# হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা

## (Medical science in the Hadith literature : A review)

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ**


তত্ত্বাবধায়ক

**ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

গবেষক

**মো: কামরুল হাসান**

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি: নং৭২/২০১৬-২০১৭ (পুন:)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০২১

# প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মো: কামরুল হাসান কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত **“হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা”** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এর পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

**(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)**
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জন বা প্রকাশনার জন্য অভিসন্দর্ভটির পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

**(মো: কামরুল হাসান)**
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: নং- ৭২/২০১৬-২০১৭ (পুন:)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাঁর অপার অনুগ্রহে গবেষণার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে **"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যাঁর প্রদর্শিত জীবনাদর্শে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি।

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার পিতৃসম সহানুভূতিশীল শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারকে এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি। যিনি শত ব্যবস্ততার মাঝেও অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে সঠিক দিকনির্দেশনা ও সুপরামর্শ প্রদান, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা এবং গবেষণার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে এটি সমৃদ্ধ করার পথ সুগম করেছেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁর প্রত্যক্ষ ও আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং যথাযথ তত্ত্বাবধানের কারণেই গবেষণা কর্মটি শেষ পর্যন্ত জমা দিতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য মহান আল্লাহর নিকট স্যারের দীর্ঘায়ু, সুস্থতা, সার্বিক কল্যাণ ও উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা করছি।

এছাড়াও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁদের নিরন্তর উৎসাহ, গবেষণার মানোন্নয়নে বিভিন্ন রকম সুপরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ স্যারকে, যিনি গবেষণার শুরু থেকে শিরোনাম নির্ধারণ, রূপরেখা প্রণয়ণ, কর্মপন্থা নিরূপণ ও চূড়ান্ত লক্ষে উপনীতকরণের প্রতিটি স্তরে সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন এবং অন্যতম শিক্ষানুরাগী সহকারী অধ্যাপক ড. মো: আমীর হোসাইন স্যারকে, যিনি দু'টি সেমিনারের প্রবন্ধ প্রস্তুতকরণে ও গবেষণাকর্মটি সাজানোর ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন।

পারিবারিকভাবে আমার বড় ভাই-বোন প্রত্যেককেই এ গবেষণাকর্মে শুভ কামনা ও নানাভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে উৎসাহিত করায় তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষত আজকের এ অবস্থানে আমার পৌছার পেছনে যাদের অক্লান্ত শ্রম, মেধা, ত্যাগ ও দু'আয় আমি চিরঋণী, তাঁরা হলেন আমার মমতাময়ী মা, পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বাবা, বড় ভাই মো: আমিরুল ইসলাম এবং অগ্রজ মো: মাহমুদুল হাসান। তাঁদের ঋণ কোনোভাবে শোধ হবার নয়। আল্লাহ তা'আলার কাছে বিনীত প্রার্থনা করছি, তিনি আমার মা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে সুস্বাস্থ্যের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং বাবাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ আসনে আসীন করুন।

এছাড়া আমার সহধর্মিণী বদরুন্নেছা তাসনিম-এর নাম উল্লেখ না করলে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। পি.এইচডি. গবেষণা করার ক্ষেত্রে যে আমাকে সর্বোচ্চ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং অনেক

কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমার গবেষণা কর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। আমার একমাত্র শিশু পুত্র আহ্মাদ বিন হাসান (তাহনীফ)-এর প্রতিও ভালবাসা প্রকাশ করছি, যে দীর্ঘদিন ধরে আমার আদর ও স্নেহ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হয়েছে। আরো যারা আমাকে বিভিন্নভাবে এ গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

অবশেষে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও বাঁধা-বিপত্তি কাটিয়ে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরে আবারও আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী জ্ঞান দান করুন এবং আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিসন্দর্ভটি মানব জাতির সুস্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণ অর্জনের স্বার্থে কবুল করুন। আমীন।

**(মো: কামরুল হাসান)**
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: নং- ৭২/২০১৬-২০১৭ (পুন:)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

# অভিসন্দর্ভে অনুসৃত শব্দ সংকেত

| | |
|---|---|
| অনু. | অনুবাদক |
| অনূ. | অনূদিত |
| আ. | আলাইহিস সালাম |
| ইফা. | ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ইং | ইংরেজি |
| ১ম খ. | প্রথম খণ্ড |
| খ্রি. | খ্রিস্টাব্দ |
| তা.বি. | তারিখ বিহীন |
| দ্র. | দ্রষ্টব্য |
| ড. | ডক্টর |
| ডা. | ডাক্তার |
| প্রাগুক্ত | পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি |
| পূ. | পূর্বাব্দ |
| প্র. | প্রকাশ |
| পৃ. | পৃষ্ঠা |
| মু./মোঃ | মুহাম্মদ/মোহাম্মদ |
| মৃ. | মৃত্যু |
| রহ. | রহমাতুল্লাহি আলাইহি |
| রা. | রাদিআল্লাহু আনহু |
| সম্পা. | সম্পাদিত, সম্পাদনা |
| সং | সংস্করণ |
| সা. | সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম |
| হি. | হিজরী |
| ed./eds. | Edited by, edition. editor, editions |
| Ltd. | limited |
| p. | page |
| pp. | pages |
| Pub. | Published, publication |
| Vol. | volume |

# প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণ ও হরকতসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ا | অ | غ | গ |
| ب | ব | ف | ফ |
| ت | ত | ق | ক্ব |
| ث | ছ, স | ك | ক |
| ج | জ | ل | ল |
| ح | হ | م | ম |
| خ | খ | ن | ন |
| د | দ | و | ওয়া/ভ |
| ذ | জ, য | ه | হ |
| ر | র | ء | আ |
| ز | য | ى | য়, ইয়া |
| س | স | اَ | আ/া |
| ش | শ | اِ | ই/ি |
| ص | স, ছ | اُ | উ/ু |
| ض | য | اُوْ | ঊ |
| ط | ত্ব | اِىْ | ঈ/ী |
| ظ | য,জ | اَوْ | অও/আও |
| ع | আ/’ | اَىْ | আই |

# হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা

## (Medical science in the Hadith literature : A review)

## সূচিপত্র


**বিষয়** — **পৃষ্ঠা**

প্রত্যয়নপত্র ........ ii
ঘোষণাপত্র ........ iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ........ iv
শব্দ সংকেত ........ vi
প্রতিবর্ণায়ন ........ vii
সূচিপত্র ........ viii
ভূমিকা ........ xi

**প্রথম অধ্যায়: গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি, এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ........ ১৭**
: গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণার পরিধি ........ ১৮
: গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা ........ ২০
: গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ........ ২১

**দ্বিতীয় অধ্যায়: হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি ও মানব জীবনে এর গুরুত্ব ........ ২৩**
**প্রথম পরিচ্ছেদ** : হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ ........ ২৪
**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ........ ৪০
**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ........ ৫২

**তৃতীয় অধ্যায়: চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান ........ ৫৬**
**প্রথম পরিচ্ছেদ** : চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, প্রকারভেদ এবং ঔষধ প্রয়োগ ........ ৫৭
**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিভিন্ন মনীষীদের অবদান ........ ৬৭
**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান ........ ৮০

**চতুর্থ অধ্যায়: পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ........ ৯৭**
**প্রথম পরিচ্ছেদ** : পবিত্র কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান ........ ৯৮
**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : পবিত্র হাদীসে চিকিৎসা বিজ্ঞান ........ ১০৮
**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে চিকিৎসা ব্যবস্থা ........ ১১৫
**চতুর্থ পরিচ্ছেদ** : মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ........ ১২৩

**পঞ্চম অধ্যায়: আল-কুরআনে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট আয়াত ও এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা .......... ১৩২**

| | | |
|---|---|---|
| **প্রথম পরিচ্ছেদ** | : চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির রহস্য............. | ১৩৩ |
| **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** | : সুস্থ থাকার নিমিত্ত আল-কুরআনে পানাহার সংক্রান্ত মৌলিক নির্দেশনা............. | ১৪২ |
| **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | : শারীরিক সুস্থতায় কুরআনের নির্দেশনা ও এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা......... | ১৬০ |

**ষষ্ঠ অধ্যায়: হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্পর্কিত নির্দেশনা ........................ ১৯৮**

| | | |
|---|---|---|
| **প্রথম পরিচ্ছেদ** | : চিকিৎসা গ্রহণে হাদীসের নির্দেশনা............. | ১৯৯ |
| **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** | : ইসলাম ও ছোঁয়াচে রোগ............. | ২০৬ |
| **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | : চিকিৎসা ক্ষেত্রে হারাম দ্রব্যের ব্যবহার............. | ২১৬ |
| **চতুর্থ পরিচ্ছেদ** | : চিকিৎসক ওসঠিক নিয়মে ঔষধ সেবন............. | ২২১ |

**সপ্তম অধ্যায়: ইসলামে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনা: তাৎপর্য বিশ্লেষণ ................ ২৩৬**

| | | |
|---|---|---|
| **প্রথম পরিচ্ছেদ** | : সুস্থতা আল্লাহ প্রদত্ত একটি অন্যতম নিয়ামত............. | ২৩৭ |
| **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** | : স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব............. | ২৪১ |
| **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | : মানব জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা............. | ২৭৮ |
| **চতুর্থ পরিচ্ছেদ** | : স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবিক আচার-আচরণ ও কাজকর্মের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা............. | ২৯৩ |

**অষ্টম অধ্যায়: ইসলামে রোগ ও রোগের দর্শন: সুস্থতার রক্ষাকবচ হিসেবে অযু, সালাত ও সিয়াম............. ৩২৫**

| | | |
|---|---|---|
| **প্রথম পরিচ্ছেদ** | : রোগ একটি কষ্টি পাথর............. | ৩২৬ |
| **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** | : রোগে ধৈর্যধারণকারীর ফযীলত............. | ৩৩৬ |
| **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | : সুস্থতার রক্ষাকবচ হিসেবে অযু, সালাত ও সিয়াম............. | ৩৪১ |

**নবম অধ্যায়: পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ................... ৩৮৭**

| | | |
|---|---|---|
| **প্রথম পরিচ্ছেদ** | : হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও শস্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ............. | ৩৮৮ |
| **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** | : রোগ নিরাময়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ফল-মূলের ব্যবহার ........ | ৪০৭ |
| **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | : শারীরিক সুস্থতা লাভে বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার............. | ৪২৬ |
| **চতুর্থ পরিচ্ছেদ** | : হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতি............. | ৪৪১ |

**দশম অধ্যায়: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পানাহার সংক্রান্ত হাদীসের দিক নির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ.... ৪৫২**

**প্রথম পরিচ্ছেদ** : খাদ্য গ্রহণের দিকনির্দেশনা.................................................. ৪৫৩

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : পানীয় গ্রহণের দিকনির্দেশনা.................................................. ৪৮৭

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় খাদ্য তালিকা ও খাবারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন.............................................. ৪৯৭

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ** : শরীর সুস্থ রাখতে দৈনন্দিন খাবারের খাদ্য ও পুষ্টি তালিকা............... ৫১৬

**একাদশ অধ্যায়: পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভে বিভিন্ন আমল ও দু'আ ............................................................. ৫২৫**

**প্রথম পরিচ্ছেদ** : রোগ নিরাময়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের আমল................. ৫২৬

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : আল্লাহ এবং তাঁর সিফাতি নামের আমল...................................... ৫৪৬

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর আমল............................................ ৫৫৩

**দ্বাদশ অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ইসলামী বিধান .... ৫৬১**

**প্রথম পরিচ্ছেদ** : আধুনিক অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের বিধান.................................. ৫৬২

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : টেস্ট টিউব, ক্লোনিং, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত ও এইডস-এর বিধি-বিধান.................................................................................. ৫৭৯

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : অন্যান্য রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান বা মাসআলা.................. ৬০৭

**ত্রয়োদশ অধ্যায়: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোগীর প্রতি দায়িত্ব এবং রোগীর ইবাদত-বন্দেগির বিধি-বিধান........................................................................ ৬১৫**

**প্রথম পরিচ্ছেদ** : রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ........................................................ ৬১৬

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : রোগী দেখার আদব............................................................... ৬২৩

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : অসুস্থ অবস্থায় রোগীর ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান.......................... ৬৩০

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ** : অন্তিম মুহূর্তে রোগীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য................................. ৬৩৬

**চর্তুদশ অধ্যায়: গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা....................................... ৬৪১**

**গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল**............................................................................... ৬৪২

**সুপারিশমালা** ........................................................................................ ৬৪৪

**উপসংহার** ........................................................................................... ৬৪৬

**গ্রন্থপঞ্জি** ............................................................................................. ৬৪৮

بسم الله الرحمن الرحيم

# ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আস্সালাতু ওয়া আসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আস্হাবিহী আযমায়ীন।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ স্বীকার করে তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে দাসত্ব করা এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই হলো পৃথিবীতে মানবজাতি প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এ ধরায় যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষের হিদায়েতের জন্য তাঁদেরকে ঐশী গ্রন্থও প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁদের নিকট প্রেরিত আসমানী কিতাবসমূহ বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য নাযিল হয়নি এবং কোনো নবী-রাসূল নিজেকে কখনো বিজ্ঞানী বলে পরিচয়ও দেননি। তাই বর্তমান বিজ্ঞান মনস্কের যুগে কোনো নবী-রাসূলের জীবনেতিহাসে এবং তাঁদের নিকট প্রেরিত আসমানী গ্রন্থে সরাসরি বিজ্ঞান খুঁজতে যাওয়া অযৌক্তিক এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের মর্যদার মানদণ্ড নির্ণয় করাও যথার্থ নয়। তবে তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও প্রচারিত অমূল্য বাণীতে এমন সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, যা প্রতিভাবান লোকদেরকে আরো অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। একারণেই লক্ষ্য করা যায়, পবিত্র কুরআনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্রসমৃদ্ধ আয়াত বর্ণনা করার পরই আয়াতের শেষাংশে কিংবা কখনো সরাসরি একক আয়াত নাযিল করে জ্ঞানী সম্প্রদায়কে চিন্তা-গবেষণার দিকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে। (আল-কুরআন, ৩০:২১)

তিনি আরো ঘোষণা করেন- নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (আল-কুরআন, ৩: ১৯০) এমন আহ্বানে সাড়া দিয়ে জ্ঞানীগণ যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বিপুল সফলতাও অর্জন করেছেন।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চিকিৎসা। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই অপরাপর মৌলিক চাহিদার সাথে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হিসেবে স্থান দখল করে আছে। যুগে যুগে এই চাহিদা পূরণের লক্ষে বিভিন্ন প্রকারের পন্থাও অলবম্বন করা হয়েছে। এক সময়ের আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতি পূর্ণ সফলতা লাভ না করায় পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তিত রূপে চিকিৎসা সেবায় অবদান রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এযাবৎ কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানই স্থায়ীভাবে তার স্বীকৃতি ধরে রাখতে পারেনি; বরং এক যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি নিকটবর্তী যুগেই এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এভাবেই গবেষণা অব্যাহত থেকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে চিকিৎসা পদ্ধতি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক চূড়ান্ত কোনো পদ্ধতি মানুষ অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে চিকিৎসক হিসেবে প্রেরণ করেননি। তাঁর মুখ নি:সৃত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সংকলনসমূহ চিকিৎসা গ্রন্থও নয়। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অগণিত প্রজ্ঞাময়পূর্ণ বাণী ও তথ্য দিয়ে গেছেন। এসকল তথ্য বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিরাট নিয়ামত। যার সূত্র ধরে যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্বার উন্মোচন হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে যেসকল মৌলিক নির্দেশনা ও তথ্য দিয়ে গেছেন, বর্তমান বিজ্ঞানের অসাধারণ উৎকর্ষের যুগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর প্রত্যেকটি বিষয় বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হওয়ায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়েছেন। আবার বিস্ময়পূর্ণ এসব তথ্য প্রদানের কারণে অনেক বিজ্ঞানীরাসূলুল্লাহ (সা.)-কে একজন সেরা স্বাস্থ্যবিদ ও শরীর বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical science)-এর ভাষ্য হচ্ছে, এ চিকিৎসা পদ্ধতির ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, যা প্রাকৃতিক ও নিরাপদ। এ চিকিৎসার ব্যয় অত্যন্ত কম ও সহজলভ্য এবং কাঁচামাল প্রায় প্রতিটি দেশেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ পদ্ধতি রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বস্তুত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলতে যখন কিছুই ছিল না, ঠিক সে সময়ে ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মাহর সার্বিক কল্যাণে আসমানি প্রেরণার ওপর ভিত্তি করে গাছগাছড়া, ফলমূল, দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মানবিক আচার-আচরণ এবং সঠিক ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এ স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি চালু করেছিলেন, যা খুবই যৌক্তিক এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দীর ত্রিশের দশকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব চিকিৎসার ক্ষেত্রেসনাতন পদ্ধতির মুকাবিলায় নতুন নতুন সূত্র প্রদানের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে নবদিগন্তের উন্মোচন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যে সকল নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অপার বিস্ময়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি বাণীই ছিল অসাধরণ প্রজ্ঞাময়পূর্ণ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত না হয়ে কোনো কথা বলতেন না। তিনি ইরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো নিয়ামত দান করা হয়নি।" (সুনান নাসায়ী)

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসগুলো সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে মুসলিম জ্ঞান তাপসগণ পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা এবং গ্রীক বিজ্ঞানের অনুবাদ করার কালেও চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসগুলো তুলনামূলকভাবে ব্যাখা করেছেন। স্পেনে মুসলিম বিজ্ঞান চর্চার চরম উন্নতির যুগেও অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আধুনিককালেও মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অনুষদের পক্ষ থেকে চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসগুলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষিত হচ্ছে।

নবী কারীম (সা.) যেহেতু বিশ্ব মানবতার সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, তাই রূহানী চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি উম্মতকে দৈহিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যেসব তথ্য দিয়ে গেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির অধুনা এ যুগেও তাঁর পরিবেশিত অন্যান্য সকল তথ্যের ন্যায় চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্যাবলীও এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত যে, সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ আজও তা থেকে কেবল উপকৃতই হচ্ছেন না; বরং এসব তথ্যাবলীকে তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মানদণ্ড রূপে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সময় যতোই অতিবাহিত হচ্ছে, এর বাস্তবতা ততোই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন মনে করে আমি পিএইচ.ডি.-র গবেষণার জন্য এ বিষয়টিকে বেছে নিই আর গবেষণাকর্মের শিরোনাম হিসেবে নির্ধারিত হয়- **"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"**। যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত

ছোটখাট কিছু পুস্তক, অনুবাদ গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে যুগোপযোগী ও বিশ্লেষণধর্মী কোনো মৌলিক গবেষণা হয়নি। তাই বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় আলোচ্য গবেষণাকর্মটি মুসলমানদের উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি আমি ১৪টি অধ্যায় ও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায় **গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা** সম্পর্কিত। এতে হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আমার গবেষণার উদ্দেশ্য, চিকিৎসা শাস্ত্রে এর গুরুত্ব, গবেষণার পরিধি, গবেষণার পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে **হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি ও মানব জীবনে এর গুরুত্ব**। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, হাদীসের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং যুগে যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সার্বিক পর্যায়ে মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় হলো **চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান**। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচয়, উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা, ঔষধ প্রয়োগ এবং এর সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার, চিকিৎসা জ্ঞান লাভের স্বীকৃত মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্রের এতো উন্নয়নের পেছনে যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী যেমন- আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর-রাযী, ইবনে সিনা, আবুল কাশিম আল জাহরাভি, ইবনে রুশদসহ প্রমুখএবং অমুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী যেমন- ইমহোটেপ, হিপোক্রেটিক ও গ্যালেনসহ বিভিন্ন মনীষীদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় হলো **পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য**। অধ্যায়টি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে পবিত্র কুরআন-হাদীসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা এবং স্বয়ং পবিত্র কুরআনই যে একটি মহৌষধ তা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে চিকিৎসা পদ্ধতির রূপরেখা কেমন ছিল এবং ইসলামের দৃষ্টিতে একজন রোগীর প্রতি মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত তা পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে বিধৃত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় হলো **আল-কুরআনে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট আয়াত ও এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা**। অধ্যায়টিতে ৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির রহস্য ও ক্রমপর্যায়, ভ্রূণতত্ত্ব, শুক্রকীট ও ডিম্ব-এর অবস্থান স্থল, লিঙ্গ নির্ধারণ, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অনুভূতি, আঙ্গুলের ছাপ, ত্বকে ব্যথা অনুভবকারী গ্রন্থির উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুস্থ থাকার নিমিত্ত আল-কুরআনে বর্ণিত পানাহার সংক্রান্ত মৌলিক নির্দেশনা হিসেবে হারাম খাদ্য এবং পানীয় যেমন- রক্ত ও শরাব পান, মৃত জীব-জন্তু ও শূকরের গোশত ভক্ষণের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং মাদক সেবনের শারীরিক ও সামাজিক কুফল উল্লেখ পূর্বক তা পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। শারীরিক সুস্থতায় আল-কুরআনে বর্ণিত

অন্যান্য নির্দেশনা এবং এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঘুমের প্রয়োজনীয়তা, ঘুমানোর সঠিক সময় ও নিয়মাবলি, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিবাহের গুরুত্ব, শারীরিক সুস্থতায় পর্দার গুরুত্ব, পর্দার সীমারেখা, মানব জীবনে পর্দা ও দৃষ্টির প্রভাব, ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা, বিবস্ত্র না হওয়া, ইসতিঞ্জায় পানি ব্যবহারে শারীরিক উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ***হাদীস* শাস্ত্রে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্পর্কিত নির্দেশনা**। এটি ৪টি পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত। এ অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক রোগীকে চিকিৎসা করানোর নির্দেশনা, চিকিৎসা গ্রহণ করা যে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয় এবং মৃত্যু ব্যতীত কোনো অসুখ দূরারোগ্য নয় বরং সকল রোগের ঔষধ রয়েছে এবং হাদীসে ছোঁয়াচে রোগ ও মহামারী এলাকায় অবস্থানের নির্দেশনা, বিশেষ প্রয়োজনে মহামারী এলাকায় আসা-যাওয়ার বিধান, হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার কারণ, প্রয়োজেন তা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা, বিজ্ঞ ও হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা প্রদান এবং সঠিক নিয়মে ঔষধ সেবন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম **ইসলামে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনাঃ তাৎপর্য বিশ্লেষণ**। এ অধ্যায়টি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে মানুষ ইচ্ছা করলেই যে সুস্থ থাকতে পারে না বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি অন্যতম নিয়ামত তা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই  স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখার জন্য দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন- সময় মতো খাৎনা করা, নাভির নিচ ও বগলের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, মিসওয়াক করা, অযু ও গোসল করা, ইসতিঞ্জায় ঢিলা–কুলুখ ও পানি ব্যবহার করা, বাম হাত দিয়ে মলমূত্র পরিষ্কার করা, পায়খানার পর ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া এবং সঠিক নিয়মে চুলের পরিচর্যা করা ইত্যাদি অতীব প্রয়োজন বিষয় পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া সুস্থতার নিমিত্ত শুধু ঔষধের ওপর নির্ভর না করে নিরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দৈনন্দিন মানবিক আচার-আচরণ এবং কাজকর্ম কেমন হওয়া উচিত এবং পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন- বদ্ধ পানি ও যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ না করা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরি করা, নিয়মিত বিছানা ঝাড়া ও কাপড় পরিবর্তন করা, রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রাখা, খাবার পাত্রে মাছি বসলে করণীয়, হাঁচি দেয়া ও হাই তোলার সঠিক নিয়ম, জুতা পরিধানে বিভিন্ন অঙ্গের ওপর এর প্রভাব, মাঝেমধ্যে খালি পায়ে হাঁটার উপকারিতা, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা ও দ্রুত ভ্রমণে শারীরিক উপকারিতা এবং ক্রোধ সম্বরণ করা ইত্যাদি বিষয়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় **ইসলামে রোগ ও রোগের দর্শনঃ সুস্থতার রক্ষাকবচ হিসেবে অযু, সালাত ও সিয়াম**। এতে ৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এখানেমু'মিনের জীবনে রোগ যে একটি কষ্টি পাথর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব নয় বরং গোনাহের কাফ্ফারা, রহমত ও জান্নাত লাভের ওছিলা, রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের রোগে আক্রান্ত হওয়া,রোগে ধৈর্য ধারণ করাও রোগের কারণে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত, রোগকে গালমন্দ ও মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা না করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপশি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুসলমানের প্রতি আবশ্যক হিসেবে যেসকল শারীরিক ইবাদতের

নির্দেশনা রয়েছে যেমন: অযু, সালাত ও সিয়াম এসব আমল মানব শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কতটুকু ভূমিকা পালন করে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নবম অধ্যায় হচ্ছে **পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা**। এটি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এ অধ্যায়ে মানব দেহে রোগ প্রতিষেধনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যেসব উদ্ভিদ তথা গাছ-গাছড়া ও শস্যাদি যথা- মাশরুম, সিনা বা সোনামুখী, শিবরম, মুসাব্বর বা ঘৃতকুমারী, সরফজাল বা বিহিদানা, কালিজিরা, কুসত বা ঊদে হিন্দ, যব ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন ফল-মূল যেমন- খেজুর,ত্বীন, যাইতুন, আনার আঙ্গুর, কলা, কাঁকড়ী ও তরমুজের কার্যকারিতা এবং বিভিন্ন পদার্থ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা যথা- মধু, দুধ, লবণ, সুরমা ইত্যাদির উপকারিতা বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি যথা- শিংগা লাগানো, জ্বর নিবারণে পানি ব্যবহার, রক্তক্ষরণ বন্ধে ছাই-এর ব্যবহার, মেহেদী পাতা, ব্যথা নিরাময়ে দুম্বার নিতম্বের গোশত খাওয়া এবং জমাট শিশির ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

দশম অধ্যায় হচ্ছে **স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পানাহার সংক্রান্ত হাদীসের দিকনির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ**। এটি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে মানব জীবনে খাওয়ার গুরুত্ব, খাদ্য গ্রহণের মৌলিক নিয়মাবলী যেমন-সহজ ও সাধারণ খাবার গ্রহণ করা, খাওয়ার সময়সূচি, আহারের আগে-পরে হাত ধৌত করা ও ডান হাতে পানাহার করা, খাওয়ার পূর্বে কুলি করা এবং বসার পদ্ধতি, কয়েকজন মিলে একই বর্তনে খাবার খাওয়া, খাবারে ফুঁ না দেয়া, ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া ওআঙ্গুল-প্লেট মুছে খাওয়া, তাড়াহুড়া করে না খাওয়া, খাওয়ার সময় মাঝেমধ্যে আনন্দদায়ক কথাবার্তা বলা, খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি পান না করা, পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা, খাওয়ার পর মুখে হাত মালিশ করা, দুপুরে খাওয়ার পর কায়লুলা বা অল্প বিশ্রাম নেয়া, রাত্রে খাওয়ার পর হাটা, খাওয়ার পর খিলাল করা, পরিমিত খাবার গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের দিকনির্দেশনাসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে মানব জীবনে পান করার গুরুত্ব ও মৌলিক নিয়মাবলী যেমন- পানি দেখে পান করা, গরম পানি পান না করা, দন্ডায়মান অবস্থায় পানি পান না করা, তিন শ্বাসে পানি পান করা, ভাঙ্গা পাত্রে পানি পান না করা, পানপাত্র ঢেকে রাখা, পানপাত্রে নি:শ্বাস না ফেলা, বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা, পশুর মত চুমুক দিয়ে পানি পান না করা, দুধ পান করার পর কুলি করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের দিকনির্দেশনাসহ বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়ারাসূলুল্লাহ (সা.) কোন ধরনের খাবার পছন্দ করতেন ও কোন ধরনের খাবার থেকে সতর্কতা অবলম্বণ করতেন এর যৌক্তিক দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে বয়স অনুযায়ী একজন মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও পুষ্টি গুণের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো **পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভে বিভিন্ন আমল ও দু'আ**। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের আমল,আল্লাহ ও তাঁর সিফাতি নামের আমল এবং হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর আমল বর্ণনা করা হয়েছে। যা মুসলমানগণ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এসকল রূহানী আমলের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে বিভিন্ন রোগ ও বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হবে।

দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে **বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ইসলামী বিধান**। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে অসুস্থতা ও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে আধুনিক অপারেশন বা অস্ত্রোপচার যথা- মৃতদেহে অস্ত্রোপচার বা ময়না তদন্ত, ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে লাশ কাটা, প্লাস্টি সার্জারি এবং সিজার করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া টেস্ট টিউব ও ক্লোনিং পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানের

ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব বিধি-নিষেধ ও মতভেদ রয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অত:পর গর্ভপাত, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, এইডস, রক্ত দান ও গ্রহণ, একজনের অঙ্গ অপরের দেহে সংযোজন করাসহ অন্যান্য রোগ ও চিকিৎসা পদ্ধতির আহ্‌কাম বর্ণনা করা হয়েছে এবং সবশেষে এ সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনাম **কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোগীর প্রতি দায়িত্ব এবং রোগীর ইবাদত-বন্দেগির বিধি-বিধান**। এটি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই অধ্যায়ে রোগী দেখতে যাওয়ার হুকুম, রোগী দেখার প্রতিদান, রোগীর প্রতি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ডাক্তার এবং সেবক-সেবিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া রোগী দেখার আদব, রোগীর চাহিদানুযায়ী খাদ্য ও হাদিয়া প্রদান করা, রোগীর জন্য দু'আ করা, অসুস্থ অবস্থায় রোগীর ফরয ইবাদত আদায়ের বিধি-বিধান,মসজিদে যাওয়ার হুকুম এবংঅসুস্থ অবস্থায় আল্লাহর ওপর সুধারণা রাখার বিষয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি রোগী দেখে কান্না করা ও মর্মবেদনা প্রকাশ করা, অন্তিম মুহূর্তে রোগীকে সঠিক নিয়মে তালকীন দেয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনাকরা হয়েছে।

চতুর্দশ বা সর্বশেষ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে **গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা**। এতে সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্তাকারে এই গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে একটি উপসংহার সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং পরিশেষে গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে এর একটি সুবিস্তৃত তালিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণাকর্মের পরিসমাপ্তি করা হয়েছে।

আমার এ গবেষণাকর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে মৌলিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে এর কতটুকু সামঞ্জস্যতা রয়েছে তা গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে খুব সহজে ও স্বতন্ত্র আঙ্গিকে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছি।

সারাজীবন গবেষণা করেও তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত পবিত্র কুরআন-হাদীসের পরিপূর্ণ মর্মার্থ উদঘাটন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমার গবেষণাকর্মটিও যে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তা আমি মনে করি না। এর বাইরেও এমন অনেক অজানা তথ্য রয়েছে যা যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী অনুসন্ধানী গবেষকদের গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে এবং সকলের প্রচেষ্টায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে। তবে আমার এ গবেষণাকর্মটি পরবর্তীদের পথনির্দেশনার কাজ করবে বলে আমি মনে করি। এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমি আমার সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হিসেবে গৃহীত হবে।

সবশেষে আমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, এ অভিসন্দর্ভ দ্বারা আমাকে ও এর পাঠককুলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

# এ্যাবস্ট্রাক্ট

## শিরোনামঃ

## হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা

## (Medical science in the Hadith literature : A review)

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ**


তত্ত্বাবধায়ক

**ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

গবেষক

**মো: কামরুল হাসান**

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি: নং- ৭২/২০১৬-২০১৭ (পুন:)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০২১

# শিরোনামঃ

# হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা

## (Medical science in the Hadith literature : A review)

## সারসংক্ষেপ (Abstract)

### ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আস্‌সালাতু ওয়া আসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আযমায়ীন। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ স্বীকার করে তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে দাসত্ব করা এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই হলো পৃথিবীতে মানবজাতি প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এ ধরায় যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষের হিদায়েতের জন্য তাঁদেরকে ঐশী গ্রন্থও প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁদের নিকট প্রেরিত আসমানী কিতাবসমূহ বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য নাযিল হয়নি এবং কোনো নবী-রাসূল নিজেকে কখনো বিজ্ঞানী বলে পরিচয়ও দেননি। তাই বর্তমান বিজ্ঞান মনস্কের যুগে কোনো নবী-রাসূলের জীবনেতিহাসে এবং তাঁদের নিকট প্রেরিত আসমানী গ্রন্থে সরাসরি বিজ্ঞান খুঁজতে যাওয়া অযৌক্তিক এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের মর্যদার মানদণ্ড নির্ণয় করাও যথার্থ নয়। তবে তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও প্রচারিত অমূল্য বাণীতে এমন সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, যা প্রতিভাবান লোকদেরকে আরো অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। একারণেই লক্ষ্য করা যায়, পবিত্র কুরআনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্রসমৃদ্ধ আয়াত বর্ণনা করার পরই আয়াতের শেষাংশে কিংবা কখনো সরাসরি একক আয়াত নাযিল করে জ্ঞানী সম্প্রদায়কে চিন্তা-গবেষণার দিকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে। (আল-কুরআন, ৩০:২১)

তিনি আরো ঘোষণা করেন- নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (আল-কুরআন, ৩: ১৯০) এমন আহ্বানে সাড়া দিয়ে জ্ঞানীগণ যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বিপুল সফলতাও অর্জন করেছেন।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চিকিৎসা। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই অপরাপর মৌলিক চাহিদার সাথে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হিসেবে স্থান দখল করে আছে। যুগে যুগে এই চাহিদা পূরণের লক্ষে বিভিন্ন প্রকারের পন্থাও অলবম্বন করা হয়েছে। এক সময়ের আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতি পূর্ণ সফলতা লাভ না করায় পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তিত রূপে চিকিৎসা সেবায় অবদান রাখতে সচেষ্ট

হয়েছে। কিন্তু এযাবৎ কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানই স্থায়ীভাবে তার স্বীকৃতি ধরে রাখতে পারেনি; বরং এক যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি নিকটবর্তী যুগেই এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এভাবেই গবেষণা অব্যাহত থেকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে চিকিৎসা পদ্ধতি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক চূড়ান্ত কোনো পদ্ধতি মানুষ অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে চিকিৎসক হিসেবে প্রেরণ করেননি। তাঁর মুখ নি:সৃত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সংকলনসমূহ চিকিৎসা গ্রন্থও নয়। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অগণিত প্রজ্ঞাময়পূর্ণ বাণী ও তথ্য দিয়ে গেছেন। এসকল তথ্য বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিরাট নিয়ামত। যার সূত্র ধরে যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্বার উন্মোচন হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে যেসকল মৌলিক নির্দেশনা ও তথ্য দিয়ে গেছেন, বর্তমান বিজ্ঞানের অসাধারণ উৎকর্ষের যুগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর প্রত্যেকটি বিষয় বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হওয়ায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়েছেন। আবার বিস্ময়পূর্ণ এসব তথ্য প্রদানের কারণে অনেক বিজ্ঞানীরাসূলুল্লাহ (সা.)-কে একজন সেরা স্বাস্থ্যবিদ ও শরীর বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical science)-এর ভাষ্য হচ্ছে, এ চিকিৎসা পদ্ধতির ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, যা প্রাকৃতিক ও নিরাপদ। এ চিকিৎসার ব্যয় অত্যন্ত কম ও সহজলভ্য এবং কাঁচামাল প্রায় প্রতিটি দেশেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ পদ্ধতি রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বস্তুত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলতে যখন কিছুই ছিল না, ঠিক সে সময়ে ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মাহর সার্বিক কল্যাণে আসমানি প্রেরণার ওপর ভিত্তি করে গাছগাছড়া, ফলমূল, দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মানবিক আচার-আচরণ এবং সঠিক ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এ স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি চালু করেছিলেন, যা খুবই যৌক্তিক এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দীর ত্রিশের দশকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব চিকিৎসার ক্ষেত্রেসনাতন পদ্ধতির মুকাবিলায় নতুন নতুন সূত্র প্রদানের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে নবদিগন্তের উন্মোচন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যে সকল নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অপার বিস্ময়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি বাণীই ছিল অসাধরণ প্রজ্ঞাময়পূর্ণ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত না হয়ে কোনো কথা বলতেন না। তিনি ইরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো নিয়ামত দান করা হয়নি।" (সুনান নাসায়ী)

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসগুলো সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে মুসলিম জ্ঞান তাপসগণ পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা এবং গ্রীক বিজ্ঞানের অনুবাদ করার কালেও চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসগুলো তুলনামূলকভাবে ব্যাখা করেছেন। স্পেনে মুসলিম বিজ্ঞান চর্চার চরম উন্নতির যুগেও অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত

হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আধুনিককালেও মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অনুষদের পক্ষ থেকে চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসগুলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষিত হচ্ছে।

নবী কারীম (সা.) যেহেতু বিশ্ব মানবতার সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, তাই রূহানী চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি উম্মতকে দৈহিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যেসব তথ্য দিয়ে গেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির অধুনা এ যুগেও তাঁর পরিবেশিত অন্যান্য সকল তথ্যের ন্যায় চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্যাবলীও এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত যে, সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ আজও তা থেকে কেবল উপকৃতই হচ্ছেন না; বরং এসব তথ্যাবলীকে তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মানদণ্ড রূপে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সময় যতোই অতিবাহিত হচ্ছে, এর বাস্তবতা ততোই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন মনে করে আমি পিএইচ.ডি.-র গবেষণার জন্য এ বিষয়টিকে বেছে নিই আর গবেষণাকর্মের শিরোনাম হিসেবে নির্ধারিত হয়- **"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"**। যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত ছোটখাট কিছু পুস্তক, অনুবাদ গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে যুগোপযোগী ও বিশ্লেষণধর্মী কোনো মৌলিক গবেষণা হয়নি। তাই বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় আলোচ্য গবেষণাকর্মটি মুসলমানদের উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি আমি ১৪টি অধ্যায় ও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায় ***গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা*** সম্পর্কিত। এতে হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আমার গবেষণার উদ্দেশ্য, চিকিৎসা শাস্ত্রে এর গুরুত্ব, গবেষণার পরিধি, গবেষণার পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে ***হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি ও মানব জীবনে এর গুরুত্ব***। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, হাদীসের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং যুগে যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সার্বিক পর্যায়ে মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় হলো ***চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান***। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচয়, উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা, ঔষধ প্রয়োগ এবং এর সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার, চিকিৎসা জ্ঞান লাভের স্বীকৃত মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্রের এতো উন্নয়নের পেছনে যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী যেমন- আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর-রাযী, ইবনে সিনা, আবুল কাশিম আল জাহরাভি,

ইবনে রুশদসহ প্রমুখএবং অমুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী যেমন- ইমহোটেপ, হিপোক্রেটিক ও গ্যালেনসহ বিভিন্ন মনীষীদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় হলো ***পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য***। অধ্যায়টি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে পবিত্র কুরআন-হাদীসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা এবং স্বয়ং পবিত্র কুরআনই যে একটি মহৌষধ তা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে চিকিৎসা পদ্ধতির রূপরেখা কেমন ছিল এবং ইসলামের দৃষ্টিতে একজন রোগীর প্রতি মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত তা পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে বিধৃত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় হলো ***আল-কুরআনে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট আয়াত ও এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা***। অধ্যায়টিতে ৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির রহস্য ও ক্রমপর্যায়, ভ্রূণতত্ত্ব, শুক্রকীট ও ডিম্ব-এর অবস্থান স্থল, লিঙ্গ নির্ধারণ, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অনুভূতি, আঙ্গুলের ছাপ, ত্বকে ব্যথা অনুভবকারী গ্রন্থির উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুস্থ থাকার নিমিত্ত আল-কুরআনে বর্ণিত পানাহার সংক্রান্ত মৌলিক নির্দেশনা হিসেবে হারাম খাদ্য এবং পানীয় যেমন- রক্ত ও শরাব পান, মৃত জীব-জন্তু ও শূকরের গোশত ভক্ষণের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং মাদক সেবনের শারীরিক ও সামাজিক কুফল উল্লেখ পূর্বক তা পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। শারীরিক সুস্থতায় আল-কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশনা এবং এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঘুমের প্রয়োজনীয়তা, ঘুমানোর সঠিক সময় ও নিয়মাবলি, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিবাহের গুরুত্ব, শারীরিক সুস্থতায় পর্দার গুরুত্ব, পর্দার সীমারেখা, মানব জীবনে পর্দা ও দৃষ্টির প্রভাব, ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা, বিবস্ত্র না হওয়া, ইসতিঞ্জায় পানি ব্যবহারে শারীরিক উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ***হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্পর্কিত নির্দেশনা***। এটি ৪টি পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত। এ অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক রোগীকে চিকিৎসা করানোর নির্দেশনা, চিকিৎসা গ্রহণ করা যে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয় এবং মৃত্যু ব্যতীত কোনো অসুখ দূরারোগ্য নয় বরং সকল রোগের ঔষধ রয়েছে এবং হাদীসে ছোঁয়াচে রোগ ও মহামারী এলাকায় অবস্থানের নির্দেশনা, বিশেষ প্রয়োজনে মহামারী এলাকায় আসা-যাওয়ার বিধান, হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার কারণ, প্রয়োজেন তা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা, বিজ্ঞ ও হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা প্রদান এবং সঠিক নিয়মে ঔষধ সেবন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম ***ইসলামে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনা: তাৎপর্য বিশ্লেষণ।*** এ অধ্যায়টি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে মানুষ ইচ্ছা করলেই যে সুস্থ থাকতে পারে না বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি অন্যতম নিয়ামত তা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই  স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখার জন্য দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন- সময় মতো খাৎনা করা, নাভির নিচ ও বগলের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, মিসওয়াক করা, অযু ও গোসল করা, ইসতিঞ্জায় ঢিলা–কুলুখ ও পানি ব্যবহার করা, বাম হাত দিয়ে মলমূত্র পরিষ্কার করা, পায়খানার পর ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া

এবং সঠিক নিয়মে চুলের পরিচর্যা করা ইত্যাদি অতীব প্রয়োজন বিষয় পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া সুস্থতার নিমিত্ত শুধু ঔষধের ওপর নির্ভর না করে নিরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দৈনন্দিন মানবিক আচার-আচরণ এবং কাজকর্ম কেমন হওয়া উচিত এবং পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন- বদ্ধ পানি ও যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ না করা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরি করা, নিয়মিত বিছানা ঝাড়া ও কাপড় পরিবর্তন করা, রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রাখা, খাবার পাত্রে মাছি বসলে করণীয়, হাঁচি দেয়া ও হাই তোলার সঠিক নিয়ম, জুতা পরিধানে বিভিন্ন অঙ্গের ওপর এর প্রভাব, মাঝেমধ্যে খালি পায়ে হাঁটার উপকারিতা, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা ও দ্রুত ভ্রমণে শারীরিক উপকারিতা এবং ক্রোধ সম্বরণ করা ইত্যাদি বিষয়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় ***ইসলামে রোগ ও রোগের দর্শন: সুস্থতার রক্ষাকবচ হিসেবে অযু, সালাত ও সিয়াম***। এতে ৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এখানেমু'মিনের জীবনে রোগ যে একটি কষ্টি পাথর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব নয় বরং গোনাহের কাফ্ফারা, রহমত ও জান্নাত লাভের ওছিলা, রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের রোগে আক্রান্ত হওয়া,রোগে ধৈর্য ধারণ করাও রোগের কারণে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত, রোগকে গালমন্দ ও মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা না করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপশি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুসলমানের প্রতি আবশ্যক হিসেবে যেসকল শারীরিক ইবাদতের নির্দেশনা রয়েছে যেমন: অযু, সালাত ও সিয়াম এসব আমল মানব শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কতটুকু ভূমিকা পালন করে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নবম অধ্যায় হচ্ছে ***পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা***। এটি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এ অধ্যায়ে মানব দেহে রোগ প্রতিষেধনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যেসব উদ্ভিদ তথা গাছ-গাছড়া ও শস্যাদি যথা- মাশরুম, সিনা বা সোনামুখী, শিবরম, মুসাব্বর বা ঘৃতকুমারী, সরফজাল বা বিহিদানা, কালিজিরা, কুসত বা ঊদে হিন্দ, যব ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন ফল-মূল যেমন- খেজুর,ত্বীন, যাইতুন, আনার আঙ্গুর, কলা, কাঁকড়ী ও তরমুজের কার্যকারিতা এবং বিভিন্ন পদার্থ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা যথা- মধু, দুধ, লবণ, সুরমা ইত্যাদির উপকারিতা বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি যথা- শিংগা লাগানো, জ্বর নিবারণে পানি ব্যবহার, রক্তক্ষরণ বন্ধে ছাই-এর ব্যবহার, মেহেদী পাতা, ব্যথা নিরাময়ে দুম্বার নিতম্বের গোশত খাওয়া এবং জমাট শিশির ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

দশম অধ্যায় হচ্ছে ***স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পানাহার সংক্রান্ত হাদীসের দিকনির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ***। এটি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে মানব জীবনে খাওয়ার গুরুত্ব, খাদ্য গ্রহণের মৌলিক নিয়মাবলী যেমন-সহজ ও সাধারণ খাবার গ্রহণ করা, খাওয়ার সময়সূচি, আহারের আগে-পরে হাত ধৌত করা ও ডান হাতে পানাহার করা, খাওয়ার পূর্বে কুলি করা এবং বসার পদ্ধতি, কয়েকজন মিলে একই বর্তনে খাবার খাওয়া, খাবারে ফুঁ না দেয়া, ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া ওআঙ্গুল-প্লেট মুছে খাওয়া, তাড়াহুড়া করে না খাওয়া, খাওয়ার সময় মাঝেমধ্যে আনন্দদায়ক কথাবার্তা বলা, খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি পান না করা, পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা, খাওয়ার পর মুখে হাত মালিশ করা, দুপুরে খাওয়ার পর কায়লুলা বা অল্প বিশ্রাম নেয়া, রাত্রে খাওয়ার পর হাটা, খাওয়ার পর খিলাল করা, পরিমিত খাবার গ্রহণ

করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের দিকনির্দেশনাসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে মানব জীবনে পান করার গুরুত্ব ও মৌলিক নিয়মাবলী যেমন- পানি দেখে পান করা, গরম পানি পান না করা, দন্ডায়মান অবস্থায় পানি পান না করা, তিন শ্বাসে পানি পান করা, ভাঙ্গা পাত্রে পানি পান না করা, পানপাত্র ঢেকে রাখা, পানপাত্রে নি:শ্বাস না ফেলা, বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা, পশুর মত চুমুক দিয়ে পানি পান না করা, দুধ পান করার পর কুলি করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের দিকনির্দেশনাসহ বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়ারাসূলুল্লাহ (সা.) কোন ধরনের খাবার পছন্দ করতেন ও কোন ধরনের খাবার থেকে সতর্কতা অবলম্বণ করতেন এর যৌক্তিক দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে বয়স অনুযায়ী একজন মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও পুষ্টি গুণের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো ***পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভে বিভিন্ন আমল ও দু'আ***। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের আমল,আল্লাহ ও তাঁর সিফাতি নামের আমল এবং হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর আমল বর্ণনা করা হয়েছে। যা মুসলমানগণ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এসকল রূহানী আমলের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে বিভিন্ন রোগ ও বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হবে।

দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে ***বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ইসলামী বিধান***। এটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে অসুস্থতা ও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে আধুনিক অপারেশন বা অস্ত্রোপচার যথা- মৃতদেহে অস্ত্রোপচার বা ময়না তদন্ত, ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে লাশ কাটা, প্লাস্টি সার্জারি এবং সিজার করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া টেস্ট টিউব ও ক্লোনিং পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব বিধি-নিষেধ ও মতভেদ রয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অত:পর গর্ভপাত, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, এইডস, রক্ত দান ও গ্রহণ, একজনের অঙ্গ অপরের দেহে সংযোজন করাসহ অন্যান্য রোগ ও চিকিৎসা পদ্ধতির আহ্কাম বর্ণনা করা হয়েছে এবং সবশেষে এ সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনাম ***কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোগীর প্রতি দায়িত্ব এবং রোগীর ইবাদত-বন্দেগির বিধি-বিধান,*** এটি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই অধ্যায়ে রোগী দেখতে যাওয়ার হুকুম, রোগী দেখার প্রতিদান, রোগীর প্রতি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ডাক্তার এবং সেবক-সেবিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া রোগী দেখার আদব, রোগীর চাহিদানুযায়ী খাদ্য ও হাদিয়া প্রদান করা, রোগীর জন্য দু'আ করা, অসুস্থ অবস্থায় রোগীর ফরয ইবাদত আদায়ের বিধি-বিধান,মসজিদে যাওয়ার হুকুম এবংঅসুস্থ অবস্থায় আল্লাহর ওপর সুধারণা রাখার বিষয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি রোগী দেখে কান্না করা ও মর্মবেদনা প্রকাশ করা, অন্তিম মুহূর্তে রোগীকে সঠিক নিয়মে তালকীন দেয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনাকরা হয়েছে।

চতুর্দশ বা সর্বশেষ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ***গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা***। এতে সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্তাকারে এই গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে একটি উপসংহার সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং পরিশেষে গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে এর একটি সুবিস্তৃত তালিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণাকর্মের পরিসমাপ্তি করা হয়েছে।

আমার এ গবেষণাকর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে মৌলিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে এর কতটুকু সামঞ্জস্যতা রয়েছে তা গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে খুব সহজে ও স্বতন্ত্র আঙ্গিকে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছি।

সারাজীবন গবেষণা করেও তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত পবিত্র কুরআন-হাদীসের পরিপূর্ণ মর্মার্থ উদঘাটন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমার গবেষণাকর্মটিও যে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তা আমি মনে করি না। এর বাইরেও এমন অনেক অজানা তথ্য রয়েছে যা যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী অনুসন্ধানী গবেষকদের গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে এবং সকলের প্রচেষ্টায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে। তবে আমার এ গবেষণাকর্মটি পরবর্তীদের পথনির্দেশনার কাজ করবে বলে আমি মনে করি। এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমি আমার সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হিসেবে গৃহীত হবে।
সবশেষে আমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, এ অভিসন্দর্ভ দ্বারা আমাকে ও এর পাঠককুলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।


তত্ত্বাবধায়ক

**ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

গবেষক

**মো: কামরুল হাসান**

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি: নং- ৭২/২০১৬-২০১৭ (পুন:)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

# প্রথম অধ্যায়

## গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণার পরিধি

গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, প্রাথমিক উৎস ও দ্বৈতিয়ীক উৎস

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

# গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণার পরিধি

## গবেষণার উদ্দেশ্য

যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় নবী কারীম (সা.)-এর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত ছোটখাট কিছু পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে যুগোপযোগী কোনো মৌলিক গবেষণা হয়নি। তাই হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তা গুরুত্বের দাবি রাখে।

উক্ত গবেষণা কর্মটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সক্ষম হবে-

**ক.** নবী কারীম (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে মৌলিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তা আধুনিক যুগেও এর গ্রহণযোগ্যতার পূনর্মূল্যায়ন করা।

**খ.** চিকিৎসা সম্পর্কিত নবী কারীম (সা.)-এর অমীয় বাণীসমূহ বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মর্মার্থ উপলব্ধি করা।

**গ.** বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দ্বারা স্বতন্ত্র আঙ্গিকে একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করে অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় সংযোজন করা।

**ঘ.** রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শসমূহ ও নির্দেশনাবলীকে সামনে রেখে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল কাজে লাগিয়ে বর্তমান বিশ্বের রোগাক্রান্ত ও পীড়িত মানব জাতিকে সুখী, সমৃদ্ধ ও সুস্থ রাখার বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা দেয়া।

**ঙ.** বর্তমানে আবিষ্কৃত এবং সারাবিশ্বে স্বীকৃত প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিই যে রোগ নিরাময়ের একমাত্র মাধ্যম নয়; বরং হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমেও যে তুলনামূলক আরো সহজ ও কম খরচে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবিক সুষ্ঠু আচার-আচরণ অনুশীলন ও বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করেও যে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন-যাপন করা সম্ভব তা তুলে ধরাও এ গবেষণার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।

**চ.** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল-রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাএবং এটিই যে শ্রেয়, তা হাদীসের আলোকে এ গবেষণায় ফুটিয়ে তোলা।

## গবেষণার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা সকল জ্ঞান দিয়েই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলিম অমুসলিম সবার জন্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রহমত স্বরূপ। তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে যেমন সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন, তেমনি মানুষের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় চিকিৎসা ক্ষেত্রেও দিয়েছেন অসংখ্য নির্ভুল তথ্য। এসকল বিষয় অনুসরণের ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সুস্থ ও নিরাপদ জীবন লাভ করলেও বর্তমান মুসলিম সমাজ তাঁর (সা.) বর্ণিত

চিকিৎসা পদ্ধতি পুরোপুরি অবলম্বন না করার কারণে অসংখ্য রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাই মুসলমানগণ ধর্মীয় অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণের পাশাপশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ নি:সৃত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক যেন সুস্থ ও নিরোগ থাকতে পারে এ বিষয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন জ্ঞানী ও মনীষীগণ গবেষণা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব রাখে। সঙ্গত কারণে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে একেক সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের একেক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেও সিহাহ্ সিত্তাহসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রোগ ও চিকিৎসাভিত্তিক তা সন্নিবেশিত এবং ব্যাখ্যা করা হয়নি। এতে বর্তমান সময়ে সাধারণ মুসলামনগণ এ বিষয়ে অজ্ঞাত থাকার কারণে তা থেকে উপকার গ্রহণে বঞ্চিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা সংক্রান্ত বাণীসমূহ ধারাবাহিকভাবে এবং অধ্যায়ভিত্তিক সন্নিবেশন করত গবেষণাকর্ম পরিচালিত হলে এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসরণের মাধ্যমে মানব জাতি সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

## গবেষণার পরিধি

**"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণায় আমি চিকিৎসা সম্পর্কিত ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহই বিশ্লেষণ করেছি এবং সে সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত থাকলে তা উল্লেখ করেছি। প্রাসঙ্গিকক্রমে উক্ত গবেষণায় হাদীস শাস্ত্রের পরিচিতি ও মানব জীবনে এর গুরুত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান, মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ইসলামী বিধান ইত্যাদিসহ চিকিৎসার সাথে সামঞ্জস্য বিষয়াবলীও তুলে ধরেছি। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, সিহাহ্ সিত্তাহ্ এবং অন্যান্য মৌলিক হাদীস গ্রন্থসমূহের পাশাপাশি সহায়ক অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তথ্যাবলী এবং দেশ-বিদেশের উদ্ভাবিত ও বিস্তৃত চিন্তা ধারার প্রাথমিক ও মৌলিক রচনাবলী সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা করেছি, যাতে চিকিৎসা বিষয়ক বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষায় যে সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা, জার্নাল, ফিচার ও অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে তা সংগ্রহ করে গবেষণা কর্মে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে যেসকল প্রমাণ, ব্যাখ্যা ও অভিমত রয়েছে তা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী,বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরী প্রভৃতি ব্যবহার করে বিভিন্ন গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, বিশেষ করে ইন্টারনেট হতে পিডিএফ বই এবং তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেছি। এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত প্রতিটি গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র থেকেই কম-বেশি সহযোগিতা গ্রহণ করেছি।

# গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা

## গবেষণা পদ্ধতি

**"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণাটি একটি মৌলিক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। আমি আমার গবেষণা কর্মটিকে সহজ-সরল ও সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি সংমিশ্রণ করে সম্পাদন করেছি। এতে বিশেষ করে অনুবাদমূলক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক, যুক্তিনির্ভর, সমালোচনামূলক, সীরাত ও ইতিহাস নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও আমি এ গবেষণা কর্মে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতির রীতিনীতি অনুসরণপূর্বক আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছি। গবেষণাটি বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক সহযোগিতা হিসেবে প্রয়োজন মতে আরবী ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে।

## গবেষণার সীমাবদ্ধতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীভিত্তিক হওয়ায় তা অন্তর্নিহিত ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত তিনি যেসকল বাণী ও পরামর্শ দিয়েছেন সার্বিক দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর প্রতিটি বিষয় নিয়ে অদ্যাবধি সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়নি, যার ওপর ভিত্তি করে চলমান চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি শক্ত অবকাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব হয়। যেমন- হাদীসে কালিজিরাকে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ বলা হলেও এখনো পর্যন্ত কোন রোগে কতটুকু এবং এর সেবনবিধি কী হবে, এ বিষয়ে আমাদের বাস্তব জীবনে উচ্চতর পর্যায়ের গবেষণাভিত্তিক ও প্রামাণিক প্রয়োগের প্রতিফলন ঘটেনি। এমনিভাবে হাদীসে আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা শতভাগ সঠিক হওয়া সত্ত্বেও শুধু গবেষণার অভাবে বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রভাব ফুটে ওঠেনি। আর তাই মুসলিম সমাজে আজও হাদীস কেন্দ্রিক একটি যুগোপযোগী ও সফল চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ছাড়াও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির অপ্রতুলতা এবং আমি নিজেও একজন চিকিৎসক না হওয়ার কারণে চিকিৎসা সংক্রান্ত যেসকল বিষয় হাদীসে রয়েছে তা বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য রেখে গবেষণকর্মটির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার পেছনে বড় ধরনের অন্তরায় ছিল। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে এবং সুধীজনের সহযোগিতা নিয়ে নানা জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বর্তমান গবেষণাকর্মটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়েছি। তাদের ঐকান্তিক সহায়তা এবং আমার বিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের সুপরামর্শ ও সুচিন্তিত দিকনির্দেশনার কারণেই আমার পক্ষে এ কঠিন কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

## গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

মানব জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে প্রতিটি মুমিনের সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী খুবই প্রয়োজনীয় ও অনুসরণীয় একটি অধ্যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ নি:সৃত চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহকে কেন্দ্র করে বিশেষজ্ঞগণ যুগ যুগ ধরে গবেষণা করে আসছেন। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশে আরবী, বাংলা, ইংরেজি, উর্দূ প্রভৃতি ভাষায় অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে এখনো গবেষণা চলছে। ভেষজ বিজ্ঞানী ও গবেষক ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন ***"ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান"***নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটি মূলত একটি ইসলামিক টিভি চ্যানেলে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্প্রচারিত প্রশ্নোত্তর আকারে ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালার পূর্ণ বিষয়বস্তুর লিখিত রূপ। এতে চিকিৎসা বিষয়ক ৩০০টি প্রশ্নের উত্তর হাদীসের আলোকে প্রদান করা হলেও আরবী মূল কিতাবের ইবারতের উদ্ধৃতি কম রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর পর্যালোচনা করা হয়নি। লাহোরস্থ শিবলী কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব হাফেয নযর আহমদ সংকলিত ***"তিব্বে নববী সা."*** গ্রন্থটিতেরাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস উপস্থাপন করেছেন। উক্ত গ্রন্থে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাপূর্বক এর যৌক্তিকতাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন। মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন ***"ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা"*** নামক বইয়ে আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয়সহ কুরআন-হাদীসের আলোকে চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন আহ্‌কাম উল্লেখ করলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত চিকিৎসার পূর্ণরূপ উল্লেখ করেননি। পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী স্কলারগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ***"স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম"***নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন-হাদীসের যথেষ্ট উপাত্ত থাকলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত চিকিৎসা সংক্রান্ত হাদীসের পূর্ণরূপের বহিপ্রকাশ ঘটেনি। প্রখ্যাত হাদীস তত্ত্ববিদ ইমাম ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহ.) কর্তৃক প্রণীত ***"আত-তিব্বুন নববী"*** আরবী কিতাবটিও রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসকে প্রাকৃতিক ঔষধ, রূহানী চিকিৎসা এবং আরবী বর্ণভিত্তিক ওষুধ ও খাবারের শিরোনাম দিয়ে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। তবে উল্লিখিত কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা সংক্রান্ত শুধু মৌলিক নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহ স্থান পেলেও প্রতিটি নির্দেশনা ও পরামর্শই যে সুস্থতা লাভের ক্ষেত্রে পুরোপুরি কার্যকরী এর বিশদ ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। চিকিৎসা বিষয়ক আরেকটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ হলো পাকিস্তানের প্রখ্যাত লেখক ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদচুগতাই-এর ***"সুন্নতে নববী আওর জাদীদ সাইনস"***। গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ডে রচিত এবং বাংলা ভাষাসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতসমূহ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে যথেষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি লেখক হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলীও আলোচনা করেছেন। তবে অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করার কারণে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে ওঠেনি।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত অগ্রপথিক সংকলন ***"সিয়াম ও রমযান"*** গ্রন্থটিতে দৈহিক সুস্থতা অর্জনে রোযা রাখার বিষয়টি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হলেও শারীরিক সুস্থতা লাভে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য বিষয়সমূহ স্থান পায়নি। শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক কর্তৃক রচিত ***"কোরআন হতে বিজ্ঞান"*** গ্রন্থে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু সুন্নাত যা চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরিমাণে তা খুবই নগণ্য। আরেফ বিল্লাহ ডা. মো: আব্দুল হাই (রহ.) ***"ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা.)"*** গ্রন্থে নবী কারীম (সা.)-এর পূত-পবিত্র জীবনের অনুপম আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পাশাপাশি গ্রন্থটির শেষের দিকে রোগ সম্পর্কে ও রোগীর সাথে তাঁর (সা.) সাক্ষাত করা ও সমবেদনা জানানোর বিষয়টিও সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। তবে তা রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া এম. আকবর আলী কর্তৃক রচিত ***"বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান"*** *এবং* আখতার-উজ-জামান কর্তৃক রচিত ***"জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান"*** গ্রন্থদ্বয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধনের কথা এবং তাঁদের জীবনী সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও সরাসরি হাদীস শাস্ত্রের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়াবলীর কোনো উল্লেখ নেই। হাফিয আকরমুদ্দিন ***"তিব্বে নববী"*** নামক গ্রন্থে বিভিন্ন রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত পানাহার পদ্ধতি, ফল-মূলের ব্যবহার এবং এ প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে এবং বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়নি। এমনিভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ***"সীরাত বিশ্বকোষ"***-এর চতুর্দশ খণ্ডে **'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা কার্যক্রম'** নামক প্রবন্ধে হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত চিকিৎসা সম্পর্কিত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও গবেষণামূলক তেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি। এছাড়া জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে প্রকাশিত ***"রোগ নিরাময়ে ইসলাম নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা"*** প্রবন্ধে তারেক বিন আতিক রোগ নিরাময়ে ইসলামী চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনা, ইসলামিক দৃষ্টিতে চিকিৎসা ও রোগ মুক্তি, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতির প্রয়োগ এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্বীকৃত বিভিন্ন পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধে হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সার্বিক ও তাত্ত্বিক বিষয়কখনো ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি বিভিন্ন ভাষায় হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন, আর্টিকেল বা প্রবন্ধ ইত্যাদি অফলাইন ও অনলাইনে অসংখ্য লেখা থাকলেও এ বিষয়ে সার্বিক দিক উল্লেখ করে বৃহদাকারে গবেষণামূলক কোনো কাজ হয়নি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরচিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় বর্তমান যুগেও যেকোনো রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত চিকিৎসা ব্যবস্থার চেয়েও যে অধিক উন্নত, কার্যকরী এবং সহজলভ্য সেসকল লেখায় তা পুরোপুরি তুলে ধরা হয়নি। তবে আমার **"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"** অভিসন্দর্ভে এ বিষয়টিই ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছি। তাছাড়া ইতিপূর্বে হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সকল গবেষণা ও পুস্তক রচিত, তাতে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসার বিভিন্ন ধরন ও সংশ্লিষ্ট হাদীসটিই তুলে ধরা হয়েছে। আর আমার এই অভিসন্দর্ভে চিকিৎসার বিভিন্ন ধরন এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উল্লেখ পূর্বক এর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা, উপকারিতা, বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অভিমত, অভিজ্ঞাতা এবং তাঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার সাথে হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও যেসামঞ্জস্যতা রয়েছে সে বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি ও মানব জীবনে এর গুরুত্ব

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব |

## প্রথম পরিচ্ছেদঃ হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ

হাদীস শাস্ত্র বা হাদীস সাহিত্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মহৎ ভান্ডার। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ও অবকাঠামো এ হাদীস শাস্ত্রের ওপরই নির্ভরশীল। মানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রজীবনাদর্শই হাদীস। হাদীস ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর স্থান। তবে কুরআন যেভাবে নাযিলের সময় নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়, হাদীস ঠিক তেমনিভাবে রাসূলের আমলে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও উম্মতের নিয়মিত আমল, রাসূলের লিখিত ফরমান এবং সাহাবীদের স্মৃতিভান্ডার থেকে পরবর্তী সময়ে তা নিয়মিতভাবে এবং অতীব সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআন ইসলামীজীবন বিধানের মৌলিক নীতি পেশ করেছে। আর হাদীস বা সুন্নাহ সেসব মূলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা পেশ করেছে। এ কারণেই ইসলামী জীবন বিধানে পবিত্র কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا–

অর্থঃ আর রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।[১]

ইসলামী শরী'আতের প্রথম উৎস পবিত্র কুরআন হিফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই গ্রহণ করেছেন। ঠিক অনুরূপভাবে হাদীসকেও ধ্বংস ও বিলুপ্তির করাল গ্রাস হতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদীসের উৎপত্তিকাল হতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে এর সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস যাতে সর্বোত্তম ও নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং তাতে কোনো প্রকার মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটে, সেজন্য হাদীস বিজ্ঞানীগণগণ হাদীসের পরিচয়, এর বিভিন্ন পরিভাষা এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। নিম্নে হাদীসের পরিচয়, হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা, হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন পদ্ধতি এবং মানব জীবনের হাদীসের গুরুত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

### হাদীসের পরিচয়

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ হাদীস, সুন্নাহ, খবর ও আ'সার- এসকল পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস-এর মতে উল্লিখিত পরিভাষাগুলোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে এগুলো সমার্তবোধক। আর এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।[২] সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

**হাদীস (حديث):** 'হাদীস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- নতুন, কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, কাহিনী ইত্যাদি।[৩]এর বিপরীত শব্দ হলো কাদীম(قديم)বা পুরাতন।[৪]হাদীস এর বহুবচন(أحاديث)। পবিত্র কুরআনে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণনা করা, প্রকাশ করা ও কথা বলার অর্থে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে –وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থঃ আপনি আপনার রবের নিয়ামতের কথা বর্ণনা করুন।[৫] কখনো হাদীস শব্দটি স্বপ্নকালীন কথা-বার্তাকেও বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন, পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যবানীতে বলা হয়েছে-

---

১. আল-কুরআন, ৫৯: ৭

২. ড. আলী মুহাম্মদ নাসার, "আন-নাহজুল হাদীস", *দাওয়াতুল হক*, মাক্কাতুল মুকাররামাহঃ রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মার্চ ১৯৮৫, ৪র্থ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, পৃ. ২০

৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনীঃ ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৩৩১

৪. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*, ঢাকাঃ মধ্যবাড্ডা, মাকতাবাতুল আযহার, আগস্ট ২০১২ (তৃতীয় প্রকাশ), পৃ. ৭৩

৫. আল-কুরআন, ৯৩: ১১

–وَ عَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ তথা স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।[৬]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আর-রাগীব (রহ.)-এর ব্যাখ্যাও যথার্থ। তিনি লিখেছেন-

اَلْحَدِيْثُ وَ الْحُدُوْثُ كَوْنُ الشَّىْءِ بَعْدَ اَنْ لَّمْ تَكُنْ عِرْضًا كَانَ اَوْ جَوْهَرًا وَ كُلُّ كَلَامٍ يَبْلُغُ الْاِنْسَانَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ اَوِ الْوَحْىِ فِىْ يَقْظَتِهِ اَوْ مَنَامِهِ يُقَالُ لَهُ حَدِيْثُ–

অর্থ: হাদীস আর হুদুস বলতে বোঝায়, কোনো একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোনো মৌলিক জিনিস হোক বা অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কোনো কথা পৌঁছায় তাকেই হাদীস বলা হয়।[৭]পরিভাষায় হাদীস বলতে বোঝায়-

مَا اُضِيْفَ اِلٰى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَوْلاً لَهُ اَوْ فِعْلاً اَوْ تَقْرِيْرًا اَوْ صِفَةً حَتّٰى الْحَرَكَاتِ وَ السَّكَنَاتِ فِى الْيَقْضَةِ وَ الْمَنَامِ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি এবং তাঁর গুণ, এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত।[৮]আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন-

عِلْمُ الْحَدِيْثِ هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ اَقْوَالُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَفْعَالُهُ وَ اَحْوَالُهُ–

অর্থ: ইলমে হাদীস এমন বিশেষ জ্ঞান, যার সাহায্যে নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কাজ ও আবস্থা জানতে পারা যায়।[৯]মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ভূমিকায় শাহ আবদুল আযীয (রহ.) বলেন-

عِلْمُ الْحَدِيْثِ فِىْ اِصْطِلَاحِ جَمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ فِعْلِهِ وَ تَقْرِيْرِهِ–

অর্থ: মুহাদ্দিসীনের সমর্থিত পরিভাষায় ইলমে হাদীস বলতে বোঝায় নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন অনুমোদনের বিবরণ।[১০] আবদুল হক মুহাদ্দিস আদ-দিহলভী (রহ.) লিখেছেন- অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে হাদীস বলা হয়- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে। অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবিঈর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[১১]হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

اِنَّ الْكَثِيْرَ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ كَانُوْا يَطْلُقُوْنَ اِسْمَ الْحَدِيْثِ عَلٰى مَا يَشْمِلُ اٰثَارَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِيْهِمْ وَ فَتَاوَاهُمْ–

অর্থ: পূর্বকালের মনীষীগণ সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের মুখের কথা ও কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফাতওয়াসমূহের ওপর 'হাদীস' নাম ব্যবহার করতেন।[১২]

প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ হাফিয সাখাফী (রহ.) বলেন-

وَ كَذَا اٰثَارُ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ وَ غَيْرِهِمْ وَ فَتَاوَاهُمْ مِمَّا كَانَ السَّلَفُ يُطْلِقُوْنَ عَلٰى كُلِّ حَدِيْثًا–

অর্থ: অনুরূপভাবে সাহাবা, তাবেঈন এবং অন্যান্য (তাবে-তাবেঈন)-এর আসা'র ও ফাতওয়াসমূহের প্রত্যেকটিকে পূর্ববর্তী মনীষীগণ হাদীস নামে অভিহিত করতেন।[১৩]

---

৬. আল-কুরআন, ১২: ১০১

৭. আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মদ আর-রাগীব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পাকিস্তানঃ করাচী, নূর মোহাম্মদ কুতুবখানা, তা. বি. পৃ. ১১০

৮. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা," *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩, ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৮

৯. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০১২ (১৫তমপ্রকাশ), পৃ. ২৮

১০. প্রাগুক্ত

১১. আল্লামা আবদুল হক আদ-দিহলভী, *আল মুকাদ্দামাতু লি-মিশকাতিল মাসাবীহ*, ইন্ডিয়া: দিল্লী, রাশীদিয়া কুতুবখানা, তা.বি. পৃ. ৩

১২. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

**সুন্নাহ (سُنَّةٌ):** হাদীসের অপর এক নাম 'সুন্নাহ'। এর আভিধানিক অর্থ- রীতি, নিয়ম,পথ, কর্মপন্থা, স্বভাব ইত্যাদি।[১৪]

এর বহুবচন (**سنن**)।

ইমাম রাগেব (রহ.) বলেন –سُنَّةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَرِيْقَتُهُ الَّتِىْ يَتَحَرَّاهَا

অর্থ: সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি-পদ্ধতি বোঝায়, যা নবী কারীম (সা.) বাছাই করে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন।[১৫]

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়- 'সুন্নাহ' বলতে নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি, দৈহিক গঠন, চারিত্রিক গুণাবলী অথবা তাঁর জীবন চরিতকে বোঝায়, তা নবুওয়তের পূর্বে কিংবা পরে হোক।[১৬]এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি 'হাদীস'-এর সমার্থবোধক।

আর উসূলবিদগণের পরিভাষায়- নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কর্ম অথবা মৌন সম্মতিকে সুন্নাহ বলা হয়। ফকীহগণের পরিভাষায়- ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া শরীআতের বিধি-বিধানের পাঁচটি পরিভাষার মধ্যে সুন্নাহ একটি। বিদ'আতের বিপরীতে তাঁরা সুন্নাত শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন।[১৭]

আল্লামা আবদুল আযীয আল-হানাফী (রহ.) বলেন-

لَفْظُ السُّنَّةِ شَامِلُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ فِعْلِهِ وَ تَطْلَقُ عَلى طَرِيْقَةِ الرَّسُوْلِ وَ الصَّحَابَةِ–

অর্থ: সুন্নাত শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা ও কাজ বোঝায় এবং ইহা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১৮] সফীউদ্দীন আল-হালী বলেন-

اَلسُّنَّةُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ–

অর্থ: সুন্নহ বলতে বোঝায় কুরআন ছাড়া নবী কারীম (সা.)-এর সব কথা, কাজ ও সমর্থন অনুমোদন।[১৯]

'সুন্নাহ'-এর সংজ্ঞা নিরূপণে এরূপ মত পার্থক্যের কারণ হলো, প্রতিটি দলই তাঁদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে 'সুন্নাহ'-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কাজেই সুন্নাহ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও জীবন চরিত সম্পর্কে যা কিছু পেয়েছেন সবই আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা শরী'আতের বিধান প্রতিষ্ঠিত হলো কি হলো না, এ দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেননি। উসূলবিদগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন একজন শরীআত প্রবর্তক হিসেবে। সুতরাং তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও তাকরীর (মৌন সম্মতি) সমূহ যার দ্বারা আহ্কামে শরীআহ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে স্ববিস্তার আলোচনা করেছেন।ফিকহবিদগণও রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল শরীআতের হুকুম নির্ধারণে যেন তাঁর কাজগুলো বাদ না পড়ে। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার বান্দার কার্যাবলী সম্পর্কে শরঈ বিধান কী সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ তা কী ফরয, ওয়াজিব, হারাম না মুবাহ ইত্যাদি। তবে মুহাদ্দিসগণ 'সুন্নাহ'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটাই অধিক গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো 'হাদীস'-এর অপর নাম 'সুন্নাহ'।[২০]

যদিও সুন্নাহ শব্দটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্বোতভাবে হাদীস শব্দের সমান নয়। কেননা সুন্নাহ হলো রাসূলের বাস্তব কর্মনীতি, আর হাদীস বলতে রাসূলের কাজ ছাড়াও কথা ও সমর্থন বোঝায়।[২১]

---

১৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

১৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৬. আব্বাস মুতাওয়াল্লী হাম্মাদাহ, *আস-সুন্নাতু নাবাভিয়্যাহ*, লেবানন: বৈরুত, আদ-দারুল কাওমিয়্যাহ, ১৯৬৫, পৃ. ২৩

১৭. আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজর, *নুযহাতুন নাযর শারহু নুখবাতিল ফিকর*, সিরিয়া: দামেশক, মুআস্‌সাসাহ ওয়া মাকতাবাতুল খাফিকাইন, ১৯৮০, পৃ. ১৮

১৮. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৯. প্রাগুক্ত

২০. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

**খবর (خبر):** 'খবর' -এর আভিধানিক অর্থ হলো- সংবাদ, তথ্য, বর্ণনা, বার্তা ইত্যাদি।[২২] এর বহুবচন হলো-اخبار। পরিভাষায়-

اَلْخَبْرُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ وَ غَيْرِهِمْ، وَ الْحَدِيْثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.), সাহাবায়ে কিরাম কিংবা অন্য কারো থেকে যা বর্ণিত তাকে খবর বলে। আর কেবলমাত্র নবী কারীম (সা.) থেকে যা বর্ণিত তাকে হাদীস বলে।[২৩]

অনেক মুহাদ্দিসের মতে- 'খবর' ও 'হাদীস' সমার্থক শব্দ। তবে কেউ কেউ বলেছেন, নবী কারীম (সা.) থেকে যা বর্ণিত তা 'হাদীস' এবং অন্যান্যদের নিকট হতে যা বর্ণিত তা 'খবর'। এ কারণে যাঁরা হাদীস গবেষণায় নিমগ্ন তাঁদেরকে 'মুহাদ্দিস' এবং যাঁরা ইতিহাস চর্চায় নিমগ্ন তাঁদেরকে 'ঐতিহাসিক' বলা হয়। কারো কারো মতে, 'হাদীস' ও 'খবর'-এর মধ্যে 'আম-খাস-মুতলাক'-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রত্যেকটি হাদীসই খবর, কিন্তু প্রত্যেকটি খবর হাদীস নয়।[২৪]আসলে 'হাদীস' ও 'খবর' এ পরিভাষা দু'টি সমার্থবোধক হলেও 'খবর' হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক।

**আ'ছার (اثار):** আ'ছার শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- প্রাচনী নিদর্শনাবলী, প্রত্নতত্ত্ব, চিহ্ন, সাক্ষ্য, প্রমাণ ইত্যাদি।[২৫]

এটি اثر। এর বহুবচন। পরিভাষায়- খোরাসানী ফিকাহবিদদের অভিমত অনুসারে:

مَا اُضِيْفَ اِلَى الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ مِنَ الْاَقْوَالِ وَ الْاَفْعَالِ–

অর্থ: সাহাবী ও তাবিঈনদের কথা ও কাজের বিবরণকে আ'ছার বলা হয়।[২৬]

তবেঅনেক মুহাদ্দিস মারফূ এবং মাওকূফ রেওয়ায়েতকেও আ'ছার বলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আত-তাহাভী (রহ.) তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'শারহু মা'আনিল আ'ছার'- এতে অনেক মারফূ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম আত-তাবারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'তাহ্যীবুল আ'ছার' এতে শুধু মারফূ হাদীস উল্লেখ করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও বহু মাওকূফ হাদীস এতে বর্ণিত হয়েছে।[২৭]

যাহোক নবী কারীম (সা.),সাহাবা ও তাবিঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ যদিও মোটামুটিভাবে 'হাদীস' নামে অভিহিত; কিন্তু শরী'আতের মর্যাদার দৃষ্টিতে এ সবের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কাজ, সমর্থন ও আচরণকে বলা হয় 'হাদীস' বা 'সুন্নাহ'। এর অপর নাম 'মারফূ'। সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আ'ছার'। এর অপর নাম 'মাওকূফ'। অনুরূপভাবে তাবেঈর কথা ও কাজের নাম দেয়া হয়েছে 'ফাতওয়া'। এর অপর নাম 'মাকতূ'।[২৮]

**হাদীসে কুদসী (حديث قدسى):** 'কুদসী' শব্দটি কুদস (قدس) হতে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ হলো- পবিত্র, খাঁটি, নিষ্কলুষ।[২৯]কুদস (قدس) শব্দের সাথে'ى'নিসবতীর সাথে কুদসী শব্দটি গঠিত। আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত করে যেসব কথা ব্যক্ত করা হয় সে গুলোকে এজন্যই হাদীসে কুদসী বলা হয় যে, সেগুলোর সম্পর্ক এমন এক সত্ত্বার সাথে যিনি পবিত্র (قدس)। অতএব হাদীসে কুদসীর অর্থ হলো পবিত্রসত্ত্বার কথা।[৩০] পরিভাষায়-

২২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২
২৩. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২৪. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
২৬. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২৭. আবদুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর-রাবী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৮, পৃ. ৪৩
২৮. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩২
৩০. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

اَلْحَدِيْثُ الَّذِىْ يَرْوِيْهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اَنَّهُ مِنْ كَلَامِ اللهِ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.) যেসব হাদীস আল্লাহর কালাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর দিকে নিসবত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত যে সকল বর্ণনা সংকলক পর্যন্ত সূত্র পরম্পরায় পৌঁছেছে সেগুলোই হাদীসে।[৩১]

হাদীসে কুদসী বর্ণনার সময় নবী কারীম (সা.) বলতেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন কিংবা জিবরাঈল (আ.) বলে গেছেন অথবা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন বা আমার রব বলেছেন।হাদীসে কুদসীকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হলো, নবী কারীম (সা.) এ হাদীসগুলোর বক্তব্য সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইলকা, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে লাভ করেছেন অথবা জিরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং তিনি নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার একটি নাম কুদ্দূস' আর হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে সরাসরি তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তাই একে হাদীসে কুদসী বলা হয়। হাদীসে কুদসীকে 'হাদীসে এলাহী' এবং 'হাদীসে রাব্বানী'ও বলা হয়ে থাকে।[৩২]

সহজ ভাষায় বলা যায়, যে হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, আর নবী কারীম (সা.) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।[৩৩]

## কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য

হাদীসে কুদসী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হলেওতা কুরআন বা কুরআনের সমতুল্য নয়। কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান:

১. কুরআনের ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ। আর হাদীসে কুদসীর শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু তার অর্থ ও ভাব আল্লাহ তাআলার নিকট হতে প্রাপ্ত।[৩৪]

২. কুরআন নবী কারীম (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার এক আশ্চর্য মুজিযা। এর প্রতিটি আয়াত ও সূরা চ্যালেঞ্জকৃত। কুরআনের ন্যায় বাণী তৈরি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসীর অবস্থা অনুরূপ নয়।

৩. পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আর হাদীসে কুদসীর অধিকাংশই খবরে ওয়াহিদ।

৪. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত সালাত আদায় হয় না। কিন্তু হাদীসে কুদসীর অবস্থা অনুরূপ নয়।

৫. পবিত্র কুরআন অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যায়, কিন্তু হাদীসে কুদসী অমান্যকারীকে কাফির বলা যায় না। তবে সে ফাসিক।[৩৫]

৬. কুরআন 'তাহারাত' তথা পবিত্রতা ব্যতীত স্পর্শ করা জায়েয নয়, কিন্তু হাদীসে কুদসী নাপাক অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয আছে।

৭. পবিত্র কুরআন পাঠ করা ইবাদত। এর প্রতিটি হরফের জন্য দশটি নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীসে কুদসীর পাঠ ইবাদত নয়।[৩৬]

৯. পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত এবং সেখান থেকেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু হাদীসে কুদসী লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত নয়।

১০. পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজে গ্রহণ করেছেন। আর হাদীসে কুদসী মানুষের বর্ণনার ভিত্তিতে সংরক্ষিত হয়েছে।[৩৭]

১১. পবিত্র কুরআন কাদীম। কিন্তু হাদীসে কুদসী কাদীম নয়।[৩৮]

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২, ৯৩

৩২. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৩৩. মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান, *আহ্‌কামুল হাদীস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, আগষ্ট-২০১৯ (৭ম মুদ্রণ), পৃ. ১৪

৩৪. আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী, (অনুবাদ: মোমতাজ উদ্দীন আহমদ), *হাদীসে কুদসী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০15 (একাদশ মুদ্রণ), পৃ. ১১

৩৫. মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৩৬. মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩৭. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

### হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর পার্থক্য

হাদীসে কুদসী আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত এবং তাঁর পক্ষ হতে বর্ণিত। ফলে হাদীসে কুদসী আল্লাহ তাআলার মহান সত্তা ও তাঁর মহিমান্বিত গুণাবলীর সাথে জড়িত। হাদীসে নববী আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তাঁর পক্ষ হতে বর্ণনাও করা হয়নি, আর তার আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর সঙ্গে জড়িতও নয়। ইহা নবী কারীম (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত। হাদীসে কুদসীর মর্ম আল্লাহ তাআলার নিজস্ব, কিন্তু এর ভাষা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ হতে বর্ণিত হয়েছে। আ রহাদীসে নববীর মর্ম ও ভাষা উভয়টি নবী কারীম (সা.)-এর নিজস্ব।  হাদীসে কুদসী লেখতে গিয়ে রাবীগণ দু'টি পন্থা অবলম্বন করেছেন –قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَّبِّهِ–

অথবা

قَالَ اللهُ تَعَالٰى فِيْمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

আর হাদীসে নববী বর্ণনা করার পদ্ধতি হলো–قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

হাদীসে কুদসী লিপিবদ্ধ করার উল্লিখিত দু'টি রীতির অর্থ একই। উভয় রীতিতেই সুস্পষ্ট নির্দেশ মিলে যে, হাদীসে কুদসী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাণী, যা নবী কারীম (সা.) আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর উম্মতের নিকট পৌঁছিয়েছেন।[৩৯]

### হাদীসের বিষয়বস্তু

ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় হলো- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহান সত্ত্বা এ হিসেবে যে তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল।অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রেরিত ব্যক্তি-রাসূল হিসেবেও এই পদমর্যাদায় অভিষিক্ত থেকে যা কিছু ইরশাদ করেছেন, যা কিছু সম্পাদন করেছেন, যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন, সমর্থন জানিয়েছেন তা এবং এসবের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে মহান সত্তা বিকশিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাই ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু। হাদীসে এসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে এবং হাদীস পাঠ করলে তা হতে এসব বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। রাসূলে কারীমের জীবনব্যাপী বলা কথা, কাজ, সমর্থন এবং সাধনা সংগ্রামের বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণও জানার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ইবাদত হচ্ছে হাদীস।

বস্তুত হাদীস কোনো সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, একদেশদর্শী ও ক্ষুদ্র পরিসর সম্পদ নয়। ইহা মূলতই অত্যন্ত ব্যাপক ও বিপুল ভাবধারা সমন্বিত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান নেতৃত্বে আরবভূমিতে যে বিরাট বিপ্লবী আন্দোলন উত্থিত হয়েছিল তার সম্যক ও বিস্তারিত রূপ হাদীস হতেই সুপরিস্ফুট হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, তাঁর এবং সাহাবায়ে কিরামের বিপ্লবাত্মক কর্মতৎপরতা, তদানীন্তন সমাজ সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর ব্যাপক ও মৌলিক সংশোধনীর এবং সাধিত সংস্কারের বিবরণও হাদীসের মধ্যেই সামিল।

হাদীসের এ ব্যাপকতা অনস্বীকার্য, এর যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করাও কিছুমাত্র কঠিন নয়। পূর্বকালের মনীষীগণও হাদীসের এ ব্যাপক রূপ বুঝিতে পেরেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হলেও এর আসল ও পূর্ণাঙ্গ নাম হলো –اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ الْمُخْتَصِرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ سُنَنِهِ وَ اَيَّامِهِ–

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কার্যাবলী ও তাঁর সমসাময়িক যুগের সমস্ত অবস্থা ও ব্যাপারসমূহের বিশুদ্ধ সনদযুক্ত বিবরণের ব্যাপক সংকলন।

### হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

হাদীস যাচাই-বাছাই ও বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ অনেক পরিভাষা আবিষ্কার করেছেন। এখানে কিছু পরিভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

**সাহাবীঃ** যিনি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমানের ওপর ইন্তিকাল করেছেন।

---

৩৮. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৩৯. মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

**তাবেঈ:** যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছন এবং মুসলমান হিসেবে ওফাত লাভ করেছেন।

**শায়খাইন:** সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-কে একত্রে 'শায়খাইন' বলা হয়; কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে একত্রে **'শায়খাইন'** এবং ফিকহের পরিভাষায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও আবু ইউসুফ (রহ.)-কে একত্রে 'শায়খাইন' বলা হয়।[৪০]

**সহীহাইন:** 'সিহাহ সিত্তাহ' গ্রন্থের মধ্যে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে 'সহীহাইন' বলা হয়।

**সিহাহ সিত্তাহ:** বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে একত্রে 'সিসাহ সিত্তাহ' বলা হয়। গ্রন্থগুলো হলো- (১) সহীহুল বুখারী, (২) সহীহ মুসলিম, (৩) সুনান আবু দাউদ, (৪) আল-জামিউত তিরমিযী, (৫) সুনান নাসায়ী এবং (৫) সুনান ইবন মাজাহ।

**সুনানে আরবা'আ:** সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থের মধ্যে সহীহাইন তথা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম বাদে অপর চারটি গ্রন্থ তথা সুনান আবু দাউদ, আল-জামিউত তিরমিযী, সুনান নাসায়ী এবং সুনান ইবন মাজাহকে একত্রে সুনানে আরবা'আ বলা হয়।

**কুতুবুল খামসা:** সুনান ইবন মাজাহ বাদে সিসাহ সিত্তাহর অপর পাঁচটি গ্রন্থ তথা সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, আল-জামিউত তিরমিযী এবং সুনান নাসায়ীকে একত্রে কুতুল খামসা বলা হয়।

**ওাবী (راوى):** রাবী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনাকারী, কাহিনীকার, বিবরণদাতা। এর বহুবচন হলো-رواة যা روى শব্দ হতে উদ্ভূত। ইলমে হাদীসের পরিভাষায় রাবীর সংজ্ঞা হলো-

الراوى هو الذى ينقل الحديث باسناده، سواء أكان رجلا او امرأة–

অর্থ: রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি সনদসহকারে হাদীস বর্ণনা করেন। তা তিনি পুরুষ কিংবা নারী।[৪১]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস-এর মতে, রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি হাদীস রেওয়ায়েত করার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর বর্ণিত বিষয়ে পারদর্শী হন অথবা না হন। সুতরাং কেউ যদি হাদীস রেওয়ায়েত করার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা না করেন অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবা কিংবা তাবিঈ ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেন তবে তাকে (ইলমে হাদীসের পরিভাষায়) রাবী বলা যাবে না।[৪২]

**রেওয়ায়েত (رواية):** রেওয়ায়েত শব্দের আভিধানিক অর্থ কাহিনী, কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে হাদীস বা আ'ছার বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলে, আবার কোনো কোনো সময় হাদীস ও আ'ছার-কেও রেওয়ায়েত বলে।[৪৩]

পরিভাষায়- হাদীস রেওয়ায়েতের শব্দসমূহ দ্বারা হাদীস ও সনদ বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলা হয়।[৪৪]

**সনদ (سند):** সনদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- প্রমাণ, নির্ভরযোগ্য। এর বহুবচন আসনাদ(اسناد)। যেহেতু সনদ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতার প্রমাণ বহণ করে তাই একে 'সনদ' বলা হয়। আর নির্ভরযোগ্য এ অর্থে যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া এ সনদের ওপর নির্ভরশীল। পরিভাষায় সনদের সংজ্ঞা হলো-

السند هو الطريق الموصلة الى المتن–

---

৪০. মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪১. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪২. ড. আলী মুহাম্মদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা:) লি: মার্চ ২০০৮, (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩

৪৪. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

অর্থ: মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছবার পরম্পরা বর্ণনা সূত্রই হচ্ছে সনদ।অর্থাৎ, হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।[৪৫]

উল্লেখ্য, মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের সনদ বর্ণনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা নির্ভরযোগ্য সনদ ছাড়া মতন বা মূল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই বলা হয়, সনদ ও মতের সমন্বয়েই একটি হাদীস।[৪৬] এছাড়া হাদীসের পরিভাষায় 'ইসনাদ' শব্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ যাকারিয়া (রহ.) বলেন, মুহাদ্দিসগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদ ও ইসনাদ একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।[৪৭]

**রিজাল (رجال):** রিজাল অর্থ ব্যক্তিবর্গ, এটি রাজুল (رجل)-এর বহুবচন।

পরিভাষায়–الرجال هو رواة الحديث।

অর্থ: হাদীস বর্ণনাকারীগণকেই রিজাল বা 'রিজালুল হাদীস' (رجال الحديث) বলা হয়।[৪৮]

যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী আলোচনা করা হয় তাকে 'আসমাউল রিজাল বা রিজাল শাস্ত্র বলা হয়।[৪৯]
ইলমে হাদীসের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো রিজাল শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীর নাম, বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম-মৃত্যুর সন ও তারিখ তথা রাবীগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।[৫০]

**মতন (متن):** মতন -এর আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুর উপরের অংশ, পৃষ্ঠ, পুস্তকের মূল লেখা, শক্ত, মযবুত। এর বহুবচন মুতূন (متون)। পরিভাষায়- হাদীসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়। আবদুল হকমুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন –المتن ما انتهى اليه الإسناده। অর্থ: সনদসূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে তার পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়।[৫১]

**মুহাদ্দিস** (محدث)**:** মুহাদ্দিস শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনাকারী, বক্তা। আর পরিভাষায়-

هُوَ مَنْ يَّشْتَغِلُ بِعِلْمِ الْحَدِيْثِ رِوَايَةً وَ دِرَايَةً يَطَّلِعُ عَلٰى كَثِيْرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَ اَحْوَالِ رُوَاتِهَا–

অর্থ: যিনি হাদীস চর্চায় (রেওয়ায়েত সম্পর্কিত হোক বা দিরায়াত সম্পর্কিত হোক) সবসময় নিরত থাকেন এবং বহু রেওয়ায়াত ও এর রাবীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাকে মুহাদ্দিস বলা হয়।
জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, আমাদের যুগে মুহাদ্দিস হলো-

مَنْ كَانَ كَثِيْرَ الْاِشْتِغَالِ بِمُطَالَعَةِ كُتُبِ الْحَدِيْثِ وَ دَرْسِهِ وَ تَدْرِيْسِهِ بِاِجَازَةِ الشُّيُوْخِ لَه مَعَ مَعْرِفَةِ مَعَانِى الْحَدِيْثِ رِوَايَةً وَ دِرَايَةً–

অর্থ: যিনি হাদীসের কিতাবাদী অধ্যয়নে ব্যাপক ভিত্তিতে নিরত এবং এক বা একাধিক শায়খের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হাদীসের দরস ও তাদরীসে নিরত আছেন এবং হাদীসের অর্থসহ রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে অবগত আছেন। অবশ্য আল্লামা জাযায়েরী বলেন, যিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন এবং মতন সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস বলা হয়।[৫২]

---

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৪৬. মুফ্তী সাইয়িদ আমীমুল ইহ্সান (অনুবাদ: আফ্লাতুন কায়ছার), , *মীযানুল আখ্বার*, ঢাকা: নিউ আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭, পৃ. ১০
৪৭. ড. উমার ইবন হাসান ফালাতা, *আল ওয়াযউ ফিল হাদীস*, সিরিয়া: দামেশক, মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১, খ. ১, পৃ. ৮
৪৮. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৪৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৫০. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৫১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৫২. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

**শায়খ (شيخ):** শায়খ শব্দের আভিধানিক অর্থ বয়োবৃদ্ধ, ভদ্রলোক, সম্মানিত ব্যক্তি, উস্তাদ, অধ্যাপক। এর বহুবচন 'শুয়ূখ' (شيوخ) ।ইলমে হাদীসের পরিভাষায় 'শাইখ' ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয় যিনি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। অধিকাংশ সময় হাদীস শিক্ষা গ্রহণে, হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যায়নে এবং হাদীস শিক্ষাদানে নিমগ্ন থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই একজন হাদীস বিশারদকে শায়খুল হাদীস (شيخ الحديث)বলা হয়ে থাকে।[৫৩]

**হাফিয (الحافظ):** হাফিয -এর আভিধানিক অর্থ হিফাযতকারী, রক্ষাকারী, কণ্ঠস্থকারী, রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষণকারী ইত্যাদি।[৫৪]

পরিভাষায়- ঐ হাদীস বিশারদকে হাফিয বলা হয়, যিনি সনদ ও মতন সহকারে এক লক্ষ হাদীস মুখস্ত করেছেন, যিনি হাদীস চর্চায় মগ্ন থাকেন, রেওয়ায়েতে হাদীস ও দিরায়াতে হাদীস সম্পর্কেও যাঁর সুস্পষ্ট ধারণা আছে এবং যিনি তাঁর নিজরে উস্তাদ এবং উস্তাদের উস্তাদ সম্পর্কেও জ্ঞাত আছেন।[৫৫]

কারো মতে হাফিয বলা হয়-

هُوَ الَّذِىْ اِذَا سَمِعَ الْحَدِيْثَ عَرَفَ اَنَّهُ فِى الصِّحَاحِ اَمْ فِىْ غَيْرِهَا، وَ كَانَ حَفِظَ اَلْفَ حَدِيْثٍ فَصَاعِدًا بِالْمَعْنَى–

অর্থ: যিনি কোনো হাদীস শোনার পর বুঝতে পারেন যে, এটি সিহাহ সিত্তায় আছে না অন্যকোনো কিতাবে আছে। তৎসঙ্গে এক হাজার কিংবা তার চেয়েও বেশি হাদীস তার মুখস্ত আছে।[৫৬]

উল্লেখ্য, সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে সর্বমোট ৯২ জন হাদীসে হাফিয ছিলেন। তন্মধ্যে সাহাবী ২২ জন, প্রথম দিকের তাবেঈগণের মধ্যে ৪০ জন এবং মধ্যভাগের তাবেঈগণের মধ্যে ৩০ জন হাদীসে হাফিয ছিলেন। পরবর্তীকালে অসংখ্য হাফিযে হাদীসের সংখ্যা বেড়ে যায়।[৫৭]

**হুজ্জাত (الحجة):** হুজ্জাত শব্দের আভিধানিক অর্থ যুক্তি, প্রমাণ, দলীল, সনদ, নথি, নির্ভরযোগ্য সূত্র, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।[৫৮]

পরিভাষায় –هُوَ الَّذِىْ كَانَ قَوْلُهُ اِنَّ فِى الْحَدِيْثِ كَذَا حُجَّةُ بَيْنَ أَقْرَانِهِ وَ لاَ يَنْكِرُوْنَهُ عَلَيْهِ–

অর্থ: এমন ব্যক্তিকে হুজ্জাত বলা হয় যিনি কোনো হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করলে তা সমকালীন ব্যক্তিদের নিকট হুজ্জাত বলে গণ্য হয়। কেউ তাঁর মন্তব্যকে প্রত্যাখান করে না।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, যিনি সনদ ও মতনের যাবতীয় বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত্ব করেছেন, তাকে হুজ্জাত বলা হয়।[৫৯] উল্লেখ্য, হাফিযের উপরের স্তর হলো হুজ্জাত।

**হাকিম (حاكم):** হাকিম অর্থ শাসক, গভর্নর, বিচারক।[৬০] এর বহুবচন হুককাম (حُكَّام)।

পরিভাষায়- হাকিম হচ্ছেন সেই মহামতি, যিনি সমস্ত হাদীস সম্পর্কে অবহিত। অবশ্য হাতে গোনা দু'চারটি হাদীস তাঁর ইলম বহির্ভূত হতে পারে।[৬১]কেউ কেউ বলেন-

هُوَ الَّذِىْ اَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيْعِ الْاَحَادِيْثِ سَنَدًا وَ مَتْنًا وَ اَحْوَالَ الرُّوَاةِ جَرحًا وَ تَعْدِيْلاً وَ تَارِيْخًا–

---

৫৩. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৫৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২
৫৫. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, পাকিস্তান: লাহোর, ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮১ (প্রথম সংস্করণ), পৃ. ২৬
৫৬. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৫৭. মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (অনুবাদ: লোকমান আহমদ আমীমী), *তারীখে ইলমে হাদীস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৫
৫৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮
৫৯. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৬০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২
৬১. ড. মুহাম্মদ আত্-তাহ্হান, (অনুবাদ: ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন), *হাদীসের পরিভাষা*, ঢাকা: ইফাবা, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১৮

অর্থ: যিনি সমস্ত হাদীস, মতন, রাবীদের অবস্থা, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা ও হাদীসের সাথে ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তসহ আয়ত্ত্ব করেছেন।
অনেকে আবার আট লক্ষ হাদীস মুখস্ত থাকার শর্তারোপ করেছেন।[৬২]

**আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস (امير المؤمنين فى الحديث):** আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস অর্থ হাদীস শাস্ত্রের খলীফা বা শাসক উপাধি বিশেষ। এটি মুহাদ্দিসগণের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর হিসেবে পরিগণিত।[৬৩]

পরিভাষায়- যিনি রিওয়ায়েত ও দিরায়াত, জারহ ও তাদীল এবং রিজাল শাস্ত্র তথা এ বিষয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় ও সঠিক মর্মসহ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' বলা হয়।[৬৪]

**আদালত (العدالة):** আদালত অর্থ: বিশ্বততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ, নিরপেক্ষ মতামত ইত্যাদি। পরিভাষায়–هِيَ الْمَلَكَةَ الَّتِىْ تَحْمِلُ الْاِنْسَانَ عَلٰى مُلاَزَمَةِ التَّقْوٰىوَالْمُرُوْئَةِ–

অর্থ: এমন সুদৃঢ় আত্মশক্তি যা মানুষকে তাকওয়া ও মরুওয়াত (মনুষ্যত্ববোধ) অবলম্বণ করতে অনুপ্রাণিত করে।কারো মতে – هِيَ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِنْسَانُ مُتَّصِفًا بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً سَالِمًا مِّنْ اَسْبَابِ الْفِسْقِ وَ خَوَارِمِ الْمُرُوْئَةِ–

অর্থ: একজন মানুষের মুসলমান, বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়াসহ সকল ধরণের ফিস্‌ক, পাপাচার এবং মরুওয়াত বা উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিপন্ন করে এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগমুক্ত থাকাকে আদালত বলে।[৬৫]

**মুসালসাল (المسلسل):** মুসালসাল শব্দটি سلسلة মূলধাতু থেকে গঠিত ইসমে মাফউলের সীগাহ। যার অর্থ ক্রমিক, ধারাবাহিক, পরস্পরযুক্ত, অবিরত।[৬৬] পরিভাষায়-

وَ هُوَ مَا تَتَابَعَ فِيْهِ رِجَالُ الْاِسْنَادِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ رِوَايَتِهِ عَلٰى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ–

অর্থ: এমন হাদীসকে মুসালসাল বলা হয়, যার সূত্রে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনার সময় একই অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন।[৬৭] এর তিনটি প্রকার রয়েছে। যথা: (ক) মুসালসাল কাওলী (খ) মুসালসাল ফে'লী এবং (গ) মুসালসাল কাওলী ও ফে'লী।

**মুহকাম**(المحكم)**:** মুহকাম শব্দটি মূলত باب افعال-এর ইসমে মাফউলের সীগাহ। যার অর্থ সুদৃঢ়, মজবুত ও নির্ভরযোগ্য। পরিভাষায়–هُوَ الْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ الَّذِىْ سَلِمَ مِنْ مُعَارَضَةِ حَدِيْثٍ اٰخَرَ مِثْلَهُ

অর্থ: মকবুল হিসেবে বিবেচ্য যেকোনো হাদীস যদি অন্যকোনো মকবুল হাদীসের সাথে অর্থের দিক থেকে সাংঘর্ষিক বা পরস্পর বিরোধী না হয়, তাহলে এ ধরনের  হাদীসকে মুহকাম বলা হয়। অধিকাংশ মকবুল হাদীসই মুহকাম।[৬৮]

**যবত (الضبط):** যবত-এর আভিধানিক অর্থ হলো সংরক্ষণ করা, আটককরণ, সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখা।[৬৯] পরিভাষায়-

هُوَ حِفْظُ مَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِهِ بِحَيْثُ يَصُوْنُهُ مِنَ الْاِضَاعَةِ وَ الْاِهْلاَكِ وَ يَتَمَكَّنُ عَلٰى اِسْتِحْضَارِهِ مَتٰى شَاءَ–

অর্থ: যবত বলা হয় উস্তাদ থেকে শ্রবণ করা কোনো বিষয়কে এমন সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা যাতে তা বিস্মৃতি ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পায় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তা যথাযথভাবে পেশ করা যায়।[৭০]

---

৬২. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৬৩. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৬৪. *দাওয়াতুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৬৫. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৬৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৬
৬৭. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৬৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬
৭০. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

হাদীসের সংরক্ষণ (ضبط) দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। যথা:(১) ضبط الصدر। তথা স্মৃতিতে সংরক্ষণ এবং (২) ضبطالكتاب। তথা লিখিত সংরক্ষণ।

**সিকাহ (الثقة):** সিকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নির্ভরগোগ্য, বিশ্বস্ত ইত্যাদি। পরিভাষায়-

هُوَ الرَّاوِىْ الَّذِىْ فِيْهِ عَدَالَةُ وَ ضَبْطُ تَامٌّ–

অর্থ: যে বর্ণনাকারীর মাঝে আদালত (তাকওয়া ও মরুওয়াত তথা মনুষ্যত্ববোধ) এবং সংরক্ষণের গুণ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, তাকে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলা হয়।[৭১]

**মুত্তাফাক আলাইহি (متفق عليه):** যে হাদীস একই সাহাবী হতে বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে 'মুত্তাফাক আলাইহি' বলে। এর সংখ্যা ২৩২৬টি।[৭২]

### হাদীস গ্রন্থের শ্রেণি বিন্যাস

**আল-জামি' (الجامع):** সাধারণত যেসব হাদীস গ্রন্থে ০৮টি বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে, তাকে আল-জামি' বলা হয়। (১) যুদ্ধ বিগ্রহ, (২) আদব বা শিষ্টাচার, (৩) তাফসীর, (৪) আকাইদ, (৫) ফিতান, (৬) আহকাম, (৭) কিয়ামতের লক্ষণসমূহ এবং (৮) সাহাবায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনচরিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে মাত্র ২টি গ্রন্থ তথা সহীস বুখারী ও তিরমিযীকে আল জামি' বলা হয়। তবে সহীহ মুসলিমে তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস তুলনামূলক কম থাকলেও অনেকে একে জামি'-এর অন্তর্ভুক্ত করেন।[৭৩]

**সুনান (سنن):** ফিকহী বিন্যাসে যে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে তাকে সুনান বলা হয়। যেমন- প্রথমে কিতাবুত তাহারাত, অত:পর কিতাবুস সালাত। এ ধরনের কিতাব হলো- তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ।[৭৪]

**মুসনাদ (المسند):** সাহাবায়ে কিরামের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে তাকে মুসনাদ বলা হয়। এ বিন্যাস সাহাবীদের ফযীলতের ভিত্তিতে হোক বা ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে হোক অথবা আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে হোক। যেমন- প্রথম হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস, অত:পর হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসগুলো সংকলন করা।[৭৫]

**মু'জাম (المعجم):** উস্তাদের ফযীলতের ভিত্তিতে যে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে তাকে মু'জাম বলা হয়। এ বিন্যাস আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হোক বা তাঁদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে হোক। যেমন- মু'জামু তাবারানী।

**মুসতাদরাক (المستدرك):** কোনো কোনো সংকলক তার শর্তসমূহ পাওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু হাদীসকে তাঁর কিতাবে স্থান দেননি, অত:পর যদি অন্য কোনো সংকলক ঐ হাদীসসমূহকে কিতাব আকারে একত্রিত করেন, তবে সে কিতাবকে মুসতাদরাক বলা হয়। যেমন- মুসতাদরাক হাকিম।

**আরবাঈন (اربعين):** যে কিতাবে চল্লিশটি হাদীস সংকলন করা হয়েছে, তা একই বিষয়ের ওপর হতে পারে আবার বিভিন্ন বিষয়ের ওপরও হতে পারে, তাকে আরবাঈন বলা হয়।

**কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل):** যে সকল হাদীসে সূক্ষ্ম ত্রুটি রয়েছে সে হাদীসগুলোর ত্রুটি উল্লেখ করত উক্ত হাদীসগুলো যে কিতাবে সংকলন করা হয়, সে কিতাবকে কিতাবুল ইলাল বলা হয়।

---

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৭২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬, খ. ১৫, পৃ. ১৪৮
৭৩. সম্পাদনা পরিষদ, *হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: মালিবাগ, প্রকাশনা বিভাগ জামিয়া শারইয়্যাহ, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১০
৭৪. প্রাগুক্ত
৭৫. প্রাগুক্ত

**আজযা (اجزاء):**যে হাদীস গ্রন্থে একটি মাসআলা সম্পর্কে যত হাদীস আছে তা সংকলন করা হয়েছে, তাকে আজযা বলা হয়।

**মুফরাদ (مفرد):**যে হাদীস গ্রন্থে এক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস সংকলন করা হয়েছে, তাকে মুফরাদ বলা হয়। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত সকল হাদীস একত্রে সংকলন করা।[৭৬]

### হাদীসের প্রকারভেদ

হাদীস প্রধাণত দু' প্রকার। সহীহ (মাকবুল) এবং যঈফ (মারদুদ)। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সহীহ, হাসান এবং যঈফ। মুতাকাদ্দিম (পূর্ববর্তী) মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' হাদীসকে 'যঈফ' হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আর মুতাআখ্‌খির (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণ একে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। উল্লেখ্য, ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) সর্বপ্রথম হাসান হাদীসের পরিভাষাটি চালু করেন। তাঁর পূর্বের মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে সহীহ ও যঈফ এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন।[৭৭] এ তিন প্রকার হাদীসের অধীন আরো বহু প্রকার হাদীস রয়েছে। ইমাম নববী (রহ.) এবং সুয়ূতী (রহ.)-এর মতে পঁয়ষট্টি প্রকার হাদীস রয়েছে। আর আল-হাযিমী (রহ.)-এর মতে সর্বমোট প্রায় একশ প্রকার হাদীস রয়েছে।[৭৮] তবে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে বিভক্ত করেছেন।

**মাকবুল (مقبول):** মাকবুল ঐ রেওয়ায়েতকে বলা হয় যাতে হাদীস গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আর হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী হলো- হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল হওয়া, রাবী আদালত ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া এবং হাদীসটি শায ও মুআল্লাল না হওয়া। আর যে রেওয়ায়েতে ঐ শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকলে তাকে মারদুদ হাদীস বলা হয়।[৭৯]

### মাকবুল হাদীসের প্রকারভেদ

মাকবুল হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। **সহীহ এবং হাসান।** এর প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। সহীহ লি-গাইরিহী এবং হাসান লি-গাইরিহী। এ নিয়ে মাকবুল হাদীস সর্বমোট চারভাগে বিভক্ত।[৮০] যথা-

**১. সহীহ লি-যাতিহী(صحيح لذاته):** ইলমে হাদীসের পরিভাষায় ঐ হাদীসকে 'সহীহ লি-যাতিহী' বলা হয়, যার সনদ মুত্তাসিল, প্রত্যেক রাবীই আদিল এবং পূর্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদীসটি শায ও মুআল্লালও নয়। ফিকহ ও উসূলবিদ এবং মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো সহীহ হাদীস শরী'আতের নির্ভরযোগ্য দলীল এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।

**২. হাসান লি-যাতিহী (حسن لذاته):** ইলমে হাদীসের পরিভাষায় 'হাসান লি-যাতিহী' ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার উৎস সর্বজনজ্ঞাত, রাবীগণ সুপ্রসিদ্ধ এবং যার ওপর অধিকাংশ হাদীসের ভিত্তি স্থাপিত। অধিকাংশ আলেমতা গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং ফকীহগণ সাধারণত একে দলীল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।[৮১]

**৩. সহীহ লি-গাইরিহী (صحيح لغيره):** সহীহ হাদীসের কোনো রাবীর মধ্যে যদি স্মরণশক্তি দুর্বলতা থাকে এবং অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে যদি তা দূরীভূত হয়, তবে তাকে 'সহীহ লি-গাইরিহী' বলা হয়। যেহেতু সনদ হিসেবে হাদীসটি সহীহ নয়, বরং অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সহযোগিতায় এটি সহীহ-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই একে 'সহীহ লি-গাইরিহী' বলা হয়।

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৭৭. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৭৯. ড. উমার ইবন হাসান ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৮০. আবদুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৮১. আল-খাত্তাবী, *মা'আলিমুস সুনান*, মাতবা'আতু আনসারিস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া, ১৯৪৮ খ. ১, পৃ. ১১

**৪. হাসান লি-গাইরিহী (حسن لغيره):** যদি কোনো যঈফ হাদীসবিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং বর্জনের স্তর হতে গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করে, তাকে 'হাসান লি-গাইরিহী' বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, হাসান লি-গাইরিহী ঐ যঈফ রেওয়ায়েতকে বলা হয় যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়। তবে দুর্বলতার কারণ রাবীর ফিসক বা মিথ্যাচার নয়।[৮২]

উল্লেখ্য, মাকবুল (مقبول) হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ নিম্নলিখিত শব্দাবলী ব্যবহার করে থাকেন। যথা: জাইয়্যিদ (جيد), মুজাওয়াদ (مجود), কাভী (قوى), ছাবিত (ثابت), মাহফূয (محفوظ), মা'রূফ (معروف), সালিহ (صالح), মুস্‌তাহ্‌সান (مستحسن), হাসান (حسن), সহীহ (صحيح), রিজালুহু ছিকাহ (رجاله ثقات), রিজালুহু মাওছূকূন (رجاله موثوقون), রিজালুহু রিজাল আল সহীহাইন (رجاله رجال الصحيحين)।[৮৩]

## রাবীগণের সংখ্যা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ

হাদীস বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে একই রূপ হয় না। তাই রাবীগণের সংখ্যা হিসেবে হাদীস দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা: (ক) মুতাওয়াতির (متواتر) এবং (খ) আহাদ (احد)।

**মুতাওয়াতির (متواتر):** ঐ হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় যার সনদের প্রত্যেক স্তরেই (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এতো অধিক যে, তাঁদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা স্বভাবতই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়।[৮৪]মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ইলমে ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়, যা সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। সুতরাং এক্ষেত্রে সনদ বিশ্লেষণ করা কিংবা বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য মুতাওয়াতির হাদীস আবার দু'প্রকার। লাফযী(لفظى) [৮৫]এবং মা'নুভী (معنوى)।[৮৬]

**আহাদ (احاد):** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি, তাকে আহাদ বলে।[৮৭] খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ইলমে নাযীর লাভ হয়।[৮৮] এ ধরনের হাদীস আবার তিন প্রকার। যথা-

ক. মাশহুর (مشهور),খ. 'আযীয (عزيز) এবং গ. গারীব (غريب)।

**মাশহুর (مشهور):** যে হাদীস প্রত্যেক স্তরেই তিনজন রাবী বা তার অধিক রাবী রেওয়ায়েত করেছেন (তবে এর সংখ্যা মুতাওয়াতির স্তরে পেঁছেনি) তাকে 'মাশহুর' বলা হয়। ফকীহগণের পরিভাষায় একে মুস্তাফীয (**مستفيض**) বলা হয়।[৮৯]

**'আযীয (عزيز):** পরিভাষায় ঐ হাদীসকে 'আযীয বলা হয় যার সনদের সর্বস্তরে কমপক্ষে দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ বর্ণনা পরম্পরার সর্বস্তরে অন্তত দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকতে হবে। তবে সনদের কোনো স্তরে তিনজন অথবা তার অধিক রাবী হলেও তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু শর্ত হলো অন্তত সনদের একটি স্তরে হলেও দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকতে হবে। কেননা এখানে সনদের সর্বনিম্ন স্তরটিই বিবেচ্য।

---

৮২. ড. মাওলানা মো: মোরশেদ আলম সালেহী, *হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৮ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৩১

৮৩. ড. মাওলানা মো: মোরশেদ আলম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৮৪. ইবন হাজার আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকর*, মিশর: কায়রো, মাকতাবুল ইজনলো আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৪, পৃ. ৩

৮৫. মুতাওয়াতির লাফযী ঐ রেওয়ায়েতকে বলা হয়, যার শব্দ ও ভাব একইরূপে সকল যুগে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বহু সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (ড. মাওলানা মো: মোরশেদ আলম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২)

৮৬. মুতাওয়াতির মা'নুভী ঐ রেওয়ায়েতকে বলা হয়, যার শব্দ এক না হলেও মুল ভাবার্থটি সকল যুগেই অসংখ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৮৭. ড. মাওলানা মো: মোরশেদ আলম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৮৮. ইলমে নাযীর ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যা দলীল-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। দলীল-প্রমাণ নির্ভরযোগ্য হলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব।

৮৯. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

**গারীব (غريب):** পরিভাষায় গারীব ঐ খবরকে বলা হয় যার কোনো এক স্তরে শুধু একজন রাবী রয়েছেন। অর্থাৎ একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে গারীব বলা হয়। চাই সনদের সকল স্তরে এ সংখ্যা বিদ্যমান থাক কিংবা যেকোনো একটি স্তরে। তবে সনদের কোনো কোনো স্তরে একাধিক রাবী বিদ্যমান থাকলেও তাতে কোনো দোষ নেই। কেননা এখানে সর্বনিম্নটাই বিবেচ্য। কোনো কোনো মুহাদ্দিস গারীব-এর অপর নাম দিয়েছেন 'ফারদ' (فرد)।[৯০]

**আরো কয়েক প্রকার হাদীস**

**আল মারফূ' (المرفوع):** যে সূত্রের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো কথা কাজ কিংবা অনুমোদন বা আচরণ বর্ণিত হয়েছে তাকে আল-মারফূ' হাদীস বলে। এরূপ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল অথবা মুনকাতি' উভয়ই হতে পারে। মারফূ' হাদীস চার প্রকার। যথা:

(ক) আল মারফূ' আল-কাওলী (المرفوع القولى)

(খ) আল মারফূ' আল-ফি'লী (المرفوع الفعلى)

(গ) আল মারফূ' আত-তাকরীরী (المرفوع التقريرى)

(ঘ) আল মারফূ' আল-ওয়াসফী (المرفوع الوصفى)।[৯১]

**মারদূদ হাদীস-এর প্রকারভেদ**

মুহাদ্দিসগণ মারদূদ (যঈফ) হাদীসকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এর অধিকাংশ প্রকারেরই পৃথক পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো প্রকারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করে সাধারণভাবেই যঈফ বলা হয়েছে। ইবন হাব্বান (রহ.) যঈফ হাদীসকে প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।[৯২] হাদীস মারদূদ হওয়ারও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে মৌলিক কারণ দু'টি। সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং রাবী অভিযুক্ত (দোষী সাব্যস্ত) হওয়া।

**যঈফ হাদীস (ضعيف الحديث) :** যঈফ শব্দের অর্থ দুর্বল। যঈফ ঐ রেওয়ায়েতকে বলা হয়, যাতে সহীহ অথবা হাসান হাদীস-এর শর্তসমূহ অবর্তমান। উল্লেখ্য, মুহাদ্দিসগণের মতে, জাল তথা মিথ্যা হাদীস ব্যতীত সকল প্রকার যঈফ হাদীসই সনদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা ব্যতীত রেওয়ায়েত করা জায়েয। তবে শর্ত হলো, হাদীসটি দীনি আকীদাহ ও শরী'আতের বিধান সম্পর্কিথ হবে না; বরং তা হবে ওয়ায-নসীহত, ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান, খারাপ কাজে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাসহ ফাযায়েলে আমল সম্পর্কিত।[৯৩]

**যঈফ হাদীসের প্রকারভেদ**

সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যঈফ হাদীসের প্রধান কয়েকটি প্রকার-

*** আল মু'আল্লাক (المعلق):** ইলমে হাদীসের পরিভাষায় সনদের প্রারম্ভ থেকে এক বা একাধিক রাবী পরপর বাদ পড়াকে আল মু'আল্লাক বলা হয়।

*** আল-মুরসাল (المرسل):** সনদের শেষাংশ থেকে তাবিঈর পরে সাহাবী বাদ পড়াকে আল মুরসাল বলে।

*** আল-মু'দাল (المعضل):** সনদ থেকে পরপর দু'জন অথবা তার অধিক রাবী বাদ পড়াকে আল-মু'দাল বলা হয়।

---

৯০. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
৯১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *আত-তাওযীহ*, মিশর: কায়রো, মাকতাবাতুল ইশা'আত, ১৩৬৬ হি. (প্রথম প্রকাশ), খ. ১, পৃ. ২৫২
৯২. ইবন আস-সালাহ, *উসমান ইবন আবদুর রহমান মুকাদ্দামা*, পাকিস্তান: ফারুকী কুতুবখানা, ১৩৫৭হি. (৪র্থ প্রকাশ), পৃ. ২০১
৯৩. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ : পর্যালোচনা", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

*** আল-মুনকাতি'(المنقطع):** সনদের যেকোনো স্তর থেকে রাবী বাদ পড়লে তাকে আল-মুনকাতি' বলা হয়। আর এররূপ বাদ পড়াকে আল-ইনকাতি' বলা হয়।

*** মুদাল্লাস (المدلس):** যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত উস্তাদের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সে হাদীস শুনেননি, এমন হাদীসকে মুদাল্লাস বলে। এরূপ করাকে তাদলীস বলে। আর যিনি এরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। এক কথায় বলা যায়, যে হাদীসের সনদে দোষ লুকানো হয়েছে কিন্তু বাহ্যিক দিক সুন্দর করে তোলা হয়েছে।[৯৪]
মুদাল্লাস হাদীস প্রধানত দু'প্রকার-

(ক) তাদলীসুল ইসনাদ (تدليس الاسناد) এবং (খ) তাদলীসুস শুয়ূখ (تدليس الشيوخ)।

*** আল-মুরসাল আল খাফী (المرسل الخفى):** একই যুগের শায়খ যার থেকে হাদীস শ্রবণ করা হয়নি তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণের সম্ভাবনাময় শব্দে হাদীস রেওয়ায়েত করাকে 'আল-মুরসাল আল-খাফী' বলে।

*** আল-ম'আন'আন ও আল-মু'নান (المعنعن المؤنن):** কোনো রাবীর 'ফুলান আন ফুলান' (অমুক থেকে অমুক) বলে হাদীস রেওয়ায়েত করাকে 'আল-ম'আন'আন' বলা হয় এবং হাদ্দাসানা ফুলান আন্না ফুলানুন ক্বালা বলে রেওয়ায়াত করাকে আল মু'আন বলে।[৯৫]

**রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যঈফ হাদীস-এর প্রধান কয়েক প্রকার**

*** আল-মুদরাজ (المدرج):** যে হাদীসের মধ্যে রাবী তাঁর নিজের অথবা অপর কারো উক্তি প্রক্ষেপ করেছেন তাকে 'আল-মুদরাজ' বলা হয় এবং এরূপ করাকে 'আল-ইদরাজ' বলে।

*** আল-মুদতারাব (المضطرب):** ঐ রেওয়ায়েতকে 'আল-মুদতারাব' বলা হয়, যা বিভিন্ন সনদসূত্রে এমন এলামেলোভাবে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে কোনোরূপ সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয় এবং এর প্রতিটি রেওয়ায়েতই এরূপ সমমানের যে একটির ওপর আরেকটিকে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়।

*** আল-মাকলুব (المقلوب):** হাদীসের সনদ কিংবা মতনে পূর্বের শব্দকে পরে এবং পরের শব্দকে পূর্বে অদল-বদল করে রেওয়ায়েত করাকে আল-মাকলুব বলা হয়।

*** আল-মুসাহ্হাফ (المصحف):** সিকাহ্ রাবী থেকে বর্ণিত হয়নি এমন শব্দাবলী দ্বারা হাদীসের শব্দসমূহ পরিবর্তন করাকে আল-মুসাহ্হাফ বলা হয়।

*** আল-মাহফূয ও আল-শায (المحفوظ و الشاذ):** কোনো সিকাহ্ রাবীর হাদীস অপর কোনো সিকাহ্ রাবী বা রাবীগণের হাদীসের বিপরীত হলে যে হাদীসের রাবীর স্মরণ শক্তি অধিক কিংবা অন্য কোনো সূত্র দ্বারা যার হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায় অথবা অন্য কোনো কারণে যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তাঁর হাদীসকে আশ-শায বলে এবং এরূপ হওয়াকে 'আশ-শুযূয বলা হয়।

*** আল-মা'রূফ ও আল-মুনকার (المعروف والمنكر):** কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী যদি কোনো বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ননার বিপরীতে হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদীসকে 'আল-মা'রূফ এবং দুর্বল বর্ণনকারীর হাদীসকে 'আল-মুনকার' বলে।

---

৯৪. মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৯৫. ড. মাওলানা মো: মোরশেদ আলম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

*** আল-মু'আল্লাল (المعلل):** যে হাদীসে এমন সূক্ষ্ম থাকে যা কেবল হাদীস বিশেষজ্ঞগণই পৃথক করতে পারেন তাকে 'আল-মু'আল্লাল' বলা হয়। আর এরূপ ত্রুটিকে ইল্লাত(عِلَّة)বলা হয়।

*** আল-মাতরূক (المتروك):** যে হাদীসের রাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে নয় বরং সাধারণ কতা-বার্তায় মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়েছে তারহাদীসকে 'আল-মাতরূক' বলা হয়।

*** আল-মাওযূ (الموضوع):** যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম (সা.)-এর নামে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছ তার বর্ণিত হাদীসকে 'আল-মাওযূ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়-

هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله–

অর্থ: বানোয়াট ও মিথ্যা কথাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চালিয়ে দেয়াকে পরিভাষায় মাওযূ হাদীস বলা হয়।[৯৬]

---

৯৬. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *হাদীসের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

### হাদীস সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবকিছুই মূলত পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। যা উম্মতের জন্য অবশ্যই অনুসরণীয় এবং তা সংরক্ষণও প্রয়োজন। বস্তুত সে কারণেই শুরু থেকে সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের পাশাপাশি হাদীস সংরক্ষণের প্রতিও বিশেষভাবে যত্নশীল ছিলেন। বরং বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসকে সংরক্ষণের সুমহান দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামের জামাআতকে বিশেষ যোগ্যতাও দান করেছিলেন এবং মনোনীত করেছিলেন। তাই তাঁরা নবী কারীম (সা.)-এর হাদীসগুলোকে সংরক্ষণের বিষয়টিকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক সাধনা, নবীর প্রতি অপরীসীম ভক্তি ও ভালোবাসা, অন্ধকার জীবনে নবীর সহবতে আলোর সন্ধান লালভ, শুনামাত্রই তা নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ ও অন্তরে ধারণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যেকটি কথাকে আমলে বাস্তবায়ন করার চেতনা এসব কিছু মিলিয়েই তাঁদের জন্য নবীর হাদীসগুলোকে সংরক্ষণ করা সহজ হয়েছিল।

কোনো বিষয়কে সংরক্ষণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে স্মৃতিতে ধারণ ও লিখে সংরক্ষণ এ দু'টিই প্রধান। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দু'টি পন্থার কোনোটিই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বরং একটি আরেকটির সম্পূরক। কেননা, অনেক সময় মানুষের স্মৃতিতে ভ্রম হয়, তখন লিখিত তথ্যের সহযোগিতায় সেই স্মৃতি ভ্রমের সংশোধন করা হয়। আবার অনেক সময় লিখতে গিয়েও ভুল হয়, তখন স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করা হয়। বস্তুত দু'টি মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। যদিও বলা যায়, স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও লিখিত তথ্য ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অন্যদিকে ভাবলে দেখা যায়, লিখিত তথ্য পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, হারিয়ে গিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিনই অক্ষত থাকে। তাই কোনোটির চেয়ে কোনোটির গুরুত্ব কম নয়। তাই পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দু'টি পদ্ধতি তথা মুখস্ত করা এবং লিখে রাখা উভয়টিই অনুসরণ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তিনি এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যখন মানুষের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল স্মৃতি নির্ভর এবং লেখার উপায় উপকরণও পর্যাপ্ত ছিল না। তাছাড়া লেখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যাও ছিল নিতান্ত নগণ্য। যে কারণে প্রথমদিকে তিনি কুরআনকে লিখে সংরক্ষণ করার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তথ্য উপাত্ত থেকে যতটা জানা যায়, শুরুর দিকে নবী কারীম (সা.) কুরআনকে লিখে এবং হাদীসগুলোকে স্মৃতিতে ধারণ করে সংরক্ষণের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। আর এজন্যই তিনি শুরুর দিকে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি বিশেষ কোনো কারণে তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরিমার্জন করেছেন এবং হাদীসসমূহও লেখার অনুমতি দিয়েছেন।

বস্তুত কুরআন ও হাদীস উভয় বিষয়ের সংরক্ষণের জন্য উভয় ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে। একদিকে যেমন কাতেবীনে ওহী কুরআনকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছেন। অপরদিকে হুফ্‌ফাযুল কুরআন যাঁরা ছিলেন তাঁরা কুরআনকে স্মৃতিপটেও সংরক্ষণ করেছেন। আর হাফেযে হাদীসগণ মুখস্ত করে হাদীসগুলো সংরক্ষণ করেছেন। আবার সাহাবাদের অনেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু হাদীস লিখে রেখেও হাদীস সংরক্ষণ করেছেন। তবে নবী কারীম (সা.) কুরআনকে যেভাবে নিজে তত্ত্বাবধান করে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, হাদীসের ব্যাপারে নিজ উদ্যোগে এবং নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সেগুলো লিপিবদ্ধ করানোর বিশেষ কোনো ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্ণ কুরআন এবং হাদীসের এক বিরাট অংশ উভয় পন্থায় সংরক্ষিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আপন ইচ্ছায় এই উভয় পন্থায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়েছেন। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য মনোনীত এই দীনের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কোনোরূপ ফাঁক-ফোকর না থাকে। কেননা যদি শুধু লিখন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হতো তাহলে হয়তো সমালোচকরা বলতা, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর এক সম্প্রদায় লেখার কাজ আঞ্জাম দিয়েছে, কে জানে তারা কতটা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করেছে।

আর যদি শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করা হতো, তাহলে তারা বলতো, অশিক্ষিত লোকেরা তাদের স্মৃতি থেকে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছে। কে জানে তারা কতটা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছে। যেরূপ বর্তমানে পশ্চিমা এবং এদেশীয় ইসলাম বিদ্বেষী কিছু জ্ঞানপাপী বলে থাকে।[৯৭]

যদি শুধুমাত্র স্মৃতিতে ধারণ করেও হাদীস সংরক্ষণ করা হতো তাহলেও এতে কোনো জটিলতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্যগুলোকে জীবনের পথে আলোর দিশা হিসেবে পেয়ে পরম ভক্তি ও আবেগ নিয়ে তা স্মৃতিতে স্বযতনে ধারণ করতেন। নবীর প্রতি পরম ভালোবাসা ও আবেগই সেগুলো স্মৃতিতে ধারণের কাজটি তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছিল।

তাছাড়া আরবরা এমনিতেই প্রচণ্ড স্মৃতিধর ও স্মৃতিনির্ভর এক জাতি ছিল। সেই জাহেলী যুগ থেকে কবিদের রচিত সুদীর্ঘ কাব্য উপাখ্যান বংশানুক্রমে স্মৃতিতে ধারণ করে যুগ যুগ বহন করা যাদের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এমনকি উটের বংশ তালিকা মুখস্ত করে রাখা যাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, তাদের জন্য একান্ত প্রিয়তম নবীর পবিত্র কালামকে হুবহু মুখস্ত করা ও স্মৃতিতে ধারণ করা কোনো অসম্ভব বিষয় ছিল না। কারণ বর্তমান যুগেও যদি ৩০ পারা কুরআন লক্ষ লক্ষ শিশু নির্ভুলভাবে মুখস্ত করে সারাজীবন স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারে, তাহলে সাহাবায়ে কিরামের জন্য নবী কারীম (সা.)-এর পবিত্র মুখ হতে নি:সৃত কথাগুলো মুখস্ত করে রাখা খুব একটা দু:সাধ্য বিষয় নয়। এছাড়া সমগ্র হাদীস একজন সাহাবী মুখস্ত রেখেছিলেন এমনটি নয়; বরং সহীহ তথ্যমতে তাকরার বা দ্বিরুক্তি ছাড়া মোট ১২০০০ এর চেয়ে কিছু বেশি হাদীস ৪০০০ মতান্তরে ১৫০০ জন সাহাবীর সমন্বয়ে মুখস্ত করার বিষয়টি আঞ্জাম দেয়া মোটেই দু:সাধ্য নয়।[৯৮]

## সাহাবায়ে কিরামের হাদীস হিফয করা

সাহাবায়ে কিরাম ও শীর্ষস্থানীয় তাবেঈগণের অস্বাভাবিক স্মরণশক্তি ছিলো। তাবেঈগণের মধ্যে হযরত কাতাদাহ, হযরত শায়াবী, ইমাম যুহরী প্রমুখ ব্যক্তির অসাধারণ স্মরণশক্তির কথাও বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.)-এর বর্ণিত হাদীসের একটি বিন্দুবিসর্গও আমি ভুলতাম না।[৯৯]হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি আমার রাত্রগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে নিতাম। প্রথমভাগে নিদ্রা যাপন করতাম, দ্বিতীয়ভাগে ইবাদত বন্দেগী করতাম। আর তৃতীয়ভাগে নবীজীর হাদীস মুখস্ত করতাম।[১০০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এই কাজের তাগিদ দিয়ে বলেন- তোমরা হাদীস চর্চা করতে থাকো। কেননা হাদীস স্মরণ ও চর্চার অপর নাম জীবন। একদিন তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা যখন একত্রে বস তখন হাদীস চর্চা করো কি? ছাত্রগণ জবাব দিলেন- হ্যাঁ, আমরা তো এটাকে এতোই গুরুত্ব দিই যে, আমাদের কোনো সাথী যদি কখনো না আসে আমরা গিয়ে তার সাথে মিলিত হই, যদিও সে কুফার শেষ প্রান্তে থাকে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের এই নেক আমলের সুফল সর্বদা ভোগ করতে থাকবে।[১০১]

হযরত আবু সাঈদ (রা.) হাদীস চর্চার জন্য তাগিদ দিতেন। বরং যখনই কোনো ছাত্র হাদীস লিখে দেয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন পেশ করতো তিনি তা অস্বীকার করতেন আর বলতেন, আমরা যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে হাদীস শুনে মুখস্ত করেছি তোমরাও সেভাবে মুখস্ত করো।[১০২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলতেন, তোমরা হাদীস চর্চা করতে থাকো। যদি এগুলো মুখস্থ না করো তাহলে এগুলো বিস্মৃত হতে থাকবে। এমনকি নিজের অনুসৃত নিয়ম সম্পর্কে বলতেন, আমরা নিজেরাও হাদীস মুখস্থ করতাম।

---

৯৭. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭, ৮
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৯৯. লোকমান আহমদ আমীমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১০০. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১০১ . লোকমান আহমদ আমীমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১০২. লোকমান আহমদ আমীমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস শুনতাম, যখন তিনি মজলিস থেকে ওঠে যেতেন আমরা সেগুলো পরস্পর পর্যালোচনা করতাম। অত:পর আমরা যখন মজলিস থেকে ওঠতাম সেগুলো আমাদের মুখস্ত হয়ে যেতো এমনভাবে যে, যেন সেগুলো আমাদের মনে রোপিত হয়ে গেছে।[১০৩]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে শুধু যে হাদীস মুখস্থ করার ব্যাপারে অসাধারণ উৎসাহ ছিলো তাই নয়, হাদীসের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁদের তৎপর ছিলো অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম হাদীসের প্রচার ও প্রসার কাজকে নিজেদের জন্য ফরয করে নিয়েছিলেন। ফলে শুধু কুফাতে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজারে, যাঁরা তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং শিখেছেন।[১০৪]

## হাদীস বর্ণনায় সাহাবায়ে কিরামের সতর্কতা

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম খুবই সর্তকতা অবরম্বন করতেন। নবী কারীম (সা.)-এর একটি সাবধান বাণীর কারণে ভীত সন্ত্রস্ত থেকেই এ কাজ করতেন। নবী কারীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে নেয়।[১০৫] তাই সাহাবীগণ সবসময় সচেষ্ট ছিলেন, যেন কোনোক্রমেই ভুল উদ্ধৃতি করা না হয়। হযরত আনাস (রা.)-এর নিয়ম ছিলো, যে কোনো হাদীস সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র খটকা লাগলে তিনি তা বর্ণনাই করতেন না এবং বলতেন, ভুল হওয়ার আশংকা না থাকলে অবশ্যই হাদীস বর্ণনা করতাম।[১০৬]

কোনো কোনো সাহাবী এমনও ছিলেন যে, তাঁদের বর্ণনায় ভুলক্রমে হ্রাস বা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে তাঁরা খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এ কারণেই হাদীস কম বর্ণনা করার তাগিদ দিতেন। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নিয়ম ছিলো, কেউ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি সাক্ষ্য তলব করতেন এবং হযরত আলী (রা.) বর্ণনাকারীর শপথ নিতেন। তাঁদের খিলাফতকালে এই ধরনের বিভিন্ন শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ ছিলো। এর মূল কারণ ছিলো, যাতে কোনো ভুল উক্তি নবী কারীম (সা.)-এর ওপর আরোপিত হয়ে না যায়। এই হলো খুলাফায়ে রাশিদীনের সর্তকতা অবলম্বনের নমুনা।

মোটকথা, নবী কারীম (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগে মুখস্থ রাখা, পর্যালোচনা করা, হাদীস শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অসাধারণ পর্যায়ের ছিলো বিধায় আল-কুরআনের মতো আল-হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত হয়নি। তাছাড়া নবী কারীম (সা.)-এর যামানা আল-কুরআন নাযিলের যামানা ছিলো। তখন আল-কুরআন লিখা ও লিখানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো। কিছু কিছু হাদীসও লিখা হতো। তবে আল-কুরআন ও আল-হাদীস পরস্পর মিশে যেতে পারে এই আশংকায় নবী কারীম (সা.) সাধারণভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- আমার হাদীসগুলো লিখো না। কুরআন ছাড়া কেউ আমার হাদীস লিখে থাকলে তা মুছে ফেলা হোক। অবশ্য আমার হাদীস বর্ণনা করতে কোনো আপত্তি নেই।

## হাদীস লেখার অনুমতি না দেয়ার কারণ

পবিত্র কুরআন নাযিলের শুরুর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে হাদীস লিখে রাখার অনুমতি প্রদান করেননি।তিনি শুরুর দিকে পবিত্র কুরআনকে লিখে এবং হাদীসকে স্মৃতিতে ধারণের মাধ্যমে সংরক্ষণের চিন্তা করেছিলেন। এর একটি কারণ হয়তো পর্যাপ্ত উপকরণের দুর্লভ্যতা ও লিখতে জানেন এমন লোকের অভাবও হতে পারে। তাছাড়া আরবের লোকদের অধিকাংশই ছিল উম্মী। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে একাকার করে ফেলারও সম্ভাবনা থাকতে পারে বিধায় তিনি পবিত্রকুরআনকে মিশ্রণমুক্ত করে সংরক্ষণের তাকীদে হাদীস লিপিবদ্ধ

---

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১০৪. প্রাগুক্ত
১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১০৬. প্রাগুক্ত

করতে নিষেধ করে ছিলেন। তাছাড়া পবিত্র কুরআনকে بلفظه বা হুবহু শব্দে সংরক্ষণ করা যতটা অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ের ছিল, হাদীসের ক্ষেত্রে হুবহু শব্দে সংরক্ষণের বিষয়টি ততোটা অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ের ছিল না। কারণ হাদীসের ক্ষেত্রে অর্থের দিকটাই বেশি প্রাধান্য পেত। সুতরাং অর্থ অবিকল রেখে কোনো শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলে তাতে তেমন কোনো অসুবিধার কারণ ছিল না। যে কারণে তিনি শুরুর দিকে হাদীসগুলো লিখতে নিষেধ করেছিলেন। হযরত যায়েদ ইবন সাবিত (রা.) বলেন–اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِهِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে কুরআন ছাড়া অন্যকিছু না লিখতে নির্দেশ দেন।[১০৭]

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন–اِسْتَاْذَنَّا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَاْذَنْ لَنَا–

অর্থ: আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে লিখার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমতি দেননি।[১০৮]
আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আরো বলেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَ مَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ وَ حَدِّثُوْا عَنِّىْ وَ لاَ حَرَجَ–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আমার কোনো কথা তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া অন্য কিছু যদি কেউ আমার থেকে লিপিবদ্ধ করে থাকে তাহলে সে যেন তা মিটিয়ে ফেলে। আমার কোনো কথা তোমরা মৌখিকভাবে বর্ণনা করতে পারো, এতে কোনো অসুবিধা নেই।[১০৯] অন্যত্র আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন-

كُنَّا قُعُوْدًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا هٰذَا تَكْتُبُوْنَ؟ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ مِنْكَ– فَقَالَ اَ كِتَابُ مَعَ كِتَبِ اللهِ؟ اَمْحِضُوْا كِتَابَ اللهِ وَ اخْلِصُوْهُ– قَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ–

অর্থ: আমরা নবী কারীম (সা.) থেকে যা শুনতাম তা লিপিবদ্ধ করতাম। একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাস করলেন, তোমরা এগুলো কী লিখছ? আমরা বললাম, আপনার থেকে যা কিছু শুনি সেগুলো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে আরেক কিতাব বানাতে যাচ্ছো? আল্লাহর কিতাবকে একক গ্রন্থ হিসেবে থাকতে দাও এবং তাকে মিশ্রণমুক্ত রাখো। এ কথা শুনে আমরা ইতিপূর্বে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছিলাম তার সমূদয় এক মাঠে একত্রিত করলাম এবং সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিলাম।[১১০]

তাই ওহী নাযিলের শুরুর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো কথা যেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর আড়ালে থেকে না যায় সেদিকে তাঁরা সর্বদা খেয়াল রাখতেন এবং এজন্য অনেক সময় তাঁরা নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়ে হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পড়ে থেকে হাদীস মুখস্ত করতেন।

**হাদীস লেখার অনুমতি প্রদান**

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন দেখলেন সাবাবীগণ কুরআন ও হাদীসকে মিলিয়ে একাকার করে ফেলার পর্যায় থেকে অগ্রসর হয়ে পরিপক্কতা অর্জন করেছেন এবং উপরন্তু একলদ লোক কুরআনকে হুবহু শব্দে মুখস্ত করেছেন। তখন তিনি হাদীসসমূহও লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। আর তখন থেকেইসাহাবায়ে কিরামের এক জামাআত ব্যক্তিগতভাবে হাদীস লিখে রাখার কাজ শুরু করেন। হাদীস লেখার অনুমতি পাওয়ার পর সাহাবায়ে কিরামের একটি উল্লেখযোগ্য দল যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে বসে ব্যক্তিগভাবে লেখার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন বিভিন্ন রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি থেকে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। যেমন: হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বলেন-

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَكْتُبُ اِذْ سُئِلَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَىُّ الْمَدِيْنَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلاً قُسْطَنْطِيْنِيَّةُ اَوْ رُوْمِيَّةُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ بَلْ مَدِيْنَةُ هِرَقْلَ اَوَّلاً–

---

১০৭. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১০৯. প্রাগুক্ত
১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

অর্থ: আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারদিকে বসে লিখছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কনস্টান্টিনোপল ও রোম এই দুই নগরের কোনটি প্রথমে বিজিত হবে? উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন: বরং হেরাক্লিয়াসের শহর (কনস্টান্টিনোপল)-ই প্রথম বিজিত হবে।[১১১]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারী সহাবী নিজের স্মৃতি দুর্বলতার অভিযোগ করে বলেন, হে আল্লার রাসূল! প্রতিদিন আপনি যে ওয়াজ-নসীহত করেন তা আমার ভালো লাগে। কিন্তু আমি তা মনে রাখতে পারি না। নবী কারীম (সা.) তাকে ইরশাদ করলেন: তুমি ডান হাতের সাহায্য গ্রহণ করো।[১১২]

### হাদীস রেওয়ায়েতের সংখ্যানুসারে সাহাবীদের বিভিন্ন শ্রেণি

হাদীস রেওয়ায়েতের সংখ্যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: (১) মুকাস্‌সিরীন, (২) মুতাওয়াস্‌সিতীন, (৩) মুকিল্লীন ও (৪) অন্যান্য মুকিল্লীন।

### মুকাস্‌সিরীন

যেসব সাহাবীর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের বেশি তাঁরা এই শ্রেণির অন্তর্গত। তাঁদের সংখ্যা ৭জন। তাঁরা হচ্ছেন-

(১) আবু হুরায়রা (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫,৩৭৪
(২) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২৬৬০
(৩) আয়িশা (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২২১০
(৪) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০
(৫) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.), তাঁর হাদীস সংখ্যা ১৫৪০
(৬) আনাস ইবন মালিক (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৮৬ এবং
(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১১৭০।

### মুতাওয়াস্‌সিতীন

এই শ্রেণিতে রয়েছেন ঐসব সাহাবী যাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা এক হাজারের কম কিন্তু পাঁচশতের অধিক। তাঁদের সংখ্যা ৪জন। যথা:

(১) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮
(২) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০
(৩) আলী (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৮৬
(৪) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৯

### মুকিল্লীন

এই শ্রেণিতে রয়েছেন ঐসব সাহাবী যাঁদের রেওয়ায়েত সংখ্যা পাঁচশতের নিচে এবং চল্লিশের উর্ধ্বে। তাঁদের সংখ্যা ৫৭জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

(১) উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে উমাইয়া (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩৭৮
(২) আবু মুসা আশআরী আবদুল্লাহ ইবন কায়েস (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩৬০
(৩) বারা ইবন আযিব (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩০৫
(৪) আবু যর গিফারী (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২৮১
(৫) সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২১৫
(৬) সাহাল আনসারী (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৮৮

---

১১১. প্রাগুক্ত
১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

(৭) উবাদাহ ইবন সামিত (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৮১
(৮) আবু দারদা উওয়াইমির ইবন আমীর (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭৯
(৯) আবু কাতাদাহ আনসারী (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭০
(১০) উবাই ইবন কাব (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৪
(১১) বুরাইদাহ ইবন হাসিব আল আসলামী (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৪
(১২) মুআজ ইবন জাবাল (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭৫
(১৩) আবু আইউব খালেদ ইবন যায়েদ আনসারী (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৫০
(১৪) উসমান ইবন আফফান (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৪৬
(১৫) জাবির ইবন সামুরাহ (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৪৬
(১৬) আবু বকর সিদ্দীক (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৪২
(১৭) মুগীরা ইবন শোবা (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৩৬। প্রমুখ

**অন্যান্য মুকিল্লীন**

মুকিল্লীন ৫৭ জন সাহাবাদের ছাড়াও আরো রেওয়ায়েতকারী সাহাবী রয়েছেন, যাঁদের সংখ্যা চল্লিশ বলে উল্লেখ রয়েছে। মুসনাদে আহমাদসহ প্রভৃতিগ্রন্থে তাঁদের রেওয়ায়েত রয়েছে।

## হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হাদীস সংক্রান্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনকারী হলেন ইবন শিহাব যুহরী (মৃত্যু ১২৫)। আবার কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম হাদীস সংকলন করেছেন আবু বকর ইবন হাযম। তবে ইবন শিহাব যুহরী এই গৌরবের দাবি করে নিজেই বলেন–لم يدون هذا العلم احد قبل تدونى

অর্থ: আমার পূর্বে ইলমে হাদীসের সংকলন আর কেউ করেনি।[১১৩]

উল্লেখ্য, সর্বপ্রথম বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংকলন করন ইমাম শা'বী (রহ.)। যাহোক, হাদীস সংকলনের ধারা পর্যালোচনা করলে সাধারণত ৪টি যুগে বিভক্ত করা যায়। যথা:
**(ক) প্রথম যুগ:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ হতে ৯৯ হিজরী পর্যন্ত।
**(খ) দ্বিতীয় যুগ:** হিজরী ২য় শতকের প্রথম থেকে ৩য় শতকের ১ম পর্যন্ত।
**(গ) তৃতীয় যুগ:** হিজরী ৩য় শতকের ১ম হতে হিজরী ৫ম শতকের শেষ পর্যন্ত।
**(ঘ) চতুর্থ যুগ:** হিজরী ৫ম শতকের পর হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত।

**প্রথম যুগ:** এই যুগে কিতাবাদি লেখার চেয়ে স্মৃতিশক্তি দ্বারা হাদীস ধরে রাখা হতো বেশি। এই যুগের সূচনা হয় নবী কারীম (সা.)-এর যামানাতেই। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে এ পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবদের নিয়ম ছিলো, তারা তাদের পূর্বপুরুষ ও মহান ব্যক্তিদের কৃতিত্ব এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ কণ্ঠস্থ করতো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তারা প্রাচীনকালের ঘটনাবলীর বিবরণের পরিবর্তে সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও কাজের বিবরণ সজীব রাখার প্রয়াস পায়। এটাই হাদীস শাস্ত্রের গোড়ার কথা।

নবী কারীম (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যামানায় কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ ও কপি করার কাজকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রচলন তখনো শুরু হয়নি। অবশ্য সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিতে নবী কারীম (সা.)-এর হাদীসসমূহ সংরক্ষিত ছিলো। শুধু সংরক্ষণই নয়, এর প্রচার-প্রসারেও তাঁরা আত্মনিয়োগ করতেন। আল-কুরআন এবং আল-হাদীসের আলোকেই তাঁরা ফাতওয়া দিতেন। হাদীস সংগ্রহে সাহাবায়ে কিরামের তৎপরতা বিস্ময়কর। তাঁর একটিমাত্র হাদীস শুনার জন্য কয়েক হাজার মাইল দূরের পথ সফর করতেন। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.)-এর ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনাইস

১১৩. সম্পাদনা পরিষদ, *হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

(রা.) থেকে একটিমাত্র হাদীস শুনার জন্য তিনি একমাসের পথ সফর করেছিলেন এবং আবু আইউব আনসারী (রা.) একটি মাত্র হাদীস শুনার জন্য মদীনা থেকে মিসর পর্যন্ত সফর করেছিলেন।[১১৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ইবন আমর ইবনুল আস (রা.)-কে হাদীস লিপিবদ্ধ করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি লিখিত হাদীসগুলো নিজের জন্য সংরক্ষণ করতেন। এতে তাঁর নিকট হাদীসের বিরাট সম্পদ জমেছিলো। তিনি এই সংকলনের নাম রেখেছিলেন 'সাদিকাহ' এবং নবী কারীম (সা.) হযরত রাফি' ইবন খাদীজ (রা.)-কেও হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরো কিছু সংখ্যক সাহাবীকেও এই অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। হযরত আলী (রা.)ও সে যুগে কিছুসংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[১১৫]

হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর লিখিত পুস্তকাদি তিনি দেখেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)ও পাঁচশত হাদীস সম্বলিত একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তা বিনষ্ট করে ফেলেছিলেন। মোটকথা, নবী কারীম (সা.)-এর যামানাতেই হাদীস ও চিঠিপত্র ইত্যাদির একটি সম্ভার মুওজুদ ছিলো। প্রথম পর্যায়ের তাবেঈগণের যুগেও হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিয়ম ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) ইলমুল ফারায়েয-এর ওপর একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত আবু রাফি' (রা.) হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত সাদ ইবন আবী উবাদাহ (রা.), হযরত কায়েস ইবন সাদ (রা.), হযরত জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.), হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.), হযরত সামুরাহ ইবন জুনদুব (রা.), হযরত ওয়াসিলাহ ইবন আসকা (রা.), আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রা.) এবং তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ ইবন যুবায়র, ইবন ওরওয়াহ, হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়াহ, মুজাহিদ প্রমুখ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা হাদীসগুলোকে বিষয়বস্তুর নিরিখে ভাগ করে স্বতন্ত্র কোনো কিতাবের রূপ দেননি। বরং মুখস্থ করার সুবিধার্থে এ পন্থা (লিখন) অবলম্বন করতেন। প্রকৃত কিতাব ছিলো তাঁদের বক্ষে। এগুলোর প্রচার ও প্রসারের দিকে ছিলো তাঁদের দৃষ্টি।[১১৬]

নিম্নে সাহাবীদের যুগে হাদীসের লিখিত সংকলনের বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হলো-

**(১) الصحيفة الصادقة:** ওয়াহাব ইবন মুনাব্বেহ-এর সূত্রে বুখারীতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সংকলন। তিনি বলতেন ما يرغبنى فى الحياة الا الصادقة والوهط তাঁর পৌত্র আমর ইবন শুআয়ব এর দরস দিতেন।[১১৭]

**(২) صحيفة على :** এতে যাকাত, হত্যার বিধান, গোলাম আযাদকরণ, কাফিরের বিনিময়ে মুসলমানতে হত্যা না করার বিধান, মদীনার হেরেমের সীমারেখা ও তার বিধান, অন্যকে পিতা হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা, ভূমির প্রাচীন নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করার নিন্দা ইত্যাদি বহু বিষয়ের হাদীস উল্লেখ ছিল। সহীহ বুখারীর باب الاعتصام بالكتابو السنة অধ্যায়ে এর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে এই সংকলনটি অনেক বিস্তারিত ও দীর্ঘ ছিল বলে মনে হয়।

**(৩) تاليف عمرو بن حزم:** হযরত আমর ইবন হাযম (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে একটি লিখিত হিদায়াতনামা দিয়ে ছিলেন, যাতে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও ধর্মীয় হিদায়াতের কথা উল্লেখ ছিল। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে তা হিফাযত করেন এবং অন্যান্য গোত্রের নিকট প্রেরিত নবী কারীম (সা.)-এর বিভিন্ন চিঠি-পত্র ও ফরমানসমূহকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেন।

---

১১৪. লোকমান আহমদ আমীমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১১৫ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১১৭ . আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্‌ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

**(৪) رسالة سمرة بن جندب** : আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) বলেন, সামূরা (রা.)-এর ছেলে সুলায়মান তাঁর পিতা কর্তৃক সংকলিত বৃহৎ পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

**(৫) صحيفة سعد بن عبادة**: তিরমিযীতে এ বিষয়টি উল্লেখ আছে। তাঁর ছেলে সেই সহীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

**(৬) صحيفة جابر بن عبد الله** : হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে তিনি একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন বলে সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে।

**(৭) مجموعة مغيرة بن شعبة** : সহীহ বুখারীতে باب الذكر بعد الصلاة এর উল্লেখ আছে যে, হযরত মুগীরা (রা.) কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়ে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

**(৮) مسند ابى هريرة**: হযরত উমর ইবন আবদুলর আযীযের পিতা আবদুল আযীয ইবন মারওয়ান- যিনি মিশরের গভর্ণর ছিলেন। তাঁর নিকট এই সংকলনটি ছিল।

**(৯) تعليق ابى هريرة**: বশীর ইবন নাহীক নামে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একজন শিষ্য একটি সংকলন করেন। অত:পর তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণের সময় এটি তাঁকে পাঠ করে শুনান এবং বলেন: এসব হাদীস আমি আপনার নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। এ শুনে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- হ্যাঁ।

**(১০) الصحيفة الصحيحة** : হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ নামক জনৈক শিষ্যের জন্য হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বাছাইকৃত হাদীসের একটি ছোট সংকলন। এতে ১৫০টির মতো হাদীস ছিল। পূর্বে 'মুসনাদে আবি হুরায়রা'এর কথা উল্লেক করা হয়েছে। বস্তুত এ দু'টোই আবু হুরায় (রা)-এর সংকলন ছিল।

**(১১) كتاب الصدقة**: এ সংকলনটি রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত গভরর্ণরদের নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়ে ছিলেন। এতে মূলত যাকাত, সাদাকাহ, উশর ইত্যাদির বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

**(১২) صحف انس بن مالك** : হযরত সাঈদ ইবন হিলাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা যখন হযরত আনাস (রা.)-এর সম্মুখে বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করছিলাম, তখন তিনি একটি পাণ্ডুলিপি বের করে আনলেন এবং বললেন: এগুলো আমি নবী কারীম (সা.) থেকে শ্রবণ করেছি।

**(১৩) صحيفة بن عباس**: হযরত আবু কুরায়ব যিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর গোলাম ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর কিতাবাদির এতো বিরাট স্তুপ পেয়েছিলেন যা এক উটের বোঝা হবে।

**(১৪) صحيفة بن مسعود**: আল্লামা ইবন আবদুল বার বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.)-এর ভাই আবদুর রহমান ইবন মাসঊদ (রা.) একটি কিতাব বের করে এনে বললেন, আমি কসম করে বলছি- এটি আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.)-এর লেখা কিতাব।

**(১৫) صحيفة عبد المالك بن مروان** : আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান এটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর থেকে লিপিবদ্ধ করিয়ে ছিলেন।

**(১৬) صحيفة وهب بن منبه**: হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ১৫৪০টি হাদীস বর্ণনা করেতেন। তাঁর এসব হাদীসগুলোও লিপিবদ্ধ ছিল। তাঁর শিষ্য ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

**(১৭) صحيفة عروة بن الزبير**: হযরত আয়িশা (রা.) ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করতেন। এগুলো তাঁর কাছ থেকে উরওয়াহ ইবন যুবায়র লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন।[১১৮]

---

১১৮. আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, ২৬

**(খ) দ্বিতীয় যুগ:** হিজরী ২য় শতকের প্রথম থেকে ৩য় শতকের ১ম পর্যন্ত।

এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অনেকেই এ পৃথিবী থেকে ইন্তিকাল করেছিলেন। এতে যাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। যেমন বসরায় সর্বশেষ সাহাবী হযরত আনাস (রা.) ৯৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। অন্যান্য শহরগুলোতেও দু'চারজন প্রবীন সাহাবী ছাড়া প্রায় সকলেই বিদায় হয়ে গিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে ইসলাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলে হাদীস রেওয়ায়েতের যে প্রকৃতি পূর্বে বিদ্যমান ছিল তার আর রইলো না। বিভিন্ন বিদ'আতী গোষ্ঠী ও মনগড়া হাদীস বর্ণনাকারীর দল বের হয়। ফলে মিথ্যা হাদীস প্রচলিত হওয়া শুরু হয়। বিশুদ্ধ হাদীসও বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।ফলে হাদীস শাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সনদ সহকারে কিতাবদি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ সকল নানা কারণে হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.) হাদীসগুলোকে গ্রন্থাবদ্ধ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণকে হাদীস প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেন। সাঈদ ইবন ইবরাহীম (রহ.) বলেন- উমর ইবন আবদুল আযীয় আমাদেরকে 'সুনান' তথা হাদীসসমূহ সংকলন করার জন্য নির্দেশ দান করেন। অত:পর আমরা তা কিছুদিনের মধ্যেই সংকলিত করলাম। অত:পর তিনি তাঁর শাসনাধীন সকল অঞ্চলে এর কপি প্রেরণ করেন। এই পরম্পরায় ইমাম যুহরী (রহ.) সর্বপ্রথম মাগাযী বা যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস সংকলন করেন। ইমাম যুহরী হাদীস সংকলন করতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি মদীনার প্রতিটি ঘরে গিয়ে সাহাবাদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীসমূহ ও অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং তা লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁর সংকলিত হাদীস ভাণ্ডার কয়েকটি উটের বোঝা সমপরিমাণ ছিল।[১১৯]

হাদীস সংকলনের ফরমান জারী করার পর খলিফা যদিও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না, কিন্তু সে যুগের আলেম সমাজ হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই মক্কা ও মদীনাসহ সারা আরব জাহানে তাবেঈদের মধ্য হতে প্রথম শ্রেণির মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো- মক্কায় সর্বপ্রথম ইবন জুরাইয (মৃত্যু ১৫০ হি.), মদীনায় ইবন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হি.) এবং ইমাম মালেক (মৃত্যু ১৭৯ হি.)। এভাবে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলন শুরু করেন।[১২০]

**দ্বিতীয় শতকে সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ**

* কিতাবুল আসার লি-আবি হানীফা- নু'মান বিন সাবিত (মৃত্যু ১৫০ হি.)
* কিতাবুয যুহ্দ- আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (মৃত্যু ১৮১ হি.)
* মুয়াত্তা মালেক- মালেক ইবন আনাস (মৃত্যু ১৭৯ হি.)
* জামে' সুফিয়ান সাওরী- সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু ১৬১ হি.)
* মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ- মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী (মৃত্যু ১৮৯ হি.)
* মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালেসী- আবু দাউদ তায়ালেসী (মৃত্যু ২০৪হি.)
* মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক- আবদুর রাজ্জাক (মৃত্যু ২১১ হি.)
* মুসনাদ হুমায়দী- আবদুল্লাহ ইবন জুবায়েন আল হুমায়দী (মৃত্যু ২১৯ হি.)
* মুসান্নাফ ইবন আবি শায়বা- আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন শায়বা (মৃত্যু ২৩৫ হি.)
* মুসান্নাফ লাইস ইবন সা'দ- লাইস ইবন সা'দ (মৃত্যু ১৭৫হি.)
* মুসান্নাফ সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ- সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ (মৃত্যু ১৯৮ হি.)
* মুসনাদে ইমাম শাফী- ইমাম শাফী (মৃত্যু ২০৪ হি.)।[১২১]

**(গ) তৃতীয় যুগ:** হিজরী ৩য় শতকের ১ম হতে হিজরী ৫ম শতকের শেষ পর্যন্ত। হাদীস সংকলনের ৩য়যুগছিল চরম উন্নতি ও পরিপূর্ণতার যুগ। এ যুগেই ইলমে হাদীসের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। তাই এ যুগকে হাদীস সংকলনের

---

১১৯. লোকমান আহমদ আমীমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১২০. সম্পাদনা পরিষদ, *হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তৃতীয় শতকের শেষভাগে হাদীস সংকলন এবং কিতাবাদি প্রণয়নের কাজ পূর্ণতা লাভ করে। চতুর্থ শতকের প্রথম থেকেই হাদীসসমূহের বাছাই, বিন্যাস এবং এগুলো সহজ পদ্ধতিতে পরিবেশনের দিকে হাদীস বিশারদগণ মনোযোগ দেন। তবে এ যুগে হাদীসের মতনের চেয়ে সনদের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণে প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ তাদের মতের স্বপক্ষীয় হাদীসটির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য একাধিক সনদেও হাদীসটি পেশ করার প্রবণতায় লিপ্ত হন। কারণ একাধিক সনদের বর্ণিত হওয়ার অর্থই হলো হাদীসটি সম্পর্কে অনেকেই অবগত বিধায় হাদীসটি আমলযোগ্য। আর এ সময়ই ইত্তেসালে সনদের প্রেক্ষিতে সহীহ হাদীস সংকলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সিহাহ সিত্তাহ মূলত এ সময়েই সংকলিত হয়েছে। যদিও সহীহ হাদীসের মধ্যেও স্তরভেদ রয়েছে এবং প্রত্যেকে নিজস্ব উসূল অনুযায়ী সহীহ হাদীসের স্তর নির্ণয় করেছেন। এ শতকেই হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীস সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের অপূর্ব সমাহার ঘটে। এ যুগের পূর্বে গ্রন্থকারগণ সাধারণত বিশুদ্ধ ও দুর্বল প্রত্যেক প্রকারের হাদীসগুলোকে সনদ সহকারে সংকলন করতেন। এ যুগেও বহু গ্রন্থকার উক্ত নিয়ম অবলম্ব করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের একটি দল শুধু বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো সংকলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। তাঁরা শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের উক্তিসমূহকেও পৃথক করেন। এ যুগে আসমাউর রিজাল বা চরিত অভিধানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর 'মুসনাদ' দ্বারা এই যুগের সূচনা হয়।[১২২]

**তৃতীয় শতকে সংকলিত উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহ**

* সহীহ আল বুখারী- মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হি.)
* সহীহ মুসলিম- আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃত্যু ২৬১ হি.)
* সুনান আবু দাউদ- সুলায়মান ইবন আশআস ইবন ইসহাক (মৃত্যু ২৭৫ হি.)
* সুনান নাসায়ী- আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব (মৃত্যু ৩০৩ হি.)
* জামি তিরমিযী- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা (মৃত্যু ২৭৯ হি.)
* সুনান ইবন মাযাহ- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (মৃত্যু ২৭৩ হি.)
* মুসনাদু দারেমী- আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (মৃত্যু ২৫৫ হি.)
* সুনান আবু মুসলিম- আবু মুসলিম ইবরাহীম (মৃত্যু ২৯২ হি.)
* মুসনাদ বাজ্জার- আবু বকর আহমাদ (মৃত্যু ২৯২ হি.)
* মুসনাদ আবু ইয়ালা- আহমাদ ইবন আলী (মৃত্যু ৩০৭)
* সহীহ ইবন খুযায়মাহ- আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃত্যু ৩১১ হি.)
* সহীহ আবু আওয়ানাহ- ইয়াকুব ইবন ইসহাক (মৃত্যু ৩১৫ হি.)।[১২৩]

**(ঘ) চতুর্থ যুগঃ** হিজরী ৫ম শতকের পর হতে অদ্যাবধি।হাদীস সংকলনের তৃতীয় যুগে হাদীসসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হওয়ায় এবং সনদের বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়টিও প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে যাওয়ায় পরবর্তীকালে হাদীস সংকলনের ধারাও পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে সেসব গ্রন্থের ওপর টীকা, ব্যাখ্যা, পরিশিষ্ট, নির্ঘন্ট ইত্যাদি তৈরির কাজ চলতে থাকে। তবে এ যুগে হাদীস মোতাবেক আমলকরণ, হাদীস শিক্ষাকরণ ও শিক্ষাদান এবং হাদীস লিখন পূর্বের ন্যায় চললেও হিফযকরণ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[১২৪]

অন্যান্য যুগের ন্যায় চতুর্থ যুগে এসে সনদ সহকারে হাদীস মুখস্থ রাখার তেমন প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এ যুগের লোকেরা পূর্ববর্তীদের লিখিত কিতাবের আলোচনা-সমালোচনার প্রতিই মনোনিবেশ করেন। কেউ কেউ হাদীসের কিতাবসমূহের সনদ বিচার করেন, কেউ এর সংক্ষেপ করেন এবং কেউ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। অনেকে আবার বিভিন্ন কিতাবের হাদীসসমূহ একত্র করে হাদীসের বিশ্বকোষ রচনা করেন এবং হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের অভিধান রচনা করেন। কেউ হাদীস সংশ্লিষ্ট অপরাপর এলেমের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি মনোযোগী হয়ে হাদীস সম্পর্কীয় বহু শাখা

১২২. লোকমান আহমদ আমীমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১২৩. সম্পাদনা পরিষদ, *হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১২৪. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংকলনের একটি প্রবণতাও অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, আধুনিককালে নতুন নতুন সমস্যার প্রেক্ষিতে নতুন শিরেনামে যেসব হাদীসে এর সমাধার পাওয়া যায়, তা একত্রিত করে নতুন গ্রন্থ সংকলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই সকল যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি নতুন প্রজন্ম এই শূন্যতা পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট রয়েছে।[১২৫]

## হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জীবন দর্শনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই হাদীস সংরক্ষণ ও সংগ্রহেরধারা চালু হয়। নিম্নে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কয়েকটি উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

**হিদায়াতের উৎস:** হাদীস জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিদায়াতের উৎস। মুসলিমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ও হিদায়াতের অমর বাণী হিসেবে হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন।

মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সমগ্র হাদীস পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা তখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সরাসরি তিনিই সমাধান দিতেন। কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পর নব উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

**ইসলামের প্রসারতা লাভ:** ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম হয়ে উঠেদিগন্ত বিস্তারকারী। মরু আরবের চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি তাঁর সাম্য ও শান্তি জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটান দেশ হতে দেশান্তরে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী শাসন। আর এ ব্যাপক বিস্তৃতিই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত, বৈষয়িক ও শাসনতান্ত্রিক জটিলতা। উদ্ভূত এ অবস্থার নিরসন কল্পে বিশুদ্ধ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

**জ্ঞান লাভ:** মহানবীর (সা.)-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম আরো বেশি সম্প্রসারিত হওয়ায়সাহাবীগণ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং বসতিস্থাপন করেন। ফলে এক এলাকায় বসাবাসরত রাবীর স্মৃতিতে রক্ষিত হাদীস সম্পর্কে অন্য এলাকার রাবীর অবহিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই সকল হাদীস সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের সব জায়গায় লোকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের জন্য হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

**শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন:** ইসলামী হুকুমত সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের পরই হাদীসের নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

**কুরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য:** মহানবী (সা.)-এর অবর্তমানে কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া সাহাবীদের শাহাদতবরণ ও ইন্তিকালে হাদীস অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

**ভন্ড দলের আবির্ভাব:** ইসলামের মধ্যযুগ তথা খিলাফতে রাশেদার শেষের দিকে বিশেষ কিছু স্বার্থান্বেষী ও ভ্রান্তধর্মীয় ফেরকার আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে খারেজী, রাফেজী, জাবরিয়া, কাদারিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায় খুবই সক্রিয় ছিল। এসব ফেরকার লোকেরা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা বা নিজেদের স্বার্থে হাদীস রচনা করতো। এদের থেকে হিফাজতের জন্য হাদীস সংকলন করাঅত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দেয়।

**জাল হাদীস প্রতিরোধ:** রাজনৈতিক ও দলীয় প্রয়োজনে ষড়যন্ত্রমূলক কিছু জাল হাদীস রচনা করে কেউ কেউ ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালাতো। এদের থেকে সহীহ হাদীসকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে এবং জাল হাদীস প্রতিরোধের জন্য হাদীস সংরক্ষণ করা জরুরী হয়ে পড়ে।

১২৫. সম্পাদনা পরিষদ, *হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

**স্মরণশক্তি হ্রাস:** বয়োবৃদ্ধে এবং দুনিয়াবী ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় হাদীসবিদ সাহাবী ও তাবিঈগণের স্মরণ শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বস্তুত এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁরা সঠিক ও শুদ্ধ হাদীস সংরক্ষণের জন্য হাদীসকে লিখে রাখার প্রতি যত্মবান হন।

**অনাগত উম্মাহর কাছে পৌঁছানো:** বিদায় হজ্জ্বে মহানবী (সা.) করেছিলেন- একটি বাক্য হলেও তোমরা তা পৌঁছে দাও। তোমরা উপস্থিত যারা তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিও।

এসব হাদীসের প্রেক্ষাপটে হাদীসবেত্তাগণ হাদীস সংকলন করে অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বিচেনায় খ্যাতনামা রাবী ও মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে অবিশ্রান্তসাধনা ও প্রয়াস চালান এবং চিরদিনের জন্য হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। তাঁর মুখ নি:সৃত প্রতিটি বাণীই ছিলো মানব জাতির জন্য প্রেরণা ও সফলতার মাধ্যম। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর জন্য হাদীসে রাসূল (সা.) এক অমূল্য সম্পদ এবং ইসলামী শরী'আতের অন্যতম উৎস। একে বাদ দিয়ে ইসলামী জীবন পরিচালনা করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা,আদেশ-নিষেধ তথা তাঁর প্রতিটি কথা ও গোটা কর্মময় জীবনই মানব জাতির জন্য অপরিহার্য এক মহান আদর্শ। কারণ মানব কল্যাণ সাধনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, বিচার বিভাগীয়, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলীল, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়সহ এমন কোনো দিক নেই যে বিষয়ে তিনি সম্যক ধারণা প্রদান করেন নি। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: নিশ্চয় রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[১২৬]

তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ

অর্থ: আমি রাসূল পাঠিয়েছি একমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে, তাকে মেনে চলা হবে।[১২৭]

এ আয়াতে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে-

يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ–

অর্থ: হে বিশ্ববাসীগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তাঁর আদেশ শ্রবণের পর তা অমান্য করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা।[১২৮]

এতে রাসূলের আনুগত্য অনুসরণের আদেশ সুস্পষ্ট। প্রথমে অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দান করা হয়েছে। সেই সাথে রাসূলে কারীম (সা.)-এর প্রতিও আনুগত্য করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

অর্থ: বলুন (হে নবী!) তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকারী, দয়াশীল।[১২৯]

আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার অনিবার্য দাবি ও বাস্তব শর্ত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ করে চলা। আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার উপায় হচ্ছে রাসূলে কারীম (সা.)-কে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ না করলে আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর নিকট থেকে গুনাহ মার্জনা লাভ করা সম্ভব নয়। এমনকি এ ব্যতীত মানুষ ঈমানদারই হতে পারে না, মুসলিমও থাকতে পারে না; বরং কাফির হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ–

অর্থ: বলুন (হে নবী!) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলো, যদি তা না করো তবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।[১৩০]

---

১২৬. আল-কুরআন, ৩৩: ২১
১২৭. আল-কুরআন, ৪: ৬৪
১২৮. আল-কুরআন, ৮: ২০
১২৯. আল-কুরআন, ৩: ৩১
১৩০. আল-কুরআন, ৩: ৩২

এ আয়াতেও আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহর এবং সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। ফলে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করলেই যথেষ্ট হবে না, রাসূলুল্লাহ (সা)-এরও আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য না করলে মানুষ যেমন কাফির হয়ে যায়, তেমনি রাসূলের আনুগত্য না করলেও মানুষ কাফির হয়ে যায়। এটা কুরআনেরই কথা।

অপরদিকে কুরআনুল কারীমে ইবাদতের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। হাদীসে এসেছে তার ব্যাখ্যা, রাসূলের বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে। যেমন সালাত, যাকাত ইত্যাদি। এ ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবহারিক ওচারিত্রিক ইত্যাদি বিষয়াদিও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে হাদীসে। তাই মানব জীবনে রয়েছে হাদীসের অপরিসীমগুরুত্ব।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করে তা বর্জন কর।[১৩১]আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল।[১৩২] তাই কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রধান মাধ্যম হলো হাদীস এবং হাদীসই হলো কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যা। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শকে অনুসরণ করার অর্থই হলো তাঁর রেখে যাওয়া হাদীসসমূহকে মানব জীবনেরসার্বিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা।

নিম্নে মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক নিচে আলোকপাত করা হলো-

**ব্যক্তি জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শ মানুষের ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট সমাধান পেশ করে। মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও লক্ষ্য নির্ধারণের ওপর নির্ভর করে তার জীবনের শান্তি, উন্নতি আর মুক্তি। হাদীস মানুষের সে সব বিষয়ের পুঙ্খানপুঙ্খ সমাধান বলে দেয়। শিরক, বিদআত, অবিশ্বাস, কপটতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা রয়েছে হাদীসে। সর্বপ্রকার অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ জীবনাচারের প্রতি পবিত্র হাদীস ব্যক্তিকে আহবান জানায়। অপরদিকে ব্যক্তিজীবনে মানবের দেহ-মন ও আত্মার সমন্বয় সাধন না হলে ব্যক্তি জীবন সমস্যা সংকুল ও বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। আর মানুষের মন ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার বিধান পাওয়া যায় হাদীসের মধ্যে।

**পারিবারিক জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** সামাজিক জীবনের প্রাথমিক সংঘ হচ্ছে পরিবার। পরিবার ব্যবস্থা ছাড়া সভ্যতা মূল্যহীন। পরিবার গঠন, পরিচালনা,বিয়ে, তালাক, সন্তানের ভরণ-পোষণ, লালন-পালন, শিক্ষাদান ইত্যাদি পরিবারের দায়িত্ব। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধানহাদীসে দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণ, ব্যভিচার, লীভ-টুগেদার, গোপন অভিসার, সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি, বহুগামিতা,অমতাচার ইত্যাদির ন্যায় সামাজিক অভিশাপ থেকে পারিবারিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় দূর্গের মত মানুষকে মুক্ত রাখে। আর এসবকিছুর পরিপূর্ণ রূপরেখা হাদীসে এসেছে।
সামাজিক জীবনে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে রয়েছে অগণিত সমস্যা। পবিত্র কুরআন সামাজিক বন্ধনের মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। আর হাদীসে এসেছে সমাজ জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলী। প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো হাদীসের মাধ্যমে আমরাপেয়ে থাকি। সমাজের বন্ধন, গঠন, উন্নয়ন, উৎকর্ষতা ও শৃঙ্খলা বিধান কিভাবে করতে হয় এবং সমাজের ভাঙ্গনরোধ, অন্যায় অত্যাচার, অসামাজিক কার্যাবলীর ক্ষতিকর প্রভাব ও এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় সবই হাদীসে এসেছে।

সমাজের বিভিন্ন মানুষের অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, নাগরিক সকলের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে, তার সবকিছু হাদীসে এসেছে।[১৩৩]

**রাজনৈতিক জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** দুনিয়ায় অশান্তির মূল কারণ মানুষের মনগড়া আইন ও দুর্নীতিবাজ লোকের শাসন। এজন্য আল্লাহর আইন ওসৎ লোকের শাসন ছাড়া মানুষের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ

---

১৩১. আল-কুরআন, ৫৯: ৭
১৩২. আল-কুরআন, ১৬: ৪৪
১৩৩. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*-এর ভূমিকা (থেকে উদ্ধৃত)

(সা.) আল্লাহর আইন ও সৎমানুষের শাসন কায়েমের বাস্তব উদাহরণ পেশ করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা রাজনীতির সকল খুঁটিনাটিবিষয় হাদীসের মাধ্যমে পাই। পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে-

فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْنَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا–

অর্থ: আপনার প্রতিপালকের শপথ! লোকেরা কিছুতেই মু'মিন হতে পারবে না যদি না তারা আপনাকে (নবীকে) তাদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী স্বীকার করে। আপনার ফায়সালা সম্পর্কে মনে প্রশান্তি বোধ করে এবং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়।[১৩৪]

**অর্থনৈতিক জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** বস্তুবাদী সভ্যতা অর্থনীতিকে মূল সমস্যা মনে করে। কিন্তু ইসলাম এটাকে বড় বা প্রধান সমস্যা মনে করে না তবে অন্যতম সমস্যা বলে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বাস্তবধর্মী এক সুষম অর্থনীতি পেশ করেছেন, যা সর্বজনীন ও কালজয়ী। তিনিযাকাত, উশর, খারাজ, ফাই, গনীমত, সাদাক, জিযিয়া, ব্যবসায় বাণিজ্য নীতি, কৃষিব্যবস্থা এবং অন্যান্য কর ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি আদর্শ ও শোষণহীন অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন। আমরা হাদীসের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বিবরণ পেয়েথাকি।

**শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** মানুষের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক জীবনেও হাদীসের রয়েছে সুষ্ঠু ও পরিশীলিত-মার্জিত মূল্যবোধ ভিত্তিক প্রগতিশীলচিন্তাধারা। শিক্ষাকে সকল নারী-পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাওহীদ ভিত্তিক পরিচ্ছন্ন পূত:পবিত্র সংস্কৃতিচর্চার প্রতি উৎসাহিত করেছে ইসলাম। আর এ সব কিছুর বিধান আমরা হাদীসে পাই।

**রাষ্ট্রীয় জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** সমাজের বৃহত্তর অঙ্গন হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানের সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ অবকাঠামো হাদীসে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপকার ও মডেল। রাজনীতি হচ্ছে রাজার নীতি, রাজ্যশাসন নীতি, নীতির রাজা ও উত্তম নীতি। তাই মহানবী (সা.)-এর রাজনীতি ছিল সর্বোত্তম নীতি। শাসক, প্রজা, কর্মচারী,কর্মকর্তা, শাসনকর্তা, প্রত্যেকের কী কী দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার আছে তা হাদীসে সুস্পষ্ঠভাবে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদীন হাতে-কলমে তা রূপায়িত করে দেখিয়েছেন।

**আন্তর্জাতিক জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** মানব সমাজের বৃহত্তম অঙ্গন হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। মানুষ এ নিখিল বিশ্ব পরিবারের একজন সদস্য। তাই পৃথিবীতেমানুষের কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, দেশ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির লোক। তাদের সাথে কীআচরণ করতে হবে তার বিবরণ আমরা রাসূলের (সা.) হাদীসে পাই। অন্য জাতির সাথে সন্ধি, সম্পর্ক, যুদ্ধ, চুক্তি, কুটনীতি সবকিছুর রূপরেখা হাদীসে পেয়ে থাকি।
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা মুসলমাদেরপারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী করে পাঠিয়েছেন।

**জ্ঞান-বিজ্ঞানে হাদীসের গুরুত্ব:** মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের ২টি সূত্র রয়েছে। প্রথমত মানবীয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথা বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চিন্তা ও গবেষণা। এর দ্বারা বস্তুজগতের সংগৃহীত তথ্যভিত্তিক জ্ঞান নিছক ধারণাও অনুমাণ প্রসূত। আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারা ও মতাদর্শ তাই চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত।দ্বিতীয়ত বস্তুজগতের উর্ধ্বে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উৎস তথা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। আর হাদীস এক প্রকার ওহী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) লিখেন, "ইলমে হাদীস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদীসেসর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন বিধৃত। বস্তুত ইহা অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ, যেমন সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ শশী। যে এর অনুসারী হবে ও আয়ত্ব করবে, সে সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং বিপুলায়তনকল্যাণের ফল্গুধারা লাভ করবে।[১৩৫]

**ঐতিহাসিক দলীল হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব:** হাদীস ইসলামের প্রামাণ্য উৎস। এর পর্যালোচনা, সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চেতনার উন্মেষ ঘটে। হাদীসবর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তির জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদঘাটন করতে গিয়ে

১৩৪. আল-কুরআন, ৪: ৬৫
১৩৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

বিপুলায়তন নতুন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস গড়ে ওঠেছে। হাদীসের মাধ্যমে সমকালীন আরবসহ সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি ও জীবনযাত্রার তথ্য মিলে। এছাড়াও পৃথিবীর আদি ইতিহাসের অনেক নির্ভুল-সঠিক তথ্যও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

**ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে হাদীসের গুরুত্ব:** মানুষ কেবল দেহ সর্বস্ব জীব নয়। মানুষের রয়েছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাসমূহের নির্ভুল ও সঠিক সমাধান হাদীসে রাসূলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। কিভাবে আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করা যায় তার নির্ভেজাল উদাহরণ ও বাস্তবতা হাদীসেই রয়েছে। এক্ষেত্রে কারও মনগড়া ব্যাখ্যা বা পদ্ধতির জন্য কারো কাছে মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

সবেশেষে বলা যায়, হাদীস ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। মানব জীবন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তার সব কিছুর মূলনীতি আল-কুরআনে আছে। আর হাদীসে তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। হাদীস কেবল মহানবীর (সা.) জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয়; বরং এটা তাঁর সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলীল। মানুষের ইবাদত-বন্দেগীর নিয়মনীতি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সব কিছুর দিকনির্দেশনা, আইন-কানুন হাদীসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে এবং জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে হাদীসের শিক্ষা ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে আমরা কল্যাণময় জীবন ও সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

# তৃতীয় অধ্যায়

## চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান


| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, প্রকারভেদ এবং ঔষধ প্রয়োগ |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিভিন্ন মনীষীদের অবদান |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান |

## প্রথম পরিচ্ছেদ: চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, প্রকারভেদ এবং ঔষধ প্রয়োগ

একবিংশ শতাব্দীর চরম উৎকর্ষতার মাধ্যম হলোবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অব্যাহত অভিযাত্রা দুনিয়ার মানুষকে দিয়েছে অনেক বিস্ময়কর উপহার। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা মানব সভ্যতাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়ে জীবনকে করেছে সহজ থেকে সহজতর। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই বিজ্ঞান মানুষকে পর্যায়ক্রমে উপকার পৌঁছিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে আগুন, এরপর চাকা এমনিভাবে আজকের সবচেয়ে বিস্ময়কর কম্পিউটার আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার অগ্রসরতা এগিয়েছে বিজ্ঞানের হাত ধরেই এবং বিজ্ঞানের অগ্রসরতার চাকা বহুদূর বহুবার ঘুরে পৃথিবীকে দিয়েছে অবভানীয় পরিবর্তনের বিস্ময়কর স্বাদ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সমোজ্জ্বলতার সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্রও নব নব থিওরীতে সমৃদ্ধতা লাভ করে মানুষকে সুস্থ রাখতে অভাবনীয় সুফল পৌঁছিয়েছে। মানুষের যে কয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে তার মধ্যে চিকিৎসা হলো অন্যতম। চিকিৎসা বিজ্ঞান সবসময়ই পরম বন্ধুরন্যায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এর কল্যাণে মানুষ মুক্তি পেয়েছে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে।নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা, প্রকারভেদ এবং ঔষধ প্রয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো-

### চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা

চিকিৎসা হলো রোগ নিরাময়ের নিমিত্ত গৃহীত ব্যবস্থাদি, ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্রোপচার ইত্যাদি দ্বারা রোগ দূরীকরণের চেষ্টা।[১] ইংরেজিতে একেthe art of healing a diseaseবলা হয়।[২]আরবীতে একে **طب** (তিব্ব) বলা হয়।[৩] আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিব্ব (**طب**) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, দয়া, যত্ন, চিকিৎসা ও যাদু ইত্যাদি। এজন্যই যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে মতবূব (**مطبوب**) বলা হয়।[৪] উল্লেখ্য, মেডিসিন শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন ভাষার শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে ‘the medical art’ বা চিকিৎসা কলা।সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ইংরেজিতে medicalscience বলা হয়।

আর চিকিৎসা বিজ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্র হলো রোগ উপশমের বিজ্ঞান কলা বা শৈলী। মানব শরীর এবং মানব স্বাস্থ্য ভালো রাখার উদ্দেশ্যে রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতিষেধক বিষয়ে অধ্যয়ন করে জ্ঞান আহরণ করা এবং প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে তা থেকে উপকার লাভ করা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় ইবনে সিনা বলেন- Medicine is the science by which we learn the various states of the body; in health, when not in health; the means by which health is likely to be lost; and when lost, is likely to be restored. In other words, it is the art whereby health is concerned and the art by which it is restored after being lost.

অর্থ: চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যদ্বারা আমরা শরীরের বিভিন্ন অবস্থার কথা জানতে পারি; সুস্থতায়, অসুস্থতায় কী কারণে কারো স্বাস্থ্যহানী ঘটে এবং কখন ঘটে। অন্যভাবে বলা যায়- এটি হলো এমন শিল্প, যা স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তা করে এবং যে শিল্পের সাহায্যে স্বাস্থ্যহানীতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।[৫]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০২ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৪১৪

২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশেনারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ২০০৫ (২১তম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৯৮

৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী: ২০০৫(প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৫৩৬

৪. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা*, ঢাকা: সা'দ প্রকাশনী, মিরপুর-১, জুলাই ২০০৯,পৃ. ২১

৫. Howell, Trevor H, "*Avicenna and His Regimen of Old Age*". Age and Ageing. 16(1): 58–59. doi:10.1093/ageing/16.1.58. PMID 3551552.(থেকে উদ্ধৃত)

অনেকে বলেন, চিকিৎসা বলতে শারীরিক বা মানসিক রোগ, বিকার বা বৈকল্যে আক্রান্ত কিংবা শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নতি করা, রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিংবা ভবিষৎ রোগ প্রতিরোধ করার লক্ষে পদ্ধতিভিত্তিক সেবা, পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। ইংরেজিতে যাকে Medical treatmentবলা হয়।[৬]

কেউ কেউ বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical science) ঐ বিদ্যাকে বলা হয়, যা শিখলে কোনো প্রাণীর অসুস্থার কারণ ও তা থেকে বাঁচার উপায়-উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।[৭]

উল্লেখ্য আধুনিক বিশ্বে রোগতত্ত্বের বায়োমেডিক্যালে বলা হয়-

Diseaes can be defined as a derangement of normal function that can be described in biochemical or structural terms, detected by objective measurements and that can be approved by appropriate chemical or surgical intervention.

অর্থ: রোগ হলো শরীরবৃত্তের সাধারণ কার্যকলাপের বিশৃংখলরূপ যা জৈবিক ও কাঠামোগত পদে বর্ণনা করা যায় এবং বিষয়গত পরিমাপেরচিহ্নিত করা যায়। রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে থাকি, যা আমাদের যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায় এবং নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এতে করে আমরা স্বাস্থ্যের প্রতি আরো বেশি যত্নবান হয়ে উঠি।[৮]

**চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য**

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং ভগ্ন ও রূগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা।[৯] তাই চিকিৎসক বা ডাক্তার হলেন এক ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদায়ক, যার পেশা হলো শারীরিক বা মানসিক রোগ, আঘাত বা বিকারের নিরীক্ষণ, নির্ণয় ও নিরাময়ের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রাখা বা পুনর্বহাল করা। এছাড়া সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন, গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে ঔষধ বা শল্য চিকিৎসার দ্বারা রোগ নিরাময় করার চেষ্টা করা হয়।

**চিকিৎসার প্রকারভেদ**

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী চিকিৎসাকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো যথাক্রমে:

(১) আরোগ্যমূলক/নিরাময়মূলক/প্রতিকারমূলক/সক্রিয় চিকিৎসা (Curative or Therapeutic).

(২) প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (Prophylatic).

(৩) উপশমমূলক চিকিৎসা (Palliative).[১০]

**আরোগ্যমূলক চিকিৎসা**

রোগ বা বিকার নির্ণয়ের পরে রোগীর লক্ষ্য থাকে হৃতস্বাস্থ্য শতভাগ ফেরত পাওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সেরে ওঠা। অনেক রোগের ক্ষেত্রেই চিকিৎসার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সফল হওয়া সম্ভব হয়। এ ধরনের চিকিৎসাকে আরোগ্যমূলক চিকিৎসা বলে। সমার্থকভাবে এটি প্রতিকারমূলক চিকিৎসা, নিরাময়িক বা নিরাময়মূলকঅথবা সক্রিয় চিকিৎসা বলা হয়। ইংরেজিতে একে ‘থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্ট’ (Therapeutic treatment) বা সংক্ষেপে ‘থেরাপি’ (Therapy), ‘কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট’ (Curative treatment) বা সংক্ষেপে ‘কিউর’ (Cure), অথবা ‘অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট’ (Active treatment) বলা হয়। মূলত তিন ধরনের আরোগ্যমূলক চিকিৎসা বিদ্যমান। এগুলো হলো ঔষধ সেবন বা গ্রহণ, শল্যচিকিৎসা এবং অঙ্গসঞ্চালন চিকিৎসা।

---

৬. *Medical treatment beyond first, University of Wisconsin System.*(থেকে উদ্ধৃত)

৭. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৮ . তারেক বিন আতিক, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, (প্রবন্ধ: রোগ নিরাময়ে ইসলাম নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা), *ঢাকা:* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০১৪ ,সংখ্যা ৮-৯ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ ও জানুয়ারি-জুন ২০১৪, পৃ. ১১৯, ১২০

৯. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*, লেবানন: বৈরুত, দারু ইহয়াহ আত্-তুরাস আল-‘আরাবি, ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ), চিকিৎসা অধ্যায়, খ. ৪, পৃ. ২৯২

১০. *Mosby’s Pocket Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions, Elsevier Health Sciences,* 2009, P. 1375

**ঔষধ সেবন:** বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরোগ্যমূলক চিকিৎসাতে ঔষধকে সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে ব্যাকটেরিয়ারোধক ঔষধ বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রদান করা হয়। অতিপ্রতিক্রিয়া বা অ্যালার্জি হলে সেই প্রতিক্রিয়াকে দূর করতে হিস্টামিনরোধক (অ্যান্টিহিস্টামিন) রোগীর দেহে প্রয়োগ করা হয়। এসব ঔষুধ মুখ দিয়ে গলধকরণ করা হয় বা দৃশ্যমান দেহ এলাকার উপরে প্রলেপের মতো প্রয়োগ করা হয় অথবা সূচিপ্রয়োগের মাধ্যমে রক্তে বা পেশীতে প্রবেশ করানো হয়।

**শল্যচিকিৎসা:** প্রাচীন ভারতে শল্য বলতে অস্ত্র বোঝাতো। তাই সার্জারিকে বলা হতো শল্যতন্ত্র। সুতরাং যে প্রক্রিয়ায় অস্ত্রের সাহায্যে মানব দেহের যাবতীয় রোগ বা কষ্ট দূরীভূত করা হয় তাই শল্য চিকিৎসা।[১১]শল্যচিকিৎসা রোগ থেকে সরাসরি আরোগ্য প্রদান করে না। সাধারণত শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে দেহের নির্দিষ্ট অসুস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটিকে মেরামত করা হয় কিংবা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করা হয়। এরপর দেহ নিজে নিজেই আরোগ্য লাভ করে। একারণে শল্যচিকিৎসাকে এক ধরনের আরোগ্যমূলক চিকিৎসা বলা হয়। দেহের কোনোও অবাঞ্ছিত কলা কেটে ফেলা (যেমন- অ্যাপেন্ডিক্স), কোলেস্টেরল জমে বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃৎপেশী ধমনীতে ঢুকে সেটির আয়তন বৃদ্ধি করা, ভেঙ্গে যাওয়া হাড় একই রেখায় নিয়ে আসা ইত্যাদি কিছু মেরামতমূলক শল্যচিকিৎসার উদাহরণ।

**অঙ্গসঞ্চালন চিকিৎসা:** দেহের পেশী বা অন্যান্য অংশ যদি পীড়নের শিকার হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেগুলোকে শারীরিক অনুশীলন ও নড়াচড়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আরোগ্য অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। এক্ষেত্রে ধৈর্য ও সময়ের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ।[১২]

### প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে কোনো রোগ থেকে ব্যক্তিকে সুরক্ষা বা প্রতিরক্ষা প্রদান করা। একে ইংরেজিতে Preventive treatment বা Prophylactictreatmentবলে। যেমন- টিকা, বংশাণুভিত্তিক চিকিৎসা, দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি পালন, নির্দিষ্ট পথ্য গ্রহণ ইত্যাদি।

টিকার মাধ্যমে দেহে অনেকগুলো ঘাতক বা গুরুতর ক্ষতি সৃষ্টিকারী রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। টিকাতে সাধারণত মৃত বা দুর্বল জীবাণু দেহে প্রবেশ করানো হয়, যাতে দেহের অনাক্রম্যতন্ত্র সেগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে ঐ একই জীবাণু দেহকে আক্রমণ করলে সেগুলোর বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

আধুনিক যুগে ব্যক্তিমাফিক চিকিৎসাতে একজন ব্যক্তি তার বংশভিত্তিক সঙ্কেত পর্যালোচনা করতে পারে এবং বিশেষ কোনো বংশাণু বা জিনের কারণে তার মধ্যে কোনো বংশবাহিত রোগ হবার জোরালো সম্ভাবনা থাকলে সে বিষয়ে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে। যেমন- কিছু মহিলার দেহে স্তন ক্যান্সার হওয়ার বংশাণু উপস্থিত থাকে এবং তারা প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্তনের সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ দেহকলা শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে কেটে ফেলে দিতে পারে।

দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা (যেমন- গোসল করা, দাঁত মাজা), পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ (যেমন- অস্থি সুস্থ রাখার জন্য ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার গ্রহণ), ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য পরিহার (যেমন- বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য গবাদি পশুর গোসত না খাওয়া), নিয়মিত শরীরচর্চা করা, সঠিক সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ইত্যাদিও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যায়।[১৩]

### প্রশমনমূলক চিকিৎসা

প্রশমনমূলক চিকিৎসা বা উপশমমূলক চিকিৎসা বলতে রোগের উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসাকে বোঝায়। যার অপর নাম হলো সহায়ক চিকিৎসা।এটি রোগের মূল কারণ দূর করে না, বরং রোগের বাহ্যিক উপসর্গগুলোকে প্রশমন বা উপশম করে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে। সর্বাত্মক ও বহুমুখী-নিয়মানুবর্তিতামূলক অভিগমনে গুরুতর অসুস্থ মানুষের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়। এতে ব্যথানাশক ঔষধ, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্নায়ুতে ব্যথা উদ্রেককারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা টিউমার

১১.আফরোজা চৌধুরী, *https://bn.quora.com/* “শল্য চিকিৎসা কী”? ২০১৮ (থেকে উদ্ধৃত)
১২. *https://bn.wikipedia.org/*(থেকে উদ্ধৃত)
১৩. *https://bn.wikipedia.org/*(থেকে উদ্ধৃত)

অপসারণ, পথ্য, মালিশ, মানসিক সাহচর্য ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে প্রশমনমূলক চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে রোগীর জীবনযাপন অধিকতর সহজ ও আরামদায়ক হয়।

বিশেষ করে ক্যান্সার, ফুসফুসের রোগ,ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, যকৃতের রোগ বা অন্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা থেকেমানুষকে মুক্ত করার জন্য প্রশমন সেবার প্রয়োজন হয়। আর ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সবচেয়ে বড় ওষুধই হলো প্রশমনমূলক সেবা। যা ক্যান্সারের যন্ত্রণা অনেকাংশে প্রশমিত হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা বা উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন- প্রচন্ড ব্যথা বা অসহ্য যন্ত্রনা। প্রশমনমূলক সেবায় ক্যান্সারের চিকিৎসার পাশাপাশি ঔষধ দিয়ে প্রচন্ড ব্যথা বা অসহ্য যন্ত্রণা, অসুস্থতাজনিত কষ্ট ও ভোগান্তি প্রশমন করা হয়। প্রশমনমূলক সেবা ও নির্ধারিত চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। তবে রোগ শনাক্ত হওয়ার পরপরই প্রশমনমূলক সেবা শুরু করা দরকার। কিছু ক্ষেত্রে জীবনের শেষ সময়ে এ সেবাই একমাত্র চিকিৎসা হয়ে দাঁড়ায়। এ সেবার মূল উদ্দেশ্য হলো, রোগীর জীবনের মান বাড়ানো।[১৪]

সুতরাং এ সেবার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য আছে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রশমনমূলক সেবা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে এবং জীবনের শেষ সময়ে চিকিৎসা খরচ কমায়। অক্টোবর মাসের ২য় শনিবার বিশ্ব হসপিস ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস উদযাপন করা হয়।[১৫] তাই প্রশমনমূলক সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব সেবাসদন ও প্রশমনমূলক সেবা দিবস আয়োজিত হয়। বিশ্ব সেবাদান ও প্রশমনমূলক সেবা মৈত্রী (World Hospice and Palliative Care Alliance) প্রতিবছর এ দিবসটির আয়োজন করে।[১৬]

তাই কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভোগা রোগীদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য ও সামগ্রিকভাবে তাদের স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে, দ্রুততার সাথে ও কার্যকরভাবে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ জনসমষ্টির মধ্যে দীর্ঘয়োদী রোগগুলোকে শুরুতেই শনাক্ত করা এবং পরবর্তীতে প্রতিরোধমূলক, নিরাময়মূলক ও উপশমমূলক চিকিৎসার সম্মিলন ঘটিয়ে এইসব রোগের বিরূপ প্রভাবগুলোকে প্রতিরোধ করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখাকে রোগ ব্যবস্থাপনা বোঝায়। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবায় কর্মরত বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশাদারী একটি দল সম্মিলিতভাবে রোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। এছাড়া রোগী যাতে নিজেই নিজের সেবা নিশ্চিত করতে পারে, সে ব্যাপারেও তাকে উৎসাহ ও সমর্থন দেয়া হয়। এমনিভাবে মুমূর্ষু ও অন্তিম দশার রোগী তথা মরণাপন্ন রোগীর জীবন সায়াহ্নেতাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদার দেখভাল করার পাশাপাশি তাদের ব্যথা ও যন্ত্রণা হ্রাস করার মাধ্যমে আরাম ও জীবনের মান বৃদ্ধি করার অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
এছাড়া রোগ ব্যবস্থাপনা ও মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। অনেক সময় একই সাথে একাধিক শ্রেণির চিকিৎসা রোগীর ওপর প্রয়োগ করা যায়। সেক্ষেত্রে একটিকে মূল চিকিৎসা (Primary treatment) এবং অন্যগুলোকে সহায়ক চিকিৎসা (Adjuvant treatment) বলা হয়।

আবার পন্থা বা পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসাকে কয়েকটি প্রকারে ভাগ করা যায়। যেমন- ঔষধভিত্তিক চিকিৎসা (Pharmaceutic), শল্য চিকিৎসা (Surgical) এবং সহায়ক চিকিৎসা (Supportive).

আবার দর্শন বা প্রচলন অনুযায়ী চিকিৎসাকে দু'টি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়। এগুলো হলো: মূলধারার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং বিকল্প ধারার চিকিৎসা। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত মুলধারার আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি হলো, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা। একে অনেক সময় 'অ্যালোপ্যাথি' নামেও ডাকা হয়। ২০শ শতক থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক চিকিৎসার বিকাশ ঘটে। এর সম্পূরক হিসেবে কিছু বিকল্প ধারার চিকিৎসাপদ্ধতিও বিদ্যমান। যেমন- হোমিও চিকিৎসা, আয়ুর্বেদী চিকিৎসা, ইউনানি চিকিৎসা, ভেষজ চিকিৎসা, যোগবায়াম, ঐতিহ্যবাহী চৈনিক

১৪. Derek Doyle, Nathan Cherny. *Oxford Textbook of Palliative Medicine.Oxford University Press*, 2005. (থেকে উদ্ধৃত)
১৫. Ann M. Berger, John L. Shuster, Jamie H. Von Roenn. *Principles and Practice of Palliative Carw and Supportive Oncology*. Lippincott Williams &Wilkins, 2007. (থেকে উদ্ধৃত)
১৬.*www.national-awareness-days.com/world-hospice and palliative*. Accwssed on 28 October 2014. (থেকে উদ্ধৃত)

চিকিৎসা (আকুপাংচার, আকুপ্রেশার ইত্যাদি), অস্থিসন্ধি সঞ্চালন চিকিৎসা (Osteopathy), মেরুদণ্ড সঞ্চালন চিকিৎসা (Chiropractic), অবগাহন চিকিৎসা (Balneotherapy) ইত্যাদি।[১৭]

**চিকিৎসা বিজ্ঞানের শাখা**

চিকিৎসাবিদ্যা অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত। এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক বা বেসিক, প্যারাক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল। প্রাথমিক শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে এনাটমী বা অঙ্গস্থানতত্ত্ব, ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব, বায়োকেমিস্ট্রি বা প্রাণরসায়ন ইত্যাদি।

প্যারাক্লিনিক্যাল শাখার মধ্যে অণুজীববিদ্যা, রোগতত্ত্ব বা প্যাথোলজি, ভেষজতত্ত্ব বা ফার্মাকোলজি অন্যতম। আর ক্লিনিক্যাল হলো প্রায়োগিক চিকিৎসাবিদ্যা। এর প্রধান দু'টি শাখা হল- মেডিসিন এবং শল্যচিকিৎসা বা সার্জারি। আরও আছে ধাতৃ ও স্ত্রীরোগবিদ্যা, শিশুরোগবিদ্যা বা পেডিয়াট্রিক্স, মনোরোগবিদ্যা বা সাইকিয়াট্রি, ইমেজিং ও রেডিওলোজি ইত্যাদি। এসবগুলোরই আবার বহু বিশেষায়িত্ব শাখা রয়েছে।

এনাটমি হচ্ছে জীবের শারীরিক কাঠামো নিয়ে অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা। তাছাড়া ম্যাক্রোস্কোপিক বা গ্রস এনাটমি, সায়োটোলজি এবং হিস্টোলজিও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু শাখার নাম উপস্থাপন করা হলো-

**জৈব রসায়ন:** জীবজন্তুর ক্ষেত্রে বিশেষ করে কাঠামোগত পদার্থের গঠন এবং কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করে।

**বায়োমেকানিকস:** বায়োমেকানিকস হলো যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা জৈবিক পদ্ধতির কাঠামো এবং ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা।

**বায়োস্ট্যাটিক্স:** বায়োস্ট্যাটিক্স হলো জীববিজ্ঞান-এর বিস্তৃত প্রয়োগ। বায়োস্ট্যাটিক্সের জ্ঞান চিকিৎসা গবেষণার পরিকল্পনা, মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যার জন্য অপরিহার্য। এটি মহামারীবিদ্যা এবং প্রমাণভিত্তিক ঔষধের জন্যও মৌলিক বিষয় হিসেবে কাজ করে।

**জীবজগত বিজ্ঞান:** এটি আন্ত:সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞান যা জৈবিক পদ্ধতিগুলো অধ্যয়ন করার জন্য পদার্থ বিজ্ঞান ও শারীরিক রসায়ন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকে।

**কোষবিদ্যা:** এটি পৃথক কোষগুলোর মাইক্রোস্কোপিক গবেষণা সংক্রান্ত বিদ্যা।

**ভ্রুণবিদ্যা:** এটি কী করে ভ্রুণের বিকাশ ঘটে তা নিয়ে গবেষণা সংক্রান্ত বিদ্যা। ১৮৮৫ সালে লুই পাস্তুর তার পরীক্ষাগারে ভ্রুণবিদ্যা নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছিলেন।

**এন্ডোক্রিরোলজি:** এটি হরমোন এবং পশুদের সমগ্র শরীর জুড়ে তাদের প্রভাব নিয়ে অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা।

**মহামারীবিদ্যা:** মহামারী রোগের প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা কাজে এই বিষয়টি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি শুধু মহামারী গবেষণা কাজের মধ্যেই সীমিত নয়।

**জেনেটিক্স:** জিন গবেষণা, জৈবিক উত্তরাধিকার এবং এদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

**হিস্টোলজি:** এটি আলোর মাইক্রোস্কোপি, ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি এবং ইমিউনোহিসটোম দ্বারা জৈবিক টিস্যু গঠনগুলোর অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা।

**ইমিউনোলজি:** ইমিউন সিস্টেম নিয়ে অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা, যা মানুষের মধ্যে সহজাত এবং অভিযোজিত ইমিউন সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করে।

**মাইক্রোবায়োলজি:** এটি প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি এবং ভাইরাসসহ সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা।

**স্নায়ুবিজ্ঞান:** এটি স্নায়ুতন্ত্রের গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানগুলোর অন্তর্ভুক্ত। স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মানব মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড। স্নায়ুবিদ্যা, নিউরো-সার্জারি এবং মানসিক রোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো স্নায়ুবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

---

১৭. আলমগীর আলম, *https://blog.bdnews24.com/alamgiralam/210632*, "আকুপ্রেশার-বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা", ২৩.০৩.২০১৭ (থেকে উদ্ধৃত)

**পুষ্টি বিজ্ঞান:** খাদ্য ও পানির সাথে স্বাস্থ্য, রোগের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। চিকিৎসা পুষ্টি থেরাপি মূলত ডায়েটিশিয়ান দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন রোগ যেমন ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ওযন এবং খাবার গ্রহণের মাধ্যমে যে রোগ হয়, এলার্জি, অপুষ্টি এবং নিউপ্লাস্টিক রোগের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

**প্যাথলজি:** এটি রোগের কারণ, কোর্স, অগ্রগতি ও এর রেজোল্যুশন নিয়ে গবেষণা সংক্রান্ত বিদ্যা।

**ফার্মাকোলজি:** এটি মূলত ড্রাগ ও এর কর্ম প্রণালী নিয়ে পর্যালোচনা করে।

**ফোটোবায়োলজি:** এটি বিকিরণ এবং জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ে অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা।

**শারীরবৃত্তীয়:** শরীরের সাধারণ কাজ এবং অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা সংক্রান্ত বিদ্যা।

**রেডিওবায়োলজি:** আয়নীকরণ, বিকিরণ এবং জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা সংক্রান্ত বিদ্যা।

**বিষক্রিয়া:** এটি ওষুধ এর বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক প্রভাব নিয়ে গবেষণা সংক্রান্ত বিদ্যা।[১৮]

## ঔষধ প্রয়োগ

ঔষধ বলতে আমরা বুঝি যার দ্বারা রোগ নাশ হয় বা প্রতিকার হয় এমন দ্রব্য, পীড়া ও ক্লেশ নিবারণকারী পদার্থ।[১৯] ইংরেজিতে that which cures a disease; medicine; drug.[২০]

Drugশব্দটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ 'drogue'থেকে উদ্ভূত বলে অনুমান করা হয়। এই শব্দটি থেকে পরবর্তীতে ওলন্দাজ ভাষায় 'droge-vate' শব্দটি আসে। এ শব্দটির অর্থ 'শুকনো পাত্র' যেখানে ঔষধি গাছ সংরক্ষিত থাকে। আর বাংলা ঔষধ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। এটি তৎসম শব্দ। ঔষধ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়: *ওষধি+অ(অণ্)*। তবে *ওষধি* শব্দটির অর্থ যে গাছ একবার ফল দিয়েই মারা যায়।[২১] তবে সংস্কৃতে শব্দটি প্রচলিত অর্থেই ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। যেমন যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার **১২** অধ্যায়ের ৮০ সংখ্যক সূক্তটিতে এর প্রমাণ মেলে-

"ওষধ: সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃনোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজানং পারয়ামাসি।"[২২]

সুতরাং ঔষধ বা ওষুধ হলো এমন রাসায়নিক দ্রব্য যা প্রয়োগে প্রাণী দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রভাবান্বিত হয় এবং যার দ্বারা রোগ নাশ হয় বা প্রতিকার হয় বা পীড়া ও ক্লেশ নিবারণ হয়; ভেষজ দাওয়াই এর অন্তর্ভুক্ত।[২৩]

যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (FDA) সংজ্ঞার্থ অনুসারে- দ্রব্যসমূহ যা রোগ নির্ণয়ে, আরোগ্য উপশমে প্রতিকারে অথবা প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় এবং দ্রব্যসমূহ (খাদ্য বাদে) যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর শারীরিক গঠন বা ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে, তাকে ঔষধ বলা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংজ্ঞার্থ অনুসারে- ঔষধ শব্দটির বিভিন্ন রকম ব্যবহার হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঔষধ এমন দ্রব্য যার আরোগ্য (cure) এবং প্রতিরোধের (prevention) ক্ষমতা আছে অথবা যা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। আবার ফার্মাকোলজিতে ঔষধ এমন রাসায়নিক দ্রব্য যা প্রাণীদের অথবা কলার জৈব রাসায়নিক এবং শারীরিক প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করতে সক্ষম ।

আবার সাধারণের মুখে ড্রাগ শব্দটির অর্থ অবৈধ দ্রব্য। যেমন: হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা, ইত্যাদি।[২৪]

---

১৮. *https://www.banglaquiz.in/* " বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা", আপডেট: ০৬.০৭.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)
*https://bn.wikipedia.org/wiki/* "চিকিৎসা বিজ্ঞান" (থেকে উদ্ধৃত)

১৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০২ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ২০৩

২০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশেনারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ২০০৫ (২১তম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৯৯

২১. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদক) "ঔ" *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী: ২০০৩, পৃ. ২০৩

২২. শিবকালী ভট্টাচার্য, *ভৈষজ্য দীক্ষার শ্রুতি পরম্পর*,কলকাতা:চিরঞ্জীব বনৌষধি, আইএসবিএন ৮১-৭০৬৬-৬০৬-৬

২৩. *"ঔ" বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*,প্রাগুক্ত

২৪. *https://bn.wikipedia.org/wiki/* "ঔষধ" (থেকে উদ্ধৃত)

রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধককেই সচরাচর ঔষধ হিসেবে অভিহিত করা হলেও প্রচলিত আইনে এর অর্থ ব্যাপকতর। যেমন, ব্রিটিশ আমলে প্রণীত এবং অদ্যাবধি বাংলাদেশের কার্যকর ১৯৪০ খিস্টাব্দের ড্রাগ অ্যাক্ট বা ঔষধ আইন অনুযায়ী ঔষধের আইনগত সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

ঔষধ বলতে ঐ সকল দ্রব্যকে বোঝায়, যা মানুষ বা প্রাণীর বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের প্রতিকারের, উপশমের অথবা প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়।[২৫]

## ঔষধ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষা

**Drug:** (ড্রাগ বা ঔষধ) যে কোন প্রাণীর রোগ নিরাময় স্বস্তি বা রোধ করার জন্য বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ ব্যবহার করার উপযোগী রাসায়নিক পদার্থকে ড্রাগ বলা হয়।

**Materia Medica**: (মেটাররিয়া মেডিকা) এটি একটি ফার্মকোলজীর শাখা, যা প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ঔষধের ভেষজ রসায়ন বা ফার্মেসীর ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে।

**Pharmacology:**(ফার্মাকোলজী) চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখা, ঔষধের শোষণ বা গ্রহণ নীতি এবং কার্য পদ্ধতিসহ দেহের স্বাস্থ্য ও রোগের জন্য ব্যবহৃত ঔষধের প্রস্তুতি গুণাগুণ কার্যাবলী, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি আলোচনা করে তাহাকে ফার্মাকোলজী বলে।

**Medicine:** (মেডিসিন) ব্যবহারের যথাযথ নির্দেশনাসহ সরবরাহকৃত এবং একটি যথার্থ ডোজ ও নিয়মানুসারে মিশ্রিত এক বা একাধিক ঔষধের মিশ্রণকে মেডিসিন বলা হয়।

**Pharmacy**: (ফার্মেসী বা ভেষজ রসায়ন) চিকিৎসা বিদ্যার যে শাখা রোগ চিকিৎসার জন্য যথার্থ নিয়ম সম্বলিত ঔষধের প্রস্তত প্রণালী ও সেবনের রসায়নবিদগন বিভিন্ন রোগের জন্য নানাররকম ঔষধের শিল্পোৎপাদন করেছেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ক্রয় এবং সেবন করা হয়।

**Toxicology:** (টক্সোকোলজী বা বিষ বিদ্যা) রোগ নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনাসহ ফার্মাকোলজীর সে শাখা অতিরিক্ত ঔষধ সেবনের অপ্রসূত ফলাফলে যে ক্রিয়া আশা করা হয়নি বা বিষক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে তাহাকে বিষ বিজ্ঞান বা টক্সোকোলজী বলা হয়।

**Pharmacopoeia:** (ফার্মকোপিয়া) ইহা ড্রাগের আইন ঘটিত শাস্ত্র, সাধাররণভাবে যে শাস্ত্র ঔষধের প্রস্তুতি, সনাক্তকরণ, উন্নয়ন বিশুদ্ধতা পরীক্ষা, মাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে, তাহাকে ফার্মাকোপিয়া বলা হয়।

**Pharmacist:** (ফার্মাসিষ্ট) ফার্মাসিষ্ট একজন চিকিৎসার সাথে জড়িত ব্যক্তি যিনি ডাক্তার চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী রোগীকে ঔষধ বিতরণ করে এবং ব্যবহারের পদ্ধতি বলিয়া থাকে ও জৈব মিশ্রিত করিয়া থাকে। যার ফার্মাকোলজী ও ফার্মাসিউটিকেলের ওপর বিশেষ জ্ঞান থাকে, তাকে ফার্মাসিষ্ট বলে।[২৬]

## ঔষধ সেবনের বিভিন্ন মাধ্যম

ঔষধ যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক না কেন তা সাধারণত শরীরের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে দেয়া হয়ে থাকে। এগুলোকে ঔষধের রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান (routes of administration) বলা হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুট হলো-

* মুখ (orall)
* পায়ু ও যোনিপথে সাপোজিটরি(rectall and vaginall as suppository)
* নি:শ্বাস(inhalation)
* জিহ্বার নিচে (sublingully)
* অনান্ত্রিক পথে (parenteral routes)
* আন্ত:ধমনী বোলাস (intravenous bolus)
* আন্ত:ধমনী ইনফিউশন (intravenous infusion)

---

২৫. ড. মো: শাহ এমরান, *ওষুধ বিজ্ঞান*, ঢাকা, শোভা প্রকাশ, আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০০৮৪-০০৮১-১

২৬. *https://www.holyworld.org/pharmacology/* "ঔষধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা" (থেকে উদ্ধৃত)

* আন্তঃপেশী (intramuscular)
* সাবকিউটেনিয়াস (subcutaneous)
* দেহের বাইরে বা ত্বকের ওপর (topically)

### ঔষধের সদ্ব্যবহার (rational use of drug)

ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর সদ্ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঔষধের সদ্ব্যবহার এমন এক চিকিৎসা ব্যবস্থা যা সাধারণ মৌলিক নীতির ওপরে ভিত্তি করে প্রদত্ত, যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়া, বিচক্ষণতা কিংবা সুস্থ চেতনার মাধ্যমে কোনো ঔষধের প্রয়োগ বা ব্যবহার। দু'টি সাধারণ শ্রেণির ঔষধের একটি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যটি যেসব ঔষধে নেশা হয়েথাকে। প্রথমটি একটি অপরিহার্য শ্রেণির ঔষধ যা সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েথাকে। আর দ্বিতীয়শ্রেণির ঔষধ যেগুলিকে অভ্যাস বা নেশা সৃষ্টিকারীরূপে গণ্য করা হয়। যদিও বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বিধিবদ্ধ করা একটি সমস্যা এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে অ্যান্টিবায়োটিকের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা অনস্বীকার্য। তথাপি এর সদ্ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। এতে রোগীর যেমন সচেতন থাকতে হবে, তেমনি ব্যবস্থাপত্র লেখতে গিয়ে ডাক্তারকেও সততার পরিচয় দিতে হবে। কারণ আমাদের ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র পদ্ধতি মোটেই আদর্শ নয়। তাঁরা বিভিন্ন ধরণের কোম্পানী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঔষধের সদ্ব্যবহার থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। এ বিষয়ে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

### ঔষধের অপব্যবহার

বর্তমানে দেশি-বিদেশি মিলে সরকার অনুমোদিত ওষুধ কারখানা রয়েছে ২৫২টি। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে ২৬৮টি ইউনানি, ২০১টি আয়ুর্বেদি, ৯টি হারবাল ও ৭৯টি হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।[২৭] কিন্তু বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ঔষধের অপব্যবহার খুবই উদ্বেগজনক। ওষুধের অপব্যবহার বলতে ওষুধের ওপর এমন এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতাকে বোঝায়, যাতে কোনো ওষুধ বারংবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেখা গেছে, প্রায় সকল প্রকার আসক্তি সৃষ্টিকারী ওষুধ মস্তিষ্কে অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন কিছু স্নায়ুগত সংকেত প্রেরণ করে থাকে, যা বারবার একই ওষুধ গ্রহণ করতে চায়। ওষুধের অপপ্রয়োগ সমাজের যেকোনো শ্রেণির মানুষদেরকে প্রভাবিত করে। বেশির ভাগ সময় নিজের অজান্তেই যুবক-যুবতীরা প্রেসক্রিপশন করা বা না করা ওষুধের প্রতি অথবা একটি অবৈধ আসক্তকারী ওষুধ জাতীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওষুধের অপব্যবহারের উপসর্গগুলি তিন রকমের হয়ে থাকে। যেমন- (ক) শারীরিক, (খ) আচরণগত ও (গ) জৈবিক।

**শারীরিক উপসর্গসমূহ:** বেশি ঘুমানো অথবা অনিদ্রাভাব, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, চোখের তারা প্রসারিত বা সংকোচিত হওয়া, দেহের ওযন হঠাৎ পরিবর্তন, বমি, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।

**আচরণগত লক্ষণসমূহ:** সামাজিক যোগাযোগ পরিবর্তন হওয়া, বিষণ্নতা, আক্রমণাত্মক ব্যবহার, বিরক্তি বেড়ে যাওয়া, একা থাকার ইচ্ছা, পরিবার পরিজনকে পরিহার করা ইত্যাদি।

**জৈবিক উপসর্গসমূহ:** লিভার সিরোসিস, হেপাটাইটিস, এইচআইভি সংক্রমণ, যক্ষ্মারোগ, মুখের ভেতর স্বাস্থ্যসম্বন্ধনীয় সমস্যা ইত্যাদি।

**ওষুধের অপব্যবহারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ:** অসৎ সঙ্গ, পরিবারের কেউ পূর্ব থেকেই মাদকাসক্ত হলে, অপব্যবহার করা যাবে এমন জিনিস একেবারেই কৈশোর অবস্থায় হাতে পাওয়া, একাকিত্ব ও বিষণ্নতা, পরিবার কর্তৃক সঠিক গাইড লাইন না পাওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, রাসায়নিক দিক থেকে ঔষধ একটি ক্রিয়াশীল পদার্থ।সুতরাং নির্দিষ্ট মাত্রায় ও নির্দিষ্ট রোগে তা ব্যবহৃত না হলে ঔষধই বিষে পরিণত হয়। যা একাধিক জীবনকেড়ে নিতে পারে। তাই ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে নেশায়পরিণত হয়এ ধরনের ঔষধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্রটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ব্যবস্থাপত্র ব্যতিরেকে নানা ঔষধ অপব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- জ্বর ও প্রদাহ উপশমকারী, প্রশান্তিদায়ক, বেদনানাশক, ঘুমের

---

২৭. *http://sangbad.net.bd/opinion/* "ওষুধের অপব্যবহার রোধ করা জরুরি", ২৩.০৪.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

বড়িএসব। ফেনসিডিল নামক একপ্রকার চেতনা হরণকারী ঔষধ যা মন, আচার-আচরণ বা মেজাজের ওপর ক্রিয়াশীল।[২৮]

### পথ্য হিসেবে ঔষধ

ঔষধ যদি কোনো রোগ নির্ণয়ে (diagnosis), আরোগ্যে (cure), প্রতিকারে (treatment) অথবা প্রতিরোধে (prevention) নির্দিষ্ট ডোসেজ ফরমে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে পথ্য বলা হয়।[২৯]

### ঔষধের বিনোদনমূলক ব্যবহার

ঔষধের বিনোদনমূলক ব্যবহার (recreation drug use) বলতে বোঝায়, ঔষধকে বিনোদনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা। কোনো নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যকে (controlled substance) কারো মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ বা পর্যবেক্ষণ ছাড়া ব্যবহার করা হলে সেটি তার বিনোদনমূলক ব্যবহার হবে।[৩০]সাধারণত অ্যালকোহল, নিকোটিন (তামাক), ক্যাফেইন (চা, কফি) এবং জাতিসংঘের সিংগেল কনভেনশন অফ নারিকোটিক ড্রাগস এবং কনভেনশন অফ সাইকোট্রপিক সাবস্টানসেস অন্তর্গত ঔষধসমূহের বিনোদনমূলক ব্যবহার রয়েছে।[৩১]

সাইকোফার্মাকলোজিস্ট রোনাল্ড কিথ সিয়েগেল অবশ্য একে তুলনা করেন মানুষের অপর তিনটি উদ্যমের সাথে। যথা: ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং আশ্রয়। তার মতে, এই ঔষধসমূহের প্রতি তীব্র এবং স্থায়ী আসক্তি এগুলোকে ব্যবহারকারীর কাছে খাদ্য, পানি এবং আবাস্থলের মতো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।[৩২]

### ঔষধের ক্রিয়া

ঔষধ জীবদেহের উপর কী ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা ফার্মাকোলজি আলোচনা করে। এখানে দেখানো হয়, বিভিন্ন মাত্রায় (dose) ঔষধ একাধারে রোগ নিরাময়কারী (therapeutic) আবার বিষাক্তও (toxic) হতে পারে। ফার্মাকোলজির দু'টি শাখা হলো-

**(১) ফার্মাকোকাইনেটিক্স:** এটিতে কোনো ঔষধের শোষণ (absorption), বিস্তৃতি (distribution), বিপাক (metabolism) এবং রেচনের (excretion) হার এবং পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[৩৩]

**(২) ফার্মাকোডিনামিক্স:** এটিতে কোনো ঔষধ শরীরে প্রবেশ করার পর তা কিভাবে শারীরিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৩৪]

### ঔষধ আইন

ঔষধের আমদানি, রপ্তানি, তৈরি, পরিবেশন, ক্রয়-বিক্রয় এ সংক্রান্ত আরো যতো কিছু আছে সবকিছুর জন্য সরকারিভাবে ঔষধ আইন রয়েছে। এ আইন সর্বপ্রথম ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৪০ সালের ১০ এপ্রিল প্রণীত হয়এবং

---

২৮. ডা. আয়ুশ পাণ্ডে, *https://www.myupchar.com/bn/disease/drug-abuse.* "ওষুধের অপব্যবহার", ০১.১২.২০১৮ (থেকে উদ্ধৃত)

২৯. *US Federal Food, Drug and Cosmetic Act*, SEC. 210.Accessed 17 August 2008.(থেকে উদ্ধৃত)

৩০. *http://dictionary.Reference.com/browse/drug.* (থেকে উদ্ধৃত)

৩১. *Lingeman, drugs from A-Z A Dictionary, penguim.* আইএসবিএন ০-৭১৩৯-০১৩৬-৫।

৩২. Siegel, Ronald. (2005). *Intoxication: The universal drive for mind-altering. Substances.* Vermont: Park Street Press. ISBN: 1-59477-069-7. (থেকে উদ্ধৃত)

৩৩. Kathleen knights: bronwen Bryant (2002). *Pharmacology for Health Professionals. Amsterdam: Elsevier.* ISBN: 0-7295-3664-5. (থেকে উদ্ধৃত)

৩৪. এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম, এ.এম. হারুন অর রশীদ, আমিনুল ইসলাম, অজয় রায়, সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, আবু জাফর মাহমুদ (সম্পাদক), *ফার্মাকোলজি*, বাংলা একাডেমী, বিজ্ঞান বিশ্বকোষ, তৃতীয় খণ্ড (প্রিন্ট), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৪৫, আইএসবিএন ৯৮৪-০৭-৪১৯৬।

পরবর্তীকালে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষাক্রমে সংশোধিত ও ১৯৫৭ সালের ২১ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। এটি বাংলাদেশে গৃহীত হয় ১৯৭৪ সালে।[৩৫]

এই আইন একদিকে দেশে নিম্নমানের ও ক্ষতিকর ঔষধের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য ঔষধের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে এটি দেশে নিম্নমানের বা ভেজাল ঔষধ তৈরি বন্ধের জন্য ঔষধ তৈরির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ঔষধ ক্রয়-বিক্রয়, মিশ্রণ, বিতরণ ও পরিবেশন বস্তুত বিশেষজ্ঞের কাজ বিধায়আইনে এমন বিধি আছে যাতে শুধু সুযোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

এ আইনে সরকার প্রদত্ত যথাযোগ্য অনুমোদিত লাইসেন্স বা পারমিটের মাধ্যমেই কেবল কোনো কোনো শ্রেণির ঔষধ আমদানি হয়ে থাকে। দেশে আমদানিকৃত সকল শ্রেণির ঔষধের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত মান এবং তফসিল নির্ধারিত লেবেল ও প্যাকিং অনুযায়ী মোড়কবদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক। সব শ্রেণির ঔষধ তৈরির এবং বিতরণ বা বিক্রয়ের জন্যও লাইসেন্স গ্রহণের বিধান আছে। এ আইনে বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ঔষধ পরিদর্শক দ্বারা লাইসেন্সকৃত স্থানসমূহে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে ঔষধ তৈরি বা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েথাকে। এছাড়া তৈরি বা বিক্রয়ে ঔষধসমূহের নমুনা সংগ্রহ, সেগুলিকে কেন্দ্রীয় ঔষধ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔষধের মানের ওপর নজরদারি রাখার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও ২০০৫ সালে ১৮ এপ্রিল প্রণীত 'জাতীয় ঔষধনীতি ২০০৫'-এ ঔষধ সংক্রান্ত অনেক নীতিমালা রয়েছে, যা সঠিকভাবে পালিত হলে রোগীর সুস্থতা লাভে সুফল বয়ে আনবে।[৩৬]

### চিকিৎসা জ্ঞান লাভের স্বীকৃত মাধ্যম

বিশ্বব্যাপী চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার বেশ কয়েক রকম পদ্ধতি আছে। সাধারণত মেডিকেল স্কুল বা কলেজগুলোতে শিক্ষা দেয়া হয়। একে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক ডিগ্রি হিসেবে এম.বি.বি.এস বা এম.ডি. প্রচলিত। প্রথমোক্ত ডিগ্রি যুক্তরাজ্যসহ কমনওয়েলথ দেশগুলোতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এম.ডি, ডিগ্রি যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো কয়েকটি দেশে প্রচলিত। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মধ্যে এম.আর.সি.পি; এফ,আর.সি.এ. ইত্যাদি বিভিন্ন মেম্বারশিপ ও ফেলোশিপ অন্যতম। বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে সম্মানজনক স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মধ্যে এফ.সি.পি.এস. অন্যতম, যা দেশগুলোর নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় 'কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এণ্ড সার্জনস' কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার মূল ক্ষেত্র মেডিকেল কলেজ। প্রতিবছর সরকারি ও বেসরকারি অনেকগুলো কলেজে প্রায় দশ হাজারের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে থাকে। পাঁচ বছর মেয়াদি পড়াশোনা শেষে স্নাতক হিসেবে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী লাভ করে। এরপর এক বছর শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। শিক্ষানবিশ শেষে 'বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল' এর রেজিস্টার্ড ডাক্তার হিসেবে চর্চা করতে পারেন।

---

৩৫ . *Bangladesh Laws* (Revision and Declarations) (Amendment) Act No. LIII of 1974
৩৬. *প্রাগুক্ত*

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিভিন্ন মনীষীদের অবদান

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস মানবেতিহাসের ন্যায় প্রাচীন। সুদূর অতীতে মানব প্রজাতির বিকাশের সাথে সাথেইচিকিৎসাবিদ্যাও বিকশিত হয়েছে। তবে তা এখনকার যুগের মতো এতো উন্নত, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ছিলো না। নিম্নে প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগের চিকিৎসা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থঅপন করা হলো-

## প্রাগৈতিহাসিক যুগে চিকিৎসা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে চিকিৎসা ব্যবস্থার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তখনকার মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর ছিল তা নি:সন্দেহে বলা যায়। তাই সে সময় বিজ্ঞানভিত্তিক বা বিজ্ঞানসম্মত কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায়মানুষনিজস্ব ধারণা অনুযায়ী রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন: গাছগাছড়া ওফলমূল তথা প্রকৃতি কেন্দ্রিক বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করতো।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঔষধ হিসেবে উদ্ভিদ (herbalism), পশুর দেহের বিভিন্ন অংশ এবং খনিজ পদার্থ ব্যবহার করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিত, shamans বা চিকিৎসকরা এই উপকরণগুলিকে ঐন্দ্রজালিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করতো। এক্ষেত্রে প্রাণবৈচিত্র (আত্মার অনিবার্য বস্তু সম্পর্কে ধারণা), আধ্যাত্মিকতা (দেবতাদের কাছে আপীল বা পূর্বপুরুষদের আত্মার সাথে আলাপ করা); Shamanism (রহস্যময় ক্ষমতার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচিতি) এবং ভবিষৎবাণী (যাদুর মাধ্যমে সত্যকে প্রাপ্তি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

## প্রাচীন যুগে চিকিৎসা

প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতির কাছে একেবারেই অসহায় ছিল। তখনকার দিনে চিকিৎসাও ছিল প্রকৃতি নির্ভর। মানুষ তখন প্রকৃতির গাছগাছড়া, লতাপাতা, দু'আ-কালাম, তাগাতুগা, তাবিজ, ঝাড়ফুক, পানিপড়া প্রভৃতির ওপর আস্থাশীল ছিল এবং অনেক জটিল রোগেও তারা এসব জিনিস দিয়ে চিকৎসা করাতো। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে মানুষ তখন জটিল রোগে মারা তো যেতই, এমনকি সাধারণ রোগ-শোকেও মারা যেতো। তখনকার যুগে এসব রোগ-শোককে ‘মড়ক’ বলা হতো। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতির মতো রোগেও শত শত এমনকি হাজার হাজার মানুষ মারা যেতো। নিম্নে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

## প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রাচীন মেসোপটেমীয়দের যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞান ও যাদুর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তাররা রসিকতা ও ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান উভয় যাদুকরী সূত্রকে নির্দেশ দিতেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম সহস্রাাব্দে ওষুধের প্রাচীনতম ব্যাবিলীয় গ্রন্থগুলো পুরাতন ব্যাবিলীয় সময়ের সাথে সম্পর্কিত। তবে সবচেয়ে ব্যাপক ব্যাবিলীয় চিকিৎসা পাঠটি হলো উম্মানু বা বোর্সপিয়ার প্রধান পণ্ডিত এসগিল-কিন-আপ্লি লিখিত ডায়াগনস্টিক হ্যান্ডবুক। ব্যাবিলের রাজা আদাদ-আপল্লা-আডিনা (১০৬৯-১০৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-এর শাসনামলে মিশরীয়দের পাশাপাশি ব্যাবিলীয়রা নির্ণয়, প্রগতি, শারীরিক পরীক্ষা এবং প্রতিকারের অভ্যাস প্রবর্তন করেছিল। উপরন্তু ডায়াগনস্টিক হ্যান্ডবুক থেরাপি এবং কারণ পদ্ধতি চালু। এই রোগের মধ্যে রোগীর লক্ষণগুলোর তালিকা এবং রোগ নির্ণয়ের সাথে রোগীর দেহে প্রদত্ত উপসর্গগুলো মিশ্রিত করার জন্য ব্যবহৃত লজিকাল নিয়মগুলোসহ বেশিরভাগ বিস্তারিত অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণের তালিকা রয়েছে।ডায়াগনস্টিক হ্যান্ডবুকটি রোগীর লক্ষণসমূহ পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন এবং অনুমানগুলোর একটি যৌক্তিক সেটের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। রোগীর রোগ, এর কারণ এবং ভবিষ্যত বিকাশ এবং এটির সম্ভাবনা নির্ধারণ করা।[৩৭]

প্রাচীন মেসোপটেমীয়রাও প্রফিল্যাক্সিস ব্যবহার করতেন এবং রোগের বিস্তাররোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এছাড়া তারা বিভিন্ন রকমের ঔষধি গাছ, গুল্ম, পশুজাত দ্রব্য এবং খনিজ পদার্থের ব্যবহার করতেন। মানসিক অসুস্থতা প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে সুপরিচিত ছিল। যেখানে রোগ এবং মানসিক রোগ নির্দিষ্ট দেবতা দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করা হয়। কারণ

৩৭. তপন চক্রবর্তী, *চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, অনুপম প্রকাশনী, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৭

একজন ব্যক্তির ওপর হাত প্রতীক হিসেবে মানসিক অসুস্থতা নির্দিষ্ট দেবতার 'হাত' বলে পরিচিত ছিল। এক মানসিক অসুস্থতা কাট ইস্তার নামে পরিচিত, যার অর্থ 'ইশতারের হাত'। অন্যরা 'শামশের হাত', 'ভূতের হাত' এবং 'ঈশ্বরের হাত' হিসেবে পরিচিত। তবে এই অসুস্থতার বিবরণগুলো এতটাই অস্পষ্ট যে এগুলো সাধারণত আধুনিক পরিভাষা অনুসারে নির্ধারণ করা অসম্ভব।[৩৮]

## প্রাচীন মিশরে চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রাচীন মিশর একটি বড় বৈচিত্রময় এবং ফলপ্রসূ চিকিৎসা ঐতিহ্য বিকশিত স্থান। সভ্য পৃথিবীতে চিকিৎসা ব্যবস্থার শুরু হয় আফ্রিকার গৌরব প্রাচীন মিশরের মাটিতে। আধুনিক যুগে Medical Care বলতে আমরা যা বুঝি এর গোড়াপত্তন হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ সালে। তবে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে সেটা ছিল অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রাচীন মিশরে রোগের কারণ হিসেবে মানুষ দেবতাদের অসন্তুষ্টিকে দায়ী করা হতো। মানুষের চোখের অগোচরে চলাফেরা করা অদৃশ্য আত্মারা বিভিন্ন কারণে শরীরের স্বাভাবিক বিকল করে দিত। যার কারণে মানুষ রোগে ভুগত এবং মহামারিতে আক্রান্ত হতো। গ্রামের পর গ্রাম মহামারীর প্রকোপে সাফ হয়ে যেতো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রদূত মিশর সভ্যতার বুদ্ধিজীবীগণ এই মহামারির হাত থেকে বেঁচে থাকতে গবেষণা শুরু করেন। তাদের গবেষণায় জন্ম নেয় মানব দেহের রহস্যময় 'চ্যানেল' তত্ত্ব। ইংরেজি চ্যানেল শব্দের অর্থ খাল। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের খাল খনন থেকে এই তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল বলে এরূপ নামকরণ করা হয়। ধারণা করা হতো মানুষের হৃদপিণ্ডের মোট ৪৬টি চ্যানেল রয়েছে। যখন অশুভ দেবতা বেহেদু তার ক্ষমতাবলে হৃদপিণ্ডের চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দেন, তখন মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। মিশরীয়দের মতে, মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক ছিলেন দেবতারা। থোথ নামক এক দেবতার আর্শীবাদে মানুষ গর্ভধারণ করে এবং বেস নামক আরেক দেবতার মাধ্যমে একজন নারী বাচ্চা প্রসব করে।

আপাততদৃষ্টিতে চ্যানেল তত্ত্ব অনেকটা ভুল মনে হলেও সভ্যতার অগ্রসরতায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একদম প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ রোগের কারণ হিসেবে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কারণকে দায়ী করলেও এই তত্ত্বের মাধ্যমে চিকিৎসকগণ রোগের সাথে মানব দেহের যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তাই চ্যানেল তত্ত্বকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম মাইলফলক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।[৩৯]

নতুন তত্ত্ব আবির্ভাবের সাথে তাল মিলিয়ে মিশরের চিকিৎসকের আসনে আসীন হন মিশরীয় কবিরাজগণ। এর পূর্বে চিকিৎসার কাজ করতেন মন্দিরের পুরোহিতগণ। একদিকে যেমন চিকিৎসকগণ মানব দেহের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছিলেন, অপরদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে অদ্ভুদ চিকিৎসা পদ্ধতির জন্ম হতে থাকে। মিশরের এক অঞ্চলে ডাক্তারগণ চিকিৎসার জন্য নীল নদের বৈদ্যুতিক মাছ ব্যবহার শুরু করেন। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, তৎকালীন মানুষরা মাছের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে যাদু হিসেবে দেখত। তাই বৈদ্যুতিক মাছ চূর্ণ করে রোগীর ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বহু মানুষ এই ঔষধ সেবন করে আরোগ্য লাভ করতো। হয়তো পুরো ব্যাপারটি মনস্তাত্ত্বিক। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তারগণ উত্তম চিকিৎসা প্রদান করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মিশরের ডাক্তারগণ স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য অপরিষ্কার খাদ্য এবং কাঁচা মাছ ভক্ষণ করতে নিষেধ করতেন। সর্বপ্রথম মিশরে হাড় ভাঙা, পা মচকানোর চিকিৎসা এবং জখম সেলাই করার প্রচলন শুরু হয়। মিশরের দন্ত চিকিৎসকগণ দাঁত তোলা এবং দাঁত বাঁধাইয়ের কাজ করতে পারতেন। মিশরের চিকিৎসকগণ দাঁতের মাজন এবং টুথপেস্ট আবিষ্কার করেছিলেন। দিনে দিনে মিশরের চিকিৎসকদের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ভিনদেশি সম্রাট, রাজা, বাদশাহগণ মিশরে গিয়ে চিকিৎসা করাতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪০]

চিকিৎসার জ্ঞান প্রসার এবং উন্নতমানের চিকিৎসক তৈরির লক্ষে মিশরজুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। বুবাস্তিস এবং আবিদস অঞ্চলে এরূপ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম শোনা যায়। পেশাজীবী ডাক্তারগণ House of Life নামক শিক্ষা কেন্দ্রে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নারী-পুরুষ সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। চিকিৎসা

৩৮. *https://bn.wikipedia.org/wiki/*, "মেসোপটেমিয়া" (থেকে উদ্ধৃত)

৩৯. মো: ফাহিম খান, *https://roar.media/bangla/main/history/pharaoh-diary-how-was-the-medical-system-of-ancient-egypt* "ফারাও ডায়েরি: কেমন ছিল প্রাচীন মিশরের চিকিৎসা ব্যবস্থা", ২৪.০৭.২০১৮

৪০. তপন চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

বিজ্ঞানের শুরুর দিকে মানব দেহ নিয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায়, যেকোনো রোগ প্রতিরোধের চেয়ে জখমের চিকিৎসা করা সহজতর ছিল। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতো পূর্ব ইহ জনমের পাপের শাস্তিস্বরূপ দেবতারা রোগ প্রদান করতেন। কিন্তু ঝামেলা বাঁধতো যখন সাধু শ্রেণির কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তো। তখন মনে করা হতো, হয়তো কোনো অসুরের কোপানলে পড়েছেন সাধু মশাই।

প্রাচীন চিকিৎসার প্রমাণগুলো পাওয়া গেছে মিশরীয় ঔষধ, বেবিলনিয়ান ঔষধ, আয়ুর্বেদিক ঔষধ (যা ভারতীয় উপমহাদেশে সুপ্রচলিত ছিলো), ক্লাসিক্যাল চীনা ওষুধ (যাকে আধুনিক ঐতিহ্যবাহী চীনা ওষুধের পূর্বসূরি বলে ধারণা করা হয়), প্রাচীন গ্রিক ঔষধ এবং রোমান ঔষধ থেকে।

মিসরের ইমহোতেপ (৩য় সহস্রাব্দের বিসি) ছিল প্রথম পরিচিত চিকিৎসক, যা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রাচীনতম মিশরীয় চিকিৎসা পাঠ্যক্রমটি কাহুন গাইনোকোলজিক্যাল প্যাপিরাস নামে পরিচিত, যা মূলত গাইনোকোলজিক্যাল রোগের বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস সার্জারির ওপর প্রথম কাজ করেছিলেন, আর ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে Ebers Papyrus কাজ করেছিলেন। যা চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের অনুরূপ ছিল।[৪১]

## প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থা

ভারতে শল্য চিকিৎসক Sushruta প্লাস্টিকের অস্ত্রোপচারের প্রাচীনতম রূপসহ অসংখ্য অস্ত্রোপচারের বর্ণনা দিয়েছেন। অস্ত্রোপচারের সবচেয়ে পুরনো রেকর্ডগুলো পাওয়া যায় শ্রীলংকার মিহিনটলে অবস্থিত উৎসর্গীকৃত হাসপাতালে, যেখানে রোগীদের জন্য সুষম চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতের মুখ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা। এটি প্রাচীন ভারতের লৌকিক, স্থানীয় এবং মূলত ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা রোগ নিরাময়ে বিশেষত তৎকালে সীমাহীন অবদান রেখেছে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে চিকিৎসাকে আটটি অংশের বিজ্ঞান হিসেবে শ্রেণি বিন্যাস করা হয়। যা নিম্নরূপঃ
১. কায়া চিকিৎসা (জেনারেল মেডিসিন), ২. কৌমান ভরত্য (শিশু-কিশোর চিকিৎসা), ৩. শল্য চিকিৎসা, ৪. শালাক্য তন্ত্র (চক্ষু, নাক, কান ও গলা চিকিৎসা), ৫.ভুত বিদ্যা (অপদেবতা, মনোরোগ সম্পর্কিত বিদ্যা), ৬. আগড় তন্ত্র (বিষক্রিয়া সম্পর্কিত), ৭.রসায়ন তন্ত্র (নানাবিধ দ্রব্য সহকারে তরল ওষধি প্রস্তুতকরণ বিদ্যা), ৮.বাজিকরণ তন্ত্র ও আফ্রোডিজিয়াক। হাজার হাজার বছর পরেও বর্তমান বিশ্ব চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই শ্রেণি বিন্যাসের কোনোটাই অপাংক্তেয় বা পরিত্যাজ্য হয়ে যায়নি।

আয়ুর্বেদ হচ্ছে বৈদিক রীতি মতে উপবেদ (বা বাড়তি জ্ঞান) গোত্রীয়, ঋগ্বেদের উত্তরখণ্ড তথা সম্পূরণী অংশ বা পরিশিষ্টে এর অন্তর্ভুক্তি থাকলেও অথর্ববেদকে আয়ুর্বেদের মুখ্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। অথর্ব বেদের সংহিতা অংশে রোগ নিরাময়ের জন্য ১১৪টি স্তোত্রগীত বা যাদু বিদ্যার মন্ত্রোচ্চারণমূলক শ্লোক আছে। চরক তাঁর সংহিতায় উল্লেখ করেন যে চিকিৎসকরা অথর্ব বেদ সংলগ্ন থাকা বিধেয়। আয়ুর্বেদকে পাঁচ হাজার বছরের পুরানো চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন। আয়ুর্বেদের উৎস সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে চিকিৎসক ধন্বন্তরী বা দিবোদাস, এই বিজ্ঞান ব্রহ্মার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এটাও প্রচলিত আছে, ঋষি ভরদ্বাজের শিষ্য ঋষি অগ্নিবেশ এর রচিত এটি- যা শ্রবণ পরম্পরার মাধ্যমে স্মরণে রাখা হতো এবং সংরক্ষিত ও বিস্তৃত হত। পরে এসে তা গ্রন্থের রূপ পায়।[৪২]

যারা আয়ুর্বেদ চর্চা ও প্র্যাকটিস করতেন সেইসব চিকিৎসকদের মধ্যে আত্রেয়, অগ্নিবেশ, চরক ও শুশ্রুত অন্যতম। আত্রেয় ও অগ্নিবেশ এর মতো ঋষিগণ খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দে আয়ুর্বেদের মূল সূত্র নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। সুবিখ্যাত চিকিৎসক অগ্নিবেশ সেই সময়ে বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ চিকিৎসা সম্পর্কীয় জ্ঞানকোষ রচনা করেন। তাঁদের কাজ ও অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চরক চিকিৎসা সম্পর্কীয় সূত্র ও চর্চা তথা চরক সংহিতা রচনা করেন, যা দুই সহস্রাধিক বছর যাবৎ ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করেছে এবং প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ক

৪১. তপন চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪২. *https://bn. m.wikipedia.org/wiki* "চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস" (থেকে উদ্ধৃত)

গ্রন্থের একটি মানদণ্ড বা মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং অনুদিত হয়েছে আরবী ও ল্যাটিনসহ বিভিন্ন ভাষায়।

ভারতীয় অনেক রাজা প্রাচীন এই চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আয়ুর্বেদ এবং যোগ ব্যায়াম জনিত চিকিৎসা পদ্ধতি উপমহাদেশে বহুলভাবে অনুসৃত হয়। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ভারতে জগৎব্যাপী পরিচিতি ও বিস্তৃতি পায়।[৪৩]

প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ০২টি ধারা ছিল। যার একটি হল আর্য়ুবেদ এবং অপরটি হল সিদ্ধা। আর্য়ুবেদ চিকিৎসা পুরো ভারত উপমহাদেশ ব্যাপি ছড়িয়ে থাকলেও সিদ্ধা ছিল শুধু দক্ষিণ ভারতীয় তামিলভাষীদের ভেতর সীমাবদ্ধ।

আয়ুর্বেদ মানে আয়ুবৃদ্ধি সম্পর্কিত বেদ অথবা দীর্ঘায়ু বিজ্ঞান। 'আয়ু' শব্দের অর্থ জীবন এবং 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা। সুতরাং আর্য়ুবেদ শব্দের অর্থ জীবনের জন্য যে বিদ্যা। অর্থাৎ যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনকে দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়, সেটাই আর্য়ুবেদ।[৪৪]

আর্য়ুবেদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "রোগের ত্রিদশা তত্ত্ব"-এর ওপর ভিত্তি করে। ০৩টি দশার মধ্যে রয়েছে বায়ু, পিত্ত ও কফ। বলা হয় এই তিনটি দশার একটিতেও গড়মিল হলে রোগের জন্ম ঘটে।

## প্রাচীন গ্রীসে চিকিৎসা ব্যবস্থা

গ্রীস চিকিৎসক হিপোক্রেটিক যাকে পশ্চিমা চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়, তিনিই প্রথম গ্রীসে ঔষধের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন। হিপোক্রেটিসই চিকিৎসকদের জন্য হিপোক্রেটিক ওথ চালু করেছিলেন, যা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং আজ অবধি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রোগকে তখনি প্রথম acute, chronic,endemic and epidemicহিসেবেচিহ্নিতকরা হয়েছিল। তাছাড়া তাদেরকে exacerbation, relapse, resolution, crisis, paroxysm, peak and convalescence হিসেবেও শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।

গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনকে প্রাচীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সার্জন ছিলেন বলের ধারণা করা হয়। মস্তিষ্ক ও চক্ষু অস্ত্রোপচারসহ অনেক অদ্ভূত অপারেশন তিনি করেছিলেন। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং মধ্যযুগ সূচনা হওয়ার পর পশ্চিম ইউরোপে ঔষধের গ্রীক ঐতিহ্য হ্রাস পেতে থাকে, যদিও এই পদ্ধতির পূর্ব রোমান (বাইজানটাইন) সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত ছিল।

১ম সহস্রাব্দের দিকে প্রাচীন হিব্রু চিকিৎসা পদ্ধতির অধিকাংশই তাওরাত থেকে আসে। যেমন, মূসা (আ.)-এর পাঁচটি বই, যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন এবং রীতিনীতিগুলো ধারণ করে। আধুনিক ঔষধের উন্নয়নে হিব্রুদের অবদান বাইজেন্টাইন যুগে শুরু হয়েছিল ইয়াহুদী চিকিৎসক আসাফ-এর মাধ্যমে।[৪৫]

## প্রাচীন চীনে চিকিৎসা ব্যবস্থা

চীনে চিকিৎসা বিষয়ক প্রত্নতাত্ত্বিক যে প্রমাণগুলো পাওয়া যায়, তা ছিল ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন। তখন সেখানে শং রাজবংশের শাসন ছিল। চীনে অস্ত্রোপচারের জন্য বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত বীজ ব্যবহৃত হতো। Huangdi Neijing ছিল চীনের চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য মাইল ফলক, যা ছিল দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের শুরু এবং তৃতীয় শতাব্দীতে লেখা একটি মেডিক্যাল পাঠ।

---

৪৩. ডা. দিলীপ দে, *https://dainikazadi.net*. "প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থার গোড়ার কথা", ৩১.০১.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)
৪৪. *https://www.wikiwand.com/bn/* "আয়ুর্বেদ" (থেকে উদ্ধৃত)
৪৫. তপন চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

## মধ্যযুগে চিকিৎসা

মধ্যযুগে আয়ুর্বেদ সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে। দলহন (১২০০খ্রি), সরঙ্গধারা (১৩০০খ্রি.), ভবমিশ্র (১৫০০খ্রি.) ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ সংকলন করেন। ৮ম শতাব্দীতে শুশ্রুত ও চরক সংহিতা আরবীতে অনুদিত হয়। ৯ম শতাব্দীর পারস্যের চিকিৎসক ঢ়াঝেস এসব গ্রন্থ সম্পর্কে জানতেন। গুপ্ত যুগের গ্রন্থ থেকে আরবী ভাষায় অনুদিত হয়ে তা মধ্য যুগের শেষের দিকে ইউরোপীয় চিকিৎসা জগতে প্রবেশ করে। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ধ্যান ধারণা গ্রীকদেরও প্রভাবিত করে। এটা মূলত খ্রিস্টপূর্ব ১৮০ থেকে ১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের একাংশে ইন্দো-গ্রীক শাসনামলের সরাসরি সংস্পর্শের কালে ঘটেছিল। ইতালীয় রেনেসাঁর যুগে সিসিলি'র ব্রাঙ্কা পরিবার এবং বোলাঙ্গা'র গাস্পারে টলিয়াকোজ্জি শুশ্রুতের দক্ষ শল্য চিকিৎসার কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হন।[৪৬]

ইউরোপে শার্লিমেন ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিটি ক্যাথিড্রাল এবং মঠের জন্য একটি হাসপাতালকে সংযুক্ত করা উচিত। ইতিহাসবিদ জ্যফ্রে ব্লেইন মধ্যযুগের স্বাস্থ্যসেবার ক্যাথলিক চার্চের কার্যক্রমগুলোকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রাথমিক সংস্করণের সাথে যুক্ত করেছিলেন। যেখানে বয়স্কদের জন্য হাসপাতাল, অনাথ শিশুদের জন্য এতিমখানা এবং সব বয়সের রোগীদের জন্য ঔষধ, কুষ্ঠরোগীদের জন্য থাকার জায়গা এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য হোস্টেল ছিল, যেখানে তারা সস্তায় বিছানা এবং খাবার কিনতে পারতো। বেলডিসটাইনের আদেশটি মঠগুলোতে হাসপাতাল ও রোগীর স্থাপনা নির্মাণ করাতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা সেবা এবং জেলাসমূহের প্রধান চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারীর জন্য Abbey of cluny সুপরিচিত ছিল। এছাড়াও গির্জা ক্যাথেড্রাল স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেখানে চিকিৎসা সেবা অধ্যয়ন করা যেতো। মধ্যযুগীয় ইউরোপের সালেনোতে গ্রিক ও আরব চিকিৎসকগণের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সেরা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার নাম ছিল Schola Medica Salernitana.

তবে চৌদ্দ ও পঞ্চদশ শতকের কালো মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ উভয়কেই ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাছাড়া তর্ক বিতর্ক করা হয়েছিল যে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় পশ্চিম ইউরোপ সাধারণত রোগ মুক্তির জন্য আরো বেশি কার্যকর ছিল। প্রাক আধুনিক যুগে, চিকিৎসা বিদ্যা এবং শরীর বিদ্যা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পরিসংখ্যান ইউরোপে আবির্ভূত হয়েছিল, যার মধ্যে Gabriele Falloppio এবংWilliam Harvey এর নাম অন্যতম।[৪৭]

১৬৭৬ সালে এন্টোনি ভ্যান লিউভেনহোক একটি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে প্রথম বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে মাইক্রোবায়োলজির যাত্রা শুরু করেছিলেন। মাইকেল সার্ভেটাস ইবনে নাফিসের কাছ থেকে pulmonary circulation সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু এ আবিষ্কারটি জনগণের কাছে পৌঁছেনি। কারণ এটি ১৫৪৬ সালের দিকে প্রথমবার Manuscript of Paris এ লেখা হয়েছিল। পরবর্তীতে এটি ধর্মতত্ত্ব নামে ১৫৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি রেনালডাস কলম্বাস এবং আন্দ্রে সিলেপিনোর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছিল। লিডেন Herman Boerhaave-কে কখনও কখনও 'শারীর বৃত্তির জনক' (the father of physiology) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

## মধ্যযুগে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান

মধ্যযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যবস্থার কথা বললে সর্বপ্রথম মুসলিম বিজ্ঞানীদের কথা বলতে হয়ে। কারণ তাঁদের হাতে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আবু আলী হোসাইন ইবনে সিনা সবচেয়ে বিখ্যাত। মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশ্বকোষ "আল-কানুন ফিত-তিব্ব" রচনা করেন, যা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ্য ছিল। তাঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে সম্মান করা হয়ে থাকে।

যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে গ্রীকরাই সবচেয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছে ছিল। কিন্তু গ্রীকদের এ উত্তরাধিকারকেমুসলিমরা নিজেদের প্রতিভাদীপ্ত অনুশীলনে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বর্তমান যুগের উচ্চস্তরে আনয়নের পথ

৪৬. *https://bn.wikipedia.org/wiki/* "চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, মধ্যযুগ",
৪৭. প্রাগুক্ত
৪৮. প্রাগুক্ত

সুগম করে। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত যে মুসলিমরা চিকিৎসাবিদ্যায়, বিশেষতঃ ভেষজ গ্রন্থাদি রচনায় অসামান্য সফলতা দেখায় ও আশ্চর্য উন্নতি সাধন করে এবং এ ক্ষেত্রে বর্তমান ইউরোপের ওপর মুসলিমরদেরই প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়।

পবিত্র কুরআনে কোনো রোগ সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়নি সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানকে অবহিত করা হয়েছে। মুসলিমরা গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদের জ্ঞানানুশীলন শুরু হয়। তাঁদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রীক পণ্ডিতদের চিকিৎসা ও ভেষজ গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুদিত হয়। তাঁদের অনেকে বাগদাদে আব্বাসী খলিফাদের চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় জালিনুসের লিখিত চিকিৎসা বিদ্যার প্রাচীন পুঁথিগুলো আরব সমাজে সুপরিচিত হয়। অনুবাদকারীগণ আরবীতে চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশ্বকোষের মতো বিরাট গ্রন্থও প্রণয়ন করা হয়।

ইসলামী খেলাফত আমলে মিসরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক উপদেষ্টা ইয়াহইয়া আন নাহবি চিকিৎসা বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থাবলি রচনা করেন। তিনি প্রথম আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ইজিয়ান হিপোক্রিটিস (৪৬০-৩৭৭ খ্রিস্টপূর্ব) এবং গ্যালনের (২০০-১৩০ খ্রিস্টপূর্ব) গ্রন্থগুলোর ওপর গবেষণাধর্মী পুস্তকও প্রণয়ণ করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির এ ধারা উমাইয়া শাসনামলেও অব্যাহত থাকে।

খালিদ ইবনে ইয়াজিদের উদ্যোগে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রীক গ্রন্থগুলো আরবীতে অনূদিত হয়। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের উদ্যোগে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলীসহ প্রথম পাবলিক লাইব্রেরিটি সিরিয়ার দামেস্কে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগে বসরার ইহুদি চিকিৎসাবিদ হারুন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে লেখেন বিখ্যাত ‘মেডিক্যাল ইনসাইক্লোপিডিয়া’। ইয়াজিদ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম লেখেন ‘কিতাবুল উসুল আত তিব্ব’ নামের বিখ্যাত গ্রন্থ। খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান সর্বপ্রথম বিপুল অর্থ ব্যয় করে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এক বিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা আল মামুন ও মুতাসিমের আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

বিজ্ঞানে অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষে আব্বাসীয় খলীফা আল মামুন বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতবর্গের সমন্বয়ে ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে একটি অত্যাধুনিক ‘বায়তুল হিকমা’ নামে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এতে খলিফা আল মামুন অনুবাদ কার্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলেন। অনুবাদ কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য খলিফা কোনো রকম বৈষম্য সৃষ্টি করেনি এবং তিনি শুধু মুসলিম পণ্ডিতগণকে নিয়োগ না দিয়ে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির পণ্ডিতগণকেও নিয়োগ দিতেন। এসব পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, অংক, ইতিহাস, রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জ্যোতি শাস্ত্র এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৪৯]

তাই মুসলিম খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানের শাখাসমূহের মধ্যে প্রথম যে উন্নতি সাধিত হয়, তাহলো চিকিৎসা শাস্ত্র। উমাইয়া খলিফাগণ চিকিৎসা শাস্ত্রকে উৎসাহিত করলেও মূলত আব্বাসীয় আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বেশি উন্নতি লাভ করে। সুতরাং মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা বলতে যা বোঝায় তা হয়েছিল আব্বাসীয় শাসনামলে। অধ্যাপক কে আলী লেখেন- আরবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় আব্বাসীয় আমলে। রাজধানী বাগদাদসহ বড় বড় শহরে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। সর্বপ্রথম আলাদা আলাদা ইউনিটে পুরুষ ও মহিলাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যথাযথ চিকিৎসক কর্তৃক যাতে যথার্থ ওষুধ প্রয়োগ নিশ্চিত হয়, সেজন্যও চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এ যুগে অনেক অনুবাদক ও চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করে তাঁরা নিজেদের মৌলিক চিন্তা-ধারার স্বাক্ষর রাখেন।[৫০]

---

৪৯. মুফতি মুহাম্মাদ মিনহাজ উদ্দিন, *https://www.banglanews24.com/index.php/islam/news/bd/746239.details* “হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় মধ্যযুগে মুসলিমদের অবদান” ১৬.১০.২০১৯ইং (থেকে উদ্ধৃত)

৫০. *https://www.wikiwand.com/bn/* “মধ্যযুগীয় ইসলামি বিশ্বের ইতিহাস” (থেকে উদ্ধৃত)

খলিফা আল মনসুরের রাজত্বকালে গ্রিক বিজ্ঞানের অনুবাদ কার্য জুন্দিশাপুর কলেজে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করেন। জুন্দিশাপুরের প্রধান চিকিৎসাবিদ ছিলেন বখত ইসু। তাঁর পুত্র জুরদাসকে খলিফা আল মনসুরের দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইতিহাসের কালক্রমে এ বখত ইসু-এর পরিবার বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে এবং আড়াই শতাব্দী ধরে খলিফাদের চিকিৎসক হিসেবে কাজ করে। এরপর আস্তে আস্তে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরো উন্নতি সাধিত হয়। যা এক সময় শুরুই করেছিলেন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ।[৫১]

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলিম বিশ্বের হাতে ছিল হিপোক্রেটস, গ্যালেন এবং আরবি অনুবাদিত অনুলিপি। তাছাড়া ইসলামী চিকিৎসকগণ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য ইসলামিক চিকিৎসা অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছে ফারসি আভিসিনা। ইমহোটেপ ও হিপোক্রেটসের সাথে তাঁকেও 'মেডিসিনের জনক' বলা হয়। তিনি কানুন অফ মেডিসিন গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে একটি বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া মধ্যযুগে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর-রাযী, আবুল কাসিম, ইবনে আল নাফিস, ইবনে রুশদ-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[৫২]

## আধুনিক যুগে চিকিৎসা

চিকিৎসা বিজ্ঞান মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধতা লাভ করেছে। পুরাতন সব চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে এসেছে নতুন নতুন সব চিকিৎসা ব্যবস্থা, চিকিৎসা সামগ্রী, ওষুধপত্র প্রভৃতি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাচীন সব ধ্যান ধারণা ও ব্যবস্থাপত্রকে পেছনে ফেলে নতুন থিওরী ও প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসা জগতে বিপ্লব সাধন করেছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে দুরারোগ্য সব ব্যাধিতে মৃত্যুর সংখ্যা আজ বেশ কমে গেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে যুগান্তকারী সব ওষুধপত্র। যেমন: স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরামাইসিন, পেনিসিলিন, স্কেলোমাইসিন, প্যারাসিটামল প্রভৃতি ওষুধ, এক্সরে, ইসিজি, এন.জিও গ্রাম প্রভৃতি সব আবিষ্কার আজকে মৃত্যু পথযাত্রী সব রোগীকে নতুন জীবনে আশ্বাসে বলীয়ান করেছে। কর্নিয়া সংযোজন, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ও যকৃতের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে চিকিৎসা শাস্ত্র আজ সমুন্নত। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন পূর্বের তুলনায় হাজার গুণে সমৃদ্ধ। অতি কম্পনশীল শব্দ এবং লেজার রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে, রেডিয়াম আবিষ্কার করে তাকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান এমন এক বিপ্লব এনেছে, যার দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কী অবস্থা তা দেখা যাচ্ছে এবং রোগ নির্ণয় করে ব্যবস্থা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। অপটিক ফাইবার ব্যবহার করে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করা যায়। শুধু তাই নয়, মূত্রথলি ও পিত্তথলির পাথর চূর্ণ করার কাজে তা যেমন সফলতা এসেছে, তেমনি সফলতা পেয়েছে বহুমূত্র রোগীর অন্ধত্ব প্রতিরোধে। সবশেষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কম্পিউটার প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে তাতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ শুধু রোগীর রোগ নির্ণয় করেই বসে থাকেনি; বরং মানুষের জন্মপূর্ব রোগ নির্ণয়েও অবদান রাখছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল যুগ হচ্ছে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতক। এই দুই শতকে বিজ্ঞানের অন্যান্য সব শাখার ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিপ্লবাত্মক সব আবিষ্কার হয়। বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সংঘটিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনেই আবিষ্কার হয় বহু চিকিৎসা কৌশল।

১৭৬১ সালের দিকে পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল যা মানব দেহের চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে একটু পৃথক ছিল। ফ্রান্সের পশু চিকিৎসক ক্লড বুগ্রেল্যাট বিশ্বের প্রথম পশু চিকিৎসা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে মেডিকেলের ডাক্তারগণই মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর চিকিৎসা করতো।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বায়োমেডিকাল গবেষণা (যেখানে ফলগুলো পরীক্ষাযোগ্য এবং প্রজননযোগ্য হয়) শুরু হয়েছিল পশ্চিমা ঐতিহ্য ভেষজের উপর ভিত্তি করে। প্রথম দিকে গ্রীক 'four humours'-এর পরিবর্তে এবং পরে অন্যান্য ধরনের প্রা-আধুনিক ধারণার পরিবর্তন শুরু হতে থাকে। আধুনিক যুগ আসলে শুরু হয়েছিল ১৮ শতকের শেষের দিকে

---

৫১. প্রাগুক্ত

৫২. তপন চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

এডওয়ার্ড জেনারের smallpox-এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার (এশিয়ার প্রচলিত টিউশুর পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত), ১৮৮৮ সালে রবার্ট কোচের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগের সংক্রমণের আবিষ্কার, তারপর ১৯০০-এর কাছাকাছি এন্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে আধুনিকতার যুগ ইউরোপ থেকে আরো জাগ্রত গবেষক খুঁজে পেয়েছিল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া থেকে ডাক্তার রুডলফ বীরভো, উইলহেল্ম কনরাড রন্টজেন, কার্ল ল্যান্ডস্টেইনটার ও অটো লোইই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। যুক্তরাজ্য থেকে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, জোসেফ লিস্টার, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। স্প্যানিশ ডাক্তার সান্তিয়াগো র‍্যামন ও কাজালকে আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের জনক বলে মনে করা হয়। নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে মরিস উইলকিন্স, হাওয়ার্ড ফ্লোরী এবং ফ্রাঙ্ক ম্যাকফার্লেন বার্নেটকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উইলিয়াম উইলিয়ামস কিন, উইলিয়াম কলি, জেমস ডি. ওয়াটসন ইতালি (সালভাদর লুরিয়া) থেকে, সুইজারল্যান্ড থেকে আলেকজান্ডার ইয়ারসিন, জাপান থেকে কিটাসাটো শিবাশবুরো এবং ফ্রান্স থেকে জিস মার্টিন চারকোট, ক্লাউড বার্নার্ড, পল ব্রোকা এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন স্যার উইলিয়াম ওসলার এবং হার্ভি কুশিং।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ঔষধের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। ইউরোপ জুড়ে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কেবল পশু ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যই ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, এর পাশাপাশি অন্যান্য পদার্থও ব্যবহৃত হয়েছিল। ফারমাকোলজি বিকশিত হয়েছে হারবালিজম থেকে এবং কিছু কিছু ঔষধ যেমন (এট্রোপাইন, এফ্রেডিন, ওয়ারফারিন, অ্যাসপিরিন, ডাইগক্সিন, ভিনকা অ্যালকোলোড, ট্যাকোলোল, হাইস্কিন ইত্যাদি) এখনও উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত হয়। এডওয়ার্ড জেনার এবং লুই পাস্তুর টিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক ছিল অ্যারফেনামাইন (সালভারসন), যা ১৯০৮ সালে পল এরিলিচ আবিষ্কার করেন। প্রথম এবং প্রধান এন্টিবায়োটিক হলো সালফা ওষুধ, যা জার্মান রসায়নবিদ azo dyes থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

ফার্মাকোলজি ক্রমবর্ধমানভাবে অত্যাধুনিক হয়ে ওঠছে। আধুনিক জৈব প্রযুক্তি নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় মাদক দ্রব্যকে বিকশিত করতে সহায়তা করে, আবার কখনো কখনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমাতে শরীরের সাথে সামঞ্জস্যের ব্যবস্তা করা হয়।

জিনোমিক্স এবং জেনেটিক্স সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ঔষধের উপর কিছু প্রভাব ফেলেছে। কারণ বেশির ভাগ মনোজেনিক জেনেটিক ডিসঅর্ডারের জিনগুলো এখনচিহ্নিতকরা হয়েছে, যা causative genes হিসাবে কার্যকরী। তাছাড়া আণবিক জীববিদ্যা এবং জেনেটিক্সের কৌশলগুলোর বিকাশ ও চিকিৎসা প্রযুক্তি অনুশীলনের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অনেক প্রভাবিত করেছে।

## চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন মনীষীদের অবদান

### ইমহোটেপ ও অন্যান্যদের অবদান

মিশরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'ইমহোটেপ' নামক চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৭ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশায় স্থপিত ইমহোটেপ মিশরের বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণের নকশা প্রণয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। দার্শনিকদের ভাষায়, ইমহোটেপ সর্বপ্রথম 'ধর্ম নিরপেক্ষ' চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি দাবি করতেন, মানুষ প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হয়, এর পেছনে দেবতাদের শাস্তির ধারণা মিথ্যা। এছাড়া খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ সালের দিকে মিশরের রাজসভার প্রধান চিকিৎসক হিসেবে 'মেরিতাহ' নামক এক নারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে মেরিতাহ সর্বপ্রাচীন নারী চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালে নিম্ন মিশর অঞ্চলে নাইথের মন্দিরে আরেকজন নারী চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া গেলেও তার নাম জানা সম্ভব হয়নি।মেরিতাহের পর মিশরের সবচেয়ে বিখ্যাত নারী চিকিৎসক হিসেবে আবির্ভূত হন 'পেশেহেত'।

উল্লেখ্য তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে নারীদের চিকিৎসা পেশায় প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তাই খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে এথেন্সের এগনাডাইস চিকিৎসক হওয়ার উদ্দেশ্যে ইউরোপ থেকে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাচীন মিশরে নারীদের চিকিৎসাক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদানের এরূপ দৃষ্টান্ত নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু এতো স্বাধীনতার পরও মিশরে যে কেউ ইচ্ছা করলেই ডাক্তার হতে পারতো না। আধুনিক যুগের ভর্তি পরীক্ষার মতো তাদেরকেও বাছাই করা হতো। একজন ডাক্তারকে পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে দেহ এবং আত্মিক দিক থেকেও পবিত্র হতে হতো। সেজন্য মিশরেরচিকিৎসকদের 'ওয়াবাউ' অর্থাৎ আত্মিকভাবে শুদ্ধ হিসেবে উপাধি প্রদান করা হতো।

একজন চিকিৎসক যেকোনো অঙ্গ কিংবা রোগ নিয়ে পড়াশোনা করে বিশেষজ্ঞ হতে পারতো। তবে আরেকদল ডাক্তার ছিলো যারা ঔষধপত্রের বদলে যাদু-টোনার মাধ্যমে চিকিৎসা করতো। চিকিৎসকগণ সকল রোগের চিকিৎসা করলেও গর্ভবতী নারীর চিকিৎসা এবং সন্তান জন্ম দেয়ার অংশটুকু ধাত্রী নারীগণ সম্পন্ন করতেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। নারী এবং পুরুষগণ সেবক-সেবিকা হিসেবে ডাক্তারদের সাহায্য করতেন। মিশর সাম্রাজ্যে ডাক্তার, ধাত্রী এবং সেবিকাদের সমানভাবে মর্যাদা প্রদান করা হতো।

প্রাচীন মিশরের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত যাদুঘরসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ এবং যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বহু মূল্যবান দলিল কালের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে গিয়েছে। পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে দ্য চেস্টার বিটি প্যাপিরাস নামক দলিলটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালে রচিত হয়েছিল। ইতিহাসবিদগণের তথ্যানুযায়ী, প্যাপিরাসের অনুচ্ছেদগুলোয় মানব দেহের নিম্নাঙ্গের বহু রোগের বর্ণনা এবং চিকিৎসা পদ্ধতি এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৫৩]

বার্লিন প্যাপিরাস নামক পাণ্ডুলিপি গর্ভকালীন বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। এটি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, যেখানে গর্ভকালীন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি আনুমানিক ১৫৭০ খ্রিস্টপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। হৃদরোগ, উদরাময় এবং মানসিক রোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপির নাম 'ইবেরাস প্যাপিরাস'। শল্য চিকিৎসা পদ্ধতির প্রাথমিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসের গায়ে। এরূপ শত শত পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাচীন মিশরীয় পণ্ডিতদের জ্ঞানপিপাসু এবং গবেষণাবান্ধব মান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

যদিও মিশরীয় সভ্যতার প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বেশির ভাগই ভুল ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগের উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দীর্ঘ সফরে পেশেহেতের মতো ডাক্তারদের অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতি অগ্রদূত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তখন মানুষ জীবাণু সম্পর্কে জানতো না। বড় বড় ব্যাধির কারণ সম্পর্কে জানার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রযুক্তিও তখন আবিষ্কৃত হয়নি। সামান্য কিছু ভেজষ ঔষধ আর ধারালো ছুরিই ছিল তাদের প্রধান সম্বল। কিন্তু আজও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে পরিগণিত হন। মিশরীয় সভ্যতা যে চিকিৎসা পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেছিলো, তা শত বছর পর ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে প্রাচীন গ্রিসের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনসহ প্রমুখের হাতে তা দুর্বার গতি লাভ করে। এভাবে হাজারো নাম না জানা পণ্ডিত এবং চিকিৎসকগণের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় চিকিৎসা বিজ্ঞান।[৫৪]

তাই শুকনো জলবায়ু এবং উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে হেরোডোটাস মিসরীয়দেরকে 'সকল লোকের স্বাস্থ্যবান, লিবিয়াদের পাশে' বলে বর্ণনা করেছেন।

**নার্গাজুন, ধন্বন্তরী,শুশ্রুত, চরক ও অন্যান্যদের অবদান**

ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে সিন্ধু সভ্যতা পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা যে বৃক্ষজ, প্রাণিজ, অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থ, খনিজ বা আকরিক পদার্থ ব্যবহার করতো এর নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন একটি উৎস খননে

---

৫৩. তপন চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৫৪. Md. Fahim Khan, *https://roar.media/bngla/main/history/pharaoh diary how was* the medical system of ancient Egypt. Date: 24.07.2018. (থেকে উদ্ধৃত)

শিলাজাত পাওয়া যায়। তার মানে প্রাচীন মহেঞ্জোদারো'র লোকদের জনজীবনে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার ছিল। বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও আর্বান জনজীবনে যেখানে নগর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সবকিছুই একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতির মাধ্যমে চলতো, সেখানে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা বা ধারণা ছিল না এটা কল্পনা করা কঠিন।

গাঙ্গেয় বৈদিক সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব অন্যূন হাজার বছর অর্থাৎ আজ থেকে অন্তত তিন হাজার বছর আগের। আর্যদের এ সভ্যতায় ধ্বনিত ঋগ্বেদে ধন্বন্তরী-কে শ্রী বিষ্ণুর ১৭তম নবমূর্তিতে আর্বিভাব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধন্বন্তরী হচ্ছেন চিকিৎসা শাস্ত্রের দেবতা অর্থাৎ চিকিৎসার একটা ভিন্ন ব্যবস্থা সেই আদিকাল থেকেই ভারতে বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে অশ্বিনীদ্বয় ছিলেন দুর্ভাগ্য ও রোগ নিরাময়কারী দেবতা। তাঁরা দু'জনে দেব চিকিৎসক এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রের দেবতা।

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে যারা ধর্ম এবং প্রচলিত ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা একসঙ্গে যুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে নার্গাজুন অন্যতম। নার্গাজুন মধ্যমপথ নামক ধর্মীয় ব্যাখ্যার স্রষ্টা, অন্যদিকে তিনি চিকিৎসা বিষয়ক একশত ব্যবস্থাপত্র এবং মূল্যবান সংকলন প্রভৃতিরও রচয়িতা। তাঁর উত্তরতন্ত্র মূলত বিভিন্ন ঔষধি তৈরির নির্দেশক গ্রন্থ। তিনি *আরোগ্যমঞ্জরী*, *কক্ষপূততন্ত্র*, *যোগসার* ও *যোগশতক* শীর্ষক ৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সময়কাল দশম শতাব্দী বিধায় তাঁর পূর্বের চিকিৎসকদের ধ্যান ধারণা তাঁর লেখায় অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর কয়েক যুগ পর ১০২০ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আক্রমণ চালানোর প্রাক্কালে সোমনাথের বাসিন্দা নাগার্জুনের এই বিশাল লেখালেখির ভান্ডার তাদের হাতে পড়ে বলে ধারণা করা হয়। সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আসা আল বিরুনী ছিলেন পরিব্রাজক ও লেখক। তিনি ভারতের চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করে তা আরবীতে অনুবাদ করেন। ভারতের *চরক* ও *শুশ্রু সংহিতা*সহ চিকিৎসা বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হয়ে আরবীয় ইউনানী চিকিৎসায় অন্তর্ভূক্ত হয়। নাগার্জুনের রচনা সম্ভারও তাদের নজর এড়ানোর কথা নয়।

আত্রেয়াকে (৮০০ খ্রিস্টপূর্ব) ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম চিকিৎসক এবং শুশ্রুতাকে (১২০০খ্রিস্টপূর্ব) ভারতীয় শল্য চিকিৎসার জনক (father of Indian surgery) বলা হয়।তিনি *'শুশ্রুতা সংহিতা'*রচনা করেন।চরক ছিলেন (২০০খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন বৌদ্ধ রাজার কানিস্কার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। *চরক সংহিতা* গ্রন্থে তিনি ৫০০ ঔষধের বর্ণনা দিয়েছেন।

শুশ্রুত সংহিতা ও চরক সংহিতা ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। এই আকর গ্রন্থদ্বয়ে রোগের উপসর্গ, রোগ নির্ণয় এবং সম্ভাব্য নিরাময়ের সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কিত জ্ঞান একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালী-পদ্ধতিতে মুনি-ঋষিদের মধ্যে যুগ ও প্রজন্ম -পরম্পরায় লিপিবদ্ধ করা ব্যতিরেকে কেবল তাঁদের স্মৃতিতে ধারণ ও বিস্তৃত হতে থাকে এবং সাধক ও পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে তা নানা স্থানে ছড়ায়। তবে পরবর্তীতে যারা এই বিদ্যা আয়ত্ব ও চর্চা করতেন তাদেরকে বৈদ্য বলা হতো এবং তারা মূলত ছিলেন ব্রাহ্মণশ্রেণিভুক্ত।

যোগ ব্যায়ম হচ্ছে মানব শরীর ও মনের উৎকর্ষের জন্য বিশেষ ধরনের শারীরিক কসরৎ। এটা প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম অংশ ছিল। খ্রিস্ট জন্মের অনেক পূর্ব থেকেই এ ভূখন্ডে এর প্রয়োগ থাকলেও ঋষি পতঞ্জলি খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে যোগের সকল মূল বিষয়গুলো মূল উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করেন। পতঞ্জলি লিখেন, যোগচর্চার মাধ্যমে সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করা যায়, তা প্রয়োগ করা যায় এবং এটা শরীর ও মনের ওপর একটা স্বাস্থ্যকর ভূমিকা রাখে। পতঞ্জলি যোগ চর্চাকে কিছু রোগ এবং বিশেষত নানা দীর্ঘসূত্রি রোগব্যাধি নিরাময়ের কাজে ব্যবহারের শিক্ষা দিতেন।

উল্লেখ্য, ভারতীয় শল্য চিকিৎসা আদিকাল থেকেই বেশ উন্নত থাকলেও বৌদ্ধদের রাজত্বকালে এটি তেমন বিকাশ লাভ করেনি। পরবর্তীতে তা বিকাশ লাভ করতে থাকে। ভারতীয় শল্য চিকিৎসকদের কাছ থেকেই বৃটিশরা Rhinoplasty operation শিখেছিল।[৫৫]

বলা হয়ে থাকে, চরক সংহিতা তার প্রাথমিক রূপে খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বৎসর আগের। এই সংহিতায় শরীরের নানা অভ্যন্তরীণ ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড (ফিজিওলজি) রোগের উৎপত্তি ও কারণ (ইটিয়োলজি), ভ্রূণ তত্ত্ব

৫৫. *https://fourlimbed.blogpost.com.* ভারতীয় উপমহাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস (থেকে উদ্ধৃত)

(এম্ব্রয়োলজি), হজম প্রক্রিয়া (ডাইজেসসান), বিপাক প্রক্রিয়া (মেটাবোলিজম) এবং রোগ প্রতিরোধসহ (ইম্যুনিটি) শ্রেণিবদ্ধভাবে শরীর বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। জেনেটিকস্ এর একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণার সন্ধানও এ সংহিতায় স্থান পেয়েছে। চরক সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারক হিসেবে কোনো কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করে বলেন, মা-বাবার দোষে সন্তান জন্মান্ধ হয় না, এটা ভ্রূণ থেকে আসে।

**গ্যালেনের অবদান**

প্রাচীন রোমের চিকিৎসা ব্যবস্থার আলোচনা করতে গেলে মহান চিকিৎসক গ্যালেনের নাম এমনিতেই চলে আসে। গ্যালেনের মাধ্যমেই রোমের প্রাচীন চিকিৎসার একটি রূপ রেখা পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গ্যালেন ১২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বে গ্রীসের পারগামন নামক শহরের এক ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ক্লডিয়াস গ্যালেন নামেও পরিচিত। পারগামন শহরটি বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্গত। শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারগামন শহর ছিল সে সময়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহরগুলোর একটি। গ্যালনের ২০ বছর বয়সে বাবা নিকন মারা গেলে পারগামন ছেড়ে তিনি ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন এবং চিকিৎসা জ্ঞান সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান লাভে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শহর আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঁচ বছর জ্ঞান বৃদ্ধি করে ১৫৮ খ্রিস্টাব্দে নিজ শহর 'টেম্পল অব পারগামন'-এ রোমান গ্লাডিয়েটরদের চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন।আধুনিককালের খাদ্য সংযম বা ডায়েটিং পদ্ধতি এসেছিল গ্যালেনের হাত ধরেই। তিনি গ্লাডিয়েটরদেরকে সুস্থ সবল রাখতে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ দেন।

"সকল অজানা রাস্তাই রোমে গিয়ে শেষ হয়"। সে সময়ে প্রচলিত এই প্রবাদটির সত্যতা নিরূপনে গ্যালেনও রোমে না গিয়ে পারলেন না। তিনি ১৬৬ খ্রিস্টাব্দে সেখানে গিয়ে দেখলেন সেখানকার চিকিৎসকদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তারা গ্যালেনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে অস্বীকার করে। ফলে গ্যালেন অসন্তুষ্ট হয়ে সেখানকার চিকিৎসকদের 'বিবেকবর্জিত চোর' বলে আখ্যা দেন, যারা রোগীকে সুস্থ না করে টাকা আয় করতেই ভালবাসতো। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই উক্তি চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্যালেন প্রাণ ভয়ে পালিয়ে নিজ শহরে ফিরে আসে। যদিও এর মাত্র ৩বছর পর ১৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস সে সময়ের খ্যাতিমান চিকিৎসক গ্যালেনকে পারগামন থেকে রোমে নিয়ে আসেন এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি গ্যালেন সম্পর্কে বলেন- ডাক্তারদের মধ্যে সেরা, দার্শনিকদের মধ্যে অনন্য। সম্রাট অরেলিয়াসের মৃত্যুর পর তার ছেলে কমোডাস এবং অত:পর সম্রাট সেপটিমিয়াস সেভারাসেরও তাঁকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন। এই প্রভাবশালী চিকিৎসক আমৃত্যু প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজদরবারের চিকিৎসক হিসেবে সম্রাটেদের পছন্দের শীর্ষে থেকেছেন। ফলে সে সময় তিনি নিজের মতো করে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা করেছেন এবং তথ্য দিয়েছেন।

গ্যালেনের চিকিৎসা বিষয়ক কাজগুলোর প্রভাববলয়ে পশ্চিমা এবং আরব বিশ্ব আবদ্ধ ছিল প্রায় ১৫০০ বছর। গ্যালন মূলত জন্মগতভাবে একজন গ্রীক। কিন্তু টানা কযেক দশক রোমান সম্রাটদের গৃহচিকিৎসকের দায়িত্ব পালন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজের চিকিৎসা সম্পর্কিত জ্ঞানের উন্নয়ন গ্যালনকে করেছে রোমানদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ। তিনি প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও নিজের গবেষণার ফলাফল মিলিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন অসামান্য চিকিৎসা পদ্ধতি, যা সে সময়ে সত্যিই অতুলনীয় ছিল। গ্যালেন বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন অ্যানাটমি, ফার্মাকোলজি, সার্জারি এবং ভেষজ চিকিৎসায়। প্রাচীনকালের যেকোনো বিজ্ঞানী বা চিকিৎসকের তুলনায় গ্যালেন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য টিকে আছে। তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কাজের প্রায় ২০ হাজার পৃষ্ঠা এখনো টিকে আছে।[৫৬]

গ্যালেনের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক কাজগুলো এতোটাই জনপ্রিয়তা পায় যে, সেগুলোকে আলাদা করে গ্যালেনিজম বলা হয়। অনেকে মনে করেন, গ্যালেনিজম সবিস্তারে বর্ণনা করতে গেলে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া রচনার প্রয়োজন পড়বে। গ্যালেনিজমে যে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে তা নিম্নোক্ত তুলে ধরা হল-

* রোগীর পালস বা নাড়ির স্পন্দন সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করে রোগ নির্ণয় করা।

* রোগীর মূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা।

---

৫৬. *https://bn.wikipedia.org/wiki/* "চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, মধ্যযুগ",

* চোখের ছানি অপসারণ করার পদ্ধতি।
* মূত্রাশয় নয়; বরং বৃক্কে মূত্র তৈরি হয়।
* মানসিক সমস্যার দ্বারা উদ্ভূত শারীরিক সমস্যা নির্ণয় করা।
* ধমনীর মধ্য দিয়ে তরল রক্ত প্রবাহিত হওয়া। অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বাস করা হতো যে ধমনী দিয়ে গ্যাস বাহিত হয়।
* অপটিক ও অ্যাকাউস্টিকসহ ১২টি করোটিক স্নায়ুর মধ্যে ৭টি আবিষ্কার করা।
* দুই ধরনের রক্ত চিহ্নিত করা। টকটকে লাল রক্ত এবং কালো রক্ত।
* হৃৎপিণ্ডের চারটি কপাটিকা আবিষ্কার করা।
* হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো কেবল একমুখী রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করে।

গ্যালেনিজমের উপরোল্লিখিত চিকিৎসা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যদিও পরবর্তীতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে এবং সময়ের তুলনায় তিনি অনেক অগ্রসর কথা বলে গেছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত মতবাদে ভুলও কম ছিল না, যা পরবর্তীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকায়নে তা নির্ণয় করা হয়। নিম্নে চিকিৎসা সম্পর্কিত তাঁর কিছু ভুল সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল:
* মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের পচনের ফলে সৃষ্ট দুর্গন্ধ থেকে মানুষের রোগ হয়।
* শিরার কালো রক্ত যকৃতে তৈরি হয়, যা সারা দেহের খাদ্য হিসেবে পরিবাহিত হয়।
* ধমনীর টকটকে লাল রক্ত হৃৎপিণ্ডে তৈরি হয় এবং দেহে শক্তি দান করে।
* রক্তক্ষরণকেও চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
* সূক্ষ্ম রক্তনালিকার মাধ্যমে শিরা ও ধমনী যুক্ত, যাদের মধ্য দিয়ে রক্ত এবং বাতাস প্রবাহিত হয়।
* কালো পিত্তরস মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা সৃষ্টি করে।
* গ্যালেন হিপোক্রেটিসের 'পিত্তরস দ্বারা রোগ' হওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন।

তবে ইউরোপে রেনেসাঁর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত গ্যালেনের কাজগুলোই ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক নীতি। মধ্যযুগে বেশ ক'জন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী গ্যালেনের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ১৬ শতকে গিয়ে উইলিয়াম হার্ভের হাত ধরে তা প্রতিষ্ঠা পায়। হার্ভে গ্যালেনের রক্ত সঞ্চালন ও অ্যানাটমিক গবেষণার বিস্তর ভুল প্রমাণ করেন। তবে এজন্য গ্যালেনকে পুরোপুরি দোষ দেয়া যায় না। কারণ তখন প্রাচীন রোমে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে গ্যালেন তার পর্যবেক্ষণ শূকর ও অন্যান্য প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করে চালিয়ে এমন তথ্য প্রদান করেছিলেন।

গ্যালেনের কাজগুলো বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ সময় যে সমস্যাটি পরিলক্ষিত হয়, তা হচ্ছে- তাঁর সংকলিত বা সংগৃহীত কাজগুলোকেও তাঁর নিজস্ব কাজ বলে মনে করা হয়। গ্যালেন মূলত নিজের গবেষণা ও আবিষ্কারের চেয়ে তাঁর পূর্বসূরীদের কাজের সংকলনই বেশি করেছেন। তিনি হিপোক্রেটিস, হিরোফেলাস, সেলসাস, আল্কমেয়ন, প্র্যাক্সাগোরাস, এসক্লিপিয়াডেস, এরাসিস্ট্রেটাসসহ প্রভৃত প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাজ নিয়ে গবেষণা করেন এবং সেগুলো থেকে যা তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, তা সংকলিত করেন। তিনি তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক বইয়ে তাদের নামও উল্লেখ করে গেছেন।

**হিপোক্রেটিসের অবদান**

ঐতিহাসিকদের মতে, হিপোক্রেটিস আনুমানিক ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কস নামক একটি গ্রীক দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন।[৫৭] সোরানোস মতে, পিতামহ প্রথম হিপোক্রেটিস ও পিতা হেরাক্লিদেসের নিকট হতে হিপোক্রেটিস চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। প্লেটো রচিত প্রোতাগোরাস গ্রন্থে হিপোক্রেটিসকে আসক্লেপিয়াদ উপাধিকারী কসের হিপোক্রেটিস নামে উল্লেখ করেছেন।[৫৮] তিনি তাঁর *ফাউদ্রোস* গ্রন্থে বলেছেন যে আসক্লেপিয়াদ হিপোক্রেটিস মনে করতেন,

---

৫৭. Nuland, Sherwin B. (1988), *Doctors, Knopf,* Page. 4, ISBN: 0-9539240-3-3.
৫৮. Plato (2006) [380 B.C.], Protagoras, *Internet Classics Archive: The University of Adelaide Library.*

চিকিৎসাবিদ্যায় শরীরের প্রকৃতির জ্ঞান প্রয়োজন। হিপোক্রেটিস সারা জীবন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান করেন। তিনি কমপক্ষে থেসালি, থ্রেস ও মার্মারা সমুদ্র পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।[৫৯]

হিপোক্রেটিসকে প্রথম ব্যক্তি মনে করা হয় যিনি বিশ্বাস করতেন যে, কুসংস্কার বা ঈশ্বর থেকে নয়; বরং প্রাকৃতিক উপায়ে রোগের প্রকোপ ঘটে। পিতাগোরাসের শিষ্যদের মতে, হিপোক্রেটিস দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন।[৬০] বস্তুত তিনি ধর্ম হতে চিকিৎসাবিদ্যাকে পৃথক করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, রোগ দেবতাদের দ্বারা ঘটে না; বরং জীবনযাপন পদ্ধতি, খাদ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা নিরূপিত হয়। কর্পাস হিপোক্রেটিকামে কোথাও রহস্যজনক অসুস্থতার উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি।[৬১]

প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসা পদ্ধতি নিডোস ও কস এই দুই অঞ্চলের প্রচলিত পদ্ধতিতে বিভক্ত ছিল। নিডোস অঞ্চলের চিকিৎসা পদ্ধতি রোগ নির্ণয়ের ওপর নির্ভর করতো, কিন্তু এটিই রোগের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলে এই পদ্ধতি বিফল হতো।[৬২] অন্যদিকে কস অঞ্চলে প্রচলিত হিপোক্রেটীয় চিকিৎসা পদ্ধতি রোগ নির্ণয়ের ওপর নির্ভর না করে রোগীর সেবা ও আরোগ্য সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিতো, যা রোগ নিরাময়ে অধিক সাফল্যের কারণ হয়ে ওঠে।[৬৩] রোগীর নিকট হতে বিশদ রোগের ইতিহাস জেনে তার আরোগ্য সম্ভাবনা বোঝার চেষ্টা করা হতো।[৬৪]

হিপোক্রেটীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে সঙ্কট মুহূর্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সঙ্কট মুহূর্ত এমন একটি সময় রোগীর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয় অথবা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় রোগ নিরাময় ঘটার ফলে রোগী বেঁচে যায়। সঙ্কটমুহূর্ত পেরোলে আবার একটি এরকম মুহূর্ত আশার সম্ভাবনা থাকে, যা রোগীর জীবন-মৃত্যুর ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। হিপোক্রেটীয় তত্ত্বানুসারে, রোগ শুরু হওয়ার একটি বিশেষ সময়ের পরেই সঙ্কটের সময় শুরু হয়। এই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে যদি সঙ্কট মুহূর্ত আসে, তবে তা বারবার ফিরে আসতে পারে। গ্যালেনের মতে, এই ধারণা হিপোক্রেটিস প্রথম প্রচলন করেন, যদিও তাঁর পূর্ব থেকেই এই ধারণা প্রচলিত ছিল এমন মত রয়েছে।[৬৫]

হিপোক্রেটীয় চিকিৎসা পদ্ধতি একটি নিরীহ ও নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি বিশেষ। প্রকৃতির নিরাময় শক্তির ওপর এই পদ্ধতি নির্ভর করতো। এই তত্ত্বানুসারে, চারটি ধাতুর ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা শরীরের রয়েছে যা নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয়।[৬৬] ফলে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রাকৃতিক উপায়কে আরও সহজ করার দিকে মনোযোগ দেয়। রোগীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং শরীরের বিশ্রামের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। এ পদ্ধতি সাধারণভাবে রোগীদের একদমই কষ্ট দিতো না। যেমন, বিশুদ্ধ পানি বা মদ দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করা হতো। কখনও বা আরামদায়ক মলম লাগানোও হতো। হিপোক্রেটিস প্রথমেই রোগীকে উচ্চ পর্যায়ে চিকিৎসা প্রদান না করে রোগ নির্ণয়ের পর সাধারণ চিকিৎসা দিতেন।[৬৭] তিনি সাধারণ চিকিৎসা হিসেবে উপবাস ও আপেলসুরার সির্কা পান করার পথ্য দিতেন। তাঁর মতে, রোগের সময় খাদ্য গ্রহণ করলে তা রোগকেই খাবার দেয়ার মত।[৬৮]

---

৫৯. Margotta, Reberto (1968), *The Story of Medicine,* New York, Golden Press. P. 66,
৬০. Adams, Francis (1891), *The Genuine Works of Hippocrates*, New York: William Wood and Company. Page. 4
৬১. Jones, W.H.S. (1868), *Hippocrates Collected Work,* Cambridge Harvard University Press. Page. 11
৬২. *Adams* 1891, page: 15
৬৩. *Margotto* 1968, page: 67
৬৪.*Garrison* 1966, page: 93-94
৬৫. *Jones* 1868, page: 46,48,59
৬৬. *Garrison* 1966, page: 99
৬৭. *Singfr & Underwood* 1962, page: 35
৬৮. *Encyclopaedia Britannica* 1911.

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ: চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও আরব প্রতিভার সর্বোপেক্ষা অধিক বিকাশ ঘটে চিকিৎসা বিজ্ঞানে। সপ্তম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ।আরব চিকিৎসকদের সর্বমুখী প্রতিভা তদানীন্তন শিক্ষা প্রথার এক প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁদের অনেকেই ছিলেন যুগপৎ বিখ্যাত পণ্ডিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। তাঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে শত শত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি সেই সুদূর অতীতেও এনাটমি বা রুগ্ন দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন পরীক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখার মতো পারদর্শী লোকের অভাব ছিল না। চিকিৎসা বিশ্বকোষ সচরাচয় পরিদৃষ্ট হতো। আরব চিকিৎসকেরা চক্ষুরোগ, ধাত্রীবিদ্যা ও ভ্রূণ সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা করেছেন। তাঁদের প্রশংসনীয় অনুবাদ কাজের ফলে গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসা পুস্তকসমূহ খ্রিস্টধর্ম সমাজের কুসংস্কার ও অসহিষ্ণুতার গোর হতে উত্থিত হয়ে বাইরের আলো দেখতে পায়। নতুবা এগুলো চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যেতো।

রাযীর কিতাবুল মানসুরী, ইবন সিনার আল-কানুন ফিত-তিব্ব উল্লেখযোগ্য। তেহরান ও কায়রোর কলেজে গৃহীত হওয়ার পূর্বেই কর্ডোভায় শিক্ষার্থীরা ইবনুল হায়সাম ও আলী ইবন ঈসার গ্রন্থাবলী ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। খলীফাদের কুতুবখানায় প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তক পাওয়া যেতো। মুসলিম স্পেনের চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলো ছিল জগতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহের অন্যতম। সর্বসাধারণের স্কুল-কলেজ ব্যতীত খ্যাতনামা চিকিৎসকদের নিজস্ব বিদ্যালয় হাসপাতাল থাকতো। বহু চিকিৎসকের পুত্র পিতার চিকিৎসা ব্যবসায় জড়িত থাকার কারণে বংশানুক্রমিক প্রতিভা, কৌশল ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতেন।

### চিকিৎসা শাস্ত্রে আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর-রাযীর অবদান

মুসলিম চিকিৎসাবিদগণের মধ্যে আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর-রাযী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ। পাশ্চাত্যে তিনি রাজেস (Razes) নামে পরিচিত। তিনি ৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রাজধানী তেহরানের অন্তর্গত রে নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।তাঁর নামের আর-রাযী অংশটি এসেছে তাঁর জন্মস্থল 'রে' থেকে, যার অর্থ তিনি 'রে'-এর অধিবাসী।[৬৯]

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই তাঁর কথা বলতে হয়। তবে তিনি শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না, ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ এবং দার্শনিক। ভীষণ মেধাবী এই মানুষটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক অবদান রেখেছেন, যা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচিত দু'শোরও বেশি বইয়ের পাতায়। তবে চিকিৎসক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সারাজীবনতিনি চিকিৎসা কাজেই অতিবাহিত করেন।বিভিন্ন আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে অসামান্য অগ্রগতি সাধান করে গেছেন, সেজন্যই তাঁকে বেশি স্মরণ করা হয়।

শিক্ষা জীবনের প্রথমে আর-রাযী চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে এতোটা আগ্রহী ছিলেন না। ধারণা করা হয়, তাঁর বয়স যখন ত্রিশের কোঠা পার হয় তখন তিনি চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। তাই তৎকালীন শিক্ষা-দীক্ষায় সবচেয়ে উন্নত শহর বাগদাদে চলে যান। সেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশোনা করে কিছুদিন নেশাপুরের বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে শিক্ষকতার পাশাপাশি আলকেমী ও ভেষজতত্ত্বে গভীর গবেষণা করেন। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবন ইসহাকের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। রসায়ন শাস্ত্রেও তাঁর অত্যন্ত দখল ছিল এবং যৌবনে তিনি বহুদিন আলকেমী সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেছিলেন। তিনি কেবল গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানই শিক্ষা করেননি, ইরানী চিকিৎসা প্রণালী ও ভারতীয় আয়ুর্বেদী শাস্ত্রেও জ্ঞান অর্জন করেন।[৭০]

বাগদাদে কর্মকালীন রে এর গভর্নর মানসুর ইবন ইসহাক তাঁকে রে শহরে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানান এবং রে হাসপাতালের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। আর-রাযী মানসুর ইবন ইসহাককে দু'টি বই উৎসর্গ করেন- 'দ্য স্পিরিচুয়্যাল ফিজিক' এবং 'কিতাব আল-মানসুরী'। নতুন চিকিৎসক হিসেবে বেশ ভালোই সুনাম কুড়িয়েছিলেন আর-রাযী। ফলে

---

৬৯. মু. আবুল কাসেম ভূঁইয়া, *ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাবাজার, বাংলাপ্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৩২

৭০. আখতার-উজ-জামান, *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, জানুয়ারি-২০১০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২২৬

বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল মু'তাদিদ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং নতুন স্থাপিত একটি হাসপাতালের প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি কিছুকাল খলিফা আল-মু'তাদিদ-এর প্রধান চিকিৎসকও ছিলেন। বাগদাদ শহরে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনোচিকিৎসক ছিল না। এ সময় পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে দলে দলে রোগী তাঁর নিকট নিরাময়ের আশায় ছুটে আসতো। খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, সিরীয়, ইরানী প্রভৃতি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা তাঁর পদতলে শিক্ষা লাভের আশায় ভিড় জমাতো।

আর-রাযীর চিকিৎসা প্রণালী যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সহধর্মীছিলো, তেমনি তাঁর শিক্ষা প্রণালীও ছিলো উন্নত ধরনের। তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন এবং হাসপাতালে রোগীর আশে-পাশে অবস্থান করে তাদের সেবা করার এবং তৎসঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উপদেশ দিতেন। 'সার্জারী' বা অপারেশনেও তাঁর হাত ছিলো অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এ বিষয়ে তিনি গ্রীকদের চেয়েও উন্নত পন্থা অবলম্বন করতেন। আর-রাযীর হাতে চিকিৎসা লাভ করা তৎকালের রোগীরা আল্লাহর অপূর্ব নিয়ামত মনে করতো এবং সবচেয়ে নিরাপদ ভাবতো। ফলে তাঁর খ্যাতি, সম্মান ও প্রতিপত্তি যেমন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এর সাথে সাথে প্রচুর অর্থাগমও হয়। এভাবে প্রায় চল্লিশ বছরেরও অধিককাল চিকিৎসা কার্যে আত্মনিয়োগ করে হাকীম আর-রাযী অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

তিনি পেডিয়াট্রিকস, অপথ্যালমোলজি, নিউরোসার্জারি এবং সংক্রামক রোগসহ চিকিৎসা বিদ্যার অনেক শাখার গোড়াপত্তন করেন। তিনি প্রায় ২০০-এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে চিকিৎসার বিভিন্ন প্রণালী, রোগের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব, অভিজ্ঞ চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও সবরকম রোগের চিকিৎসায় অপটুতার হেতু, ভীতু রোগী চিকিৎসককে ভয় করে কেন এবং সাধারণ চিকিৎসক ও জনসাধারণের বোধগম্য বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। প্রায় প্রত্যেক রোগ সম্বন্ধেই তিনি ছোট ছোট বই লেখে গেছেন। অনুবাদের বদৌলতে তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী এবং ধ্যান-ধারণা মধ্যযুগের ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিদ্যাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো।[৭১]

অন্যতম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর-রাযী কর্তৃক রচিত বেশকিছু গ্রন্থ পাশ্চাত্যের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হতো। আর-রাযীর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে- 'আল কিতাব আল হাওয়ি'; দ্যা ভার্চুয়াস লাইফ'; আল জুদারি ওয়াল হাসবাহ'; আল মানসুরি' প্রভৃতি। 'আল কিতাব আল হাওয়ি'; গাইনোকলজি, অবেস্ট্রিকস এবং অপথ্যালমিক সার্জারির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। বলা হয়, আর-রাযীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, 'আল কিতাব আল হাওয়ি'। যা সর্বপ্রকার রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাসহ চিকিৎসার প্রণালী ও ঔষধের ব্যবস্থাসম্বলিত একটি আভিধানিক গ্রন্থ। এই বিশাল গ্রন্থটি ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে এর মাত্র ১০ খণ্ডের অস্তিত আছে। অ্যাংজু বংশীয় সিসিলির রাজা প্রথম চার্লসের আদেশক্রমে ইয়াহুদী চিকিৎসক ফারাজ ইবনে সলিম এ বৃহৎ গ্রন্থটির ল্যাটিন ভাষায় তরজমা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে 'আল কিতাব হাওয়ি' ইউরোপীয় চিন্তা রাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৪৮৬ সালের পর থেকে ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই এই অনুবাদটি ক্রমাগত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বইটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র মুদ্রণ অজস্রভাবে হয়েছিলো। 'আল কিতাব হাওয়ি'র ৯ম খণ্ডটি ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ১৬শতক পর্যন্ত পাঠ্য ছিলো। এই গ্রন্থটিতে আর-রাযী প্রত্যেক রোগ সম্বন্ধে প্রথমে গ্রীক, সিরীয়, আরবী, ইরানী ও ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেছেন। তারপর নিজের মতামত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৭২]

এছাড়া ৯ ভলিউম বিশিষ্ট রচিত 'দ্য ভার্চুয়াস লাইফ, বইটিতে গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এবং প্লেটোর কাজ সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্টিশীল ধারণা দেয়া হয়। এই বইটিতে আর-রাযী বিভিন্ন অর্জিত জ্ঞান, নানা রকম রোগ এবং তাঁর চিকিৎসা নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ একত্রিত করেন। শুধুমাত্র এই বইটির জন্য অনেক পণ্ডিত

---

৭১. ইকবাল কবীর মোহন, *https://www.kalerkantho.com.islamiclife*, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-রাজরি অবদান, ১৩.০৮.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

৭২. *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

তাঁকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বিবেচনা করেন। বইটি ইউরোপে 'The large comprehensive'বা 'Continens Liber'নামে পরিচিত।[৭৩]

আর-রাযীর সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে বসন্ত ও হাম সম্পর্কে 'আল জুদারী ওয়াল হাসবাহ্' নামক পুস্তকে বিস্তৃত ও বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা। তিনিই প্রথম চিকিৎসক, যিনি হাম এবং গুটি বসন্তকে আলাদা রোগ হিসেবে চিহ্নিতকরেন। এর আগে দু'টো রোগকে একই ভাবা হতো। ল্যাটিন ও ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই এ গ্রন্থটির অনুবাদ করা হয়। ইংরেজি ভাষাতেই ১৪৯৮ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৪০ বার এ গ্রন্থটির অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। খ্রিস্ট জগত আর-রাযীর মাধ্যমেই এ দু'টি রোগ সম্পর্কে জানতে পারে।[৭৪]

ইরানে অবস্থানকালে আর-রাযী *'কিতাবুল মানসুরী'* নামে দশ অধ্যায়ের যে বিরাট চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তা ১৫০০ শতকের অষ্টম পাদে মিলান শহরে ল্যাটিন তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এর ফারসী ও জার্মান সংস্করণও প্রকাশ করা হয়। *'কিতাব আল-মুলুকী'* নামের একটি চিকিৎসা গ্রন্থ তিনি তাবারিস্তানের শাসক আলী ইবনে ওয়েহ সুনানের নামে উৎসর্গ করেন।

আর-রাযী রচিত আরেকটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হচ্ছে-*Doubts about Galen.*এই বইটিতে তিনি গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের অনেক ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের সাথে গ্যালেনের অনেক দাবিই সাংঘর্ষিক ছিল। এমনকি গ্যালেন জ্বরের যে লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন, আর-রাযী জ্বরের রোগীর সাথে এর কোনো মিল পাননি। আর-রাযীর *The Diseases of children*বইটি পেডিয়াট্রিকসকে চিকিৎসা বিদ্যার স্বতন্ত্র একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।[৭৫]

আর-রাযীই সর্বপ্রথম 'তিব্বে রূহানী' বা ইলাজ-নফসানী' তথা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার কথা চিন্তা করেন এবং তাঁর গ্রন্থাদিতে এ ধরনের চিকিৎসা প্রণালীর উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। মনোবিদ্যা বিষয়ে আর-রাযীর শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে *'মানসিক শরীর'*নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এর দ্বারাই একজন চমৎকার মনোবিদ ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মানব চরিত্রের নিখুঁত বিশ্লেষণ ও নৈতিক জীবন গঠনের জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাদানে গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর-রাযী ফারসী সভ্যতার আবহাওয়ায় বর্ধিত, গ্রীক সভ্যতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী এবং আরবী সভ্যতায় শিক্ষিত মানুষ। অতএব তাঁর এ গ্রন্থটি প্রথম দু'টি সভ্যতার অপূর্ব ও সুনিপুণ সংমিশ্রণ। বস্তুত এখানে বিজ্ঞান ও অর্ধবিদ্যার এক উত্তম সংশ্লেষণ, যা বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদের মানসে রূপ পেয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই সমগ্র আরবী সাহিত্যে গ্রন্থটি অতুলনীয়।

আল-রাযীর পর্যবেক্ষণ শক্তি কতো তীক্ষ্ম ছিলো এবং তিনি কতদূর সাবধানী চিকিৎসক ছিলেন একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যখন বাগদাদের রাজচিকিৎসক সে সময় বাগদাদের প্রধান হাসপাতালের জন্য স্থান নির্বাচনের ভার তাঁর ওপর দেয়া হয়। তিনি প্রথমে কয়েক স্থানে কাঁচা গোশতের টুকরা ঝুলিয়ে রাখেন। তারপর সেগুলোকে পরীক্ষা করে যে জায়গার গোশত সবচেয়ে কম পঁচনশীল দেখা গেল, সেখানেই হাসপাতালের স্থান নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন।

আর-রাযী চিকিৎসা ক্ষেত্রে নৈতিকতা নিয়েও কাজ করেছেন। তিনি সে সময়ে শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভুয়া ডাক্তারদের দমন করেন। একই সাথে তিনি এটাও বলে গেছেন যে, উচ্চ শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কোনো চিকিৎসকের কাছেও সব রোগের নিরাময় নাও থাকতে পারে। তবে তিনি চিকিৎসকদের আধুনিক জ্ঞান এবং নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হতে বলেছেন। তিনি গরীব, অসহায় লোকজন, মুসাফিরদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তিকা রচনা করেন, যাতে করে ডাক্তার কাছে না থাকলেও নিজেদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারে।

---

৭৩ .সাবরিনা সুমাইয়া, *https://roar.media/bangla/main/biography/abu-bakr-al-razi-the-most-important-figure-in-islamic-medicine,*আবু বকর আল রাযি: আরবীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাণপুরুষ,৩০.১১.২০১৭ (থেকে উদ্ধৃত)

৭৪. *https://bn.wikipedia.org/wiki/আল রাযি (থেকে উদ্ধৃত)*

৭৫.মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী*, ঢাকা: নিউ এলিফ্যান্ট রোড, র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৮৬-৮৮

আর-রাযী আল কেমীর চর্চা করতেন। তিনি নানা প্রকার এলকোহলিত স্পিরিটও আবিষ্কার করেন। তাছাড়া হীরাকষকে শোধন করে তিনি গন্ধক দ্রাবক তুঁতিয়া প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি আল কেমী বিষয়ে *'কিতাবুল -আসরার'* বা রহস্যের গ্রন্থ নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এটি জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয় (১১৮৭খ্রি:) এবং চতুর্দশ শতক পর্যন্ত রসায়ন শাস্ত্রেও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে এটি সারা ইউরোপের পাঠ্যপুস্তক ছিলো। আল কেমীর অনুশীলনে আর-রাযী যদিও জাবীর ইবনে হাইয়ানের মতানুসারী, তবুও তিনি পদার্থের শ্রেণি বিভাগে মৌলিক নীতি অনুসরণ করেছেন। জাবলি ও অন্যান্য আরবী রাসায়নিকরা খনিজ পদার্থকে 'জিস্‌ম' অর্থাৎ শরীর (যেমন সোনা, লোহা, রোপা ইত্যাদি), 'নফস' অর্থাৎ আত্মা (যেমন গন্ধক, আর্সেনিক) ও 'রূহ' অর্থাৎ জীবনীশক্তিতে (যেমন পারা) বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু আল-রাযী সব রকম রাসায়নিক পদার্থকে উদ্ভিদ, প্রাণী ও খনিজ হিসেবে বিভক্ত করেছেন এবং এই শ্রেণি বিভাগ আধুনিক কালেও চলে আসছে। খনিজ পদার্থকে তিনি তরল ও নিরেট দ্রব্য, প্রস্তুর, গন্ধক, সোহাগা ও লবণে বিভাগ করেছেন এবং উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী স্পিরিটে পার্থক্য দেখিয়ে শেষোক্ত পর্যায়ে তিনি গন্ধক, পারদ, আর্সেনিক ও সালএমোনিয়াকে স্থান দিয়েছেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি করার প্রণালীও উদ্ভাবন করে সকলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। ইউরোপে পানি থেকে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরির প্রণালীগুলো শতক পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল।

চিকিৎসক হিসেবে আর-রাযী অতুলনীয় নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান বিবেচনা করলে তাঁকে তুলনা করা যায় তাঁর এক শতাব্দী পর জন্ম নেয়া চিকিৎসক ইবনে সিনার সাথে। অনেক বিশেষজ্ঞ আর-রাযীকে মধ্যযুগের সেরা চিকিৎসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁকে সে সময়ের সবচেয়ে সৃজনশীল লেখক বলেও মানা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহুবিধ মূল্যবান অবদানের জন্য তাকে 'চিকিৎসকদের চিকিৎসক' বলা হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর-রাযীর অসামান্য জ্ঞানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর এবং সর্বসম্মতিতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসাবিদ এবং বিশ্বের সকল যুগের চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম। পণ্ডিতদের মতে, দার্শনিক ইবনে সিনা ও রুশদের পর আর-রাযী ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম মনীষীই মধ্যযুগীয় শিক্ষা ও রেনেসাঁয় অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হননি। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে-

The greatest physician of the Islamic world.

অর্থ: আল রাযী হলেন ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক। এডওয়ার্ড জি. ব্রাউনি আল-রাযীর উচ্ছ্বসিত প্রসংশায় বলেন-

The greatest and most original of the Muslim physicians and one of the most prolific as an author.

অর্থ: আল রাযী হচ্ছেন সকল মুসলিম চিকিৎসকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক চিকিৎসাবিদ এবং ফলপ্রসূ লেখক।[৭৬]

## চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে সিনার অবদান

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে আবু আলী ইবনে সিনা নামে এক অনন্য জ্ঞানসাধক এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবী জুড়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানে যার অবদান অনস্বীকার্য। মনীষীগণ নির্ধারিত কোনো দেশের নাগরিত্ব ও গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থেকে যেখানেই ভূমিষ্ট হয়ে থাকুন না কেন বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করাই হলো তাঁদের মূল লক্ষ্য। আর এ কারণেই ইবনে সিনাকে একই সাথে ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান এবং রাশিয়ার বিজ্ঞজনেরা তাদের জাতীয় জ্ঞানবীর হিসেবে দাবি করে থাকেন। মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত রচনায় অসামান্য অবদান রাখার কারণেই তাঁর এই সম্মাননা। ইবনে সিনাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী একজন সফল বিজ্ঞানী মনে করা হয় এবং মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি জ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি একাধারে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, গণিত, জ্যামিতি, ন্যায়শাস্ত্র, খোদাতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে অসীম জ্ঞান লাভ করেন। তবে পরবর্তী পণ্ডিতবর্গ তাঁর অর্জিত জ্ঞানসমূহ পর্যালোচনা করে বলেন, এ সকল বিষয়ের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানেই তিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন এবং মানবতার কল্যাণ সাধনে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন মতবাদ ও উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি সংযোজনের কারণে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো:

৭৬. *ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

পুরো নাম আবু আলী আল হোসাইন ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা আল বুখারী। আরবিতে তাঁকে আশ-শায়খ আর-রাঈস তথা জ্ঞানীকুল শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ল্যাটিন ইউরোপে তিনি আভিসিনা (Avicenna) নামে সমধিক পরিচিত এবং হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম Aven Sina(আভেন সিনা)।[৭৭]

ইবনে সিনা বুখারার (বর্তমান উজবেকিস্তান) অন্তর্গত খার্মাতায়েন জেলার আফসানা অঞ্চলের কারমাইথান (সূর্যের স্থান) নামক গ্রামে ২২ আগস্ট (মতান্তরে ডিসেম্বর) ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী পঞ্জিকা অনুসারে তা ছিল ৩৭০ হিজরীর সফর মাস।[৭৮] পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম সিতারা বিবি।[৭৯]ইবনে সিনার পিতা আব্দুল্লাহ মূলত বলখ তথা আফগানিস্তানের অধিবাসী হলেও ইবনে সিনার বয়স যখন ৬ বছর তখন ছেলেকে নিয়ে তিনি বোখারায় চলে আসেন এবং সুশিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। ইবনে সিনার বাল্যশিক্ষা সেখানেই শুরু হয়। সে সময় বোখারা ছিল মুসলিম জাহানের জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র। ইবনে সিনার মেধা ছোটকাল থেকেই সবার নজরে আসায় তখনকার সময়ে তাঁকে বিস্ময়কর বালক হিসেবে ধরা হয়। মাত্র ১০ বছরেই ইবনে সিনা পবিত্র কুরআনের ৩০ পারা মুখস্থ করে ফেলেন এবং আরবী সাহিত্যে দক্ষ হয়ে ওঠেন। এর পাশাপাশি তিনি প্রাসঙ্গিক বিদ্যাও রপ্ত করতে থাকেন।[৮০]

প্রথমে এক ভারতীয় গণিতশাস্ত্রবিদের নিকট ইবনে সিনা গণিতশাস্ত্রের অনেক বিষয় আয়ত্ত করেন। এরপর তিনি ইসমাইলী শাস্ত্রের আইন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন।[৮১] অত:পর ইবনে সিনার পিতা তৎকালীন অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব আল নাতেলীকে নিজের গৃহে থাকার ব্যবস্থা করে দেন এবং এই শিক্ষকের কাছেই ইবনে সিনা ফিকহ, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ছোট কালেই ইবনে সিনার প্রখর মেধা দেখে নাতেলী বিস্মিত হয়ে পিতা আব্দুল্লাহকে বলেছিলেন- আপনার ছেলে একদিন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হবে। খেয়াল রাখবেন, ওর পড়াশোনায় যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।[৮২] পরবর্তীতে ইবনেসিনার শিক্ষক হিসেবে আরও দু'জন নিযুক্ত হন। তাঁরা হলেন- ইবরাহীম ও মাহমুদ মাসসাহ।[৮৩]

একটু বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইবন সিনাকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য অনেকটা নিজের ওপর নির্ভর করেই চলতে হয় এবং অপারগ হয়ে নিজেই নিজের শিক্ষক বনে যান। এ সম্বন্ধে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেন-
"যেকোন সমস্যার সমাধান ওস্তাদ যেরূপ করতেন, আমি তার চেয়ে ভালোভাবে করতে পারতাম। ওস্তাদ নাতেলীর কাছে জাওহারির মানতিক বা তর্কশাস্ত্রের খনি নামক বইটি মুখস্থ করার পর বুঝলাম, আমাকে শেখাবার মতো নতুন কিছু তাঁর কাছে নেই। তখন বইগুলো আরো একবার পড়তে শুরু করলাম। ফলে সকল বিষয়ে আমি বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলাম।... টলেমির ১৩ খণ্ডের *আলমাজেস্ট* বইটি শুরু করে সমস্যার সম্মুখীন হলে ওস্তাদ বললেন, তুমি নিজে সমাধান করতে চেষ্টা করো এবং যা ফল দাঁড়ায় এনে আমাকে দেখাও। আমি বিচার করে রায় দেবো। একে একে সব সমস্যার সমাধান করে ওস্তাদের সম্মুখে হাজির করলাম। তিনি দেখে-শুনে বললেন, ঠিক হয়েছে, সব ক'টিই নির্ভুল সমাধান হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, এ ব্যাপারে ওস্তাদ আমার কাছ থেকে কিছু নতুন তথ্য শিখে নিলেন।"[৮৪]

এ সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্রষ্টাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। অ্যারিস্টটলের দর্শন সম্পূর্ণ ধাতস্থ করেন এসময়েই। এ সময় তাঁর খ্যাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে পড়তে আসতো। ফলে তিনি তরুণ বয়সেই শিক্ষকতা শুরু করলেন।[৮৫]

---

৭৭. Mahdi M. Gutas D. *Avicenna, Encyclopedia Iranica.* London: Routledge and Kegan Paul; 1987. V-3.p. 2
৭৮. Ibn Abi Usaybia, *Uyun al-Anba* ,Cairo: al-Matbaa al-Wahhabiyya: 1299 AH, Vol. II, p. 2
৭৯. Willim E. Gohlman, *THE LIFE OF IBN SINA,* Albany, New York PRESS: 1974, p.17
৮০. সাইফ ইমন,'ইবনে সিনার বিস্ময়কর জীবন' *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*,০৪.০৫.২০১৮, পৃ. ৫ (থেকে উদ্ধৃত)
৮১. Al-Bayhaqi, *Tarikh hukama al-Islam,* Damascus: Mataat al-Taraqqi:1946, p. 53
৮২. সৈয়দ আবদুস সুলতান, *ইবনে সীনা: সংক্ষিপ্ত জীবনী*, রাজশাহী: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, জুন ১৯৮১, পৃ. ৬-৭
৮৩. আবু জাফর, *রাষ্ট্র দর্শনে মুসলিম মনীষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৭৯, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. ৪৭
৮৪ . *bn.Wikipedia.org/wiki/Ibnsina*(থেকে উদ্ধৃত)
৮৫ . সাইফ ইমন, 'ইবনে সিনার বিস্ময়কর জীবন', *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ০৪.০৫.২০১৮, পৃ. ৫(থেকে উদ্ধৃত)

৪ রামযান, ৪২৮ হিজর/২১ মোতাবেক জুন ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে ৫৮ বছর বয়সে বিশ্বের অন্যতম এই জ্ঞান তাপস ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর হামাদানে এখনও বিদ্যমান রয়েছে।[৮৬]

### চিকিৎসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ

বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়েইবনে সিনার মনে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তাই তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শীতা অর্জন করে দু:স্থ মানবতার সেবা করার জন্য মনস্থির করেন। এজন্য তিনি চিকিৎসা বিষয়ক যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন এবং এ সংক্রান্ত নতুন নতুন পদ্ধতি রপ্ত করতে থাকেন। কয়েক বছরের মধ্যেই একজন বিখ্যাত ও স্বনামধন্য চিকিৎসক হিসেবে তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং জটিল রোগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ইবনে সিনা চিকিৎসক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন।

বোখারায় বাদশাহ নূহ বিন মনসুর এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে দেশ-বিদেশের কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারছিলেন না। ইতিপূর্বে বাদশাহ চিকিৎসক হিসেবে ইবনে সিনার সুখ্যাতি শুনেছেন। তাই সুস্থ হওয়ার শেষ ভরসা হিসেবে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ইবনে সিনা বাদশাহেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে রোগ সম্পর্কে অবহিত হলেন। অত:পর মাত্র কয়েক দিনের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠলে বোখারায় চিকিৎসক হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। আরোগ্য লাভের পর ইবনে সিনার ইচ্ছানুসারে বাদশাহ পুরস্কার হিসেবে তাঁকে শাহী কতুবখানায় প্রবেশ করে অধ্যয়নের সুযোগ দেন এবং তিনি লাইব্রেরির সকল বই কিছু দিনের মধ্যেই পড়ে ফেলেন।[৮৭]

### মনস্তাত্ত্বিক আজব চিকিৎসা

একবার পারস্যের এক শাহজাদার আজব এক রোগ দেখা দিল। শাহজাদা কিছুই না খাওয়ার কারণে দিন দিন তার শরীর একদম শুকিয়ে যেতে লাগলো। সে চিৎকার করে সারাক্ষণ শুধু হাম্বা হাম্বা করে ডাকে আর বলে আমি গরু হয়ে গিয়েছি, আমাকে জবাই করো এবং আমার গোশত দিয়ে কাবাব বানাও। তার রোগ সারানোর জন্য একে একে রাজ্যের সব হেকিম, কবিরাজ ডাকা হলেও কোনো লাভ হলো না। কারণ শাহজাদাকে কোনো কিছুই খাওয়ানো যায় না। এমনকি কোন ওষুধও সে খেতে চায় না। এমতাবস্থায় শাহজাদার চিকিৎসার জন্য ইবনে সিনাকে বাদশাহ ডেকে পাঠান। সব ঘটনা শুনে তিনি বললেন, শাহজাদাকে খবর দাও যে এক্ষুণি একজন কসাই আসছেন, যিনি গরুটাকে জবাই করে তার গোশত দিয়ে কাবাব তৈরি করবেন। এ কথা শুনে শাহজাদা নিজেই ইবনে সিনার কাছে হাজির হয়ে বলল- এসো আমাকে জবাই করে গোশত দিয়ে কাবাব বানাও। ইবনে সিনা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ছুরি চালাতে গিয়ে সাথে সাথে থেমে গেলেন। চুখে-মুখে একটা ঘৃণার ভাব এনে বললেন- নাহ্! গরুটা একদম শুকিয়ে গেছে, এর গোশত দিয়ে মোটেও কাবাব হবে না। একে জবাই করে কোনো লাভ নেই। বরং আগে বেশি খাইয়ে-দাইয়ে একে মোটা-তাজা করো। তারপর নিয়ে এসো, জবাই করে দেবো। ইবনে সিনার কথায় সে ভাবলো- 'সত্যিই কি আমি এতো শুকিয়ে গেছি যে কসাইও আমাকে জবাই করতে ঘৃণা করলো। তাহলে তো মোটা-তাজা হওয়ার জন্য এখন থেকেই ভালো খাবার খেতে হবে। এই ফাঁকে ইবনে সিনা গোপনে বাদশাহকে পরামর্শ দিলেন, শাহজাদাকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে এবং তাতে মিশিয়ে দিতে হবে আমার দেয়া কিছু ওষুধ। মোটা-তাজা হওয়ার লোভে শাহজাদা খাবারের সাথে মিশ্রিত ইবনে সিনার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী নানা পুষ্টিকর ওষুধও খেতে শুরু করলো। তাঁর আজব এই মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ফলে অল্পদিনেই শাহজাদা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করল এবং তার চেহারায় পূর্বের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্টতা ও লাবণ্যতা ফিরে আসলো।[৮৮]

### গ্রন্থাবলী

ইবনে সিনার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে। কথিত আছে, তিনি মোট ৪৫০টি গ্রন্থ রচনা করেন। যার প্রায় ২৪০টি গ্রন্থ এখনো টিকে আছে। এর মধ্যে ১৫০টি হলো দর্শন সম্পর্কিত এবং ৪০টি চিকিৎসা সম্পর্কিত। এছাড়াও তিনি মনোবিদ্যা, ভূবিদ্যা, গণিত, মহাকাশবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কেও অনেক গ্রন্থ রচনা

৮৬. সৈয়দ আবদুস সুলতান, *ইবনে সীনা: সংক্ষিপ্ত জীবনী*, রাজশাহী: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, জুন ১৯৮১, পৃ. ২৭

৮৭ .আবদুস শহীদ,'কোয়ারেন্টিন ধারণার উদ্ভাবক ইবনে সিনা', *দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন)*, ২১.০৬.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

৮৮. *https://parstoday.com* :ইবনে সিনার গল্প (থেকে উদ্ধৃত)

করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সের পর থেকেই ইবনে সীনা বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। ২১ বছর বয়সে তিনি *আল মুজমুয়া* নামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। এর মধ্যে গণিত ছাড়া সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেন।[৮৯]ইবনে সিনার বিখ্যাত কিছু গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(১) *কিতাব আশ-শিফা*: এ গ্রন্থটি তিনি অল্প বয়সে রচনা করেন। এটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। কিতাব আশ-শিফা, যা চার খণ্ড বিশিষ্ট একটি এন্সাইক্লোপিডিয়া। এ গ্রন্থে সমগ্র দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন।[৯০](২) *আন-নাজাত*: এটি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং এর এক অংশ আশ-শিফা থেকে সংকলিত।[৯১](৩) *আল-ইশারাত ওয়াত তানবীহাত*: এটি তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। জীবনের শেষভাগে তাঁর দার্শনিক চিন্তার সংশোধনের পর তিনি এ পুস্তক রচনা করেন। এটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়।[৯২] (৪) *আল-কানুন ফিত-তিব্ব* বা সংক্ষেপে *আল-কানুন*: চিকিৎসা সংক্রান্ত এটি একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। (৫) *আল-আদরিয়াতুল কালবিয়া*: এই গ্রন্থটি তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়; (৬) *মাজমু* (কমপেনডিয়াম); (৭) *বাদ-দীন* (অশুভ ধর্ম সম্পর্কে); (৮) *আল-মুখতাসার আল-আসওয়াত* (মধ্যবর্তী সারসংক্ষেপ); (৯) *আল-হাসিল ওয়া আল-মাহসুল* (দ্রব্য সম্পর্কিত); (১০) *আল-বিরওয়া আল-ইসম* (শুভ ও মন্দ সম্পর্কিত); (১১) *আল-মাদা ওয়াল মা'বাদ* (প্রারম্ভ এবং প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত); (১২) *আল-আরসাদ আল-কুল্লিয়া* (সাধারণ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত); (১৩) *মুখতাসার আল-মাজুসতি* (আলমাগেস্টের সার সংক্ষেপ সম্পর্কিত); (১৪) *কিতাব আল-মা'বাদ* (প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত গ্রন্থ); (১৫) *কিতাব আল-হিদায়াহ* (হিদায়েত সম্পর্কিত গ্রন্থ); (১৬) *রিসালাত হাই ইবনে ইয়াকজান;* (১৭) *কিতাব আল-কুলজান;* (১৮) *আল-আদাবিয়াত আল-কালবিয়া* (কার্ডিয়াক-রেমেডি সম্পর্কিত); (১৯) *লিসান আল-আরব* (আরবদের ভাষা সম্পর্কিত); (২০) *মুখতালার আল-আসগর* (স্মলার এপিটম সম্পর্কিত); (২১) *কিতাব আল-ইনসাফ* (বিচার সম্পর্কিত গ্রন্থ, পুড়ে যাওয়া গ্রন্থাগার থেকে কিয়দাংশ পাওয়া যায়); (২২) *মা দুনিয়াত* (খনিজপদার্থসমূহ সম্পর্কিত); (২৩) *দানেশ নামেহ;* (২৪) *মানতিক আল-মাসরিকিয়িন* এবং (২৫) *আল-হিকমাত আল-মাসারিকিয়্যা*, ইত্যাদি।[৯৩]

**চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান**

চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষত ভেষজ গ্রন্থ রচনায় ইবনে সিনার স্থান মুসলিমদের মধ্যে সবার ঊর্ধ্বে। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিমদের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিনায়ক। অন্ততপক্ষে ছয়শতক ধরে সারা ইউরোপে তাঁর শিক্ষার প্রাধান্য ও প্রভাব স্বীকৃত রয়েছে। এজন্যই তাঁকে "শাইখুর রাইস ফিত-তিব্ব" তথা চিকিৎসা শাস্ত্রের পণ্ডিতদের গুরু বলা হতো এবং পশ্চিমাবিশ্বে তিনি "the prince of physicians" নামে সমধিক পরিচিত।[৯৪]

কিডনী ও মূত্রাশয়ের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ইবনে সিনাই সর্বপ্রথম তাঁর লিখিত *'কানুন ফিত-তিব্ব'*-এ আলোচনা করেন। ক্যাথেটার এর ব্যথা কমানোর জন্য তিনি গোল মাথা বিশিষ্ট একটি ক্যাথেটার ডিজাইন করেন। এছাড়া প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসার কারণ তিনিই প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন।

ইবনে সিনা বিশ্বাস করতেন, রোগী কখনোই সুস্থ হতে পারে না, যদি না তার অসুস্থতার কারণ ও সুস্থতার পন্থা উভয়টিই শনাক্ত করা যায়।[৯৫]

মানব দেহের গঠন আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন- মানব দেহ চার ধরনের উপাদান দ্বারা তৈরি। যথা: উষ্ণ উপাদান, শীতল উপাদান, শুষ্ক উপাদান এবং আদ্র উপাদান। বিষয়টি The Canon of Medicine- তে নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে-

---

৮৯.সাইফ ইমন, 'ইবনে সিনার বিস্ময়কর জীবন' ,*দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ০৪.০৫.২০১৮, পৃ. ৫(থেকে উদ্ধৃত)

৯০. এর কয়েকটি খণ্ড ১৩০৩ হিজরীতে লিথো ছাপাখানামুদ্রিত হয়েছিল

৯১. প্রকাশিত, রোম ১৫৯৩ খ্রি: এবং মিসর ১৩৩১হিজরী

৯২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৬(দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ৪, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

৯৩ .মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী*, ঢাকা: নিউ এলিফ্যান্ট রোড, র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

৯৪. Weisser, U. "Avicenna The influence of Avicenna on medical studies in the West". *Encyclopædia Iranica*. 2011. pp. 126

৯৫. Howell, Trevor H, "*Avicenna and His Regimen of Old Age"*. Age and Ageing. 16 (1): 58 59. doi:10.1093/ageing/16.1.58. PMID 3551552.

The temperaments are reported to be the interaction between the four different element's qualities, such as the conflict between dryness, wetness, cold, and hot. Avicenna suggests that these qualities battle between each other until an equilibrium state is reached and this state is known as the temperaments.[৯৬]

চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা মানুষের জীবনচক্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানব জীবনকে চারটি ধাপে এবং প্রথম ধাপকে আবার পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। মানব জীবনের এই চারটি ধাপ হলো- (ক) ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত যৌবন (খ) ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মধ্যবয়স (গ) ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত পড়ন্ত বয়স এবং (৫) ৬০ বছরের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বার্ধক্য।
প্রথম ধাপ যৌবনের পাঁচটি ভাগ হলো- (ক) নবজাতক (খ) শিশু (গ) বালক/বালিকা (ঘ) কিশোর/কিশোরী এবং (ঙ) তরুণ/তরুণী।[৯৭]
ইবনে সিনা সোনা ও রূপার রোগ মোচনের ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এরকম ধারণা করাও অসংগত নয় যে তাঁর লেখা থেকেই সোনা ও রূপার সূক্ষ্মপাত দিয়ে বড়ি মোড়ার বর্তমান রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। তিনি কেন্দ্রীয় ও পার্শ্ব প্যারালাইসিস রোগসমূহকে পৃথকভাবে নির্ণয় ও প্রতিকার করতেন। তিনি চোখের ছানি নিরাময় করার প্রণালীও জানতেন।[৯৮]

ইবনে সিনা বক্ষ ক্যান্সারে লেড বা কপার অক্সাইড ব্যবহার করে একে সীমিত রাখার চিকিৎসা দিতেন। তিনিই সর্বপ্রথম মস্তিষ্কে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ঝিল্লির প্রদাহ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাছাড়া তিনি যক্ষা রোগের সংক্রামক, প্রকৃতি, প্রাণী ও মৃত্তিকা দ্বারা রোগ বিস্তারের ধারণা ও কৃমি রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন।
তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে কুসংস্কার পরিহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সে সময় তিনি গ্যালেন-এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। ইবনে সিনা রোগ-জীবাণুর আক্রমণ সম্বন্ধে প্রথম ঘোষণা করেন- শরীরের বাইরে থেকে জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সংক্রমণ হয় না এবং সংক্রামক রোগ হতে পারে না। তিনিই ঘোষণা করেন, যক্ষা একটি সংক্রামক রোগ। ইবনে সিনা প্রথম মেনেনজাইটিস রোগটি সনাক্ত করেন এবং পানি ও ভূমির মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় সেগুলো তিনি আবিষ্কার করেন।

তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করার পর চিকিৎসাকার্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞানের প্রসঙ্গে বলা হয়- যখন চিকিৎসাশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিলো না, তখন হিপোক্রিটাস এর জন্ম দেন। যখন এ শাস্ত্র মৃত প্রায়, তখন গ্যালেন এ শাস্ত্রকে পুনর্জীবিত করেন। আর যখন এ শাস্ত্র বিক্ষিপ্ত ও গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন আর-রাযী একে সুসংবদ্ধ করেন। আর এ শাস্ত্র যখন অসম্পূর্ণ ছিল, তখন ইবনে সিনা এ শাস্ত্রকে সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা দান করেন। [৯৯]
ইবনে সিনা তাঁর বইগুলোতে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতির বর্ণনা করেছেন। যেমন: গালফার ঔষধ, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ, ক্যালসিয়াম পলিসালফাইড, কপার ও সোনার ভস্মীকরণ, সালফারের প্রস্তুতি প্রভৃতি।

৯৬. Laleh Bakhtiar, *Canon of Medicine* (2nd ed.). New York, NY: AMS Press, Inc. ISBN 0-404-11231-5
৯৭. Lutz, Peter L. *The Rise of Experimental Biology: An Illustrated History*. Humana Press. p. 60. ISBN 0-89603-835-1
৯৮.আখতার-উজ-জামান, *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, জানুয়ারি-২০১০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২২৫
৯৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ*,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯

**চিকিৎসা বিজ্ঞানে *'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'***

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর ইবনে সিনা কর্তৃক রচিত *'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'* একটি বৃহৎ, ব্যাপক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে প্রাচীন ও সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ইসলামী আমলে লব্ধ জ্ঞান অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণেই আল-কানুন পুস্তকটি প্রকাশের পর গ্যালেন, রাযী ও আলী ইবন আব্বাসের রচনাবলীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্রই পরবর্তী ছয়শত বৎসর অর্থাৎ সপ্তদশ পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা আল-কানুনের ভিত্তিতেই হতো। প্রাচীন চিকিৎসার চরম উন্নতি গ্যালনের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও ইবনে সিনা তাঁকেও অতিক্রম করে গেছেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় ইবনে সিনা খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ইবনে সিনা গ্রন্থি ব্যথার ১৫টি কারণ বর্ণনা করেছেন। চক্ষুর আবরণের প্রদাহ বর্ণনায় তিনি মধ্যস্থিত এবং পার্শ্বস্থ আবরণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, ক্ষয়রোগ একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এ রোগ বিস্তারে বাতাস ও পানির প্রভাব খুব বেশি। চর্মরোগের যথাযথ বর্ণনা দেয়া ছাড়াও তিনি ধাতুগত পীড়া ও ধাতু ও ধাতুগত বিকৃতি, স্নায়ুবিক উপসর্গ এমনকি প্রেমজনিত পীড়াও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি মানসিক ও পীড়াগত তথ্যের নিদান নিরূপন ও এর বিশ্লেষণ করেন। এখান থেকেই মনোবিশ্লেষণ (psycho-analysis) শুরু হয়। ভেষজ দ্রব্যগুণ বিষয়ে তিনি ঔষধসমূহের যথার্থ তত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যায় অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহের একটি নকশা তৈরি করেন।[১০০] ইউরোপে এ পুস্তক *Cannon medicina* নামে সুপ্রসিদ্ধ। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ চার খণ্ডে রোমে মুদ্রিত হয়।[১০১]

আল-কানুন ফিত-তিব্ব গ্রন্থটি ১১৫০ সালে জেরারড ক্রেমোনা প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপরই সারা পৃথিবীতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। অত:পর কয়েক খণ্ডের অনুবাদ খ্রিস্ট্রিয় ১৫ শতক শেষ হওয়ার পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে। অনেকে এ পুস্তকের সমগ্রভাবে এবং বিশেষ বিশেষ অংশের টীকা ও সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করেছেন। যেমন: (১) ইবনুন নাফীস, (২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, (৩) কুতবুদ্দীন মাহমুদ, (৪) কুতবুদ্দীন ইবরাহীম, (৫) সাদুল্লাহ, (৬) আল-ইরাকী, (৭) আল-মুওয়াফফাক আস-সামিরী, (৮) ইবন খাতীব, (৯) নাজমুদ্দীন ইবনুল মিনফাক, (১০) ইবনুল আলিমা, (১১) ইবনুল কূফ, (১২) আস-সাদীদ কাযরুনী, (১৩) ইবনুল আরাব মিসরী, (১৪) আল-আমিলী, (১৫) দাউদ আনতাকী, ইনি সংক্ষেপিত কানুনও প্রকাশ করেন, (১৬) আল-খুজিনদী, (১৭) রাফী উদ্দীন জাবালী (১৮) শারাফুদ্দীন রাজসী, (১৯) ইবনুল লাবুদী, (২০) ফাখরুদ্দীন ইবনুস সাআতী, প্রমুখ।[১০২]

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সীনার দ্বিতীয় পুস্তকের নাম *আল-আদবিয়াতুল-কালবিয়া*, কালসী রিফাআত বিলগে (Bilge) তুর্কী ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন, যা আরবী মূলসহ ইবনে সীনার নবম শতবার্ষিকীতে স্মৃতিপুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। নাশাআত উমার ইরদিলিপ (Irdelp) এর উপক্রমণিকা লেখেছেন।[১০৩]

১০ লক্ষ শব্দ সম্বলিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'* চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যমণি ছিলো। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের এরকম আশ্চর্য সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। এ গ্রন্থটিকে ইউনানী ও আরবী চিকিৎসা শাস্ত্রের বৃহৎ ভাণ্ডার বলা চলে। এতে মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের হরেক রকম লক্ষণ, ঔষধের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা প্রণালী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ভেষজ বিভাগে কমপক্ষে ৭৬০ রকম ঔষধের ও উপকারিতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১০৪] যক্ষা ছড়ায় কেনো, সংক্রামক রোগ বিস্তারে পানি ও মাটি কতটুকু সাহায্য করে, গেঁটে বাত রোগের উৎপত্তির আসল কারণ, আমন্ত্রিক জীবাণু ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের জন্য ইবনে সিনার *'কানুন ফিত-তিব্ব'* সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ১৫ শতকের শেষ দিকে 'কানুন ফিত-তিব্ব' কিতাবটি ১৫ বার

---

১০০. *ইসলামী বিশ্বকোষ*,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৪৮৯-৪৯০,

১০১. এর পরবর্তী মুদ্রণগুলো নিম্নরূপ: রোম ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ; তেহরান ১২৮৪/১৮৬৭ (শুধু প্রথম খণ্ড); লিথো ছাপা, লখনৌ ১২৯৬/১৮৭৯ (শুধু জ্বর বিষয়ক এক খণ্ড); লখনৌ ১২৯৮/১৮৮১

১০২.সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৬(দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ৪, পৃ. ৪৯০

১০৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯-৪৯০,

১০৪.মু. আবুল কাসেম ভূঁইয়া, *ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাবাজার, বাংলাপ্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ২৭

ল্যাটিন সংস্করণ ও ১বার হিব্রু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রোমে এর আরবী সংস্করণ সর্বপ্রথম ছাপা হয়। কিন্তু এর সর্বপ্রথম ল্যাটিন তর্জমা করেন ১২ শতকের চিকিৎসাবিদ জিরার্ড। তাঁর অনুবাদই ইউরোপে সাদরে গৃহীত হয় এবং পরবর্তী মনীষী জালিনুস, আর-রাযী ও আল মাজুসীর শিক্ষার পরিবর্তে একমাত্র 'কানুন ফিত-তিব্ব' ইউরোপের প্রত্যেক শিক্ষায়তনে চিকিৎসা বিষয়ের টেক্সটবুক হিসেবে গৃহীত ও পঠিত হয়ে থাকে। ১২ থেকে ১৭ শতক পর্যন্ত ইবনে সিনা ছিলেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষক এবং তাঁর *'কানুন ফিত-তিব্ব'* ছিলো প্রধানতম পাঠ্যপুস্তক।[১০৫]

ইবনে সিনার *'কানুন ফিত-তিব্ব'* গ্রন্থটি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সবার কাছে বিশ্ব নন্দিত ও প্রভাবশালী গ্রন্থ। একাদশ শতাব্দী হতে ১৭শ শতাব্দী প্রায় পাঁচটি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কানুন গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্ধারিত ছিল। প্রখ্যাত মনীষী A.C. Crombic ইবনে সিনা রচিত *'কানুন ফিত-তিব্ব'* গ্রন্থটিকে মেডিকেলের বাইবেল বলে অভিহিত করেছেন। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকার গ্রন্থে টমাস ক্লিফোর্ড উল্লেখ করেছেন- ইবনে সিনার কানুন গ্রন্থটি হিপোক্রোটস ও গ্যালনের কর্তৃত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। অধ্যাপক হিট্টি বলেন: দ্বাদশ শতক হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলোতে এ গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান পথ প্রদর্শক ছিলো। মুসলিম বিশ্বে এখন পর্যন্ত বিশেষ করে ইউনানী পদ্ধতির এটি প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ।[১০৬]

*'আল কানুন ফিত-তিব্ব'*-কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া (medical encyclopedia) বলা হয়।[১০৭] তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বছর ধরে তাঁর লিখিত বইগুলো অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজসহ ইউরোপের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুরুত্বসহকারে পড়ানো হতো।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'* আরবজগৎ থেকে আনীত সর্বাধিক প্রভাবশালী গ্রন্থ। ইবনে সিনার কানুন সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি বলেন, কানুনের আরবী সংস্করণ ১৫৯৩ সালে রোমে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং এটি একটি প্রারম্ভিক যুগের মুদ্রিত গ্রন্থ। আরবী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর স্থান অদ্বিতীয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর রচিত ১৬টি মৌলিক গ্রন্থের ১৫টিতে তিনি বিভিন্ন রোগের কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। মানব সভ্যতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর চেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত দ্বিতীয়টি আর নেই। পাঁচ খণ্ডে এবং ৮০০ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই চিকিৎসা বিশ্বকোষে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে যেনো একসঙ্গে বেঁধে ফেলেছেন।[১০৮]

Avicenna authored a five-volume medical encyclopedia: The Canon of Medicine (Al-Qanun fi't-Tibb). It was used as the standard medical textbook in the Islamic world and Europe up to the 18th century.[১০৯]The Canon still plays an important role in Unani medicine. The Canon of Medicine is divided into five books- তথা *'কানুন ফিত-তিব্ব'* গ্রন্থটিকে ৫টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।[১১০] যার প্রতিটি খণ্ডে আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ৭৬০টি রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

**১ম খণ্ড:** গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড General Principles সম্পর্কিত। এই খণ্ডে মহাজাগতিক বস্তু যা এ বিশ্বজগৎ ও মানবদেহ তৈরি করেছে, বিভিন্ন বস্তুর সাথে মানবদেহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া, অঙ্গসংস্থান, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের সাধারণ বর্ণনার পাশাপাশি মানবদেহ ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের শরীরের বর্হিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন

---

১০৫. আখতার-উজ-জামান, *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, জানুয়ারি-২০১০(দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২২৪-২২৫

১০৬.মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী*, ঢাকা: নিউ এলিফ্যান্ট রোড, র‌্যাক্স পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৮

১০৭. Nasr, Seyyed Hossein . "Avicenna". *Encyclopaedia Britannica Online. 31 October 2007.* (থেকে উদ্ধৃত)

১০৮ . রায়হান রাশেদ, 'চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান' *,দৈনকি কালের কণ্ঠ (অনলাইন)*, ০৩.১১.২০১৭, পৃ. ১৫ (থেকে উদ্ধৃত)

১০৯. Mc Ginnis Jon. *Avicenna. Oxford University Press: 2010. p. 227.*

১১০ . Nasser Mona, Tibi, Aida; Savage-Smith, Emilie (2009). *'Ibn Sina's Canon of Medicine: 11th century rulws for assessing the effects of drugs'*. Journal of the Royal Society of Medicine, PMC, 102 (2): 78-80 (থেকে উদ্ধৃত)

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ এবং তাদের কাজসমূহ বর্ণনা করার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধিও এতে আলোচিত হয়েছে। এতে Physiology এবং Hygiene-এর সাধারণ মূলনীতি রয়েছে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

**২য় খণ্ড:** গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড Materia Medica সম্পর্কিত। এতে চিকিৎকদের ব্যবহৃত প্রায় ৮০০ জিনিসের ব্যবহার তুলে ধরা হয়েছে এবং ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৭৫০টি গুল্ম, প্রাণিজ ও খনিজ ঔষধের বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে বহু ঔষধ এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই খণ্ডে প্রত্যেকটি ঔষধের পরিচিতি, ব্যবহারের পরিমাণ, কার্যকারিতা এবং কোন রোগে কোনটি ব্যবহার্য তা আলোচিত হয়েছে।

**৩য় খণ্ড:** গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড Deases in the individuales organs সম্পর্কিত। এতে মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ, সেগুলোর Symptom, dainosis, prognosis চিকিৎসা এবং etiology সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রোগ যেমন- মাথা ধরা, মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক তাপ, মৃগী, চোখ, কান, নাক, গলা ও দাঁতের অসুখ, হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের রোগ, পৌষ্টিক নালী তথা- পেট, অন্ত্র, যকৃত, পিত্ত ও প্লীহার রোগ, জননেন্দ্রীয় সংক্রান্ত রোগ, গর্ভধারণ ও স্ত্রীরোগ ছাড়াও পেশী সন্ধীস্থান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

**৪র্থ খণ্ড:** গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড General Diseases সম্পর্কিত। এই খণ্ডে যে সকল রোগে মানুষ প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে, যেমন জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, খাদ্যের অনিয়ম, ক্রোধ, ভয়, বেদনা, প্রদাহ, পচন, শারীরিক রসের গোলমাল, মহামারী, বসন্ত, যক্ষা, ফোড়া, কুষ্ঠ ঘা, হাড়ভাঙ্গা, স্থানচ্যুতি, আলসার, খনিজ উদ্ভিদ ও প্রাণীজ পদার্থের বিষক্রিয়া, সৌন্দর্য, প্রসাধনী, চুল, নখ, চর্ম, গাত্রগন্ধ, লিউকোডারমা, পেডিকেলোসিস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১১১]

**৫ম খণ্ড:** গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড Formula for remidies সম্পর্কিত। এতে প্রায় ৬৫০টি ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী ব্যহার, গুণাগুণ এবং বিভিন্ন রোগের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র, বড়ি, পাউডার ও সিরাপ তৈরির ফুরমূলা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

এ গ্রন্থটির আরেকটি বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- স্বচিকিৎসা নামক নতুন একটি ধারা জন্ম দেয়া। স্ব-চিকিৎসা হলো কলাকৌশল ও খাদ্য প্রয়োগ করে সুস্থ, সবল ও নিরোগ থাকা। কলাকৌশল ও খাদ্য সুচিকিৎসার মূল ভিত্তি। দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় সচল ও সক্ষম থাকাই সুস্থতার লক্ষণ এবং এগুলোর ভারসাম্যহীনতা মানে অসুস্থতা নির্দেশ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনা তাঁর এই গ্রন্থে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ৪টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে যোগ করে নতুন এক মাত্রা। পদ্ধতিগুলোর দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় কলাকৌশল প্রনায়াম, যোগব্যায়াম, খেলাধুলা-হাঁটা, ধ্যান, আকুপ্রেশার ও আকুপাংচারসহ যাবতীয় শারীরিক কসরতগুলো প্রথম পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি ছাড়াও অম্ল ও ক্ষারের সমতা বিধান করে pH মাত্রা সঠিক অবস্থায় রাখা। এতে দেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ ও সঞ্চালণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যা জীবন চেতনার অপরিহার্য উপাদান। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতি অকার্যকর হলে তৃতীয় পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে রয়েছে প্রাণীজ ও উদ্ভিদজ উপাদান নিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করে কার্যক্ষম করা।

যদিও এটি বিকল্প পদ্ধতি এবং এর বিধিসম্মত ব্যবহার না ঘটলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। সর্বশেষ পদ্ধতি হলো- শল্যচিকিৎসা। শল্যচিকিৎসকদের মান অনুযায়ী যেখানে নির্ভর করে এর ব্যবহার কিংবা অপব্যবহার। ইবনে সিনা তার বইয়ের একটা অংশে মজা করে বলেছিলেন আনাড়ী শল্যকিচিৎসক তার হাত পাকানোর জন্য "When to Cut" করতে উদগ্রীব থাকেন। কম অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক How to Cut নিয়ে ভাবেন কিন্তু অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক Not to Cut করে রোগীকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।[১১২]

তিনি *'কানুন ফিত-তিব্ব'* কিতাব ব্যতীত চিকিৎসা বিষয়ক আরো **১৫**টি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। আজও হামাদানে ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকের সমাধিস্থলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুধীবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সমবেত

১১১.ড. ইকবাল কবীর মোহন, 'আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৮.০৬.২০২১খ্রি. পৃ. ১০ (থেকে উদ্ধৃত)

১১২. *মেডিভয়েস:* সংখ্যা ৫, বর্ষ ২, জুন-জুলাই ২০১৫ খ্রি:(থেকে উদ্ধৃত)

হন। আজও মরক্কো হতে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের হাকিমরা ইবনে সিনার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দূরারোগ্য রোগের ব্যবস্থা দেন। The Canon still plays an important role in Unani medicine.[১১৩]

তাই ডি. ক্যাম্বেল যথার্থই বলেন- The most famous of Arab physicians and philosophers, his (Avicenna) infiuence extended through out the world of Islam and in the west of Europe, his writings formed the principal reading of the Christian Scholastics.

অর্থ:ইবনে সিনা ছিলেন প্রখ্যাত আরব চিকিৎসক ও দার্শনিক। তাঁর প্রভাব সারা মুসলিম দুনিয়া ও পশ্চিম ইউরোপে প্রসারিত ছিল। তাঁর লেখা খ্রিস্টান পণ্ডিতদের প্রধান পাঠ্য ছিল।[১১৪]

অবশেষে বলা যায, ইবনে সিনা ছিলেন পৃথিবীর সকল জাতি, দেশ ও সকল যুগের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও গুণীগণের অন্যতম। মধ্যযুগীয় ইতিহাসে তিনি একজন অসাধারণ চিন্তাবিদ। মুসলিম বিজ্ঞানের ইতিহাসে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি একাধারে ইনসাইক্লোপেডিস্ট, দার্শনিক, চিকিৎসক, দেহতত্ত্ববিদ, অংকশাস্ত্রবিশারদ, জ্যোতির্বিদ এবং ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্র, খোদাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, কাব্য ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অসীম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এসকল জ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগে অসামান্য পাণ্ডিত্য মাত্র ২২ বছর বয়সেই অর্জন করেছিলেন। তিনি যেমন কালজয়ী একজন মানুষ, তেমনি তাঁর জীবন প্রবাহও ছিল বৈচিত্রে ভরা। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের উত্থান ও পতন তাঁর কর্মশক্তিকে বিনষ্ট করতে পারেনি। সাফল্য উত্থানের সময় তিনি যেমন চিন্তাধারা বিকাশের কাজে লিপ্ত ছিলেন, তেমনি জীবনের সংকটময় মুহূর্তেও তিনি গ্রন্থ রচনায় কালক্ষেপন করতেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন যদিও দীর্ঘস্থায়ী ছিল না, কিন্তু তাঁর জীবনকালে বিভিন্ন বিষয়ে যে অবদান রেখেছেন তা আজও জাতির অসমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে।

### চিকিৎসা শাস্ত্রে আবুল কাশিম আল জাহরাভির অবদান

পুরো নাম আবুল কাশিম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহরাভি। তিনি ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কর্ডোভার শহরতলীর প্রধান অংশ আল-জাহরায় জন্ম গ্রহণ করেন। কারো মতে তাঁর জন্ম 'মদিনাতুজ জাহরায়'। জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই তিনি স্পেনের কর্ডোভায় কাটিয়েছেন এবং সেখানেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইউরোপে আল-জাহরাভি অ্যালবুকাসিস(Albucasis), বুকাসিস (Bucasis)ও আল-য়্যারভিয়াস (Alyaharvious) নামে পরিচিত। জাহরাভির পিতা-মাতা স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে মারা যান।[১১৫]

মধ্যযুগে সভ্য পৃথিবী বিনির্মাণে যে ক'জন মুসলিম মনীষীর ভূমিকা অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃত,তাঁদের মধ্যেআবুল কাশিম আল জাহরাভি অন্যতম। তিনি কর্ডোভা সোনালী যুগে বিখ্যাত শল্য চিকিৎসাবিদ হিসেবে পৃথিবীকে উপহার দেন তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ '*আত-তাছরিফ*'। শল্য চিকিৎসায় আল-জাহরাভি কেমন পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন গ্রন্থটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে সময়কার মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জন্য তাঁর এই বিশ্বকোষটি ছিল অক্সিজেনস্বরূপ। ফলে তাঁকেমুসলমানদের মধ্যে শল্য চিকিৎসার প্রাণপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি তাঁর মেধা, মননশীলতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রায় পূর্ণতার কাছাকাছি নিয়ে আসেন। তাঁকে আধুনিক শল্যচিকিৎসা ও ডাক্তারি যন্ত্রপাতির আবিষ্কারক ও শল্যচিকিৎসার জনকও বলা হয়।[১১৬]

আবুল কাশিম আল-জাহরাভি কর্ডোভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তবে তিনি প্রথম থেকেই শল্য চিকিৎসায় আশ্চর্যজনক সফলতা লাভ করেন। ফলে দ্রুত সবদিকে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সফলতার স্বাক্ষর হিসেবে খলিফা আব্দুর রহমান এবং খলিফা আবুল হাকাম উভয়েরই চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কর্ডোভার বিখ্যাত হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক হিসেবেও নিয়োগ পান তিনি। তাঁর

---

১১৩. Axel Lange and Gerd B. Müller. *Polydactyly in Development, Inheritance, and Evolution. The Quarterly Review of Biolog*: Mar. 2017, Vol. 92, No. 1, pp. 1–9

১১৪.*ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১১৫. *ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১১৬. আলী আশ-শাতশাত, *তারিখুল জারাহা ফিত-তিব্বিল আরবি*, খ. ১, পৃ. ৭৫

ভুবন বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ *'আত-তাছরিফ'*-এর মতো বিষয়বস্তু ও তত্ত্বনির্ভর এতো চমৎকার গ্রন্থ তৎকালীন যুগে আর কেউ লেখেনি।[১১৭]

শল্য চিকিৎসা বিভাগের প্রভূত সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষকরা জাহরাভিকে স্পেনের আরব চিকিৎসাবিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, জাহরাভিই সর্বপ্রথম চিকিৎসক যিনি ইউরোপে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার্জারির প্রচলন ও এর বিশদ বিবরণ প্রচার করেন।[১১৮]

চিকিৎসা বিষয়ক যে গ্রন্থটি তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাঁকে মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে মহৎ শল্যবিদ এবং আধুনিক শল্য চিকিৎসার জনক বলে গণ্য করা হয় তাহলো 'কিতাবুত তাছরিফ লিমান আজিযা আনিত তা'লিফ'। এই গ্রন্থটি প্রধানত দু'খণ্ডে শিক্ষাগত (Educational) ও কার্যকরী (Effective) এবং ৩০টি অধ্যায়ে বিস্তৃত। প্রথম খণ্ডে এনাটমি (Anatomy), ফিজিওলজি (Physiology) ও ডায়াটেটিকস (Dietetics) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আত-তাসরিফের এই খণ্ডটিকে অনেকেই মধ্যযুগের ফারমাকোলজি বা ঔষধ বিজ্ঞানের বাইবেল বলে অভিহিত করেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষত সার্জারি (Surgery) সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে অধ্যাপক সারটন 'Medical Encyclopedia' নামে অভিহিত করেছেন। এর চিকিৎসার অংশের চেয়ে সার্জারির অংশ সর্বদিক দিয়ে উন্নত ও মৌলিকতার পরিচায়ক হলেও চিকিৎসার অংশেও মৌলিকতার অভাব নেই। ঔষধ তৈরি করতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসরণে পাতন (Distillation) ও উর্ধ্বপাতন (Sublimation) প্রথা প্রয়োগ করেছেন।[১১৯]

*'আত-তাসরিফ'* গ্রন্থে অস্ত্রোপচার থেকে শুরু করে মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, অপথ্যালমোলজি, অর্থোপেডিকস, প্যাথলজি, দন্ত বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান, শিশু চিকিৎসাসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। বলা যায়, এই গ্রন্থের পেছনেই তিনি সারা জীবন ব্যয় করেছেন। গ্রন্থটিকে খুঁটিনাটি নানা বিষয় সংযোজন করতে তাঁর ৫০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। ৩০ অধ্যায়ের এই বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডটি 'জেনারেল প্রিন্সিপালস অব মেডিসিন' বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে সাধারণ ও প্রাথমিক বিষয়গুলো দিয়ে সাজিয়েছেন তিনি। একজন চিকিৎসকের প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার কাজ শুরু করতে যতটুকু মৌলিক জ্ঞান প্রয়োজন, তার পুরোটাই (মধ্যযুগীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনায়) এই খণ্ডে সংযোজন করেছেন জাহরাভি।

সার্জারি খণ্ডের বিশেষত্ব হলো- এর মধ্যে সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা করা হয়নি। ফলে এটা এমনিতেই পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ খণ্ডটি পৃথকভাবে চিত্রাদিসহ প্রকাশিত হয়। ডা. ক্যাম্পবেলের মতে, The first independent illustrated book on the subject অর্থাৎ এ হলো এ বিষয়ের সর্বপ্রথম স্বাধীন সচিত্র গ্রন্থ।[১২০]

সার্জারী খণ্ডটি জিরাল্ড ল্যাটিন ভাষায় মূল আরবিসহ প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন গ্রন্থটির নাম দেন 'De Chirurgia'. এটি সালার্নো ও মন্টেপেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[১২১]

আত তাসরিফের শেষ এবং সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি শল্য চিকিৎসা নিয়ে রচিত। চিকিৎসক হিসেবে নিজের পুরো ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতাকে'অন সার্জারি অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস' নামক এই খণ্ডে একত্র করেছেন আল জাহরাভি। এটি শল্য চিকিৎসা নিয়ে লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হওয়ার মূল কারণ এটাই। এই অধ্যায়ে তিনি প্রায় দুই শতাধিক অস্ত্রোপচারের বর্ণনা দেন। এছাড়া এতে প্রায় ২০০টি অস্ত্রোপচার সরঞ্জামের ছবি রয়েছে। এই সরঞ্জামের ছবি তিনি নিজেই এঁকেছিলেন। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্যতম ছিল দাঁত তোলা, দাঁতের গোড়া পরিষ্কার, চোখের ছানি অপারেশন, ভাঙা হাড় বের করা, জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করা এবং মৃত ভ্রূণকে বের করাসহ নানা ধরনের যন্ত্র। এই সব যন্ত্র

১১৭. ইবনে হাজম, *ফাদায়েলু আহলিল আন্দালুস*, খ. ২, পৃ. ১৮৫
১১৮. ইবনু আবি উসাইবা, *উয়ুনুল আনবা ফী তাবাকারিল আতিব্বা*, পৃ. ৫০১
১১৯. *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
১২০. বিচারপতি আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, ঢাকা: বাংলাবাজার, মাওলা ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৪ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৭৯-৮০
১২১. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানেদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

কখন, কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এই গ্রন্থে। 'অন সার্জারি অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস' অধ্যায়টিকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম সচিত্র 'সার্জিক্যাল গাইড'। ঐতিহাসিকদে মতে, জাহরাভিই সর্বপ্রথম আরব বৈজ্ঞানিক যিনি ইউরোপে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার্জারির প্রচলন এবং এর বিশদ বিবরণ প্রচার করেন। এছাড়া চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম অ্যাবডোমিনাল প্রেগনেন্সি এবং এক্টোপিক প্রেগনেন্সি নিয়ে বর্ণনা করেছেন। মৃত ভ্রূণকে কীভাবে বের করতে হবে তার বর্ণনাও দিয়েছেন।[১২২] নিজের প্রিয় অধ্যায়কে সবার শেষে সংযোজন করা নিয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত মন্তব্যও রয়েছে-

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে শল্য চিকিৎসা। একজন চিকিৎসক যতদিন না চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্য সকল শাখার সাথে যথার্থভাবে পরিচিত হয়ে ওঠবেন, ততদিন তার শল্য চিকিৎসার দিকে যাওয়া উচিত নয়।
তিনি আরো বলেন- যে ব্যক্তি শল্য চিকিৎসাকে জীবনের লক্ষে পরিণত করতে চায়, তাকে অবশ্যই অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে।

'অন সার্জারি অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস' খণ্ডটিকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম সচিত্র 'সার্জিক্যাল গাইড'। এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আল জাহরাভি এখানে কোন অস্ত্রোপচারে কোন বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, তা সবিস্তারে লিখেছেন, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী জুড়ে ইউরোপীয়রা আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করেছে। শল্য চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় এমন প্রতিটি যন্ত্রের পৃথক পৃথক ডায়াগ্রাম এঁকে সেটিকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। বর্ণনাগুলো এত প্রাঞ্জল যে, কোনো সাধারণ মানুষও সেগুলো পড়ে শল্য চিকিৎসা বুঝে ফেলতে পারবে। জারাভির মূল উদ্দেশ্য ছিল, মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য শল্য চিকিৎসা শেখা সহজ করে দেয়া। সে উদ্দেশ্যে তিনি দারুণভাবেই সফল হয়েছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থ আরব বিশ্ব ছাড়িয়ে ইউরোপের সকল বিখ্যাত মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রায় ৫ শতাধিক বছর প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২৩]

এ গ্রন্থে ২০০ প্রকার সার্জারির যন্ত্রপাতির নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থটি ইউরোপে কী পরিমাণ মর্যাদা লাভ করেছিল, তা এর বারবার অনুবাদ থেকেই বোঝা যায়। ডা. ক্যাম্পবেলের মতে, গ্রন্থটি পরপর পাঁচবার ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। আর একথা সর্বসম্মত যে, তাঁর এ গ্রন্থের প্রভাবেই ইউরোপে সার্জারির মান বিশেষভাবে উন্নীত হয়।[১২৪]

সার্জারির ক্ষেত্রে এই মহামনীষীর অপরিসীম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সফলকাম হলেও মেডিসিন বা ঔষধ বিষয়েও যথেষ্ট অবদান পাওয়া যায়। তিনি কুষ্ঠরোগ ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি অবস্থা বুঝে এ রোগের চিকিৎসা করতেন। এ রোগ সম্বন্ধে তাঁর আগে আর কোনো বিজ্ঞানী এমন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন বলে জানা যায় না।[১২৫]

জাহরাভি শিশু রোগের চিকিৎসাতেও কিছু কিছু অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি শিশু রোগের চিকিৎসার জন্য মাতৃস্তন থেকে দূষিত দুধ চুষে বের করার পরিবর্তে এর জন্য এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। শিশুদের রিকেট হওয়ার কারণ এবং এর প্রতিকারেরও এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি শিশুদের মেরুদণ্ড বাঁকা হওয়ার কারণ সম্বন্ধে পূর্বেকার সব মতের ওপর নতুন মত প্রকাশ করেন।[১২৬]

নিউরোসার্জারি এবং নিউরোলজিক্যাল চিকিৎসায়ও জাহরাভির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরো ইসলামি স্বর্ণযুগে কোনো মুসলিম চিকিৎসককে যদি আলাদা করে নিউরোসার্জন বলতে হয়, সেটা কেবল জাহরাভিকেই বলা যায়। তখনকার চিকিৎসা বিজ্ঞান আবর্তিত হতো শল্য চিকিৎসা এবং ঔষধ শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে। নিউরোসার্জারির দিকে যাওয়ার সাহস অধিকাংশ চিকিৎসকই দেখাতেন না। সেখানে জাহরাভির নিউরোসার্জারি বিষয়ক কাজগুলো চিকিৎসা শাস্ত্রের এই শাখায় নবদিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। তিনি তাঁর জীবনের অসংখ্যবার মাথার আঘাত, মাথার খুলির

১২২. *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
১২৩. ড. এম. আবদুল কাদের, *মুসলিম কীর্তি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১০ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৯৫
১২৪. আবদুল আজিম আদ-দায়েব, *আবুল কাসিম আল-জাহরাভি*, *আওয়ালু তাবিবিন-জার্রাহ-ফিল আম*, পৃ. ৫৭
১২৫. *আওয়ালু তাবিবিন-জার্রাহ-ফিল আম*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১২৬. *বিজ্ঞানে মুসলমানেদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

অস্থিতে ফাটল, মেরুদণ্ডীয় জখম, হাইড্রোসেফালাসের সমস্যার চিকিৎসা করেছেন। এসব চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং প্রায়োগিক পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন, যেগুলোর একটা বড় অংশ এখনো নিউরোসার্জারিতে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর প্রথম হাইড্রোসেফালিক সমস্যার সমাধান করার কৃতিত্ব দেয়া হয় জাহরাভিকে। মানুষের মাথার ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি থেকে 'সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড' বা সিএসএফ নামক এক প্রকার তরল নির্গত হয়, যা মস্তিষ্ককে ঘিরে রাখে। হাইড্রোসেফালিক সমস্যা তখন হয়, যখন এই সিএসএফ তরল মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে এটি খুলির মধ্যে জমা হতে থাকে এবং শিশুর মাথার আকৃতি অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। কেননা শিশুদের খুলির অস্থিগুলো পরিপক্ক এবং একীভূত নয়। অন্যদিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাথার আকৃতি বাড়তে পারে না এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এই সমস্যাকে অনেক সময় 'মাথায় পানি জমা'ও বলা হয়।

জাহরাভি তাঁর গ্রন্থে এই সমস্যার অস্ত্রোপচারের কথা সবিস্তারে লেখেছেন-নবজাতকশিশুর মাথার খুলি এমনিতেই নানাবিধ তরলে পূর্ণ থাকে। মাথায় পানি জমতে থাকলে প্রতিদিন তার মাথার আয়তন বাড়তে থাকে। ফলে খুলির অস্থিগুলো একীভূত হতে পারে না। এ সমস্যার সমাধানকল্পে খুলির মধ্যভাগে তিনটি নির্দিষ্ট স্থানে কেটে উন্মুক্ত করতে হবে। জমে থাকা তরল নির্গত হয়ে গেলে ক্ষত সেলাই করে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হবে, যেন খুলির অস্থিগুলো একীভূত হতে পারে।

ইউরোলজিতে জাহরাভির অবদান লিথোটমি। তিনি মূত্রথলীর পাথর অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি 'মিশাব' নামক একটি যন্ত্র তৈরি করেন, যা অনেকটাই আধুনিক যুগের লিথোট্রাইটের অনুরূপ। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি কোনো কাটাছেঁড়া ছাড়া মূত্রথলির ভেতরেই পাথর ভেঙে ফেলতে পারতেন। ফলে এটিই ছিল ইতিহাসের প্রাথমিক কালের লিথোটমি বা কাটাছেঁড়াবিহীন মূত্রথলির পাথর অপসারণ। দন্ত চিকিৎসায়ও জাহরাভির গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মুসলিম চিকিৎসকদের মধ্যে একমাত্র জাহরাভিই দাঁত অপসারণের অস্ত্রোপচার সঠিকভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তিনি ব্রোঞ্জ এবং রোপা দিয়ে দাঁত বাঁধাই করতেন। তাকেই বলা হয় পৃথিবীর প্রথম সফলভাবে দাঁত 'ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা চিকিৎসক। এসব অস্ত্রোপচারে তিনি ২০০ এর অধিক সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন, যেগুলোর একটি বড় অংশ আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সার্জন আল জাহরাভিলাইগেশন পদ্ধতিতে রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যথা: লাইগেশন পদ্ধতি, কটারাইজেশন পদ্ধতি এবং ধমনী সংকোচনকরণ পদ্ধতি। কিন্তু তথাকথিত ফ্রেঞ্চ সার্জন এমব্রোস পেরী ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে লাইগেশন পদ্ধতিতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করাকে তার উদ্ভাবিত পন্থা হিসেবে প্রচার চালায়।
মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল জাহরাভি ক্যান্সারেরও চিকিৎসা করতেন। তিনি ক্যান্সারের পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা করেন এবং সীমিত অবস্থায় ক্যান্সারের টিউমারগুলো টিস্যুর গভীর হতে বের করে ফেলে চিকিৎসা করতেন।আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি ছিলেন বিশ্ব নন্দিত সার্জারি চিকিৎসক। তিনি সার্জারির ওপর প্রায় পনেরোশ' পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সিজার অপারেশন করেছিলেন এবং শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত ফরসেপ বা চিমটে জাতীয় অস্ত্র উদ্ভাবন করেন।

জাহরাভির সচিত্র গ্রন্থের যে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দু'টি রয়েছে অক্সফোর্ডের বডলিয়েন (Bodleian) লাইব্রেরিতে এবং অন্য একটি রয়েছে গোথাতে। জিরাল্ডের ল্যাটিন অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে প্যারিসে। এতে তিনি গ্রন্থকারের নাম দিয়েছেন Abul Casim. কিছু পাণ্ডুলিপি ফ্লোরেন্স, ব্যামবার্গ, ফ্রাঙ্কয়েস, মন্টেপেলিয়ার, লিডেন ও ডেনিস রক্ষণাগারে সুরক্ষিত আছে।[১২৭]

কিতাবু তাসরিফ গ্রন্থ ব্যতীত জাহরাভি চিকিৎসা বিষয়ক অন্য যেসকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাহলো-
(ক) আল-জাওযুত তাম্মি ফী ইলমিত তিব্বি ওয়াত তাসরিহি ওয়া আলয়িরি জালিকা।
(খ) মাকালাতু তাকাসিমুল আমরাদ।
(গ) আফসিরুল মাওজুদ ফী ক্বালবিত তিব্বি বিইখতিলাফি আসমায়ি মারবিল হুরুফিল মুজামা।

১২৭. *মুসলিম মনীষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

(ঘ) আল-মাকালাতু  ফী আমালিল জাসাদি।
(ঙ) মাকালাতুন ফী আমরিল আকাফিরিল মুফরাদাতি ওয়াল মুরাক্কাবাত।
ঐতিহাসিক হিট্টির মতে-

It (al-tasrif) contains illustrations of instrumenta which influenced other Arab authors and helped the foundations of surgery in Europe.

অর্থ: এতে (আত-তাছরিফ) প্রদত্ত যন্ত্রপাতির নকশাসমূহ অন্যান্যআরব লেখকদের প্রভাবিত করেছে এবং ইউরোপের শল্য চিকিৎসা উদ্ভাবনে সহায়ক হয়েছে।[১২৮]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার মতে-

More than anyone else, Abul Kasim helped raise the status of surgery in Christain Europe.

অর্থ: আবুল কাশিম (আল জাহরাভি) খ্রিস্টান ইউরোপের শল্য চিকিৎসার উন্নতি সাধনে অবদান রাখেন।
জর্জ সার্টন বলেন, আবুল কাশিম (আল জাহরাভি) হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মুসলিম সার্জন।[১২৯]

তাই বলা যায়, মধ্যযুগে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সার্জন ও গবেষক রজার বেকন আল জাহরাভীর *আল তাসরিফ* থেকে সার্জারি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন।

**চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে রুশদ-এর অবদান**

পুরো নাম আবু আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ। তিনি সংক্ষেপে ইবনে রুশদ নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যে জগতে ইংরেজি ভাষায় তাঁর নাম হচ্ছে Aveross (এভেরোজ)। তিনি ১১২৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৫২০হিজরীতে কর্ডোভায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৫৯৫ হিজরী সনে মারাকেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং কর্ডোভায় তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি একাধারে ধর্মতত্ত্ববিধ, জ্যোর্তিবিদ, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন।[১৩০] তবে তি চিকিৎসাবিদ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তাঁকে আধুনিক সার্জারির জনক বলা হয়। সেই সাথে ছিলেন একজন বড় মাপের আধ্যাত্মিক পুরুষ। কাজে কর্মে ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর দাস। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাস করতেন-I give bandage, Allah will heal the wound.অর্থ: আমি ক্ষতস্থান বেঁধে দেবো, ক্ষত সারাবেন আল্লাহ।

কর্ডোভার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আবু জাফর ইবনে হারুনের কাছে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখা করেন। তিনি ব্যাপকভাবে দর্শন ও ভেষজ বিষয় নিয়েলেখাপড়া করেন । তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে ডেকে নেয়া হয় মরক্কোতে। আল ইয়াকুব সেখানে ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেন।

ইবনে রুশদ মানব জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'কিতাব আল কুলিয়াত ফি আল তিব্বি'*। চিকিৎসা শাস্ত্রে এটি একটি মাস্টার ওয়ার্ক। ইবনে রুশদ এই বইটি লিখেন ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে।তাঁর এই গ্রন্থ পরবর্তী প্রায় কয়েক শতাব্দী যাবৎ সমগ্র ইউরোপ এবং আরব বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পাঠ্য বই ছিল। এতে ০৭টি খণ্ড ছিলো। এতে রয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রের তিনটি মৌলিক বিষয়-
(ক) রোগ বিশ্লেষণ বা ডায়োগনেসিস, (খ) নিরাময় বা কিউরী এবং (গ) প্রতিরোধ বা প্রিভেনশন। বইটিতে ইবনে সিনার 'আল-কানুন' সম্পর্কে সর্বশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইবনে রুশদ-এর আসল পর্যবেক্ষণের বিষয় বিধৃত আছে। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বিশদ সমাবেশ ঘটেছে। (১) শরীর বিদ্যা বা এনাটমি, (২) শরীরবৃত্ত বা ফিজিওলজী, (৩) সাধারণ রোগবিদ্যা বা জেনারেল প্যাথলজি, (৪) নিদান রোগ নির্ণয় বা ডায়াগনোসিস, (৫) ভেষজ বিজ্ঞান বা মেটিরিয়া মেডিকা, (৬) স্বাস্থ্যবিদ্যা বা হাইজেন এবং (৭) ভৈষজ বা থেরাপেটিকস।[১৩১]

---

১২৮.গবেষণা বোর্ড, *Muslim Contribution to Science and Technology,*ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুলাই ২০১২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৫৭
১২৯.*ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৩০. *ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১৩১. *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

ইবনে আল আব্বার বলেন, ইবন রুশদ ২০ হাজার পৃষ্ঠার বই লেখে গেছেন। এগুলো মূলত দর্শন, চিকিৎসা ও মৌলিক আইন বিষয়ক বই। শুধু চিকিৎসা বিষয়ে তিনি ২০টির মতো বই লিখেছেন। প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাবেশি ছিলো। ইবনে রুশদ-এর বইগুলো মূলত অনুবাদ হয়েছে ইউরোপীয় লাতিন, ইংরেজি, জার্মান, হিব্রু ইত্যাদি ভাষায়। ইবনে রুশদকে দ্বাদশ শতকের একজন শীর্ষ সারির চিন্তাবিদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই রেনেসাঁর যুগে ইউরোপে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিলো আকাশছোঁয়া। দু'বার যে কারো বসন্ত হয় না, এ তথ্যও তাঁর জানা ছিলো।[১৩২]

১৩২. *মুসলিম কীর্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

# চতুর্থ অধ্যায়

## পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | পবিত্র কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | পবিত্র হাদীসে চিকিৎসা বিজ্ঞান |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে চিকিৎসা ব্যবস্থা |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | : | মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য |

## প্রথম পরিচ্ছেদ: পবিত্র কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য প্রেরিত এমন এক শিফা ও রোগ মুক্তির মহৌষধ, যার মধ্যে আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার অসুস্থতার নিরাময় রয়েছে।[১] যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মহিমান্বিত কালামেরনির্দেশনামূলক এই ব্যবস্থাপত্র পরিপূর্ণ গ্রহণ করেছেন, বাস্তবেই তাঁরা দুনিয়াবী সকল ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে চিকিৎসকের অমুখাপেক্ষী রয়েছেন। ইতিহাসের পাতায়এর যথেষ্টপ্রমাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে দেখা যায়, মদীনা শরীফের ডাক্তারগণ রোগী না পাওয়ার কারণে বসে বসে অলস সময় কাটাতেন। একদা নবী কারীম (সা.)-এর নিকট একজন ডাক্তার অভিযোগ নিয়ে এলেন যে তার নিকট কোনো রোগীই আসে না।[২]

আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআনকে শিফা বা আরোগ্য ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

অর্থ: আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শিফা ও রহমত স্বরূপ।[৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়- পবিত্র কুরআন যে অন্তরের শিফা এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ আরোগ্যের এক মহৌষধ এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কোনো কোনো আলিমের মতে, কুরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহেরও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কারণ কুরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দেয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে।[৪]

হাদীসে এসেছে–عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَ الْقُرْاٰنِ

অর্থ: আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা শিফাদানকারী দু'টি বস্তুকে নিজেদের জন্য অবশ্যই গ্রহণ করবে। একটি মধু এবং অপরটি কুরআন।[৫]

দেহ ও মনের সমন্বয়ে মানুষের জীবন। দেহের যেমন রোগ হয়, তেমনি মনেরও রোগ হয়। দৈহিকভাবে সুস্থ থাকার বিভিন্ন উপাদান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- দুধ, মধু ইত্যাদি যা পথ্য হিসেবে অতুলনীয়। এছাড়া গোশত, মাছ, শাকসবজি ও ফল-মূলের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এসব দ্রব্যাদি মানুষের খাদ্যের জোগান দেয়ার পাশাপাশি মানবদেহে পুষ্টি যোগায়। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। তাই অপচয় না করে পরিমিত খাবার গ্রহণের কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হালাল-হারামের যে বিধান দেয়া হয়েছে সেখানেও মানব দেহের উপকার ও ক্ষতিকর দিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মৃত জন্তু, বিষাক্ত প্রাণি, হিংস্র জীবজন্তু, মদ পান করা ও শোকরের গোশত খাওয়া এবং ব্যভিচার করা ইত্যাদি মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আল কুরআনে এগুলোও হারাম করা হয়েছে। মানুষের দেহকে পরিপূর্ণ সুস্থ রাখার জন্যই এসব বিধি-নিষেধআরোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এছাড়া মানব জীবনে এমন কিছু রোগ রয়েছে, যা বর্তমানে তৈরিকৃত জাগতিক মেডিসিনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন- মানসিক অস্থিরতা, ডিপ্রেশন, বদ নযর এবং যাদু ইত্যাদি। কিন্তু এসকল রোগ থেকে পরিত্রাণের

---

১. বিস্তারিত আলোচনা- আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল কুরতুবী, *আল-জামিউ' লি আহ্‌কামিল কুরআন ওয়াল মুবায়্যিনু লিমা তাদাম্মানাহু মিনাস সুন্নাতি ওয়া আবিল ফুরকান*, লেবানন: বৈরুত, আল-রেসালাহ পাবলিশার্স, ২০০৬, খ. ১৩, পৃ. ১৫৬-১৬২ (পরবর্তীতে ইহা সংক্ষিপ্তাকারে "*তাফসীরে কুরতুবী*" নামে উল্লিখিত হয়েছে)

২. প্রিন্সিপাল হাফেজ নযর আহমদ, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্ যামান), *তিব্বে নববী*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, মার্চ ২০০২ (চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ৮১

৩.আল-কুরআন, ১৭: ৮২

৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: দশম সংস্করণ, মার্চ ২০১২, খ. ৫, পৃ. ৫১৮-৫১৯

৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মাআরিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধু, খ. ৪, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ৩৪৫২ (পরবর্তীতে ইহা "*সুনান ইবন মাজাহ*" হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

চিকিৎসাও পবিত্র কুরআনে রয়েছে। কুরআনিক চিকিৎসা বা বিভিন্ন আয়াত পাঠের মাধ্যমেএসকল রোগের উপশম হয় এবং স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি মেলে। এটি সুপ্রমাণিত বিষয়। মানসিক অস্থিরতার ক্ষেত্রে প্রশান্তি লাভের সর্বোত্তম ঔষধ হলো পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা। ইরশাদ হচ্ছে –اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থ: জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণে (যিকিরে) অন্তরের প্রশান্তি অর্জন হয়।[৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করে ইরশাদ করেন –وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا

অর্থ: এবং তাঁরা রাত্রি অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদায় নত হয়ে এবং দন্ডায়মান হয়ে।[৭] তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে তাহাজ্জুদ সালাতের কথা বলা হয়েছে। আর গবেষণা করে দেখা গেছে, তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত উপকারসমূহ হাসিল হয়ে থাকে-

(১) তাহাজ্জুদ সালাত অশান্তি ও অনিদ্রার মহৌষধ, (২) মানসিক রোগীর জন্য তা অব্যর্থ ঔষধ, (৩) রগের টান লাগা রোগের জন্যও পরম উপকারী, (৪) মস্তিষ্কের চিকিৎসা বিশেষ করে পাগলের জন্য তা সর্বশেষ চিকিৎসা, (৫) যাদের দৃষ্টিশক্তিতে ত্রুটি আছে, তাদের জন্যও তাহাজ্জুদ সালাত উপকারী, (৬) তাহাজ্জুদ সালাত মানব দেহে আনন্দ, উৎসাহ, কর্মস্পৃহা ও সীমাহীন শক্তি সঞ্চার করে, যা তাকে পুরো দিন হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল রাখে।[৮]

এছাড়া সময় মতো সালাত আদায় করা, সিয়াম সাধনা ও অন্যান্য আমলও মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার অন্যতম ব্যবস্থাপত্র। যা পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা নির্দেশিত ও প্রমাণিত। এ সমস্ত বিষয়েও অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

নযর লাগার বিষয়টি কোনো কল্পকাহিনী বা রূপকথা নয়; বরং এটি একটি বাস্তব বিষয়। অধুনা দেহতত্ত্ববিদগণও এ সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়েছে। বস্তুত হ্যাফনাটিজমের ভিত্তি চোখের আকর্ষণ শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে, তা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْعَيْنُ حَقٌّ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম(সা.) ইরশাদ করেন: বদ নযর লাগা সত্য।[৯]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে- হুমাইদ ইবন কায়েস মক্কী (রহ.) বলেন, জাফর ইবন আবি তালিব (রা.)-এর ছেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকট আসলো। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের খাদিমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছেলেরা এতো দুর্বল (জীর্ণশীর্ণ) কেন? খাদিমা উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের ওপর খুব সহজেই বদ নযর লেগে যায়। আর তাদেরকে কোনো রকম ঝাড়ফুঁক করাই না। কারণ হয়তো বা আপনি তা পছন্দ করেন না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: এদের জন্য ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করো। কেননা যদি কোনো বস্তু তাকদীরের পূর্বে কোনো কর্ম সম্পাদন করতে পারতো, তবে তা হলো বদ নযর।[১০] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِىْ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ وَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيْعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَ مَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكٰى كَانَ يَاْمُرُنِىْ اَنْ اَفْعَلَ ذٰلِكَ بِهِ–

৬.আল-কুরআন, ১৩: ২৮

৭. আল-কুরআন, ২৫: ৬৪

৮. ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, আল-কাউসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ (সংশোধিত সংস্করণ), খ. ১, পৃ.৬৫-৬৭

৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *আল-জামি আস-সহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮,অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: বদ নযর লাগা সত্য, খ. ২, পৃ. ১৬২৯, হাদীস নং ৫৭৪০ (পরবর্তীতে ইহা সংক্ষিপ্তাকারে "*সহীহ আল-বুখারী*" নামে উল্লিখিত হয়েছে)

১০. মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, পাকিস্তান: করাচি, মাকতাবাতুল বুশরা, ২০১১, অধ্যায়: কিতাবুল জামি, অনুচ্ছেদ: বদ নজরের জন্য ঝাড়ফুঁক করা, খ. ৩, পৃ. ৫৮২, হাদীস নং- ১৬৯৯ (পরবর্তীতে ইহা "*মুয়াত্তা ইমাম মালিক*" হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুললাহ (সা.) যখন আপন বিছানায় আসতেন, তখন তিনি উভয় হাতের তালুতে সূরা ইখলাস এবং মুআওব্বিযাতায়ন অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তারপর উভয় তালু দ্বারা আপন চেহারা ও দু'হাত শরীরের যতদূর পৌঁছায় ততদূর পর্যন্ত মাসাহ করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন: এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন অসুস্থ হন, তখন তিনি আমাকে অনুরূপ করার নির্দেশ দিতেন।[১১]বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান যাদুটোনার বিষয়টিকে স্বীকার না করলেও ইসলাম একে অস্বীকার করে না। যাদুটোনা বা কুফুরী কালামের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অনেক ক্ষতি সাধনকরা সম্ভব। আর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠ করে এসকল ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يَرٰى اَنَّهُ يَاْتِى النِّسَاءَ وَ لاَ يَاْتِيْهِنَّ، قَالَ سُفْيَانُ وَ هٰذَا اَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ، وَ اِذَا كَانَ كَذَا- فَقَالَ يَا عَائِشَةُ! اَعَلِمْتِ اَنَّ اللهَ قَدْ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ- اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِىْ وَ الاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلِىَّ- فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رَاْسِىْ لِلاُخَرِ، مَا بَالُ الرَّجُلُ؟ قَالَ مَطبُوْبُ، قَالَ وَ مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ حَلِيْفُ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا- قَالَ وَ فِيْمَ؟ قَالَ فِىْ مَشْطٍ وَ مُشَاقَةٍ- قَالَ وَ اَيْنَ؟ قَالَ فِىْ جُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ- قَالَتْ فَاَتَى النَبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْبِئْرَ حَتّٰى السْتَخْرَجَهُ، فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِىْ اُرِيْتُهَا وَ كَانَ مَائَهَا نُقَاعَةَ الْحِنَّاءِ- وَ كَانَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنَ- قَالَ فَاسْتَخْرَجَ-

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর একবার যাদু করা হয়। এমন অবস্থা হয় যে তাঁর মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেননি। সুফিয়ান বলেন: এ অবস্থা হলো যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুম থেকে জেগে ওঠে বলেন: হে আয়েশা! তুমি অবগত হও, আমি আল্লাহর কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অন্যজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। আমার মাথার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: এ লোকটির কী অবস্থা? দ্বিতীয়জন বললেন: তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন বললেন: কে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বললেন: লাবীদ ইবন আসামস। সে ছিল ইয়াহুদীদের মিত্র যুরায়ক গোত্রের একজন মুনাফিক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন: চিরুনী এবং চিরুনী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন: পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' নামক কূপের ভেতর পাথরের নিচে রাখা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের করেন এবং বলেন: এটিই সেই কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পানি মেহেদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়, আর এ কূপের (পার্শ্ববর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) শয়তানের মাথার ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন: সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন।[১২]

এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই অসুখ ছয় মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এক ইয়াহুদী বালক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমত করতো। এই সুযোগে ইয়াহুদীরা তাকে বাধ্য করে তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাথার কিছু চুল ও তাঁর চিরুনীর কয়েকটি কাঁটা সংগ্রহ করত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যাদু করে। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ইবন আসাম নামক এক ব্যক্তি। এটিতে তাঁতের সূতায় এগারোটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুই সংযুক্ত করে। অত:পর তা খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে একটি কূপে প্রস্তরখণ্ডের নিচে রেখে দেয়া হয়। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করে। অত:পর আল্লাহ তাআলা এগারো আয়াতবিশিষ্ট সূরা ফালাক ও সূরা নাস এই দু'টি সূরা নাযিল করেন। এই সূরা দু'টির একেকটি আয়াত পড়ার সংগে

১১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাড়-ফুঁকে থুথু দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬৩০, হাদীস নং ৫৭৪৮
১২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: যাদুর চিকিৎসা করা যাবে কি না? খ. ২, পৃ. ১৬৩৫-১৬৩৬, হাদীস নং ৫৭৬৫

সংগে সূতার একটি করে গ্রন্থি আপনা আপনি খুলে যায়। গ্রন্থিসমূহ খোলার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেনো একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে।[১৩]

তাই বলা হয়, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনযর এবং দৈহিক ও আত্মিক সমস্ত অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।[১৪]

আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى يَقْرَأُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَ يَنْفُثُ– قَالَتْ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْعُهُ كُنْتُ اَنَا اَقْرَأُ عَلَيْهِ وَ اَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই অসুস্থ হতেন তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে (নিজের ওপর) দম করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যথা অধিক হতো, তখন আমি নিজে এই সূরাদ্বয় পড়ে বরকতের জন্য তাঁর (রাসূলের) ডান হাত দিয়ে মালিশ করে দিতাম।[১৫]

এছাড়াওকুরআনের বিভিন্ন সূরা ও অংশবিশেষ পাঠ করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) চিকিৎসা করতেন। বহু হাদীসে এর প্রমাণও পাওয়া যায়।হাদীসে এসেছে-

عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَثَرَ ضَرْبَةٍ فِىْ سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ فَقَالَ اَصَابَتْنِىْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ اُصِيْبَ سَلَمَةُ فَاَتَى بِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَفَثَ فِىْ ثَلٰثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتّٰى السَّاعَةَ–

অর্থ: ইয়াযীদ ইবন আবু উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমার পায়ের গোছায় একটি মারাত্মক ক্ষত চিহ্ন দেখে তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, এটি খায়বরের যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন, যা দেখে লোকেরা বলাবলি করছিল: সালমার জীবনের আশা খুবই কম। এরপর আমাকে নবী কারীম (সা.)-এর নিকট হাযির করা হয়। তিনি তিনবার কিছু পড়ে এতে ফুঁক দেন। ফলে আমি আজ পর্যন্ত এতে আর কোনো ব্যথা অনুভব করিনি।[১৬]অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَتَوْا عَلٰى حَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ، فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذَا لُدِغَ سَيِّدُ اُولٰئِكَ فَقَالُوْا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ اَوْ رَاقٍ، فَقَالُوْا اِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَ لَانَفْعَلُ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَ يَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَ يَتْفِلُ فَبَرَأَ فَاَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوْا لَا نَاْخُذُهُ حَتّٰى نَسْاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَاَلُوْهُ فَضَحِكَ وَ قَالَ وَ مَا اَدْرَاكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوْهَا وَ اَضْرِبُوْا لِىْ بِسَهْمٍ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে কতিপয় সাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোনো মেহমানদারী করলো না। তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায়েই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে  সাপে দংশন করলো। তখন তারা এসে বললো: আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়-ফুঁকারী কোনো লোক আছেন কি? তাঁরা উত্তর দিলেন: হাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোনো মেহমানদারী

১৩.আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর, (অনুবাদ: অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক), *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ১১, পৃ. ৬৩৭

১৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ঢাকা: ইফা. ২০১২ (নবম সংস্করণ), খ. ৮, পৃ. ৮৯৬

১৫. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিতাবুল জামি, অনুচ্ছেদ: রোগের সময় তাবীয বা ঝাড়ফুঁক করা, খ. ৩, পৃ. ৫৮৪, হাদীস নং- ১৭০৬

১৬ .আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ, ২০০৪, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাড়-ফুঁকের দুআ, খ. ২, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ৩৮৯৮, ইফা. হাদীস নং-৩৮৫৪ (পরবর্তীতে ইহা "*সুনান আবু দাউদ*" হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

করোনি। কাজেই আমাদের জন্য কোনো বিনিময় নির্ধারণ না করা পর্যন্ত আমরা তা করবো না। ফলে তারা তাঁদেরকে এক পাল বকরী বিনিময় স্বরূপ দিতে রাজি হলো। তখন একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে তা সে ব্যক্তির গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। ফলে সে আরোগ্য লাভ করলো। এরপর তাঁরা বকরীগুলো নিয়ে এসে বললো: আমরা নবী কারীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করবো না। এরপর তাঁরা এ বিষয়ে নবী কারীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি হেসে দিয়ে বললেন: তোমরা কিভাবে জানলে যে এটি রোগ নিরাময়কারী? ঠিক আছে বকরীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক অংশ রেখে দিও।[১৭]আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ رَاجِعًا مِّنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلُ مَّجْنُوْنُ مُّوْثَقُ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ اَهْلُهُ اِنَّا حُدِّثْنَا اَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءُ نُدَاوِيْهِ– فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَاَ فَاَعْطُوْنِىْ مِائَةَ شَاةٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ اِلاَّ هٰذَا– وَ قَالَ مُسَدَّدُ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا قُلْتُ لاَ قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِىْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ–

অর্থ: খারজা ইবন সালত তামীমী (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট হতে ফেরার সময় পথিমধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যান, যাদের মধ্যে শিকল পরা একজন পাগল লোক ছিল। তখন পাগলের অভিভাবকরা বললো, আমরা শুনেছি, তোমাদের সাথী (নবী সা.) উত্তম ও কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তোমার কাছে এমন কোনো জিনিস আছে কি, যা দিয়ে তুমি এ পাগলের চিকিৎসা করতে পারো?

(রাবী বলেন) তখন আমি সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিই, যার ফলে সে ভালো হয়ে যায়। তখন তারা আমাকে একশত বকরী প্রদান করে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: তুমি সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পাঠ করনি তো? রাবীমুসাদ্দাদঅন্য বর্ণনায় বলেছেন: তুমি এছাড়া আর কিছু পড়েছিলে নাকি? আমি বলি, না। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি এগুলো নিয়ে নাও। আমার জীবনের শপথ! লোকেরা তো যাদু-টোনা করে খায়, যা বাতিল। তুমি তো একটি হক তথা সত্য জিনিস পড়ে ফুঁক দিয়েছো।[১৮]

সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কুরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত শুরু করা হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা ফাতিহাকে সমগ্র কুরআনের সার-সংক্ষেপও বলা যায়। কারণ এ সূরায় কুরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেয়া হয়েছে। কুরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কেননা সমগ্র কুরআন প্রধানত ঈমান ও নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা ফাতিহার দৃষ্টান্ত তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর প্রভৃতি অন্য কোনো আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কুরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ। অন্য হাদীসে সূরা ফাতিহাকে সূরায়ে শিফাও বলা হয়েছে।[২০]
সূরা ফাতিহার ন্যায় আল-কুরআনের অন্যান্য সূরা ও বিশেষ কিছু আয়াতের মাধ্যমে নানা ধরণের অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ সংক্রান্ত বিষয়াবলী ১১তম অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

১৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতবুত তিব্ব, অনুচ্ছেদ: সূরা ফাতিহার দ্বারা ফুঁক দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬২৮, হাদীস নং ৫৭৩৬
১৮.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: যে সব জন্তু হারাম হওয়ার কথা কুরআন-হাদীসে নেই, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৫৭
১৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩
২০.*তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৬, ১৭৪

আমরা অসুস্থহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করে রোগমুক্ত হই। কিন্তু কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো- মানুষের অন্তরের রোগ নিরাময় করা। প্রথমত মানুষের অন্তরে অসুখ থাকলে পরিপাটি ও সুস্থ-সবল দেহেরও কোনো মূল্য নেই। যার অন্তর কলুষিত, তার সবল দেহ থেকে সে নিজেও উপকৃত হতে পারে না এবং অন্যরাও পারে না। দ্বিতীয়ত, আত্মার রোগের ক্ষতি দেহের রোগের ক্ষতি থেকে বেশি মারাত্মক। একজন চরিত্রহীন লোক যতই সুস্থ থাকুক না কেন, এক পর্যায়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। যেমন, অধিক মদ পান করার কারণে লিভারে ও গলায় ক্যান্সারসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের কারণে এইডস ও অন্যান্য যৌন রোগ দেখা দেয়।এমনিভাবে চারিত্রিক অধপতনের ফলেঅনেকে চুরি, ডাকাতি ও জুয়া খেলাসহ নানা অপরাধে লিপ্ত হওয়ায় এক সময় নিজের জীবনের প্রতিই চরম অনীহাভাব চলে আসে, এমনকি হতাশাগ্রস্ত হয়ে সবশেষে আত্মহত্যার মতোজঘণ্য কাজটিও করে বসে। তাই বলা হয়-

Money is lost nothing is lost, Health is lost some thing is lost, But Character is lost every thing is lost.

এজন্য বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই কম-বেশি মনের রোগী। কিন্তু আমরা শারীরিক রোগের চিকিৎসা করালেও মনের রোগের চিকিৎসা করানোর প্রয়োজনবোধ করি না। অথচ মন অসুস্থ হলে আমাদের সকল কিছুই অসুস্থ হয়ে পড়ে। দেহকে আমরা দেখতে পাই, মনকে দেখতে পাই না। দেহের সুনির্দিষ্ট অবয়ব আছে, কিন্তু মনের কোনো অবয়ব নেই। তবে মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মনের অবয়ব হলো ক্রিয়াগত। আমরা মনের অস্তিস্ব সম্পর্কে জানতে পারি মনের ত্রিবিধ ক্রিয়ার অস্তিত্ব তথা চিন্তার ক্রিয়া, ইচ্ছার ক্রিয়া ও অনুভূতির ক্রিয়াজানার মাধ্যমে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জনক ডা. হ্যানিম্যান বলেন, মন আর দেহ বিচ্ছিন্ন নয়। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, প্রত্যেক রোগ সৃষ্টির মূলে রয়েছে মনের বিশৃঙ্খলা। মন বিশৃঙ্খল না হলে দেহের কোনো রোগ হতে পারে না। যে কোনো ব্যাধিতে প্রথমে মনকে আক্রমণ করে, পরে দেহকে আক্রমণ করে।[২১]

দেহ অসুস্থ হয় ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, বাহ্যিক ইরিটেশন ও অভ্যন্তরীণ ডিফিসিয়েনসি দ্বারা, কিন্তু মন কিভাবে আক্রান্ত হয় তা অনেকের জানা নেই। মনের কাঠামোগত অস্তিত্ব খুঁজে না পেলেও একথা সত্য, মন বাহ্যিক ইরিটেশান দ্বারা আক্রান্ত হয়। (ক) শব্দজাত ইরিটেশান, যেমন- সঙ্গীত, ভর্ৎসনা, কর্কশ ভাষা ব্যবহার, গালিগালাজ করা; (খ) গন্ধজাত ইরিটেশান, যেমন- সুগন্ধী, দুর্গন্ধ; (গ) রূপজাত ইরিটেশান, যেমন- কুৎসিত চেহারা, সুন্দর চেহারা, এলোমেলো আসবাবপত্র; (ঘ) ভাবজাত ইরিটেশান, যেমন- ভালোমন্দ, স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, অপবাদ, তিরস্কার; (ঙ) ইচ্ছাজাত ইরিটেশান, যেমন- প্রেম-প্রীতি, বন্ধুত্ব, ধনলিপ্সা, প্রতিহিংসা; (চ) অনুভূতিজাত ইরিটেশান, যেমন- রাগ-বিরাগ; (ছ) চিন্তাজাত ইরিটেশান, যেমন এলামেলো চিন্তা, ইত্যাদি। জে. টি. কেন্ট এম. ডি. রচিত "রেপাটরী অব দি হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা' বইতে প্রায় সাড়ে পাঁচশত-এর মতো মানসিক বিশৃঙ্খলতার চিত্র উল্লেখ করেছেন।[২২]

দেহ রোগ থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমরা সকলে সজাগ। স্বাস্থ্যনীতিতেও পরিবেশ দূষণ তথা পঁচাগলা, আবর্জনা ও দুর্গন্ধের অপকারিতার কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ দূষণ তথা কটুকথা, রূপ দূষণ তথা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করা, ভাব দূষণ তথা আচরণগত দুর্ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের কোনোরূপ ধারণা নেই। সচেতন ব্যক্তিরা কাউকে ডাস্টবিন থেকে পরিত্যাজ্য পঁচা খাদ্য খেতে দেখলে শিহরে ওঠে। কারণ তাতে রোগ জীবাণু আছে। সে যে কোনো সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা আমরা জানি না যে মানুষের নেতিবাচক আচরণ পঁচা পরিবেশ ও ডাস্টবিন থেকেও ক্ষতিকর। কোনো ব্যক্তি একটি জ্বলন্ত শলা দিয়ে অপর ব্যক্তির মুখ পুড়িয়ে দিলে বিচার হয় এবং আহত ব্যক্তির চিকিৎসাও হয়। কিন্তু একজন রূপসী তার রূপানল দিয়ে কারও হৃদয় পুড়িয়ে দিলে তা কেউ দেখে না, কাউকে বলা যায় না, বিচার হয় না এবং তার চিকিৎসাও হয় না। কারণ মনোরোগের প্রতিকার সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। এটা একটি মানসিক যাতনা। এসকল বিষয়ের প্রতিকার ছাড়া সমাজে অক্ষত মন রাখা সম্ভব নয়। আর সুন্দর মন ছাড়া সুন্দর দেহও হয় না।[২৩] তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে

---

২১. ডা. আ ন ম বদরুদ্দিন, "মানসিক রোগ চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, (মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার কর্তৃক সম্পাদিত), ঢাকা: ইফা. ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. পৃ. ১৮০

২২.ডা. আ ন ম বদরুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২, ১৮৪

২৩. ডা. আ ন ম বদরুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

মানুষের বিভিন্ন আচরণগত দিক যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে সেজন্য মানবিক আচরণতগত বিধি-নিষেধের মাধ্যমেঅতিসূক্ষ্ম এবং সুকৌশলে চিকিৎসা প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থ: যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।[২৪]

তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) চরিত্র গুণকেও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সহায়ক বলে ঘোষণা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার চরিত্র খারাপ করেছে, সে তার নফসকে কষ্টে ফেলেছে, তার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে এবং তার শরীর রোগাক্রান্ত হয়েছে।[২৫]

তৃতীয়ত, মানুষের পক্ষে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ঔষধ আবিষ্কার করা সম্ভবহলেও অসুস্থ আত্মার প্রতিকার আবিষ্কার করা পুরোপুরি সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অন্তরের অসুখ নিরাময়ের প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ- অর্থ: তিনি মুমিনদের অন্তরের রোগ নিরাময়কারী।[২৬] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ– وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

অর্থ: হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উপদেশ এসেছে এবং এটা (কুরআন) তোমাদের অন্তরে যে রোগ আছে তার নিরামক এবং মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।[২৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ

অর্থ: আপনি (তাদেরকে) বলুন, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়েত (পথ-নির্দেশ) ও রোগমুক্তি (ব্যাধির প্রতিকার)।[২৮] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

অর্থ: হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে (রোগ-ব্যাধি) তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য পথ-নির্দেশনা (হিদায়েত) ও রহমত।[২৯]

উপদেশ ছাড়াও আয়াতের এই অংশে কুরআনের আরো তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, কুরআন বিশেষভাবে অন্তরের অসুখ নিরাময় করে। দ্বিতীয়ত, কুরআন মানুষকে হিদায়েতের পথ দেখায় এবং সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য কুরআন অবতীর্ণ হলেও কেবল মুমিনরাই এর থেকে ফায়েদা নিতে পারে। তৃতীয়ত, কুরআন মুমিনের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-আল্লাহর কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর মাধ্যমে তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তিনি তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।[৩০]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ–

অর্থ: আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এমন একটি গ্রন্থ, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।[৩১] হাদীসে এসেছে-

---

২৪. আল-কুরআন, ৯১: ৯-১০

২৫. মোহম্মদ হাবীবুল মতিন সরকার, "রাসূলুল্লাহ স-এর চিকিৎসা কার্যক্রম", *সীরাত বিশ্বকোষ*, (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত) ঢাকা: ইফা. জুন ২০০৮, খ. ১৪, পৃ. ২৪০-২৪১

২৬. আল-কুরআন, ৯: ১৪

২৭. আল-কুরআন, ১০: ৫৭

২৮. আল-কুরআন, ৪১: ৪৪

২৯. আল-কুরআন, ১০: ৫৭

৩০. আল-কুরআন, ৫: ১৫-১৬

৩১. আল-কুরআন, ১৬: ৮৯

عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَ هِىَ الْقَلْبُ–

অর্থ: নোমান ইবন বাশীর (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মনে রেখো, শরীরের মধ্যে (এমন) একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যতক্ষণ তা ঠিক থাকে সমস্ত শরীর ঠিক থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। খুব মনে রেখো! এটা হলো অন্তর।[৩২]

আল-কুরআন হলো বিজ্ঞানময় একটি আসমানী কিতাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يٰس ، وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ– অর্থ: ইয়া-সীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।[৩৩]

প্রখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী Hartwig Hirschfieldতাঁর New Researches in to the Composition and Exegesis of the Quranগ্রন্থে বলেন-We must not be surprised to find the Quran regarded as the fountain head of all sciences.[৩৪]

সুতরাং আল-কুরআন যে অপরাপর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও মূল ভিত্তি- একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনীষীদের আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের সাধনা ও গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জার্মান পণ্ডিত ড. কার্ল ওপিজ (Dr. Karl Opitzg)-এর গবেষণা মতে, আল-কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৯৭টি সূরার মোট ৩৫৫টি আয়াতে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট তথ্য রয়েছে। তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত Die Medisin In Koran গ্রন্থে এ সকল আয়াতে বিবৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও সূত্র সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আল-কুরআনের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনুজ্ঞাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

**১. চিকিৎসা(Medisin)**: এর মধ্যে রয়েছে-

ক. জীব রহস্য: ভ্রূণ, গর্ভধারণ, গর্ভাবস্থা, শিশু পরিচর্যা, শৈশবাবস্থা, আয়ুষ্কাল ইত্যাদি।

খ. শারীর বিজ্ঞান বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), শারীরবৃত্ত (Physiology).

গ. নিদান শাস্ত্র (Pathology), রোগের কারণ তত্ত্ব (Etiology), মনোবিদ্যা (Psychology), মনোরোগ-নিদান (Psycho-Pathology).

ঘ. সাধারণ চিকিৎসা ও বিশেষ চিকিৎসা।

ঙ. মৃত্যু ও পূর্ণ জীবন।

**২. স্বাস্থ্যবিদ্যা (Hygiene)**:এর মধ্যে রয়েছে-

ক. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি: পোশাক, বিশ্রাম, পুষ্টি, পানীয়, শরীরের যত্ন ইত্যাদি।

খ. সমাজগত স্বাস্থ্যবিধি: ঘরবাড়ি, পরিবেশ, সংক্রামক ব্যাধি।

গ. আকস্মিক দুর্ঘটনা, মহাদুর্ঘটনা, মহামারী।

**৩. স্বাস্থ্য বিধান (Health provisions)**:এর মধ্যে রয়েছে-

ক. শারীরিক পুষ্টি বিধান, মদ, মাংস ইত্যাদি।

খ. যৌন বিধান: সুষ্ঠু ও অসুষ্ঠু যৌনক্রিয়া।

গ. আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান, ত্বকচ্ছেদ, রোযা-সংযম, অযু, গোসল, পীড়া, ক্লান্তি, বিনোদন ইত্যাদি।

ঘ. সামাজিক বিধিবিধান: হত্যা, প্রতিশোধ, অভিভাবকত্ব।[৩৫]

---

৩২.আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবন শরফ আন-নওয়াবী, (অনুবাদ: নিযামুদ্দিন মোল্লা), *আন-নাওয়াবীর চল্লিশ হাদীস*, Islam House. Com, হাদীস নং- ৬

৩৩. আল-কুরআন, ৩৬: ১-২

৩৪. ড. ইকবাল কবীর মোহন, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*,"আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান", ১৮.০৬.২০২১, পৃ. ১০ (থেকে উদ্ধৃত)

**চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতের তালিকা**

| সূরা নম্বর | সূরার নাম | আয়াত নম্বর |
|---|---|---|
| ২ | বাকারা | ৫০, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৭৩, ৯৬, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৮৩, ২২২, ২২৮, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৯, ২৫৯, ২৬০, ২৭৫ |
| ৩ | আল ইমরান | ৪০, ৪১, ৪৭, ৪৯, ৫৪, ১৬৯, ১৮৪, |
| ২২ | আল-হজ্জ | ৬, ১৫, ১৯, ২০, ৬০ |
| ২৩ | মুমিনূন | ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৫, ৫১, ৭০ |
| ২৪ | নূর | ২৪, ৩৭, ৫৮ |
| ২৫ | ফুরকান | ৮ |
| ২৬ | শুআরা | ২৭, ৩৩, ৫০,১১৬, ১৫৩, ১৮৫ |
| ২৭ | নামল | ১২ |
| ২৮ | কাসাস | ১২, ১৫, ৩২ |
| ২৯ | আনকাবূত | ৩৭, ৪০ |
| ৩১ | লুকমান | ১৪ |
| ৩২ | সাজদা | ৮ |
| ৩৩ | আহযাব | ৪, ১০ |
| ৩৪ | সাবা | ৮, ১৪, ৪৬ |
| ৩৫ | ফাতির | ৮, ১১ |
| ৩৬ | ইয়াসীন | ৬৫, ৬৮, ৭৭, ৭৮ |
| ৩৭ | সাফফাত | ৩৬, ৫৮, ৫৯, ৮৮, ৮৯, ৯৭, ১৪৫ |
| ৩৮ | সোয়াদ | ৪১, ৪২ |
| ৩৯ | যুমার | ৬, ৪২ |
| ৪০ | মু'মিন | ১১, ১৮, ৬৪, ৬৭ |
| ৪১ | হামীম আস-সাজদা | ২০, ৩৯ |
| ৪৪ | দুখান | ১৪ |
| ৪৬ | আহকাফ | ১৫ |
| ৫০ | কাফ | ১৮, ১৯ |
| ৫১ | যারিয়াত | ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৫২ |
| ৫২ | তূর | ২৯ |
| ৫৩ | নাজম | ৪৫, ৪৬ |
| ৫৪ | কামার | ৯, ১৯, ২০, ৩১, ৩৪, ৪০ |
| ৫৫ | আর-রাহমান | ৪১ |
| ৫৬ | ওয়াকিয়া | ৮৩ |
| ৬৫ | তালাক | ৪, ৬ |
| ৬৮ | কালাম | ২, ৫১ |
| ৬৯ | হাক্কাহ | ৬, ৭, ৪৬ |

৩৫. এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, দি অনিক লাইব্রেরী, তা.বি. খ. ৬, পৃ. ৩১৩-৩১৮

| | | |
|---|---|---|
| ৭০ | মাআরিজ | ১৬, ৩৯ |
| ৭১ | নূহ | ১৪ |
| ৭৪ | মুদ্দাছ্ছির | ৪ |
| ৭৫ | কিয়ামাহ | ৩৪, ১৪, ২৬, ২৯, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ |
| ৭৬ | দাহর | ২, ২৮ |
| ৭৭ | মুরসালাত | ২০, ২১, ২২ |
| ৭৮ | নাবা | ৯ |
| ৮০ | আবাসা | ১৯, ২১, ২২ |
| ৮১ | তাকবীর | ৮, ২২ |
| ৮৬ | তারিক | ৬ |
| ৯৪ | আলাম নাশরাহ | ১, ২, ৩, ৪ |
| ৯৬ | আলাক | ২ |
| ১০৫ | ফীল | ৩, ৪, ৫ |
| ১১৩ | ফালাক | ২, ৩, ৪, ৫ |

আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সকল বিষয়ে প্রধানত আলোকপাত করা হয়েছে, তাহলো- ১. জন্মরহস্য, ২. স্বাস্থ্যবিধি, ৩. রোগ-ব্যাধি, ৪. রোগ-ব্যাধির কারণ, ৫. ঔষধ ও প্রতিরোধক, ৬. কল্যবিদ্যা, ৭. মৃত্যু ও পুনর্জীবন।[৩৬]

বস্তুত পবিত্র কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বর্ণনা একটি সত্য এবং বাস্তব বিষয়। কুরআনের প্রতি যাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই কেবল তাদের দ্বারাই এ বিষয়টি অস্বীকার এবং অবজ্ঞা করা সম্ভব। আর যারা কুরআনকে শুধু আত্মিক ব্যাধির আরোগ্য দান করতে সক্ষম বলে মন্তব্য করে থাকে, তাদের ধারণাও ভুল। কেননা আত্মিক ও শারীরিক উভয় রোগেইআল-কুরআন আরোগ্যদানকারী।

অবশেষে বলা যায়, কুরআন কর্তৃক আত্মিক ও শারীরিক রোগ নিরাময়ের এই ব্যবস্থাপত্র শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়েই বিদ্যমান ছিল এমন নয়, এই প্রেস্ক্রিপশন কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। তবে শর্ত হলো এর ওপর যথাযথ আমল করা। তাই পবিত্র কুরআনকে আসমানী ও উত্তম গ্রন্থ মনে করে শুধু পাঠ করাই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন রোগ থেকে পরিত্রাণসহ সকল বিষয়ে উপকৃত হতে পারি।

৩৬. মোহম্মদ হাবীবুল মতিন সরকার, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২১৫-২১৭

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পবিত্র হাদীসে চিকিৎসা বিজ্ঞান

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তখনকার যুগে আরবসহ সারাবিশ্বে রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যচিকিৎসা পদ্ধতি বলতে নিজেদের আবিষ্কৃত যথসামান্য কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন লতা-পাতা, গাছ-গাছড়ার ছাল ও বিচি-ই ছিল একমাত্র পথ্য। সেই প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি মানুষ রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও মানব জাতির পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখে যান। তাঁর হাত ধরেই চিকিৎসাশাস্ত্রে পূর্ণতা ও সজীবতা আসে। তিনি হলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তাঁর ওপর নাযিলকৃত আল কুরআন চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি আকরগ্রন্থ, যার ব্যাখ্যা হলো-তাঁর মুখ নি:সৃত হাদীস শাস্ত্র।তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার পরিত্যাগ করে বাস্তবধর্মী ও যুগোপযুগী এমন সব তথ্য ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন যা সত্যিই বিস্ময়কর।

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সহীহ আল-বুখারীর 'তিব্বুন নববী' শীর্ষক অধ্যায়ে ৮০টি পরিচ্ছেদের প্রতিটি হাদীসই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি, রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধ কার্যাবলী সংবলিত।রাসূলুল্লাহ (সা.) শারীরিক রোগ-ব্যাধি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং প্রতিষেধক সম্বন্ধে যে সকল বাণী ও বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন, পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাঁদের রচিত হাদীসগ্রন্থসমূহে এগুলোকে 'কিতাবুত তিব্ব' বা চিকিৎসা শাস্ত্র শিরোনামের অধীনেলিপিবদ্ধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এসকল হাদীসগুলোকে একত্র করলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার শতাধিক। প্রখ্যাত হাদীসতত্ত্ববিদ আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ'-এ চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রায় ৩০০ হাদীস উল্লেখ করেছেন। যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট এ সমস্ত হাদীসচিকিৎসা শাস্ত্রের এক অন্যতম রত্নভাণ্ডর। এসকল হাদীস যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অতুলনীয় প্রজ্ঞার প্রমাণ মিলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ যাতেনতুন কোনো পদ্ধতির অপেক্ষায় না থেকে তাঁর রেখে যাওয়া চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে সে ব্যবস্থাই তিনি করে গেছেন। তিনি নিজ হাতে সঙ্গীদেরকে এ বিষয়েশিক্ষা প্রদান করেছেন, অসুস্থ হলে ঘরে বসে না থেকে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজেও অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন ও চিকিৎসকের পারিশ্রমিক দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اسْتَعَطَّ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নাকে ঔষধ প্রয়োগ করেন।[৩৭]

অন্য হাদীসে এসেছে– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلنَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَ اَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَ اسْتَعَطَ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার শিংগা নিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক দিলেন। একবার তিনি নাকে ওষুধের ফোঁটা নিলেন।[৩৮] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ لاَ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ–

অর্থ: আমর ইবন আমির আনসারী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি: রাসূলুল্লাহ (সা.) শিংগা নিয়েছিলেন আর তিনি (যথারীতি মজুরিও দিয়েছিলেন- কারণ তিনি) পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কারো প্রতি যুলুম করতেন না।[৩৯]

---

৩৭. আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, মিশর, কায়রো, দারুল হারামাইন, ১৯৯৭ (প্রথম প্রকাশ), অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৫, হাদীস নং- ৭৫২৫ (পরবর্তীতে ইহা "*আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*", হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

৩৮. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তান: করাচি, বুশরা পাবলিশার্স, ২০০৯, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ৩৪৭, হাদীস নং- ৫৭৪৩ (পরবর্তীতে ইহা "*আস- সহীহ লিল মুসলিম*", হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

৩৯. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৪৭, হাদীস নং- ৫৭৪৪

অন্য হাদীসে এসেছে- ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: একদা হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রশ্ন করলেন يَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ؟ তথা হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ হতে? আল্লাহ তা'আলা বললেন: আমার পক্ষ হতে। তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন -مِمَّنِ الدَّوَاءُ؟ তথা ওষুধ কার পক্ষ হতে? আল্লাহ তা'আলা বললেন: ওষুধও আমার পক্ষ হতে। অত:পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আবারো জিজ্ঞাসা করলেন يَا رَبِّ فَمَا بَالُ الطَّبِيْبُ– তথা হে আমার পালনকর্তা! তাহলে চিকিৎসকের কী প্রয়োজন? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন أُرْسِلُ الدَّوَاءَ عَلٰى يَدَيْهِ – তথা চিকিৎসকের মাধ্যমে ওষুধ পাঠানো হয়।[৪০]অন্যত্র বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন – يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ يَنْفَعُ الطِّبُّ؟ قَالَ الَّذِىْ اَنْزَلَ الدَّاءَ اَنْزَلَ الشِّفَاءَ فِيْمَا شَاءَ–

অর্থ: ইয়া রাসূলুল্লাহ! চিকিৎসা কি উপকারে আসে? নবী কারীম (সা.) জবাবে বললেন, যিনি রোগ দিয়েছেন, তিনি প্রতিষেধক দিয়েছেন। তিনি যে কেনো জিনিসের মাধ্যমে ইচ্ছা মুক্তি দেন।[৪১]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে অসুস্থতা ও নিরাময় এবংচিকিৎসা গ্রহণসহ বিভিন্নপ্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর এসে গেছে।

ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً– عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ–

অর্থ: আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ-ব্যাধি দেননি, যার সাথে এর প্রতিষেধক নাযিল করেননি। তবে এর জ্ঞান যাকে দেয়ার তাকেই দিয়েছেন। আর যাকে বে-খবর রাখার তাকে বে-খবর রেখেছেন অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেককে এর জ্ঞান দান করেননি।[৪২]

আরেকটি হাদীসে এসেছে-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) দু'জন চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন, যারা মদীনায় দীর্ঘকাল অবস্থানরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো এক রোগীকে চিকিৎসা করার জন্য তাদের নির্দেশ দিলে চিকিৎসকদ্বয় বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে আমরা চিকিৎসা ও হিলা-বাহানা সবই করতাম, তবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর একমাত্র (আল্লাহর ওপর) তাওয়াক্কুল করেই চলছি। একথা শুনে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন –عَالِجَاهُ فَاِنَّ الَّذِىْ اَنْزَلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ جَعَلَ فِيْهِ شِفَاءً فَقَالَ فَعَالَجَاهُ فَبَرَأَ–

অর্থ: তোমরা তার চিকিৎসা করো। যে মহা প্রভু রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও প্রেরণ করেছেন এবং তার মধ্যেনিরাময়ও রেখেছেন। হাদীসের রাবী বর্ণনা করেন, চিকিৎসকদ্বয় নবী কারীম (সা.)-এর নির্দেশনানুযায়ী চিকিৎসা করায় রোগী আরোগ্য লাভ করে।[৪৩]

বর্তমানে আমাদের সমাজেও ঔষধপত্র ও চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করে যে, ঔষধ কি আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে পারে? রোগ-ব্যাধি যদি ভাগ্যের লিখন তথা খোদায়ী বিধানই হয়ে থাকে, তবে চিকিৎসা করে লাভকী? এমন প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেও করা হয়েছিল। হাদীসটি নিম্নরূপ-

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকদীরের মোকাবিলায় কি ঔষধ কোনো কাজ করতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন-

اَلدَّوَاءُ مِنَ الْقَدْرِ وَ هُوَ يَنْفَعُ مَنْ يَّشَآءُ بِمَا يَشَآءُ–

---

৪০. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, লেবানন: বৈরুত: মানারাল ইসলাম, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ১৭ (পরবর্তীতে ইহা *"যাদুল মাআদ"*, হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

৪১. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৪

৪২. *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৩

৪৩. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্ যামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

অর্থ: ঔষধপত্রও খোদায়ী তাকদীরেরই অন্তর্ভূক্ত। তিনি যাকে চান এবং যেভাবে চান তার উপকার হয়।[৪৪]
হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সহজ-সরল সাহাবীর এটাই জিজ্ঞাস্য ছিল যে, আমরা যে ঝাড়-ফুঁক ও ঔষধপত্র ব্যবহার করি এবং বিভিন্ন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে চলি, এগুলো কি আল্লাহর লিখিত তাকদীরকে বদলে দিতে পারে? যদি কারো তাকদীরে রোগ লেখা থাকে বা রোগের কারণে তার মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলে আমাদের অবলম্বন করা পন্থাগুলো কি তা টলাতে পারবে?

মাঝে মধ্যে আমাদের মনেও এ ধরনের বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয় এসে থাকে। একটু ভেবে দেখুন এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) কতো হিকমতপূর্ণ জবাব দিয়েছেন যে তোমাদের এই ঝাড়-ফুঁক, ঔষধপত্র গ্রহণ এবং সর্তকতা অবলম্বন এসবই আল্লাহ তাআলার হুকুমেরই অন্তর্ভূক্ত। কে জানে দয়াময় আল্লাহ তাআলা এগুলোর মাধ্যমেই কারো আরোগ্য লেখে রেখেছেন।এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য হলো, প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার অসিলা ও সতর্কতা অবলম্বন তথা চিকিৎসকের মাধ্যমে ঔষধ গ্রহণ করা। কেননা, এসকল বিষয় গ্রহণ করাও আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। অন্যত্র বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَه شِفَاءً–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি, যার নিরাময়ের উপকরণ সৃষ্টি করেননি।[৪৫]

সুতরাং উল্লিখিত হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়-

**(১)** রোগ আল্লাহর পক্ষ হতে আসে। সুতরাং অসুস্থতার কারণে নিজেকে দুর্ভাগ্য মনেনা করা।

**(২)** কোনো রোগই দূরারোগ্য নয়। মহান আল্লাহ প্রতিটি রোগের সঙ্গে প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। তাই কোনো অবস্থায়ই চিকিৎসা বা ঔষধপত্র বর্জন না করা এবংআরোগ্য হওয়া থেকে নিরাশ না হওয়া।

**(৩)** প্রতিটি রোগের নির্দিষ্ট ঔষধ রয়েছে। অতএব কোনো ঔষধে রোগ না সারলে মনে করতে হবে রোগ অনুযায়ী সঠিক ঔষধ নির্বাচনকরা হয়নি। তাই একচ্ছত্র শিফাদানকারী আল্লাহর নিকট সঠিক ঔষধ নির্ণয়ের জন্য তাওফিক চাওয়ার পাশাপাশি সুস্থতার জন্যও দুআ করা।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা.) মহামারী আক্রান্ত এলাকায় গমন না করা এবং মহামারী এলাকা থেকে বেরিয়ে না আসার যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা মূলত সর্তকতার ভিত্তিতেই ছিল। তেমনিভাবে হযরত উমর (রা.) দামেস্কের মহামারী উপদ্রব এলাকায় প্রবেশ না করে এর দ্বার-প্রান্ত থেকে মদীনায় ফিরে আসাও সর্তকতামূলক পদক্ষেপ ছিল।

সুতরাং যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এজাতীয় নানা ধরণের ওষুধ, গাছ-গাছড়া, ফল-মূল ও পদার্থ গ্রহণ এবং সতর্কতামূলক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, যেগুলো দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সুস্থ থাকা যায়, তা মূলত সবই চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, রোগ হওয়ার পূর্বে সতর্কতামূলক এর প্রতিষেধক ব্যবহার করা, যেমন- হেপাটাইটিস-বি,পোলিও, হাম, ধনুষ্টংকার বা মহামারী করোনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অগ্রিম টীকা গ্রহণ করাও হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা বিজ্ঞানেরই অংশ, যা নিষেধ নয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَعدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجوَةٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَ لاَ سِحْرٌ–

অর্থ: স'াদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি 'আজওয়া' (উৎকৃষ্ট) খেজুর ভক্ষণ করবে তাকে ঐ দিন কোনো বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।[৪৬]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) অতিসূক্ষ্ম পন্থায় মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এমন কিছু ইবাদত, মানবিক আচরণ ও অভ্যাসের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেগুলোও

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৪৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: আল্লাহ এমন কোনো ব্যাধি অবতীর্ণ করেননি, যার নিরাময়ের কোনো উপকরণ সৃষ্টি করেননি, খ. ২, পৃ. ৬১৫, হাদীস নং ৫৬৭৮
৪৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: আজওয়া খেজুর, খ. ২, পৃ. ১৫৫৭, হাদীস নং- ৫৪৪৫

হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত চিকিৎসা সংক্রান্ত অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। যা বিভিন্ন অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো-

**(১) দৈনিক অযু করা:** শরীরের যে সকল অংশ সাধারণত খোলা থাকে এবং যদ্দারা শরীরে রোগ-ব্যাধির জীবাণু অনুপ্রবেশ করে থাকে, ঐ অঙ্গগুলোকে জীবাণু মুক্ত ও সংরক্ষিত রাখতে পারলে অতি সহজে রোগমুক্ত জীবন লাভ করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রবর্তিত অযু পদ্ধতি প্রকৃত অর্থে ঐ সকল অঙ্গের রোগ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কারণ অযুর মধ্যে রয়েছে মিসওয়াক ও কুলি করা, যা দাঁত, মুখ ও পাকস্থলীকে যাবতীয় রোগ-জীবাণু থেকে মুক্ত রাখার জন্য সহায়ক। নাক দ্বারা আমরা দেহাভ্যন্তরে বাতাস গ্রহণ করে থাকি। বাতাসে রয়েছে ধূলাবালিসহ অসংখ্য রোগ-জীবাণু। একজন মুসলিম প্রত্যহ কয়েকবার অযু করার সময় নাকের অভ্যন্তরীণ অংশ পানি দ্বারা পরিষ্কার করে থাকে। সুতরাং নাকের অভ্যন্তরে কোন রোগ-জীবাণু লালিত হওয়া সম্ভব নয়। এমনিভাবে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা, ভেজা হাতে মাথা, কান ও ঘাড় মাসেহ করা এবং পা ধৌত করা। এ সকল কর্ম এমনই সুবিন্যস্ত পদ্ধতি, যা নিয়মিত সম্পাদন করলে বিবিধ রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থাকা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ–

অর্থ: হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করে নাও এবং মাথা মাসেহ করো এবং পাসমূহ টাখনোসহ ধৌত করো।[৪৭] অযু করার প্রতি উৎসাহ প্রদানে রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِاَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ– فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِاَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ– فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ– حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: কোনো মুসলমান কিংবা কোনো মুমিন বান্দা যখন অযু করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ দূরীভূত হয়ে যায়, যার দিকে তার দুই চোখের দৃষ্টি পড়েছিল এবং যখন দুই হাত ধোয়, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দুই হাত ধরেছিল। যখন উভয় পা ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার উভয় পা অগ্রসর হয়েছিলো। ফলে (অযু শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ হতে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়।[৪৮]

**(২) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়:** মুসলমানগণ সালাতকে একটি মৌলিক ইবাদত হিসেবে আদায় করলেও এর মধ্যে যে সুস্থ থাকার অগণিত ব্যবস্থাপত্র রয়েছে, তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সত্যি কথা বলতে এ সালাতের মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। কারণ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, সালাত হলো সকল রোগের শিফা বা প্রতিষেধক এবং সফলতার মাধ্যম। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَا نَائِمُ، اَشْكُوْ مِنْ وَّجْعِ بَطْنِىْ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ أَ فِىْ بَطْنِكَ وَجْعُ؟ قُلْتُ نَعَم يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شِفَاءً–

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি পেটের ব্যথায় অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কি পেটে ব্যথা? আমি আরয করলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, ওঠো, সালাত আদায় করো। কেননা, সালাতেশিফা তথা আরোগ্য রয়েছে।[৪৯]

---

৪৭. আল-কুরআন, ৫: ৬

৪৮. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযুর পানির সাথে গুনাহ ঝড়ে যাওয়া, খ. ২,পৃ. ৩৯, হাদীস নং- ৫৭৭

৪৯. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সালাত একটি শিফা , খ. ৪, পৃ. ৯৮, হাদীস নং- ৩৪৫৮

**(৩) নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ করা:** দেহের জন্য খাদ্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু তা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অন্যথায় দেহের সুস্থতা রক্ষা করা অসম্ভব। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ-ব্যাধির কারণ হলোঅনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছেন, তা রোগ প্রতিরোধ ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুবই সহায়ক। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন البطنة اصل الداء و الحمية رأس الدواء– অর্থ: উদরপূর্তি করে আহারই রোগের উৎসমূল, আর সর্তকতা অবলম্বনই রোগের চিকিৎসা।[৫০]

**(৪) পানির স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করা:** মানুষসহ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের জীবন ধারণ পানির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পানির নির্মলতা ও জীবাণু মুক্ত হওয়া সুস্বাস্থ্য ও রোগ মুক্ত জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) পানিকে সকল প্রকার দূষন মুক্ত ও পবিত্র রাখার প্রতি জোর তাকীদ দিয়েছেন। তিনি পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন এবং পানপাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া পানি পান করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিজ্ঞানসম্মত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে, যেমন: দাঁড়িয়ে পান না করা, তিন শ্বাসে পান করা, দেখে পান করা, পানিতে ফুঁ না দেয়া ইত্যাদি সুস্থ জীবন লাভের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ–

অর্থ: আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন পানি পান করে সে যেন তখন পানপাত্রে নি:শ্বাস না ফেলে।[৫১] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لاَ يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ–

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: তোমাদের কেউ যেন স্থির তথা যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো প্রস্রাব না করে। পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।[৫২]

**(৫) পরিমিত বিশ্রাম গ্রহণ করা:** স্বাস্থ্য সুগঠন ও সংরক্ষণের জন্য একদিকে যেমন শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে, অপরদিকে প্রয়োজন পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করাও অপরিহার্য। কেননা শারীরিক শ্রম না করা হলে শরীরের চর্চা হয় না। ফলে তা সুস্থ ও সবল হতে পারে না বিধায় শরীর চর্চার জন্য শারীরিক শ্রম অপরিহার্য। আবার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম গ্রহণ না করে শুধু শ্রম দিতে থাকলে একটানা শ্রমের ধকল সইতে না পেরে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। অনেকে বিশ্রামের ব্যাপারে চরম উদাসীনতাও প্রদর্শন করে থাকে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: দু'টি নিয়ামত এমন আছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অমনোযোগী। তাহলো সুস্থতা এবং আর অবসর বা বিশ্রাম।[৫৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ মহান বাণীর আলোকে আমরা যদি শারীরিক শ্রম ও পরিমিত বিশ্রামসহ স্বাস্থ্য সচেতন হই, তবে আমাদের জীবন হবে সুখী ও শান্তিময়। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে হাজারো ধন-সম্পদ আর বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। পক্ষান্তরে দুটো শুকনো রুটি অথবা দু'মুঠো ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে সুস্থ শরীর নিয়ে স্ত্রী-পুত্রসহ ঝুপড়ির মধ্যে রাত কাটাতে পারাই প্রকৃত সুখের অংশ।

---

৫০. প্রফেসর ডা. শারীফুল ইসলাম, "ইসলামের দৃষ্টিতে রোগীর সেবা ও তার প্রতি কর্তব্য", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত), ঢাকা: ইফাবা. এপ্রিল-জুন ২০১৮, ৫৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১১

৫১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: পান পাত্রে নি:শ্বাস ফেলা নিষেধ, খ. ২, পৃ. ১৬০২, হাদীস নং-৫৬৩০

৫২ . *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: স্থির পানিতে প্রস্রাব করা, খ. ১, পৃ. ৭৬, হাদীস নং -২৩৯

৫৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কোমল হওয়া, অনুচ্ছেদ: নবী কারীম (সা.)-এর বাণী: আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, খ. ২, পৃ. ১৭৯৫-১৭৯৬, হাদীস নং- ৬৪১২

বিশ্রামের ক্ষেত্রে আরো স্বাস্থ্য তথ্য হলো, রীতিমত বিশ্রাম না নিলে মানব দেহ স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বার্ধক্য আসার পূর্বেই বার্ধক্যের কোলে ঢলে পড়তে হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। কেননা মানব দেহ একটি ইঞ্জিন বা যন্ত্রের মতো। একটানা কোন ইঞ্জিন চলতে থাকলে সেটা যেমন খুব দ্রুত অকার্যকর হয়ে পড়ে, তেমনি মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রাম না হলে তাও তদ্রূপ দ্রুত অকমর্ণ্য হয়ে যায়। বিশ্রাম বলতে পরিশ্রমমুক্ত ও নিদ্রা গ্রহণকে বোঝায়। তিন-চার ঘন্টা একটানা শারীরিক পরিশ্রমের পর অন্তত এক ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন। মস্তিষ্কের ক্ষয় পূরণের জন্য দৈনিক অন্তত ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন। সুনিদ্রা একদিকে যেমন মস্তিষ্ক সবল করে অপরদিকে তা শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গমনেও সহায়তা করে।[৫৪]তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিমিত বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বিপ্রহরে কিছু সময় বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। অপর দিকে রাত্রে ইশার সালাতের পরপরই শয্যা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন– كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইশার সালাতের আগে ঘুমানো এবং ইশার পর (না ঘুমিয়ে) গল্পগুজব করাকে অপছন্দ করতেন।[৫৫]

অনিয়মিত নিদ্রা ও বিশ্রামের কারণেও বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়। নিদ্রা ও বিশ্রামের পদ্ধতিগত কতিপয় নিয়ম-কানুনও রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্ধারণ করেছেন, যা রোগ মুক্ত জীবন যাপন ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুবই সহায়ক। যেমন: বাম কাতে শয়ন না করে ডান কাতে শয়ন করা, এতে হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচলের উপর চাপ পড়ে না। ফলে হার্ট ভালো থাকে, ইত্যাদি।

**(৬) নির্দিষ্ট স্থানে ও যথা নিয়মে মলমূত্র ত্যাগ করা:** মলমূত্র ত্যাগ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। তবে তা যথানিয়মে সমাধান করা গেলে অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মলমূত্র ত্যাগের জন্য কতিপয় নিয়মবিধি প্রবর্তন করেছেন। এসকল নিয়মবিধি অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। যেমন: লোক সমাগম হতে দূরে নির্দিষ্ট স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা, মলমূত্র পরিষ্কারের ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করা, মলমূত্র ত্যাগের পর কুলুখ ব্যবহার করত: পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা, ইত্যাদি। কারণ মাটি সর্বাধিক জীবাণুনাশক, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) পানি ব্যবহারের পূর্বে মাটির ঢিলা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই সর্বপ্রথম মদীনায় মলমূত্র ত্যাগের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। আর তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন: আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিঞ্জা করবো।[৫৬]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কত তীক্ষ্ণ নযর ছিল, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি কী পরিমাণ মনোযোগ ছিল, সর্বোপরি মানব জীবনের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি তাঁর কত সতর্ক দৃষ্টি ছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর। ঘুমন্ত অবস্থায় অবচেতন মনে হাত শরীরের কোন অংশে যায়, কোথায় চুলকায় কিছু জানা থাকে না। ফলে হাতের মধ্যে এবং নখের ভেতর বিভিন্ন রোগ-জীবাণু লেগে থাকা একেবারেই স্বাভাবিক বিষয়। এমতাবস্থায় ঘুম থেকে ওঠে যদি হাত পৃথকভাবে ধৌত না করে ঐ জীবাণুযুক্ত হাত সরাসরি সম্পূর্ণ পানির পাত্রে বা কোনো খাদ্য দ্রব্যে রাখে, তাহলে সকল খাদ্য দ্রব্য বা পানিতে অতি সহজেই জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে। অত:পর তা শরীরে প্রবেশ করলে পুরো শরীর অতি সহজেই রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এসব ক্ষতি থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্যও তিনিসুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। যা বাহ্যিকভাবে এসব বিষয় সাধারণ মনে করা হলেও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি বিরাট মাইল ফলক।

**(৭) মাদক ও নেশাকর দ্রব্য বর্জন করা:** সুস্বাস্থ্য ধ্বংস ও অসংখ্য রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিতে মাদক ও নেশাকর বস্তুর অশুভ প্রভাব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল প্রকার মাদক দ্রব্য ও নেশাকর বস্তু হারাম ঘোষণা

৫৪. মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী, "স্বাস্থ্য সংরক্ষণে প্রিয়নবী (সা.)-এর নির্দেশনা", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
৫৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪
৫৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: পাথর দিয়ে ইসতিঞ্জা করা, খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬, হাদীস নং- ১৫৫

করেছেন। তিনি একে ‘উম্মুল খাবাইস’ (সকল অনিষ্টের মূল) বলে আখ্যা দিয়েছেন। মাদকের ছোবলে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে এবং কোটি কোটি মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে। তাই হাদীসের নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে আমাদের সমাজে মাদক ও নেশাকর দ্রব্য বর্জন করতে পারলে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ মরণব্যাধি থেকে খুব সহজেই মুক্তি লাভ করে সুস্বাস্থ্য লাভ করতে সক্ষম হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহর লানত শরাবের ওপর, তা পানকারীর ওপর, যে পান করায় তার ওপর, যে বিক্রি করে তার ওপর, যে তা খরিদ করে তার ওপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার ওপর, আর যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে সকলের ওপর।[৫৭]

**(৮) অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকা:** অবাধ যৌনাচারে এমন সব রোগের জন্ম হয়, যা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এর অন্যতম একটি রোগ হলো এইডস, যার সংক্ষিপ্তরূপ এইচ.আই.ভি.। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, এটা এমন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধি যার শেষ পরিণতি অনিবার্য মৃত্যু। এখন পর্যন্ত এ রোগ থেকে পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমান বিশ্বে অতি দ্রুত গতিতে এইডসের বিস্তার ঘটছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এইডসের কারণ হিসেবে যে সকল বিষয় চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে একটি মৌলিক বিষয় হলো অবৈধ যৌন মিলন, বিকৃত যৌনাচার ও বহুগামিতা। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেন, এইডস হতে রক্ষা পেতে হলে সকলকে অবশ্যই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। তবে আমরা তাঁদের এ উপদেশকে আরেকটু সম্প্রসারিত করে বলবে, যে কোনো ধর্মের অনুশাসন নয়; বরং ইসলাম ধর্মের অনুশাসন মেনে চলাই এইডস হতে বাঁচার একমাত্র উপায়। কেননা একমাত্র ইসলাম ধর্মেই যৌনতার ব্যাপারে সর্বাধিক কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

অবাধ ও বিকৃত যৌনাচারের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই মানব জাতিকে সর্তক করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন ব্যাপকভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তখন তোমাদের মধ্যে এমন সকল ভয়ংকর রোগ-ব্যাধি দেখা দেবে, যা তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ কখনও দেখেনি।[৫৮]
মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষদ্বাণী আজ বিশ্বব্যাপী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে। মানুষ ব্যাপকভাবে এইডসে আক্রান্ত হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এইডস প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অমূল্য বাণীকে এ রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

বস্তুত ‘রোগের প্রতিকারের চেয়ে রোগের প্রতিরোধই উত্তম ব্যবস্থা’- এ নীতিই হলো হাদীস শাস্ত্রের স্বাস্থ্য বিধির মূলকথা।তাই দেখা যায়, হাদীস শাস্ত্রে উল্লিখিত চিকিৎসা বিষয়াবলী ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে খাৎনা করা, গোঁফ ছাটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়াসমূহ ধৌত করা, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, ইস্তিনজা করা, দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব না করা, কুলি করা, খালি পায়ে হাঁটা, মানানসই জুতা ব্যবহার করা, হাঁচি ও হাই তোলার পদ্ধতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা, চুল পরিচর্যা করা, ছাদরে উপর না ঘুমানো, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা, রাগ সম্বরণ করাইত্যাদি এবং পারিপার্শ্বিক পর্যায়ে মানববসতিকে সর্বপ্রকার দূষণমুক্ত রাখা, মলমূত্র ত্যাগের পর ময়লাগুলো ভূগর্ভস্থ রাখার ব্যবস্থা করা, চলাচলের পথ থেকে দূরে মল-মূত্র ত্যাগ ও ময়লা আবর্জনা ফেলা, ঘর-বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা, ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ঝাড়া এবংখাবারে মাছি বসলেকরণীয় পন্থা ইত্যাদি বিষয়েও হাদীসে স্বাস্থ্যবিধি সম্বলিত যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে, তা স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে অতীব বাস্তবধর্মী, বিজ্ঞান সম্মত, সুদূর প্রসারী ও ফলপ্রসূ। যার বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা অন্যান্য অধ্যায়ে রয়েছে।

৫৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মদ তৈরির জন্য আংগুর নিংড়ানো, খ. ২, পৃ. ১৬২, হাদীস নং- ৩৬৭৪
৫৮ . *তারবিয়াতুল আওলাদ ফি ইসলাম*, খ. ১,পৃ. ২৩৯

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে চিকিৎসা ব্যবস্থা

## সার্বিক সুস্থতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনানুযায়ী জীবন-যাপন করাই ছিল তৎকালীন সময়ে রোগ প্রতিরোধ এবং সার্বিক সুস্থতা আনয়নে এক বিস্ময়কর কার্যকরী ব্যবস্থা। তবে কোনো কারণে কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই তাকে চিকিৎসা দিতেন এবং চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে উৎসাহ প্রদান করতেন। এমনকি নিজেও অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করতেন।

## রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে চিকিৎসক

তৎকালীন আরবে যেসকল চিকিৎসক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সকল প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি; বরং মানব কল্যাণে তাদের এই মহৎ পেশা ও কর্মের সমান স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আরবে যারা চিকিৎসক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁরা হলেন-

(ক) হারিস ইবন কালাদা। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি একজন অমুসলিম চিকিৎসক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসার জন্য তার নিকট রোগীদের পাঠাতেন এবং পরামর্শ নিতেন। তিনি তায়েফে বসবাস করতেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা.)-এর শাসনামলে ভিন্ন মতে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তার মৃত্যু হয়।

(খ) আবু হাফসা ইয়াযীদ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের বিখ্যাত ইয়াহুদী চিকিৎসক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

(গ) ইবন উবায়্যি আত-তামীমী। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ক্ষত ও অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার খ্যাতি ছিল।

(ঘ) যায়নাব একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

(ঙ) রুফায়দা বা নুসায়কা বিনতে কাব একজন আনসারী সাহাবিয়া মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে মদীনার মসজিদে নববীর আঙিনায় স্থাপিত চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।চিকিৎসা সেবাকে গণমানুষের দোর-গোড়ায় পৌঁছানো এবং আপামর জনসাধারণের জন্য এ সেবাকে সহজতর করার লক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে সমগুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করেছেন।[৫৯]

## রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে হাসপাতাল

চিকিৎসা হচ্ছে মূলত 'খিদমাতে খালক' বা আল্লাহর সৃষ্টজীবের সেবা যা একটা ইবাদত। যে সময় সভ্যতা ও আধুনিকতা ছিল অকল্পনীয়, তখন তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি স্থাপন করেন স্বাস্থ্য কেন্দ্র।তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবদান সত্যিই অনন্য।বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে পরবর্তীকালে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নির্মিত অসংখ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই ছিলেন তাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বাস্থ্য রক্ষা ও চিকিৎসার গুরুত্ব প্রদানের লক্ষে মদীনায় মসজিদে নববীর পার্শ্বে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। মুসলিম ইতিহাসে এটাই প্রথম হাসপাতাল।এ হাসপাতালে অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হতো। বিশেষত যুদ্ধাহতদেরকে এখানে চিকিৎসা দেয়া হতো। সায়্যিদা নুসায়বা বিনত কাব আল-আনসারী (রা.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তিনি উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দিতেন। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক রণাঙ্গনের পার্শ্বে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যোপযোগী স্থানে চিকিৎসার জন্য আলাদা তাঁবু স্থাপন করতেন। এগুলো ছিল 'ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র' (Mobile Medical Center)।[৬০]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংস্পর্শ প্রাপ্ত শুধু পুরুষগণই নন; বরং মহিলাগণও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সফল চিকিৎসা আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিতেন তখন মহিলা

---

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৩৩
৬০. প্রাগুক্ত

সাহাবীগণ প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করতেন। জিহাদের ময়দানে গাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়াও তাঁরা আহতদের ক্ষত স্থানে মলম ও পট্টি লাগাতেন। হাদীসে এসেছে, হযরত রুবাইয়ি'বিনত মুআব্‌বিয (রা.) বর্ণনা করেন:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَسْقِيْ وَ نُدَاوِى الْجَرْحٰى وَ نُرَدُّ الْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ–

অর্থ: আমরা নবী কারীম (সা.)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে আহতদের পানি পান করাতাম এবং তাদের পরিচর্যা তথা ক্ষত স্থানে মলম দিতাম ও ব্যান্ডেজ করতাম। আর শহীদগণকে মদীনায় নিয়ে যেতাম।[৬১]

**রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে দন্ত চিকিৎসা**

দন্ত রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাদ্যাংশ। এর মাধ্যমে নানা রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয় যা দাঁত ও দাঁতের মাড়ির চরম ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও মুখের সাহায্যে এই পঁচা খাবার ও জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগব্যাধি সৃষ্টি করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমোদনক্রমে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ডেন্টাল সার্জারীসহ দাঁতের নানা চিকিৎসা করিয়েছিলেন। সুলায়মান (রহ.) হতে বর্ণিত, তাঁর পিতা উমায়ের (রা.)-এর দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে স্বর্ণের দাঁত বেঁধে নেয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে গেলে, তিনিও তা স্বর্ণ দ্বারা বেঁধে নেন। হযরত উসমান (রা.)-এর একটি দাঁতেও স্বর্ণের ক্যাপ ছিল।[৬২]

**রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে প্লাস্টিক সার্জারী**

ভাঙ্গা ও অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণ করে কৃত্রিম প্রত্যঙ্গ স্থাপন করার ব্যবস্থাপনাকে 'প্লাস্টিক সার্জারী' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর অনুমতি নিয়ে ভাঙ্গা ও অকেজো অঙ্গ ফেলে দিয়ে কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন করেছেন। সাহাবী আব্দুর রহমান ইবন আওফ-এর দাদা আরফাযা ইবন আসআদ ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। ইসলাম পূর্ব এক যুদ্ধে তাঁর নাক কেটে যায়। তিনি রৌপ্য নির্মিত একটি কৃত্রিম নাক সংযোজন করেন। একবার তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রৌপ্য নির্মিত কৃত্রিম নাকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে রৌপ্যের পরিবর্তে একটি স্বর্ণের কৃত্রিম নাক সংযোজনের অনুমতি প্রদান করেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَفْرَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ اَنَّهُ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ–

অর্থ: আরফাজাহ ইবন আসআদ (রা.) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুলাবের যুদ্ধে তাঁর নাক যখম হয়ে যায়। ফলে তিনি রূপার একটি নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু তাতে নাকে পচন ধরে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দেন।[৬৩]

সাহাবায়ে কিরামের অনেকের জিহাদে দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতিক্রমে তাঁরা স্বর্ণের কৃত্রিম দাঁত প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুগীরা ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত।[৬৪]

**মলম ও ব্যান্ডেজ ব্যবহারের প্রচলন**

রাসূলুল্লাহ (সা.) রক্তক্ষরণ বন্ধ এবং ক্ষতস্থান রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মলম ও ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতেন। হযরত রুবাইয়ি'বিনত মুআব্‌বিয (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে আহতদের পানি পান করাতাম এবং তাদের ক্ষত স্থানে মলম ও ব্যান্ডেজ লাগাতাম।[৬৫]

---

৬১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জিহাদ, অনুচ্ছেদ: মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা, খ. ১, পৃ. ৭৮০-৭৮১, হাদীস নং- ২৮৮২

৬২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৩১

৬৩. আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ, *সুনানু নাসায়ী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৯, অধ্যায়: সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: যার নাক যখম হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি না, পৃ. ৫২৭, হাদীস নং- ৫১৬১ (পরবর্তীতে ইহা "*সুনানু নাসায়ী*" হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৩১

৬৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জিহাদ, অনুচ্ছেদ: মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা, খ. ১, পৃ. ৭৮০-৭৮১, হাদীস নং- ২৮৮২

এমনকি উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) আহত হলে হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন।এ সম্পর্কে হযরত সাহল ইবন সাদ (রা.) বলেন-

كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَغْسِلُهُ وَ عَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيْلُ الدَّمَ اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةً مِّنْ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَ اَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) ক্ষত স্থান ধৌত করছিলেন এবং আলী (রা.) ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতিমা (রা.) যখন দেখলেন, পানি দ্বারা রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে কেবল তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিয়ে তা জ্বালিয়ে এর ছাই ক্ষত স্থানের ওপর লাগিয়ে দিলে। এতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলো।[৬৬]

**রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মহিলাগণ কর্তৃক চিকিৎসা ও নার্সিং ব্যবস্থা**

রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থদের পরিচর্যার জন্য শুধু অন্যকে নির্দেশ দিয়েই নিজের দায়িত্ব শেষ মনে করতেন না, বরং তিনি নিজেও চিকিৎসা ও নার্সিং কাজে সহযোগিতা করতেন এবং নিজ পরিবারবর্গকেও এ বিষয়ে কাজে লাগাতেন। হাদীসে এসেছে-আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে সাহাবীগণ নবী কারীম (সা.) থেকেবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন আমি দেখলাম, আয়িশা বিনত আবু বকর (রা.) এবং উম্মে সুলাইম (রা.) তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের অলংকার দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বহন করে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীগণের মুখে ঢেলে দিচ্ছিলেন।[৬৭] আরেক হাদীসে এসেছে-

عَنْ رُبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَسْقِى الْقَوْمَ وَ نَخْدُمُهُمْ وَ نَرُدُّ الْقَتْلٰى وَالْجَرْحٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ–

অর্থ: রুবায়ঈ বিনতে মুআওয়ায ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা নবী কারীম (সা.)-এর সংগে যুদ্ধে শরীক হতাম। তখন আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-যত্ন করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় পৌঁছে দিতাম।[৬৮]

অন্য হাদীসে এসেছে- আনাস (সা.) থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কতিপয় লোক নবী কারীম (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।... আবু তালহা বলেন, আমি (সেদিন) আবু বকর তনয়া আয়িশা ও উম্মু সুলাইমকে এমন অবস্থায় দেখেছি,তাঁরা তাঁদের পিঠে পানির মশক বয়ে আনছিলেন। তখন তাঁরা এমনভাবে গুছিয়ে চলছিলেন যে, আমি তাঁদের নলীর খাড়ু দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা তাদের (আহতদের) মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তাঁরা আবার গিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে পানি দিচ্ছিলেন।[৬৯] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে-

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَخْلُفُهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ فَاصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَ اُدَاوِى الْجَرْحٰى وَ اَقُوْمُ الْمَرْضٰى–

অর্থ: উম্মু আতিয়া আনসারিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের শিবিরের পশ্চাতে অবস্থান করতাম। তাদের খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম।[৭০]

---

৬৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: মাগাযী, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই), খ. ২, পৃ. ১১০৭, হাদীস নং- ৪০৭৫

৬৭. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জিহাদ, অনুচ্ছেদ: মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, খ. ১, পৃ. ৭৮০,হাদীস নং- ২৮৮০

৬৮. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা , অনুচ্ছেদ: পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের চিকিৎসা করতে পারে কি? খ. ২, পৃ. ১৬১৫, হাদীস নং - ৫৬৭৯

৬৯.*আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জিহাদ ও এর নীতিমালা, অনুচ্ছেদ: পুরুষের সঙ্গে মহিলাদের যুদ্ধযাত্রা, খ. ৫, পৃ. ৫২১,হাদীস নং- ৪৬৮০

৭০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: জিহাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী নারীদের..., খ. ৫, পৃ.৫২৬, হাদীস নং- ৪৬৮৭

**রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি**

রাসূলুল্লাহ (সা.) মোটামুটি পাঁচটি পদ্ধতি ব্যবহার করে চিকিৎসা করতেন। যথা:
(১) হাজামাত বা রক্তমোক্ষণ পদ্ধতি (২) লোলুদ বা মুখ দিয়ে ওষুধ ব্যবহার (৩) সাউত বা নাক দিয়ে ওষুধ ব্যবহার (৪) মাসীঈ বা পেটের বিশোধনের জন্য ওষুধ ব্যবহার এবং (৫) কাওয়া বা লোহা গরম করে ছ্যাঁক দেয়া (এটা বর্তমানে অপারেশনের বিকল্প হতে পারে)।[৭১]

**রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা করতেন**

১. মাছি বাহিত রোগ, ২. গলগন্ড রোগ ৩. জ্বর ৪. নিউমোনিয়া ৫. মাথা ব্যথা ৬. অন্যান্য ব্যথা৭. ডায়রিয়া ও পেটের পীড়া ৮. চক্ষুরোগ ৯. চর্মরোগ ১০. বিভিন্ন বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ১১. জীবাণু বাহিত রোগ ১২. জখম ১৩. উচ্চ রক্তচাপ ১৪. সাইটিকা ব্যথা ১৫. পক্ষাঘাত ১৬. যাবতীয় মানসিক রোগ ১৭. অশ্বরোগ ১৮. বিভিন্ন গ্রন্থিসন্ধির ব্যথা ও ক্ষয় ইত্যাদি।

**চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যবহৃত ঔষধসমূহ**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ও পদক্ষেপ ছিল বাস্তবধর্মী এবং হিকমতপূর্ণ। তিনি স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীদের বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগে প্রাজ্ঞপূর্ণ চিকিৎসা করতেন। তিনি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি অধিকাংশ সময় রোগ অনুসারে ঔষধপত্র সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিতেন। রোগ-ব্যাধিতে তাঁর ব্যবহৃত ঔষধপত্র প্রায় সবগুলোই অমিশ্র বা একক উপকরণ বিশিষ্ট ছিল। অবশ্য তিনি কখনো যৌগিক ঔষধ ব্যবহার করতেন এবং প্রয়োগ করতেন। তাঁর ব্যবহৃত কয়েকটি ঔষধের উপাদান হলো-

**১. মধু (عسل):** আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত, মানবদেহের জন্য যতো প্রকার ভিটামিন আবশ্যক, তার বারো আনা মধুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। গবেষণায় আরো দেখা জানা যায়, মধু অপেক্ষা শক্তিশালী ভিটামিন যুক্ত আর কোনো পদার্থ নেই। মধুর শিফা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও বর্ণনা এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ–

অর্থ: আল্লাহ মধুমক্ষিকার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় ও মধু বের করেন, এতে মানুষের জন্য অসংখ্য রোগের প্রতিকার রয়েছে।[৭২] হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاةٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلاَءِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিনদিন সকালে মধু চেটে খায়, তাকে বড় ধরনের কোনো মুসীবত তথা রোগ-ব্যাধি আক্রান্ত করবে না।[৭৩]

**২. কালিজিরা (حبة السوداء):** চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে কালোজিরা পেট, ব্যথা, শুলবেদনা, মস্তিষ্ক দুর্বলতা, শিরা, অকর্মণ্যতা, অর্ধাংগকাঁপুনি রোগ বিশেষত ঠান্ডাজনিত রোগ-ব্যাধি যেমন সর্দি, কাশি, কফ ইত্যাদি উপশমে অত্যন্ত উপকারী। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامُ– قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ السَّامُ الْمَوْتُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন- কালিজিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। ইবন শিহাব বলেন: 'সাম' অর্থ হলো মৃত্যু।[৭৪]

---

৭১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২১-২২২
৭২. আল-কুরআন, ১৬: ৬৯
৭৩. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধু, খ. ৪, পৃ. ৯৪, হাদীস নং- ৩৪৫০

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এর অনেক ব্যবহার রয়েছে। যৌনব্যাধি, বুক ব্যথা, প্রসূতি রোগ, ভ্রূণ শক্তিশালী করণ, মূত্রথলির পাথর, অধিক ঋতুস্রাব ও মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রাব তথা ডায়াবেটিস এবং ক্রিমিনাশক ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুবই উপকারী।

**৩. হাজামাত (حجامت):** আরব বিশ্বে হিজামাবা শরীরে শিংগা লাগানো একটি অতি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ব্যাপক আকারে এর প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানেও কাপিং পদ্ধতি নামে এর আধুনিকায়ন ব্যবহার রূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিক নিয়মে হিজামা করালে অনেক রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرُ فَالْحِجَامَةُ –

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা যে সমস্ত বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো, তার মধ্যে শিংগা লাগানো উত্তম।[৭৫]

**৪. খেজুর (نخل):** পেটের গ্যাস, শ্লেষ্মা, কফ, শুষ্ক কাশি, এজমা এবং হৃদরোগের জন্য খেজুর মহৌষধ।

খেজুর সাধারণত মরু অঞ্চলের ফল হলেও সারাবিশ্বে এর যথেষ্ট কদও রয়েছে। অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরপুর এই খেজুর শারীরিক নানা সমস্যা দূর করতে বিশেষভাবে কার্যকরী। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি এবং সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য সাহাবাদেরকে নিয়মিত খেজুর থেকে উৎসাহ দিতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَ لاَ سِحْرُ–

অর্থ: হযরত সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ভোর বেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন বিষ বা যাদু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৭৬]

**৫. ত্বীন (تين):** অশ্বরোগ ও গেটে বাত-ব্যথার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিলাতি ডুমুর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে-

اُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَبَقُ مِنْ تِيْنٍ فَقَالَ لِاَصْحَابِه كُلُوْا فَلَوْ قُلْتُ اِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلاَعَجَمٍ لَقُلْتُ هِىَ التِّيْنُ وَ اَنَّه يَذْهَبُ بِالْبَوَاسِيْرِ وَ يَنْفَعُ النَّقْرِسَ–

অর্থ: একদা হাদিয়া হিসেবে নবী কারীম (সা.)-এর নিকট এক প্লেট তীন (ডুমুর) আসলে তিনি সাহাবাদের বললেন, তোমরা খাও। আমি যদি বলতাম যে জান্নাত থেকে ফল এসেছে, তবে আমি নিশ্চয় বলতাম যে এটা হলো তীন। এটা অশ্ব রোগ দূর করে এবং গেঁটে বাতের ব্যথার জন্য উপকারি।[৭৭]

**৬.যায়তুন (زيتون):** যায়তুন তেলের উপকারীতা অপরিসীম। শরীরের ছোট ছোট গ্রন্থি, বিশেষ করে আংগুল, হাঁটু, গোড়ালি ও হাতের কবজির সন্ধিতে তীব্র ব্যথায় যায়তুন তেল মালিশ করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَ الْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ–

অর্থ: হযরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) 'যাতুল যাম্ব' তথা প্লুরিসি বা পাঁজরের ব্যথাজনিত রোগে এবং অরসের উপকারিতায় যায়তুনের প্রশংসা করতেন।[৭৮]

৭৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কালিজিরা, খ. ২, পৃ. ১৬১৭, হাদীস নং- ৫৬৮৮
৭৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: শিংগা লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৬১
৭৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: আজওয়া খেজুর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা, খ. ২, পৃ. ১৬৩৭, হাদীস নং- ৫৭৬৯
৭৭ . মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

**৭. আগর বা চন্দন কাঠ (قسط):** রাসূলুল্লাহ (সা.) সাধারণত গলনালীর আবদ্ধতা, গলগন্ড, হাঁপানী, এজমা, নিউমোনিয়া, শ্লেষ্মা, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, অন্ডকোষের রোগের জন্য তা ব্যবহার করতেন। তিনি ইরশাদ করেন-

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىْ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ يُسْتَعِطُّ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ يُلَدَّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ–

অর্থ: উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি: তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা এর মধ্যে সাত ধরনের চিকিৎসা (নিরাময়) রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্য তা সেবন করা যায়।[৭৯]

**৮. মাশরুম (كمأة):** চোখের নানা রোগে প্রতিষেধক হিসেবে অতীব পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَ جَابِرٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ –

অর্থ: আবু সাঈদ ও জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কাম'আত হলো 'মান্না' (বনূ ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত আসমানী খাবার) এর শ্রেণিভুক্ত এবং এর রস চোখের জন্য শিফা।[৮০]

**০৯. তালবীনা (تلبينة):** রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সময়ে সাহাবীদেরকেতালবীনা পেটের পীড়া, ক্ষুধামন্দা শরীরিক দূর্বলতা নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী একটি মহৌষধ হিসেবে তালবীনা ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। হাদীসে এসেছে, উম্মুর মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বর্ণনা-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا قِيْلَ له اِنَّ فُلاَنًا وَجَعَ لاَ يَطْعَمُ الطَّعَامَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِيْنَةِ فَحُسُوْهُ اِيَّاهَا وَيَقُوْلُ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا تَغْسِلُ بَطْنَ اَحَدِكُمْ كَمَا تَغْسِلُ اِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسَخِ–

অর্থ: কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এ সংবাদ নিয়ে আসতো যে, অমুক ব্যক্তির পেটে অসুখ খানাপিনা করছে না, তাহলে তালবিনা (যবের দালিয়া) তৈরি করে তাকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিতেন। অত:পর তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম, এটা তোমাদের পেটকে এমনভাবে পরিষ্কার করে, যেমনভাবে কোনো ব্যক্তি স্বীয় চেহারা ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাকে।[৮১]

**১০. লবণ (ملح):** লবণ হলো হজমশক্তি পরিপাক বর্ধক, ক্ষুধানিবারণকারী ও মন প্রফুল্লকারী। এটি চুকা ঢেকুর, পেটের বায়ু পরিশোধন, রক্ত দূষণ, যকৃত ও প্লীহা রোগে খুবই উপকারী। এ ছাড়া বিষাক্ত বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গের বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) লবণ ব্যবহার করতেন। দংশিত ক্ষতস্থানে পানি সহকারে লবণের ব্যবহার করলে অনেক উপকারীতা অর্জিত হয়। একটি হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে-

ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَ مَاءٍ فَجَعَلَهُ فِىْ اِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى اِصْبَعِيْهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَ يَمْسَحُهَا وَ يُعَوِّذُهَا بِمُعَوِّذَتَيْنِ–

অর্থ: অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লবণ ও পানি চেয়ে তা একটি পাত্রে ঢাললেন। অত:পর ঐ দ্রবণে আঙ্গুল ডুবিয়ে ক্ষত স্থানে মালিশ করলেন। অবশেষে পবিত্র কুরআনের শেষোক্ত দু'টি সূরা তিলাওয়াত করলেন।[৮২]

**১১. সিনা বা সানা (سناء):** সিনা বা সানা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এক মহৌষধ। সিনা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে যেমন সিনায়ে মাক্কী বা হিজাজী, সিনায়ে রোমী, সিনায়ে মিসরী, সিনায়ে আসকারী এবং সিনায়ে হিন্দী। সিনা ব্যবহারে

---

৭৮. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৪, হাদীস নং- ৭৫২১

৭৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ভারতীয় ও সামুদ্রিক এলাকার চন্দন কাঠের ধোঁয়ার সাহায্যে নাকে ঔষধ টেনে নেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬১৮, হাদীস নং- ৫৬৯২

৮০ . *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মাশরুম ও আজওয়া খেজুর, খ. ৪, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ৩৪৫৩

৮১. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৯-১২০

৮২. আল্লামা মুহাম্মদ যাকারিয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আল-কান্দলভী, *আওজাযুল মাসালিক*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তা.বি. পৃ. ৬৩৯, খ. ১৪

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর, মস্তিস্ক পরিষ্কার হয়, কোমর ব্যথা, পার্শ্ববেদনা, নিউমোনিয়া, উরুর উপর অংশ ব্যথা, গিটবাত এবং পালাজ্বরসহ সর্বপ্রকার মাথা ব্যথানাশক ও মৃগী রোগীর জন্য খুবই উপকারী। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا ذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِيْنَ قُلْتُ بِالشُّبْرُمِ، قَالَ حَارٌّ حَارٌّ– ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَى فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِيْ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَى– وَ السَّنَى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ–

অর্থ: হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের জুলাব নিয়ে থাকো? আমি বললাম, শিবরমের। তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: এটাতো ভীষণ গরম জিনিস। অত:পর আমি সোনাপাতা দ্বারা জুলাব নিলাম, তখন তিনি (সা.) বললেন: কোনো ঔষধ যদি মৃত্যু থেকে শিফা দিতো, তাহলে সেটা হতো সোনা পাতা। আর সোনাপাতা হলো মৃত্যু থেকে শিফাদানকারী।[৮৩]

**১২. শিবরাম (شبرم):** শিবরম এক ধরনের বীজ দানা। এটা সিদ্ধ করে পান করা হলে পেটের কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হয়। তবে এটা অত্যন্ত গরম বিধায় তার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) কালোজিরা এবং সানা তথা সোনামুখী গাছের ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَسْتَمْشِيْنَ قَالَتْ بِالشِّبْرِمِ قَالَ حَارٌّ حَارٌّ–

অর্থ: আসমা বিনত উমাইস (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জোলাবের জন্য কী ব্যবহার কর?তিনি বললেন: শিবরম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: হাররুন! হাররুন! তথা এটা গরম এটা গরম।[৮৪]

**১৩. মেহেদী (حنا):** রাসূলুল্লাহ (সা.)আঘাত জনিত ক্ষত, ঘা ও চর্মরোগে মেহেদী ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। হাদীসে এসেছে – اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا صَدَعَ غَلَفَ رَأْسَه بِالْحِنَاءِ وَ يَقُوْلُ اِنَّهُ نَافِعٌ بِاِذْنِ اللهِ مِنَ الصَّدَعِ–

অর্থ: যখন নবী কারীম (সা.)-এর মাথা ব্যথা দেখা দিতো তখনই তিনি মাথায় মেহেদী লাগাতেন আর বলতেন, আল্লাহর হুকুমে এটা মাথা ব্যথার শিফাদানকারী।[৮৫]

**১৪. ইছমাদ (اثمد) :** রাসূলুল্লাহ (সা.) তঁর সাহাবীদেরকে ইছমাদ জাতীয় সুরমা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। কারণ এটি ব্যবহার করলে ভ্রূ উদগত হয় এবং চোখের দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ... اِنَّ خَيْرَ اَكْحَالِكُمْ الاِثْمَدُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَ يَنْبُتُ الشَّعْرَ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন- ...তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইছমাদ। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে।[৮৬]

**১৫. সফরজাল (سفرجل):** সফরজালের বাংলা পরিভাষা হলো বিহিদানা।এটা একপ্রকার টক মিষ্টি জাতীয় ফল। বিহিদানা শরবত ও মোরাব্বা তৈরি করে খেলে পেট, যকৃত, হৃদকম্পন ও মানসিক দূর্বলতা দূর হয়।
হযরত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِيَدِه سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ دُوْنَكَهَا يَا طَلْحَةُ فَاِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ–

---

৮৩. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জুলাব ব্যবহার, খ. ৪, পৃ. ১০০, হাদীস নং- ৩৪৬১
৮৪. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং- ৭৫১৮
৮৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুফলিহ, *আল-আদাবুল শারঈয়্যাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬, খ. ২, পৃ. ২৮২
৮৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সুরমা ব্যবহার, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং- ৩৮৩৬

অর্থ: আমি একবার নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হই। এ সময় নবী করীম (সা.)-এর হাতে একটি বিহিদানা ছিল। নবী করীম (সা.) আমাকে দানাটি দেখিয়ে ইরশাদ করলেন: হে তালহা! এটা নিয়ে নাও, নি:সন্দেহে এটা চিত্ত সতেজকারী।[৮৭]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে রক্ত বন্ধ করণে মাদুরের ছাই, সিয়াটিক পেইন রোধ করণে দুম্বার নিতম্বের মাংস, জ্বর নিরাময়ে ঠান্ডা পানি, চুলকানী রোগীদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান, পাকস্থলী ও হার্টের শক্তি বর্ধক করণে মুসাব্বর, ডায়েরিয়া নিরাময়ে ওরাল স্যালাইনসহ অন্যান্য রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন জিনিস ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতেন। যার বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা অন্যান্য অধ্যায়ে রয়েছে।

৮৭. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২০

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হওয়ার প্রত্যাশায় চিকিৎসার জন্য স্বভাবতই ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে হয় এবংমানব সেবা ও সুস্থতার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি মূলত চিকিৎসকরাই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাই সমাজে ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাছাড়া ডাক্তারী পেশা ও মানবিকতা একই সুতোয় গাঁথা। কারণ ডাক্তারগণ মানুষের যতোবেশি সেবা করার সুযোগ পান অন্য পেশাজীবীরা ততোটা পান না। একজন আদর্শ ডাক্তার অন্য যেকোনো পেশা থেকে একটু ভিন্ন হওয়ার কারণে তাঁর দায়িত্বও বেশি। একটি দায়িত্ব মানুষ হিসেবে, আরেকটি ডাক্তার হিসেবে। কাজেই একজন ডাক্তারকে আগে ভালো মানুষ হতে হয়। একজন ভালো মানুষই মূলত একজন আদর্শ ডাক্তার। একজন চিকিৎসক যখন চিকিৎসা করেন, তখন তিনি একই সঙ্গে যোদ্ধা ও শান্তির প্রতীক। তার যুদ্ধ রোগের সঙ্গে রোগী বা অর্থ উপার্জনের সঙ্গে নয়। চিকিৎসক যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে নিজের এবং রোগীর মুখে হাসি ফোটায়। সে হাসি সাফল্য, বিজয় ও আনন্দের হাসি। আর তা অর্জন করা একজন ডাক্তারের পক্ষে তখনই সম্ভব যখন তিনি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সচেতন থাকেন এবং বিশুদ্ধ নিয়ত, ধৈর্য, মহমর্মিতা, সদাচরণ ও সহনশীলতার সাথেকাজ করেন। পক্ষান্তরে,একজন ডাক্তার যদি প্রতারণা, লোভ, রোগীর প্রতি অবহেলা এবং বেনিয়াবৃত্তির সাথে চিকিৎসা করেন তবে তা কখনই মানব সেবার পর্যায়ে পড়ে না। ইঞ্জিনিয়ার বাড়ি বানাতে ভুল করলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা আছে এবং বিচারকও যদি আদালতে রায় ভুল দেয় তাহলে উচ্চ আদালতে তা সংশোধনের সুযোগ থাকে, কিন্তু চিকিৎসায় ভুল করলে তা সংশোধনের সুযোগ না বললেই চলে। সুতরাং কুরআন-হাদীসের আলোকে একজন মুসলিম ডাক্তারের দায়িত্ব কর্তব্য অন্য যেকোনো ধর্মের ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি। নিম্নে সংক্ষেপে মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করা হলো–

নিম্নে কুরআন-হাদীসের আলোকে মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হলো-

**০১. বিশুদ্ধ নিয়ত:** মুসলিম চিকিৎসক তাঁর কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সৃষ্টির সেবার নিয়ত করবেন। কেননা বিশুদ্ধ নিয়ত জাগতিক কাজকেও ইবাদতে পরিণত করে। মানব সেবার নিয়তে চিকিৎসা সেবা দিলে এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি মিলবে। তাই একজন আদর্শ ডাক্তারের উদ্দেশ্য থাকবে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। হাদীসে এসেছে-

**إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ–** অর্থ: নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।[৮৮]

**০২. বিশুদ্ধ বিশ্বাস:** মুসলিম চিকিৎসক গভীরভাবে বিশ্বাস করেন তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও প্রচেষ্টা উপলক্ষ্য মাত্র। রোগ মুক্তি ও আরোগ্যের প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ–

অর্থ: আমি যখন অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে রোগমুক্ত করেন।[৮৯]

**০৩. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ:** চিকিৎসক তাঁর জ্ঞান, মর্যাদা ও মানব সেবার সুযোগের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। কেননা, তা একান্তই আল্লাহর অনুগ্রহ। ইরশাদ হয়েছে-

وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا–

অর্থ: তুমি যা জানতে না তা তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন এবং তোমার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ।[৯০]

**০৪. চিকিৎসায় যত্নবান হওয়া এবং রোগীকে উত্তম পরামর্শ দেয়া:** মুসলিম চিকিৎসক তাঁর পেশাগত কাজে যত্নবান হবেন। সময়মতো ও সময় নিয়ে রোগী দেখা, মনোযোগ ও যত্নসহকারে দেখা এবং রোগী দেখার সময় টেলিফোন, মোবাইল বা অন্য বিষয় থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা। এছাড়া তিনি রোগীর জন্য সবচেয়ে উপকারী পরামর্শটি দেবেন। কোনো কোম্পানীর প্ররোচনায় বা অন্য কোনো কারণে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিম্নমানের ও অতিরিক্ত ঔষধ দেবেন না। হাদীসে এসেছে-

---

৮৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: ওহীর সূচনা, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, খ. ১, পৃ. ১, হাদীস নং-১

৮৯. আল-কুরআন, ২৬: ৮০

৯০. আল-কুরআন, ৪: ১১৩

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمنُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।[৯১]

**০৫. রোগীর জীবন ঝুঁকিতে না ফেলা:** মুসলিম চিকিৎসক নিজের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা গোপন করে রোগীর জীবন ঝুঁকিতে ফেলবেন না। তিনি আল্লাহকে ভয় করবেন। যদি কোনো রোগের চিকিৎসা তাঁর জানা না থাকে, তাহলে এ বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাঁর নিকট প্রেরণ করবেন, এতে কোনো ভনিতা করবেন না। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى اَبِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيُّمَا طَبِيْبٍ تَطَبَّبَ عَلٰى قَوْمٍ لاَّ يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنُ– قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ اِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوْقِ وَالْبَطُوْ الْكَىُّ–

অর্থ: আবদুল আযীয ইবন উমার ইবন আবদুল আযীয (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার নিকট যাঁরা আসতেন তাদের বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো যদি ব্যক্তি ডাক্তার না হয়েও রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে কেউ না জানে, এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা দ্বারা কারো ক্ষতি হলে তিনি দায়ী হবেন।[৯২]

**০৬. রোগীর সাথে কোমল আচরণ করা:** রোগীর সাথে চিকিৎসকের আচরণ হবে বন্ধুসুলভ। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিলে তিনি ইরশাদ করেন-

اَللهُ الطَّبِيْبُ بَلْ اَنْتَ رَجُلُ رَّفِيْقُ طَبِيْبُهَا الَّذِىْ خَلَقَهَا–

অর্থ: ডাক্তার তো আল্লাহই,বরং তুমি রোগীর একজন বন্ধু। আসল ডাক্তার তো তিনিই, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।[৯৩]

**০৭. রোগীর প্রতি কল্যাণকামী হওয়া:** মুসলিম চিকিৎসক রোগীর প্রতি কল্যাণকামী হবেন। অনেক সময় অমানবিক এমন ডাক্তারও দেখা যায়, প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তারী ফিস দিতে না পারার কারণে তারা অসহায় ও গরীব রোগীর চিকিৎসাদিতে রাজি হন না, এমনকি নির্ধারিত ফিস থেকে একটি টাকাও কম নিতে চান না। তাই বেনিয়া ও কসাই মনোবৃত্তি বাদ দিয়ে রোগীর প্রতি দয়াবরবশ হতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللهُ–

অর্থ: জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।[৯৪]

**০৮. রোগীর অসংযত আচরণে ধৈর্য ধারণ করা:** মুসলিম চিকিৎসক রোগীর অসংযত আচরণ ও অভিযোগের প্ররিপ্রেক্ষিতে ধৈর্যের পরিচয় দেবেন, তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। শায়খ আবু আবদুর রহমান সাকাল্লি (রহ.) বলেন- সব অভিযোগ নিন্দনীয় কিন্তু তিনটি ব্যতিক্রম। যথা: (ক) শিক্ষার্থী যখন আলিমের কাছে না বোঝার অভিযোগ করে, (খ) মুরিদ যখন তার শায়েখের কাছে অন্তরের ব্যাধির অভিযোগ করে এবং (গ) রোগী যখন চিকিৎসকের কাছে তার শারীরিক ব্যাধির অভিযোগ করে।অনেক সময় রোগীর অশোভ আচরণ ও অন্যান্য পীড়াদায়ক ব্যবহরে ডাক্তাদের ধৈর্যধারণ করতে হয়। এজন্যও তাঁরা পুরষ্কৃত হবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

---

৯১. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: পরামর্শদাতা হলো আমানতদার, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদীস নং- ২৮২২
(পরবর্তীতে ইহা " *জামি আত-তিরমিযী*", হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে)

৯২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রক্তপণ, অনুচ্ছেদ: চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করলে তার শাস্তি সম্পর্কে, খ. ২, পৃ. ২৮৫, হাদীস নং- ৪৫৮৭

৯৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিরুনি করা, অনুচ্ছেদ: খিযাব, খ. ২, পৃ. ২২৬, হাদীস নং- ৪২০৭

৯৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, (অনুবাদ: আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪ (পঞ্চম মুদ্রণ), অনুচ্ছেদ: যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না, পৃ. ৭৭, হাদীস নং- ৯৭

অর্থ: কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।[৯৫]

**০৯. হারাম পরিহার করা:** যতক্ষণ রোগীর জীবন বাঁচাতে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। তাই মুসলিম চিকিৎসক চিকিৎসার ক্ষেত্রে হারাম কাজ, পদ্ধতি ও প্রতিষেধক পরিহার করবেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَ الدَّوَاءَ وَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوْا وَ لاَ تَدَاوُوْا بِحَرَامٍ–

অর্থ: আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রোগ ও চিকিৎসা দু'টিই পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।[৯৬]

**১০. লিখিত ব্যবস্থাপত্র দেয়া:** রোগীদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত, মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের হয়ে থাকে। তাই রোগীকে সেবন করার জন্য যেসকল ঔষধ দেয়া হয় তা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকতে হবে এবং ওষুধের পরিমাণ, ব্যবহার পদ্ধতি, ওষুধ খাওয়ার আগে না পরে, চিকিৎসা গ্রহণের সময় যেসব বিষয় পরিহার করে চলতে হবে এবংওষুধ ব্যবহারের ফলে সাময়িক যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা সুস্পষ্টভাবেলেখা থাকতে হবে অথবা সময় নিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।

**১১. রোগীর দৃষ্টিতে রোগ দেখা:** রোগী তার রোগের কারণে মানসিক ও শারীরিকভাবে যতটুকু পেরেশানিতে আছে, তা উপলব্ধি করার অনুভূতি ডাক্তারের মাঝে থাকতে হবে। একজন ডাক্তারের কাছে রোগী কী প্রত্যাশা করে, সে অনুযায়ী রোগীর প্রতি খেয়াল করা, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনা এবং তার প্রতি দয়া করা। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ–

অর্থ: তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।[৯৭] অন্য হাদীসে এসেছে– عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلاَّ مِنْ شَقِیٍّ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: বদবখত ছাড়া কারো থেকে দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয় না।[৯৮]

**১২. রোগীর সাথে প্রতারণা না করা:** সাধারণত একজন রোগী ডাক্তারকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।সুতরাং কোনো কিছু ঠিক করে দেয়ার আগে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে এর কার্যকারিতা ও প্রায়োগিক দিকগুলো ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। অপ্রচলিত, অগ্রহণযোগ্য এবং অপ্রয়োজনীয় কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। মানহীন কোম্পানীর ওষুধ শুধু কমিশনের লোভে দিলে এটা হবে রোগীর সাথে প্রতারণা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا অর্থ: যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৯৯]

**১৩. নির্লোভ থাকা:** চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের নির্লোভ থাকা খুবই জরুরী। কোনো ডাক্তারের মধ্যে যদি টাকা, পদ বা অন্যকোনো লোভ এসে যায় তাহলে তার দ্বারা প্রকৃত চিকিৎসা পাওয়া দুষ্কর। তখন তিনি এসকল বিষয় উপার্জনের জন্য বিভিন্ন নিষিদ্ধ পথ অবলম্বন করবেন এবং প্রতারণার আশ্রয় নেবেন। এমনকি অনেক সময় অর্থের লোভে পড়ে রোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা প্রদানের মনমানসিকতা হারিয়ে ফেলবেন এবং কোনো কোনো সময় মিথ্যা রিপোর্ট দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না। হাদীসে এসেছে-

---

৯৫. আল-কুরআন, ৩৯: ১০

৯৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: গর্হিত ঔষধ, খ. ২, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং- ৩৮৭৪

৯৭ .*জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, অনুচ্ছেদ: মানুষের প্রতি দয়া,খ. ২, পৃ. ৪১, হাদীস নং- ১৯২৪

৯৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: মানুষের প্রতি দয়া,খ. ২, পৃ. ৪১, হাদীস নং- ১৯২৩

৯৯. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্তি- যে ব্যক্তি আমাদের ধোকা দেবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, খ. ১, পৃ. ৩২১, হাদীস নং- ২৮৩

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهِ–

অর্থ: আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে ব্যক্তি অন্য মুমিনের ক্ষতি করে বা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে।[১০০] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَ الْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মুমিন হলো সরল ভদ্র আর কাফির হলো সুচতুর, প্রতারক ও নিচ।[১০১]আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ وَ مَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ–

অর্থ: আবু সিরমা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে আল্লাহ তা দিয়েই তার ক্ষতি করেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় আল্লাহও তাকে কষ্ট দেন।[১০২]

**১৪. অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করা:** চিকিৎসা পেশাতে অন্যায় ও পাপ কাজের অনেক চোরাগলি রয়েছে। সেগুলোর অন্যতম হলো- বাচ্চা নষ্ট করা, সার্জারীর মাধ্যমে চেহার বা দেহের আকৃতি পরিবর্তন করা, মিথ্যা রিপোর্ট দেয়া প্রভৃতি। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا-

অর্থ: আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করবো, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেবো, তাদেরকে আদেশ দেবো যেনো তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করবো যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[১০৩]

অত্র আয়াতে সৃষ্টির বিকৃতি বলতে আল্লাহর প্রাকৃতিক সৃষ্টির পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে। পুরুষের স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা মহিলাদের গর্ভাশয় তুলে ফেলে তাদের সন্তান জন্মানোর যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করাও এই পরিবর্তনের আওতায় পড়ে। পাশাপাশি মেকআপের নামে ভ্রূর চুল চেঁছে আকৃতির পরিবর্তন করা, দাত সরু করা এবং চেহারা ও হাতে নকশা করা, উল্কি করা, ট্যাটু লাগানো ইত্যাদিও এর মধ্যে শামিল। এসবই হলো শয়তানী কার্যকলাপ, একজন ডাক্তারকে এসব কাজে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা ঈমানী দায়িত্ব।এ সকল বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক হাদীসে রয়েছে।

**১৪. সতরের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা:** মহিলা রোগীর চিকিৎসা মহিলা ডাক্তার দ্বারা করাই উত্তম। তবে সংশ্লিষ্ট রোগের বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে বাধ্যগত অবস্থায় পুরুষ ডাক্তারও চিকিৎসা করতে পারবেন, তবে সেখানে মহিলার কোনো অভিভাবক তার সঙ্গে থাকবে। অনুরূপভাবে মহিলা ডাক্তারগণও প্রয়োজনে সতর্কতার সাথে পুরুষ রোগীর চিকিৎসা করতে পারবেন। সুতরাং চিকিৎসার প্রয়োজনে কারো সতর ও লজ্জাস্থান খোলার দরকার হলে শুধু প্রয়োজনীয় অংশ খোলা, দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং স্পর্শ করার অনুমতি আছে এর বেশি নয়। এক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য জরুরী হলো দৃষ্টিকে সংযত রাখা ও সর্বাবস্থায় তাকওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া। হাদীসে এসেছে-রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী (রা.)-কে বলেন: হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাত (বেগানা স্ত্রীলোকদের প্রতি যা অনিচ্ছাকৃত হয়েছে) তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি যেন তার অনুসরণ না করে। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়েয, আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।[১০৪]

---

১০০. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, অনুচ্ছেদ: খিয়ানত ও প্রতারণা, খ. ২, পৃ. ৪৫, হাদীস নং- ১৯৪১
১০১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: কৃপণতা, খ. ২, পৃ. ৫১, হাদীস নং- ১৯৬৪
১০২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: খিয়ানত ও প্রতারণা, খ. ২, পৃ. ৪৫, হাদীস নং- ১৯৪০
১০৩. আল-কুরআন, ৪: ১১৯
১০৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়, খ. ১, পৃ. ৩০৯,

**১৫. আমানতদারী রক্ষা করা:** রোগীর অবস্থা বিবেচনায় তার সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কারো নিকট টাকা বা জিসিন রাখার পর তা গ্রাহককে যথাযথ ফিরিয়ে দেয়ার নামই শুধু আমানত নয়। বরং মানুষের জীবন সবচেয়ে বড় আমানত। তাইনির্দিষ্ট রোগের ব্যাপারে ডাক্তারের অভিজ্ঞতা না থাকলে আমানতদারীর সঙ্গে তিনি রোগীকে অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করা উচিত নয়। এতে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। যার কোনো মূল্য হতে পারে না। একজন রোগী ডাক্তারের কাছে রোগবিষয়ক পরামর্শের জন্য আসে। হাদীসে এসেছে– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।[১০৫]

উল্লেখ্য,রোগীর রোগ সম্বন্ধে গোপনীয়তা রক্ষা করাও একজন ডাক্তারের অন্যতম আমানত এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য।

**১৬. নিজের ব্যাপারে সর্তক থাকা:** মুসলিম চিকিৎসক যেমন রোগীর সেবা করবেন, তেমনি তিনি নিজের ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন। এমন অনেক ডাক্তার দেখা যায়, যারা অর্থের জন্য নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করে দেয়। বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের গভীর রাত পর্যন্ত রোগী দেখেন এবং অপারেশন করেন। ডাক্তার রোগীকে সময়মতো ও পমিাণমতো ঘুমানোর পরামর্শ দিলেওনিজে টাকার নেশায় খুব কম ঘুমান এবং ঠিকমতো খাওয়ারও সময় পান না। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ اَ رَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِىْ؟ قَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ لٰكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ قَالَ فَاِنِّىْ اَنَامُ وَ اُصَلِّىْ وَ اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اَنْكِحُ النِّسَاءَ– فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ فَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ اِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَ اَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ نَمْ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) উসমান ইবন মাযউন (রা.)-কে ডেকে পাঠান। তিনি আগমন করলে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: হে উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাতের বিরোধিতা করছো? তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না, বরং আমি আপনার সুন্নাতের অন্বেষণকারী। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: আমি ঘুমাই এবং সালাতও আদায় করি, রোযা রাখি এবং ইফতারও করি এবং স্ত্রীও গ্রহণ করি। হে উসমান! তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তোমার প্রতি তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে, তোমার নফসেরও হক আছে। অতএব তুমি রোযাও রাখো এবং রোযাহীনও থাকো, সালাত আদায় করো এবং নিদ্রাও যাও।[১০৬]

**১৭. ডাক্তারী করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করা:** রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি দক্ষ-অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা নেয়া। তাই একজন ডাক্তার পেশা জীবনে রোগী দেখার পাশাপাশি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন কোর্স করে এবং প্রচুর বই, সাময়িকী, জার্নাল অধ্যয়ন ও গবেষণা করেঅভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত। অদক্ষ এবং অনভিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে কোনোক্রমেই ভালো এবং উন্নত চিকিৎসা সেবার আশা করা যায় না। তাই আদর্শ ডাক্তারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, চিকিৎসা ক্ষেত্রে জন্য নতুন বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করা। মানুষের শিক্ষার কোনো শেষ নেই। বিশেষ করে চিকিৎসার ময়দানে। প্রত্যেক দিন মানব দেহে নতুন নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেক ডাক্তারের কর্তব্য হলো, এসকল রোগ নিরাময়ের জন্য নতুন নতুন অভিজ্ঞা ও সৃজনশীল দক্ষতা অর্জন করা। হাদীসে এসেছে-

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَصَابَهُ جَرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ– وَ اَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِىْ اَنْمَارٍ– فَنَظَرَا اِلَيْهِ فَزَعَمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُمَا اَيُّكُمْ اَطَبُّ؟

---

হাদীস নং- ২১৪৯

১০৫. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: পরামর্শদাতা হলো আমানতদার, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদীস নং- ২৮২২

১০৬. *সুনান আবু দাউদ*, অধ্যায়: সালাত, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: সালাতের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ, খ. ১, পৃ. ২০২-২০৩, হাদীস নং- ১৩৬৯

অর্থ: যায়দ ইবন আসলাম (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তির শরীর যখম হয়ে রক্ত জমা হয়ে গিয়েছিলো। অত:পর লোকটি বনী আনযাম গোত্রের দুই ব্যক্তিকে এর চিকিৎসার জন্য ডেকে আনলেন। তারা পরীক্ষ-নিরীক্ষা করে দেখলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের উভয়ের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান কে অধিক জানে?[১০৭]

**১৮. আল্লাহভীতি ও ইবাদতের পদ্ধতি শিখানো:** অনেক রোগী আছেন, যারা দীনের বিধান সঠিকভাবে পালন করেন না। অসুস্থ হলে তাদের হৃদয়ে অনুতাপের অনুভূতি জাগ্রত হয়। তখন তাদের হৃদয় আল্লাহর দিকে রুজূ হয় এবং দাওয়াত গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠে। আর সেই অনুতপ্ত হৃদয়ে ডাক্তাররা আল্লাহভীতির বীজ বপন করতে পারেন। অনেকেই রোগক্রান্ত হয়েও ইবাদতের বিধি-বিধান না জানার কারণে ইবাদত থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। যেমন অনেক রোগী অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সালাত আদায় করেন না, আবার কেউ হাসপাতালে বেডে বসে গান শোনে-টিভি দেখে সময় কাটান। তাই সালাতের আবশ্যকতা, সালাত পরিত্যাগের পরিণতি, অসুস্থাবস্থায় অযু, গোসল, তায়াম্মুম এবং অক্ষম অবস্থায় বসে বা শুয়ে থেকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি ও বিধানগুলো ডাক্তারদের মাধ্যমে শিখলে রোগীরা বেশি প্রভাবিত হন। কোনো কোনো রোগীর জীবনে ডাক্তারদের দাওয়াতের প্রভাব আজীবন থেকে যায়। তাই ডাক্তারদেরকে চিকিৎসা বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শরঈ জ্ঞান চর্চার প্রতিও মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। এজন্য মেডিকেলের সিলেবাসগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

**১৯. কালিমার তালকীন দেয়া:** ডাক্তারগণ মৃত্যুর পথযাত্রীদেরকে কালেমার তালকীন (পড়ানো) দেয়ার বেশি সুযোগ পান। সুতরাং হাসপাতালের বেডে বা অপারেশন থিয়েটারে মরণাপন্ন রোগীকে কালেমার তালকীন দেওয়া ডাক্তারের অন্যতম কর্তব্য। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْخُدْرِیُّ یَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালিমার তালকীন দেবে তথা তার কানের কাছে আস্তে আস্তে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করতে থাকবে।[১০৮] অন্য হাদীসে এসেছে, মুআয ইবন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِهِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ–

অর্থ: যে ব্যক্তির সর্বশেষ কালিমা (কথা) হবে- “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১০৯]

**২০. ডাক্তারদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা:** দ্বীনদার ডাক্তারদের অন্যতম করণীয় হলো তাদের মেডিকেল, হসপিটাল, ক্লিনিক এবং চেম্বারগুলোতে দীনি পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। সহকারী ডাক্তার, নার্স ও সহকর্মীদের মাঝে হালাল-হারাম, ডাক্তারী পেশার খিয়ানত, পর্দা-পুশিদা প্রভৃতি বিষয়ে দাওয়াত দানে সদা তৎপর থাকা। কোনো মেডিকেল, হসপিটাল বা ক্লিনিকের পরিবেশ যদি অনুকূলে নাও থাকে, তবুও আল্লাহর ওপর ভরসা করে ধৈর্যের সাথে নিজের দীনি দায়িত্ব পালন করা। অনেকেই দূষিত পরিবেশের দোহাই দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন, এটা আদৌ কাম্য নয়। আবার কোনো কোনো অপরিণামদর্শী আলিম ডাক্তারদেরকে এই পেশায় নিরুৎসাহিত করেন এবং নারীদের জন্য হারাম হওয়ার ফাতওয়া দেন। অথচ আমরা যদি ডাক্তারদেরকে চিকিৎসাবিদ্যা ছেড়ে দিতে বলি, ভালো লোকেরা এই জ্ঞান অর্জন না করে এবং বলে যে, আমরা কিভাবে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করবো অথচ আমাদের পাশে থাকে মহিলা নার্স, শিক্ষার্থী ও ইন্টার্নী ডাক্তার? আমরা বলবো, আপনি যদি এই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে এ বিদ্যার ময়দান কি খালি থাকবে? অচিরেই খারাপ লোকগুলো এ ময়দান দখল করে নেবে এবং যমীনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেবে। বরং আপনারা একজন, দুইজন, তিনজন, চারজন যদি একত্রিত হন, আশা করি এমন একদিন

---

১০৭. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিতাবুল জামি, অনুচ্ছেদ: রোগের সময় তাবীয বা ঝাড়ফুঁক করা, খ. ৩, পৃ. ৫৮৫, হাদীস নং-১৭০৮

১০৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: তালকীন, খ. ২, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ৩১১৬

১০৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ৩১১৫

আসবে যেদিন আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রপ্রধানকে হিদায়াত দেবেন এবং তিনি মহিলাদের জন্য আলাদা ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করবেন।

সুতরাং দীনদার ডাক্তারের কর্তব্য হলো তার কর্মক্ষেত্রে যদি কলুষিত পরিবেশ থাকে, তাহলে প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াতের মাধ্যমে সাধ্যমতো তিনি তার দীনি দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন। দীন বিমুখ, আত্মহারা ও অসাধু ডাক্তারদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য দীনদার ডাক্তারদেরকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সাধারণত আলিমগণের দাওয়াত অধিকংশ সময় তাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে না। তাই মৌখিকভাবে হোক এবং বইপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক নিজেদের পরিমন্ডলে সাধ্য অনুযায়ী দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করা একজন আদর্শ ডাক্তারের ঈমানী দায়িত্ব।

এছাড়াও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসকদের নিজস্ব অবস্থান থেকে রোগীর প্রতি সর্বোচ্চ আন্তরিক হতে হবে, রোগী দেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় হাতে রাখতে হবে এবং ইতিবাচক আচরণ ও কথাবার্তার মাধ্যমে রোগীর মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে হবে। তাহলে চিকিৎসকের বিষয়ে রোগীর আস্থা বাড়বে। যেহেতু রোগী বা রোগীর স্বজন অসুস্থতার সময় মানসিক চাপের পাশাপাশি আর্থিক চাপের মধ্যে থাকে, তাই মাঝে মাঝে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারে। তখন যথাসম্ভব তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাও চিকিৎসকের দায়িত্ব।

রিলিজ দেয়ার উপযুক্ত সময় আসার আগে রিলিজ না দেয়া। এমনিভাবে রিলিজ করার সময় হলে অযথা রোগীকে আটকিয়ে না রাখা। অনেক অসাধু বেসরকারী মেডিকেল কর্তৃপক্ষ টাকার নেশায় সময় পার হয়ে গেলেও রিলিজ দিতে চায় না। আবার অনেক সরকারী হাসপাতাল সময়ের আগেই বের করে দেয়। উভয়টাই রোগীর প্রতি অন্যায় ও চরম অবহেলা।রোগী ধনী বা গরীব যাই হোক অসুস্থ অবস্থায় মূলত সবাই অসহায়। আর চরম অসহায় এই মানুষদের পকেটের সব টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য কিছু ডাক্তার, ক্লিনিক, প্যাথলজি, রক্তবিক্রেতা ও নামে-বেনামে ওষুধ কোম্পানী মিলে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সারা দেশে তাদের লোভের জাল বিস্তার করে রেখেছে। ইথিকস বিসর্জন দেয়া বেনিয়া ডাক্তাররা রোগীকে কঠিন অসুখের ভয় দেখিয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল টেস্ট করাতে বাধ্য করেন। পরে টেস্টের মোট টাকার একটি ভাগ তিনি কমিশন পান সংশ্লিষ্ট প্যাথলজি থেকে। কমিশনের বাইরেও তিনি টেস্টের জন্য রোগী পাঠানোর নামে সংশ্লিষ্ট প্যাথলজি থেকে এককালীন সেলামী বাবদ মোটা টাকা পান। এছাড়া এরা বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী থেকে তাদের দামী দামী ওষুধ রোগীর প্রেসক্রিপশনে লেখার জন্য মোটা অংকের সেলামী আদায় করেন। ওষুধ ও কোম্পানী যতো ভালই হোক না কেন টাকা না দিলে এসব ডাক্তার সেই ওষুধ কোন দিন রোগীর প্রেসক্রিপশনে লেখেন না। যেখানে একটা বা দুইটা সাধারণ কম দামী ওষুধে রোগীর অসুখ সারতে পারে, সেখানে এসব ডাক্তাররা ওষুধ কোম্পানীর সেলামী হালাল করতে রোগীকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অধিক সংখ্যক দামী ওষুধ লিখে দিচ্ছেন। প্রয়োজন না থাকলেও শুধু ওষুধ কোম্পানীর বিক্রি বাড়াতে এসব ডাক্তাররা অসহায় রোগীদের বেশি টাকার ওষুধ কিনতে বাধ্য করছেন। এসব ডাক্তাররা অসহায় মরণাপন্ন রোগীকে সুস্থ হবে না জেনেও ব্যয়বহুল বেসরকারী হাসপাতালে রেফার করেন স্রেফ কমিশনের জন্য। এরা কমিশনের জন্য রোগীকে সরকারী অ্যাম্বুলেন্স রেখে বেসরকারী এ্যম্বুলেন্স ব্যবহারে উৎসাহ দেন। রোগীর অপারেশন দরকার না হলেও স্রেফ টাকার জন্য রোগীকে জোর করে অপারেশন করান। সরকারী হাসপাতালে টেস্টের ব্যবস্থা থাকলেও কমিশনের লোভে একজন গরীব রোগীকেও ব্যবসায়িক প্যাথলজিতে পাঠাতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করেন না। সেখানেও রয়েছে কমিশন। বেশি টাকার এই অসংযত লোভ করাও যে একজন ডাক্তারের মানসিক অসুস্থতার একটি বড় লক্ষণ, তা তারা ভুলে যান।

সুতরাং মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে সেই ডাক্তাররাই যদি এমন একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ থাকেন তাহলে মানুষ কার কাছে চিকিৎসা নেব? এই মানসিক রোগাক্রান্ত ডাক্তারদের কাছে শারীরিক রোগের সুপরামর্শ পাওয়া দিবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সুতরাং সেই সকল ডিগ্রীধারী অসাধু ডাক্তারদের প্রতি পরামর্ম হলো- সাবধান হোন এবং আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষের সাথে প্রতারণা করে নিজেদের আখিরাত ধ্বংস করবেন না। দয়া করে অমানবিক হবেন না। কোনোরূপ অবহেলা ও লালসার কারণে যদি কোনো রোগীর সামান্যতম ক্ষতি হয় তাহলে এর হিসাব অবশ্যই আল্লাহর সামনে দিতে হবে। ডাকাতের হত্যা করা আর ডাক্তারের হত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا–

অর্থ: কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো একজনের জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে।[১১০]

অবশেষে বলা যায়, চিকিৎসা পেশা একটি মহান পেশা। এই পেশায় মানব সেবার যত বেশি সুযোগ পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোনো পেশাতে সেটা পাওয়া যায় না। ডাক্তারগণ হলেন মানবতার খাদেম। তারা যদি আদর্শবান হন, তাহলে তাদের হাত ধরেই সমাজে মানবিকতার ভিত রচিত হবে এবং মনুষ্যত্বের নিশান উচ্চকিত হবে। পক্ষান্তরে তারা বিপথগামী হলে জনজীবনে নেমে আসবে অশান্তি ও দুর্ভোগের কালো মেঘ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মানব সেবায় এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ডাক্তারগণকে আদর্শবান ও মানবসেবী হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!

প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু বকর রাজি সুচিকিৎসা লাভে রোগীর প্রতি তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলো- (ক) নিজ শহরের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসককে নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করা, (খ) চিকিৎসকের সঙ্গে সর্বোচ্চ সদাচরণ করা এবং (গ) চিকিৎসকের প্রতি আস্থা রাখা ও ধৈর্যের পরিচয় দেয়া। অত:পর তিনি বলেন, এগুলো তোমাকে অল্প কষ্টে, দ্রুততম সময়ে সহজে আরোগ্য লাভে সহায়তা করবে।[১১১]

**চিকিৎসক কখন দায়ী হবেন**

চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে যেহেতু মানুষের জীবন ও জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, তাই প্রাজ্ঞ আলিমগণ মুসলিম চিকিৎসকদের জন্য তিনিটি মৌলিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তা পূরণের ক্ষেত্রে তিনটি কাজ বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেন রোগী ক্ষতি থেকে এবং তাঁরা আইনী জবাবদিহি থেকে রক্ষা পান।প্রধান তিন লক্ষ্য

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন- শারীরিক চিকিৎসার মূল ভিত্তি হলো তিনটি। যথা: (ক) সুস্থতা রক্ষা, (খ) কষ্টকর বিষয় বা রোগ দূর করা এবং (গ) সুস্থতার জন্য হুমকি এমন বিষয় অপসারণ করা (অস্ত্রোপচার)।[১১২]

বর্জনীয় তিন কাজ: (ক) চিকিৎসা কাজের জন্য কোন চিকিৎসককে দায় করতে হলে তাঁর ব্যাপারে তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হতে হবে-

(ক) ইসলামী শরীয়ত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রচলন ও রীতির বিপরীতে বাড়াবাড়ি করা,

(খ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিকর কোন ওষুধ বা পদ্ধতি প্রয়োগ করা এবং

(গ) পেশাগত দায়িত্বে অবহেলা করা।[১১৩]

আর কোন চিকিৎসক যদি অজ্ঞ হন এবং তাঁর দ্বারা মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় থাকে, তবে এমন চিকিৎসককে প্রতিহত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[১১৪]

**চিকিৎসকের মর্যাদাপূর্ণ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য**

আবু বকর মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া আর-রাজি চিকিৎসকদের মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ে বলেন, চিকিৎসকরা এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। তাহলো-

০১. পৃথিবীর সব জাতি ও সভ্যতা তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে।

০২. রাষ্ট্র ও ক্ষমতাগুলো তাঁদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছে। যখন পরিবার-পরিজন ও সম্পদ কাজে আসে না, তখন তাঁরা ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

০৩. মানুষের কল্যাণ চেষ্টা থেকে তাঁরা কখনো মুখ ফিরিয়ে নেননি।

০৪. সব সময় মানুষের সুখ ও শান্তিকে অগ্রাধিকার দেন।

---

১১০. আল-কুরআন, সূরামায়েদা: ৩২

১১১. *আখলাকুত-তাবিব*, পৃ. ৩১-৩৩

১১২. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬

১১৩. *তাকরিবু ফিকহিত-তাবিব*, পৃ. ১০১

১১৪. *আখতাউল আতিব্যা*, পৃ. ৮

০৫. তাঁদের নামটি তাবীব (طبيب) আল্লাহর গুণবাচক নাম থেকে নেয়া।[১১৫]

তবে প্রকৃত সুস্থতা দানকারী হিসেবে নয়, সুস্থতার কারণ বা সবব হিসেবে।

ড. আলী আবদুল্লাহ সাহাল মুসলিম সমাজে চিকিৎসকের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন- পেশা হিসেবে চিকিৎসা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কেননা একজন ডাক্তারের আলোচ্য বিষয় মানুষের জীবন, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানব প্রকৃতিকে শক্তিশালী করা ও রোগ মুক্তি। যা পৃথিবীতে মানব প্রেরণের উদ্দেশ্য (আল্লাহর দাসত্ব) পূরণের আবশ্যক। তাছাড়া এই পেশার মাধ্যমে শরীয়তের অন্যতম 'মাকসাদ' তথা ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্য পূরণ হয়।[১১৬] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-–تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى অর্থঃ ভালো কাজ ও তাকওয়ায় তোমরা একে অন্যের সহযোগিতা করো।[১১৭]

চিকিৎসাবিদ্যা যেহেতু এমন বিষয় যা স্রষ্টার এই লক্ষ্য পূর্ণ করে, সেহেতু উলামায়ে ইসলাম একে বড়ই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে –العلم علمان علم الفقه للاديان ز علم الطب للابدان

অর্থঃ ইলম মূলত দু'টিই। (এক) জীবন পরিচালনার জন্য ফিকহশাস্ত্র এবং (দুই) শারীরিক সুস্থতার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র।[১১৮]

তাই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করা ফরযে কিফায়া (সামষ্টিক অবশ্য করণীয়)। অর্থাৎ, উম্মাহর একটি দলকে অবশ্যই সবসময় এই বিদ্যা চর্চায় থাকতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্র বা কোনো জনপদে সংঘবদ্ধভাবে বসবাসকারী মুসলিমদের পক্ষ থেকে চিকিৎসায় পর্যাপ্ত ব্যয় নির্বাহ করা বা এটির উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচর্যা করাও ফরযে কিফায়া। ইমাম নববী (রহ.) বলেন- বুদ্ধিবৃত্তিক (ওহী নির্ভর নয় এমন) জ্ঞানগুলোর মধ্যে চিকিৎসা ও হিসাব বিজ্ঞান ফরযে কিফায়া কেননা, মানুষ এর মুখাপেক্ষী।[১১৯]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন- আমি হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞানের (ইসলামি আইন বিজ্ঞান) পর চিকিৎসার চেয়ে অভিজাত কোনো বিদ্যা সম্পর্কে জানি না।[১২০]

---

১১৫. *আখলাকুত তাবিব*, পৃ. ৮৭

১১৬. *আখলাকুত তাবিবিল মুসলিম*, পৃ. ৪-৫

১১৭. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা: ২

১১৮. মুফতি আন্ওয়ার শাহ, *ইসলাম ও আধুনিক মেডিকেল মাসাইল*, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: জামিয়া ফারুকিয়া ওয়ায়েজুল উলূম ইসলামাবাদ, সরাইল, মার্চ-২০১১খ্রি. পৃ. ১৪

১১৯. *রাওদাতুত-তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিয়্যীন*, খ. ১০, পৃ. ২২৩

১২০. *সিয়ারু আলামিন-নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৫৭

# পঞ্চম অধ্যায়

## আল-কুরআনে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট আয়াত ও এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির রহস্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুস্থ থাকার নিমিত্ত আল-কুরআনে পানাহার সংক্রান্ত মৌলিক নির্দেশনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শারীরিক সুস্থতায় কুরআনের নির্দেশনা ও এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা

## প্রথম পরিচ্ছেদ: চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টি রহস্য

বর্তমান সময় হলো বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। বিজ্ঞানকে জানা মানে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানা, আল্লাহর সৃষ্টিরহস্যের সাথে পরিচিত হওয়া, আল্লাহর দেয়া বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবতার কল্যাণ সাধন করা। এ যুগের তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আবহে বেড়ে ওঠছে। তারা যদি জানতে পারে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত, দিক-নির্দেশনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনন্ত ভাণ্ডার তাহলে তারাই সর্বাগ্রে আঁকড়ে ধরবে এই আসমানী কিতাবকে এবং এর আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠবে তাদের মেধা ও মনন। অন্যথায় তারা হবে বিভ্রান্ত। অথচ অজ্ঞাতার কারণে অনেকেই বিজ্ঞানকে ধর্মীয় বিষয়ে অঙ্গীভূত বলে মনে করতে চান না। এ জন্যই হয়তো বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন- Science without religion is lame and religion without science is blind.[১]
সুতরাং বিজ্ঞানের যতোই উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও তাঁর সৃষ্টি রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্যাস ও কৌশলের সাথে পরিচিত হয়ে মানুষ ততোই আল্লাহর দীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।আল্লাহ তা'আলার এমনি এক সৃষ্টি রহস্য হলো মানব সৃষ্টি, যা আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি রহস্য উল্লেখ করা হলো-

**ভ্রূণতত্ত্ব**

প্রকৃতির গঠন-ভারসাম্য বৈশিষ্ট্যাবলী এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যকার আপেক্ষিত অনুপাত সম্পর্কে যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে বিন্যাস ও সঙ্গতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বস্তু ও জীবসমূহের অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ বর্তমানে যে আকার-আকৃতিবিশিষ্টি, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনোরূপ হলে পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্র এবং অন্যান্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে মানিয়ে চলতে পারতো না। একটা নির্দিষ্ট দেহ কাঠামোর ভেতরেও আবার বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশ ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে। বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গতিই কোনো কিছুকে সৌন্দর্যের সুসমঞ্জস্যতা দান করে। কাজেই, সৃষ্টির সার্বিক মহাপরিকল্পনায় সঙ্গতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে চক্ষু উন্মীলকভাবে উপস্থাপনে কুরআনের ভঙ্গিমায় মাতৃ উদরে মানব সৃষ্টির যে তাত্ত্বিক বিষয় বিধৃত হয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভ্রূণ স্তর থেকে ধাপে ধাপে মানব শিশু কীভাবে বেড়ে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হয়। এ সকল ধাপের কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে ৭ম শতকে যখন ভ্রূণতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্ভাবনই হয়নি। ঘটনাচক্রে ভ্রূণতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক শাখা, যা বিগত একশ বছরে গড়ে ওঠেছে। এভাবে বস্তুত এ এক অবাক করার মতো ঘটনা যে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মানব ভ্রূণের ধাপে ধাপে বৃদ্ধির বিষয়টি মাত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে তাঁর সৃষ্টি এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলেছেন যেন মানুষ জীববিদ্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে পারে। আবার জীববিজ্ঞান বিষয়ক ঘটনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সুসম্পৃক্ত ধারার কথা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করে মানুষকে সকল ও বিস্তারিত দিকসহ চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নের দিকে আহ্বান জানায় এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে তার মনে আবেদন সৃষ্টি করে। কাজেই এ সকল বৈজ্ঞানিক ঘটনার উল্লেখমাত্রই সাড়ম্বরে এ ধারণা সমর্থন করে যে, আল্লাহর মহত্ত্বের উপলব্ধি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমরা যাকে সৃষ্টি জগৎ বলে থাকি, তা আল্লাহরই এক প্রকার স্মারকচিহ্নবা নিদর্শন। বিজ্ঞান মানুষকে এই স্মারকচিহ্নই বুঝতে সাহায্য করে।[২] আল্লাহ তা'আলা মানব জন্ম রহস্য ও ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন –اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ– خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ–

অর্থ: পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।[৩]

আরবি শব্দ عَلَقٍ (আলাক) এর অর্থ- জোঁক, জমাটবদ্ধ রক্ত, সংলগ্ন রক্তপিণ্ড, ঝলন্ত পদার্থ।[৪]

---

১. ড. ইকবাল কবীর মোহন, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, "আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান", ১৮.০৬.২০২১, পৃ. ১০ (থেকে উদ্ধৃত)

২. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ১০

৩. আল-কুরআন, ৯৬: ১-২

৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী: ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৫৭৫

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব শিশুর রহস্যময় গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেন। আলাক শব্দটি মূলত মায়ের জরায়ুতে মানব শিশুর জন্ম ও বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ক্রমকে বর্ণনা করে, যা আল-কুরআনের ছয়টি পৃথক আয়াতে এসেছে।[৫]

ভ্রূণ তত্ত্ববিদ্যার অন্যতম বিশেষজ্ঞ কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণ অধ্যাপক এবং এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কেইথ মূর (Dr. Keith Moore) বলেন- প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ভ্রূণকে জোঁকের মতো দেখায় কিনাআমি তা জানতাম না। অত:পর একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমি ভ্রূণের প্রাথমিক যাচাই করতে গবেষণা শুরু করি এবং প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের আকৃতির সাথে একটি জোঁকের আকৃতির তুলনা করি। এ দুটোর মধ্যে ভ্রূণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃত তথ্যের অদ্ভুত মিল দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই এবং ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে অজানা অনেক জ্ঞান আমি কুরআন থেকে লাভ করি। তিনি আরো বলেন, আমাকে যদি আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হতো, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভাবে আমি সেগুলোর অর্ধেকেরও উত্তর দিতে পারতাম না।[৬]

ড. কেইথ মূর কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত আশিটির মতো প্রশ্নের জবাব দেন। ইতিপূর্বে তিনি 'The Developing Human' নামক একটি বই লিখেছিলেন। কুরআন থেকে নতুন জ্ঞান অর্জনের পর তিনি ১৯৮২ সালে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং একক লেখকের সর্বোত্তম বই হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন। বইটি বিশ্বের অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্রথম বর্ষের মেডিকেল কলেজের ভ্রূণতত্ত্বর পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে সপ্তম মেডিকেল কনফারেন্সে ডা. মূর বলেন, কুরআনে বর্ণিত মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্যাবলির ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ পেয়ে আমি গভীরভাবে আনন্দিত। এটা আমার নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট এ সকল বর্ণনা অবশ্যই আল্লাহর নিকট হতেই এসেছিলো। কারণ এগুলোর প্রায় সকল জ্ঞানই পরবর্তী বহু শতাব্দী পরেও আবিষ্কৃত হয়নি। এটা আমার কাছে প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।[৭]
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে বেলর কলেজ অব মেডিসিনের ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. জো লিগ সিম্পসান ঘোষণা করেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর বর্ণিত এসব হাদীস সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়নি। তাই পরবর্তীতে দেখা গেলোযে, ধর্মের সাথে বংশগতিবিষয়ক বিজ্ঞান বা প্রজননশাস্ত্রের কোনো পার্থক্য নেই, উপরন্তু প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতের সাথে ধর্ম তার বিস্ময়কর জ্ঞানকে যুক্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে পথ প্রদর্শন করতে পারে... কুরআনের বর্ণিত বর্ণনাগুলো কয়েক শতাব্দী পরে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। যাতে বোঝা যায়, কুরআনের জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত।[৮]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছেমতো আকৃতি গঠন করেছেন।[৯]

পবিত্র কুরআনে মানব সৃষ্টির সুনিপুন পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ  سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ– ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ– ثُمَّ خَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا، ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًاٰاخَرَ، فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ–

অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অত:পর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি, এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অত:পর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। বরকতময় আল্লাহ তিনি কতই না সুনিপুণ সৃষ্টিকারী![১০]
আল-কুরআনের আলোকে মানব ভ্রূণের বিকাশের স্তরগুলো ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হলো-

---

৫. মু. আবুল কাসেম ভূঁইয়া, *ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাবাজার, বাংলাপ্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৪৬
৬. মো: রফিকুল ইসলাম, *ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, পিস পাবলিকেশন, জুন ২০০৯, পৃ. ১০৩-১০৪
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত
৯. আল-কুরআন, ৮২: ৭-৮
১০. আল-কুরআন, ২৩: ১২-১৪

প্রথম স্তর: নুতফা
দ্বিতীয় স্তর: আলাক
তৃতীয় স্তর: মুদগাহ
চতুর্থ স্তর: ইযামা
পঞ্চম স্তর: লাহ্‌ম
ষষ্ঠ স্তর: আনসা

সম্প্রতি বিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে যে, একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য গড়ে ৩০ লক্ষ শুক্রাণু হতে একটি মাত্র শুক্রাণুর প্রয়োজন অর্থাৎ নিষিক্তকরণের জন্য শুধু নির্গত শুক্রকীটের ১/৩ মিলিয়ন ভাগ অথবা ০.০০০০৩% শুক্রাণুর প্রয়োজন।[১১] তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا– اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ –

অর্থ: মানুষের ওপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, এভাবে যে তাকে পরীক্ষা করবো।[১২]

চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে- একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের ফলে প্রতিবার বীর্যপাতের সময় তার দেহ থেকে যে শুক্রকীট বের হয় এর পরিমাণ ২২কোটি থেকে ৩০কোটি। এই কোটি কোটি শুক্রকীটের প্রত্যেকটি স্ত্রী ডীম্বকোষে প্রবেশ করার সুযোগ পেলে প্রতিটিই এক একটি পূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ৩০কোটি শুক্রকীটের মধ্যে ১টি শুক্রকীট দিয়ে যদি একজন মানুষের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে সৃষ্টির শুরুতে সে কত হীন, নগণ্য ও ক্ষুদ্র ছিল তা কল্পনাও করা যাবে না। সত্যিই তা চোখে দেখা বা উল্লেখ করার মতো কোনো উপাদান ছিল না। ঐ শুক্রকীটে না ছিল কোনো হাত-পা, চোখ, কান, নাক, মাথা, হাড্ডি, মাংস, চুল বা অন্য কোনো অঙ্গ। আল্লাহ তাআলাই এই নির্জীব শুক্রকীটে স্বীয় কুদরতে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থাপন করে মানুষকে সুন্দর আকৃতি প্রদান করেছেন।[১৩]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْسلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَهِيْنٍ

অর্থ: অত:পর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানি নির্যাস থেকে।[১৪]

আরবি শব্দ سللة (সুলালাহ) অর্থ তরল পদার্থের নির্যাস বা অবিভক্ত কোনো বস্তুর সর্বোত্তম অংশ। পুরুষের দেহে তৈরি কয়েক মিলিয়ন শুক্রাণু থেকে ডিম্বাণুতে প্রবেশকারী একটি মাত্র শুক্রাণুই নিষেকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আবশ্যক। কয়েক মিলিয়নের মধ্য থেকে এটি একটি মাত্র শুক্রাণুকীটকে পবিত্র কুরআনে 'সুলালাহ' বলে উল্লেখ করেছে। স্ত্রী কর্তৃক উৎপাদিত হাজার হাজার ডিম্বাণুর মধ্য হতে মাত্র একটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে থাকে। হাজার হাজার ডিম্বাণু থেকে কেবল একটি ডিম্বাণুকেও 'সুলালাহ' নামে কুরআন উল্লেখ করেছে। তরল পদার্থ থেকে সুষমভাবে বের করে আনার অর্থেও 'সুলালাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তরল পদার্থ দ্বারা জননকোষ ধারণকারী নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু সংক্রান্ত তরল পদার্থকে বোঝায়। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উভয়কে নিষিক্তকরণের প্রক্রিয়ায় সুষমভাবে তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে বের করে আনা হয়।

আরবি ভাষায় নুতফা শব্দটির অর্থ স্বল্প পরিমাণ মিলিত তরল পদার্থ। পুরুষের শুক্রাণু ও স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষেক প্রক্রিয়ায় মিলিত হয়ে জাইগোট (Zygote) নামক কোষে পরিণত হয়। নুতফা আমসাজ শব্দটি দ্বারা মূলত জাইগোটকেই বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআন কমপক্ষে এগারো বার নুতফা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষ নুতফাহ থেকে সৃষ্টি। নুতফাহ এর অর্থ হলো- নগণ্য পরিমাণ তরল বা এক ফোঁটা তরল, যা পেয়ালাশূন্য করার পর পড়ে থাকে। আলাক শব্দের অর্থ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে (Embryo)। মুদগাহ শব্দের অর্থ দাঁতে কামড় দিয়ে ফেলে দেয়া পিণ্ডের মতো কোনো পদার্থ। চুইংগামকে দাঁতের মাড়ি দিয়ে একবার কামড় দিলে তার ওপরে যে আকৃতির ছাপ হবে সেই আকৃতিই মুদগাহ।

১১. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
১২. আল-কুরআন, ৭৬: ১-২
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ কামরুল হাসান, *ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম*, ঢাকা: মিরপুর, মিডিয়া দাওয়াতী সেন্টার, জানুয়ারী ২০১৭, পৃ. ৩৬
১৪. আল-কুরআন, ৩২: ৮

এই অবস্থাকে বুঝানোর জন্য Embryology-তে somite শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে ইযামা শব্দের অর্থ অস্থি এবং লাহ্‌ম শব্দের অর্থ মাংসপেশি।[১৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে قَرَارٍ مَّكِيْنٍ বা দৃঢ়ভাবে অটল এমন বিশ্রামের স্থানে সুরক্ষিত রেখে অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে মানুষের পেছনের মাংসপেশী যে মেরুদণ্ডটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে সেই মেরুদণ্ডের দ্বারা জরায়ুর পশ্চাতভাগে উত্তমরূপে সংরক্ষিত। সুতরাং এতে বোঝা যায় ভ্রূণ সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি সুরক্ষিত বাসস্থান সংরক্ষিত রেখেছেন।

অল্প পরিমাণ তরল পদার্থকে আলাক্ব (عَلَقٍ) বলা হয়, যা আটকে থাকে। এটার আরেক অর্থ হলো জোঁক সদৃশ বস্তু। উভয় বর্ণনাই বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণীয়। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ দেয়ালের সাথে লেগে থাকে এবং এটাকে আবার জোঁকের আকৃতির মতো দেখায়। তাছাড়া এটি জোঁকের (রক্তচোষক) মতোই আচরণ করে। এটা মায়ের গর্ভফুলের মধ্য দিয়ে রক্ত সরবরাহ করে। عَلَقٍ (আলাক্ব) শব্দের অন্য অর্থ হচ্ছে 'রক্তপিণ্ড'। গর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে রক্তপিণ্ডের স্তরে থাকাবস্থায় রক্তপিণ্ডটি তরল পদার্থ বেষ্টিত বন্ধ থলির মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং একই সময়ে রক্তের আকৃতির পাশাপাশি জোঁকের আকৃতিও ধারণ করে।

উল্লেখ্য, আয়াতে 'নুৎফা' থেকে 'আলাকা' স্তর পর্যন্ত প্রতি স্তরের শুরুতে ثُمَّ বা অত:পর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে এই সংযোগকারী অব্যয় প্রতি স্তরের মধ্যে কিছুটা সময় লেগেছে বুঝায়। মুদগাহর পদ فَ অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এতেও অত:পর বুঝায়। তবে এতে কম সময়ের ব্যবধান বুঝায়। তাছাড়া এই সব স্ত্রই একটার পর একটা শুরু হলেও বিভিন্ন স্তর তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও সময় পর্যন্ত চালু থাকে। মুদগাহ স্তর গর্ভের প্রায় ৪০তম দিবস পর্যন্ত চলতে থাকে।[১৬] হাড়ের পরের স্তর হচ্ছে মাংসপেশীর সৃষ্টি। গর্ভের ৭ম সপ্তাহ থেকে হাড় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করে এবং ক্রমে শরীরের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন আকারের হাড় সৃষ্টি হতে থাকে। অত:পর ভ্রূণ একটি মানব শিশুর আকার ধারণ করে। ৭ম ও ৮ম সপ্তাহে মাংসপেশী হাড়গুলোকে ঢেকে দেয় বা হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যদিও হাড় ও মাংসপেশী প্রায় একই সময়ে তৈরি হতে থাকে। তবে মাংসপেশী হাড় তৈরি হওয়ার পরই সংযুক্ত হয়। তাই আয়াতে হাড়ের পর মাংসপেশীর সংযোগ বলা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। আর হাড়কে মাংসপেশী আবৃত করছে বলাও খুব যুক্তিপূর্ণ উক্তি। ৮ম সপ্তাহের পর শরীর ও হাত-পায়ের এবং মাথার মাংসপেশীগুলো সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে এবং তখন নবসৃষ্ট শিশু নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।[১৭]

১৬৭৭ সালে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী হাম ও লিউন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শুক্রকোষ পর্যবেক্ষণ করেন। তারা ভেবেছিলেন যে অতি ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ জরায়ু কোষে থাকে, যা জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে নবজাতকরূপে গড়ে ওঠার জন্য। এটি The perforation Theory বা ছিদ্রকরণ তত্ত্ব নামে পরিচিত ছিল। যখন বিজ্ঞানীরা আকিষ্কার করলেন যে শুক্রাণুর চেয়ে ডিম্বাণু বড়, তখন ডিগ্রাফের মতো বিজ্ঞানীসহ অন্যান্য বিজ্ঞানী চিন্তা করলেন ডিম্বাণুর মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতির ভ্রূণ বিকশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী মাওপারটুইস 'মাতা-পিতার দ্বৈত উত্তরাধিার তত্ত্ব' ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।[১৮]

অধ্যাপক ড. কেইথ মূও (Dr. Keith Moore) একটি প্লাস্টার মিল নিয়ে এটিকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের মতো তৈরি করে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মুদগায় পরিণত করতে চেষ্টা করেন। তিনি এ প্রক্রিয়াকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের চিত্রের সাথে তুলনা করেন। তিনি দেখেন চিবানো প্লাস্টার সিলে দাঁতের দাগsomites-এর মতো সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এটাই হলো মেরুদণ্ডের প্রাথমিক গঠন। অত:পর মুদগাহ পরিণত হয় ইযাম বা হাড়ে। হাড়গুলোকে এক খণ্ড মাংস বা মাংসপেশি লাহম পরানো হয়। এরপর আল্লাহ একে তৈরি করেন ভিন্ন সৃষ্টিতে।

---

১৫. ডা. সাইফুল ইসলাম, "ইসলাম ও মেডিকেল সায়েন্স আসমানী কিতাবের বিস্ময়কর বর্ণনা ও বিজ্ঞানের অকুণ্ঠ সমর্থন", *সীরাতুন্নবী সংখ্যা*, ছাত্র সংবাদ, মার্চ ২০০৮, পৃ. ৭৮

১৬. K.L. Moore and A.M.A. Azzindani, *The Developing Human with Islamic Additions*, Jeddah: Dur al-Qiblah for Islam Literatures. 1982 3rd end. p. 73

১৭. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

১৮. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলোডেলফিয়ার থমসন জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দানিয়েল ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক ও জীবদেহের গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান (Anatomy) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মার্শাল জনসন বলেন- আল-কুরআনে ভ্রূণ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাত্ত্বিক পর্যায়গুলো সমকালীন কোনো মত হতে পারে না। সম্ভবত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে কুরআন ১৪০০ বছর আগে অবতীর্ণ হয়ে, আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে নবী কারীম (সা.)-এর বহু শতাব্দী পর। তখন তিনি হাসেন এবং স্বীকার করেন যে প্রথম আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোনো ক্ষুদ্র জিনিসকে ১০ গুণের বেশি বড় করে দেখাতে পারতো না এবং পরিষ্কার ছবিও দেখাতে পারতো না। তারপর তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ (সা.) যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন তাঁর ওপর ঐশী বাণী নাযিল হওয়ার বিষয়ে কোনো বিরোধ দেখি না।'[১৯]

ড. কেইথ মূরের মতে, বিশ্বজুড়ে গৃহীত আধুনিক কালের ভ্রূণ বিষয়ক উন্নয়ন স্তর সহজে বোধগম্য নয়। কারণ এতে স্তরগুলোকে সংখ্যাগতভাবে চিহ্নিতকরা হয়েছে। যেমন ১ম স্তর, ২য় স্তর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে স্তরগুলো ভ্রূণ অতিক্রম করে তার শ্রেণিবিভাগি কুরআনের বর্ণনানুসারে পার্থক্যসূচক এবং সহজেই এগুলোর আকার-প্রকৃতি চিহ্নিতকরা যায়। এগুলো জন্মপূর্ব বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তিশীল ও বোধগম্য এবং বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ও সাবলীল বর্ণনার ধারণাকারী। নিচের আয়াতেও মানুষের ভ্রূণ বিকাশে স্তরগুলো বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِى يُّمْنٰى – ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى– فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى–

অর্থ: সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না। এরপর ছিল রক্তপিণ্ড, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অত:পর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।[২০]

**শুক্রকীট ও ডিম্ব-এর অবস্থান স্থল**

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ– خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍيَّخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

অর্থ: সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত কোন বস্তু হতে সে সৃজিত হয়েছে। তাকে এক প্রক্ষিপ্ত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষের অস্থিপঞ্জরের মধ্যস্থল থেকে নির্গত হয়।[২১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বের অবস্থান স্থল খুব সূক্ষ্মভাবে বলে দিয়েছেন। এখানে নুৎফার বদলে প্রক্ষিপ্ত পানির কথা উল্লেখ করেছেন যা সৃষ্ট হয়ে পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষপঞ্জরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে নির্গত হয়। আসলে মানুষ প্রথমে শুক্রকীট ও ডিম্বের সংযোগে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের আকারে সৃষ্টি হয়। পুরুষের বীর্যের সঙ্গে যে শুক্রকীট সজোরে প্রক্ষিপ্ত হয় তা রক্ত ও পেটের ভেতরে তরল পদার্থে ভাসমান থাকে। সুতরাং শুক্রকীট ও ডিম্ব দুইই প্রক্ষিপ্ত তরল পদার্থে থাকে, যা এই আয়াতে বলা হয়েছে প্রক্ষিপ্ত পানি।

আল-কুরআনের বর্ণনা মতে, এই দু'টি তরল পদার্থ পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষপঞ্জরের মধ্যবর্তীস্থল অর্থাৎ পেটের ভেতর থেকে নির্গত হয়। শারীরবিদ্যা থেকে জানা যায়, পুরুষের শুক্র অণ্ডকোষের ভেতর তৈরি হয়। পূর্ণত্ব প্রাপ্ত শুক্রকীটগুলো তখন দু'টি নল দিয়ে পেটের ভেতর মূত্রথলির সঙ্গে নালির নিচে প্রস্টেট গ্রন্থির পেছনে অবস্থিত দু'টি থলিতে (seminal) জমা হয়। এই শুক্রথলির সঙ্গে নালির মাধ্যমে মূত্রনালির সরাসরি যোগ রয়েছে। আর নারীর ওভারি দু'টিও তার তলপেটেই অবস্থিত। যখন শুক্র নির্গত হয়, অণ্ডকোষ থেকে নয়, বরং তলপেটের শুক্রথলি থেকে নির্গত হয়। ডিম্বও পরিস্ফুট হয়ে তলপেটেই পড়ে।

অণ্ডকোষ ও ওভারিদ্বয় পেটের ভেতরে আরো উপরে মেরুদণ্ডের ১০নং হাড়ের ($10^{th}$ thoracic vertebra) দু'পাশে প্রথমে তৈরি হয়। এদের স্নায়ু, রক্তের ধমনি ও শিরা পেটের ভেতরকার সেই উপরের এলাকা থেকেই সংযুক্ত হয় এবং এগুলো যখন তলপেটে নেমে আসে, তার সঙ্গে স্নায়ু ও ধমনিও লম্বা হয়ে ওভারির ক্ষেত্রে নিচে তলপেটে নেমে আসে। সুতরাং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শুক্রকীট ও ডিম্ব দুইই পেটের ভেতরে প্রক্ষিপ্ত হয়এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য।[২২]

---

১৯. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
২০. আল-কুরআন, ৭৫: ৩৭-৩৯
২১. আল-কুরআন, ৮৬: ৫-৭
২২. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪

সুতরাং জন্মপূর্ব অবস্থায় বিকাশের স্তরে পুরুষ ও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়গুলো যেমন পুরুষের অণ্ডকোষ ও নারীর ডিম্বাশয়, কিডনীর কাছে মেরুদণ্ড স্তম্ভ এবং ১১শ ও ১২শ বক্ষ পাঁজরের হাড়ের মাঝে বিকশিত হওয়া শুরু করে। তারপর সেগুলো নিচে নেমে আসে। স্ত্রীর ডিম্বাশয় মেরুদণ্ডের নিচে ও নিতম্বের মধ্যেকার অস্থিকাঠামোর মধ্যে এসে থেমে যায়। কিন্তু জন্মের পূর্ব পর্যন্ত পুরুষের অণ্ডকোষ উরুর গোড়ার নালী দিয়ে অণ্ডকোষের থলিতে নেমে আসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এমনকি বয়:প্রাপ্ত অবস্থায় জননেন্দ্রিয় নিচে নেমে আসার পরেও মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মাঝে অবস্থিত উদর সংক্রান্ত বড় ধমনি থেকে এ অঙ্গগুলো উদ্দীপনা ও রক্ত সরবরাহ করে। এমনকি রস জাতীয় পদার্থ বহনকারী নালী এবং শিরাগুলো একই এলাকায় গিয়ে মিলিত হয়।[২৩]

মানব সন্তান মায়ের উদরে তিনটি অন্ধকার বা পর্দার আড়ালে ভ্রূণ সংরক্ষরণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন-

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُوْمٰتٍ ثَلٰثٍ– ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَه الْمُلْكُ– لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ–

অর্থ: তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে।[২৪]
আয়াতে বর্ণিত ত্রিবিধ অন্ধকার বলতে তিনটি স্তরের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে-
(ক) মায়ের গর্ভের সম্মুখের প্রাচীর
(খ) জরায়ুর প্রাচীর
(গ) সেই ঝিল্লি যা শিশুকে ঢেকে রাখে।[২৫]

**ভ্রূণ আংশিক গঠিত এবং আংশিক অগঠিত**

মুদগাহ অবস্থায় যদি ভ্রূণকে ছেদন এবং এর অভ্যন্তরীণ কোনো অঙ্গকে কর্তন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এর অধিকাংশই গঠিত, কিন্তু অন্যান্য কিছু অংশ পুরোপুরি গঠিত হয়নি।অধ্যাপক জনসনের মতে, ভ্রূণকে যদি আমরা একটি পূর্ণ সৃষ্টি বর্ণনা করি, তাহলে আমরা ঐ অংশটিকে বর্ণনা করছি- যা ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর যদি আমরা একে অপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে যে অংশ এখনও পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়নি ঐ অংশের বর্ণনা করছি। সুতরাং ভ্রূণ কি পূর্ণ সৃষ্টি না অপূর্ণ সৃষ্টি? এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা অপেক্ষা ভ্রূণের উৎপত্তির স্তর সম্পর্কে আর কোনো উত্তম বর্ণনা নেই। যেমন পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতে 'আংশিক গঠিত হয়েছে' এবং 'আংশিক গঠিত হয়নি' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে – خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ–

অর্থ: আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য।[২৬]
বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, বিকাশের প্রাথমিক স্তরে কিছু পার্থক্যমূলক কোষ এবং কিছু অপদার্থমূলক কোষ থাকে। অর্থাৎ কিছু অঙ্গ গঠিত এবং কিছু অঙ্গ এখনো গঠিত হয়নি।[২৭]

**লিঙ্গ নির্ধারণ**

আমাদের সমাজের কোনো মহিলা কন্যা সন্তান প্রসব করলে অনেকে তাকে অপায়া বা বক্র দৃষ্টিতে দেখে এবং তাকে অলক্ষী মনে করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণায় নারীর ডিম্বাণু প্রকৃতি নয় বরং পুরুষের শুক্রকীটের প্রকৃতিই লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী। নারীর ডিম্বানুর ২৩ জোড়া ক্রোমোজমই নেগেটিভ কিন্তু পুরুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজমের মধ্যে কিছু নেগেটিভ, কিছু পজেটিভ। তাই গর্ভের সন্তান ছেলে শিশু না হয়ে মেয়ে শিশু হওয়ার জন্য একমাত্র পিতাই দায়ী। এ কারণেই কুরআন ও বিজ্ঞান উভয়ই পুরুষের শুক্রকীটকেই একমাত্র লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী হিসেবে উল্লেখ করে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় শুক্রাণুর প্রকৃতির দ্বারা ডিম্বাণুর প্রকৃতির দ্বারা নয়। একটি শিশু নারী বা নর তা নির্ভর করে ২৩তম ক্রোমোজমের (Chromosomes) XX না YY তার ওপর।

---

২৩. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২৪. আল-কুরআন, ৩৯: ৬
২৫. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
২৬. আল-কুরআন, ২২: ৬
২৭. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

প্রধানত লিঙ্গ নির্ধারণ করার কাজটি হয়ে থাকে নিষিক্তকরণের সময় এবং এটা নির্ভর করে ডিম্বাণুকে শুক্রাণুর কোনো প্রকার লিঙ্গ ক্রোমজোম নিষিক্ত করে তার ওপর। এটা যদি X বহনকারী শুক্রাণু হয় যা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, তাহলে ভ্রূণ হবে স্ত্রীলিঙ্গ এবং এটা যদি Y বহনকারী শুক্রাণু হয় তাহলে ভ্রূণ হবে পুংলিঙ্গ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَّ الْاُنْثٰى مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى–

অর্থ: তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী একবিন্দু থেকে যখন স্খলিত করা হয়।[২৮] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى– ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى– فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى–

অর্থ: সে কি স্খলিত এক ফোঁটা শুক্রকীট ছিল না? অত:পর সে পরিণত হয় এমন কিছুতে যা লেগে থাকে, এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করলেন এবং যথাযর্থরূপে সুবিন্যস্ত করেন। তারপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।[২৯]

উক্ত আয়াতে পুনরায় نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ শব্দ দ্বারা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে পুরুষের নিকট থেকে আসা খুবই অল্প পরিমাণ শুক্রকীটকে বুঝানো হয়েছে।[৩০]

**শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অনুভূতি**

বিকাশমান মানব ভ্রূণের সর্বপ্রথম শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব ঘটে। ভ্রূণ ২৮তম সপ্তাহের পর হতে শব্দ শুনতে পায়। পরবর্তীতে দর্শন ইন্দ্রিয় বিকাশ লাভ করে এবং ২৮তম সপ্তাহ পরে রেটিনা বা অক্ষিপট আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়। ভ্রূণে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্পর্কিত কুরআনের নিম্নের আয়াতটি লক্ষ্য করা যায় – وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ–

অর্থ: আর তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তর প্রদান করেন।[৩১] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَ هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ–

অর্থ: আর তিনিই তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।[৩২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا–

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।[৩৩]

এসকল আয়াতে দৃষ্টিশক্তিরপূর্বে শ্রবণশক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে পবিত্র কুরআনের বর্ণনার সাথে আধুনিক ভ্রূণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩৪] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ اللهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ–

অর্থ: এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন, এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা করার জন্য হৃদয় দিয়েছেন, এজন্য যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[৩৫]

কান শ্রবণকার্য সম্পাদন করে। জন্মের সময় যদিও বাহ্যত দু'টি কান থাকে যার প্রত্যেকটির তিনটি অংশ রয়েছে। যথা: বাইরের অংশ, মধ্যম ও অভ্যন্তরীণ অংশ। বাইরের অংশ বা কান মাতৃগর্ভেই তৈরি হয়, যা গর্ভের ষষ্ঠ সপ্তাহে শুরু হয় এবং ৩২তম সপ্তাহে তার নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত হয়। মধ্যম অংশ গর্ভধারণের ২৪-২৮ দিনের মধ্যে শুরু হয় এবং গর্ভের শেষ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়। অভ্যন্তরীণ কানের সৃষ্টি গর্ভের ৪র্থ সপ্তাহে শুরু হয় এবং ২০তম সপ্তাহে শেষ হয়।

---

২৮. আল-কুরআন, ৫৩: ৪৫-৪৬
২৯. আল-কুরআন, ৭৫: ৩৭-৩৯
৩০. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৩১. আল-কুরআন, ৩২: ৯
৩২. আল-কুরআন, ২৩: ৭৮
৩৩. আল-কুরআন, ৭৬: ২
৩৪. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৩৫. আল-কুরআন, ১৬: ৭৮

কিন্তু এ সময় শিশু সব শব্দ খুব স্পষ্ট শুনতে পায় না। কানের পেছনের উঁচু অংশকে mastoid বলে। তাতে বাতাস ধরে রাখার মতো অনেকগুলো গর্তের সৃষ্টি হয় যা আওয়াজকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। এমনিভাবে চক্ষু, হৃৎপিণ্ড ও রক্তের বিষয়েও এ ধরনের ব্যাপক ব্যাখ্যা রয়েছে।[৩৬]

**আঙ্গুলের ছাপ**

অবিশ্বাসীরা মনে করে মানুষ মরে গেলে হাড়গুলো মাটির মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং মুসলমানগণ যে বলে এসকল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে শেষ বিচারের দিন পুনরুত্থান করা এবং প্রতিটি মানুষকে পৃথক পৃথকভাবেচিহ্নকরা সম্ভব হবে না। অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার জন্য এটি যে মোটেও কঠিন নয় পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কোনো হাড়গুলোকে জমা করে নয় বরং মানুষের কেবল আঙ্গুলের ছাপেরমাধ্যমেও যথার্থভাবে পুনরায় সৃষ্টি করতে যে সক্ষম তাও পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ– بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ–

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে আমি কখনো হাড়সমূহকে একত্রিত করবো না? হ্যাঁ, আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম।[৩৭]

ব্যক্তি পরিচয় নির্ধারণের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন কেন আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে কথা বলেছে স্বাভাবিকভাবেই তা প্রশ্ন জাগে। ১৮৮০সালে স্যার ফ্রান্সিস গোল্ট-এর গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরিচয় নির্ধারণে আঙ্গুলের ছাপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বিশ্বে এমন দু'জন ব্যক্তিও নেই যাদেও আঙ্গুলের ছাপ সম্পূর্ণ একই রকম। এ কারণে বিশ্বব্যাপী পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের শনাক্ত করতে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে থাকে।[৩৮]

**ত্বকে ব্যথা অনুভবকারী গ্রন্থির উপস্থিতি**

একদা ধারণা করা হতো যে অনুভূতি ও ব্যথার উপলব্ধি মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে ত্বকে ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। ঐ উপাদান ছাড়া ব্যক্তি ব্যথা অনুভব করতে পারে না। তাই আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষত সৃষ্টি হলে ডাক্তার যখন তার চিকিৎসা করেন তখন একটি সরু পিন দ্বারা পোড়ার মাত্রা পরীক্ষা করেন। রোগী ব্যথা অনুভব করলে ডাক্তার খুশি হন। কেননা এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে পোড়ার ক্ষতটি অগভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ অক্ষত রয়েছে। পক্ষান্তরে ব্যথা অনুভব না করলে বোঝা যায় যে পোড়ার ক্ষতটি গভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী কোষসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতে ব্যথা উপলব্ধিকারী গ্রন্থি বা কোষের অস্তিত্বের স্থাপনই ইঙ্গিত বহন করে-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ– اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا–

অর্থ: যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর যখনই তাদের গায়ের চামড়া পুড়ে যাবে তখন আমি পাল্টে দেবো নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা (শাস্তির পর) শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।[৩৯]

থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাগাতাত তেজাসেন ব্যথা উপলব্ধিকারী গ্রন্থি বা কোষের ওপর দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। প্রথমদিকে তিনি বিশ্বাস করতেন না যে এ বৈজ্ঞানিক সত্যটি পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি কুরআনের এ বিশেষ আয়াতটির অনুবাদ পরীক্ষা করেন। অধ্যাপক তেজাসেন কুরআনের এ আয়াতটির বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতায় এতোটা অভিভূত হয়ে পড়েন যে, রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'কুরআন ও সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক দিকনির্দেশনাবলি' বিষয়ের ওপর ৮ম সৌদি মেডিকেল কনফারেন্সে প্রকাশে ঘোষণা করেন- لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

---

৩৬. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, পৃ. ৩২০-৩২১

৩৭. আল-কুরআন, ৭৫: ৩-৪

৩৮. মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৩৯. আল-কুরআন, ৪: ৫৬

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।[৪০]

সবশেষে বলা যায়, মানব সৃষ্টির মাতৃগর্ভ নামক এই স্থানটি এক ধরনের তরল পদার্থে পরিপূর্ণ এক আবদ্ধ প্রায় কক্ষ বিশেষ। এটি এক অভিনব কলাকৌশলও বটে- যার মধ্যে আল্লাহর সীমাহীন করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা এতে রয়েছে তরল পদার্থে নিমজ্জিত ভ্রূণকে বহিঃস্থ আঘাত এবং ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই আদর্শ পরিবেশেই ভ্রূণ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় এবং গর্ভধারণকৃত ক্ষুদ্র ডিম্বাণু সুনির্দিষ্ট আকৃতিসহ বড় হয়ে একটি পূর্ণ শিশুতে পরিণত হয়। মাতৃগর্ভে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াই একটি শিশুর বেঁচে থাকা আরেক বিস্ময়। ৪ থেকে ৮ পাউন্ড ওযনবিশিষ্ট একটি শিশুর এক সংকীর্ণ পথে নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখাও আল্লাহ তা'আলার করুণাপূর্ণ কৌশলসমূহের অনন্য দৃষ্টান্ত।

৪০ . মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুস্থ থাকার নিমিত্ত আল-কুরআনে পানাহার সংক্রান্ত মৌলিক নির্দেশনা

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত গ্রন্থ। এতে নিজস্ব রচনাশৈলী ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন উপকারার্থে সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে। এসব কিছুর মধ্যে মানব জাতি সুস্থ থাকার জন্য এমনকিছু মৌলিক বিষয়াবলীও বর্ণিত হয়েছে, যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে অনেক বড় গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন হবে। তবে মানব জাতি শারীরিকভাবে সুস্থতা লাভের জন্য যে কয়টি মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো- হালাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং হারাম খাদ্য ও পানীয় বর্জন করা।

জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেক জীবকেই খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। মানব জীবনেও খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সব আহার্য সামগ্রী গ্রহণ করলে জীবদেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন ও ক্ষয়পূরণ হয়, তাকেই খাদ্য বলে। খাবারের ওপর ভিত্তি করেই মানব জীবন টিকে আছে এবং মানব দেহে এর প্রভাব সরাসরি পরিলক্ষিত হয়। কোনো ব্যক্তি যদি এক-দু'দিন খাবার গ্রহণ না করে, তাহলে নিশ্চিত সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার জন্যও ভালো খাবার দরকার হয়। কারণ মানুষের শরীর সুস্থ থাকার জন্য যে সকল ভিটামিন প্রয়োজন, তা বিভিন্ন প্রকার খাবারের মধ্যেই রয়েছে।তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল কিছু যেন খাওয়াকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে। যে কোনো কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করতে শরীরে ক্যালরী তথা শক্তির প্রয়োজন হয়, যা খাবার থেকেই সংগৃহীত হয়। পবিত্র কুরআন-হাদীসেও পানাহারের বিষয়টি বিভিন্নভাবে খুব গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে– كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلٰلاً طَيِّبًا

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও।[৪১] হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: অন্যান্য ফরয কাজ আদায়ের পাশাপাশি হালাল রিযিক অনুসন্ধান করাও একটি ফরয।[৪২]

সুতরাং হালাল খাবার গ্রহণ এবং হারাম খাবার বর্জন করা ইসলামের অন্যতম একটি নির্দেশ। তাই একজন মুসলমানের জন্য হারাম খাবার বর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় বিধান এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ধাপ হলো হালাল রুজি রোজগার করার পাশাপাশি তাকে অবশ্যই পবিত্র ও হালাল খাদ্য খেতে হবে। পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং নবী-রাসূলগণ সর্বদা হালাল খাদ্য গ্রহণ এবং হারাম খাদ্য পরিত্যাগের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلٰلاً طَيِّبًا، وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ–

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।[৪৩]

সুতরাং হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা এবং হারাম খাদ্য বর্জন করা মুসলিমের জন্য অন্যতম ফরয ইবাদত। শুধু তাই নয়, এর ওপর নির্ভর করে তার অন্যান্য ফরয ও নফল ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া বা না হওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا، اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ–

অর্থ: হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু হতে আহার করুন এবং সৎকর্ম করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।[৪৪] এ আয়াত থেকেও বোঝা যায়, পবিত্র বস্তু হতে আহার করা সৎকর্ম করার পূর্ব শর্ত।

---

৪১. আল-কুরআন, ৫: ৮৮

৪২. ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, (অনুবাদ: মাওলানা এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার), *মিশকাত শরীফ*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৫, অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়, অনুচ্ছেদ: উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা, খ. ৪, পৃ. ২৩০, হাদীস নং- ২৬৬১

৪৩. আল-কুরআন, ৫: ৮৮

৪৪. আল-কুরআন, ৪০: ৫১

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা যেসকল খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী এবং হালাল ভোগ্যবস্তু থেকে মানুষদেরকে উপকার গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন, তা নিজ থেকে হারাম করা যাবে না। কারণ সেগুলোকে পরিত্যাগ করাও তাঁর না শুকরিয়ার শামিল। ইসলাম মানব স্বভাবসিদ্ধ একটি ধর্ম হওয়ায় এসকল পবিত্র জিনিসগুলোকে ত্যাগ করা যেমন মানব স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তেমনি নিজ থেকে কোনো হালাল বিষয়কে হারাম মনে করা এবং কোনো হারাম বিষয়কে হালাল মনে করাও ঐশী সীমা লঙ্ঘন। তাই হালালকে হারাম করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি হারামকে হালাল করাও জায়েয নয়। এইসব বিধান আল্লাহর হাতে, মানুষের হাতে নয়। হালাল বস্তু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা যেমন ঠিক নয়, সেই সাথে হালাল বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কিংবা অপচয় করাটাও উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوْا، اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ–

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৪৫]

হাদীসে এসেছে-হযরত আয়িশা (রা.) বলেন নবী কারীম (সা.) যখন যয়নব বিনত জাহাশ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন, তখন তিনি সেখানে মধুর শরবত পান করতেন। এরপর আমি এবং সাওদা (রা.) এরূপ পরামর্শ করি, আমাদের মধ্যে যার কাছেই নবী কারীম (সা.) আসবেন, সে যেন বলি: আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের (এক ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত ঘাস, যে ঘাস থেকে মধুমক্ষিকা মধু সংগ্রহ করলে তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়) দুর্গন্ধ অনুভব করছি। এরপর নবী কারীম (সা.) তাঁদের কারো কাছে উপস্থিত হলেই তিনি এরূপ উক্তি করেন। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: আমি তো যয়নব বিনত জাহাশের ঘরে মধুর শরবত পান করেছি। এখন হতে আমি আর তা পান করবো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়–لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ–

অর্থ: হে নবী! আপনি কেন হারাম করলেন তা, যা হালাল করেছেন আল্লাহ আপনার জন্য।[৪৬]

সাধারণত আমরা যেসব খাবার গ্রহণ করে থাকি তা দুই প্রকার। একটি পশু-পাখি এবং অপরটি উদ্ভিদ ও শাক-সবজি জাতীয়।পশু-পাখি খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিদর্শন ও বিধি-বিধান লক্ষ্য করলে হালাল-হারাম নির্ণয় করা সহজ হয়। মানুষের জন্য দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম। যেমন- বাঘ, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, হাতি, কুকুর, শিয়াল, শূকর, বিড়াল, কুমির, কচ্ছপ, সজারু, বানর, ইত্যাদি। পাঞ্জাধারী হিংস্র পাখি খাওয়াও হারাম। যেমন- ঈগল, বাজ, শ্যেন, পেঁচা ইত্যাদি।[৪৭] এ বিষয়ে হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

নোংরা ও নাপাক কিছু খাওয়াও হারাম। যেমন: মৃত জন্তু, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, প্রবাহিত রক্ত  এবং যেসব খাবারে কোনো প্রকার উপকার নেই, যেমন: বিষ, মদ, খড়কুটা, মাদকদ্রব্য, তামাক ও অন্যান্য নেশজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি। আর যেসব প্রাণী হত্যা করতে শরীয়তে নির্দেশ দিয়েছে বা যেসব প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছে তা খাওয়াও হারাম। যেমন: ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি, বিচ্ছু, কাক, চিল ইত্যাদি। কুরআন-হাদীসে এগুলো খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এছাড়া হুদহুদ, দোয়েল, ব্যাঙ, পিঁপড়া ও মৌমাছি ইত্যাদি। আল্লাহর নাম নেয়া ছাড়া জবাইকৃত হালাল পশু-পাখিও খাওয়া হারাম। হালাল প্রাণী জবাই শুদ্ধ না হলে জবাইকৃত সে প্রাণীও হারাম। আবার জীবিত প্রাণী থেকে পৃথক করা গোশতও মৃত প্রাণীর মতো হারাম। ইসলামী শরী'আতে জবাই করার কিছু নিয়ম-নীতি ও পূর্ব শর্ত রয়েছে। সেগুলো পূর্ণ না হলে জবাইকৃত হালাল জন্তুও হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-তাদের জন্য তিনি পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।[৪৮]

নাপাক বস্তু থেকে সৃষ্ট পোকা-মাকড় এবং যার শরীরে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোও নাপাক। যেমন: তেলাপোকা ইত্যাদি। সব ধরনের মৃত প্রাণী এবং প্রবাহিত রক্ত হারাম। তবে দুই ধরনের মৃত প্রাণী ও রক্ত হালাল। রাসূলুল্লাহ (সা.)

৪৫. আল-কুরআন, ৫: ৮৭

৪৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মধুর শরবত পান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং- ৩৭১৪

৪৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,জুন ২০০৯ (অষ্টম সংস্করণ), অধ্যায়: ত্রয়োদশ, মু'আমালাত-লেনদেন, অনুচ্ছেদ: খাদ্য ও পানীয়, পৃ. ৬২৪

৪৮. আল-কুরআন, ৭: ১৫৭

ইরশাদ করেন: আমাদের জন্য দু'প্রকার মৃত প্রাণী ও দু'প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী হলো, মাছ ও পঙ্গপাল। আর রক্ত হলো, কলিজা ও প্লীহা।[৪৯]

**উদ্ভিদ জাতীয়**

খাদ্য ও পানীয়ের মূল প্রকৃতি হচ্ছে বৈধ ও হালাল হওয়া। সে সূত্রে বিভিন্ন উদ্ভিদ, ফল ও শস্য ইত্যাদি থেকে তৈরিকৃত জুস ও পানীয় হালাল। তবে যত ধরনের খাবার ও পানীয় নেশা তৈরি করে তা খাওয়া বা পান করা জায়েয নেই। যেমন: গাঁজা, আফিম, ইয়াবা, বিয়ার, শ্যাম্পেইন, হিরোইনসহ এ জাতীয় অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য। যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর তাও জায়েয নেই। যেমন: বিষ, সিগারেট এবং এ জাতীয় অন্যান্য খাবার ও পানীয়। এগুলোর ক্ষতি ও অপকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট। বাস্তবে আল্লাহ তাআলা যা খেতে ও পান করতে হারাম করেছেন, তা মানুষের উপকার ও কল্যাণার্থেই করেছেন। হয়তো অনেক সময় আমরা তা বুঝতে পারি না। ইসলাম যেসব খাবার গ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করেছে তা সবই পবিত্র, স্বাস্থ্যসম্মত ও উপকারী এবং যেসব খাবার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে তা সবই অপবিত্র, অবৈধ এবং স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী।

উল্লেখ্য, পানাহারের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধতার দু'টি প্রকার রয়েছে। এক প্রকার খাদ্য স্থায়ীভাবে অবৈধ। যেমন- শুকরের গোশত, মদ, প্রবাহিত রক্ত, মৃত জীবের গোশত ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের অবৈধ হলো খাদ্য উপার্জন সংক্রান্ত। যেমন- সুদ, জুয়া, ঘুষ, ডাকাতি, যুলুম, যৌতুক, অবৈধ মজুদদারি, অবৈধ ব্যবসা, চাঁদাবাজি, ওযনে-পরিমাপে কম দেয়া, ভেজাল মেশানো, প্রতারণা বা মিথ্যার মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করা, চাকুরিতে চুক্তিমতো দায়িত্ব পালন না করে বেতন নেয়া, সরকারের বা জনগণের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করা ইত্যাদি। কুরআন-হাদীসে এ প্রকারের অবৈধ খাদ্য কোনো কারণে বা প্রয়োজনে বৈধ হবে বলে বলা হয়নি এবং অবৈধভাবে উপার্জিত রিযিক সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে যেসকল দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে,মানব শরীরের জন্য এর ক্ষতিকর দিকগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো-

**মৃত জীব-জন্তুখাওয়া হারাম**

শরীয়তের সকল বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর। যেসব বস্তু অপবিত্র, নিকৃষ্ট এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর আল্লাহ তাআলা সেগুলোই মানুষের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এসকল দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হলো, মৃত জীব-জন্তু খাওয়া। মৃত জীব-জন্তু খাওয়া সকল নবীর শরীয়তেও হারাম ছিলো এবং ইসলামী শরীয়তেও তা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত জীব হারাম করেছেন।[৫০]

প্রাণীর দেহ পবিত্রকারী হলো আত্মা। দেহ থেকে আত্মাপৃথক হয়ে গেলে তখন দেহ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু বের করার মতো কিছু থাকে না। ফলে ঐ দূষিত বায়ু তার সমস্ত শরীরকে নষ্ট করে দেয় এবং দেহে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু প্রভাব বিস্তার করে। তাই মৃত প্রাণী খেতে অভ্যস্ত ব্যক্তির তার আকার-আকৃতি, স্বভাব-চরিত্রও এমন বিশ্রী হয়ে যায়, যেন তার স্বভাবটাই মনুষ্যত্ব থেকে বের হয়ে যায়। নিকৃষ্ট স্বভাব ও পাষাণ অন্তর তার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং মৃতের মাঝে এক ভয়ানক বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় যা মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

তাছাড়া স্থলভাগের সব প্রাণীই বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। যখন কোনো প্রাণীকে জবাই করা হয় তখন তার বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড রক্তের সাথে বের হয়ে যায়। কিন্তু যখন ওই প্রাণীকে শ্বাসরোধ করে মারা হয় বা তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তখন ওইসব প্রাণীর বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড ও রক্ত দেহের ভেতরেই মাংসের সাথে মিশে যায়। এসব রক্ত ভেতরে থাকার কারণে আদ্র হয়ে অনেক দ্রুত দূষিত হয় এবং এই দূষিত রক্ত সমস্ত গোশত নষ্ট করে ফেলে। তাছাড়া রক্ত থেকে যে পোকা সৃষ্টি হয়, তা দেহে মরে

৪৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: শিকার, অনুচ্ছেদ: মাছ ও টিড্ডি শিকার, খ. ৩, পৃ. ৫৭৬, হাদীস নং- ৩২১৮

৫০. আল-কুরআন, ২: ১৭৩

বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই মৃত জীব-জন্তুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ।

স্বভাবতই সুস্থ মানব প্রকৃতি মৃত জন্তুকে ঘৃণা করে। বিবেকবান মানুষ মৃত জন্তু খাওয়াকে মানুষের জন্য নিতান্তই অশোভন ও হীনকাজ বলে গণ্য করে। এ কারণেই সকল আসমানী কিতাবে মৃত জন্তু খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত জন্তু সম্পর্কে আশঙ্কা থাকে যে, সেটি কোনো রোগের কারণে, বিষক্রিয়া, টক্সিনঅথবা এনথ্রাক্সের মতো ভয়াবহ সংক্রামক রোগের জীবাণূতে আক্রান্ত হয়েও মারা যেতে পারে। এরূপ মৃত জন্তুও মাংস আহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়াই স্বাভাবিক।[৫১] এছাড়া মহান আল্লাহ মানুষের জন্য মৃত জীব-জন্তু হারাম ঘোষণা করে অন্যান্য পশু-পাখির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার ফলে অতিরিক্ত Co2 (কার্বন ডাই-অক্সাইড) রক্তে জমে ওঠে এবং এর দ্বারা ক্ষতিকর যৌগিক উপাদান (harmful compounds) গঠিত হয়। এছাড়া রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ না থাকায় মারাত্মক টক্সিন সৃষ্টি হয় এবং ব্যাকটেরিয়া বের হতে পারে না। সুতরাং গলা টিপে হত্যা করা পশু-পাখির গোশতে বিষক্রিয়া ও ব্যাকটেরিয়া থেকে যায়। যে গোশতে টক্সিন ও ব্যাকটেরিয়া থাকে তা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করাও যায় না, পচন ধরে। আর শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা পশুর শরীর থেকে পরবর্তী পর্যায়ে রক্তক্ষরণ করাও সম্ভব হয় না। অতএব এভাবে হত্যা করা প্রাণীর গোশত শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

**রক্ত পান করা হারাম**

আল্লাহ তাআলা হালাল ও হারামের বিধান জারি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জাতির কল্যাণ সাধন করা এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ বিধান পালনেই নিহিত রয়েছে মানুষের আত্মার প্রশান্তি, দেহের কল্যাণ এবং বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা। হালাল গ্রহণের ফলে আত্মা ও সমগ্র শরীর সুস্থ থাকে ও ভালো কাজ করতে সক্ষম হয়। আর হারাম গ্রহণের ফলে আত্মা ও সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ভাল কাজ করতে সক্ষম হয় না।

পবিত্র কুরআনে পানাহার বস্তুর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে রক্ত পান করাকেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ রক্ত হলো উচ্চশ্রেণির প্রাণী দেহের এক প্রকার কোষবহুল, বহু জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত সামান্য লবণাক্ত, আঠালো, ক্ষারধর্মী ও লালবর্ণের ঘন তরল পদার্থ যা হৃৎপিন্ড, ধমনী, শিরা ও কৈশিক জালিকার মধ্য দিয়েনিয়মিত প্রবাহিত হয়। এটা একধরনের তরল যোজক কলা এবং দেহের জ্বালানি স্বরূপ, যা প্রধানত দেহে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পরিবাহিত করে। ইরশাদ হচ্ছে–اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেসব জীব-জন্তু হারাম করেছেন, যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়।[৫২]

আল্লাহ তা'আলা রক্ত পান করাকে যে হারাম ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয় এতে মানব জীবনের উপকার ও হিকমত নিহিত রয়েছে। কেননা রক্ত শরীরের সকল জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ, ক্ষতিকর প্রভাব এবং রোগ বহনকারী। রক্তের তীব্রতা ও উষ্ণতার দ্বারাই এই ক্ষতিকর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবতসুস্থ মানব প্রকৃতিও মৃত জন্তুর মতো রক্ত পান করাকে ঘৃণা করে থাকে। রক্ত ভক্ষণ মানুষকে হিংস্র প্রাণীর স্বভাবের দিকে ধাবিত করে এবং স্বভাবে ক্রোধ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। জাহিলী যুগে তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে উট বা অন্য কোনো জন্তুকে আঘাত করা হতো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হওয়ার সময় আঘাতকারী ব্যক্তি তা পান করতো। এতে জন্তুটি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতো এবং দুর্বল হয়ে পড়তো।এসব কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রবহমান রক্ত হারাম করেছেন।

এছাড়া রক্তের মাঝে এমন বিষক্রিয়া থাকে, যা পান করলে মানুষ অল্প বয়সে বৃদ্ধ হয়ে যায়, প্যারালাইসস রোগ দেখা দেয় এবং হাত পায়ের জোড়া ঢিলা হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রক্ত পানকারীর নাড়ীতে পৌঁছে তার জীবাণুগুলো ইমোনিয়া সৃষ্টি করে। এতে যকৃৎ দুষণ এবং বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। প্রবাহিত

৫১. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৫২. আল-কুরআন, ২: ১৭৩

রক্তে বিষাক্ত বিপাকীয় পদার্থ, টক্সিন ও রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব থাকতে পারে।[৫৩]তাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হিকমতে মানুষের জন্য রক্ত পানকে হারাম আখ্যায়িত করেছেন।

**শূকরের গোশত ভক্ষণ করা হারাম**

পবিত্র কুরআনে যে সকল দ্রব্যকে সরাসরি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো শূকরের গোশত। ইসলামের বিধি মোতাবেক কোনো মুসলমান শুকরের গোশত খেতে পারে না। মুসলমানদের জন্য যা কিছু খারাপ, ক্ষতিকর এবং বিপদজনক তাই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর যা কিছু ভালো, উপকারী এবং কল্যাণকর তা সবই হালাল। বর্তমান শতাব্দী হলো বৈজ্ঞানিক যুগ এবং মানুষের জীবনযাত্রা বিজ্ঞানভিত্তিক, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এ কথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই প্রযোজ্য। খাদ্য-দ্রব্যের গুণাগুণও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করে এদের ভালো-মন্দের দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, শূকরের গোশত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পবিত্র কুরআনে এই ক্ষতিকর জন্তুটি খাওয়ার বিরুদ্ধে মানুষকে বার বার সতর্ক করা হয়েছে।যদিও কুরআন নাযিলের সময় এর ক্ষতিকর দিক মানুষের জানা ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেসব জীব-জন্তু হারাম করেছেন, যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়।[৫৪] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ، وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ–

অর্থ: তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত, যেসব জীব-জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যহেব করেছো। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ।[৫৫]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা জবাইকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অত:পর কেউ সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫৬]

قُلْ لاَّ اَجِدُ فِى مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لاَ عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

অর্থ: আপনি বলে দিন, যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাই না কোনো ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে ভক্ষণ করে। কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত, এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অত:পর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালঙ্ঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু।[৫৭]

পবিত্র কুরআনে শূকরের গোশত ব্যবহার কেন নিষেধ করা হয়েছে তা বহু শতাব্দী পর্যন্ত একটি রহস্য ছিল। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা যায়, শূকরের গোশত মানুষের শরীরের জন্য অত্যধিক ক্ষতিকর। কিছুদিন পূর্বেও মনে করা হতো শূকরের গোশতে Trichina Parasite (একপ্রকার পরজীবি জীবাণু)-ই মানুষের শরীরের জন্য একমাত্র বিপত্তি। বৈজ্ঞানিকরা বর্তমানে শূকরের গোশতের ওপর গবেষণা করে আরো অনেক ক্ষতিকর দিক আবিষ্কার করেছে। যেমন-

৫৩. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৫৪. আল-কুরআন, ২: ১৭৩
৫৫. আল-কুরআন, ৫: ৩
৫৬. আল-কুরআন, ১৬: ১১৫
৫৭. আল-কুরআন, ৬: ১৪৫

**(১)** শূকরের গোশতে Sutoxin নামে একটি স্বতন্ত্র প্রোটিন রয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের এলার্জি সৃষ্টি করে। যেমন, হাঁপানি, খোস পাঁচড়া ও একজিমা ইত্যাদি।

**(২)** শূকরের গোশতে প্রচুর পরিমাণে Muco polysaccharides (এক প্রকার শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ) রয়েছে। এগুলি সালফারে সমৃদ্ধ এবং গিঁটসমূহে ও শরীরের জোড়াগুলিতে ব্যথা সৃষ্টি করে।

**(৩)** শূকরের গোশত রক্তের প্রবাহে চর্বিজাতীয় পদার্থের অনুপাত বাড়িয়ে দেয়। প্রাণীর গোশতে দু'ধরনের চর্বি থাকে। একটি হলো বাহ্যিক যা গোশতকে ঢেকে রাখে। অপরটি হল অভ্যন্তরীণ, যা থাকে গোশতপেশীর তন্তুসমূহে। নিম্নে সাধারণ গোশতের আভ্যন্তরীণ পেশীতে চর্বিরপরিমাণ হলো- বাছুরের গোশত- ১০%, ভেড়া- ২০% মেষশাবক- ২৩% শূকরের গোশত- ৩৫%। রক্তে চর্বির উচ্চমাত্রা কতিপয় স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, বার্ধক্য, জ্বরাগ্রস্ততা, প্যারালাইসিস ও হৃদযন্ত্র সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রোগ। শূকরের গোশতের উচ্চমাত্রার চর্বি মানব স্বাস্থের জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক।

**(৪)** শূকরের গোশতের উচ্চমাত্রার চর্বির আরেকটি ক্ষতিকর দিক হল, তা ভিটামিন 'ই'র অতিরিক্ত ক্ষয়সাধন করে। ভিটামিন 'ই'র এই ক্ষয়সাধন বা ঘাটতি পরিণামে ভিটামিন 'এ'র ক্ষয় সাধন করে। এভাবে শূকরের গোশত শরীরের ভিটামিন 'ই' ও 'এ'র ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে শরীরবৃত্তীয় কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

**(৫)** শূকর নোংরা ও ঘৃণিত বস্তু ভোগ ও আহার করে থাকে। এজন্যে তার Lympatic system (লসিকা প্রণালী) সর্বদা সক্রিয় অবস্থায় থাকে। এটি albumens সহ বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণমূলক বস্তুতে পূর্ণ থাকে। শূকরের শরীরের এক অংশে albumens-এর উপস্থিতি শরীরের অন্য অংশে Immune response সৃষ্টি করে। শূকরের গোশত ভক্ষণের ফলে এভাবে বিভিন্ন প্রকার এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া ও মানব দেহে লসিকা প্রণালীতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

**(৬)** শূকরের গোশতের কারণে অন্য একটি প্রাণঘাতি ব্যধি জন্ম নেয়, যা সঞ্চারিত হয় 'Trichina' নামক জীবাণুর মাধ্যমে। যদিও পশ্চিমাদের সাম্প্রতিক উৎকর্ষের ফলে এই জীবাণু দূর করা যেতে পারে তথাপি ধারণা করা হয় পৃথিবীতে প্রায় ৩০ মিলিয়ন এই 'Trichina victims' রয়েছে।[৫৮]

**(৭)** এছাড়া ভূপৃষ্ঠে শুকর এমন এক অশ্লীল ও নির্লজ্জতম প্রাণী যে তার স্ত্রী সঙ্গীর সম্ভ্রমহানীর ব্যাপারে সজাগ নয় এবং এজন্য সে লড়াই করে না; বরং সে স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গে সংগম করার জন্য অন্যান্য পুরুষ-সঙ্গীদের ডেকে নেয়। এতে যেসব জাতি শূকরের গোশত ভক্ষণ করেতাদের সাথে যৌনসংক্রান্ত মানসিকতা প্রদর্শনে এক অদ্ভুত সাজুয্যতা লক্ষ্যকরা যায়। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য হলো শুকরের গোশত। খাদ্যভ্যাস যে আচরণে প্রকাশ পায় বিজ্ঞানের এ সূত্রের জীবন্ত নমুনা তাদের মাঝে প্রকাশ পায়। তাদের প্রিয় সংস্কৃতি ড্যান্স পার্টিগুলোতে নেচে নেচে উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে স্ত্রী বদল করে। অনেকেই আবার জীবন্ত নীল ছবির স্বাদ দেয়ার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে বন্ধু-বান্ধব ডেকে নেয়।এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের ওপর শূকরের গোশতে একটি বিশেষ নৈতিক নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে।

**(৮)** যে ঘরে শূকর বসবাস করে সে ঘরের বাসিন্দাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখিন হয়। কেননা এটা চলাচলের সময় বাহির থেকে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু নিয়ে আসে। এ ব্যাধিই পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কিন্তু গরু, মহিষ, ছাগল বা অন্যান্য পশু এদের রোগ মানুষের মাঝে তত বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ছড়ায় না।

**(৯)** বিভিন্ন প্রাণীর গোশতের মধ্যে শূকরের গোশতে সবচেয়ে বেশি চর্বিযুক্ত কোলেস্টেরল রয়েছে। মানুষের রক্তে কোলেস্টেরল এর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তনালী ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া শূকরের গোশতে থাকা 'ফ্যাটি এসিড' অন্য সকল খাদ্যে থাকা ফ্যাটি এসিড থেকে ভিন্নরকম ও ভিন্ন গঠনের। তাই অন্য যেকোনো খাদ্যের তুলনায় মানুষের শরীর খুব সহজে একে চুষে নেয়। এতে রক্তে কোলেস্টেরল এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

**(১০)** শূকরের গোশত ও চর্বি কোলন ক্যান্সার (বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার), রেক্টাল ক্যান্সার (মলদ্বারের ক্যান্সার), অণ্ডকোষের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ও ব্লাডক্যান্সার এর বিস্তার ঘটায়।[৫৯]

**(১১)** শূকরের গোশত খাওয়া চর্মরোগ ও পাকস্থলির ছিদ্র ইত্যাদি রোগের কারণ। শূকরের গোশত খাওয়ার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো, শূকরের গোশতে ফিতা কৃমির শূককীট থাকে, যাকে টিনিয়া সলিয়াম (Taenia solium) বলা

---

৫৮. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

৫৯. *https://bn.mtnews24.com/islam/* "৪টি কারণে ইসলামে শূকরের মাংস খাওয়া হারাম", ০১.১২.২০১৫ (থেকে উদ্ধৃত)

হয়। এ কৃমি ২-৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এ কৃমির ডিম্বগুলো যদি মস্তিষ্কে বৃদ্ধি পায় তাহলে পরবর্তীতে মানুষ পাগলামি ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর যদি হার্টে বৃদ্ধি পায় তাহলে মানুষ উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টএটাকে আক্রান্ত হতে পারে। শূকরের গোশতের মধ্যে আরো যেসব কৃমি থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে- ট্রিচিনিয়াসিস কৃমির শূককীট রান্না করলেও এগুলো মরে না। মানুষের শরীরে এ কৃমি বাড়ার ফলে মানুষ প্যারালাইসিস ও চামড়ায় ফুসকুড়িতে আক্রান্ত হতে পারে। শূকরের গোশত খেলে Rheumatology বা বাতরোগ হওয়ারও সম্ভাবনা।

**(১২)** শূকরের গোশত খাওয়ার ফলে ভিটামিন বি-১২ এর ঘাটতি ঘটায়। এতে মানুষের রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।
পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ১৪৫ আয়াতে শূকর হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে 'রিজসুন' (সীমাহীন অপবিত্র) এবং 'ফুসুক' (আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের সুস্থ বিবেক ও শরিয়ত কর্তৃক নিন্দনীয় যেকোনো জিনিসকে আরবিতে 'রিজসুন' বলা হয়। শূকরের গোশত হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে এটিই যথেষ্ট। এছাড়াও খাদ্য ও পানীয়জাতীয় বস্তু হালাল বা হারাম হওয়ার জন্য যে সাধারণ মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে এর আলোকেও শূকরের গোশত হারামের আওতায় পড়ে।
এছাড়া পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-তিনি (আল্লাহ) তাদের জন্য উত্তম জিনিস হালাল করেছেন আর খাবাইস (নিকৃষ্ট জিনিস) হারাম করেছেন।[৬০]

'খাবাইস' দ্বারা ওই সমস্ত জিনিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা মানুষের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক বা আর্থিক ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং যে জিনিসই মানুষের জন্য কোনো ক্ষতিকর ফল বয়ে আনে তাই খাবাইস-এর অন্তর্ভূক্ত হবে। শূকর পৃথিবীর নাপাক প্রাণীকুলের অন্তর্ভূক্ত একটা ঘৃণিত প্রাণী। এটা ময়লা আবর্জনায় মুখ লাগায়, নাপাকী খায়, নোংরা স্বভাব বিশিষ্ট। এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণ লজ্জা-শরম নেই, মেজাজ সাংঘাতিক উগ্র, আর রক্ত ক্ষতিকর জীবাণুর ভান্ডার। তাই কেবল পবিত্র কুরআনেই শূকরকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি, ইঞ্জিলেও তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- শুকর যদিও এর খুর দ্বিখন্ডিত এবং খুরযুক্ত পদ বিশিষ্ট, এমন কী চিবিয়ে খায় এবং যাবর কাটে না। তবু তা অপরিচ্ছন্ন (অপবিত্র)। শূকরের গোশত তুমি খাবে না এবং এগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শও করবে না, এগুলো তোমার জন্য অপবিত্র।[৬১]

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহের ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের নিকট শূকরের গোশত একটি খুবই জনপ্রিয় খাবার এবং তাদের দেখাদেখি বর্তমানে প্রাচ্য দেশগুলোও এর প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত বাস্তব একটা বিষয় যে, শূকরের গোশতভোজী জাতি এবং গোত্র উক্ত বেহায়া জন্তুর মতই নির্লজ্জ ও বেশরম। কারণ মাদী শূকর একটি মাত্র পুরুষ শূকরের সঙ্গমে গর্ভবতী হয় না; বরং তাদের গর্ভ ধারণের জন্য একটার পর একটা শূকরের সাথে বারবার সঙ্গমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক পশুও এমন নির্লজ্জ কাজ পছন্দ করে না।

সুতরাং শূকরের মতো এমন নিকৃষ্টতম জানোয়ার যার গোশত ভক্ষণে রূহানী এবং চারিত্রিক রোগ সৃষ্টি হয়, এর ধারে কাছে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।তাই মজবুত আকীদার মুসলমানগণের নিকট এটা এতটাই ঘৃণিত প্রাণী যে নামটি পর্যন্ত মুখে নেয়াকে তারা অপছন্দ করে থাকে।

**শরাব পান করা হারাম**

শরাব বা মাদক সভ্যতার চরম শত্রু। এটা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবনকে একেবারে শেষ করে দেয়। শান্তির পরিবারে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং সমাজে অনাচার ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। নেশা ও মাদক সভ্যতার চাকা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তাই কল্যাণের ধর্ম ইসলামে শরাব তথা মাদককে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। একমাত্র ইসলাম ধর্মইমানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পানাহারের জিনিসকে হালাল-হারামে বিভক্ত করে দিয়ে বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ করেছে।

শরাব পান বা নেশা মানব জাতির এমন ভয়াবহ শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান অমুসলিমরা নেশাযুক্ত দ্রব্যাদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মনে করে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশে মদকে তাদের জাতীয় পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে ফ্রান্সসহ আরো অনেক দেশের হোটেলগুলোতে পান করার পানির চেয়েও সস্তায় মদ সরবরাহ করা হয়। এমনকি অনেক

৬০. আল-কুরআন, ৭: ১৫৭
৬১. *বাইবেল পঞ্চম গ্রন্থ*, ডিউট্যারনমী, অধ্যায়, ১১, স্তবক, ৮

যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রও তাদের সৈনিকদের জন্য মদের বিশেষ ব্যবস্থা রাখে।খ্রিস্ট দেশসমূহে ধর্মীয় যে কোনো অনুষ্ঠানে এত অধিক হারে মদ পরিবেশন করা হয়, যেন মদের ঝর্ণা বয়ে যায়। এখনো "আশায়ে রাব্বানী" (হযরত ঈসা আ. হাওয়ারীদের সাথে শেষ যে খানা খেয়েছিলেন)-এর পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানে মদে ভিজানো রুটি ইবাদতকারী নারী-পুরুষ ও বাচ্চা-বৃদ্ধদের মাঝে বণ্টন করা হয়। তারা এ রুটিকে মসীহের গোস্তের সাথে এবং রুটিতে মিশানো মদকে মসীহের রক্তের সাথে সামঞ্জস্য আছে বলে মনে করে থাকে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশেই খ্রিস্টমাস (বড়দিন) এবং থার্টি ফাস্ট নাইটে জনসাধারণ ছাড়াও তাদের বড় বড় ধর্মীয় গুরুরাও অবাধে মদ পান করে এবং প্রবৃত্তি দমনের সকল সীমা পেরিয়ে তারা নিজেদেরকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায়, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আর এ সকল উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীরা যে সকল অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ করে থাকে, এর মোটামুটি চিত্র সব দেশের পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। বর্তমানে মদকে বিনোদনমূলক সংস্কৃতি মনে করে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রেও এই চিত্র পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মে আফিম, ভাং, চরস ইত্যাদি সেবন ধর্মীয় ক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত মনে করা হয়। বেদ গ্রন্থে মাদক বিশেষত ভাং-এর প্রশংসা করা হয়েছে।কিন্তু ইসলাম ধর্মে সকল মাদক যথা আফিম, ভাং, চরস, মদ, তামাক ইত্যাদিকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ গুলোর পরিমাণ বেশি হোক আর কম হোক হুকুমের দিক থেকে সবই সমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا–

অর্থ: (হে নবী!) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য (সাময়িক ফুর্তি উপভোগের) কিছু উপকারিতা রয়েছে, তবে এসবের পাপ ও ক্ষতি এর উপকারিতা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি।[৬২] হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَّنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ الْاٰيَةَ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَّنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى النِّسَاءِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكَارٰى فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ يُنَادِىْ اَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلٰوةَ سَكَرَانُ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَّنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيٰتُ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ فَقَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا–

অর্থ: উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়, তখন উমর (রা.) বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টরূপে বর্ণনা করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, যা সূরা বাকারাতে আছে: লোকেরা আপনার নিকট মদ ও জুয়ার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদের বলে দিন, এ দু'টিতে বড় গুনাহ....আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এরপর উমর (রা.)-কে ডাকা হয় এবং আয়াতটি তাঁকে শোনান হয়। তখন তিনি বলেন: ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্ট করে বলে দিন। তখন সূরা নিসার এ আয়াত নাযিল হয়: ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।

এরপর সালাতের ইকামত শুরু হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহ্বানকারী এরূপ ঘোষণা করতেন- কোনো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেনো সালাতে শরীক না হয়। অত:পর উমার (রা.)-কে ডেকে এ আয়াত শোনানো হলে তিনি বলেন: ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয়: নিশ্চয় মদ এবং জুয়া ইত্যাদি এরূপ জঘন্য শয়তানী আমল, যা দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে দুশমনী সৃষ্টি করে এবং এর দ্বারা আল্লাহর যিকির হতে বিরত রাখে। তবু কি তোমরা ফিরে আসবে না? তখন উমর (রা.) বলেন: আমরা ফিরে আসলাম।[৬৩]

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ ...فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ–

---

৬২. আল-কুরআন, ২: ২১৯

৬৩. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ, ২০০৪, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মদ হারাম হওয়া, খ. ২, পৃ. ১৬১, হাদীস নং- ৩৬৭০

অর্থ: নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারী শয়তানের গর্হিত কাজ। তোমরা এগুলো হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক, তোমাদের মঙ্গল হবে। শয়তান মদ এবং জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। এখনও কি তোমরা ফিরে আসবে না।[৬৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الاٰخِرَةِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে, এরপর সে তা থেকে তাওবা করেনি। সে ব্যক্তি আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।[৬৫]

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُخْمِرٍ خَمْرٌ وَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَّ مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخِسَتْ صَلٰوتُهُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قِيْلَ وَ مَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ صَدِيْدُ اَهْلِ النَّارِ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: প্রত্যেক বুদ্ধি-জ্ঞান বিনষ্টকারী বস্তুই হলো শরাব। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। কাজেই যে শরাব পান করে তার চল্লিশ দিনের সালাতের (সাওয়াব) কম হয়ে যায়। এরপর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। এভাবে যদি সে চতুর্থবারও শরাব পান করে, তখন আল্লাহর জন্য এটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়: ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'তীনাতুল খাবাল' কী? তিনি বলেন: জাহান্নামের পুঁজ।[৬৬]

আমাদের সমাজে যারা মদ পান করে, কেবল তাদেরকেই ঘৃণার চোখে দেখা হয়, কিন্তু শরাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকের ওপর আল্লাহর লানত ঘোষিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহর লানত শরাবের ওপর, তা পানকারীর ওপর, যে পান করায় তার ওপর, যে বিক্রি করে তার ওপর, যে তা খরিদ করে তার ওপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার ওপর, আর যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে সকলের ওপর।[৬৭]

মদ ও মাদক দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত যে ১০ জনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিসম্পাত দিয়েছেন, তারা হলো-(১) মদ প্রস্তুতকারক (২) মদ প্রস্তুতের উপদেষ্টা (৩) মদ পানকারী (৪) মদ বহনকারী (৫) যার নিকট মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) মদ বিক্রেতা (৮) মদের মূল্য গ্রহণকারী (৯) মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

বুখারীর একটি হাদীসে জানা যায়, তৎকালীন আরবে মূলত ৫ প্রকার বস্তু দিয়ে মদ তৈরি করা হতো। এগুলো হচ্ছে- আঙুর, খেজুর, গম, যব এবং মধু।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَّ اِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَّ اِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَ اِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَّ اِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا–

---

৬৪. আল-কুরআন, ৬: ৯০-৯১

৬৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, খ. ২, পৃ. ১৫৯০, হাদীস নং- ৫৬০৯

৬৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: নেশার বস্তু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, খ. ২, পৃ. ১৬২, হাদীস নং- ৩৬৮০ এবং আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মদ পানকারী, খ. ২, পৃ. ২৪-২৬, হাদীস নং- ১৮৬২

৬৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মদ তৈরির জন্য আংগুর নিংড়ানো, খ. ২, পৃ. ১৬২, হাদীস নং- ৩৬৭৪

অর্থ: নুমান ইবন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আংগুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, মধু, গম এবং যব হতে শরাব তৈরি হয়।[৬৮]

সাধারণত আঙুর, খেজুর, গম, যব, মধু, আপেল, নাশপাতি, ইক্ষু, পীচফল ইত্যাদি থেকে যে মাদক তৈরি হয় তা পানীয় জাতীয়। ওপিয়াম গাছ থেকে যে মাদক তৈরি হয় তা গাঁজা, মরফিন ও হেরোইন নামে পরিচিত। হাশিশ গাছ থেকেও মাদক দ্রব্য তৈরি হয়। বিভিন্ন বৃক্ষ বা বৃক্ষের ফলকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বর্ণহীন তরল পদার্থে পরিণত করে এ্যালকোহল বানানো হয়। দুনিয়াব্যাপী এ্যালকোহল ব্যাপকভাবে মদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এ্যালকোহল দিয়ে যে উন্নতমানের মদ তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে ব্যাণ্ডি, বিয়ার, হুইস্কি, রাম, জিন, ভদকা, এইল ইত্যাদি।[৬৯]

মদ, মদিরা, সুরা, ব্রানডি, বিয়ার, শ্যাম্পেন, হুইস্কি, রাম ইত্যাদি যে নামেই ডাকি না কেন এসব পানীয়তে রয়েছে অ্যালকোহল। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন নাম দেয়া হলেও এগুলো সবই মদ বা মাদকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আরবীতে মদকে خَمْر (খামর) বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ হলো- ঢাকা, ঢেকে রাখা, আচ্ছাদিতকরা।[৭০] হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عُمَرَ ... وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقَلَ–

অর্থ: উমর (রা.) থেকে বর্ণিত ... খামরবা মদ হলো ঐ জিনিস, যা পান করলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে।[৭১] আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন –يَشْرَبُ نَاسُ مِنْ اُمَّتِىْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بَغَيْرِ اِسْمِهَا–

অর্থ: আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, কিন্তু তার এর অন্য নাম দেবে।[৭২]

মাদকাসক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমেরিকার National Council on Alcoholismমন্তব্য করে-

Alcoholism is an addiction to alcohol that entails several harmful consequences including damage to the brain, liver or other organs as well as destructive effects on the alcoholic's own life and that of alcoholic's family.

অর্থ: মাদকাসক্তি হচ্ছে এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় সেবনের প্রতি অভ্যাস, যা মস্তিষ্ক, যকৃতসহ মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। শুধু তাই নয়, মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার নিজ জীবন ও তার পরিবারের অন্যদের জীবনও বিপন্ন করে দেয়।

সুতরাং যে বস্তু বা পানীয় পান করলে বা সেবন করলে বা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দিলে নেশা ধরে এবং যা স্নায়ুতন্ত্রকে (Nervous System) উত্তেজিত করে তাই মাদক। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامُ–

অর্থ: জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যা অধিক পরিমাণে পান করলে নেশার সৃষ্টি হয়, তা অল্প পরিমাণে পান করাও হারাম।[৭৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوْهُ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) সহ একদল সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। পুনরায় মদ পান করলে তাকে আবার বেত্রাঘাত করো। তারপর পান করলে তাকে হত্যা করো।[৭৪]

---

৬৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: কোন কোন জিনিস থেকে শরাব তৈরি হয়, খ. ২, পৃ. ১৬২, হাদীস নং- ৩৬৭৬

৬৯. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন, "মাদকাসক্তি নিরোধে মহানবী সা.-এর শিক্ষা", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, (মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার কর্তৃক সম্পাদিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ১৯৬-১৯৭

৭০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭,

৭১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মদ হারাম হওয়া, খ. ২, পৃ. ১৬১, হাদীস নং- ৩৬৬৯

৭২. আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ, *সুনানু নাসাঈ*, সৌদি আরব: রিয়াদ, বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৯, অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার পানীয় ও এর বিধান, অনুচ্ছেদ: মদের প্রকৃত অবস্থা, পৃ. ৫৭১, হাদীস নং- ৫৬৫৮

৭৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: নেশার বস্তু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, খ. ২, পৃ. ১৬৩, হাদীস নং- ৩৬৮১

৭৪. *সুনানু নাসাঈ*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার পানীয় ও এর বিধান, অনুচ্ছেদ: মদ পানের গুরুতর পাপের হাদীসসমূহ, পৃ. ৫৭১,

হাদীসে এসেছে- উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করো। কেননা তা নানা অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিলো। এক দুশ্চিরিত্রা মহিলা তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক দাসীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন গমন করলো। সে যখনই কোনো দরজা অতিক্রম করতো, দাসী পেছন থেকে সেটি বন্ধ করে দিতো। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো, আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এক পেয়ালা মদ। সেই নারী আবেদকে বললো: আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি; বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা এই মদ পান করবেন অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বললো, আমাকে এই মদের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করালো। তখন সে বললো, আরো দাও। মোটকথা, ঐ আবেদ আর থামল না, যতক্ষণ না সে তার সাথে ব্যভিচার করলো এবং ঐ ছেলেকেও হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিহার করো। কেননা আল্লাহর শপথ! মদ ও ঈমান কখনো সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।[৭৫]

**মাদক সেবনের কুফল**

২ অথবা ৩ আউন্স পরিমাণ হুইস্কি পান করলে পানকারীর চিন্তা ও বিচারশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। উদ্বেগ অস্থিরতা হ্রাস পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হলেও তা তাৎক্ষণিক ও স্বল্পমেয়াদী হয়। রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা ৩০% হলে মদ পানকারীর মানসিক বিভ্রাট ঘটে এবং ক্রমশ চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। কারো শরীরের রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা ৪৫% হলে প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। আরন ৭০% হলে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে মৃত্যু বরণও হতে পারে। অত্যধিক মদ পানের ফলে কিডনীর সন্নিহিত অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে বেশি প্রস্রাব উৎপন্ন হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি অমাদক সেবীর তুলনায় ১০ থেকে ১২ বছর আগে মারা যায়। মাদক সেবীর স্নায়ুতন্ত্র ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি লোপ পায়। অতিরিক্ত মদ্যপানে মুখগহ্বর, গলা ও স্বরযন্ত্র (Voice Box) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মদ্যপানের সাথে যারা ধূমপান করে তাদের পাকস্থলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভবতী মহিলা যদি মদ ও ধূম একসাথে পান করে তাহলে Fetal Alcohol Syndrome দেখা দিতে পারে। যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে গর্ভজাত শিশু মানসিক ও শারীরিক বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেবে।[৭৬]

পা থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত সারা দেহই আক্রান্ত হয় মদের কুপ্রভাবের দ্বারা। অ্যালকোহল পানে শরীরে বিপাকের মূল অঙ্গ লিভারের অবস্থও সবচেয়ে বেশি খারাপ হয়। ফ্যাটি লিভার, জন্ডিস, লিভার বড়হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিভার সিরোসিস নামের ভয়ঙ্কর রোগ পর্যন্ত হতে পারে। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হলে অকালে মৃত্যুবরণের আশঙ্কা বেড়েযায় অনেকখানি। হতে পারে লিভার ক্যানসার যার ফলাফল নিশ্চিত মৃত্যু।

বুকজ্বালা, গ্যাস্ট্রিক আলসারের সমস্যা বেড়েযায়, অগ্নাশয়ে হতে পারে প্যানক্রিয়াটাইটিস বা আগ্নাশয়ের প্রদাহ যা খুব মারাত্মক। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে এটা রোগীর জীবনাবসান করাতে পারে। মুখগহবর, শ্বাসনালী ও খাদ্যনালি, কোলন বা বৃহদান্ত্রের ক্যানসারেও মদের ভূমিকা আছে।কিডনির আকার বাড়িয়ে দেয়া, কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কিডনির হরমোনের ব্যালান্স নষ্ট করা, এমনকিনিয়মিত মদ পানে কিডনি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যেতে পারে।অতিরিক্ত মদপানের কারণে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চ রক্তচাপের আশঙ্কা বাড়ে। হৃদপেশি বিকল হয়ে হার্টফেইলর বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও বন্ধ হতে পারে। হতে পারে মস্তিস্কে স্ট্রোক, ডিমেনশিয়া বা স্মৃতি ভ্রষ্টতা।

মদপানকারীর মানসিক স্বাস্থ্যেরও বেশ অবনতি ঘটে। বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা, মানসিক অস্থিরতা, অনিদ্রা, কাজে একাগ্রতার অভাব সবকিছু মিলিয়ে একজন সুরাসক্ত মানুষ মনের দিক থেকে খুবই অশান্তিতে থাকে। গর্ভবতী মা মদ পান করলে আগত সন্তানের মারাত্মক জন্মগত ত্রুটি দেখা দেয়। শিশুর শারীরিক গঠনে অস্বাভাবিকতা থাকে, মস্তিষ্কের স্বাভাবিক পরিবর্ধন ও পরিবর্তন হয় না এবং এসব সমস্যার কোনো সমাধান নেই।[৭৭]

---

হাদীসনং- ৫৬৬১

৭৫. *সুনানু নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার পানীয় ও এর বিধান, অনুচ্ছেদ: মদ পান থেকে যেসকল পাপ জন্ম নেয়, পৃ. ৫৭১-৫৭২, হাদীস নং-৫৬৬৬

৭৬. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৭৭.*আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৮

যারা অল্প সময়ে প্রচুর অ্যালকোহল গ্রহণ করেন তাদের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়, বাংলাতে যাকে আমরা মাতলামি বলতে পারি। মাতাল ব্যক্তি তার নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, চলাফেরা ও কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখা যায়। মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে অপরের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি পর্যন্ত করে। মাতাল অবস্থায় গাড়িচালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অনেকেই মারা যায়। আমাদের দেশে বাস-ট্রাকড্রাইভারদেরঅতিরিক্ত অ্যাক্সিডেন্টের অন্যতম কারণ এই মদাসক্তি। অনেকে অ্যালকোহলের বিষক্রিয়ায় মারাও যেতে পারে।

যেসব পুরুষ মদ পান করে সাময়িকভাবে তাদের মাঝে যৌন চাহিদা বাড়লেও পরবর্তীতে তাদের যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। টেস্টেরোন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ার প্রমাণ পেয়েছে গবেষকেরা। মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের ক্ষতিকারক দিক পুরুষদের থেকে বেশি। মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যানসারের একটা অন্যতম কারণ হিসেবে মদপানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাড়ক্ষয় বা অস্টিওপরোসিসের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অ্যালকোহলিক নারীদের মাঝেই বেশি দেখা যায়।[৭৮] শরাব যখন মানব দেহে প্রবেশ করে, তখন অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে খাদ্যদ্রব্যকে দ্রুত হজম করে দেয়। এটাই শরাবের বাহ্যিক উপকারিতা, যা পবিত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল এর ৬৭ নং আয়াতে শরাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এটা আকলকে বিকৃত, বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত ও অনুভূতিকে উত্তপ্ত করে স্বাভাবিক ও সুস্থ লোককে অজ্ঞান করে দেয় এবং চিন্তাশক্তি নষ্ট করে ফেলে।

শরাবের মাতলামীতে যেহেতু হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকে না, তাই আপন মা-বোন, ভাল-মন্দ ইত্যাদিও পার্থক্য পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করা এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রশ্নই আসে  না।

**পরিপাক ক্রিয়ায় শরাবের কুপ্রভাব**

মাদকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম মুখ থেকেই প্রকাশ পায়। সাধারণত মানুষের মুখে লালা সাদৃশ এক ধরণের ধাতু থাকে। এ্যালকোহল পান করার কারণে মুখের লালা উৎপাদনের শক্তি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে, যদ্দরুন মাড়ীতে ক্ষত এবং ফোলা বা স্ফীত দেখা দেয়। সুতরাং শরাবে অভ্যস্থ ব্যক্তিদের দাঁতগুলি খুবই দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। কণ্ঠ ও খাদ্যনালিতেও এর প্রভাব দেখা দেয়। উভয় অঙ্গ পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কাজ সম্পাদন করে থাকে এবং উক্ত অঙ্গ দুটির ওপর অনুভূতিশীল এক ধরণের বিশেষ আবরণ থাকে। এ্যালকোহল পান করার কারণে উক্ত আবরণটির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে অঙ্গদ্বয় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে।অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে মদ বা এ্যালকোহল ব্যবহারকেই ধরে নেয়া হয়। শরাব পান করার কারণে পাকস্থলিতে যে ধ্বংসাত্মকব্যাধির সৃষ্টি হয় এ বিষয়টি সবাই স্বীকার করে থাকে। রক্তে লিপিড নামক প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য যে এক বিশেষ ধরনের চর্বি থাকে, তা এ্যালকোহল ব্যবহারের কারণে বিগলিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, (লিপিড) এক ধরণের প্রতিরক্ষামূলক আবরণ সৃষ্টি করে, যার ওপর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ক্ষতিকারক প্রভাব কার্যকরী হয় না।

রসায়ন শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এ্যালকোহল বা শরাব দ্রবণ ক্রিয়ার জন্য বিশেষ করে চর্বি গলানোর কাজে একটি শক্তিশালী দ্রাবক। খাদ্যের পরিভাষায় এটা অবশ্য দ্রবণকারী জিনিস নয়; বরং চূর্ণ-বিচূর্ণ করার কাজে ফলপ্রসূ। অন্য কথায় চিনিকে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হজম করার ব্যাপারে শরাব একটি রাসায়নিক বিকল্প খাদ্য। উল্লিখিত কারণের ভিত্তিতে শরাবকে মানব দেহের জন্য একটি ক্ষতিকারক ক্যামিকেল হিসেবে চিহ্ন করা হয়েছে

মদ কণ্ঠনালী এবং খাদ্যনালিতে যেমন ক্যান্সার সৃষ্টির মূল উৎস হিসেবে কাজ করে, তেমনিভাবে পাকস্থলীতে ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও শরাব উল্লিখিত ভূমিকা পালন করে থাকে।

শরাবের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ডিওডেনাম এর উপর। উক্ত স্থানটি খুবই স্পর্শকাতর এবং রাসায়নিক প্রভাবজনিত হয়ে থাকে। যা বিশেষ ধরনের হজমকারী লালা উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক রাখে।

শরাব হজম শক্তিকে ধ্বংস করার পর হৃদপিণ্ড থেকে সৃষ্ট লালা নির্গত করার ব্যাপারেও বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। মদ্যপায়ীদের ডিওডেনিয়াম এবং পিত্তাবরণ সর্বদাই রোগাক্রান্ত থাকে এবং উক্ত অঙ্গদ্বয়ের কার্যক্রম প্রায়ই যথাযথভাবে হয় না। পাকস্থলির উক্ত সমস্যা পরিপাক তন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং যে পরিপাক প্রক্রিয়া কম্পিউটারের ন্যায় কর্ম

---

৭৮. মুফতী মুহাম্মদ ইসহাক, *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আল-আবরার প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৫, পৃ. ৬২,৬৩

সম্পাদন করে থাকে, তার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। একজন সুস্থ ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় সব কিছু হজম করে থাকে। এটা তার পরিপাক ক্রিয়া বিশেষ কার্যক্রম চালু রাখার কারণেই সম্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত শরাব পানকারীদের এ নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে যায়। তাদের পরিপাক ক্রিয়াটি অনিয়মিত চলতে থাকে। এতে শরীরের স্থূলতা (মেদ) বেড়ে যায়। কারণ, তাদের অপ্রত্যাশিত হজম ক্রিয়ায় পরিপাক যন্ত্রের ফাঁকা স্থানে চর্বি জমতে শুরু করে। মূলত চর্বির আধিক্য হৃদযন্ত্রের উপর ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে হৃদযন্ত্রের রোগসমূহ বিস্তার লাভ করে।

মদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর প্রভাব কিডনীর উপর পতিত হয়। মানুষের কিডনী ঐ অনুভূতির গবেষণা কেন্দ্র, যা শরাবের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বিন্দুকেও বিষের ন্যায় অনুভূতি প্রবণ করে তোলে। এ অবস্থা প্রত্যেক মদ্যপ্যকেই গ্রাস করে।

শরাবের এ প্রভাব কিডনীর জন্য বিপদজনক পরিণাম ডেকে আনে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হল কিডনী সঙ্কুচিত হওয়া। ফলে পর্যায়ক্রমে কিডনী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

ধ্বংসশীল কার্যাবলীর প্রথম হল মদ্যপানের দ্বারা হৃদপিণ্ড এমন কতগুলো রক্ত অঙ্গ সৃষ্টি করে, যা হৃদপিণ্ড নিজে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে হৃদপিণ্ডের রক্ত তৈরি ক্ষমতাটি দুর্বল হয়ে যায় এবং সমস্ত মদ্যপায়ীরা অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও তাদের বাহ্যিক চেহারা টলটলে রক্তিম বর্ণ দেখা যায় এবং তাদেরকে হৃষ্টপুষ্ট মনে হয়। কিন্তু হৃদপিণ্ডের রক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের হাড্ডির মজ্জাও নষ্ট হয়ে যায়।

তাছাড়া হৃদপিণ্ডের ঐ শক্তি যার দ্বারা দেহ-রক্ষাকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন প্রকার গ্লোবিন তৈরি হয়, উহা মদ্যপায়ীদের দেহে ভয়াবহভাবে হ্রাস পায়। ফলে মদ্যপায়ীদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব হয়ে পড়ে। কখনও শরাব হৃদক্রিয়াকে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মদ্যপায়ী অচেতন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। একে হার্ট অ্যাটাক বলা হয়। সুতরাং শরাব পানে হৃদপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি এমন দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

**রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ওপর শরাবের বিরূপ প্রভাব**

রক্ত সঞ্চালনের ওপর শরাবের প্রভাব দু'ভাবে পতিত হয়। প্রথমত হৃদযন্ত্রের ওপর শরাবের প্রভাব কোন মাধ্যম দ্বারা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত মাধ্যম ব্যতিরেকেই হৃদযন্ত্রে পেশীর ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে থাকে, যে পেশী রসালো চর্বি জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে, তাতে দুর্বলতা সৃষ্টি করে। এ কারণে ব্লাড প্রেসার দেখা দেয়। অন্যদিকে এ্যালকোহলের (মদের) তীব্রতায় হৃদযন্ত্র জ্বলে যাওয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রক্ত প্রবাহের বিঘ্ন ঘটে। এতে অন্তরের মধ্যে অবসন্নতা আসে এবং চর্বিকণিকা জমা হয়ে পড়ে আর শিরাতন্ত্রের বিরূপ প্রভাবের দ্বারা মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এটা প্রমাণিত, শরাবে অভ্যস্ত ব্যক্তি হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে নতুবা হার্টফেল করে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

কতিপয় মদ্যপায়ীর ধারণা হল, স্বল্পমাত্রায় এবং সহনীয় পরিমাণ মদ পান করায় মনের মধ্যে এবং শিরা-উপশিরায় এক প্রকার সতেজতা আসে। আর এটা শনাব পানেরই একটি উপকারিতা। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ ধারণার কোনো মূল্য নেই। যদিও ডাক্তারী শাস্ত্রে এ ধরনের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। কিছু লোক বর্তমানে মদের সাধারণ প্রচলন দেখে বলে, শক্তি লাভের জন্য এবং অতি ঠাণ্ডায় যদি অল্প অল্প মদপান করে, যাতে মাতলামি না আসে এবং হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকে, তাতে অসুবিধার কী আছে? অতিরিক্ত পরিমাণ পান করে বেহুঁশ এবং মাতাল না হলেই হলো। কিন্তু তারা মোটেও লক্ষ্য করে না, এটা এমন একটি জলাভূমি যাতে একবার ফেঁসে গেলে বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেউ একবার ফেঁসে গেলে দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হতে হয়। যদি কোনো ক্ষতিকর জিনিসের স্বল্প পরিমাণ থেকে মানুষ বিরত থাকতে না পারে, তবে অধিক পরিমাণ থেকেও বিরত থাকতে পারে না। ছোট অপরাধ থেকেই বড় অপরাধ করার সাহস হয়। এটাই স্বাভাবিক।[৭৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হারাম জিনিস সমূহেকে একটি সরকারী চারণভূমির সাথে তুলনা করেছেন। যার সীমানার কাছকাছিও প্রাণী চরানো বিপদমুক্ত নয়। তিনি ইরশাদ করেছেন, এ সকল চারণভূমির কাছেও যেয়ো না।

এ উদাহরণে তিনি মানুষের নফসে আম্মারাকে প্রাণীর সাথে তুলনা করেছেন। যা মানুষকে অপকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। সরকারী চারণভূমির বাহির সীমানায় দাঁড়িয়েই তাতে মুখ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছু খেয়েও নেয়। এরপর এক পা

৭৯. মুফতী মুহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১,৫২

ভেতরে রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে চারণভূমির মাঝখানে পোঁছার পর আর ফিরে আসতে চায় না। যতক্ষণ কেউ তাকে তাড়িয়ে বের না করে।

মানুষ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও যদি তার নফসকে বাধা না দেয়, তবে অন্য কেউ তার ওপর জোর খাটাতে পারে না। কিন্তু ধর্মহীনতার কারণে তার এ স্বাধীনতা প্রাণীর চেয়েও অধিক বিপদ ডেকে আনে।

মানুষের হৃদপিণ্ড রক্ত সঞ্চালনের শেষ কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ছাকনির কাজ করে।মদ্যপান এ জটিল কাজটিকে ব্যাহত ও হৃদপিণ্ডকেইসবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে।

**সমাজ জীবনে শরাবের প্রভাব**

**(১)** মদ্যপায়ীরা দ্রুত ক্রোধান্বিত হওয়ার ফলে তারা সমাজে অসংখ্য ঝগড়া-ফাসাদে জড়িয়ে পড়ে।

**(২)** অসংখ্য মদ্যপায়ীদের দ্বারা তালাকের দুর্ঘটনা সমাজের ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছে। এভাবে অপরাধ প্রবণ লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় পুরো সমাজ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

**(৩)**বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী মানুষ মদ পান করার কারণে উদাসীন ও অলস হয়ে যায়। ফলে তাদের কর্মজীবন এবং অভিজ্ঞতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এর কুপ্রভাব থেকে সমাজও রেহাই পায় না।

**(৪)**মদ্যপানের কারণে মানুষের মাঝে সহানুভূতি লোপ পায়। ফলে একতা এবং নীতি বিবর্জিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়।

**(৫)**মদে মাতাল ব্যক্তি অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে গালি-গালাজ করে এবং মারামারিতে লিপ্ত হয়। কখনো আবেগপ্রবণ হয়ে কাঁদতে থাকে। আবার কখনো ভয়ে কাঁপতে থাকে।

আমেরিকা এ্যারিগান প্রদেশের এ্যালকোহল এডুকেশন কমিটি এবং মদপান সংশোধন সমিতির ডাক্তার আইওয়ার্ড এম স্কট বলেন, এ প্রদেশের মদখোর পুরুষদের ৫৬ শতাংশই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজেদের পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে দেয়। আর মদখোর নারীদের হারও অনুরূপ।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, তোমরা মদ পান করো না। কারণ এটা সকল পাপের মূল। অধিকন্তু তিনি এমন পাত্রসমূহও ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, যেগুলো মদ পানের কাজে ব্যবহৃত হয়।[৮০]

মুসলমানগণ মদের কু-প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করেই মদকে উম্মুল খাবায়েছ বা সকল অপকর্মের মূল বলে আখ্যা দিয়েছেন। মাতাল ব্যক্তি এরূপ অসমীচীন মানবতা বিরোধী অশালীন কাজও করে, যা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখতেও পছন্দ করে না। কিছুদিন ধরে জাপানী পুলিশ বাহিনী মদ্যপায়ীদের সাথে একটি হাস্যকর ও নতুন ধরনের আচরণ শুরু করেছে। তা হল, যখন মদ্যপায়ী মাতাল হয়ে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে, তখন তারা এগুলো টেপে রেকর্ড করে নেয়। যখন হুঁশ ফিরে আসে, তখন ঐ টেপ রেকর্ড ছেড়ে দিয়ে তার সকল কথাবার্তা তাকে শোনায়। এতে মদ্যপায়ী বেচারা খুবই লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করে। একাজটি আমাদের দেশেও করা যেতে পারে।

**তামাক**

সারাবিশ্বে অনেকে মদ পান করাকে অনেক দোষনীয় মনে করলেও তামাক সেবনকে তারা ততটা দোষণীয় মনে করে না। ফলে দেখা যায় ধনী-গরীব, নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-মূর্খ, চাকুরীজীবি, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী তথা সর্বস্তরের কোটি কোটি মানুষ তামাকের গুঁড়োর মাধ্যমে নেশা করে থাকে। আর এই তামাকের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, হুক্কার মশল্লা, পানবিলাসীদের জন্য জর্দা-সাদা, দাঁতের ব্যবহারের গুল আর নাকে নেয়ার জন্য নস্যি। ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করার নিমিত্ত কোনোটাতে সুগন্ধিও মেশানো হয়।

তামাকের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবন-নাশক মারাত্মক ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যালস, যা এর ব্যবহারকারীকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন ধূমপায়ীকে ধুকে ধুকে এর চরম মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তামাকে রয়েছে নিকোটিন, কার্বন মনোক্সাইড, কারসিনোজেনসহ অন্যান্য বিষাক্ত কেমিক্যালস। নিকোটিন নামক মারাত্মক বিষের একটি অংশের নাম নাইট্রোসাসিন। আর এই নাইট্রোসাসিন ক্যান্সার তৈরির মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ধূমপানের ফলেও নিম্নোক্ত মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক রোগসমূহ হয়ে থাকে-

---

৮০. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: যে সকল পাত্রে নাবীয তৈরি পছন্দনীয় নয়,খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ১৮৬৮

(১) ক্যান্সার (২) যক্ষ্মা (৩) গ্যাস্ট্রিক (৪) আলসার (৫) ফুসফুসের প্রদাহ (৬) হাই ব্লাড প্রেসার (৭) হৃদরোগ (৮) কাশি-হাঁপানি (৯) কোষ্ঠ-কাঠিন্য ইত্যাদি।

এছাড়া তামাকের নিকোটিন এবং কার্বন মনোক্সাইড মানুষের যৌনক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। ধূমপায়ী যে শুধু নিজেরই ক্ষতি করছে তা নয়; বরং তার সন্তান এবং যারা তার সাথে চলাফেরা করে তাদেরও ক্ষতি করছে।

তামাক বলতে নিকোটিয়ানা টোবেকাম (Nicotiana tebacum) নামক গাছের পাতা বোঝায়। তামাক পাতা শুকনা অবস্থায় সাদা অথবা জর্দা হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিংবা ধুমপানের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর এর গুঁড়ো ব্যবহৃত হয় নস্যি হিসেবে।

**তামাকের রাসায়নিক উপাদান**

তামাক গাছ উৎপাদনের জমিতে কতটুকু খনিজ পদার্থ রয়েছে এর ওপর ভিত্তি করে তামাকের রাসায়নিক উপাদান কম-বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত তামাক পাতায় ১২-২০% পরিমাণ Ash থাকে এবং তামাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিকোটিনের পরিমাণও বিভিন্ন। হাভানায় তামাকের শুষ্ক পাতায় নিকোটিনের পরিমাণ ১৫-৩.০%, ভার্জিনিয়ার তামাকে ৬-৮% এবং কোন কোন আলজেরীয় তামাকে এর পরিমাণ আরও বেশি।

**তামাকের ব্যবহারেরবিভিন্ন ধরণ**

**(১)** ধূমপানের জন্যই তামাক পাতা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। ধূমপানের জন্য বিড়ি, সিগারেট চুরুট, পাইপ ও বিভিন্ন প্রকারের হুক্কা ব্যবহৃত হয়। প্রতি সিগারেট থেকে ০.৯২ মিলিগ্রাম নিকোটিন ধূমপানকারীর মুখে প্রবেশ করে থাকে। এই নিকোটিনের পরিমাণ প্রতিটি চুরুট (Cigar) থেকে ৩.৬মি.গ্রা এবং প্রতি গ্রাম পাইপ তামাক (Pipe tobacco) থেকে ২.৭ মি.গ্রা. ধূমপানকারীর মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। আমাদের দেশের বিড়ি ও হুক্কার মাধ্যমে কত নিকোটিন যে মুখে প্রবেশ করছে এর হিসাব রাখা মুশকিল। হুক্কা জাতীয় ধূমপান যন্ত্রে পানি থাকে এবং এর ধূম সেই পানিতে ধুয়ে মুখে যায় বলে নিকোটিনের পরিমাণ কম হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। এজন্য হুক্কাকে ধূমপানের মধ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। আমাদের দেশের নবাব-জমিদারদের দামী ফুরসী যা গ্রামের নারিকেল খোলার তৈরি হুক্কার উন্নত সংস্করণ। এতে তামাকের সঙ্গে নানারূপ খুশবুদার দ্রব্য ব্যবহৃত হতো। এসব লম্বা পাইপের ফুরসী হুক্কা আজও আরব দেশ ও উপমহাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে চালু আছে।

ধূমপানের সময় কতটুকু নিকোটিন ফুসফুসে প্রবেশ করে তা নির্ভর করে কতটুকু ধূম শ্বাসের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করছে। ফুসফুসের ভেতর প্রবেশ করা ধূম থেকে নিকোটিন (Alveoli) কর্তৃক শুষে নেয়।

**(২)** ধূমপান ব্যতীত শুকনো তামাক পাতা পানের সঙ্গে মিশিয়ে জর্দা খাওয়ার রেওয়াজ উপমহাদেশের সর্বত্র চালু আছে। জর্দার সঙ্গে নানারূপ সুগন্ধী মিশিয়ে একে লোভনীয় করা হয়। এই উপমহাদেশে উলামাদের মধ্যে জর্দাপ্রীতি বেশ উল্লেখযোগ্য। দাঁতের মাড়ির ব্যথা দূর করার জন্য খৈনির ব্যবহার ভারতের উত্তরাঞ্চলে খুব ব্যাপক। চুন ও তামাকের গুঁড়ো হাতের তালুতে পিষে তা মাড়ির কাছে রেখে দেয়া হয়। বাংলাদেশে এর প্রচলন খুব কম।

**(৩)** ষষ্ঠাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজ দরবারে প্রথম প্রচলিত নস্যির ব্যবহার আজও বিশ্বের সর্বত্র কম-বেশি চালু রয়েছে। তামাক পাতার গুঁড়ো হাতের চিমটার সাহায্যে নাকে ঢুকানোকেই নস্যি নেয়া বলা হয়। বাংলাদেশে এর ব্যবহার খুব ব্যাপক নয়।

**তামাকের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া**

একটি মাত্র সিগারেটের সামান্য নিকোটিন মানসিক ও শারীরিক শক্তির উপর উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু অধিক পরিমাণে নিকোটিন হতোদ্যম (Depression) সৃষ্টি ও মাদকদ্রব্য হিসেবে কাজ করে। ধূমপানে আসক্তদের মধ্যে নিকোটিন তাদের স্নায়ুর উত্তেজনা হ্রাস ও শান্ত করতে সাহায্য করে। এতে তাদের হৃৎপিণ্ড বা অন্যান্য অঙ্গের কর্মক্ষমতার কোনো হ্রাস হয় না।

**তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব**

**(১)** নতুন ধূমপায়ীদের মধ্যে সাময়িক বমি বমি ভাব, হতোদ্যম, মাথাঘোরা এবং বমিও হতে পারে। তবে নিত্য ধূমপায়ীদের মধ্যে এসব প্রভাব দেখা দেয় না।

(২) অতিরিক্ত ধূমপান (So-called chain smoking) নাড়ীর গতি বৃদ্ধি বা (Palitation) সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া এতে হৃদপিণ্ডের সংকোচন অনিয়মিত হয়, এমনকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এ সমস্ত লক্ষণগুলোকে একত্রে Tobacco heart syndrome বলা হয়।

(৩) অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, বদহজম, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং রঙ প্রত্যক্ষ করার শক্তি (Colour perception) নষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে লাল ও সবুজ রং পার্থক্য করা কঠিন হয়। এতে গাড়ী চালাতে সমস্যা হয়। অথচ রাস্তার মোড়ের লাল সবুজ বাতির পার্থক্য বোঝা গাড়ী চালকের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

(৪) অতিরিক্ত ধূমপানে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়। গবেষকদের মতে প্রতিদিন ২৫টি বা ততোধিক সিগারেট পান করলে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

(৫) দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফসের মধ্যস্থ শ্বাস নালীর প্রদাহ, ক্ষুদ্র অন্ত্রের ঘা এবং করোনারী হৃদরোগের সঙ্গে অতিরিক্ত ধূমপানের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৬) ধূমপানের ফলে খুসখুসে কাশ এবং গলায় প্রদাহ হয়ে থাকে, যা ধূমপান বন্ধ করলে নিরাময় হয়।

(৭) নিকোটিন পেটের সন্তানের শারীরিক গঠনের বিকৃতি ঘটাতে পারে। তাই গর্ভাবস্থায় ধূমপান করা একেবারেই নিষেধ।

(৮) তামাক বা সিগারেট কারখানায় হঠাৎ করে প্রচুর তামাকের গুঁড়া ফুসফুসে প্রবেশ করলে বা ভুলে নিকোটিনজাত পোকা মারার ওষুধ খেয়ে ফেললে তীব্র নিকোটিন বিষ ক্রিয়া হতে পারে। শিশুরা তামাক গিলে ফেললেও এরূপ হতে পারে। নিকোটিন একটি মারাত্মক বিষ। এর মৃত্যু পরিমাণ হলো ৪০ মিলিগ্রাম, আর তামাকের মারাত্মক পরিমাণ হলো ২ গ্রাম। এ ধরনের বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলো সাধারণত নতুন ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে নিকোটিনের পরিমাণ খুব বেশি হলে রোগী অজ্ঞান ও মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ অবস্থার সফল চিকিৎসা হলো রোগীকে Charcoal খাওয়ানো এবং রাবার টিউবের সাহায্যে পটাশিয়াম পারমাঙ্গামেট দিয়ে পাকস্থলীর ভেতর পরিষ্কার করা। এছাড়া শ্বাসকষ্ট হলে কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন হতে পারে।[৮১]

সম্প্রতি সারাবিশ্বে ফুসফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা ভীতিজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও এখনো পর্যন্ত এই রোগ পুরুষদের মধ্যেই বেশি। তবে মেয়েদের মধ্যেও বেশ বেড়ে যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারের ফলে ১৯৫১ হতে ১৯৭৫ সাল এই ২৫ বছরের মৃত্যু হার নিম্নে দেয়া হলো। এ থেকে উক্ত রোগের ক্রমবৃদ্ধির হার স্পষ্ট বোঝা যাবে।

১৯৭৯ সালে কেবল ইংল্যাণ্ডে ফুসফুসের ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশি পুরুষ মৃত্যুবরণ করে, যার পরিমাণ ছিল সমস্ত ক্যান্সারে মৃতের ৩৯% এবং একই সময়ে এটা ছিল মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় ১৩%। মেয়েদের মধ্যে ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করেছিল স্তন ক্যান্সার রোগে ২০%। সুতরাং ফুসফুসের ক্যান্সার একটি ব্যাপক মারাত্মক ব্যাধি।

| ক্রম | গবেষণাকাল | মৃতের সংখ্যা | | মোট |
|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | নারী | |
| ০১. | ১৯৫১-১৯৫৫ | ১৬,৬৭৮ | ২,৬৫৬ | ১৯,৩৩৪ |
| ০২. | ১৯৫৬-১৯৬০ | ২২,৬৭০ | ৩,১০১ | ২৫,৭৭১ |
| ০৩. | ১৯৬১-১৯৬৫ | ২৯,৯৭৪ | ৩,১৯৩ | ৩৩,১৬৭ |
| ০৪. | ১৯৬৬-১৯৭০ | ৩৩,৪৩০ | ৪,৯১৬ | ৩৮,৩৪৬ |
| ০৫. | ১৯৭১-১৯৭৫ | ৩৭,২৫৮ | ৫,৮৯৫ | ৪৩,১৫৩ |

বাংলাদেশের এই রোগের সঠিক পরিসংখ্যান জানা না থাকলেও বর্তমানকালে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কোনো সন্দেহ নেই যে ফুসফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে অত্যধিক সিগারেট সেবন। বিভিন্ন

৮১. ডাক্তার গোলাম মুয়াযযাম, "তামাক ও তার প্রতিক্রিয়া", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, (মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ১২

পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়, ধূমপানের অভ্যাস বৃদ্ধির সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সরাসরি বৃদ্ধি পায়।[৮২]
প্রতি ১০০টি সিগারেটের ধূমে প্রায় এক মাইক্রোগ্রাম (1mg) 3.4 benzpyrene থাকে। যা ক্যান্সারের জন্য দায়ী হতে পারে। দেখা গেছে, সিগারেটের ধূমে আলকাতরা রয়েছে, যা শক্তিশালী ক্যান্সার সহায়ক।[৮৩]

সাময়িক আনন্দ, ফুর্তি, স্বস্তির স্বাদ পেতে মদের পথে ছুটে যায় অনেকে, কিন্তু ফেরার পথে শরীরে নিয়ে আসে মারাত্মক সব রোগব্যাধি। হাদীসে এসেছে-

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَاْكُلُوْنَ اَشْيَاءَ وَ يَتْرُكُوْنَ اَشْيَاءَ تَقَذُّرًا– فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْزَلَ كِتَابَهُ وَ اَحَلَّ حَلاَلَهُ وَ حَرَّمَ حَرَامَهُ– فَمَا اَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلُ وَ مَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامُ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوُ وَّ تَلاَ قُلْ لاَ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَعَامٍ يَّطْعَمُهُ اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা কোনো কোনো বস্তু খেতো এবং কোনো কোনো বস্তুকে খারাপ মনে করে পরিহার করতো। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করেন, আর তাঁর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম নির্ধারণ করে দেন। ফলে তিনি যা হালাল করেন তা হালাল এবং যা হারাম করে তা হারাম। আর তিনি যে সম্পর্কে চুপ থাকেন, তা ক্ষমার যোগ্য। এরপর তিনি (সা.) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন: আপনি বলুন! আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, এতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি, কিন্তু মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা, এগুলো অবশ্যই অপবিত্র এবং অপবিত্র সেসকল দ্রব্য যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে (তা ভিন্ন ব্যাপার)। নিশ্চয় আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৮৪]

**হারাম খাবার কখন খাওয়া যাবে**

কেউ যদি কঠিন খাদ্য সংকটে পড়ে এবং তার কাছে হালাল খাবারের মজুদ না থাকে এবং হারাম না খেলে সে মারা যাবে। এমতাবস্থায় জীবিত ধারণ পরিমাণ হারাম খাবার গ্রহণ করা বৈধ হবে। তবে তা যদি বিষ হয় নিষিদ্ধ। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো খাবার জায়েয হওয়ার জন্য ০২টি মৌলিক শর্ত রয়েছে। যথা:(ক) খাদ্য হালাল হওয়া এবং (খ) খাদ্য পবিত্র হওয়া।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا

অর্থ: হে মানব! যমীনে যা কিছু রয়েছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলো খাও।[৮৫]

**(ক) হালাল:** হালাল ঐ সকল জিনিসকে বলে যা শরীয়ত অনুমোদিত এবং তা গ্রহণ করাকে শরীয়ত নিষেধ করেনি। যেমন: চাল, গম, ডাল, দুধ, ফল, শাক-সবজিএবং হালাল জীব-জন্তুর গোশত ইত্যাদি। তবে শরীয়ত অনুমোদনের সাথে সাথে উক্ত হালাল বস্তু অবশ্যই জায়েয পন্থায় অর্জিত হতে হবে। অবৈধ পন্থায় উপার্জিত বা প্রাপ্ত খাবার কোনোক্রমেই জায়েয নয়। যেমন: চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, ছিনতাই অথবা না হক পন্থায় অর্জিত জীবিকা হালাল নয়।

**(খ) পবিত্রতা:** খাদ্য হালাল হওয়ার পাশাপাশি দ্বিতীয় শর্ত হলো, তা পবিত্র হওয়া। কারণ কোনো বস্তু যতই হালাল এবং বৈধ উপায়ে তা অর্জিত হোক না কেন, যদি এর মধ্যে না জায়েয বা নাপাক কিছু মিশ্রিত হয়, তবে তা আর জায়েয থাকে না। যেমন- মোরগ একটি হালাল প্রাণী এবং শরীয়ত এর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তথাপি তা বৈধ হওয়ার জন্য চুরিকৃত না হওয়া, অবৈধ পন্থায় উপার্জিত না হওয়া, মৃত না হওয়া; বরং নিয়মানুযায়ী জবাইকৃত হওয়া শর্ত। এমনকি উক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি গোশতের পাতিলের মধ্যে নাপাকী পতিত হয়, তবে সমস্ত গোশতই নাপাক হয়ে খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যাবে।

---

৮২. ডাক্তার গোলাম মুয়ায্যাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৪
৮৩. ডাক্তার গোলাম মুয়ায্যাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৪
৮৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: যে সব জন্তু হারাম হওয়ার কথা কুরআন-হাদীসে, খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস নং- ৩৮৫৬
৮৫. আল-কুরআন, ২: ১৮৬

পরিতাপের বিষয় হলো, সভ্যতার দাবিদার অনেক জ্ঞানী-গুণী এবং অজস্র সম্পদের অধিকারী লোক রয়েছে, যাদের জীবন থেকে হালাল-হারামের পার্থক্য একেবারেই ওঠে গেছে ইলমহীন সাধারণ লোকেরাও খাবারের ক্ষেত্রে জায়েয-না জায়েযের প্রতি তেমন খেয়াল করে না। আর পাক-নাপাকের প্রতি তো তাদের মোটেও সতর্কতা নেই। আল-কুরআনে এসেছে-

وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ، وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بَعَظْمٍ– ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ– وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ–

অর্থ: ইহুদীদের জন্য আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।[৮৬]

আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত যে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সহজায়নকরেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- তিনি আমাদের জন্য পবিত্র সকল বস্তু খাওয়া বৈধ করেছেন এবং শুধুমাত্র অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- 'তিনি তাদের জন্য পবিত্রবস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।[৮৭]

আর যে সকল প্রাণী দেব-দেবীর নামে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা হয় এরূপ জন্তুর গোশত খেলে আকীদা নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা সমস্ত মৃত জন্তুর গোশত হারাম করে দিয়েছেন।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে উপরোল্লিখিত যেসকল দ্রব্যাদি মানুষের জন্য ভক্ষণ করা হারাম করেছেন, শারীরিক সুস্থতা লাভে তা বর্জন করা অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি তিনি পবিত্র কুরআনে যেসকল দ্রব্যাদি পানাহারের জন্য হালাল করেছেন, যেমন- খেজুর, তীন, যায়তুন, আঙুর, ডালিম, কলা, মধু, মাতৃদুগ্ধ ও বিভিন্ন প্রাণীর দুধ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে শারীরিকভাবে সুস্থতা লাভ করাও সম্ভব। এ বিষয়ে নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

৮৬. আল-কুরআন, ৬: ১৪৬

৮৭ . আল-কুরআন, ৭: ১৫৭ এবং ৬: ১১৮- ১৬১,

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শারীরিক সুস্থতায় কুরআনের নির্দেশনা ও এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা

অসুস্থ হওয়ার পর মানুষ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ খাওয়ার প্রতি যতটুকু মনোযোগী হয়, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে যদি মানুষ আল-কুরআনে নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী জীবন-যাপন পরিচালনার ক্ষেত্রে ততটুকু গুরুত্ব দিতো, তাহলে সমাজে রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কমে আসতো এবং নিরাময় ও সুস্থ জীবন লাভ করে সুখে শান্তিতে বসবাস করতো। এ সকল নির্দেশনাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো- সুন্নাত অনুযায়ী ঘুম, সঠিক পন্থায় যৌনজীবন পরিচালনা করা এবং পর্দা করা ইত্যাদি। কুরআন ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীসেও এসকল বিষয়ে অনেক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এসেছে। শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্য যদিও আমরা এগুলোর প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দিই না, কিন্তু এসকল বিষয়াবলী বাদ দিয়ে সুস্থতা লাভ করাও সম্ভব নয়। নিম্নে এসকল বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আলোকপাত করা হলো-

### স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঘুমের প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনে ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কোনো কারণে একদিন না ঘুমাতে পারলে এর নেতিবাচক প্রভাব আমাদের শরীরে ভীষণভাবে পরীলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় শরীর ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কোনো কাজকর্মই ভালো লাগে না। কারণ ঘুমের মধ্যে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনগুলো বিশ্রাম পায়। প্রতিটি নিউরনের বিপরীতে ১০টি করে গ্লিয়াল সেল রয়েছে, যা ঘুমের মধ্যে তৎপর হয়ে ওঠে। এই গ্লিয়াল সেলগুলো নিউরনের ভেতরে যে টক্সিন থাকে তা ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে পরবর্তী দিনে কাজের জন্য প্রস্তুত করে। এতে ব্রেনের টিস্যুগুলো সংস্কার হয়ে ব্রেনের সেলকে সতেজ রাখে। ভালো ঘুমে স্মৃতিশক্তি এবং ব্রেনের কার্যকারিতাও বাড়ে। ফলে মস্তিষ্ক ব্যবহারের সক্ষমতা, মানসিক অবস্থা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় একাগ্রতা ও পূর্ণ সতর্কতার সাথে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়। সারাদিনে ঘটে যাওয়া মাসল, সেল ও হাড়ের ক্ষয়ক্ষতির মেরামত হয় এই ঘুমের মধ্যেই। এ সময় ইনসুলিনের উৎপাদন বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত সুগার বার্নআউট করে। যে কারণে ডায়াবেটিক হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনানুযায়ী নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমালে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি হৃৎপিণ্ড সুস্থ থেকে দেহের ভেতরে রক্তপ্রবাহ সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। তাই ঘুম হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য একটি অন্যতম বড় নিয়ামত। নিম্নে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঘুমের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো।

### পবিত্র কুরআনে ঘুম

কোনো প্রাণি নির্ঘুম থাকতে পারে না, দিনে হোক বা রাত্রে তাকে ঘুমাতেই হয়। কারণ প্রশান্তির আরেক নাম ঘুম। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সূরায় ঘুম সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেছেন। কোনো আয়াতে ঘুমকে ক্লান্তি দূরকারী, কোনো আয়াতে রাত্রে ঘুমিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের নির্দেশনা, কোনো আয়াতে ঘুমের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ, আবার কোনো আয়াতে ঘুমকে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম বলে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ঘুম সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا– অর্থ: আর তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী।[৮৮]

ইরশাদ হচ্ছে– وَ مِنْ رَحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থ: তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যেন তোমরা রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ করো ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৮৯]

ইরশাদ হচ্ছে– وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

অর্থ: আমি তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ। আর দিনকে বানিয়েছি তোমাদের কাজের জন্য।[৯০]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন– وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا

---

৮৮. আল-কুরআন, ৭৮: ৯

৮৯. আল-কুরআন, ২৮: ৭৩

৯০. আল-কুরআন, ৭৮: ১০-১১

অর্থ: আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ এবং নিদ্রাকে আরামপ্রদ করেছেন এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়।[৯১] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

اَللهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ–

অর্থ: আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পারো এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[৯২]

**ঘুম একটি ইবাদত**

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ঘুমও একটি বড় ইবাদত। মানুষ সাধারণত জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় তথা দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ঘণ্টা ঘুমে কাটায়। সে হিসেবে একজন মানুষ যদি ৬০ বছর বাঁচে, তাহলে তার জীবনের ২০ বছরই ঘুমে অতিবাহিত হয়। সুতরাং মুমিন বান্দা যদি ঘুমের মাধ্যমে দেহ ও মনকে আরাম দেয়ার নিয়ত করে, যাতে সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের বিষয়ে আরো দৃঢ় হতে পারে এবং ঘুমের সমস্ত সুন্নাত ও শরঈ আদব পরিপূর্ণরূপে পালন করে ঘুমায়, তবে তার ঘুমও ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে এবং ঘুমের পুরো সময় সে পূণ্য লাভ করবে। হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা.) বলেন–اَمَّا اَنَا فَاَنَامُ وَ اَقُوْمُ فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِىْ كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِىْ

অর্থ: আমি (রাতে) ঘুমাই এবং জাগ্রত হয়ে সালাত আদায় করি। জাগ্রত হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে যেভাবে সাওয়াবের আশা করি, ঠিক তেমনিভাবে ঘুমানোর মাধ্যমেও সাওয়াবের আশা করি।[৯৩]

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো- তিনি আরামের মধ্যে পূণ্য আশা করতেন যেমন কষ্টের মধ্যে আশা করতেন। কেননা, আরামের উদ্দেশ্য যদি ইবাদত করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা হয়, তবে এই আরামের দ্বারাও পূণ্য লাভ হবে।

**রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো সুস্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ**

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়ার বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তাবোধ করে। এজন্য সবচেয়ে উপযোগী সময় হলো রাত। কিন্তু গোটা পৃথিবী আজ এর উল্টো স্রোতে চলছে। এশার সালাতের পর অনেকেই না ঘুমিয়ে অহেতুক গল্পগুজব, সমালোচনা, পরনিন্দা বা অনৈতিক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে। বিশেষভাবে যুবক শ্রেণি এতে বেশি জড়িত। তারা রাতে বন্ধুদের সঙ্গে অযথা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এবং দলবেঁধে পার্টিতে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত সজাগ থাকে। যারা বাইরে যায় না তারা ঘরে বসে ইন্টারনেটে সারা দুনিয়া চষে বেড়ায়। অনলাইনে ছেলে-মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে রাতভর চ্যাট ও আড্ডায় জড়িত। অনেকে সিনেমা ও বিভিন্ন ভিডিও ডাউনলোড করে দেখে। কারো চোখ টিভির পর্দায়, কারো বা এফএম রেডিওর সঙ্গে কান লেগে আছে অথবা কেউ গেম খেলায় মগ্ন ইত্যাদি। এটি বর্তমান সমাজের ভয়াবহ চিত্র, যা অভিশাপরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ ছাড়া কোনো কিছুই বয়ে আনে না । এতে মানুষের মধ্যে ভয়াবহ ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে। রাতে সময় মতো না ঘুমালে স্বভাবতই পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে ফজরের সালাত কাযা হওয়া, এশরাকের সালাত ও সকালে কুরআন তিলাওয়াতসহ অন্যান্য সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। শুধু তাই নয়, মানব জীবনে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন: দীর্ঘদিন অপরিমিত ঘুমের কারণে শরীরে দুর্বলতা ও ক্লান্তি ভাব দেখা দেয় এবং সৃজনশীলতা, প্রাণবন্ততা ও কাজে উৎসাহ হারিয়ে কর্মতৎপরতা কমে যায়। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়ায় অল্পতেই অন্যের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জনজীবনে নানা অশান্তি দেখা দেয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ঘুমের অনিয়মে রক্তের রাসায়নিক উপাদানে পরিবর্তন ঘটে, যা হাইপারটেনশনের (Hypertension) অন্যতম কারণ। রক্ত প্রবাহের সমস্যার কারণে স্ট্রোক ও হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা

---

৯১. আল-কুরআন, ২৫: ৪৭

৯২. আল-কুরআন, ৪০: ৬১

৯৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ইন্ডিয়া: মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৫, খ. ২, পৃ. ৬২২

বহুগুণে বেড়ে যায়।রাতে তাড়াতাড়ি না ঘুমালে খাবার হজমে বিঘ্ন ঘটায় এবংস্মৃতিভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হলো অপর্যাপ্ত ঘুম। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা ক্লান্তিকর ও বোঝাস্বরূপ।[৯৪]

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইশার সালাতের আগে ঘুমানো এবং ইশার পর (না ঘুমিয়ে) গল্পগুজব করাকে অপছন্দ করতেন।[৯৫]

অপ্রয়োজনে রাত জাগার কারণেই সকালে ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব হয় না। আর বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের দিন শুরু হয় ফজরের সালাত আদায় না করে। হযরত জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ–

অর্থ: ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফুরের মাঝখানে পার্থ্যক হলো সালাত ছেড়ে দেয়া।[৯৬]

**রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর শারীরিক উপকারিতা**

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও দেরিতে ঘুমানোর বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন:

**(১) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** তাড়াতাড়ি ঘুমালে মানুষের বুড়িয়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথাসহ কয়েকটি মানসিক রোগ কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এ অভ্যাস গড়ে তুললে শরীরের রোগব্যাধি প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

**(২) ওযন নিয়ন্ত্রণ:** পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং ওযন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমালে মানুষের ওযন নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

**(৩) উদ্যমী হওয়া:** রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া মানুষকে কাজে উদ্যমী ও সৃষ্টিশীল হতে সহায়তা করে। রাতে পর্যাপ্ত ঘুমের পর দিনের কার্যক্রম চালানোর জন্য যখন সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা যায়, তখন খুব বেশি প্রাণবন্ত ও উদ্যম বোধ হবে এবং শরীর সহজে ক্লান্ত হবে না।

**(৪) মনের প্রফুল্লতা:** যারা তাড়াতাড়ি ঘুমায় এবং তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে তাদের মন ভাল থাকে। তাড়াতাড়ি বিছানায় ঘুমাতে যাওয়া মানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম হওয়া। স্বাভাবিকভাবেই ভাল ঘুম হলে মন প্রফুল্ল থাকে।

**(৫) সৌন্দর্য বৃদ্ধি:** দেহের সৌন্দর্যের সঙ্গে ঘুমের দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। ঘুম ত্বককে মেরামত করে, তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমালে ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আর রাতে ভালো ঘুম না হলে মুখে বলিরেখা দেখা দেয় এবং অপরিমিত ঘুম ত্বকের লাবণ্য কমিয়ে নিষ্প্রাণ করে তুলে। তাই যারা রাতে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণনা ঘুমায় তাদেরকে নিজেদের নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে কয়েক বছর বেশি বয়সী মনে হয়। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

চার্লস সিজলার-এর মতে, সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পরপরই মানুষের ঘুমের হরমোনগুলো কাজ করতে শুরু করে। মানুষ যদি রাতের প্রথমাংশে না ঘুমায় তাহলে ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও বিষণ্নতাসহ অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে এসব অসুখ শরীরে দানা বাঁধতে পারে না।[৯৭]

এছাড়া তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ফলে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ ও জামাআতে ফজরের সালাতআদায়ের জন্য শেষ রাতে ওঠা সহজ হয়। এ সময়টি দু'আ ও আল্লাহর কাছে তওবা করার সর্বোত্তম সময়।

পবিত্র কুরআনে জান্নাতবাসীদের গুণাবলী বর্ণনায় ইরশাদ হচ্ছে–وَ بِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থ: রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৯৮]

---

৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারিমী, *সুনান আদ-দারিমী*, বৈরুত: মুআসসাসাত আর-রিসালাহ, ২০০৯, খ. ৩, পৃ. ৩১২
৯৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪
৯৬. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, ইন্ডিয়া: মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৬১
৯৭. *www. Kalerkantho.com,*" টানা আট ঘণ্টা ঘুমানোর অভ্যাসটি স্বাভাবিক নয়", ১০.১২.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)
৯৮. আল-কুরআন, ৫১: ১৮

**রাত জাগার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতিকর দিকসমূহ**

(১) গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরদিন বেলা করে ঘুম থেকে ওঠতে হয়, এতে ফজরের সালাত কাযা হয়।

(২) কোনোমতে ফজরের সময় ওঠতে পারলেও ঘুমের চোখে সালাতে মন দেয়া কষ্টকর হওয়ায় আমলে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দেয়।

(৩) প্রতিনিয়ত রাত জাগার অভ্যাস শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। দীর্ঘদিন অপরিমিত ঘুমের কারণে শরীরে দুর্বলতা ও ক্লান্তি ভাব দেখা দেয়। এতে সৃজনশীলতা, প্রাণবন্ততা এবং কাজে উৎসাহ হারিয়ে কর্মতৎপরতা কমে যায়। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়ায় অল্পতেই অন্যের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এতে ব্যক্তি, পারিবারিক ও জনজীবনে নানা অশান্তি দেখা দেয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ঘুমের অনিয়মে রক্তের রাসায়নিক উপাদানে পরিবর্তন ঘটে, যা হাইপারটেনশনের (Hypertension) কারণ।

(৪) পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে খাবার হজমে বিঘ্ন ঘটায়। রক্তপ্রবাহের সমস্যার কারণে স্ট্রোক ও হার্ট এটাকের সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখ গেছে, স্মৃতিভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হলো অপর্যাপ্ত ঘুম। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা ক্লান্তিকর ও বোঝাস্বরূপ।[৯৯]

শিল্পবিপ্লবের পর মানবজাতির স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘুমের রুটিন ব্যাপকভাবে বদলে যাওয়ায় ইউরোপসহ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এখন অ-প্রাকৃতিক এবং অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। এমনটাই মত বিজ্ঞানীদের। ক্লাসিক্যাল বিভিন্ন সাহিত্যের বই, মেডিকেল বই, আদালতের নথিপত্র, নৃতাত্ত্বিক তথ্য ও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, আগেকার মানুষরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতেন না এবং একটানা ৭ বা ৮ ঘণ্টা ঘুমাতেন না। তারা মানুষরা প্রকৃতির সাথে সাথে ঘুমিয়ে যেতেন, প্রকৃতির সাথেই জেগে ওঠতেন। মাঝখানে দু'-এক ঘণ্টার জন্য জেগে স্রষ্টার উপাসনা বা ইবাদত করতেন অথবা ব্যক্তিগত কোনো কাজ সেরে নিতেন। এটাই ছিল মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘুমের অভ্যাস। কিন্তু সুস্থ-স্বাভাবিক এই ঘুমের অভ্যাসটি ধ্বংস হতে শুরু করে ১৭ শতাব্দীর শেষের দিকে। যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। ১৬৬৭ সালের ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় প্রথম মোমবাতি লাগানো শুরু হয়। ২বছর পর তেলের বাতি আবিষ্কার হয়। এরপর লন্ডনসহ ইউরোপের প্রায় ৫০টি শহরের রাস্তায় রাস্তায় তেলের বাতি লাগালো শুরু হয়। Leipzig নামক জার্মানের ছোট্ট একটি শহরে মাত্র ১০০ জন মানুষ কাজ করলেও শহরটির বিভিন্ন রাস্তায় ৭০০টি বাতি বসানো হয়েছিল।

এসব কৃত্রিম আলো সৃষ্টির কারণে মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘুমের রুটিনটি বদলে যায়। মানুষ আস্তে আস্তে ভাবতে শুরু করলো যে, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া মানে হলো সময় অপচয় করা। দিনের কাজে দিনের আলোর মধ্যে শেষ করে ফেলার যে তাড়না অতীতের মানুষের মধ্যে ছিল, তা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে অলসতা ও বিলাসিতা চলে আসে। দিনের কাজ দিনের আলোর মধ্যে শেষ না করে মানুষ তা রাতের জন্য রেখে দিতো। ফলে অনিবার্য কারণেই রাতের ঘুমটি দিনের আলোর মধ্যে প্রবেশ করলো এবং মানুষ তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ঘুমের রুটিনটি হারিয়ে ফেলল।

১৯২০ সালের দিকে এসে শহরের মানুষ তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘুমের নিয়মটি একেবারেই ভুলে গেল এবং তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার বিষয়টি মানুষের কাছে কাল্পনিক মনে হতে লাগলো। এতে রাতের ঘুম চলে আসলো দিনের আলোতে এবং দুই বা ততধিক ঘুমের পরিবর্তে মানুষ একটি ঘুমের অভ্যাস করে ফেললো। মানুষ তাদের প্রাকৃতিক অভ্যাস ত্যাগ করায় প্রকৃতিও মানুষের সাথে বিদ্রূপ আচরণ শুরু করল। দিনের বেলা ঝিমুনি, মাথাব্যথা, হতাশা, কাজে অমনোযোগ, অলসতা, দুর্বলতা, অযথা রাগান্বিত হওয়া সহ নান কিছু মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হলো।[১০০]

**বিশেষ প্রয়োজনে রাত্রি জাগরণ করার অনুমতি**

রাসূলুল্লাহ (সা.) এশার সালাত আদায়ের পর কথা বলা ও গভীর রাত পর্যন্ত অযথা জেগে থাকতে অপছন্দ করলেও দ্বীনি শিক্ষা, প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং পরিবারের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ত্রুটিমুক্ত বৈধ গল্প করতেন।[১০১]তিনি কখনো কখনো

---

৯৯. *সুনানে দারেমী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৩৫

১০০. *www. Kalerkantho.com,*"টানা আট ঘণ্টা ঘুমানোর অভ্যাসটি স্বাভাবিক নয়", ০৫.০৯.২০১৭ (থেকে উদ্ধৃত)

১০১. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, (অনুবাদ: শায়খ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী), *শামায়েলে তিরমিযী*, ঢাকা: ইমাম পাবলিকেশন্সলি, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৯০,

রাত জাগতেন এবং মুসলমানদের কল্যাণকর পরামর্শের জন্য অনেক সময় রাতে আবু বকর (রা.)-এর বাসায় যেতেন এবং আবু বকর (রা.)ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাসায় আসতেন।[১০২]

সাহাবায়ে কিরাম অনেকেই দিনে পার্থিব কাজে ব্যস্ততা থাকায় অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় বা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় পেতেন না। তাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে কুরআন শরীফ পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কখনো এশার আগে ঘুমাতে এবং এশার পর গল্পগুজব করতে দেখিনি। এশার পর হয়তো যিকিরে মশগুল থাকতেন নতুবা ঘুমিয়ে পড়তেন। এর ফলে সব অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

**ফজর এবং আসরের পর না ঘুমানো**

আল্লাহ তা'আলা দিনকে কাজের জন্য এবং রাতকে ঘুমের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই ফজর হলো দিনের শুরুর অংশ, যা ঘুম থেকে মাত্র জাগ্রত হয়েছে মনে করা হয় এবং আসর হলো দিন শেষ হয়ে রাত্র শুরু হওয়ার প্রস্তুতিমূলক অংশ, যা সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে যাওয়ার পালা। সুতরাং সারা রাত ঘুমিয়ে আবার ফজরের পর ঘুমানো এবং রাত্রে ঘুমিয়ে যাবে জেনেও এর অল্পক্ষণ পূর্বে তথা আসরের পর ঘুমানো এটা একেবারেই নির্বুদ্ধিতার কাজ। কোনো স্বাস্থ্য সচেতন ও জ্ঞানী এই দুই সময় ঘুমানোর চিন্তাও করতে পারে না। পার্থিব কাজের জন্যও ফজরের পর বা দিনের শুরুটা হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ও বরকতময় সময়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ভোরের কাজে বরকত হওয়ার জন্য দু'আ করেছেন। হযরত সখর গামেদি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আ করেছেন- হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরু বরকতময় করুন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো যুদ্ধাভিযানে দিনের শুরুতেই সৈন্য পাঠাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, সখরও তাঁর ব্যবসায়ী কার্যক্রম ভোরবেলা শুরু করতেন। এতে তাঁর ব্যবসায় অনেক উন্নতি হয় এবং তিনি সীমাহীন প্রাচুর্য লাভ করেন।[১০৩] অন্য একটি হাদীসে এসেছে– عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ نَوْمُ اَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقٌ وَ اَوْسَطِهِ خُلُقٌ وَ اٰخِرِهِ حُمْقٌ–

অর্থ: খাওয়াত ইবন যুবায়র বলেন, দিনে প্রথমভাগে শয়ন করা নির্বুদ্ধিতা, মধ্যভাগে শয়ন করা স্বভাবজাত এবং শেষভাগে শয়ন করা অর্বাচীনতা।[১০৪]

সুতরাং সারা রাত ঘুমানোর পরও যদি কেউ নতুন উদ্যমে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে ওঠার পরিবর্তে ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তার রিযিকের দরজা যেন সে নিজেই বন্ধ করে দিল। বাস্তবে দেখা যায়, ফজরের পর ঐ ব্যক্তিই ঘুমায় যে রাত্রে সজাগ থাকে এবং আসরের পর সেই ঘুমাবে যার রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ইচ্ছা নেই। কুরআন-হাদীসের নির্দেশনানুযায়ী যে ইশার নামাযের পরপরই ঘুমিয়ে যায়, ফজর ও আসরের পর তার কখনো ঘুমের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কোনো মানুষ যাতে ইচ্ছাকৃত ফজর ও আসরের পর ঘুমানোর মনোভাব পোষণ করে রাত্রে অযথা সজাগ থেকে শরীর খারাপ না করে, এজন্যই হাদীসে স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এ দু' সময় ঘুমাতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ হাদীসের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে ফজর ও আসরের পর ঘুমায় এতে তার নিজেরই ক্ষতি হবে। কারণ যে ফজরের পর ঘুমায় সে ভোরের নির্মল ও স্নিগ্ধ অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হয়, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরী। যেমন: ভোরের বাতাস হজমশক্তি বাড়ায়, রক্তচাপ ও হার্টবিট স্বাভাবিক রাখে, ফুসফুসকে পরিষ্কার রাখে, বিভিন্ন জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে শরীরের শ্বেত রক্ত কণিকাকে সাহায্য করে এবং সকালের বাতাস আমারদের শরীরে সিরোটনিন নামক হরমোন তৈরি করে সুখি রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া অধিকাংশ ব্যায়ামবিদগণ শরীর সুস্থ রাখতে ভোরে বা সকালে হাঁটার কথা বলে থাকেন। আর সকালে হাঁটায় যে কত উপকারিতা রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

তাছাড়া সকালের মিষ্টি রোদ একজন ব্যক্তির সামগ্রিক শরীরের জন্য খুবই উপযোগী। সকালের রোদ ভিটামিন ডি-তে পরিপূর্ণ থাকে। খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন ডি-এর অভাব পূরণ করা গেলেও আমরা সে পরিমাণ ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাই না। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রায় একশো কোটি লোক ভিটামিন ডি এর অভাবে ভুগছে। কিন্তু সকালের রোদের যে পরিমাণ ডি পাওয়া যায়, সেটি শরীরের জন্য বেশ সহায়ক। বলতে গেলে ভিটামিন ডি অর্জনের একটি সহজ উপায় হলো

---

১০২. *সহীস আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫

১০৩. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, ইন্ডিয়া: মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৩৫০-৩৫১

১০৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, (অনুবাদ: আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৮ (চতুর্থ সংস্করণ), অনুচ্ছেদ: শেষ প্রহরে নিদ্রা, পৃ. ৫৪৮, হাদীস নং- ১২৫৯

সকালের রোদ। বোস্টন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক মাইকেল হলিক বলেন, সূর্যের আলোর ভিটামিন দ্বারা আমাদের দেহের ছয়ভাগের একভাগ জিনোমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ সকালের রোদ আমাদের দেহঘড়ি, মন, মেজাজ সর্বোপরি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু ফজরের পর ঘুমন্ত ব্যক্তি তা কখনো লাভ করতে সক্ষম হয় না।

**সকালের মিষ্টি রোদের কিছু উপকারিতা**

নিম্নে সকালের মিষ্টি রোদের কিছু উপকারিতা তুলে ধরা হলো-

**(ক) শরীরে অনামক্রতা যোগায়:** সকালের সূর্যের আলো শরীরে অনাক্রমতা বা ইমিউন সিস্টেম বৃদ্ধি করে। সকালের রোদে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি থাকে। যা ইমিউন সিস্টেম উন্নত করতে সহায়তা করে। শরীরের কোষের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, শরীরের প্রতিরক্ষা বাড়ায়, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেহকে সুরক্ষিত রাখে। এছাড়াও সকালের সূর্যালোক সহজাত ও অভিযোজিত অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

**(খ) হাড় গঠন:** শরীরের হাড় গঠনের অন্যতম উপাদান হলো ভিটামিন ডি। সকালের সূর্যালোকে ভিটামিন ডি এর উপস্থিতিতে হাড়ে ক্যালসিয়াম যোগায়। যা বাচ্চাদের হাড় গঠনে খুবই সহায়ক। অনেক সময় ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন ডি এর অভাবে বাচ্চাদের হাড় গঠন সঠিকভাবে হয় না বা এর ফলে ভবিষ্যতে নানা রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। নিয়মিত ভিটামিন ডি গ্রহণের ফলে আর্থারিস, অস্টিওপোরোসিস, ফ্র্যাকচার এর মত রোগগুলোর ঝুঁকি কমায়। তাই সকালে অন্তত ১০/১৫ মিনিট রোদ পোহানো উচিত।

**(গ) দৃষ্টিশক্তি উন্নত:** একটা বয়সে এসে চোখের দৃষ্টিশক্তি একেবারে কমে আসে। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এর ফলে এ ঘটনাটি ঘটে। ভিটামিন ডি-৩ ম্যাকুলার ডিজেনারেশন প্রতিরোধ একটি মূল ফ্যাক্টর। সূর্য রশ্মি থেকে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। তাই বয়স্কদের প্রতিদিন অন্তত ১০/১৫ মিনিট রোদ পোহানো উচিত। এতে দৃষ্টিশক্তি দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রখর থাকে। বিশেষ করে সূর্যোদয়ের সময়টা বেশি কার্যকরী।

**(ঘ) শরীরের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি:** সকালে সূর্যালোক শরীরের বিপাক ক্রিয়া বাড়ানোর জন্য দারুণ কার্যকরী। দেহকে সুস্থ রাখতে এবং ওযন নিয়ন্ত্রণ রাখতে সহায়ক করে বিপাক ক্রিয়া। আর বিপাক ক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত করে সকালের সূর্যালোক। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সকালে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মি স্থূলতাদমনেও সহায়তা করে। ভিটামিন ডি অভাব গ্রস্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক ব্যক্তির চেয়ে চর্বি বেশি হয়। তাই স্থুল ব্যক্তি দৈনিক কমপক্ষে ১০/১৫ মিনিট সকালের সূর্যালোকে হাঁটার অভ্যাস করা উচিত। এতে ত্বকে জমে থাকা নাইট্রিক অক্সাইড এর দহনের ফলে চর্বি কমতে শুরু করে। এছাড়া ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সকালের মিষ্টি রোদ সহায়তা করে।

**(ঙ) হাইপার টেনশন থেকে মুক্তি:** যখন কোন ব্যক্তি সকালে সূর্যালোকের মুখোমুখি হয় তখন শরীরে নাইট্রিক অক্সাইড মুক্ত হতে শুরু করে, যা রক্তচাপ কমায় ও কার্ডিওভাসকুলার রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।[১০৫]

**(চ) মন ভালো:** সকাল বেলার সূর্যের আলো সঠিকভাবে গায়ে পড়লে আমাদের শরীরে এন্ডোর্ফিন নামের হরমোন নি:সৃত হয়। এই হরমোনের কারণে আমাদের মেজাজ ভালো থাকে। জানার বিষয় হল, এন্ডার্ফিন হরমোন ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে। ডিপ্রেশন বা অবসাদ কাটাতেও রোদ খুব উপকারী।[১০৬]

এমনিভাবে আসরের পর ঘুমানোও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কারণ আসরের পর সূর্যের কিরণ কমে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় পৃথিবীতে এক ধরনের গ্যাস বের হয়। মানুষের মন মস্তিষ্কের ওপর এর একটা চাপ বা প্রভাব পড়ে। তাই আসরের পর ঘুমালে এর ক্ষতিকর প্রভাবে মানুষ বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلَه فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَه–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আসরের পর নিদ্রা গেল সে তার বুদ্ধি ভোঁতা করে ফেললো। সে যেন তার বুদ্ধি ভোঁতা হওয়ার জন্য নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে দায়ী না করে।[১০৭]

---

১০৫. *https://m.daily-bangladesh.com/health-and-medical.*"সকালের রোদের যত গুণ", ১২.১২.২০১৮ (থেকে উদ্ধৃত)

১০৬. *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, "শরীরে রোদ লাগাবেন কেন"? ০৬.০১.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

১০৭. আবু হাজর মুহাম্মদ সাঈদ ইবন বাসয়ূনী যাগলুল, *মাওসূ'আত আতরাফিল হাদীসিন নাববীশ শরীফ*, লেবাবন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৮, পৃ. ৫৭৫

তবে আসরের পর ক্লান্ত থাকলে অথবা বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন হলে ঘুমানো নিষেধ নয়। কিন্তু সালফে সালহীনের মধ্য থেকে কেউ কেউ বিনা প্রয়োজনে আসরের পর ঘুমানোকে মাকরূহ মনে করতেন। যেমন, ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّنَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ يُخَافُ عَلٰى عَقْلِهِ

অর্থ: আসরের পর ঘুমানো মাকরূহ, এতে বুদ্ধি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা আছে।[১০৮]

**পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো**

কর্মব্যস্ত দিন শেষ করে রাতের বেলায় ঘুমোতে গেলে আমরা মনে করি কোনো মতে শরীরটা বিছানায় রাখলেই হলো, এজন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ সারাদিন কাজ করে যাতে আরামে ঘুমাতে পারে এবং তার এই ঘুমটি যেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক যেসকল দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এর অন্যতম একটি হলো ইসতিঞ্জা করত পাক-পবিত্র হয়ে অযু করে ঘুমানো। হাদীসে এসেছে, হযরত বারাআ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْئَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الاَيْمَنِ–

অর্থ: তোমরা যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন সালাতের অযুর ন্যায় অযু করো। অত:পর ডান কাতে শোয়ে পড়ো।[১০৯]

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيلِ فقَضٰى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ يَعْنِىْ بَالَ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুম থেকে ওঠে প্রস্রাব করার পর হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়েন অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়েন।[১১০]

মানুষ সারাদিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে রাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে চায়। তখন মল-মূত্রের সাধারণ চাপ থাকলেও অনেকে তা উপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়ে এবং জাগ্রত হলে তা সেরে নেবে এই ভেবে এর প্রতি প্রায়ই গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু এই অবহেলা যে শরীরের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর তা আমাদের অনেকেরই অজানা।

আমাদের মূত্রথলি গড়ে ১৫ আউন্স বা ৮ গ্লাস তরল ধরে রাখতে সক্ষম হলেও দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখলে তা মূত্রথলিকে প্রসারিত করে তোলে। যখন মূত্রথলি পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় বলে আমরা টয়লেটে যাওয়ার তাড়না অনুভব করি। ফ্লোরিডার সেন্ট পিটার্সবার্গ এর সানকস্ট মেডিকেল ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. মার্ক গরডন বলেন, স্বাভাবিক প্রস্রাবের হার দিনে ৮-১০ বার।

দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখলে নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে-

**(ক) মূত্রনালির সংক্রমণ:** স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় প্রস্রাব আটকে রাখলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মূত্রনালিকে সংক্রমণ করে তুলে। এই সংক্রমণ ধীরে ধীরে কিডনিতে ছড়িয়ে পড়ায় প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া, জ্বর থাকা এবং প্রচণ্ড বেগ থাকা সত্বেও প্রস্রাব কম হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

**(খ) তীব্র ব্যথা:** দীর্ঘসময় ধরে প্রস্রাব আটকে রাখলে ব্লাডার বা মূত্রথলি ফুলে যেতে পারে। এতে প্রস্রাব করার সময় তীব্র ব্যথা হতে পারে।

**(গ) জ্বর আসা:** দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখলে প্রস্রাবে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া সময় মত বের হতে না পারার কারণে শরীরে জ্বর আসতে পারে।

**(ঘ) মূত্রাশয় ফুলে যাওয়া এবং ক্যান্সার:** পানি পান করার পর শরীর তার চাহিদা পরিমাণ গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট দূষিত পানি মূত্রাশয়ে জমা হতে থাকে। সময় মত এই দূষিত পানি শরীর হতে বের না হলে মূত্রথলি ফুলে যায়। দীর্ঘ দিন এমন বদ অভ্যাসের কারণে মূত্রাশয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে।

---

১০৮. আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, মিশর: কায়রো, দারুল হাদীস, ১৯৯৫ (প্রথম প্রকাশ) খ. ১, পৃ. ৮৪

১০৯. *সহীস আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৩৪

১১০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: নিদ্রা, অনুচ্ছেদ- পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫০৪৩

**(ঙ) কিডনিতে পাথর:** প্রস্রাবে ইউরিয়া এবং অ্যামিনো এসিডের মতো টক্সিক পদার্থ থাকে। বেশিক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখলে এই বিষাক্ত পদার্থগুলো কিডনিতে পৌঁছে কিডনি স্টোনের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

**(চ) সিস্টাইটিস:** এটি একটি সংক্রমণজনিত রোগ, যা মূত্রনালির চারপাশে হয়। বিশেষ করে এটি নারীদের একটি বড় সমস্যা। এটি মূত্রাশয়ের চারপাশের প্রাচীরে প্রদাহ গড়ে তুলে।

**(ছ) তলপেটে ব্যথা:** দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখলে তলপেটে তীব্র থেকে মাঝারি ধরনের ব্যথা হয়।

**(জ) পাকস্থলীর সংক্রমণ:** দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব আটকে থাকলে শুধু তলপেটে ব্যথা নয়, পাকস্থলীতেও সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং ব্লাডারে অসংখ্য জীবাণু উৎপন্ন হয়ে ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন-এর সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডা. চামনদীপ বালি বলেন, দীর্ঘ সময় প্রস্রাব আটকে রাখলে মূত্রথলিটি একটি ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে রূপ নেয়।

তাছাড়া জাগ্রত অবস্থায় মলমূত্রের চাপ অনুভব করলে আমরা তা যথাসময়েই পরিত্যাগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু যানবাহনে চড়লে বা অন্যকোনো কারণে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু বেশি সময় পার হয়ে গেলে শরীর ও মনের ওপর যে কী পরিমাণ স্ট্র্যাচ পড়ে তা সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় অনেকে অসুস্থও হয়ে যায়। ঘুমিয়ে থাকার কারণে আমরা হয়তো মলমূত্রের চাপ এতোটা অনুভব করি না, কিন্তু মস্তিষ্ক ও শরীরে ঠিকই এর চাপ পড়ে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, সাধারণত অবিবাহিত যুবকদের রাত্রে স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। অনেকের অধিক স্বপ্নদোষের কারণে স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। একবার জনৈক যুবক নবী কারীম (সা.)-এর নিকট স্বপ্নদোষের অভিযোগ করলে তিনি তাকে বলেন, ঘুমানোর পূর্বে নিজের গুপ্তাঙ্গ ধৌত করে নেবে।প্রস্রাবের পর স্বভাবতই গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা হয়। সুতরাং প্রস্রাব করত গুপ্তাঙ্গ ধোয়া এই দু'টি আমল স্বপ্নদোষ রোধে খুবই উপাকারি। কেননা প্রস্রাব করার কারণে মূত্রথলি খালি হয়ে যায় আর পানি দ্বারা ধমনীসমূহ ঠান্ডা হয়ে যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ইসতিঞ্জা না সেরে বিছানায় গেলে ঘুমও ভালো হয় না। শুধু তাই নয়, প্রস্রাব করে না ঘুমালে অনেক সময় ঘুমের ঘোরে বিছানায় প্রস্রাব করে দেয়, বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা। এতে অবশিষ্ট রাত্র প্রস্রাবের সাথে শরীর লেগে থাকায় নানা ধরনের চর্মরোগ হতে পারে। পাশাপাশি তোশক মোটা হওয়ার করাণে তা ধৌত করা সম্ভব হয় না। এতে প্রস্রাব লেগে থাকার কারণে পুরো শয়ন কক্ষে সীমাহীন দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। প্রস্রাবের ক্ষতিকর জীবাণু এবং দুর্গন্ধে বাসার সকলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সুতরাং ঘুমের পূর্বে ইসতিঞ্জা করে নিলে হাদীসের ওপর আমল করার পাশাপাশি শারীরিক ক্ষতিসমূহ থেকেও হিফাযত থাকা যাবে। পাক-পবিত্র অবস্থায় অযু করে ঘুমানোর বিষয়ে হাদীসে এসেছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَّبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرٍ فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ–

অর্থ: মুআয ইবন জাবাল (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: যে মুসলমান রাতে পবিত্র অবস্থায় যিকির করতে করতে শয়ন করে। অত:পর ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দুআ করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।[১১১]

হযরত সায়ীদ ইবন আবু উবাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْئَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ–

অর্থ: তোমরা যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন প্রথমে অযু করবে, যেমন সালাতের জন্য অযু কর। অত:পর ডান কাতে শোয়ে পড়বে।[১১২]

হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার আত্মা ঊর্ধ্বাকাশে চলে যায়। অত:পর তাকে মহান আল্লাহর আরশের কাছে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ঘুমায় তার আত্মা

১১১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টারচার (নিদ্রা সম্পর্কীয়), অনুচ্ছেদ- পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫০৪২

১১২. আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, *বযলুল মাজহুদ*, লেবাবন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ১৯, পৃ. ২৮৩

আল্লাহর আরশের কাছেই সিজদা করে। আর যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমায়, তার আত্মা আরশ থেকে দূরে সিজদা করে।[১১৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় ঘুমানোর পূর্বে অযু করে নিতেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এটি খুবই ইতিবাচক একটি দিক। কারণ সারাদিন কল-কারখানা এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্ম করার ফলে হাত-পা এবং মুখসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধুলাবালি ও জীবাণু লেগে থাকে। ঘুমানোর পূর্বে হাত-পা না ধুয়েই শুয়ে পড়লে সারারাত চামড়ায় লেগে থেকে এগুলা অনেক ক্ষতি সাধন করে, যা শরীরের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এছাড়া সারাদিন কাজ কর্ম করলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও বিক্ষিপ্ত ও নির্জীব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ঘুমাতে গেলে ভালো ঘুম হয় না। আর নিয়মিত এভাবে ভালো ঘুম না হলে দিন দিন শরীর খারাপ হতে থাকে। তাই ঘুমানোর পূর্বে অযু করে নিলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পানির ছোঁয়ায় পুনরায় উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং বিছানায় ঘুমাতে গেলে প্রশান্তি ও তৃপ্তিময় ঘুম লাভ হয়।

**আলো নিভিয়ে ও দরজা বন্ধ করে ঘুমানো**

ঘুমের জন্য আল্লাহ তা'আলা রাতকে নির্ধারণ করেছেন।[১১৪] আর রাত মানেই অন্ধকার। সুতরাং স্বাস্থ্যসম্মত এবং উত্তম ঘুমের জন্য যে অন্ধকার প্রয়োজন, তা কুরআন থেকেই বোঝা যায়। অনেকেই বলে থাকে, রাতে আলো না জ্বালিয়ে রাখলে ঘুম আসে না। এটা একেবারেই কুরআন, হাদীস এবং বিজ্ঞান অসমর্থিত একটি কথা; বরং রাতে আলো নিভিয়ে ঘুমালেই ভালো ঘুম হয় এবং শরীর ভাল থাকে। ঘুমানোর জন্য সঠিক অন্ধকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে কিনা তা দেখে নেয়া জরুরী। এজন্য শুয়ে যাওয়ার পর নিজের হাতটা চোখের সামনে নিয়ে দেখতে হবে হাতের আঙুল গণনা করা যাচ্ছে কিনা। যদি না গোনা যায় তবেই ঠিক আছে। রাস্তার আলো ঘুমের কক্ষে প্রবেশ করে যাতে অন্ধকার পরিবেশ নষ্ট না করে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে মোটা পর্দা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া ঘুমের সময় বিভিন্ন চার্জার ও কম্পিউটার-ল্যাপটপ মনিটরের সামান্য আলোও যাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা অন্ধকার ঘর ঘুমের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে এবং ঘুমের সময় আঁধার শরীর থেকে ম্যালাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, যা শান্তিময় ঘুমের সহায়ক।

অন্ধকার কক্ষে ঘুমালে মাথার পিনেয়াল গ্যান্ড থেকে ম্যালাটোনিন নামক যে বিশেষ ধরনের হরমোন নি:সৃত হয়, তা বুদ্ধি বাড়ায় ও মাথা কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দিনের বেলা আলো থাকার কারণে শরীর থেকে ম্যালাটোনিন ক্ষরণ কমে যায়।[১১৫]

ক্যানসার রিসার্চ সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘুমের সময় মৃদু আলো স্তন ক্যানসারের জনপ্রিয় ওষুধ ট্যামোক্সিফেনের কাজে বাধা দেয়। ঘুম নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ম্যালাটোনিনের পর্যাপ্ত উপস্থিতি ছাড়া ক্যানসারের এই ওষুধের কার্যক্ষমতা কমে যায়। এই ম্যালাটোনিন সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে কাজ করতে শুরু করে এবং রাত বাড়তে থাকার সাথে সাথে এই হরমোনের নি:সরণ বাড়ে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, রাতের বেলায় হালকা আলোতেও শরীরে সারকাডিয়ান ক্লক বা দেহ ঘড়ির কার্যক্রমে সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষত টেলিভিশন বা কম্পিউটারের মনিটর বা মোবাইল ফোনের উজ্জ্বল নীল আলো এসব ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিকর। গবেষক দলের সদস্য স্টিভেন হিল বিবিসিকে বলেন- "যারা ক্যানসারে আক্রান্ত এবং ট্যামোক্সিফেন জাতীয় ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের ম্যালাটোনিন সেবন করতে বলছি না (ঘুমের সহায়ক হিসেবে ম্যালাটোনিন বাজারে পাওয়া যায়)। কারণ আমাদের হাতে এখনো ওই রকম কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। কিন্তু সবাইকে অন্ধকার ঘরে ঘুমানোর পরামর্শ দিচ্ছি। প্রয়োজনে চোখের ওপর পট্টি বেঁধেও ঘুমাতে পারেন। কারণ ঘুমানোর আগেই সাধারণত ট্যামোক্সিফেন ওষুধ খাওয়া হয়। আর ম্যালাটোনিন যে ট্যামোক্সিফেনের কাজে ভূমিকা রাখে সেটি প্রমাণিত।"[১১৬] হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَغلِقْ بَابَكَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُّغْلَقًا– وَ اطْفِ مِصْبَاحَكَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَ خَمِّرْ اِنَائَكَ وَ لَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَ اَوْكِ سِقَائَكَ–

---

১১৩. *https://www.bd24live.com/bangla/article*. "মানুষ ঘুমালে তার আত্মা কী করে", ০৮.০৩.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

১১৪.–**وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا** আল-কুরআন, ৭৮: ১০

১১৫. *https://www.prothom alo.com.*"আলোয় ঘুমালে ক্যানসারের ওষুধের কার্যক্ষমতা কমে", ০৪.০২.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

১১৬. *https://www.prothom alo.com.*২৭.০৭.২০১৪ (থেকে উদ্ধৃত)

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি তোমার ঘরের দরজা আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) বন্ধ করবে। কেননা এভাবে দরজা বন্ধ করলে শয়তান তা খুলতে পারে না। আর আল্লাহর নাম নিয়ে বাতি নিভাবে এবং স্বীয় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখবে, যদিও তা এক খণ্ড কাঠ দিয়েও হয়। আর তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার মশকের মুখ বন্ধ রাখবে।[১১৭]

عَن بْنِ عَبَّاس قَالَ جاءَتْ فَارَةُ فَاخَذَتْ تَحرُّ الْفَتِيْلَةَ فَجاءَتْ بِهَا فَالْقَتْهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِىْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضَعِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ اِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِؤُا سُرُجَكُمْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ عَلٰى هٰذَا فَتُحْرِقُكُمْ-

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একটা ইদুর জ্বলন্ত শলতে টেনে এনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেজুর পাতার তৈরি বিছানার উপর রাখে, যার উপর তিনি বসেছিলেন। ফলে বিছানার এক দিরহাম পরিমাণ অংশ পুড়ে যায়। তখন তিনি ইরশাদ করেন: যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের চেরাগগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা, শয়তান এদেরকে (ইদুর ইত্যাদিকে) এ ধরনের কাজের জন্য প্ররোচিত করে, যা তোমাদের পুড়িয়ে দেয়।[১১৮]
হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

وَ اِنَّ الْفُوَيْسِقَةُ تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ اَوْ بُيُوْتَهُمْ-

অর্থ: অধিকাংশ সময় ইঁদুর লোকের ঘর জ্বালানোর কারণ হয়ে থাকে।[১১৯]

উল্লিখিত হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমানোর পূর্বে বাতি নিভিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা বাতি জ্বালিয়ে রাখলে ইঁদুর তা থেকে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। উক্ত হাদীসের আলোকে উলামায়ে কিরাম বলেন- বর্তমান যুগে বৈদ্যুতিক বাল্ব নিভিয়ে ঘুমানো জরুরী। এতে শান্তির নিদ্রা আসবে এবং আলোর কুপ্রভাব থেকে চক্ষু নিরাপদ থাকবে। বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে ঘুমালে তাপ বেশি হয়ে বাল্ব ফেটে ঘর বা গোদামে আগুন লাগারও সম্ভাবনা থাকে না। আজকাল বিদ্যুৎ স্পার্কিং এর কারণে অনেক বাড়ি, শহর এবং মার্কেট পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখা যায়। আর ধোঁয়া হলোপরিপূর্ণ কার্বন গ্যাস মিশ্রিত একটি পদার্থ, কোনো কারণে ধোঁয়ায় কক্ষ ভরে গেলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ করতে পারে। আগুন লাগার কারণে সাজানো একটি পরিবার, বাড়ি, গ্রাম বা শহর মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছারখার হয়ে মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়।

বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগার অন্যতম একটি কারণ হলো রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমানো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের অসতর্কতাও কম দায়ী নয়। অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়ানক দুর্ঘটনা থেকে কিছুটা হলেও পরিত্রাণ পেতে হলে, রাত্রে বাতি নিভিয়ে ঘুমানোর পাশাপাশি রান্না করার পর চুলা জ্বালিয়ে রাখার প্রবণতাও বাদ দিতে হবে। ম্যাচের একটি কাঠি বাঁচানোর জন্য অহেতুক গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিষয় এবং অপচয়ও বটে। এর জন্য আল্লাহর দরবারে অবশ্যই জবাবদিহিতা করতে হবে। তাই রান্না শেষ হলে গ্যাস বা অন্যান্য চুলা সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে দিতে হবে।
উল্লেখ্য, রাত্রে আলো নিভিয়ে ঘুমানোর পাশাপাশি সন্ধ্যা সময় বাচ্চাদেরকে আটকিয়ে রাখা এবং ঘরের দরজা বন্ধ করার বিষয়েও নির্দেশনা রয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوْهُمْ فَاَغْلِقُوا الاَبْوَابَ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا-

অর্থ: জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আটকিয়ে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে তখন

---

১১৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পাত্র ঢেকে রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬৮-১৬৯ , হাদীস নং- ৩৭৩১
১১৮. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: রাতে আগুন নিভিয়ে রাখা, খ. ২, পৃ. ৩৭২, হাদীস নং– ৫২৪৭
১১৯. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পাত্র ঢেকে রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬৯ , হাদীস নং- ৩৭৩২

তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।[১২০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ اكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَ قَالَ مُسَدَّدُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَاِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا اَوْ خَطْفَةً–

অর্থ: জাবির ইবন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এশার সময়, রাবী মুসাদ্দিদ (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাচ্চাদেরকে হিফাযত করবে। কেননা, এ সময় জিনরা ছড়িয়ে পড়ে পড়ে এবং ছোট বাচ্চাদের খোঁচা দেয়।[১২১]

দিন-রাত্রের একটি মিশ্র সময় হলো সন্ধ্যা, এ সময়টি না দিন না রাত। এটি দিন শেষ হয়ে রাতকে বরণ করে নেয়ার সময়। মানুষের মধ্যে যেমন এক শ্রেণির খারাপ লোক রাত বা অন্ধকারকে পাপ কাজের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে, তেমনি জিনদের মধ্যেও এক শ্রেণির দুষ্ট জিন রয়েছে, যারা সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারা রাত মানুষের অনিষ্ট করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে এ সকল জিন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বেশি ক্ষতি করার চেষ্টা করে। তাই হাদীসের ভাষ্য মতে, সন্ধ্যাকালীন সময়ে বাচ্চাদেরকে সতর্কতামূলক ঘরে আটকিয়ে রাখা উচিত, যাতে ঐসব দুষ্ট জিন দ্বারা ছোট বাচ্চারা কোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। কেননা আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, দুষ্ট জিনের কুপ্রভাবে ছোট বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জড়িত। এর অন্যতম কারণ হলো, নিষিদ্ধ সময়ে বাচ্চাদের বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাকদের সচেতনতার অভাব। আধুনিক চিকিৎসকগণ জিন দ্বারা শিশু কিংবা বড়দের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃতি না দিলেও কুরআন-হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে।[১২২]

রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে হাদীসে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা স্বাভাবিক মনে হলেও মানব কল্যাণ সাধনে এতে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। কেননা রাত্রে দরজা বন্ধ না করলে একদিকে যেমন বর্তমান বৈদ্যুতিক যুগের রঙ-বেরঙের বাইরের আলো ঘরে প্রবেশ করার কারণে ভালো ঘুম হবে না, তেমনি অন্ধকারে ঘুমানোর যে উপকারিতা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকেও বঞ্চিত হবে। এছাড়া রাত্রে ঘরের দরজা খোলা রাখলে চোর-ডাকাত, পোকা-মাকড়, সাপ-বিচ্ছু, শেয়াল, কুকুর এবং অন্যান্য বন্য প্রাণি খুব সহজে ঘরে প্রবেশ করে অনেক ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বন্য প্রাণি ও চোর-ডাকাত কোনো কারণে ঘরে না ঢুকলেও দরজা খোলা থাকলে সারা রাত মনের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক বিরাজ করায় রাত্রে ভালো ঘুম হবে না। এতে রাত জেগে থাকার কুফল দিনে ভোগ করতে হবে। এভাবে নিয়মিত চলতে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়া এবং স্বাস্থ্যহানী যে ঘটবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

**শক্ত বিছানায় ঘুমানো**

সারাদিন পরিশ্রম করার পর আমরা সবাই একটা শান্তিময় ঘুমের অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু ঘুমেরও বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। একেকজন একেক ভঙ্গিমা এবং বিছানায় ঘুমায়। বাঁকা হয়ে, কুঁজো হয়ে, গুটিসুটি মেরে, উপুর হয়ে এবং কেউ খুবই নরম বা শক্ত বিছানায় ঘুমাতে ভালোবাসে। তবে মনের মতো যেভাবে ইচ্ছা ঘুমালেই হবে না। বিজ্ঞানী এবং হেলথ এক্সপার্টদের মতে, ঘুম বা প্রাত্যহিক কাজ কর্মে একটু এদিক সেদিক হলেই আমাদের শরীরে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে। বেশির ভাগ মেরুদণ্ড ও পেশিজনিত ব্যথার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের শোয়া ও বসাসহ দৈনন্দিন কাজ কর্মে কিছু অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের কুফল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় শক্ত বিছানায় ঘুমাতেন। এভাবে ঘুমালে শরীর সুস্থ থাকে।

মসজিদে নববীর ভেতরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটা ছোট কক্ষ ছিল। মাঝে মধ্যে তিনি উক্ত কক্ষে বিশ্রাম নিতেন। এ কক্ষে আসবাবপত্র বলতে শুধু একটি পানির কলস এবং একটি বিছানা ছাড়া কিছুই ছিল না। আর বিছানা বলতে এটা খেজুরের ডালের কিছু চাটাই মাত্র। একদিন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই কামরায় প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে খজুরের চাটাইয়ে শায়িত অবস্থায় দেখতে পেলেন, যা তার পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে।[১২৩]

---

১২০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পাত্রসমূহকে ঢেকে রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬০০, ১৬০১, হাদীস নং- ৫৬২৩

১২১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পাত্র ঢেকে রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং-৩৭৩৩

১২২. ড. আবুল মুনযীর খলীল বিন ইবরাহীম আমীন, (অনুবাদ: মুস্তফা আল মাহমুদ), *জ্বীন কেন্দ্রিক অসুস্থতার প্রতিকার*, ঢাকা: বাংলাবাজার, দারুস সালাম বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২৩, ২৪

১২৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৬৯

একবার কয়েকজন সাহাবী মিলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর জন্য নরম ও আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করে দেয়ার আর্জি পেশ করলে তিনি ইরশাদ করেন: দুনিয়ার আরাম আয়েশের কী প্রয়োজন? আমি তো একজন পথিকের মতো, যে বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একটু আরামের জন্য গাছের ছায়ায় বসে, কিছুক্ষণ আরাম করে আবার সে চলতে থাকে।[১২৪]

আরেক স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিছানা বলতে ছিল পাতলা একটা চট। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই কষ্টদায়ক বিছানা লক্ষ্য করে হাফসা (রা.) একবার এক কাজ করে বসলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘুমানোর চট যা সচরাচর দুই ভাঁজ করা হতো, সেটাকে এক রাতে চার ভাঁজ করে দিলেন। হাফসা (রা.) ভেবে ছিলেন এতে নরম বিছানায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘুমের কিছুটা আরাম হবে। বাস্তবেও অপেক্ষাকৃত নরম বিছানার কারণে সেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটু বেশি ঘুমালেন। সকালে তিনি ঘুম থেকে ওঠে জিজ্ঞেস করলেন: বিছানার বিষয়টা কী? হাফসা (রা.) তাঁকে অতিরিক্ত ভাঁজের ব্যাপারটা বললেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মোটেও খুশি হলেন না; বরং নির্দেশ দিলেন: এটাকে আগের মতই করে দিও, এটা গতকাল আমাকে তাহাজ্জুদ পড়া থেকে বিরত রেখেছে।[১২৫] অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ اَدَمَ حَشْوُهُ لِيْفُ–

অর্থ: হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার। আর এর ভেতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের ছাল।[১২৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় লক্ষ্য রাখতেন, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাতে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে না যায় এবং আরামদায়ক নরম বিছানা যেন শরীরের ক্ষতি ও তাহাজ্জুদ সালাতে ওঠার বাধার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

এই ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিছানার অবস্থা, খবুই সাদাসিধে এবং শক্ত ছিল। যদিও আমরা সবাই তুলতুলে নরম বিছানায় ঘুমুতে পছন্দ করি। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যারা একটু ধনী তাদের বিছানা অনেক নরম তোশক বা জাজিম ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। আর পাশ্চাত্য অধিবাসী প্রায় সবাই বিছানায় ফোম বা স্পঞ্জ ব্যবহার করে থাকে, যা বেশি নরম হওয়ায় এর মধ্যে শরীর ঢুকে যায়। কিন্তু ঘুমানোর জন্য মোটামুটি শক্ত বিছানাই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি। আমাদের মেরুদণ্ড কোনো সরল রেখা নয়, এটি একটি বাঁকানো গঠন। সুতরাং নরম তুলতুলে বিছানায় ঘুমালে মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক 'কার্ভ' বা বক্রতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কোমরে ব্যথা হতে পারে। আবার অনেকে পিঠ, ঘাড়, কোমর এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা কমানোর উদ্দেশ্যে শুধু কাঠের উপর বা হার্ডবোর্ড দিয়ে খুব শক্ত বিছানায় দীর্ঘদিন যাবৎ ঘুমায়, এটাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এতে কোমর ব্যথাসহ শরীরের অন্যান্য ব্যথাকে উল্টো বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে উত্তম হলো, হালকা তোশকের সমান বিছানায় ঘুমানো। যা তুলতুলে নরম নয় এবং খুব শক্তও নয়। ইসলাম আমাদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত বিছানা সংক্রান্ত এমন শিক্ষা বহু পূর্বেইদিয়ে গেছে এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও আমল করে তা দেখিয়ে গেছেন।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, পশুর চামড়া কিন্তু ম্যাট্রেস তৈরির উপাদান না এবং চামড়ার বিছানা আরামদায়কও না। আরবরা সাধারণত চামড়া ব্যবহার করতো উট বা ঘোড়ার জিন তৈরিতে। চামড়ার সেই শক্ত বিছানাকে কিছুটা সহনীয় করার জন্য সাহাবীগণ এর ভেতর খেজুর পাতা ভরে দিতেন। আর এমন স্বাস্থ্যসম্মত বিছানাই বিজ্ঞান সমর্থন করে।

উল্লেখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে, ঘুমানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) লুঙ্গি পরিধান করতেন এবং জামা খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন। স্বাস্থ্য রক্ষার বিধান মতে, মানুষ সারাদিন যেসব কাপড়-চোপড় পরিধান করে থাকে তা পরিহিত অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া ঠিক নয়; বরং হালকা ও ঢিলা কাপড় পরিধান করে শয়ন করা উচিত। কারণ গায়ে শক্ত ও আঁটসাঁটকাপড় থাকলে ঘুমের গভীরতা না আসায় ভালো ঘুম হয় না। ইউরোপীয়রা নাইট ড্রেসকে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাস্থ্যসম্মত একটি পোশাক মনে করে গর্ববোধ করলেও আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্ব থেকেই মুসলমানীয় সংস্কৃতিতে রাতের পোশাক হিসেবে লুঙ্গি জাতীয় হালকা-পাতলা এবং ঢিলা-ঢালা পোশাক পরিধানের প্রচলন রয়েছে।

---

১২৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, (অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ), *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা. মার্চ ২০০২, হাদীস নং- ২৩৮০

১২৫. মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, (অনুবাদ: আখতার ফারূক), *সাহাবা চরিত*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ১৩৯

১২৬. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: নবী সা. এর বিছানা, খ. ১, পৃ. ৭২৬, হাদীস নং- ১৭৬১

**ডান কাতে ঘুমানো**

আমাদের হৃদযন্ত্র বাম পার্শ্বে থাকায় বর্তমানে বিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলেন, হৃদযন্ত্রের উপর যেকোনো প্রকারের চাপ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই রাত্রে ঘুমানোর সময়ও এমনভাবে শোয়া, যাতে হৃদযন্ত্রের উপর কোনো ধরনের চাপ না পড়ে। বাম কাতে শয়ন করলে পাকস্থলী ও নাড়ীভূঁড়ির চাপ হার্টের উপর পড়ায় রক্তের প্রবাহ ও হার্টের তৎপরতা হ্রাস পায়, এতে হার্টের অনেক ক্ষতি হয়। ডান কাতে ঘুমানো সম্পর্কে মুম্বাই হাসপাতালের ডা. কৃষ্ণ লাল বর্মা গবেষণা করে বলেন, যেসকল রোগীকে ডান দিকে কাত করে শয়ন করানো হয়েছে, তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছে।[১২৭]

তাই হাদীসে ঘুমানোর সময় ডান কাতে শয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّاَ وَضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الاَيْمَنِ–

অর্থ: বারা ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, তুমি যখন ঘুমাতে যাবে, তখন সালাতের অযুর ন্যায় অযু করবে। এরপর তুমি তোমার ডান কাতে শুয়ে পড়বে।[১২৮] অপর এক হাদীসে এসেছে عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَتَوَسَّدْ يَمِيْنَكَ–

অর্থ: বারা ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)আমাকে বলেন, যখন তুমি পবিত্র অবস্থায় তোমার বিছানায় শুতে যাবে, তখন তুমি তোমার ডান হাতকে বালিশ বানিয়ে নেবে।[১২৯]

এ বিষয়ে আরো বলা হয়, ডান পার্শ্বে শয়ন না করে বাম কাতে নিদ্রা গেলে পাকস্থলী ও নাড়ীভূঁড়ির চাপে হৃৎপিণ্ড ঢেকে থাকায় গভীর ঘুমে অনেক সময় হালকা আঘাত করলেও জ্ঞান ফিরে না, চোখ খোলে না এমনকি অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না। আর এমন সীমাতিরিক্ত ঘুম কোনভাবেই প্রশংসনীয় নয়। পক্ষান্তরে, ডান কাতে ঘুমালে হৃৎপিণ্ড এসব চাপ থেকে মুক্ত থাকায় গভীর ঘুম আসে না, চোখ খোলা সহজ হয়, সূক্ষ্ম আঘাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া সহজ হয়।

যদিও কোন কোন বিজ্ঞানী বাম কাতে শয়ন করাকে শরীরের জন্য উত্তম বলেছেন, তাই এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের আরো বিস্তর গবেষণা করা প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী ডান কাতেই ঘুমানো সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় ডান কাতে ঘুমাতেন। আর সুন্নাতের মাঝেই রয়েছে অসীম রহমত ও বরকত। তবে ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমানোর পরে কেউ যদি পার্শ্ব পরিবর্তন করে তাতে কোন সমস্যা নেই।

**উপুড় হয়ে না ঘুমানো**

বিজ্ঞানীরা ঘুমের সময় বিভিন্ন পজিশনের MRI বা ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং করে দেখেছেন, কাত হয়ে ঘুমালে মস্তিষ্ক যত বেশি বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করতে পারে, উপুড় বা চিত হয়ে ঘুমালে মস্তিষ্ক ততটুকু বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করতে পারে না। তাই উপুড় হয়ে না ঘুমিয়ে কাত হয়ে ঘুমালে মস্তিষ্কের বিভিন্ন রোগ হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞজনরা বলেন, এ কারণেই অধিকাংশ পশু উপুড় হয়ে না ঘুমিয়ে কাত হয়ে ঘুমায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে উপুড় হয়ে ঘুমাতেন না এবং অন্যদেরকেও এভাবে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِىْ قَالَ كَانَ اَبِى مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ فَبَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعُ مِنَ السَّحَرِ عَلٰى بَطْنِى اِذَا رَجُلُ يُحَرِّكُنِىْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ ضَجْعَةُ يَبْغِضُهَا اللهُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

---

১২৭. ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, আল-কাউসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ (সংশোধিত সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ১২২

১২৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার (নিদ্রা সম্পর্কীয়), অনুচ্ছেদ: ঘুমানোর সময় যে দু'আ পড়তে হয়, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫০৪৬

১২৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫০৪৭

অর্থ: তাখফা ইবন কায়স গিফারী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা 'আসহাবে সুফফার' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ... আমার পিতা বলেন, আমি একদিন ভোরের দিকে উপুড় হয়ে মসজিদে শুয়েছিলাম। এসময় এক ব্যক্তি পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিয়ে বলল, এভাবে শয়ন করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। রাবী বলেন, তখন আমি তাকিয়ে দেখি, তিনি হলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)।[১৩০]

অন্য আরেকটি হাদীস তিহফাহ আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা মসজিদের মধ্যে আমাকে উপুড়  হয়ে শোয়ে থাকতে দেখে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বলেন-

مَا لَكَ وَلِهٰذَا النَّوْمِ!هٰذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللهُ، اَوْ يُغْبِضُهَا اللهُ–

অর্থ: তোমার কী হলো! এমনভাবে ঘুমাও কেন? এমন ঘুম তো আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা তথা অপছন্দ করেন।[১৩১]

ঘুমের সময় শোয়ার পজিশনের কারণে বিভিন্ন নিউরোলজিকাল বা স্নায়বিক সমস্যা হতে পারে। ডাক্তারগণ বলেন, উপুড় হয়ে ঘুমালে আলঝেইমার্স ও পারকিনসনসহ বেশকিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমাদের মস্তিষ্ক যদি ঠিক মত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করতে না পারে তবে এই জমা হওয়া বর্জ্য মস্তিষ্কের নার্ভ বা স্নায়ুর ক্ষতি করে। যার পরিণতি হিসেবে আলঝেইমার্স ও পারকিনসনিজম এর মতো রোগ হতে পারে। মানুষের দেহে প্রতিটি অঙ্গের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে লসিকা তন্ত্র বা ফিম্ফেটিক সিস্টেম নেই। মস্তিষ্ক তার বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডকে দিয়ে দেয়। এই ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড পরবর্তীতে মস্তিষ্কের বর্জ্য অপসারণ করে। গবেষকরা এই সিস্টেমের নাম দিয়েছে গ্লিম্ফেটিক সিস্টেম। ধারণা করা হয় এর পিছনে মস্তিষ্কের গ্লিয়াল সেল বড় ভূমিকা পালন করে।

তাছাড়া উপুড় হয়ে ঘুমানের কারণে মানুষের শরীরের অন্ত্র, মেরুদণ্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাসে চাপ পড়ে। এতে মেরুদণ্ড ও অন্ত্র বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেরুদণ্ড আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখে। আর এই স্নায়ুতন্ত্রই শরীরের সকল অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে পুরো শরীর অক্ষম হয়ে পড়তে পারে। আর উপুড় হয়ে ঘুমালে সে ঝুঁকিটাই বাড়ে। তাই বই পড়া এবং মোবাইল-ল্যাপটপও উপুড় হয়ে না
চালানোর জন্য সর্তক করা হয়। উপুড় হয়ে শোয়ার কারণে মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক বাঁক পরিবর্তীত হয়ে ঘাড় ও পিঠে ব্যথা হতে পারে । উপুড় হয়ে ঘুমানের সময় ঘাড় প্রসারিত হয়ে দুই কাঁধ কানের কাছকাছি পৌঁছায় এবং শরীরের সিংহভাগ ভর দুই হাতের ওপর পড়ে। এতে বিভিন্ন হাড়ের জোড়ায় অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। প্রতিদিন এভাবে ঘুমালে ডাক্তারগণ বলেন, দীর্ঘমেয়াদে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

উপুড় হয়ে ঘুমালে পিঠের নিচের অংশে অস্বাভাবিক চাপের ফলে 'সায়াটিকা' রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। পিঠের নিম্নাংশ সমস্যা থেকে কোষ্ঠকাঠিণ্য ও মলত্যাগজনিত অন্যান্য সমস্যাও দেখা দেয়। এছাড়া উপুড় হয়ে ঘুমালে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পেশিগুলোর ওপর শরীরের ভার পড়ে। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস পূর্ণ হতেও বাধা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে শিশুরা যাতে উপুড় হয়ে না ঘুমায় সেদিকে খুবই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ তারা নিজস্ব শ্বাসকে পুনরায় নিশ্বাসের মাধ্যমে নেয়। উপুড় হয়ে ঘুমালে তাদের পুনর্ব্যবহৃত নিশ্বাসে অক্সিজেন কম হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি যুক্ত হওয়ায় এটি ফুসফুসের কার্যকারিতাকে হ্রাস করে দেয়। এতে এসআইডিএস বা হঠাৎ শিশু মৃত্যুর সিন্ড্রোমের ঝুঁকির মুখে পড়ে। সুতরাং উপুড় হয়ে ঘুমানো শিশুর ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে। তাই ডাক্তারদের সাজেশন হলো, মা-বাবা যেন তার সন্তানকে উপুড় হয়ে ঘুমাতে না দেয়। শিশুদের প্রথম বছর উপুড় হয়ে শোয়া বা ঘুমানো অবশ্যই এড়াতে হবে। কারণ এমতাবস্থায় নবজাতক শিশুর শরীর অক্সিজেন পুনরায় সঞ্চালনের যোগ্যতা লাভ করতে পারে না। এতে শিশু উপুড় হয়ে ঘুমালে অত্যধিক কার্বন ডাই অক্সাইড শিশুটির দেহে ফিরে এসে তা মারাত্মক ক্ষতি করে। যদিও প্রথম চার মাস নবজাতক নিজে নিজে উপুড় হওয়ার মত দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

তবে জাগ্রত অবস্থায় দৃঢ় এবং শক্ত পৃষ্ঠের উপর একটি মাদুর রেখে এর উপর শিশুকে উপুড় করে শোয়ানো যায়। কারেন সোকাল গুটিয়ারেজ এম.ডি.এম.পি.এইচ-এর মতে, শিশুদের জেগে থাকা অবস্থায় তাদের উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা দরকার, কারণ এটি তাদের শরীরের সামনের অংশের শক্তি তৈরি করতে এবং ঘুমানোর সময় তাদের আরও ভালো শ্বাস নিতে সহায়তা করে। তবে একাজটির জন্য শিশুকে জোর করা যাবে না। শুরুতে একটানা তিন থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য

১৩০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: উপুর হয়ে শোয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং- ৫০৪০
১৩১. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: উপুড় হয়ে শোয়া নিষিদ্ধ, খ. ৪, পৃ. ২১৪, হাদীস নং- ৩৭২৩

তাকে এই অবস্থায় শোয়ানো। অতঃপর শিশুটি এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠলে ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে তাকে শক্তিশালী করে তোলা।

উপুড় হয়ে শয়ন করলে হজম ও সংশ্লিষ্ট অংশ বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। এর প্রথম চাপ মাথার ওপর পড়ে। তখন মাথার স্নায়ুগুলো নিজস্ব প্রবাহ ও গতি থেকে বিপরীতমুখী হয়ে যাওয়ায় মানুষ ভীতিকর স্বপ্ন দেখে। অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এমন মানুষের জীবনের মোড় বিপরীত দিকে যেতে পারে। ফলে সে উল্টা ও উদ্ভট চিন্তাশীল (পাগলপারার মত) মানুষে পরিণত হয়ে যায়। এমনভাবে শয়ন করাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পাগল হওয়ার কারণ বলেও সতর্ক করেছেন এবং ইমাম গাযযালী (রহ.) উপুড় হয়ে শয়ন করাকে আহমকের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া উপুড় হয়ে শোয়ার দ্বারা মানুষের পাকস্থলী, হজমশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং স্বাস্থ্যের ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে ও হৃদয়ের স্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। হযরত আবু যর (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উপুড় হয়ে ঘুমাতেদেখে তিনি আমাকে পা

দিয়ে ধাক্কা মেরে বললেন–يَا جُنَيْدِبُ! اِنَّمَا هٰذِهِ ضِجْعَةُ اَهْلِ النَّارِ

অর্থ: হে জুনাইদিব! এমন শোয়া তো জাহান্নামীদের শোয়া।[১৩২]

### বেষ্টনীহীন ছাদে না ঘুমানো

স্বাভাবিকভাবে মানুষের ঘুমানোর নির্ধারিত স্থান হলো ঘরের ভেতরে খাট বা চৌকির উপর। ছাদ কখনো ঘুমানোর স্থান হতে পারে না, আর বেষ্টনীহীন ছাদে ঘুমানো তো প্রশ্নই আসে না। সাগরে ভাসমান লঞ্চ বা জাহাজের ছাদ থেকে রাত্রে খোলা আকাশের অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করতে অথবা ঘুমানোর নির্ধারিত জায়গা না থাকায় বাস বা ট্রেনের ছাদে কিংবা শহরে বা গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকলে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে একটু বাতাসের প্রত্যাশায় অথবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক বেষ্টনীহীন ছাদে কাউকে ঘুমানোর অনুমোদন ইসলাম দেয়নি। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَّيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بِرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ–

অর্থ: আলী ইবন শায়বান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন ছাদের উপর শয়ন করে যার বেষ্টনী নেই, তার ওপর থেকে যিম্মাদারী ওঠে যায়।[১৩৩]

প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। সাধারণত ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের কোনো হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। তাই প্রচণ্ড প্রস্রাব-পায়খানার চাপে বা কোনো জীব-জন্তু ও শত্রুর আক্রমণে বা কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে অথবা অন্য যেকোনো কারণে হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে চোখে ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে অন্ধকারে কোন দিশা না পেয়ে বেষ্টনীহীন ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে যে কারোর মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যু না হলেও ছাদ থেকে নিচে পড়ে অন্তত হাত-পা ভাঙ্গার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় রাত্রে অন্যান্য মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় আহত ব্যক্তির খবর পাবে না, সেখানেই পড়ে কাতরাতে থাকবে। এছাড়া কোনভাবে খরব পেলেও এ রাতে তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা দেয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও বটে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব কল্যাণ সাধনে বিশ্ববাসীকে ঘুমের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক এমন নির্দেশনা প্রদান করে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

### অধিক ঘুম একটি রোগ

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল স্লিপিং ফাউন্ডেশন তাঁদের একটি গবেষণায় বলেছে, ১৮ থেকে ৬৪ বছর বয়সী একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য দিনে ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শন ইয়ংস্ট্যাডস ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে বলেছেন, সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন যা-ই হোক, ৭ ঘণ্টার বেশি ঘুমানো ঠিক নয়। বাস্তবে মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্য ৭ ঘণ্টা ঘুমই পর্যাপ্ত। কারও কাছে যদি মনে হয়, ৭ ঘণ্টা ঘুম একটু কম হয়ে যাচ্ছে বা মাথা ঘুরাচ্ছে, তাহলে

১৩২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৪, হাদীস নং- ৩৭২৪
১৩৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার (নিদ্রা সম্পর্কীয়), অনুচ্ছেদ: এমন ছাদে শয়ন করা, যেখানে বেষ্টনী নেই, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং– ৫০৪১

বিশেষজ্ঞরা তাকে আরও ১ ঘণ্টা ঘুমানোর অনুমতি দেন, কিন্তু কোনোভাবেই এর বেশি নয়। কিন্তু এটা যদি ৮ ঘণ্টা পার হয়ে ৯-১০ ঘণ্টা কিংবা এর চেয়েও বেশি হয়ে যায়, তবে সেটা অতিরিক্ত ঘুমের মধ্যে গণ্য হবে। এই অতিরিক্ত ঘুম শরীর সুস্থ রাখার পরিবর্তে শরীরকে আরো নষ্ট করে ফেলে। কারণ সেটা তখন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ঘুমানোর আদর্শ সময়সীমার মধ্যে থাকে না। যদি প্রায় প্রতিদিনই ৯ ঘণ্টার বেশি ঘুমানো হয়, তখন সেটিকে অতিরিক্ত ঘুম বলা হবে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে Hypersomnia (হাইপারসোমনিয়া) রোগ বলা হয়।[১৩৪]

**অতিরিক্ত ঘুমানোর কারণ**

(১) আমাদের দেশের মহিলারা সাধারণত আয়রনের অভাবে বেশি ঘুমায়।

(২) যাদের ওযন বেশি তাদের ঘুম বেশি হয়।

(৩) যেসব মানুষ রাতের বেলায় নির্ধারিত সময়ে ঘুমায় না তারা সাধারণত দিনে অনেক বেশি সময় ঘুমায়।

(৪) পারকিনসন্স, এনকেফালাইটিস, এলজেইমার্স (মস্তিষ্কের ব্যাধি, যা স্মৃতিশক্তির ওপর প্রভাব পড়ে), হাইড্রোসেফালাস সাধারণত এসকল রোগীরা বেশি ঘুমায়।

(৫) দীর্ঘমেয়াদী অবসন্নতায় আক্রান্ত রোগীরা অতিরিক্ত ঘুমায়।

(৬) ফাইব্রোমায়েলজিইয়ার রোগীরা অতিরিক্ত ঘুমায়।

(৭) অনেক সময় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে অতিরিক্ত ঘুম আসে।

(৮) এলকোহল সেবনের কারণেও অতিরিক্ত ঘুম হয়।

**অতিরিক্ত ঘুমের কুফল**

পর্যাপ্ত ঘুম স্বাস্থ্যের জন্য যেমন উপকারী, তেমনি অতিরিক্ত ঘুম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। যেমন-

**(১) ডায়াবেটিস:** যাদের ঘুম আদর্শ সময়ের চেয়ে কম বা বেশি হয়, তাদের শরীরের গ্লুকোজের অসাম্যতার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই যাদের ঘুম আদর্শ সময় মতো হয় না, তাদের ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা ২০% বেশি থাকে এবং যারা সবসময় পরিমাণের চেয়ে রাতে বেশি ঘুমায় কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় কম ঘুমায় অন্যদের চেয়ে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি হয়ে থাকে।

**(২) ওযন বৃদ্ধি:** অতিরিক্ত ঘুম ওযন বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। দিনে ৯ থেকে ১০ ঘন্টা ঘুমানো একজন মানুষের ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুমানো মানুষের চেয়ে ৬ বছরে ২১% ওযন বৃদ্ধি পায়।

**(৩) মাথা ও পিঠব্যথা:** দীর্ঘ সময় ধরে শরীরের কোন নড়াচড়া না হলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যথার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পিঠের ব্যথা প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। লম্বা সময় ধরে সঠিক নিয়মে না শুয়ে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতিকর। অনেক সময় অতিরিক্ত ঘুমানের জন্য মাথাব্যথাও সৃষ্টি হয়।

**(৪) মানসিক ভারসাম্যহীনতা:** অতিরিক্ত ঘুম নির্দিষ্ট ঘুমকে নষ্ট করে দেয়। দিনে বেশি ঘুমালে রাতে ভালো ঘুম হয় না এবং প্রতিনিয়ত রাত জাগা ব্যক্তিকে ক্রমে হতাশার দিকে ঠেলে দিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন করে তুলে।

**(৫) হার্টে সমস্যা:** অতিরিক্ত ঘুমের কারণে হার্টে সমস্যা দেখা দিতে পারে। যারা দিনে ৮ ঘন্টার বেশি ঘুমায় সাধারণের চেয়ে তাদের অ্যাজাইনায় (হৃদযন্ত্রে রক্তের প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে যে ব্যথা অনুভূত হয়) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ থাকে এবং অন্যান্য হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১০% বেড়ে যায়। 'দ্য নার্সেস হেলথ স্টাডি' ৭২ হাজার নারীর ওপর গবেষণা করে দেখেছে ৯ থেকে ১১ ঘণ্টা ঘুমানো একজন নারী সাধারণ নারীর তুলনায় ৩৮% বেশি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

**(৬) স্ট্রোক:** ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১১ বছরের বেশি বয়সী এমন ৯,৭০০ ইউরোপীয় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে দেখতে পায়, যারা দিনে ৮ ঘন্টার বেশি ঘুমায় তাদের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৪৬% বেড়ে যায়।

**(৭) স্মৃতিশক্তি লোপ:** ঘুমের ভেতরে মানুষের স্মৃতিশক্তি তৈরি হয় বিশেষ করে হালকা ঘুমের সময়। কিন্তু একটানা দীর্ঘ ঘুম সে প্রতিক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করে অর্থাৎ অতিরিক্ত ঘুম স্মৃতিশক্তিকেও ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বাস্তবেও দেখা যায়, অতিরিক্ত ঘুমানোব্যক্তি দৈনন্দিন কাজের সিডিউল মনে রাখতে পারে না, খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। তাই অতিরিক্ত ঘুমের চাহিদা যত বেশি হবে, স্মৃতিশক্তিও তত লোপ পাবে।

---

১৩৪. *www.prothomalo.com,* "অতিরিক্ত ঘুম কেন ভালো নয়", ২৫.০১.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

**(৮) মৃত্যু ঝুঁকি ও অন্যান্য:** রাতে ৯ থেকে ১১ ঘণ্টা ঘুমানোদের মৃত্যুহার সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। অতিমাত্রায় নিদ্রা গমন করলে শরীরে শক্তি থাকে না। অবসাদ, ক্লান্তি ও দুর্বলতা আসে। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে ক্ষতি হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় কাজেও ঘাটতি দেখা দেয়। অতিরিক্ত ঘুমের কারণে মৃগী রোগ, যৌন রোগ, হিস্টিরিয়াস, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি দেখা দেয় এবং চোখের পাত ফুলে যায়।এছাড়াও অতিরিক্ত ঘুমানোর কারণে শারীরিক বৈকল্য, বিষণ্নতা, অতিরিক্ত প্রদাহ এবং প্রজনন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

অনেকে অনিদ্রা দূর করতে এবং অতিরিক্ত ঘুমানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ঘুমের ওষুধ সেবন করে থাকে। মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হয়েছে, ওষুধ খেয়ে যে ঘুম হয় এতে কখনো গভীর নিদ্রা হয় না। কারণ স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের ঘুমের মধ্যে যতোটা প্রশান্ত থাকে তা ওষুধ খেয়ে হয় না। কাজেই ওষুধ খেয়ে ঘুমানো ব্যক্তি স্বাভাবিক ঘুমের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়।

**অতিরিক্ত ঘুম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়**

* কখন ঘুম থেকে ওঠা জরুরি এর ওপর ভিত্তি করে ১/২টি অ্যালার্ম ঠিক করে রাখা। প্রতিদিন একই সময় ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করা।

* অ্যালার্ম ঘড়িটি হাতের কাছ থেকে একটু দূরে রাখা। এতে অ্যালার্ম বন্ধ করার জন্য হলেও বিছানা ছেড়ে ওঠতে হবে। যখন অ্যালার্ম বাজবে তখনই ওঠে পড়া, নতুবা ৫ মিনিট বেশি ঘুমানোর জন্য ১ ঘন্টা দেরি হয়ে যেতে পারে।

* খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে অনেকেই নাস্তা করতে চায় না। বলা হয়, যদি ঘুম থেকে ওঠার ৩০ মিনিটের মধ্যে সকালের নাস্তা সেরে ফেলা যায়, তাহলে সারাদিনের জন্য কিছু বাড়তি শক্তি পাওয়া যায়, যা রাতে ভালো মতো ঘুমাতেও সাহায্য করে।

* প্রতিদিন রাতে ১ ঘন্টা সময়ের ব্যবধানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করা।

* সাধারণত সপ্তাহের বন্ধের দিন আমরা একটু বেশি ঘুমাই। এই অভ্যাসটি না করাই ভালো। কারণ এটি নিয়মিত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

* নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। এটি শরীর ও মন ভালো রাখতে সাহায্য করে।

* সকালের সূর্য দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা।

* কোন প্রকার দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীর মধ্যে থাকলে এর আসল কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধান করা। কারণ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী মানুষকে ঠিকমতো ঘুমাতে দেয় না। ফলে ঘুমের সিডিউলের ঠিক থাকে না।

উল্লিখিত বিষয়গুলো অতিরিক্ত ঘুমানোর অভ্যাস থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় বলা হলেও সবচেয়ে বড় কথা হলো, এক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাশক্তিই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। এই বদভ্যাস ত্যাগে নিজে উদ্যোগী না হলে, অন্য কেউই সাহায্য করতে পারবে না।

সুতরাং কুরআন-হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অতিরিক্ত ঘুমের বদভ্যাস ইসলাম ধর্মও সমর্থন করে না এবং মানুষ যাতে অতিরিক্ত ঘুমে অভ্যস্থ হয়ে না পড়ে সেজন্য ঘুম এবং আমল সর্ম্পকে এমন কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা অনুসরণ করলে একজন মানুষ ইচ্ছা করলেও অতিরিক্ত ঘুমের সুযোগ পাবে না। অতিরিক্ত ঘুমের অন্যতম কারণ হলো রাত্রে সময় মতো ঘুমাতে না যাওয়া। ফলে রাতের এই ঘুম সারাদিনেও ঘুমিয়ে পোষানো যায় না। এভাবে দিনে বেশি ঘুমাতে ঘুমাতে একসময় অতিরিক্ত ঘুমের অভ্যাস গড়ে ওঠে। তাই প্রতিটি মানুষ যাতে ঘুমের জন্য রাতকে নির্ধারণ করে, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا–

অর্থ: আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ এবং নিদ্রাকে আরামপ্রদ করেছেন এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়।[১৩৫]

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ–

অর্থ: আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১৩৬]

---

১৩৫. আল-কুরআন, ২৫: ৪৭

১৩৬. আল-কুরআন, ৪০: ৬১

বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই অনেকে রাত্রে অনর্থক গল্প-গুজব করে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে লাগামহীনভাবে দিনে অতিরিক্ত ঘুমিয়ে থাকে। ইসলাম এমন ঘুম মোটেও পছন্দ করে না। কারণ রাত জাগার কারণে সকালে ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব হয় না।

লক্ষ্যণীয়, কোনো মুসলমান যদি সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে এবং হাদীসে বর্ণিত ঘুমের নিষিদ্ধ সময়ে না ঘুমায়, তাহলে তার দ্বারা অতিরিক্ত ঘুম কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাসবীহ আদায় করো, যখন সন্ধ্যায় (মাগরিব ও ইশার সালাত দ্বারা) উপনীত হবে এবং সকালে (ফযর সালাত দ্বারা) ওঠবে। আর অপরাহ্নে (আসর সালাত দ্বারা) এবং যোহরের সময়ে। আর আসমান ও যমিনে সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।[১৩৭]

সাধারণত একজন মানুষ অতিরিক্ত ঘুমানোর জন্য নিরিবিছিন্নভাবে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ইসলামী অনুশাসন বা যথাযথ আমল করলে সে সময়টুকুই পাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ একজন মুসলমানের রাত্রে এশার সালাতের পূর্বে ঘুমানোর সুযোগ নেই এবং ফযরের সালাত আদায়ের জন্য তাকে সুবেহ সাদিকের পরেও ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নেই। আর দিনকে যে আল্লাহ তাআলা জীবিকা উপার্জনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা তো পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

অর্থ: আর দিনকে বানিয়েছি তোমাদের কাজের জন্য।[১৩৮]
সুতরাং কাজকর্ম বাদ দিয়ে দিনে অতিরিক্ত ঘুমিয়ে শরীরকে নষ্ট করা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না।

**ঘুমানোর সময় দুআ পড়া**

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণির ঘুমের জন্য কোনো ধরনের নিয়ম-কানুন, আয়োজন বাদু'আ-দুরূদের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই এরা পশু-পাখি। কিন্তু মানুষ তো আর পশু-পাখি নয় যে এদের মতো ঘুমিয়ে কিংবা না ঘুমিয়ে কোনোক্রমে রাত কাটিয়ে দেবে। বরং একটু তৃপ্তি ও সুখময় ঘুমের জন্য আয়োজনের শেষ নেই। মূলত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই রাত্রে তৃপ্তির ঘুম ঘুমায়। তবে অনেকেই দু:শ্চিন্তার কারণে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সেবন করেও সারা রাতঘুমোতে পারে না। রাত্রে ঘুমানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঘুমোতে না পারা যে কতো কষ্টের তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানেঅন্য কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়, আর তখনই উপলব্ধি হয় ঘুম আল্লাহ তা'আলার কতো বড় নিয়ামত।

মূলত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই রাত্রে তৃপ্তির ঘুম ঘুমায়। আমাদের সমাজে দেখা যায়, অনেকের ঘুমের তেমন কোনো ব্যক্তিগত কক্ষ বা পরিবেশ নেই, তবুও তাদের ঘুমের শেষ নেই। তারা এশার নামায আদায় করে ঘুমায়, আরেকবার ফজরের সময় ওঠে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা রাত্রে ঘুমাতে পারে না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রাত্রে সাধারণত তারাই ঘুমাতে পারে না যারা অধিক টেনশন করে, অথচ সকল কাজ মাগরিবের আগেই সম্পন্ন করে রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে ঘুমানোর জন্য সে সারাদিন পেয়েছিল। কিন্তু কিছু অতি লোভী নির্বোধ মানুষ তা না করে সারাদিনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা বা দিনের বেলায় ঘটে যাওয়া দুনিয়ার হাজারো বিষয়ের হিসাব-নিকাশ রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অথবা শুয়ে শুয়ে মিলাতে থাকে এবং আগামী দিন কী করবে, কোথায় যাবে, কোন প্রোগ্রামে কী বলবে, কার সাথে কেমন আচরণ করবে অথবা কার কতটুকু ক্ষতি করবে এজাতীয় নানা ধরণের ফন্দি আঁটতে থাকে। সে আগামী দিনের কাজ বাস্তবায়নের জন্য সারাদিন পাবে জেনেও অযথা পেরেশানী ও টেনশনে রাত্রে আর ঘুমাতে পারে না। এক সময় দেখা যায় ব্যক্তি জীবনে এটি বদ অভ্যাসে পরিণত হয়। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ রাত্রে না ঘুমানোর কারণে আস্তে আস্তে শরীর ভেঙ্গে যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশেষে শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অথচ অসংখ্য টেনশন করে যে লোকটি গত রাত ভালোভাবে ঘুমোতে পারেনি, তার নিজেরই জানা নাই আগামীকাল সে এ পৃথিবীর ভোরের আলো দেখতে পাবে কিনা। মৃত্যু যেকোন সময় এসে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَعَةً وَّ وَ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

অর্থ: যখন তাদের মৃত্যুর সময় আসবে তখন এক মুহূর্ত আগেও করা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও করা হবে না।[১৩৯]

১৩৭. আল-কুরআন, ৩০: ১৭-১৮
১৩৮. আল-কুরআন, ৭৮: ১০-১১
১৩৯. আল-কুরআন, ৭: ৩৪

ঘুম হচ্ছে জাগরণ ও মৃত্যুর মাঝামাঝি একটা অবস্থা। তাই বলা হয়–اَلنَّوْمُ اَخُ الْمَوْتِ অর্থাৎ ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই। মৃত্যুর সাথে ঘুমের যথেষ্ট মিল থাকায় একে মৃত্যুর ভাই বলা হয়ে থাকে। রাতের ঘুমও এক ধরনের মৃত্যু। কেননা ঘুমের মধ্যে মানুষ দুনিয়াবি সম্পর্কে একদম বেখবর থাকে। এ জাতীয় বহু ঘটনা রয়েছে যে, মানুষ ঘুমিয়েছে কিন্তু আর জেগে ওঠেনি এই ঘুমই শেষ ঘুম। সুতরাং জানা নেই আগামী দিনের সাক্ষাত লাভ হবে কিনা। মুমিনের কর্তব্য হলো ঘুমাতে যাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ ওয়ালাগণ বলেন, আগামী দিনটি আসার পূর্বেই পাপ-পূণ্যের হিসাব মিলিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে দিনভর কৃত গুনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় আল্লাহ তাআলার দরবারে খুব বেশি তাওবা-ইসতিগফার করা এবং হাদীসে বর্ণিত উপযোগী মাসনুন দুআগুলো পাঠ করে নেয়া উচিত। নিম্নে হাদীসে বর্ণিত ঘুমানোর সময় কিছু মাসনুন দুআ উল্লেখ করা হলো-

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ–

অর্থ: নবী করীম (সা.)-এর স্ত্রী হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে তিনবার পড়তেন– اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরায় জীবিত করে ওঠাবেন, সেদিন আপনার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবেন।[১৪০]

হযরত বারা ইবন আযিব (রা.) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, তুমি যখন ঘুমাতে যাবে তখন নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে। এরপর তুমি তোমার ডান পাশে শুয়ে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَ اَلْجَاتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَ رَغْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَلْجَأَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَ نَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ– قَالَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ –

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমাকে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম, আমার সব কাজ আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম, আমি আপনার ওপর ভরসা করলাম, শাস্তির ভয়ে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায়। আপনার থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, আপনারকাছে ছাড়া।আমি ঈমান আনলাম আপনার কিতাবের ওপর যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবীর ওপর যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এ অবস্থায় যদি তুমি মারা যাও, তবে স্বভাব ধর্ম ইসলামের ওপর মারা যাবে।[১৪১]

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَّ اٰوَانَا نَافَكَمْ مِمَّنْ لاَّ كَافِىْ لَهُ وَ لاَ مُؤْدِىَ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন নিজের বিছানায় শয়ন করতেন, তখন এরূপ বলতেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এমন অনেকেই আছে, যার কেউ নেই এবং কোনো আশ্রয়দাতা নেই।[১৪২]

عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَذَا اَخَذَ مَضْجِعَهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَ اٰوَانِىْ وَ اَطْعَمَنِىْ وَ اَسْقَانِىْ وَ الَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ فَاَفْضَلَ وَ لاَدِىْ اَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَلْيْىءٍ وَّ مَلِيْكَهُ وَ اِلٰهَ كُلِّ شَيْىءٍ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ–

১৪০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার (নিদ্রা সম্পর্কীয়), অনুচ্ছেদ: ঘুমানোর সময় যে দু'আ পড়তে হয়, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫০৪৫

১৪১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫০৪৬

১৪২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৭, হাদীস নং- ৫০৫৩

অর্থ: ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন শয়ন করতেন, তখন নিচের দুআটি পড়তেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আমাকে খাওয়ান এবং পান কারন। আপনি আমার ওপর সবচেয়ে বড় ইহসান করেছেন। আপনি আমাকে অনেক কিছু দান করেছেন। সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আপনি সবকিছুর প্রতিপালনকারী, সবকিছুর মালিক এবং সবকিছুর ইলাহ। আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।[১৪৩]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَن اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَّمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَّوْمَ الْقِيمَةِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় আল্লাহর যিকির করে না, কিয়ামতের দিন এজন্য সে আফসোস করবে।[১৪৪]

ঘুমের আরেকটি সংক্ষিপ্ত দু'আ হলো–اَللّٰهُمَّ بِسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং আপনার নামের বদৌলতেই জাগ্রত হবো।[১৪৫]
সাধারণত আমরা সংক্ষেপে এই দুআটি পাঠ করলেও উপরোল্লিখিত দুআসমূহ ছাড়াও ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক এবং নাস পাঠসহ আরো অনেক দুআ ও যিকিরের কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় মনোযোগের সাথে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করে এসকল দুআ, দুরূদ, যিকির ও সূরাসমূহ পাঠ করবে স্বভাবতই তার মধ্যে কোনো চিন্তা ও পেরেশানী থাকবে না।
আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই একজন মানুষ যাতে নিয়মিত প্রত্যেক রাত্রে নিশ্চিন্তে আরামের সাথে ঘুমিয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে এবং অযথা ঘুমের ওষুধ সেবন করে নিজেকে যেন তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয়, ইসলাম ধর্ম ঘুমানোর সময় দুআসহ অন্যান্য আমল করার দ্বারা সে ব্যবস্থাটিই করেছে।

**ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ পড়া**

মানুষ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাদীসে বর্ণিত অর্থবোধক দু'আসমূহ পাঠ করবে, স্বভাবতই তার দ্বারা দিনে কোনো ধরনের খারাপ কাজ সংগঠিত হওয়ার কথা নয়। যখন কোনো পাপ কাজ করতে যাবে মনে বাধা দেবে যে আমি তো রাত্রে ঘুমের মধ্যে মৃত ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমাকে জীবিত না করে মৃত অবস্থায় রাখতে পারতেন। ফলে আমার দ্বারা সৎকর্ম বা পাপাচার কোনোটিই করার সুযোগ ছিল না। মূলত এসব দু'আ দ্বারা এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে মৃত দেহে আত্মা ফিরিয়ে দিয়ে নতুন জীবন দান করে আমাকে আরো একটি দিন বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছেন। এতে আমার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। সুতরাং একজন মানুষ যখন দিনের শুরুতেই এমন মনোভাব নিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ধর্ম বহির্ভূত কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে নিয়ন্ত্রিত জীবন পরিচালনা করে তখন তার জীবন অর্থবহ, পূত-পবিত্র ও নির্মল হয়ে থাকে। আর নিয়ন্ত্রিত ও পাপাচার মুক্ত জীবন মানেই হাজারো ফিৎনা-ফাসাদ ও রোগ-শোক হতে হিফাযত থেকে অনাবিল সুখ ও শান্তিময় জীবন পরিচালনা করা। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রতিদিন এসকল দু'আসমূহ পাঠের মাধ্যমে মানব জীবন সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে সে ব্যবস্থাটিই ইসলাম ধর্ম করে দিয়েছে। দু'আসমূহ হলো-

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا نَامَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيٰى وَ اَمُوْتُ وَ اِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ–

অর্থ: হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন ঘুমোতে যেতেন, তখন বলতেন-হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম নিয়ে জাগ্রত হই এবং শয়ন করি। আর তিনি (সা.) যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে নিদ্রারূপ মৃত্যুর পর জীবিত করলেন, আর তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।[১৪৬]

---

১৪৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৮, হাদীস নং- ৫০৫৮
১৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৮, হাদীস নং- ৫০৫৯
১৪৫. *শামায়েলে তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
১৪৬.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার (নিদ্রা সম্পর্কীয়), অনুচ্ছেদ: ঘুমানোর সময় যে দু'আ পড়তে হয়, খ. ২,

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন এই দুআ পাঠ করবে–اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَ عَافَانِىْ فِى جَسَدِىْ وَ اَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهِ–

অর্থ: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার আত্মা আমার দেহে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার দেহকে আরাম দিয়েছেন এবং আমাকে স্বীয় রিযিকের তাওফীক দিয়েছেন।[১৪৭]

সবশেষে বলা যায়, মানব জীবনে সুখ-শান্তি ও প্রকৃত সফলতা অর্জনের জন্য কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ঘুমের কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রকৃত সুখী হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। আর কোনো অসুস্থ ব্যক্তি কখনো সুখী হতে পারে না।সুতরাং যখন থেকে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুস্থ-স্বাভাবিক ঘুমের নির্দেশাবলী মানুষ লঙ্ঘন করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই মানুষ অগণিত রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘুম বিশেষজ্ঞ Dr. Charles Czeislerবলেন- ঘুম হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এবং উপকারি ওষুধের নাম। একজন মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের জন্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘুমানো, রাতে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ঘুমানো, দুপুরের পর কিছুক্ষণ ঘুমানো এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত দু'বার ঘুমানো উচিত।[১৪৮]

**স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিবাহ**

বিবাহ মহান আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নিয়ামত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। ঈমানের পূর্ণতার সহায়ক। চারিত্রিক আত্মরক্ষার অনুপম হাতিয়ার। যুবক-যুবতীর চরিত্র গঠনের অন্যতম উপাদান। আদর্শ পরিবার গঠন, মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ হচ্ছে বিবাহ। যা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা। এ চাহিদা পূরণার্থেই ইসলামী শরীয়ত বিবাহের হুকুম আরোপ করেছে। মানবজাতিকে যিনার মতো অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করতে বৈধভাবে যৌন চাহিদা পূরণের জন্যই মহান রাব্বুল আলামীন বিবাহের নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সামর্থ্যবান হলে কালবিলম্ব না করে বিবাহ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। বিয়ে শুধু জৈবিক চাহিদাই নয়, বরং একটি মহান ইবাদতও বটে। বিবাহ দ্বারা ইহ ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। বিবাহ মানুষকে পরিশীলিত, মার্জিত এবং পবিত্র করে তোলে। আদর্শ পরিবার গঠন, জৈবিক চাহিদা পূরণ, মানসিক প্রশান্তি ও মানব বংশ বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হলো বিবাহ। বিবাহ করার প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উৎসাহ প্রদান করেছেন।

বিবাহ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং প্রত্যেক জাতি ও ধর্মেই নারী-পুরুষের বিবাহের ব্যাপারটি আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়। বিবাহকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষ উভয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের নতুন পথ চলা শুরু হয়। বলা যায়, একজন নারী ও পুরুষের জীবনে বিবাহের দিনটি হলো মাহেন্দ্রক্ষণ, যার জন্য দীর্ঘদিন মনের মণিকোঠায় যে রঙিন স্বপ্ন লালন করে আসছে তা বাস্তবে রূপ দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে, ত্বক পরিষ্কার রাখতে, হৃৎপিণ্ড সুস্থ ও মেজাজ হালকা রাখতে বিবাহের মাধ্যমে নিয়মিত বৈধ যৌন মিলন খুবই প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মানসিক স্বাস্থ্য বিশেশজ্ঞ এমনটাই পরামর্শ দিয়েছেন। যৌন স্বাস্থ্য বিষয়কগণ বলেন- পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন মিলনের ফলে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন নি:সরিত হয়, যা মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। যৌন মিলনের সময় দেহের মধ্যে যেপ্রচুর পরিমাণ নড়া-চড়া হয়, তা দেহ ও মনের জন্য বিস্ময়কর উপকারী ফল দেয়। কারণ যৌন মিলনের সময় দু'জন মানব-মানবী পরস্পরের প্রতি যে আস্থা, ভালোবাসা এবং অনুরাগ অনুভব করেন তা স্বাস্থ্য ভাল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ، فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ، ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا–

অর্থ: আর সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের জন্য বৈধ মন:পুত হয় তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই;

পৃ. ৩৪৬,৩৪৭, হাদীস নং- ৫০৪৯

১৪৭ . মুহাম্মদ ইবন আলী যাগলুল ইবয়ানী, *আল-মাওসূ'আতুল কুবরা*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২০, পৃ. ৩৪৯,

১৪৮. *www.kalerkantho.com,* " টানা আট ঘণ্টা ঘুমানোর অভ্যাসটি স্বাভাবিক নয়", ০৫.১২.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীদেরকে (তাও শরীয়তের বিধি মোতাবেক)। এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।[১৪৯]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংবরণকারী এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী।[১৫০]

যৌন মিলনের ফলে দেহে যেসব হরমোন নি:সরিত হয়, সেগুলো মানসিক চাপ লাঘবে সহায়তা করে। আর অ্যান্ডোরফিন বিশেষ করে এটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট বা মানসিক অবসাদরোধী হিসেবে কাজ করে। ভালবাসার হরমোন নামে পরিচিত অক্সিটোসিন পরস্পরের মাঝে ভালবাসা এবং আস্থার অনুভূতি সৃষ্টি করে। অক্সিটোসিন হরমোন নি:সরণের ফলে যে ভালবাসা ও অনুরাগ সৃষ্টি করে তা আবার দু'টি জিনিসের নি:সরণ ঘটায়। অ্যান্ডোরফিন নামে স্নায়ুরস এবং সেরোটোনিন নামের হরমোন। দু'টিই ত্বকের জন্য বিস্ময়করভাবে উপকারী।

অ্যান্ডোরফিন নতুন ত্বক কোষ এবং প্রাকৃতিক কোলাজেন উৎপাদনে সহায়ক। যা ত্বকের বলি রেখা, ব্রণ ও মেছতার দাগ দূর করে। এটি ইমিউনোগ্লোবিন নামের একটি অ্যান্টিবডি নি:সরণের কাজ করে। যা সাদা ফুসকুড়ি, অ্যাকজিমা, সোরিয়াসিস এবং ব্রণ দূরীকরণে সহায়ক। আর চূড়ান্ত যৌন সুখানুভূতি লাভের সময় সেরোটোনিন নি:সরিত হয়, যা দেহ মনে সুখের ঢেউ তোলে এবং যেকোন ধরনের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ দূর করে।

ডাক্তারগণ সবসময় বলে থাকেন, আমরা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় সুস্থ থাকার জন্য প্রত্যেককেই প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট থেকে এক ঘন্টা ব্যায়াম করা প্রয়োজন। আর যৌন মিলন উৎকৃষ্ট মানের একটি ব্যায়াম। ৩০ মিনিট ব্যায়ামে ৭০ থেকে ১০০ ক্যালরি খরচ হয়। আর একবার যৌন মিলনে ২৩ মিনিট সাইকেল চালানো, ২০ মিনিট বাস্কেট বল খেলা আর ১৫ মিনিট ধরে সাঁতার কাটার সমান শক্তি ব্যয় হয়। আর দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পজিশনে যৌন মিলন করার ফলে আরো ভালো মানের ব্যায়াম করা সম্ভব। তাই যৌন মিলনে শারীরিক যে তৎপরতা হয় তা প্রাকৃতিকভাবেই হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তা বাড়ায় এবং চেহারার লোমকুপগুলো থেকে ঘাম বের হওয়ার পর গোসলের মাধ্যমে ত্বকে যেকোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ দূর করা সম্ভব।

কার্টিন বিশ্বদ্যিালয়ের যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধ্যাপক ম্যাট টিলি বলেন,উপকারী রাসায়নিক নি:সরণ ছাড়াও পাস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন মিলন প্রাকৃতিক অবসাদরোধী ঔষধ হিসেবে কাজ করে। তিনি আরো বলেন, যৌন মিলনের ফলে আমরা নিজেদেরকে একটি যৌনসত্ত্বা হিসেবেও আবিষ্কারের সুযোগ পাই। আর সঙ্গী বা সঙ্গীনীকে পরিতৃপ্ত করতে পারার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরাও আনন্দিত হই। এসব অনুভূতি আমাদের নিজেদেরকে চিনতে এবং আমাদের আত্মসম্মানবোধ বাড়াতে সহায়ক। আর এসব অনুভূতি আমাদের মেজাজ-মর্জির উন্নতিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দাম্পত্য সম্পর্কে নিয়মিত যৌন অভিজ্ঞতা ইতিবাচক ফল দেয়। যা দম্পত্তিদের পরস্পরের মধ্যকার যোগাযোগকে আরো শক্তিশালী করে।

চূড়ান্ত যৌন সুখানুভূতি লাভের সময় মানব দেহে প্রোল্যাকটিন নামের একটি হরমোন উৎপাদিত হয়। যা ঘুমের ঘোর সৃষ্টি করে। নারীদের চেয়ে পুরুষের দেহে এ হরমোন বেশি উৎপাদিত হওয়ায় যৌন মিলনের পর পরই পুরুষ গভীর নিদ্রায় চলে যায়। আর নারীও যৌন মিলনের পর শারীরিকভাবে ক্লান্ত হওয়ায় অন্য যেকোনোসময়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। এছাড়াও যৌন মিলনে পুরুষের বীর্যপাতের সময় মস্তিষ্ক থেকে নরপাইনফ্রিন, সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন নামক পদার্থ নি:সরিত হওয়ায় পুরুষ সঙ্গী খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে।

সিডনীর একজন বিখ্যাত ডাক্তার ওয়াচার লোহাক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কেউ যদি পরিণত বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বিয়ে করতে দেরি করে, তবে সেক্স হরমোন কমতে কমতে এক সময় তা নি:শেষ হয়ে যায়। বৃক্কস্থিত গ্রন্থির রসে প্রথমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। কেউ যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ না করলে সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বিবাহ করলেও সে তার অপকর্মের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে না। এভাবেই দিন দিন সমাজ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। তাই শারীরিক সুস্থতার জন্য বিবাহকে সারাজীবনের একটি উত্তম ঔষধও বলা যায়।

১৪৯. আল-কুরআন, ৪: ৩

১৫০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা, খ. ১, পৃ. ২৯৫, হাদীস নং- ২০৪৬

**ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা**

মহিলাদের ঋতু এক প্রকার অপবিত্রতা ও অসুস্থতা। প্রত্যেক সুস্থ এবং পূর্ণবয়স্ক নারীর প্রতি চার সপ্তাহে একবার হায়েয অবস্থায় থাকে এবং তাদের শারীরিক অবস্থাভেদে কারো কারো ৩ থেকে ১০দিন পর্যন্ত লজ্জাস্থান থেকে রক্ত নির্গত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আগে এটাকে স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা হলেও বর্তমানের ডাক্তারগণ বলেন, মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ নিরাপদ ও দোষমুক্ত নয়। বিখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ (Gynaecologist) উইলফ্রিড 'শ (Wilfried Show)১৯৪৮ সালে বলেন- স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের সময় কিছুটা অসুস্থতা বোধ (বিশেষ করে তল পেটে) দেখা যায়। অনেকের প্রাথমিক ঋতুস্রাবের সময় ভীষণ পেটের ব্যথা হয়, অনেকের কিছুটা ব্যথা সারা জীবনই হতে থাকে।
ডা. যোয়ান গ্রাহাম বলেন- ঋতুর সময় রোগক্রান্ত হওয়া ও রোগ ছড়িয়ে পড়ারআশঙ্কা থাকে, কাজেই একে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শরীরবিদ্যা সম্মত (Physiological) বলা চলে না।

বিখ্যাত বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল ডা. ক্যাথারিন ডাল্টন নামক জনৈক মহিলা চিকিৎসকের পাঁচটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে ঋতুর সময় মেয়েদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। মেয়েদের হোস্টেল, হাসপাতাল, জেলখানা ও শিক্ষাগারে তিনি তার গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঋতুর অব্যবহিত পূর্বে ও ঋতুর সময় মেয়েদের কার্যক্ষমতা ও কার্যকারিতা অনেক কমে যায়। এসময় মেয়েদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব ও অমনোযোগিতা, খেলা-ধুলা এড়িয়ে চলা ও বেশি কথা বলা ইত্যাদি অপরাধ ২৬% থেকে ৩৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যেসব মেয়ে স্বভাবতই দুষ্ট প্রকৃতির তাদের অপরাধ প্রবণতা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। ডা. ডাল্টন অ চেরা বলেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্য থেকে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স্কা ১১ জন মনিটর ছিল যাদেরকে দুষ্টুমির জন্য শাস্তি দেবার অধিকার দেয়া হয়েছিল। একটি প্রধান ও মজার ব্যাপার এই যে, এসব মনিটর তাদের নিজেদের ঋতুর শুরুতে শাস্তির মাত্রা বাড়তে থাকে যা ধীরে ধীরে কমে যায়। এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও ওঠে যে, এ অবস্থা কি সকল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিশেষ করে শিক্ষায়িত্রী ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য শাসন বিভাগিয় পদে অধিষ্ঠিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে? ডা. ডাল্টান আরেক জায়গায় বলেন- যদিও অতি উৎসাহিরা উভয় লিঙ্গের সমতার দাবি করে, তবু প্রকৃতি সবাইকে সমতা দিতে রাজি নয়। ঋতু সময় মানসিক ধৈর্য ও মনের দৃঢ়তা রক্ষা করার ক্ষমতা সবার সমান হয়না বলেই তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনিয়াস রাজ্যের ডা. গাইউলা জে. আর ডেইল (Gyula J. R. Delyi)১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭২৯ জন হাঙ্গেরিয় মহিলা ক্রিড়াবিকদের মধ্যে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ঋতুস্রাব তাদের ক্ষমতা প্রায়ই হ্রাস করে। তিনি আরোও বলেন- ঋতুর সময় আমি তাদের মান টেনিস ও নৌকা বাইচের ক্ষেত্রে অনেক নিম্নস্তরে নেমে যেতে দেখেছি"।[১৫১] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ– وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ– فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ– اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

অর্থ: আর তোমার কাছে তারা জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে, বলে দাও এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমণ থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে গমন কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী ও অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।[১৫২]

সুতরাং এসব তথ্য ঋতু কালকে কুরআনে 'অসুস্থতা' বলা স্বার্থকতাই প্রমাণ করে। চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে যে কথা বলা হয়েছে, তা আজ এত বছর পরে বহু গবেষণায় সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

ঋতুর সময় স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ হওয়া ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনীতি সম্মত ও যুক্তিভিত্তিক। ঋতুর সময় জরায়ুর নিম্ন মুখ স্বাভাবিক বন্ধ অবস্থায় থাকে না, তখন এর মুখ খোলা থাকে। ফলে অনবরত রক্ত বের হতে থাকে। ঋতুর রক্ত জরায়ুর স্থান থেকে ঝরে, কাজেই সেখানেও স্বাভাবিক আবরণ যা ঝিল্লি (Endomctrium) অটুট থাকে না, ফলে এ সময় জরায়ু বা যোনি নালিতে কোনো রোগ জীবাণু থাকলে তাও সহজেই ভেতরে প্রবেশ করেএবং জরায়ুর ঝিল্লি প্রদাহ (Endomctrium),

১৫১ .শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুর হক, *কোরআন হতে বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, হাছানিয়া লাইব্রেরী, আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ১০৯-১১২
১৫২.আল-কুরআন, ২: ২২২

জরায়ুর নালী প্রদাহ (Salpingitis) ও তলপেটের প্রদাহ (Celulitis) ইত্যাদি কঠিন রোগ হওয়ার সম্ভবনা থাকে। আবার স্ত্রীর গনোরিয়া, সিফলিস, সিসটাইটিস (মূত্রথল) প্রদাহ, শ্বেত প্রদর (Leucorrhoca)ইত্যাদি রোগ থাকলে স্বামীর যৌনাঙ্গে রোগ জীবাণু প্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যগত কারণেই ঋতুর সময় সহবাস নিষিদ্ধ। তাছাড়া যৌন মিলন নেহায়েতই উত্তেজনা পূর্ণ ঘটনা, সে সময় সব রকম স্বাস্থ্য বিধি পালন সম্ভব নয়। সুতরাং যখন জরায়ুর ঝিল্লি অটুট নয়, তখন পুরুষের মাধ্যমে রোগ জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনাই বেশি। যদি কেউ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে, তবুও স্ত্রীর রক্তপাতের ফলে সহবাস জঘন্য খুন-খারাবীর মত নিকৃষ্ট মানসিক অবস্থার প্রমাণ দেয়। তাই ডা. গ্রাহাম বলেন- ঋতুর সময় মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানসিক নয়; বরং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত।

কিন্তু শুধু রোগের ভয় বা ক্ষতির আশঙ্কা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে ফেরাতে পারে না, কিন্তু তাতে পাপের জন্য আল্লাহর শাস্তির ভয় থাকলে মানুষ তা থেকে বিরত থাকে। তাই ইসলাম ঋতুর সময় স্ত্রী মিলনকে হারাম বা কঠিন গুনাহর কাজে বলে ঘোষণা করেছে- 'তাদের নিকটবর্তীও হয়ো না' বলতে যে যৌন মিলনকেই বুঝায় তা নির্ভর যোগ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত। ইসলাম ঋতুবতী স্ত্রীকে অস্পৃশ্য করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: এ সময় স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসা, শোয়া, এমন কি আলিঙ্গন ও চুম্বনও অন্যায় নয়। কেবল নাপাক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে হয় না, কিন্তু মুখস্থ দু'আ-দরূদ ইত্যাদি পড়া যায়। এর চেয়ে সহজ ন্যায় সঙ্গত ও বাস্তব বিধান আর কি হতে পারে?

**শারীরিক সুস্থতায় পর্দার গুরুত্ব**

ইসলাম একটি প্রগতিশীল ও বাস্তবধর্মী জীবন ব্যবস্থা, এখানে কূপমণ্ডুকতা ও হঠকারিতার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিধান প্রবর্তিত করেছেন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। তাই এ ধর্মের কোনো কঠোর বিধানের ফলে যদি স্বার্থবাদী মহল হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে না পেরে ঐ বিধানকে কটাক্ষ বা অপপ্রচার করে, তাহলে ইসলামের কিছু যায় আসে না, ইসলাম স্বীয় স্থানে সমুন্নত। সুতরাং সত্যিকারে একজন ইসলাম অনুসারী যখন আল্লাহ প্রদত্ত সকল বিধানকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের চাবিকাঠি মনে করে নির্দ্বিধায় তা পালন করে, অবশ্যই সে সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধানাবলীকে অবজ্ঞা ও বিরোধিতা করে যে নিজেকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় সে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত পর্দা প্রথাও যে শারীরিক সুস্থতা লাভে এক বিরাট বড় নিয়ামক, এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

ইসলাম বিদ্বেষী অনেকে মনে করে কুরআন-হাদীসে পর্দার নামে নারীকে গৃহের চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ করে রাখার কারণে ইসলামী সমাজে নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় না এবং উন্নত ও সুস্থ মানসিকতার বিকাশ তথা সৃজনশীল প্রতিভার স্ফূরণ হয় না। তাদের একথাটি একবারেই অগ্রহণযোগ্য, বরং পর্দা প্রথার কারণে মুসলিম নারী-পুরুষ হাজারো রোগ-ব্যাধি থেকে কোনো চিকিৎসা ব্যতীতই সুস্থ রয়েছে। কারণ ব্যাবিলনীয়, গ্রিক, রোমান এবং মিসরীয় সভ্যতাসহ এ পর্যন্ত যত সভ্যতার উত্থান ঘটেছে সব সময়ই নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এমনকি ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবেও নারীকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো, তাদেরকে পণ্য-দ্রব্যের মত অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো এবং কন্যা শিশু জন্ম গ্রহণ করলে তাকে বিনা অপরাধে জীবিত কবর দেয়া হতো।

ইরশাদ হচ্ছে – وَ اِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ، بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থ: আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।[১৫৩]

এমতাবস্থায় একমাত্র ইসলামই তৎকালীন প্রচলিত সকল অমানবিক কুপ্রথাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নারীকে সমাজের সকল স্তরে পূর্ণাঙ্গ অধিকার এবং প্রগতির শীর্ষ চূড়ায় সমাসীন করেছে। সুতরাং ইসলাম ধর্ম পর্দার বিধান প্রবর্তন করে নারীকে কখনো শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন করেনি; বরং পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে মূলত যৌন লিপ্সু ক্ষুধার্ত কিছু নরপিচাশ শুকুনদের হাত থেকে নারীকে রক্ষা করেছে মাত্র, আর এজন্যইতাদের এতো গাত্রদাহ।

পশ্চিমা সমাজ মনে করে তারা বেপর্দার নামে নারীকে প্রগতিশীল করছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা নারীকে মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা ও মক্ষীরানী বানিয়ে ছেড়েছে। তারা নারীকে বিলাসী পুরুষদের ভোগের উপকরণ

---

১৫৩.আল-কুরআন, ৮১: ৮-৯

ও যৌন ব্যবসায়ীদের সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে, যা মিডিয়া তারকা, সমান অধিকার, আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা ও সংস্কৃতিমনা নামক রঙ্গিন পর্দা দ্বারা আড়াল করা হয়েছে। নারীদেরকে দিয়ে মিডিয়াপতিদের ব্যবসায়ী ফাঁদের মোড়ক উন্মোচন করতে গিয়ে এক মিডিয়া কর্মী ক্ষোভে বলেছিলেন- তারা আবার নারীদের কী অধিকার দেবে? তারাই তো নারীর মৌলিক অধিকার তথা বস্ত্রকে হরণ করে নিয়েছে। এ মিডিয়া জগতে বস্ত্রাবৃতা নারীদের যেন কোনো মূল্যই নেই, যারা যতো বেশি অর্ধ নগ্ন বা নগ্ন হতে পারে, তারাই ততোবেশি খ্যাতির আসনে সমাসীন হতে পারে। আর যারা নগ্ন হতে অনিচ্ছুক তাদেরকে বলা হয় পশ্চাদপদ ও সেকেলে। তারা যতো ভালোকিছুই হোক মিডিয়া জগতে তাদের কোনো ঠাঁই নেই। তাই বর্তমানে দেখা যায় নিম্ন মানের কোনো একটি পণ্যকেও বাজারজাত করার জন্য প্রতিটি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সুকৌশলে নারী দেহটিকেও সহযোগী পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- নিম্ন মানের পণ্যটি প্যাকটজাত বা ঢাকা থাকলেও পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ নারীর শরীরটি থাকে পর্দাহীন বা খোলা। নারী জাতির জন্য এর চেয়ে অপমানজনক বিষয় আর কি হতে পারে?

পর্দা অনুসরণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে যে সকল নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, তা পালন করতে বাহ্যিকভাবে কিছুটা কঠিন মনে হলেও জাতিকে ব্যভিচারের করাল থাবা থেকে পবিত্র রাখতে এবং এইডসসহ যৌন সংক্রান্ত নানাবিদ অসুস্থতা থেকে নারী-পুরুষকে রক্ষা করতে এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর কিছুই হতে পারে না। কারণ কাম-প্রবৃত্তির ব্যাপারটি এতই সূক্ষ্ম যে অপরের পক্ষে তা জানাও দুষ্কর। চলার পথে কে কার দিকে কামভাবের দৃষ্টিতে তাকালো এবং কে কাকে স্পর্শ করলো তা অন্যের পক্ষে অবগত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক নর-নারীকে স্বস্থানে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, যেন কামভাবের সাথে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতই না করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ، ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ، اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌبِمَا يَصْنَعُوْنَ– وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ، وَ لَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ...

অর্থ: (হে নবী!) আপনি পুরুষ মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। শুধু ঐ সৌন্দর্য ব্যতীত যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তারা যেন মাথার উপর ওড়না/চাদর বক্ষদেশে ফেলে রাখে, যাতে (অন্যের নিকট) তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে[১৫৪]... হাদীসে এসেছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الاُوْلٰى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী (রা.)-কে ইরশাদ করেন- হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাত (বেগানা মহিলাদের প্রতি যা অনিচ্ছাকৃত হয়েছে) দ্বিতীয় দৃষ্টিকে যেন অনুসরণ না করে। কেননা, অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য জায়েয, আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।[১৫৫]

এর উদ্দেশ্য হলো- প্রথম দৃষ্টিপাত অকাস্মৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ, নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও জায়েয নয়। তাই টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে বেগানা পুরুষ-মহিলাদের অশালীন ছবি দেখাও ইসলাম নিষেধ সাব্যস্ত করেছে। কারণ এর কুপ্রভাব ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- দৃষ্টিপাত শয়তানের এটি বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি এর পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করবো, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।[১৫৬]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الاَنْصَارِ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِنَّ الْغُرْبَانَ مِنَ الْاَكْسِيَةِ–

১৫৪. আল-কুরআন, ২৪: ৩০-৩১

১৫৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়, খ. ১, পৃ. ৩০৯, হাদীস নং- ২১৪৯

১৫৬. মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান, *আহ্‌কামুল হাদীস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, আগষ্ট-২০১৯ (৭ম মুদ্রণ), পৃ. ১৮০

অর্থ: উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়- "মহিলারা যেন তাদের দেহকে চাদর দিয়ে আবৃত করে," তখন আনসার মহিলারা কালো কাপড়ে শরীর আবৃত করে এমনভাবে বের হতো, মনে হতো যেন তাঁদের মাথার উপর কাক বসে আছে।[১৫৭]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَاَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَ لَيْسَ اَعْمٰى لاَ يَبْصُرُنَا وَ لاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَفَعَمْيَا وَ اِنْ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ–

অর্থ: উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং মায়মুনা (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর নিকট ছিলাম। তখন সেখানে আবদুল্লাহ ইবন উম্মু মাকতুম (রা.) আসেন। আর এটি ছিল পর্দার আয়াত নাযিলের পর। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তোমরা দু'জন তার থেকে পর্দা করো। তখন আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদের দেখতে পান না, চিনতেও পারেন না। তখন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরাও কি অন্ধ, তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?[১৫৮]

মূলত পর্দা পরিত্যাগের কারণেই সমাজে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যভিচারের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর ব্যভিচারের ফলে সামাজিক অনাচার এতো প্রসার লাভ করে, এর কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় একটি গোত্র, সম্প্রদায় এমনকি একটি দেশকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়। অতীত ইতিহাসই এর সাক্ষী। বর্তমানেও বিশ্বে যতো যৌনরোগ, মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি, গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা ইত্যাদির ছড়াছড়ি রয়েছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এসবের অধিকাংশ ঘটনার মূলেও এমন সব চরিত্রহীন নারী-পুরুষ রয়েছে, যারা এই অপকর্মে সরাসরি জড়িত। এটা এমন এক অপরাধ যা অন্যান্য শত শত অপরাধকে জন্ম দেয়। ব্যভিচারের মতো অশ্লীল ও নির্লজ্জ অপকর্ম দমনের জন্যই ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে, আর মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পর নারীর কণ্ঠ ও অলংকারের শব্দ শোনা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এসবই নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। এমন নির্লজ্জ কাজ থেকে মানব জাতিকেবিরত রাখার নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَ لاَتَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَآءَ سَبِيْلاً

অর্থ: তোমরা যিনার ধারে-কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।[১৫৯]
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّنِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاءَةَ جَلْدَةٍ، وَّ لاَ تَاْخُذُكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ–

অর্থ: ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়।[১৬০]

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে সৃষ্টিই করেছেন বিপরীতমুখী আকর্ষণের গুণাগুণ দিয়ে। তাই প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের মনে একে অপরের প্রতি সান্নিধ্য লাভের বাসনা থাকাটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি এ ধ্রুব সত্যটিকে অস্বীকার করে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে মিথ্যাবাদী নতুবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে রোগী। এমন রোগীকে অতিদ্রুত যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মে কোনো মোনাফেকি বা ভণ্ডামি করার সুযোগ নেই। বিশ্বের সকল প্রাণী ও জীব-জন্তুর মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান থাকা একটা সহজাত প্রবৃত্তি। এটাই সৃষ্টির চিরন্তন নিয়ম। সাবালক দু'জন নারী-পুরুষ অবাধে চলা ফরা করবে, আর তাদের মধ্যে যৌন কামনা ও আকর্ষণ জাগ্রত হবে না, এমন সাধুর সংখ্যা আমাদের সমাজে খুবই বিরল। বিড়ালকে শুটকির পাহারাদার বানিয়ে তা যথাযথ সংরক্ষণের প্রত্যাশা করা যেমন বোকামী, তেমনি নারী-পুরুষের লাগামহীন দর্শন, কথোপকথন, মেলামেশা ও চলাফেরা করার পরও

---

১৫৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী- মহিলাদের চাদর ব্যবহার করা, খ. ২, পৃ. ২১২, হাদীস নং- ৪১০১

১৫৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী- বলুন, মু'মিন স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি সংযত রাখতে, খ. ২, পৃ. ২১৩-২১৪, হাদীস নং- ৪১১২

১৫৯. আল-কুরআন, ১৭: ৩২

১৬০. আল-কুরআন, ২৪: ২

যদি বলা হয় তার মধ্যে কোনো কুচিন্তার ভাব উদয় হয় না, তা নি:সন্দেহে অবিশ্বাস্য। এটা এমন এক পিচ্ছিল পথ, যেই এর নিকটবর্তী হয় সেই আস্তে আস্তে এমন অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় যে আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকে না।
তবে ইসলাম ধর্মে পর্দা প্রথার অর্থ এই নয় যে নারীকে সবসময় ঘরের অন্ধ প্রকোষ্ঠে অসূর্যস্পর্শা করে রাখবে; বরং মার্জিত, নির্মল ও ভদ্রোচিত চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার প্রদর্শন করে প্রয়োজনে নারী বাইরের কাজেও অংশ গ্রহণ করতে পারবে। উপরন্তু ইসলাম নারীর দৈহিক উন্নতির জন্য নারীসুলভ খেলা-ধুলা, ব্যায়াম কিংবা চিত্ত বিনোদনকেও নিষেধ করে না। তবে একথাও ঠিক যে ইসলাম এমন সব কাজ-কর্ম ও চিত্ত বিনোদনের অনুমতি দেয় না যাতে নারীর নারীত্ব, স্বভাবজাত কোমলতা বিনষ্ট হয়। আসলে নারীর দেহ-মন এমন সব ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি, যা বেশি খোলা-মেলা পরিবেশের জন্য উপযোগিই নয়। এ প্রসঙ্গে কটন বলেন- ফুলের কাছে সূর্য যা, একজন নারীর কাছে বিশ্রাম বা আনন্দ তাই। পরিমিতভাবে ভোগ করা হলে এটা নারীর সৌন্দর্য বাড়ায়, অবসাদ দূর করে। আর অপরিমিতভাবে ভোগ করা হলে নারীর সুষমা হরণ করে, দেহ-মনের অবনতি ও ধ্বংস আনয়ন করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَ قَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاُوْلٰى

অর্থ: তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে এবং মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।[১৬১]
যদিও আয়াতের প্রথমাংশ থেকে বোঝা যায় নারীদেরকে ঘরের চার দেয়ালের ভেতর অবস্থান করতে বলা হয়েছে, কিন্তু কেন এবং কাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এর উত্তর পরের অংশ থেকেই পাওয়া যায় অর্থাৎ জাহেলী যুগের মতো যে সকল নারী বেপরোয়া ও লাগামহীনভাবে চলা-ফেরা করতে চায়, তারা যেন বের না হয়ে ঘরেই অবস্থান করে। কারণ এমন বেহায়া-খবীস নারীর দ্বারা পুরো জাতি নষ্ট হয়ে যাবে। এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দা রক্ষা করে বের হওয়ার পরোক্ষ অনুমোদনও দেয়া হয়েছে। তাই ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের ভেতরে আবদ্ধ করে রেখেছে, এমন অভিযোগ করা সমীচীন নয়; বরং মানব জাতির ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্যই পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের কোনো প্রয়োজন নেই তারা অহেতুক বাইরে বের হয়ে নিজের রূপ-যৌবন দেখিয়ে একটি জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়ার অনুমোদন শুধু ইসলাম নয়, কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষও দিতে পারে না।

**পর্দার সীমারেখা**

অনেকেই মনে করে পর্দা শুধু নারীর জন্যই প্রযোজ্য, পুরুষের কোনো পর্দার প্রয়োজন নেই। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। তবে শরীর ঢেকে রাখার সীমার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হলো- কমপক্ষে নাভির ওপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখা। আর নারীর ক্ষেত্রে এর সীমা হলো- এমন ১৪ প্রকার নারী যাদেরকে পুরুষের জন্য বিবাহ করা হারাম[১৬২]তাদের ছাড়া অন্য সকল পুরুষের সামনে হাতের কব্জি ও মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখা। হ্যাঁ, কেউ যদি চায় তার হাত ও মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখবে, তাহলে তা আরো উত্তম। কেননা অনেক ইসলামী বিশেষজ্ঞ হাত ও মুখমণ্ডলকেও হিজাব বা পর্দার অন্তর্ভূক্ত মনে করেন।

পোশাকীয় পর্দার পাশাপাশি ব্যক্তিকে নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ পর্দা করতে হবে। একজন ব্যক্তি পোশাক সংক্রান্ত পর্দার শর্তগুলো পূরণ করলে সীমিত অর্থেই পর্দা পালন করলো। পোশাকের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা, চিন্তা-চেতনারও পর্দা করতে হবে। ব্যক্তির কথাবার্তা, চলাফেরা এবং আচার-আচরণ ইত্যাদি পর্দার শামিল, যা পুরুষকে নারী হতে এবং নারীকে পুরুষ হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে।

উল্লেখ্য, ঘরের বাইরে গিয়ে প্রয়োজনীয় সকল কাজ করার ক্ষেত্রে যদিও কিছু সংখ্যক আলেম নারীর মুখমন্ডল ও হাতের কব্জি বা তালু পর পুরুষের সামনে ঢেকে না রাখার অনুমোদন দিয়েছেন, তথাপি পুরুষের জন্য পর নারীর এ সকল অঙ্গ দেখা জায়েয নয়। তবে হযরত ইবন আব্বাস (রা.)সহ অনেক আলিম মনে করেন, মানুষের মুখমণ্ডলই যেহেতু সৌন্দর্য ও আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাই মুখমন্ডল ও হাতের কব্জির প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি ফেৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে নারীর জন্য এগুলোও প্রকাশ করা জায়েয নয়। বর্তমান সময় হচ্ছে, ফেৎনা-ফাসাদ, কামাধিক্য, পাপাচার ও গাফলতির যুগ। তাই বর্তমান সময়ের অধিকাংশ আলিম মনে করেন, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যেমন চিকিৎসা করানো, হজ্জে যাওয়া, জমি দলিল করা, জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি, চাকরি বা অন্যকোনো বিশেষ কারণে ছবি তোলার

---

১৬১. আল-কুরআন, ৩৩: ৩৩
১৬২. আল-কুরআন, ৪: ২৩

সময় অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ইত্যাদি ছাড়া পর পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা রাখা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং বিনা প্রয়োজনে তাদের দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও পুরুষের জন্য জায়েয নয়।

অভিযোগের সুরে বলা হয়- নারীদের পর্দার মাধ্যমে চার দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখার ফলে তাদের শরীর-স্বাস্থ্য সুঠাম ও সুন্দর হয় না। এতে তাদের মানসিক অবস্থা যেমন সংকীর্ণ হয়, তেমনি তাদের প্রতিভাও থাকে অকর্মণ্য। এটি একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ। কারণ পর্দানশীল মেয়েরা যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় না বাস্তবে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিম মহিলাদের স্বাস্থ্য অমুসলিম আরব মহিলাদের চেয়ে খারাপ ছিল, এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তাছাড়া স্বাস্থ্যবতী মহিলা মানে সাধারণত স্বাস্থ্যবান সন্তান ধারণ। আর ইসলামের ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, মুসলিম মহিলাদের সন্তানেরা যুগে যুগে যুদ্ধে, রণকৌশলে, সাহস ও নৈতিক আদর্শে পৃথিবীর বুকে এক অদ্বিতীয় ও অনবদ্য অবদান রেখেছে।[১৬৩]

**পর্দানশীল মহিলারাই অধিক সুন্দরী, সুশ্রী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী**

বর্তমান যুগেও জরীপ করলে দেখা যাবে, পর্দানশীল ধার্মিক মহিলারা অন্যদের তুলনায় অধিক সুন্দরী, সুশ্রী, লাবন্যময় ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কারণ তারা প্রগতির দাবিদার অন্যান্য মহিলাদের মতো নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হয়ে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অফিস-আদালতে কাজ-কর্ম এবং মিছিল-মিটিং ইত্যাদি না করায় এবং বয় ফ্রেন্ডদের মনোরঞ্জনের জন্য মুখে ও শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক কসমেটিক ব্যবহার না করার কারণে তাদের ত্বক সর্বদায় মসৃণ ও লাবন্যময় থাকে। যে সকল নারী প্রগতির নামে যৌন স্বাধীনতার দাবিদার, তারা বহু পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করে অল্প বয়সেই এইডস, জরায়ু ক্যান্সারসহ নানা ধরনের মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সাময়িকভাবে যৌন উত্তেজনায় মত্ত থাকার জন্য ইয়াবা, ভায়াগ্রা, ফেনসিডিল, মদ-গাঁজা, কোকেন, হিরোইন, সীসা ইত্যাদি সেবনের কারণে অসুস্থ হয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাদের যৌনক্ষুধা না মেটার কারণে সারাক্ষণ অস্থির থাকে এবং এক সময় মানসিক বিকার গ্রস্থ হয়ে পড়ে। শর্ট কাপড় পরিধান করে নিজের দেহকে সকলের দৃষ্টির স্রোতে ভাসিয়ে দেয়ার কারণে তারা স্কিন ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْعَيْنُ حَقٌّ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: দৃষ্টির প্রভাব, এটি পরম সত্য।[১৬৪]

চোখে দেখা যায় না এমন গুপ্ত জ্ঞান অনুসন্ধানের নাম প্যারাসাইক্লোজী। বিশেষজ্ঞদের মতে- মূলত প্রত্যেক ব্যক্তির চক্ষু হতেই অদৃশ্য আলোক রশ্মি বের হয়ে থাকে, যার মধ্যে আবেগময় শক্তির বিদ্যুৎ থাকে। এ সকল বিদ্যুৎ দ্রুত লোমকূপের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক গঠনের অবনতি ঘটে। যদি আবেগময় শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহ বা আলোকরশ্মি পজেটিভ (+) হয়, তাহলে মানুষের উপকার হয়। আর যদি এ রশ্মি নেগেটিভ (-) হয়, তবে অব্যাহত ক্ষতি হতে থাকে। কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের চক্ষু থেকে নির্গত রশ্মি মূলত নেগেটিভ হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে এত শক্তি নিহিত থাকে যে, শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে ওলট-পালট করে দেয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বদ-নজরের চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। কারণ সূরা নাস, ফালাক, ইখলাস এবং কাফিরূন ঐ নেগেটিভ বা নেতিবাচক রশ্মিকে দূর করে দেয়।[১৬৫]

যারা পর্দা করে না তারা সাধারণত বাইরে যাওয়ার সময় অন্য পুরুষকে নিজের রূপ দেখানোর জন্য অতিরিক্ত প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে, যা আসলে রাসায়নিক উপাদান। হারবাল প্রসাধনীও প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান। অনেক প্রসাধনী এমন রয়েছে, যার রাসায়নিক উপাদান অধিক মাত্রায় ব্যবহার করলে কোষের ওপর বিরূপ প্রভাবের কারণে এতে ক্যান্সার হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক সময় হারবাল প্রসাধনীর প্রচারণায় এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গুণগান করা হয়। কিন্তু হারবাল উপাদান আর রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই।[১৬৬]

---

১৬৩. মু. আবুল কাসেম ভূঁইয়া, *যুগ-জিজ্ঞাসা ও পরিবার*, ঢাকা: ইফাবা. পৃ. ৪৩, ৪৪

১৬৪. *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: বদ নযর লাগা সত্য, খ. ২, পৃ. ১৬২৯, হাদীস নং ৫৭৪০

১৬৫. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ-২১৮-২২০

১৬৬. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, "প্রসাধনী সামগ্রীর ক্যান্সার ঝুঁকি", ২৪.০৭.২০১১ (থেকে উদ্ধৃত)

কোনো নারী যখন সেজেগুঁজে শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো দৃশ্যমান করে বের হয়, তখন স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো দৃশ্যমান হওয়ার কারণে একাধিক পুরুষের লোভাতুর কুদৃষ্টি ও খারপ চিন্তার প্রভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারীর অজান্তেই তার মধ্যে ট্রান্সমিট হয়ে যায় এবং ঐ নারীর দেহের ভেতরে হরমোনের নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে। এতে স্ত্রী রোগজনিত বা গাইনী সমস্যা যেমন- পিরিয়ডজনিত সমস্যা, স্রাবজনিত সমস্যা, ব্রেস্ট লাম্প বা টিউমার, ওভারীতে সিষ্ট, ইউটেরাসে সিষ্ট বা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেয়।[১৬৭]

পর্দাবিহীন চলাফেরার কারণে শুধু যে নারীরাই শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়; বরং পুরুষও ক্ষতির শিকার হয়। একজন পুরুষ যখন কোনো নারীর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায় তখন শুধু নারীর দেহেই রাসায়নিক রি-এ্যাকশন হয় তা নয় এর নেতিবাচক প্রভাব পুরুষের দেহেও পতিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো নারী যখন কোনো পুরুষকে নিয়ে কুচিন্তা করে কিংবা কল্পনাবিলাসী হয়, এর প্রভাবও ঐ পুরুষটির দেহে পড়ে। পুরুষটির দেহে তখন এক ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় একদম সেল লেভেলে। এতে নানা রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলনের আগ্রহ কমে যাওয়া কিংবা হারিয়ে ফেলা। প্রয়োজনের সময় লিঙ্গ উত্থিত না হওয়া কিংবা দ্রুত বীর্যপাত ইত্যাদি। টেষ্টোষ্টোরন হরমোন পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ কমে যাওয়া কিংবা মৃত শুক্রাণু উৎপাদন। যার ফলে সন্তান উৎপাদনে দেখা দেয় নানা রকম সমস্যা। আর এসব কারণে সংসারেও দেখা দেয় নানা রকম অশান্তি, ঝগড়া, ফ্যাসাদসহ বহুবিধ সমস্যা। যে সকল ডাক্তার নি:সন্তান দম্পতিদের নিয়ে কাজ করে তাদের চেম্বারে গেলে দেখা যায় এ ধরনের রোগীর সংখ্যা পরিমাণে কতো বেশি ।

পক্ষান্তরে, পর্দানশীল মহিলারা ব্যক্তি জীবনে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য অযু করে থাকে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে- কেউ যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে দৈনিক পাঁচবার মুখমন্ডলসহ হাত-পা ধৌত করে, তাহলে সে আল্ট্রা বায়োলেট রশ্মিসহ বিভিন্ন রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যময় জীবন লাভ করবে। আর সালাতের মধ্যে সঠিকভাবে কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি আমল পর্যায়ক্রমে আদায় করার কারণে নি:সন্দেহে সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ সালাত আল্লাহ প্রদত্ত একটি উত্তম ব্যায়ামও বটে।

এছাড়া পর্দানশীল নারীরা পূর্ণ মুখঢাকা বোরকা পরিধানে অভ্যস্থ্য হওয়ায় তাদের মধ্যে 'ইপস্টেইন বার ভাইরাস'-এ আক্রান্তের হার খুবই কম। এই ভাইরাস নাক ও গলায় ক্যান্সারের কারণ হিসেবে কাজ করে। রিয়াদস্থ কিং আব্দুল আজিজ হাসপাতালের রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কামাল মালাকার জানান, হিজাব (বোরকা) শ্বাস-প্রশ্বাসের নালীকে ক্ষত সৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা করে। সৌদি আরবে বিশেষ করে নারীদের নাক ও গলায় ক্যান্সারে আক্রান্তের হার খুবই কম। এটি নি:সন্দেহে একটি চমৎকার ব্যাপার যে কেবল ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি বা প্রথা কীভাবে মানব জীবনের এত গভীরে প্রভাব ফেলতে পারে।[১৬৮]

বর্তমানে সারাবিশ্বে ইভটিজিং এক মহামারী আকার ধারণ করেছে, এর ফলে পিতা-মাতারা আজ দিশেহারা। অথচ উল্লিখিত সকল সমস্যার সমাধান বহু পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ، ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَايُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

অর্থ: হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের ওড়না নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে সহজেই চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত (ইভটিজিং) করা হবে না। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৬৯]

বাস্তবেই ইসলামে নারীর জন্য হিজাব বা পর্দার যে বিধান রয়েছে, তা মহিলাদেরকে ধর্ষণ ও ইভটিজিং-এর নির্যাতন ও উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং তারা সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। পর্দা করে এমন একটি

---

১৬৭. *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, পৃ. ৯৯
১৬৮. *বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা*, পৃ. ১৬-১৭
১৬৯. আল-কুরআন, ৩৩: ৫৯

নারীও ইভটিজিং-এর স্বীকার হয় না। কারণ যথাযথ পর্দা করার কারণে দুষ্ট লোকদের জানার কোনো সুযোগই থাকে না, পর্দার ভেতরে যে মহিলাটি রয়েছে সে কি রূপসী, নাকি কুৎসিত, তার বয়স ২১ নাকি ৫০ বছর। পর্দা একদিকে যেমন নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনীর প্রবণতা অনেকাংশে অবদমন করে, অপরদিকে এর দ্বারা পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকেও নারীরা রক্ষা পায়। কথিত আছে- পর্দা বা প্রচলিত বোরখা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোনো এক বিদেশি কালো কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃত এক মুসলিম মহিলাকে চলে যেতে দেখে এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলো- এটা কী? রসিক পথচারী বললো- এটা একটা চলন্ত আশ্রয়স্থল, যা মহিলাদের বৃষ্টি ও সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করে। উক্তিটি কৌতুকপ্রদ হলেও বোরখা বা পর্দা সম্পর্কে এ মন্তব্য যথার্থ। সত্যিই পর্দা নারীকে বৃষ্টি ও সূর্যের তাপরূপ অবাঞ্ছিত বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ বাইরের পরিবেশে পুরুষের কুদৃষ্টিজনিত কারণে উদ্ভূত নানা প্রকার অপরাধ থেকে মুক্ত রাখে।[১৭০]

উল্লেখ্য, যেকোনো ভদ্র ও শালীন মহিলার নিকট সতীত্ব তার সবচেয়ে বড় সম্পদ, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান। ফলে আমাদের সমাজে দেখা যায়, ধর্ষিতা হয়ে কোনো নারী যদি তার কুমারীত্ব বা সতীত্ব হারিয়ে ফেলে, তাহলে নিজের জীবনকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দেয়। তাই ইসলাম ধর্মের পর্দার বিধান নারী জাতির জন্য একটি বিরাট নিয়ামত। এর ফলে সে নিজেকে সার্বিক যৌন নিপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়।

সমকালীন সমাজে মহামারি আকারে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নিষ্ঠুরতা, নারী নির্যাতন, কামজ অপরাধ, হিংসা-প্রতিহিংসা, মানসিক বৈকল্য, আত্মহত্যা, হতাশা-নৈরাশ্যের অন্যতম কারণ হলো এই লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা। নারীর সতীত্ব, শালীনতা ও লজ্জাশীলতা সহজাত প্রবৃত্তি। উইলিয়াম জেমসের মতে- "বংশ পরম্পরায় স্ত্রী লোকেরা লজ্জাশীল হওয়ার চর্চা করছে। তাদের নির্লজ্জ আচরণ অনেকের অবাঞ্ছিত আগ্রহ বা ঘৃণা জন্মাতে পারে এই ভয়েই তারা তার চর্চা করছে। লজ্জাহীন স্ত্রী লোকেরা তাদের প্রতি পুরুষের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না, কেবল সেসব স্ত্রী লোক যারা আনন্দ-উচ্ছ্বাস হতে অনেকটা দূরে থাকে এবং পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে না অথবা পুরুষের দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলে, তারাই পুরুষকে সর্বাধিক আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।" ডুর‍্যান্টও এই নির্লজ্জতাকে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

কোনো নারী যদি মনে করে পর্দার বিধান লংঘন করে নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন হলেই বুঝি পুরুষ আমার দিকে বেশি আকর্ষিত হবে, তার ভাবনা সেই ফল ব্যবসায়ীর মতোই বোকামী হবে, যে সহজে ক্রেতার মন জয় করতে এবং অধিক বিক্রির প্রত্যাশায় আম, কলা, পেঁপেঁ ও কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের আবরণ (পর্দা) ওঠিয়ে এর ভেতরের সুন্দর অংশ প্রদর্শন করে বাজারে বসে আছে।বরং উল্টোভাবে তাতে ধুলা-বালি, ময়লা-আবর্জনা ও ডাস্টবিনের মশা-মাছি বসে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ক্রয়ের জন্য কেউ এর কাছেই যাবে না। তেমনিভাবে নারীর সৌন্দর্য অযাচিতভাবে প্রদর্শিত হলে সমাজের কিছু নরকীট এতে সাময়িকভাবে ভাগ বসিয়ে ফায়দা লোটে নিয়ে সার্বিকভাবে তার গ্রহণ যোগ্যতাকে বিনষ্ট করে দেয়। তাই তথাকথিত সভ্যতার দাবিদার পাশ্চাত্য নারী জাতি যখন পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় মনে করে তা পরিত্যাগপূর্বক নিজেকে বল্গাহীনভাবে পুরুষের নিকট বিলিয়ে দিয়েছে, বিকৃত যৌনরুচির অধিকারী পুরুষগণও এখন তাদেরকে পরিত্যাগ করে সমকামিতার মতো জঘণ্য পাপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বর্তমানে এর পরিমাণ এমন এক ভয়াবহ অবস্থায় রূপ নিয়েছে যে বিভিন্ন দেশে সরকারিভাবে তাদের বিবাহকে বৈধতা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

নিজের দেহের আকর্ষণীয় ও মোহনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দোলিয়ে ও প্রদর্শন করে পুরুষের মনোরঞ্জন বা টাকা-পয়সা উপার্জন করার জন্য আল্লাহ তাআলা নারীকে সৃষ্টি করেননি; বরং এ পার্থিব জগতে আল্লাহ তাআলার হুকুমসমূহ যথাযথ পালন করে মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত অসীম জীবনের ঠিকানা জান্নাত উপার্জনের এক মহান উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নারীর রূপ, যৌবন ও মোহনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যেহেতু তার জন্য বিশাল নিয়ামত ও সম্পদ, তাই নিজের এ সম্পদকে নিজেই পাহারা দিতে হবে, অন্য কেউ এসে দেবে না। চোর যেমন মালিকের সম্পদ লুট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে, কিন্তু মালিক তার সম্পদ যেন হাত ছাড়া হয়ে না যায় সেদিকে কড়া নজর রাখে, তেমনি নারীকেও সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, কোনো লম্পট যেন তার সতীত্বকে চুরি ও হরণ করতে না পারে।

সারাবিশ্বে নারী উন্নয়ন শ্লোগানের নামে যেভাবে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতায় পদায়ণ করা হচ্ছে, আর্থিক স্বচ্ছলতার দোহায় দিয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে, ব্যক্তিত্ব ও মানসিক বিকাশের অন্তরালে ফ্যাশন-মডেলিং জগতে নারী দেহের যে অশ্লীল প্রদর্শনী চলছে এবং শারীরিক ব্যায়ামের প্রতারণায়

---

১৭০. মু. আবুল কাসেম ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

খেলাধুলায় অংশ গ্রহণের জন্য হালকা-পাতলা এবং শর্ট ড্রেস পরিয়ে নারীদেরকে যেভাবে জনসম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা কখনো প্রগতি হতে পারে না। এসবই প্রগতি ও উন্নয়নের নামে নারীকে ব্ল্যাকমেল করে ঘর থেকে বের করে তাকে ভোগ করার জন্য একদল মানুষের কৌশলমাত্র। শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলার নামই উন্নয়ন, প্রগতি বা সভ্যতা নয়। যদি তাই হয়, তবে পশু এবং আদিম যুগের নগ্ন মানুষদেরকেই সবচেয়ে বেশি সভ্য বলতে হয়। কিন্তু কেউ কি তা মেনে নেবে?

সুতরাং পর্দার কারণে নারী সার্বিক উন্নয়নে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নেতিবাচক দৃষ্টিতে শুধু একথাটি বললেই চলবে না; বরং পর্দাহীনতার কারণে তাদের লাঞ্ছনাময় যৌন হয়রানির কালো অধ্যায়ের কথাও বলতে হবে। তথাকথিত প্রগতিশীলদের অনুরোধ করবো- হাতে একটু সময় নিয়ে অন্তত একবার হলেও এ সংক্রান্ত দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন চ্যানেল এবং ওয়েব সাইটগুলো ঘেঁটে দেখে নিজেই সিদ্ধান্ত নিন, পর্দা নারী জাতির জন্য প্রগতির অন্তরায় নাকি আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ নিয়ামত?

**অধিক পাতলা কাপড় পরিধান না করা**

ইসলাম মানুষকে সুন্দর ও মার্জিত পোশাক পরিধানের নির্দেশ প্রধান করেছে। তবে এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা যাবে না, যা পরিধান করার পরও মানুষের শরীরের অঙ্গগুলো দেখা যায়। কারণ ইসলামী শরীয়তে পোশাক বলতে ঐ বস্ত্রখণ্ডকে বোঝায় যা লজ্জাস্থান বা সতর ঢেকে রাখে। সুতরাং যে পোশাক লজ্জাস্থানকে পুরোপুরি আবৃত করে না বা এতই সূক্ষ্ম, মসৃণ, পাতলা ও সংকীর্ণ হয় যে এর ফলে ঢেকে রাখার অঙ্গ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, ইসলাম এমন বস্ত্রকে পোশাক বলেই স্বীকৃতি দেয় না। আর তা যদি মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়, তবে একেবারেই নিষিদ্ধ। একই সঙ্গে আরেকটি জরুরি বিষয় হলো, পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিছুতেই ইসলামের সীমারেখা অতিক্রম করা যাবে না। পোশাকের রং, গুণ-বৈশিষ্ট্য, পরিধানের ধরন ও পদ্ধতিতে যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে ফ্যাশনের নামে কোনভাবেই তা ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। ইসলামের আরোপিত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে অনুসরণ করে পোশাক পরিধান করলেই তা ইসলামসম্মত পোশাক বলে পরিগণিত হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِّقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا هٰذَا وَ هٰذَا وَ اَشَارَ اِلٰى وَجْهِهِ وَ كَفَّيْهِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আসমা বিনত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পাতলা কাপড় পরিধান করে হাজির হলে তিনি (সা.) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন: হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয় তখন তাদের এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা উচিত নয়, যাতে তাদের শরীর দেখা যায়। তবে তিনি ইশারা করে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমোদন দেন।[১৭১] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ دِحْيَتَ بْنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِىِّ اَنَّهُ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِقُبَاطِىٍّ فَاَعْطَانِىْ مِنْهَا قِبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ اَحَدُهُمَا قَمِيْصًا وَّ اَعْطِ الْاٰخَرَ امْرَاَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ وَأْمُرْ امْرَاَتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا–

অর্থ: দিহিয়া ইবন খালীফা কালবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট (মিসর থেকে) কিছু পাতলা কাপড় আসলে, তিনি তা থেকে আমাকে একটি কাপড় হাদিয়া দেন এবং বলেন, তুমি একে দু' টুকরা করো। এক টুকরা দিয়ে জামা বানাও এবং অন্য টুকরাটি তোমার স্ত্রীকে দিয়ে দাও, যা দিয়ে সে ওড়না বানাবে। দিহিয়া (রা.) পশ্চাদগমন করলে তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তোমার স্ত্রীকে এর নিচে অন্য কাপড় লাগিয়ে নিতে বলবে, যাতে তার শরীর দেখা না যায়।[১৭২]

---

১৭১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: মহিলাদের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা জায়েয, খ. ২, পৃ. ২১২-২১৩, হাদীস নং- ৪১০৪

১৭২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: মহিলাদের পাতলা কাপড় পরা, খ. ২, পৃ. ২১৪, হাদীস নং- ৪১১৬

সকল সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরাম জীবনভর মোটা পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তুআধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা করে এমন পাতলা কাপড় তৈরি করেছে যা পরিধান করলেও শরীরের প্রতিটি অংশ এমনকি লোম পর্যন্ত দেখা যায়। মানুষের রক্তে ম্যালানিন নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে, যদ্বারা শরীরের রং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু চামড়ায় যখন রৌদ্রের উষ্ণতা, ঠান্ডার তীব্রতা এবং ঋতুর পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে, তখন চর্মের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। আর এ রকম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো পাতলা কাপড় পরিধান করা।

ইসলাম ধর্ম পোশাকের কিছু নীতিমালা দিয়েছে, কিন্তু কোনো পোশাককে নির্ধারণ করে দেয়নি। কারণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একেক এলাকায় একেক ধরনের পোশাক পরিধানের রেওয়াজ থাকতে পারে। সুতরাং ইসলাম যদি কোনো একটি পোশাককে নির্ধারণ বা সুন্নাত করে দিত, তাহলে নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, আবহাওয়া এবং এলাকার ভিন্নতার কারণে তা অনুসরণ করা কষ্টকর হয়ে যেতো। তবে সবসময় একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নির্দেশনার যেন ব্যত্যয় না ঘটে। তাই অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ অশালীন ও অভদ্রোচিত পোশাক অন্তর ও মস্তিষ্কে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। ইদানীং আমাদের সমাজে রুচিহীন পোশাকের ছড়াছড়ি চলছে। পোশাকের দ্বারা অনেকাংশে ছেলে নাকি মেয়ে তা চেনাই যায় না। পুরুষের প্যান্ট-শার্ট, জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জি, টি-শার্ট মেয়েরা কিংবা মেয়েদের চুড়ি, দুল, লম্বা জুটিওয়ালা চুল, ওড়না ছেলেরা অবলীলায় পরিধান করে বেড়ায়। আবার অনেকে এ পরিবর্তনকে তথাকথিত আধুনিকতা বলে তৃপ্তির ঢেঁকুরও তুলে। এসবই বিজাতীয় সংস্কৃতি ও বিধর্মী কালচার। এহেন গর্হিত অনুকরণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের দূরে থাকা উচিত।

**বিবস্ত্র না হওয়া**

পবিত্র কুরআনে পোশাকের কথা উল্লেখ করার দ্বারাই বোঝা যায় বিবস্ত্র না হওয়ার বিষটি কত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে জমিনে নামিয়ে দিলে প্রথমেই তিনি বিবস্ত্র অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং গাছের পাতা ছিঁড়ে লজ্জাস্থান আবৃত করেন।

পোশাক শুধু মুসলিমদের জন্যই প্রয়োজন নয়; বরং প্রতিটি মানুষেরই প্রয়োজন। কারণ মানুষের প্রকৃতিতে লজ্জাস্থান ঢাকার প্রবণতা রয়েছে। আর এর বিপরীতে যদি কেউ বিবস্ত্র হওয়াকে গর্ববোধের কারণ মনে করে, তাহলে বুঝতে হবে তার প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে। আর এ ধরনের মানুষকেই আল্লাহ তাআলা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করেছেন; বরং এসব মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ চতুষ্পদ জন্তু জানে না যে লজ্জাস্থান আবৃত করতে হয়। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ তাআলা বিবেক-বুদ্ধি, হিতাহিত জ্ঞান দিয়েছেন। আবার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের ওপর আসমানী বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। প্রত্যেক নবীই-রাসূলই পোশাকের বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন। এরপরও যদি মানুষ অযথা বিবস্ত্র বা উলঙ্গ হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা ঠিকই বলেছেন, এসব মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট এবং এরাই হচ্ছে গাফিল, অনবহিত, এদের কোনো বোধশক্তি নেই। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِى الْمَلَيْحِ قَالَ دَخَلَ بِنِسْوَةٍ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مِمَّنْ اَنْتُمْ قُلْنَ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ– قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِىْ تَدْخُلُ نِسَاءُهَا الْحَمَّامَاتِ ؟ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ اَمَّا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنِ امْرَاَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِهَا اِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ–

অর্থ: আবু মালীহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাম দেশের কতিপয় মহিলা আয়িশা (রা.)-এর নিকট গমন করেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের দেশ কোথায়? তারা বলেন, আমরা শাম দেশের অধিবাসী। আয়িশা (রা.) বলেন, সম্ভবত তোমরা সেখানের অধিবাসী যেখানের মহিলারা গোসল খানায় বিবস্ত্র অবস্থায় গমন করে? তারা বললো, হাঁ। তখন তিনি বলেন, সাবধান! আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে সমস্ত মহিলারা স্বীয় ঘর ছাড়া অন্য জায়গায় বিবস্ত্র হয়, তারা নিজেদের ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।[১৭৩]

عَنْ يَّعْلٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يَّغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللهَ حَيٌّ سِتِّيْرُ يُّحِبُّ الْحَيَاءَ وَ السِّتْرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ–

১৭৩. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: হাম্মাম বা গোসলখানা, খ. ২, পৃ. ২০০, হাদীস নং- ৪০১০

অর্থ: ইয়ালা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে খোলা ময়দানে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করতে দেখেন। এরপর তিনি মিম্বরে ওঠে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করার পর ইরশাদ করেন- মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, পর্দাকারী, তিনি লজ্জা ও পর্দাকারীদের ভালবাসেন। আর তোমাদের কেউ যখন গোসল করে, তখন সে যেন তার সতর ঢেকে রাখে।[১৭৪]

عَنْ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدُ هٰذَا مِنْ اَصْحَابِ الصَّفَّةِ اَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَنَا وَ فَخِذِىْ مُنْكَشِفَةُ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةً–

অর্থ: জারহাদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। জারহাদ (রা.) আসহাব-সুফ্‌ফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট বসেন। এসময় আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তিনি বলেন- তুমি কি জানো না রানও সতরের অন্তর্গত?[১৭৫]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَ لاَ تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَّ لاَ مَيِّتٍ–

অর্থ: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- তুমি তোমার রানকে খুলবে না এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তির রানের দিকে তাকাবে না।[১৭৬]

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيْلاً فَبَيْنَا اَمْشِىْ فَسَقَطَ عَنِّىْ يَعْنِىْ ثَوْبِىْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَ لاَ تَمْشُوْا عُرَاةً–

অর্থ: মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি একটি ভারী পাথর বহনকালে আমার কাপড় খুলে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন- তুমি তোমার কাপড় কিভাবে পরিধান করো?
তুমি বিবস্ত্র অবস্থায় চলা ফেরা করবে না।[১৭৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الاِيْمَانِ–

অর্থ: ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: লজ্জা হলো ঈমানের অংশ।[১৭৮]

অন্য হাদীসে এসেছে – عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا لَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ–

অর্থ: আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমার লজ্জা না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করো।[১৭৯]

**বিবস্ত্রবাদ শারীরিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ**

বিবস্ত্র বা নগ্নতা বলতে পোশাকহীন শারীরিক অবস্থাকে বোঝায়। মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পোশাক পরিধান করা, যার প্রয়োজনীয়তা কার্যকরী চাহিদা থেকে উদ্ভূত। ধর্মীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বস্ত্র পরিধান করা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানুষের ০৫টি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বস্ত্র। সাধারণভাবে শালীনতাবোধ বিবস্ত্র বা নগ্ন হওয়াকে সমর্থন করে না। আদিকাল থেকেই মানুষ কাপড় পরিধান করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে সারাবিশ্বে বিবস্ত্র বা নগ্ন হওয়া যেন ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে। কিছু লোক বিবস্ত্র বা নগ্ন হওয়াকে সভ্যতা ও আধুনিকতার প্রতীক মনে করছে। পাশ্চাত্যের কালচার অনুসরণের নামে আমাদের সমাজে কে কতো বেশি বিবস্ত্র হতে পারে এর প্রতিযোগিতা চলছে। কানাডীয় এক জরিপে দেখা যায় ৩৯% কানাডীয় ঘরে বিবস্ত্র অবস্থায় হাঁটাচলা করে এবং ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় এ হার ৫১%। বিবস্ত্রবাদীদের জন্য বিভিন্ন ক্লাব, সেন্টার, রিসোর্ট এবং অন্যকোনো সুবিধাজনক স্থান স্থাপন করা হয় এবং জার্মানির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্যমত অংশ হলো বিবস্ত্রবাদ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অবশ্য 'ফ্রি

১৭৪. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: উলঙ্গ না হওয়া, খ. ২, পৃ. ২০১, হাদীস নং- ৪০১২
১৭৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০১, হাদীস নং- ৪০১৪
১৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০১, হাদীস নং- ৪০১৫
১৭৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: বিবস্ত্র হওয়া, খ. ২, পৃ. ২০১, হাদীস নং- ৪০১৬
১৭৮. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: লজ্জা, খ. ২, পৃ. ৩১৮, হাদীস নং- ৪৭৯৫
১৭৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৮, হাদীস নং- ৪৭৯৭

বডি কালচার'-এর এই ঝোঁক কমে আসছে। তবে সুইমিং পুল, ব্যায়মাগার, সমুদ্র সৈকত, স্পা সেন্টার এমনকি পার্কেও বিবস্ত্রতাবাদের এই ঐতিহ্য পালন করে অনেকেই। অন্য অনেক দেশের তুলনায় জার্মানির সৈকতে বা স্টিম বাথগুলোতে 'বিবস্ত্রবাদ' অনেক সহনীয় একটি ব্যাপার।

বিবস্ত্রবাদ বা প্রকৃতিবাদকে ইংরেজিতে Naturism বা Nudism বলা হয়। এটি হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক নগ্নতার ব্যক্তিগত ও জন প্রকাশ্যরূপ লাভের উদ্দেশ্যে এক প্রকার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে নগ্নতাকে জনপ্রিয় করা ও বিবস্ত্রতার প্রসার ঘটানো। এর পেছনে আছে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার ধারণা। জার্মানী থেকে বিবস্ত্রতাবাদের মূল আন্দোলন শুরু হয়ে পরবর্তীতে ইংল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। ফরাসিরা বিবস্ত্রতাবাদের প্রসারে দীর্ঘমেয়াদী ছুটিতে নগ্নতা উপভোগের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বড় কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছে। এই ধারণা পরবর্তীতে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রেও প্রসারিত হয়েছে। এমনকি বিবস্ত্রতাবাদী পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র বা রিসোর্স তৈরি হয়েছে। এটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ক্যারিবীয় অঞ্চলে।

কিন্তু প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে হলে বিবস্ত্র হতে হবে তা ভ্রান্ত ধারণা। এটি একটি চরম অভিশাপ। বাস্তবে এ ধারণার মূল উদ্দেশ্য হলো বিকৃত যৌন ইচ্ছা। যৌন ইচ্ছার বিকৃতির ফলেই বিবস্ত্রবাদের সৃষ্টি। যৌনতাকে সহজলভ্য করা এবং যৌন কাজ করতে গিয়ে যাতে বাধার সম্মুখীন না হয়, মানুষ যাতে অবাধ যৌনতা করতে গিয়ে ধর্মীয় বা সামাজিক বাধার মুখে পড়তে না হয় সে জন্যই বিবস্ত্রবাদ। আর সেখান থেকেই পর্ণোগ্রাফির সৃষ্টি। বর্তমানে পর্ণোগ্রাফির এ মহামারীতে সারাবিশ্ব আক্রান্ত। এই কুকর্মে সরাসরি জড়িতদের জীবন তো শেষই, যারা এই সেক্সী ফিল্ম দেখে তাদের দাম্পত্য জীবনও ধ্বংস। নগ্ন ছবি দেখার ফলে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ (Frontal Loob) নষ্ট হয়ে যায়। যৌন উত্তেজনামূলক নোংরা ফিল্ম দেখার অভ্যাস মাদকদ্রব্য সেবনের মতোই এক ঘৃণ্য ক্ষতিকর অভ্যাস।

Cambridge University-এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, pornography দর্শনের ফলে দর্শকের মস্তিষ্ক মাদকদ্রব্য সেবনকারী মস্তিষ্কের মতো হয়ে যায়। ফলে মাদকদ্রব্য সেবন না করে যেমন অভ্যাসগ্রস্ত ব্যক্তির স্বস্তি ও শান্তি আসে না, ঠিক তেমনি অবস্থা ঘটে পর্ণোগ্রাফি দর্শনের অভ্যাসীর। গবেষক Gordon S. Bruin বলেন, আমি ২০ বছর নোংরা ফিল্ম দর্শনের অভ্যাসীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, যৌন মিলনের ফিল্ম দেখার অভ্যাস মাদ্রকদ্রব্য সেবনে অভ্যাসের মত একটি প্রকৃত ব্যাধি।

বড় পরিতাপের বিষয়, আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে আজ যত্র-তত্র নোংরা ছবির ছড়াছড়ি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ২৮,০০০ মানুষ নোংরা সাইটে প্রবেশ করে পশুর মত যৌনমিলন দর্শন করছে। এদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ হলো মহিলা। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এমন দৃশ্য দেখার সাথে সাথে মাথার সম্মুখ ভাগ হতে dopamine এবং oxytocin পদার্থ খুব বেশি পরিমাণে ক্ষরণ হতে থাকে। এতে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগের কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, মস্তিষ্কের dopamine এই অংশটি গাড়ির ব্রেকের মত। কেউ ব্রেকহীন গাড়ি চালালে যেকোনো সময় যেমন দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, তেমনি অতিরিক্ত পর্ণোগ্রাফ দেখার ফলে নিজের ব্যক্তিত্বও হারিয়ে ফেলতে পারে। কারণ উক্ত পদার্থ অধিক ক্ষরণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

এছাড়া dopamine পদার্থটি মানুষের মানসিক সুখের জন্য অতীব জরুরী একটি জিনিস। যখনই প্রচুর অর্থোপার্জন বা কোনো বিশাল সফলতার মতো সুখের বিষয় হয়, তখনই উক্ত পদার্থ ক্ষরণ হতে থাকে এবং একারণেই আমরা সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করি। কিন্তু মানুষ পর্ণোগ্রাফি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে dopamine পদার্থ বেশি পরিমাণে ক্ষরণ হয়ে ধীরে ধীরে মানসিক সুখের কোষগুলো দুর্বল হয়ে এক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে এমন ব্যক্তি পরবর্তীতে কোনো বিষয়ে আর তেমন সুখানুভব করে না, যেমন পূর্বে করতো। তখন সে এমন কিছু অনুসন্ধান করে, যা আরো বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ঠিক যেমনটি মাদকাসক্তির ফলে ঘটে থাকে। যা এক সময় মস্তিষ্কের বিশেষ কোষগুলো বিকল হয়ে যায় এবং হরমোন, হৃদরোগ, ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

মাদকাসক্তরা যতটা আসক্তি মাদকদ্রব্যের প্রতি রাখে, তার থেকে বেশি আসক্তি আসে বিবস্ত্র নারীদেহ ও যৌনমিলন দর্শনের প্রতি। মাদকদ্রব্য যতটা ক্ষতি করে, এর থেকে বেশি ক্ষতি করে এসব নোংরা বিষয় দর্শনের মাধ্যমে উষ্ণ তৃপ্তি গ্রহণকারীদের। কিন্তু নেশার  ঘোরে ক্ষতিগ্রস্তরা সে ক্ষতির বিষয় অনুভবও করতে পারে না। মানুষের মাঝে বিশ্বাস রক্ষার

দায়িত্ব পালনের জন্যও oxytocin নামক মস্তিষ্কের এই পদার্থটি কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে বিশ্বস্ততা থাকে তাও মূলত উক্ত পদার্থই সৃষ্টি করে থাকে। অধিক পরিমাণে বিবস্ত্র ও পর্ণোগ্রাফি দৃশ্য দেখলে উক্ত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণ হয়। এতে তার মনে সৃষ্টি হয় কাল্পনিক নারী নেশা ও যৌনক্ষুধা এবং দাম্পত্য জীবন হয় ক্ষতিগ্রস্ত, ভেঙ্গে যায় আবেগ ও সম্প্রীতির জীবন। বিবস্ত্র অবস্থায় বিপরীত লিঙ্গ দেখার ফলে যুবক-যুবতী হস্তমৈথুন বা অন্য কোনো বিরল মৈথুনে আসক্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে কাল্পনিক কোনো যৌনময় জগতে বসবাস শুরু করে, যা স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক যৌনজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তখন বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন যৌনক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম বৈ অন্য কিছু মনে হয় না এবং বাস্তব দাম্পত্য সুখের কথা মন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। অত:পর বিবাহ করলেও অসফল ও অসুখী থেকে যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ জন্ম নেয়। পরিশেষে কাল্পনিক যৌনাচার, পরকীয়া বা ব্যভিচারের মাধ্যমে সুখ খুঁজতে গিয়ে ঐ দম্পত্তির সংসারের শিশমহল ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যায়।

তাছাড়া অশ্লীল দৃশ্য দেখার কারণে দেহমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তা ঠাণ্ডা করতে গিয়ে হস্তমৈথুন বা অন্য কোনো বিরল যৌনাচারে লিপ্ত হয়। তাতেও তৃপ্তি না পেলে এবং সহমতালম্বী সঙ্গী পেলে ব্যভিচার অথবা সমকামের মাধ্যমে মনের আগুন নির্বাপিত করে ও নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে এবং সেটা তার স্বাভাবিক চরিত্রে পরিণত হয়। আর সহমতাবলম্বী সঙ্গী না পেলে ধর্ষণের মতো আরো বড় অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

Dr. Victor B. Cline বলেন, অশ্লীল ছবি দর্শকের চরিত্র বিরল প্রকৃতির হয়ে ওঠে। সুতরাং বলাৎকার, ইভটিজিং, শিশু অপহরণ ইত্যাদির মতো অপরাধ তার স্বাভাবিক আচরণ হয়ে যায়।
অথচ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তিত পর্দা প্রথা কুরআন-হাদীসের নীতিমালা মোতাবেক অনুসরণ করলে একজন মানুষের বিবস্ত্র হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হাদীসে এসেছে-

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عِنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَانَاتِىْ مِنْهَا وَ نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَّ يَرِيَنَّهَا اَحَدُ فَلاَ يَرِيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِذَا كَانَ اَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ–

অর্থ: বাহয ইবন হাকীম (রা.) তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের সতর কাদের থেকে আবৃত রাখবো? তিনি (সা.) ইরশাদ করেন- তুমি তোমার সতর স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য সকলের নিকট থেকে ঢেকে রাখবে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন লোকেরা পরস্পর মিলে-মিশে থাকবে? তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন- যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় যে কেউ তোমার সতর দেখবে না, তবে এরূপ করবে; যাতে তোমার সতর কেউ দেখতে না পারে। তিনি বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমাদের কেউ নির্জনে থাকবে? তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি লজ্জা করবে।[১৮০]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَ لاَ الْمَرْاَةُ اِلٰى عُرْيَةِ الْمَرْاَةِ وَ لاَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَّ لاَ تُقْضِى الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَرْاَةِ فِىْ ثَوْبٍ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন- কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষের সতরের দিকে না তাকায় এবং কোনো স্ত্রীলোক যেন অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সতরের দিকে না তাকায়। আর কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে শয়ন না করে এবং কোনো স্ত্রীলোক যেন অন্য স্ত্রীলোকের সাথে এক কাপড়ের নিচে শয়ন না করে।[১৮১]

---

১৮০.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: হাম্মাম/গোসলখানা, অনুচ্ছেদ: বিবস্ত্র হওয়া, খ. ২, পৃ. ২০১, হাদীস নং- ৪০১৭
১৮১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: হাম্মাম/গোসলখানা, অনুচ্ছেদ: বিবস্ত্র হওয়া, খ. ২, পৃ. ২০১, হাদীস নং- ৪০১৮

## মহিলাদের পায়ের পাতা ঢেকে রাখার নির্দেশনায় শারীরিক সুস্থতা

মহিলাদের পায়ের পাতা ঢেকে রাখা পর্দার অংশ এবং এর মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ মহিলারা যদি পায়ের গোড়ালির উপরে কাপড় পরিধান করে তাহলে তাদের নারীজনিত হরমোনের হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে। এতে তাদের ভ্যাজাইনাল ইনফ্লামেশন, কোমর ব্যথা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও খিঁচুনী ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেবে।[১৮২] হাদীসে এসেছে-

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ ذَكَرَ الْاِزَارَ فَالْمَرْاَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ تُرْخِىْ شِبْرًا قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِذًا يَّنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعُ لاَّ تَزِيْدُ عَلَيْهِ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পায়জামা নিয়ে আলোচনা প্রসংগে আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলারা পায়জামা কতটুকু লম্বা করবে? তিনি (সা.) ইরশাদ করেন- তারা পায়ের গোছা থেকে এক বিঘত লম্বা করবে। তখন উম্মু সালামা (রা.) বলেন, এতে তো মহিলাদের সতর খোলা থাকবে। তিনি (সা.) ইরশাদ করেন- তবে এক হাত লম্বা করবে, এর অধিক নয়।[১৮৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ اِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের পায়জামাকে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা (গোছা থেকে) করার অনুমতি দেন। অত:পর তাঁরা এর থেকে আরো এক বিঘত লম্বা করার অনুমতি চাইলে, তিনি (সা.) অনুমতি দেন। নবী কারীম (সা.)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের কাপড় আমাদের নিকট পাঠালে আমরা তা হাত দিয়ে মেপে দিতাম।[১৮৪]

### ইসতিঞ্জায় পানি ব্যবহার করা

বর্তমান বিশ্বে যাদেরকে সভ্যতা ও আদর্শের প্রতীক বলে মনে করা হয়, বাস্তবে সেই ইউরোপীয় জীবন আজ কলূষিত ও দুর্গন্ধময়। সেখানে তাদের অধিকাংশ লোকই পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা সারে না। প্রস্রাব-পায়খানা করার পর কেবল টয়লেট টিস্যু বা কাপড় দিয়েই পরিষ্কারের কাজ চালিয়ে দেয়। ফলে দুর্গন্ধময় ময়লা-আবর্জনা শরীরে আটকে থাকায় শরীরে বিভিন্ন রোগ বাসা বাধে। তবে বর্তমানে পাশ্চাত্যবাসীর কোথাও কোথাও মুসলমানদেরকে দেখে মল-মূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যদিও ইসতিঞ্জা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারই যথেষ্ট, পানি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রস্রাব-পায়খানা করার পর কোনো শোষণকারী জিনিস যেমন: পাথর, মাটির শুষ্ক ঢিলা, টয়লেট পেপার বা কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি দিয়ে যতই পরিষ্কার করা হোক না কেন তথাপি এসকল স্থানে দুর্গন্ধ এবং অদৃশ্যভাবে এর সূক্ষ্ম কণাসমূহ লেগে থাকে, যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। তাছাড়া পুরুষাঙ্গের রগসমূহ এমনভাবে প্যাঁচানো রয়েছে প্রস্রাবের পর ঢিলা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেও এতে স্বল্প পরিমাণ প্রস্রাবের ফোঁটা থেকেই যায়। ধুয়ে নিলে পানির শীতলতায় প্রস্রাবের নালী সংকোচিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তা বেরিয়ে আসে এবং সাথে সাথে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়। কিন্তু অন্যান্য জাতি প্রস্রাবের ফোঁটা থেকে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করে না। প্রস্রাব করেই প্যান্টের বোতাম বা চেইন বন্ধ করে দেয়, লুঙ্গি ছেড়ে দেয়, পায়জামা পড়ে নেয় বা ধুতির সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা শরীর ঢেকে নেয়। এতে প্রস্রাবের অবশিষ্ট ফোঁটা উরুতে লেগে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে হাদীসে খুবই সতর্ক করা হয়েছে।

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ...

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী কারীম (সা.) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে ইরশাদ করলেন: নিশ্চয়ই এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের এই শাস্তি কোনো বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য

১৮২. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৪, ১৩৫
১৮৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: মহিলাদের পায়জামা লম্বা করা, খ. ২, পৃ. ২১৪, হাদীস নং- ৪১১৭
১৮৪. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খ. ২, পৃ. ২১৪, হাদীস নং- ৪১১৯

নয়। অত:পর তিনি (সা.) একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বলেন, এই ব্যক্তিকে প্রস্রাব হতে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে।[১৮৫]...

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ইসতিঞ্জার পর শুধু ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করলে পূর্ণ শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পানি ব্যবহারে তা নরমালে চলে আসে। সুতরাং শরীরের তাপমাত্রা সর্বদা স্বাভাবিক রেখে সুস্থ থাকার ক্ষেত্রেও মল-মূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

বাস্তবে পানি হলো পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত এবং যাবতীয় কলূষতাকে পবিত্রতায় রূপান্তরিত করার অন্যতম মাধ্যম। ইসলাম পরিচ্ছন্নতা পদ্ধতিকে এত সুন্দর ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে পানি যেন আমাদেরকে সর্বদা সুস্থতার দিকে আহবান করছে। লন্ডনের হার্ড স্টেটের বিশিষ্ট ডাক্তার কেনন ডেভিস সমগ্র ইউরোপীয় জাতিকে কড়া সতর্ক করে বলেছেন, তোমরা যদি এভাবেই জীবন-যাপন করতে থাক, তা হলে নিম্নোক্ত রোগ-ব্যাধির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। লিঙ্গ ক্যান্সার, ভগন্দর, চর্ম ইনফেকশন ও ফুসফুসের রোগ।জ্যান্ট মিলন নামের জনৈক খ্রিস্টান বলেন, ইসলাম হলো পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ধর্ম। দেহের কোনো অংশ অপবিত্র হলে পানি ব্যবহার ছাড়া ঐ অংশকে পরিষ্কার করলে দেখা যাবে তা ভালভাবে পরিষ্কারই হয়নি।

তাই নবী করীম (সা.) এবং সাহাবীগণের অনেকেই মলমূত্র ত্যাগের পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করার পাশাপাশি পানিও ব্যবহার করার কারণে আল্লাহ ত'আলা তাঁদের এই আমলের প্রতি খুশি হয়ে ইরশাদ করেন-

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ–

অর্থ: তাতে (কোবায়) এমন লোক রয়েছে, যারা অধিকতর পবিত্রতা পছন্দ করে। আর আল্লাহ তাআলা অধিক পবিত্রতা পছন্দকারীদের পছন্দ করেন।[১৮৬]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোবা এলাকার সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন যে তারা পাক-পবিত্রতা পছন্দ করেন। তাঁদের সে পবিত্রতা কী ছিল? এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ، اِنَّ اللهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ هٰذَا؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَتَوَضُّ لِلصَّلَاةِ وَ نَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ– فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَهَلْ مَعَ ذٰلِكَ غَيْرُهُ؟ قَالُوْا لاَ غَيْرَ اَنَّ اَحَدَنَا اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ اَحَبَّ اَنْ يَّسْتَنْجِىَ بِالْمَاءِ – فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ–

অর্থ: হে আনসারী দল! আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতার উত্তম প্রশংসা করেছেন। তোমাদের ঐ পবিত্রতা কী? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সালাতের জন্য অযু করি এবং গোসল ফরয হলে গোসল করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এর সাথে কি আরো কোনো বিষয় আছে? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর কোনো বিষয় নেই, তবে শৌচাগার থেকে বের হলে আমাদের প্রত্যেকেই পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতে পছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এটাই সেই পবিত্রতা (আল্লাহ যার কারণে তোমাদের প্রশংসা করেছেন)। সুতরাং এটাকে তোমরা গুরুত্বের সাথে ধরে রাখবে।[১৮৭]

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইসতিঞ্জার পর শুধু ঢিলা ব্যবহারে সীমাদ্ধ না থেকে ঢিলার পর পানি ব্যবহার করা উত্তম। এটাই আনসারী সাহাবীগণের মাযহাব। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কোবাবাসীর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন তিনি অধিকতর পবিত্রতা অর্জনকারীর লোকদের পছন্দ করেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مُرْنَ اَزْوَاجَكُنَّ اَنْ يَّغْسِلُوْا اَثَرَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَ اَنَا اَسْتَحْيِيْهِمْ–

---

১৮৫. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জন করা, খ. ১, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ২০

১৮৬. আল-কুরআন, ৯: ১০৮

১৮৭. সুনান ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা করা, খ. ১, পৃ. ২২২, ২২৩, হাদীস নং ৩৫৫

অর্থ: আয়িশা (রা.) মহিলাদের বলেছেন, তোমরা নিজেদের স্বামীদের নির্দেশ দাও, তারা যেন প্রস্রাব-পায়খানার চিহ্ন ধুয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এমনি করতেন। তাদেরকে (তোমাদের স্বামীদের) বলতে আমার লজ্জা লাগে।[১৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ اَجِىْءُ اَنَا وَ غُلَامٌ مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِىْ يَسْتَنْجِىْ بِهِ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম অর্থাৎ তিনি তা দিয়ে ইসতিঞ্জা করতেন।[১৮৯]

১৮৮. আল্লামা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর, *জামিউল মুসনাদ ওয়াস্ সুনান*, লেবানন, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪, খ. ৩৯, পৃ. ৪২৩,

১৮৯.*সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা করা, খ. ১, পৃ. ৫৪, হাদীস নং- ১৫০

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্পর্কিত নির্দেশনা

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | চিকিৎসা গ্রহণে হাদীসের নির্দেশনা |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | ইসলাম ও ছোঁয়াচে রোগ |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | চিকিৎসা ক্ষেত্রে হারাম দ্রব্যের ব্যবহার |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | : | চিকিৎসক ও সঠিক নিয়মে ঔষধ সেবন |

## প্রথম পরিচ্ছেদ: চিকিৎসা গ্রহণে হাদীসের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলার নিকট একমাত্র মনোনীত দীন বা জীবন বিধান হলো ইসলাম।[১] মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় তথা সকল স্তরে এবং সার্বিক বিষয়ে সব সমস্যার সমাধান এতে নিহিত রয়েছে। সুতরাং ইসলাম যেহেতু ধারণা নির্ভর কোনো ধর্ম নয়; বরং কুসংস্কার মুক্ত, প্রগতিশীল ও যুক্তিসঙ্গত একটি ধর্ম। তাই সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামে যেমন সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে, তেমনি হাদীস শাস্ত্রেচিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিতও যথেষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং সে সকল নির্দেশনানুযায়ী মানব জীবন পরিচালনা করলেচিকিৎসার ক্ষেত্রে উদ্ভূত অনেকজটিল বিষয়েও সমাধান এবং আরোগ্যের পথ সুগম করা সম্ভব।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কাল নির্বিশেষে সকল মানুষই স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কামনা করে থাকে। একজন রোগী নিজের জন্য যেমন বোঝা, পরিবার ও সমাজের জন্যও বোঝা। রোগাক্রমণে মানব দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ায় দীর্ঘ দিনের একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক জীবনও খুব সহজে অচল হয়ে পড়ে। চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টাকরা হয়। সুতরাং রোগব্যাধি হলে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এর সুষ্ঠু চিকিৎসা করানো, দক্ষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করা, এ সবই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) চিকিৎসা বর্জন করাকে কখনো বৈধ মনে করতেন না। আবার তারা এমনও ছিলেন না যে চিকিৎসার ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যেতেন। তাই অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়; বরং চিকিৎসা গ্রহণ করাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। এ পরিচ্ছেদে তা আলোচনা করা হলো।
অসুস্থ হলে ডাক্তারের নিকট যাওয়া বা চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কিনাএ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

**প্রথম অভিমত:** একদল মুসলমান মনে করেন, রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণ করা বা ডাক্তারের নিকট যাওয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। কেননা রোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এবং তিনি হলেন সবচেয়ে বড় আরোগ্য প্রদানকারী। তিনি রোগের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। আর মুমিনগণের উচিত আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার সময় তাওয়াক্কুল করা। তাই অসুস্থ হলে এর চিকিৎসা না করে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করাই উচিত। সুতরাং অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। তারা নিজেদের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটি উপস্থাপন করে থাকেন-

عَن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ... فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ... هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَ لاَ يَكْتَوُوْنَ وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী কারীম (সা.) আমাদের নিকট আগমন করে ইরশাদ করেন... বলা হলো, ঐ সবই আপনার উম্মত এবং তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ... তাঁরা হবে ঐসব লোক যাঁরা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না; বরং তাঁরা তাঁদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে।[২]

**দ্বিতীয় অভিমত:** আরেক দল মুসলমান মনে করেন, অসুস্থ হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া এবং এর চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ বা পরিপন্থী নয়। তবে চিকিৎসা গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারণ করা তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর। যেমন: হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আবু দারদা (রা.) সহ অনেক তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও বুযুর্গদের চিকিৎসা গ্রহণ না করার ব্যাপারে যে কথা ও ঘটনা বর্ণিত আছে, তাঁরা তাওয়াক্কুলের উচ্চতর লাভের আশায় তা অবলম্বন করেছেন।[৩]

---

১. **اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الاِسْلاَمُ** অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন (ধর্ম) হলো ইসলাম। -আল-কুরআন, ৩: ১৯

২.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি ঝাড়-ফুঁক করে না, খ. ২, পৃ. ১৬৩১-১৬৩২, হাদীস নং- ৫৭৫২

৩. মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা*, ঢাকা: মিরপুর, সা'দ প্রকাশনী, জুলাই ২০০৯, পৃ. ২৪

**তৃতীয় অভিমত:** অধিকাংশ মুলমান মনে করেন, অসুস্থ হলে রোগের চিকিৎসা করা এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া কোনোক্রমেই তাওয়াক্কুল বা তাওয়াক্কুলের উচ্চস্তরের পরিপন্থী নয়; বরং অসুস্থ হলে ঘরে বসে না থেকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করানো ইসলামের মূল নির্দেশনা। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ–

অর্থ: জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে মহান ও মহিয়ান আল্লাহর হুকুমে রোগ নিরাময় হয়।[৪]

উল্লিখিত হাদীস সর্ম্পকে ইমাম নববী (রহ.) বলেন-

قال الامام النووى– فى هذا الحديث إشارة الى استحباب الدواء، و هو مذهب أصحابنا و جمهور السلف و عامة الخلف ... و فيها رد على من أنكر التداوى من علاة الصوفية، و قال كل شيء بقضاء و قدر، فلا حاجة إلى التداوى، و حجة العلماء هذه الأحاديث، و يعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، و أن التداوى هو أيضا من قدر الله، و هذا كالأمر بالدعاء و كالأمر بقتال الكفار و بالتحصن و مجانبة الإلقاء إلى التهلكة–

অর্থ: উল্লিখিত হাদীসে চিকিৎসা গ্রহণ মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর এটাই আমাদের ইমামগণ ও (জমহুর) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমদের মত... এ হাদীসে কট্টরপন্থী সূফীগণ, যারা চিকিৎসাকে অস্বীকার করেন এবং চিকিৎসাকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করেন, তাদের কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে। তারা একথা বলেন, সবকিছু তাকদীর অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার হুকুমে হয়। অতএব, চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন নেই। আলেমগণের দলীল এ সমস্ত চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস। তারা এই আকীদা রাখেন, আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত কর্তা ও প্রভাব বিস্তারকারী। চিকিৎসা গ্রহণও তাকদীরের আওতাভূক্ত। ইহা দু'আ করা, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং নিজেকে স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার হুকুমের ন্যায়।[৫]

**চিকিৎসা করানোর নির্দেশনা**

হাদীসের কিতাবসমূহে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক হাদীস বর্ণিত হলেও তন্মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট হাদীসটি হলো-

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ شَهِدْتُ الْاَعْرَابَ يَسْاَلُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ...فَقَتلُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحُ اَنْ لاَّ نَتَدَاوَى؟ قَالَتَدَاوَوْاعِبَادَ اللهِ! فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً اِلاَّ الْهَرَمَ–

অর্থ: উসামা ইবন শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে কিছু গ্রাম্য লোকদের প্রশ্ন করতে শুনেছি।... তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চিকিৎসা গ্রহণ না করাতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! ঔষধ গ্রহণ করো, কেননা আল্লাহ তাআলা বার্ধক্য ছাড়া এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার সাথে শিফা পাঠাননি।[৬]

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) গুরুত্বসহকারে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল ও তাওয়াক্কুলের উচ্চ স্তরের পরিপন্থী হতে পারে না। অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ خِزَامَةَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرَايْتَ اَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا، وَ رُقًى نَسْتَرْقِىْ بِهَا، وَ تُقًى نَتَّقِيْهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ هِيَ قَدَرِ اللهِ–

---

৪. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তান: করাচি, বুশরা পাবলিশার্স, ২০০৯, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ৩৪২, হাদীস নং- ৫৭৩৫

৫. মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মাআরিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সব রোগেরই আল্লাহ শিফা দিয়েছেন, খ. ৪, পৃ. ৮৭-৮৮, হাদীস নং- ৩৪৩৬

অর্থ: আবু খিযামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেপ্রশ্ন করা হলো, যেসকল ঔষধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করি এবং যেসকল তাবিজ মাদুলি দ্বারা আমরা ঝাড়-ফুঁক করি এবং যেসকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? সেগুলো কি আল্লাহর তাকদীরকে রদ করতে পারে? তিনি বললেন, সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভূক্ত।[৭] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا اَنْزَلَ اللهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহ এমন কোনো রোগ দেননি, যার শিফা তিনি পাঠাননি।[৮]হাদীসে আরো এসেছে-

عَنْ اَبِیْ رِمْثَةِ فِیْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ اَبِیْ اَرِنِیْ هٰذَا الَّذِیْ بِظَهْرِكَ فَاِنِّیْ رَجُلُ طَبِيْبُ قَالَ اللهُ الطَّبِيْبُ بَلْ اَنْتَ رَجُلُ رَّفِيْقُ طَبِيْبُهَا الَّذِیْ خَلَقَهَا–

অর্থ: আবু রিমছা (রা.) এক হাদীসে বর্ণনা করেন, আমার পিতা নবী কারীম (সা.)-কে বলেন, আমি একজন ডাক্তার, আপনার পিঠে কী হয়েছে তা আমাকে দেখান। তখন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: ডাক্তার তো আল্লাহই। বরং তুমি রোগীর একজন বন্ধু। আসল ডাক্তার তো তিনিই, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন।[৯]

আর এজন্যই পূর্বেকার বুযুর্গগণ নিজ নিজ ব্যবস্থাপত্রের ওপর هُوَ الشَّافِى(হুয়াশ শাফী) অর্থাৎ আল্লাহই আরোগ্যদানকারী লিখতেন, যাতে ডাক্তার এবং রোগী উভয়েরই স্মরণ থাকে যে আরোগ্যদানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। চিকিৎসক এবং ঔষধ আরোগ্যের অছিলা মাত্র।

**মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ রয়েছে**

হযরত উসামা ইবনে শরীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুঈন আরবরা একবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করবোনা? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন:

نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً اَوْ قَالَ دَوَاءً اِلاَّ دَاءً وَاحِدًا– قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا هُوَ؟ قَالَ الْهَرَمُ–

অর্থ: হাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার কোনো প্রতিষেধক তিনি রাখেননি। কিন্তু একটি রোগের কোনো প্রতিষেধক নেই। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কী? তিনি ইরশাদ করলেন: বার্ধক্য।[১০]

উক্ত হাদীস দ্বারা তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়-

(১)বার্ধক্য ব্যতীত প্রত্যেক রোগেরই উপযুক্ত চিকিৎসা রয়েছে। কোনো রোগের ক্ষেত্রেই নিরাশ হওয়া ঠিক নয়।

(২) ঔষধপত্র ব্যবহার ও চিকিৎসা গ্রহণ নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নাত। আর তা বর্জন করা নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী।

(৩)বৃদ্ধাবস্থায় যৌবন প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখা নিরর্থক। এটা এমন জিনিস নয় যে প্রত্যাশা করলেই ফিরে আসবে। তাই বেশি বয়স হলে প্রশান্ত চিত্তে বার্ধক্যকে গ্রহণ করে নেয়া উচিত।হযরত হিলাল ইবনে ইসাফ (রা.) বর্ণনা করেন-

قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَّعُوْدُه– فَقَالَ اَرْسِلُوْا اِلٰى طَبِيْبٍ– فَقَالَ قَائِلُ وَ اَنْتَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ نَعَمْ، اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ له دَوَاءً–

---

৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সব রোগেরই আল্লাহ শিফা দিয়েছেন, খ. ৪, পৃ. ৮৮-৮৯, হাদীস নং- ৩৪৩৭

৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৩৪৩৯

৯. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ, ২০০৪, অধ্যায়: চিরুনি করা, অনুচ্ছেদ: খিযাব, খ. ২, পৃ. ২২৬, হাদীস নং- ৪২০৭

১০. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঔষধ গ্রহণ ও চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহকরণ, খ. ২, পৃ. ৬৮, হাদীস নং- ২০৩৮

অর্থ: একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্যে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি রোগীর নিকট উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন, ডাক্তার ডেকে আনো। একথা শুনে উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!আপনিও এরূপ বলছেন?রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ঔষধ প্রেরণ করেননি।[১১]

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ঔষধপত্র ব্যবহারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। উক্ত হাদীস দ্বারাও দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়-

**প্রথমত:** চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়; বরং এটা নবী কারীম (সা.)-এর প্রকৃত সুন্নাতেরই অন্তর্ভূক্ত।

**দ্বিতীয়ত:** রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে ঔষধের নিজস্ব কোনো গুণ বা ক্ষমতা নেই; বরং আল্লাহ তাআলাই এতে রোগ মুক্তির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেয়ায় মানুষ তা সেবন করে সুস্থ হয়। আর ঔষধ রোগ মুক্তির কারণ এবং অছিলা তখনই হয়, যখন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন। তিনি যদি ইচ্ছা না করেন, কোন ঔষধই কার্যকরী হয় না। এমন কি চিকিৎসক সঠিক ঔষধই নির্বাচন করতে পারে না। বাস্তবেও দেখা যায়, যখন কারো মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারও সঠিক রোগ ও ঔষধ নির্ণয় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

**প্রথম পক্ষের দলীলের জবাব**

প্রথম পক্ষ রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী বলে তাদের অভিমত প্রমাণের জন্য যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তা যথাস্থানে সঠিক হলেও এখানে তা সঠিক নয়। কারণ হাদীসের অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে একথা সহজেই অনুমেয় হয় যে উক্ত হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো প্রকার চিকিৎসা গ্রহণ না করে শুধু তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য ধারণের কথা কোথাও বলেননি; বরং উক্ত হাদীস দ্বারা তিনি বর্বরতা ও অন্ধকার যুগের প্রচলিত রীতি-নীতি, হারাম ও কুফরী মন্ত্র-তন্ত্র এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন মাত্র। তাই এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

فالرقية فى ذاتها ليست ممنوعة، و إنما منع منها ما كان شركًا أو احتمله، و من ثم قال صلى الله عليه و سلم اعرضوا على رقاكم، و لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ففيه إشارة إلى علة النهى–

অর্থ: ঝাড়-ফুঁক মূলত নিষিদ্ধ নয়। তবে শিরকী বা শিরক সম্ভাব্য ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করা হয়েছে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ঝাড়-ফুঁক (পদ্ধতি) আমার নিকট পেশ করো। শিরক না হলে ঝাড়-ফুঁক করতে অসুবিধা নেই। তিনি (ইবন হাজার) বলেন, এই হাদীসে (ঝাড়-ফুঁক) নিষেধাজ্ঞার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১২]যেমন অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاءَكُمْ لاَ بَاسَ بِالرُّقٰى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا–

অর্থ: আওফ ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জালেী যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম। তখন আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একে কী রূপ মনে করেন? তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা ঝাড়-ফুঁক (পদ্ধতি) আমার সামনে পেশ করো, কেননা যখন মন্ত্রের মধ্যে শিরকের কিছু থাকবে না, তা করাতে কোনো ক্ষতি নেই।[১৩] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الرُّقٰى فَجَاءَ اٰلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنَّهٗ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَ اِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى– قَالَ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرٰى بَاْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ–

---

১১. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, লেবানন: বৈরুত, মাকতাবাতু আল-মানারুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ১৩৩

১২. আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ, তা. বি. খ. ১১, পৃ. ৪০৯,

১৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাঁড়-ফুক, খ. ২, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং- ৩৮৯০

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সময় ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিলেন। তখন আমর ইবন হাযম গোষ্ঠীর লোকেরা এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে একটি মন্ত্র ছিল, যা দিয়ে আমরা বিচ্ছুর কামড়ে ঝাড়-ফুঁক করতাম। আর আপনি তো তা নিষেধ করে দিয়েছেন। রাবী (জাবির রা.) বলেন, তারা তাঁর কাছে তা পেশ করল (শোনাল)। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: কোনো অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের কোনো উপকার করতে সক্ষম হলে সে যেন তার উপকার করে।[১৪]

**ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের বিধান**

হযরত আব্দুল্লাহ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.) বলেন- আমার স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) আমার গলায় সামান্য একটু সুতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমি উত্তরে বললাম, এক ব্যক্তি ঝাড়-ফুঁক দিয়ে আমাকে এটা গলায় বাঁধার জন্যে দিয়েছে। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন- "হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের গৃহিনী! তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষী হইও না। কেননা আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ঝাড়-ফুঁক, পৈতা এবং যাদু শিরকের অন্তর্ভূক্ত। হযরত যয়নব (রা.) বলেন, আমি আমার স্বামীকে বললাম, আমার চোখে অসুখ হলে অমুক ইয়াহুদীর কাছে গিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতাম এবং তার মাধ্যমেই সুস্থ হয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? একথা শুনে হযরত আব্দল্লাহ (রা.) বলেন-

اِنَّمَا ذٰلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخِسُهَا بِيَدِه– فَاِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَقُوْلِىْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ– وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ– لَا شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ– شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سَقْمًا–

অর্থ: এটা একটা শয়তানী আমল, যা ঐ ব্যক্তি তার নিজের হাতে করতো। যখন মন্ত্রপড়া শেষ হতো তখন শয়তান দূর হয়ে যেতো। তোমার জন্য তাই পাঠ করা উচিত ছিলো, যা নবী করীম (সা.) পাঠ করতেন। আর তাহলো- হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন। হে রোগ আরোগ্যকারী! শিফা দান করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্যদানকারী নেই। আপনার শেফা এমন যার পর আর কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকবে না।[১৫]

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হযরত যায়নব (রা.) ইয়াহুদীর ঝাড়-ফুঁককে নিজের সুস্থতার একমাত্র মাধ্যম মনে করেছিলেন, আর তাই তাঁর এ বিশ্বাসকে স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) সাথে সাথে প্রতিবাদ করে এটাকে শয়তানী আমল বা কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ ঐ ব্যক্তি নিজে যাদুময় শিরকী মন্ত্র পাঠ করে চিকিৎসা করতো।

হাদীসে এসেছে عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِاَهْلِ بَيْتٍ مِنَ لْاَنْصَارِ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসারীদের একটি পরিবারের লোকদের বিষাক্ত প্রাণির বিষক্রিয়া (আরোগ্য লাভের জন্য) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।[১৬]আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُهَا اَنْ تَسْتَرْقِىَ مَنَ الْعَيْنِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নযর লাগা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার হুকুম করতেন।[১৭]অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ، فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِىْ حُمَةٍ–

অর্থ: আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পিতা আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আয়িশা (রা.)-কে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) সবরকমের বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।[১৮]অন্য হাদীসে এসেছে-

১৪. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*,পাকিস্তান, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছে: নযর লাগা ... ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ৩৩৬, হাদীস নং- ৫৭২৫

১৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: গলায় তাবিজ ব্যবহার, খ. ২, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং- ৩৮৮৭

১৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাম, অনুচ্ছে: নযর লাগা ... ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং- ৫৭১২

১৭. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৪, হাদীস নং- ৫৭১৪

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ وَ هِيَ تَشْتَكِي وَ يَهُوْدِيَّةٌ تَرْقِيْهَا– فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ارْقِيْهَا بِكِتَابِ اللهِ–

অর্থ: আমরাহ বিনত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আয়িশা (রা.)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং জনৈক ইয়াহুদী মহিলা (কিছু) পাঠ করে তাঁর ওপর দম করছিলেন। আবু বকর (রা.) বললেন, কালামুল্লাহ (তাওরাত বা কুরআন) পড়ে দম করো।[১৯]

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়, পবিত্র কুরআন ছাড়া অপরাপর আসমানী (ঐশী) কিতাব দ্বারাও ঝাড়ফুঁক কিংবা তাবীয করা জায়েয আছে। উলামায়ে আহলে সুন্নাতের অভিমত হলো- তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ঝাড়ফুঁক তথা তাবীয গণ্ডা জায়েয আছে। যথা- (১) ঝাড়ফুঁক আল্লাহর নাম কিংবা আল্লাহর গুণবাচক নাম হতে হবে। (২) আবরী ভাষা হতে হবে কিংবা এমন ভাষা হতে হবে যা নিজে বলতে সক্ষম হয় এবং এতে শরীয়ত বিরোধী কোনো কথা না থাকে। (৩) বিশ্বাস থাকতে হবে যে, মন্ত্র বা তাবীয রোগ নিরাময়ের উসীলা মাত্র। এতে রোগ নিবারণের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, প্রকৃত রোগ নিরাময়কারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।[২০]

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, যারা ঢালাওভাবে ঝাড়-ফুঁককে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী বলেন, তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তাআলার নামে শরীয়ত সমর্থিত ঝাড়-ফুঁক মূলত আল্লাহ তাআলা ওপর তাওয়াক্কুলেরই বহি:প্রকাশ এবং তাঁর প্রতি শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর নামের বরকত গ্রহণের দাবি রাখে। তাই আল্লাহ তাআলার নাম বা কালামের ঝাড়-ফুঁক যদি তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে দুআও প্রতিবন্ধক ও পরিপন্থী বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.), তাঁর সাহাবী (রা.) ও পরবর্তী তাঁর অনুসারীগণও ঝাড়-ফুঁক করেছেন। সুতরাং অসুস্থতার ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণ করাকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করলে তাঁরা দুআ ও ঝাড়-ফুঁকও করতেন না।[২১]

**দ্বিতীয় পক্ষের অভিমতের জবাব**

দ্বিতীয় পক্ষ যে অভিমত দিয়েছে- অসুস্থতার ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারণ করা তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর,এটি আসলে গ্রহণযোগ্য অভিমত হতে পারে না। কারণ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আবু দারদা (রা.) সহ অনেক তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও অন্যান্য আল্লাহ ওয়ালাগণ মূলত রোগের ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ফযীলত অর্জনের লক্ষে চিকিৎসা গ্রহণ করেননি এবং তাঁদের এ পদক্ষেপ তাওয়াক্কুলের উচ্চস্তরের পরিপন্থী হওয়ার কারণেছিল না। কেননা তাঁরা এর আগেই তাওয়াক্কুলের উচ্চস্তরে উপনীত ছিলেন। এর বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহ.)-এর জীবনে। তিনি নিজেরচোখের চিকিৎসা না করে সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তা ছিল নিম্ন বর্ণিত হাদীসের ফযীলত লাভের উদ্দেশ্য-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: আমি যদি আমার কোনো বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি জিনিসের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করবো। আনাস (রা.) বলেন, দু'টি প্রিয় জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়।[২২]

---

১৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সাপ কিংবা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁক দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬২৯, হাদীস নং-৫৭৪১

১৯. মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, পাকিস্তান, করাচি, মাকতাবাতুল বুশরা: ২০১১, অধ্যায়: কিতাবুল জামি, অনুচ্ছেদ: রোগের সময় তাবীয বা ঝাড়ফুঁক করা, খ. ৩, পৃ. ৫৮৪, হাদীস নং- ১৭০৭

২০. মালিক ইবন আনাস, (অনুবাদ: মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী),*মুয়াত্তা ইমাম মালিক*,ঢাকা: ইসলামিকফাউন্ডেশন, ২০০১ (তৃতীয় সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ৬৬৩

২১. মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন,*ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মারজা, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে তার ফযীলত, খ. ২, পৃ. ১৬০৭,হাদীস নং- ৫৬৫৩

এছাড়া এমন রোগের কথাও হাদীসে বর্ণিত আছে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক ফযীলতপূর্ণ। যেমন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন–اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ।

অর্থ: প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি মুসলমানের জন্য শাহাদাত হিসেবে গণ্য হবে।[২৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন –اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ।

অর্থ: প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।[২৪]
সুতরাংতাঁরা বিশেষ কিছু রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে হাদীসে বর্ণিত ফযীলত লাভের আশা পোষণ করতেন। কিন্তু সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা গ্রহণ না করার কথা বলা হয়নি।

তাছাড়া আল্লাহর ওলীগণ আরো মনে করতেন- রোগে পতিত হলে মানুষের অন্তর নরম থাকায় আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে দুআয় মশগুল এবং তাওবা-ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকে। আর এমতাবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তি গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে জান্নাতের উপযোগী হয়। সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য রোগ-ব্যাধি আল্লাহ তাআলার অধিক নৈকট্য লাভের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে। তাই অসুস্থ হলে চিকিৎসা না করিয়ে তাওয়াক্কুলের নাম দিয়ে ঘরে বসে থাকা তা কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত নয়; বরং যথাসাধ্য চিকিৎসা করানোই হলো প্রকৃত সুন্নাত এবং প্রকৃত নির্দেশনা।

---

২৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্লেগ রোগের বর্ণনা, খ. ২, পৃ. ১৬২৭, হাদীস নং- ৫৭৩২; *জামি আত-তিরমিযী*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়া, খ. ২, পৃ. ১৮০, হাদীস নং-২৪০০
২৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্লেগ রোগের বর্ণনা, খ. ২, পৃ. ১৬২৭, হাদীস নং- ৫৭৩৩

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলাম ও ছোঁয়াচে রোগ

প্রত্যেক মুসলমান মনে প্রাণে বিশ্বাস কওে এবিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এবং ফায়সালাতেই হচ্ছে। সকল কর্মকাণ্ডের পেছনে যেসব উপকরণকে বাহ্যিক কার্যকারণ হিসেবে দেখা যায় সেসব বিষয় যদিও বাস্তব, তবে এসবের কার্য ও ক্রিয়া করার মূল ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তাআলা কোনো বস্তুতে ক্রিয়া করার ক্ষমতা না দিলে এগুলো তা সম্পন্ন করতে কখনো সক্ষম হবে না। এজন্যই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার পরও আল্লাহর হুকুম না থাকার কারণে আগুন তাঁকে পোড়াতে পারেনি; বরং আগুন শান্তিময় ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ

অর্থ: আমি বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের ওপর শান্তিময় ঠান্ডা হয়ে যাও।[২৫]

এমনিভাবেসুস্থতা-অসুস্থতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। সুস্থতার যেমন বিভিন্ন কারণ রয়েছে, তদ্রূপ অসুস্থতারও বিভিন্ন কারণ আছে। তাই মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় সর্দি বা জ্বর হওয়া বা রোগাক্রান্ত হওয়ার একটি কারণ এটিও যে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে যাওয়া। এটি একটি বাস্তববিষয়। শরীয়ত একে অস্বীকার করেনি। তবে অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে যে কথা, ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রেও একই কথা তথা কোনো বস্তুরকার্য ও ক্রিয়া করার নিজস্ব কোনোক্ষমতা নেই। তাই আল্লাহ তাআলা ইরাদা করলে রোগাক্রান্ত হবে নতুবা হবে না। এজন্যই দেখা যায়, সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে যাওয়ার পরও অনেকে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় না। আবার সংক্রামক রোগীর নিকট না গিয়েও অনেকে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। যদিও একজন মুমিন হিসেবেএক্ষেত্রে আকীদা সহীহ রাখা খুবই চ্যালেঞ্জের বিষয়।

### ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে যেমন নানা উপকারী নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন, তেমনিমানুষের ক্ষতিকর বহু রোগ-ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ এবং ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসও সৃষ্টি করেছেন।আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে দেখি যে অসুস্থ মানুষের সংক্রমণে অন্যজন আক্রান্তহয়ে রোগে ভুগছে বা মারা যাচ্ছে। অথচ কেউ কেউ হাদীসে বর্ণিত একটি বাক্য“রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই” উল্লেখ করে ছোঁয়াচে রোগের ধারণা সম্পর্কে ইসলামে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে। তাদের ভাষ্য হলো, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে জীবাণু বিস্তারের দ্বারা এক প্রাণি থেকে অন্য প্রাণিতে সংক্রমণ রোগের ধারণা ও বাস্তবতা নিশ্চিত। কাজেই এ ক্ষেত্রে হাদীসের বক্তব্য মোটেও সঠিক নয়।

এক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য হলো- ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে যারা ঢালাওভাবে ইসলামের নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরে, তারা আসলে ইসলামের অর্ধেক সত্যটি উপস্থাপন করে থাকে। কারণ এ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এক প্রাণি থেকে অন্য প্রাণিতে রোগের জীবাণু ছড়ানো এই প্রাকৃতিক নিয়মটিকে ইসলাম কখনো অস্বীকার করে না। তাই রোগ ব্যাধি ছোঁয়াচে হওয়া এবং না হওয়া সম্পর্কে হাদীস ও ব্যাখ্যাসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-
প্রথমত কোনো কোনো হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামে ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই। যেমন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ عَدْوٰى وَ لاَ طِيَرَةَ وَ لاَ هَامَةَ وَ لاَ صَفَرَ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: রোগের কোন সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের প্রতীক নয়, সফর মাসের কোন অশুভ নেই।[২৬]অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لاَ صَفَرَ وَ لاَ هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا بَالُ اِبِلِىْ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَاْتِى الْبَعِيْرُ الاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ اَعْدَى الاَوَّلَ–

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: রোগের কোন সংক্রমণ নেই, সফর মাসেও অশুভ নেই, আর পেঁচার মধ্যেও কোন কুলক্ষণ নেই। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে উটের এ দশা কেন হয়, উটের পাল ময়দানে হরিণের মত বিচরণ করে। এমতাবস্থায় তাদের সাথে চর্মরোগাক্রান্ত

---

২৫. আল-কুরআন, ২১: ৬৯
২৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কুষ্ঠ রোগ, খ. ২, পৃ. ১৬২১, হাদীস নং- ৫৭০৭

একটি উট এসে মিশে যায় এবং এদেরকেও চর্ম রোগাক্রান্ত করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, আচ্ছা! তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা হতে আসল?[২৭]

দ্বিতীয়ত কোনো কোনো হাদীস দ্বারা ছোঁয়াচে রোগের সমর্থন পাওয়া যায়। এমনকি অনেক হাদীসে ছোঁয়াচে রোগকে অস্বীকার তো করেই না; বরং ছোঁয়াচে বা সংক্রমণ রোগ হওয়া থেকে সতর্ক থাকতে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِرُّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- কুষ্ঠ রোগী হতে এমনভাবে পলায়ন করো, যেমন তুমি বাঘ হতে পলায়ন করো।[২৮]

হযরত আবূ সালামা বিন আব্দুর রহমান বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছি-

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-لاَ يُوْرِدُوْا مُمْرِضُ عَلٰى الْمُصِحِّ

অর্থ: অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত করা যাবে না।[২৯]

কেননা আল্লাহর হুকুমে সুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত হলে সে তার তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস না করে ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করবে, যা ঈমান সাংঘর্ষিক। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–لاَ تُدِيْمُوا النَّظَرَ اِلٰى الْمَجْذُوْمِيْنَ

অর্থ: কোষ্ঠ রোগীদের দিকে তোমরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকো না।[৩০] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَقَالَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَا اُخْبِرُكَ عَنْهُقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا عَلَيْهِ وَ اِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا فِرَارًا–

অর্থ: আমির ইবন সাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উসামা ইবন যায়েদ (রা.) সাদ (রা.) বললেন, আমি তোমাকে সে বিষয়ে অবহিত করছি। ... রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোনো এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ শোনো, তখন সেই এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান করো তথায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে সেখান থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেয়ো না।[৩১]

সুতরাং বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই ছিলেন Quarantine নামক concept-এর প্রথম আবিষ্কারক। তিনি প্লেগ রোগের আবির্ভাবে Quarantine (NO IN NO OUT) নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। যা বর্তমানে করোনা মহামারী থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সারাবিশ্বে স্বীকৃত একটি উত্তম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

**ইসলাম ছোঁয়াচে রোগকে অস্বীকার করে না**

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম কখনো ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। অন্যথায় হাদীসে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় ঢুকতে এবং সেখান থেকে বের হতে নিষেধ করা হতো না। এর কারণ তো এটাই যে, মহামারী এলাকায় প্রবেশ করলে প্রবেশকারীও মহামারীতে আক্রান্ত হতে পারে। আর ঐ এলাকা থেকে বের হলে তার সাথে ঐ রোগ বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে ছোঁয়াচে রোগ আছে বলেই প্রমাণিত হয়।

সুতরাং বিভিন্ন হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, এর দ্বারা মূলত সংক্রামক রোগকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং একথা দ্বারা জাহেলী ও অন্ধকার যুগের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, নির্দিষ্ট এমন কিছু ব্যাধি রয়েছে যা আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়াই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অথচ 'সংক্রামক রোগ' নিজ শক্তিতে কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না

২৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সফর পেটের পীড়া ব্যতীত কিছুই নয়, খ. ২, পৃ. ১৬২৩, হাদীস নং- ৫৭১৭
২৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: কুষ্ঠ রোগ, খ. ২, পৃ. ১৬২১, হাদীস নং- ৫৭০৭
২৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: কোনো সংক্রামক নেই, খ. ২, পৃ. ১৬৩৮, হাদীস নং- ৫৭৭৪
৩০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কুষ্ঠরোগ, খ. ৪, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং- ৩৫৪৩
৩১. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাম, অনুচ্ছেদ: প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা ইত্যাদি, খ. ৬, পৃ. ৩৫৭, হাদীস নং- ৫৭৬৯

করেন। কেননা আল্লাহ তাআলা চাইলে যে রোগের মাঝে সংক্রমণের শক্তি সৃষ্টি করেছেন, সে রোগ থেকে সংক্রমণের শক্তি রহিতও করতে পারেন।[৩২]

ডাক্তারী পরীক্ষায় যদি এ কথা প্রমাণিত হয়, রোগ-জীবাণু একজনের শরীর থেকে অপরজনের শরীরে প্রবেশ করে, তবুও এ মতটি যে সমস্ত হাদীসে সংক্রামক ব্যাধি বলতে বাস্তবে কিছু নেই বলা হয়েছে, সে সমস্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা হাদীসে لَاعَدْوٰ বলে ছোঁয়াচে রোগকে অস্বীকার করা হয়নি; বরং জীবাণুর মধ্যে যে সংক্রামক ব্যাধি বলতে বাস্তবে কিছু নেই, এর দ্বারা তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই এ কথাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং জাহেলী যুগে জীবাণুর নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলে যে বিশ্বাস করা হতো, তা নি:সন্দেহে শিরক ও কুফর হওয়ার কারণে সে কথা রদ করা হয়েছে মাত্র।

মোটকথা, হাদীসে ছোঁয়াচে রোগকে অস্বীকার করা হয়নি; বরং ভ্রান্ত আকীদাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। দুনিয়া হলোসাধারণ নিয়মে উপকরণ নির্ভরস্থান। এ হিসেবে আল্লাহ তাআলা তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী প্রায় সকল কার্যক্রম আসবাবের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন। আসবাব ও উপকরণসমূহের মধ্য হতে ছোঁয়চে বা সংক্রামক ব্যাধিও একটি উপকরণ। তবে প্রতিটি মুমিনের এ বিশ্বাস রাখা অবশ্যই জরুরী- পার্থিব জগতের অন্যান্য আসবাব ও উপকরণসমূহের ন্যায় এটিও কার্যত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা থাকলে উক্ত আসবাব ও উপকরণ যথারীতি প্রতিক্রিয়াশীল হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুম না থাকলে উক্ত আসবাব ও উপকরণ প্রতিক্রিয়াহীন বা বিফল হয়ে যাবে। অতএব, রোগী থেকে সতর্ক থাকা তাওয়াক্কুল ও শরীআত পরিপন্থী নয়; বরং রোগ ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে রোগী থেকে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়।

হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে রোগ-মুসীবতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে, জীবনকালে সে উক্ত রোগ-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।[৩৩]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً–

উল্লিখিত হাদীস থেকেও রোগ সংক্রমণ হয় বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা না হলে উক্ত দু'আ পড়লে ঐ রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি মুসীবত থেকে নিরাপদে থাকার কোনো অর্থই হয়না। এ দু'আ না পড়লে ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায়ই দুআটি পড়তে বলা হয়েছে।

শারীদ গোত্রের আমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

كَانَ فِىْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلُ مَجْذُوْمُ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ–

অর্থ: সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে জনৈক কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী কারীম (সা.) লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন: তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বায়আত করে নিয়েছি।[৩৪]

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে- তাহলে হাদীসে কেন এ কথা বলা হলো "সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই।" এর উত্তর হাদীসের মূল বক্তব্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে। হাদীসে সাহাবীগণ যখন এক উটের সংস্পর্শে অন্য উটের রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: "প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে?" অর্থাৎ, এই রোগের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহতাআলা। যখন কেউ রোগাক্রান্ত ছিলো না তখন এই রোগ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রথম রোগাক্রান্ত প্রাণি তো কারো নিকট থেকে সংক্রমণের শিকার হয়নি। রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয় বটে, কিন্তু জীবাণু সংক্রমিত হওয়া মানেই রোগ সংক্রমিত হওয়া না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সুস্থ রাখেন, যাকে ইচ্ছা রোগাক্রান্ত করেন। যদি আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি না থাকে, তাহলে জীবাণু সংক্রমিত হলেও রোগ হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সংক্রমিত হওয়ারও যেমন সামর্থ্য নেই, আবার সংক্রমিত হয়েও কারো দেহে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিও এটাই বলে যে- জীবাণু সংক্রমিত হওয়া মানেই রোগ সংক্রমিত হওয়া না। জীবাণু সংক্রমিত হলেও অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত হয় না। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (র.) বলেন-সুতরাং যদি

---

৩২. *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩৩.ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পাকিস্তান: করাচি, মাকতাবাতুল বুশরা, ২০১০, অধ্যায়: দুআ, অনুচ্ছেদ: বিভিন্ন সময়ের দুআ, খ. ২, পৃ. ৫০২, হাদীস নং- ২৪২৯

৩৪. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কুষ্ঠরোগ , খ. ৪, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং- ৩৫৪৪

জানা যায়, কোনো বস্তু সংঘটিত হওয়াতে সঠিক কারণ রয়েছে, তাহলে তাকে কারণ হিসেবে বিশ্বাস করা বৈধ। কিন্তু নিছক ধারণা করে কোনো ঘটনায় অন্য বস্তুর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কোনো বস্তু নিজে নিজেই অন্য ঘটনার কারণ হতে পারে না। তাই ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন- "অসুস্থ উটের মালিক যেন সুস্থ উটের মালিকের উটের কাছে অসুস্থ উটগুলো নিয়ে না যায়"। সুস্থ উটগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এ রকম ইরশাদ করেছেন। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- "বাঘের ভয়ে তুমি যেমন পলায়ন করো, কুষ্ঠ রোগী দেখেও তুমি সেভাবে পলায়ন করো।"[৩৫]

অন্যান্য সুস্থ লোকেরা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এখানে রোগের চলমান শক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে রোগ নিজস্ব ক্ষমতাবলে অন্যজনের কাছে চলে যায়, তা অনিবার্য নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন।[৩৬]

বর্ণিত আছে- একজন কুষ্ঠ রোগী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসলে তিনি (সা.) তার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর ওপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করে তুমি আমার সাথে খাও।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা ছিল যে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা না করলে এ কুষ্ট রোগ হবে না। তাই তিনি কুষ্ঠ রোগীকে খাবারে শরীক করেছিলেন।কিন্তু কিছু রোগ ছোঁয়াচে হওয়ার ব্যাপারে সমাজে যে প্রচলন রয়েছে যেমন- কুষ্ঠ রোগ, কলেরা, করোনা ভাইরাস ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ রোগী থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন প্রতিরোধমূলক তদবীর ও আসবাব (উপকরণ) গ্রহণার্থে। কেননা এগুলো গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল ও তকদীরের পরিপন্থী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস এমন থাকবে যে উপকরণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তার নিজস্ব কোনো প্রভাব নয়; বরং এসব আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ছোঁয়াচে রোগের হাদীস দ্বারা সতর্ক করেছেন যে এ ধরণের রোগ যদিও সংক্রামক, কিন্তু এর সংক্রমণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, এর নিজস্ব কোন শক্তি, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নেই।

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরেকটু পরিষ্কার করা যায়-আমরা জানি সাপ,বিচ্ছু বা পিঁপড়া এগুলো আল্লাহর সৃষ্ট জীব। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সামর্থ্য আল্লাহ তাআলা এদেরকে দান করেছেন। তেমনিভাবে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াও আল্লাহর সৃষ্টজীবকণা। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর হওয়ার সামর্থ্য আল্লাহ তাআলা এদেরকেও দান করেছেন। আর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভাষায় জীবকণার স্থানান্তর হওয়ার আরেকনামইহচ্ছে সংক্রমণ। সুতরাং সাপ, বিচ্ছু বাপিঁপড়াদেখা যায় বলে এদের স্থানান্তরণ যদি আমরা মেনে নিতে পারি, তাহলে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া খালি চোখে দেখা যায় না বলে এদের স্থানান্তরণ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে, সাপ-বিচ্ছু কামড় দিলে মানুষ মারা যেতে পারে, তবে মারা যাওয়া নিশ্চিত নয়। তারপরও আমরা সাপ থেকে সতর্কতামূলক দূরে থাকি। এমন সতর্কতা অবলম্বন করার কারণে আকিদা নষ্ট হয় না। এমনিভাবে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করলে অসুস্থ হয়ে মানুষ মারা যেতে পারে। কিন্তু রোগ হওয়া বা মারা যাওয়া নিশ্চিত নয়। সুতরাং ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া থেকেওসতর্কতামূলকদূরে থাকলে আকিদা নষ্ট হবে না। গর্তে সাপ থাকার সন্দেহেএতে হাত ঢুকাতে নিষেধ করা যেমন যৌক্তিক, তেমনিভাবে রোগের কারণ (জীবাণু) ছড়ানোর দ্বারা একটা ঝুকিপূর্ণ অংশের মৃত্যু ঘটার আশঙ্কায় সমাগম এড়িয়ে চলার বিষয়টিও যৌক্তিক।

সাপের কামড়ে বা আগুনে পুড়ে লোকটি মারা গেছে- এ কথা বলা জায়েয। কিন্তু সাপের কামড়বা আগুনকেই তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ মনে করা যাবে না। এমন মনে করলে ইসলামের দৃষ্টিতে আকিদা নষ্ট হয়ে যাবে। ভাইরাসের সংক্রমণে লোকটি মারা গেছে- একথা বলা জায়েয,কিন্তু ভাইরাসকেই মারা যাওয়ার প্রকৃত কারণ মনে করা জায়েয নয়। যেমন বাস নিজে নিজে আসতে পারে না, এটাকে ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে আসে। এরপরও বাস এসেছে বলা জায়েয, এভাবে বলা প্রচলিত। সব আসবাবের ক্ষেত্রে ঠিক একই কথা। আসবাবের দিকে ফলাফলকে সম্পর্কিত করা জায়েয। তবে

---

৩৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কোনো সংক্রামক নেই, খ. ২, পৃ. ১৬৩৮, হাদীস নং- ৫৭৭৪

৩৬. *https://www.muslimmedia.info*(থেকে উদ্ধৃত)

৩৭. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: কুষ্ঠ রোগীর সাথে আহার করা, খ. ২, পৃ. ১১, হাদীস নং- ১৮১৭

আসবাবকে ফলাফলের প্রকৃত কারণ মনে করা আকিদার বিপরীত। আসবাবের মধ্যে প্রভাব আছে। আল্লাহ তাআলা চাইলে এই প্রভাব প্রতিফলিত হয়, ইচ্ছা না করলে হয় না। সব ক্ষেত্রে একই কথা, রোগ হোক বা অন্য কিছু।

সুতরাং রোগীর সংস্পর্শে গেলেই ঐ ব্যক্তির শরীরে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করবে বা সংক্রামিত হয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, এমন বিশ্বাস চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও করে না। তাই প্রায়ই দেখা যায়, কোন জটিল রোগীর সংস্পর্শে যারা গেছে তাদের সবাইকে টেস্ট করা হয়। অতএব রোগীর সংস্পর্শে গেলেই যদি রোগ সংক্রমণ হওয়া নিশ্চিত হতো, তাহলে আর সবাইকে টেস্ট করানোর প্রয়োজন হতো না; ধরেই নেয়া হতোযে সবাই সংক্রমিত হয়েছে। কিন্তু এমনটি নয়; বরং টেস্টের পর ফলাফল নেগেটিভ আসলেও কেউ বলে না যে কিভাবে নেগেটিভ হলো?

তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) 'লা আদওয়া' বলে রোগের স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তরকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু সংক্রমণের সম্ভাবনাকে (রোগের কারণ ছড়িয়ে পড়াকে) অস্বীকার করেননি। কারণ সংক্রমণকে অস্বীকার করা বাস্তবতা বিরোধী। এ বিষয়টি অন্য সব আসবাবের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি এখানেও। মূল পার্থক্যটা হলো বস্তুবাদীরা আসবাবকে প্রকৃত কারণ মনে করে, আর মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে প্রকৃত কারণ মনে করে।

সুতরাং বলা যায়, হযরত সাদ (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী মহামারী বা এ জাতীয় মারাত্মক কোনো রোগের বিস্তার ঠেকাতেরাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো এলাকায় আসা-যাওয়ার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা বৈধতা রয়েছে এবং সাধারণ সুস্থতা সংক্ষণের লক্ষে এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করা ওয়াজিব পর্যায়ের। মহামারী, কুষ্ঠ এবং এ জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে ইমাম গাযালী ও হাফিয ইবন কায়্যিম (রহ.) শরীয়তের রহস্যও বর্ণনা করেছেন। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন- মহামারী আক্রান্ত শহরের লোকদেরকে বাইরে যেতে এজন্য বাধা দেয়া হয়েছে, বাহ্যিকভাবে যাদেরকে সুস্থ দেখা যায় তাদেরও মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রাথমিক পর্যায়ে অসুখের প্রভাব প্রকাশ পায় না। কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আসা-যাওয়ার কারণে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।[৩৮]

হাফেয ইবন কায়্যিম (রহ.) বলেন- বাইরে থেকে সুস্থ ব্যক্তির রোগাক্রান্ত শহরে প্রবেশ নিষেধের যেসব রহস্য বর্ণনা করেছেন এগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো, মেলামেশার কারণে এসব রোগ বৃদ্ধি পায়। এজন্য যেসকল লোক বাইরে আছে এবং সুস্থ আছে তাদের জন্য অন্যায়ভাবে নিজেকে বিপদে ফেলা উচিত হবে না।[৩৯]
যদিও হাদীসের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে এই নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা ওয়াজিব পর্যায়ের, না তানযিহী পর্যায়ের। হাফেয ইবন হাজার ও বগভী (রহ.)-এর মতে, এই নিষেধাজ্ঞা ওয়াজিব পর্যায়ের নয়।
আর এ মতটিই নিম্নোক্ত মূলনীতির সাথে বেশি সামঞ্জস্য রাখে-যেখানে কোনো শরঈ অনুমোদিত খারাপের কারণে নিষেধ নয়; বরং ডাক্তারী ও স্বভাবসুলভ উপকারের লক্ষে হয়, যাকে মূলনীতিবিদগণ 'নাহী ইরশাদ' বলে থাকেন, সেখানে তা হারাম হতে পারে না। কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তির কাজের সঙ্গে যেহেতু ব্যাপক সুস্থতা ও অসুস্থতার সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রশাসন ব্যাপক উপকারের বিষয় লক্ষ্য করে কতক বিশেষ কড়াকড়ি আরোপের অধিকার রাখে। যেমনভাবে ফোকাহায়ে কিরাম দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার লক্ষে মূল্য নির্ধারণ করার অনুমতি দিয়েছেন ।তেমনিভাবে ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সুস্থতাকে সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রশাসন এরকম কড়াকড়ি আরোপ করতে পারে। আর এটা ঐ সময়, যখন নিষেধাজ্ঞা হারাম পর্যায়ের না হয়। কিন্তু ইবন হাজার (রহ.) অধিকাংশ আলেম থেকে এর হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।[৪০]
এমতাবস্থায় এই কড়াকড়ি ও বাধ্য-বাধকতা শুধু প্রশাসনের পক্ষ থেকেই নয়; বরং শরীয়তের পক্ষ থেকেও হবে।

---

৩৮. আবু হামিদ মোহাম্মাদ ইবন মোহাম্মদ আল-গাযযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৯৬, খ. ৪, পৃ. ২৯১
৩৯. প্রিন্সিপাল হাফেজ নযর আহমদ, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান), *তিব্বে নববী* ,ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, মার্চ ২০০২(চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ৪৯
৪০. *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৮৯

**মহামারী এলাকায় অবস্থানের নির্দেশনা**

ছোঁয়াচে রোগ বা রোগের সংক্রমণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা বাস্তবেও দেখতে পাই যে, রোগীর কাছে বা চারপাশে থেকেও অনেক মানুষ সুস্থ রয়েছে। আবার অনেক সতর্কতার পরেও মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বস্তুত শুধু রোগ জীবাণুর সংক্রমনেই যদি রোগ হতো তাহলে আমরা সকলেই অসুস্থ হয়ে যেতাম, কারণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকারের রোগ জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করছে।

রোগ জীবাণুর পাশাপাশি মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, রোগ জীবাণুর কর্মক্ষমতা ইত্যাদি অনেক কিছুর সমন্বয়ে মানুষের দেহে রোগের প্রকাশ ঘটে।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সংক্রমণ প্রতিরোধে বিচ্ছিন্নকরণ (quarantine) ব্যবস্থার নির্দেশনা প্রদান করেন। মুমিন বিশ্বাস করে যে সকল বিষয়ের ন্যায় রোগের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এজন্য সংক্রমণের ভয়ে অস্থির বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পাশাপাশি যে সব রোগ সংক্রমণ জাতীয়, তা বিস্তার রোধে ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

মুমিনগণ বিশ্বাস করে থাকে, মহামারী ও বালা-মুসীবত মানুষের গুনাহেরই ফসল। বান্দা যখন বেপরোয়াভাবে গুনাহ করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তখন তাকে সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলেন। যেন সে গুনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ–

অর্থ: স্থলে ও সমুদ্রে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৪১]

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَ اَعُوْذُ بِاللهِ اَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ، حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَ الْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِىْ اَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا–

অর্থ: যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার ঘটে তখন সেখানে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেবে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।[৪২]

তাই এমন মহামারী ও বালা মুসীবতে মুমিনের মুনির আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সে সর্বদা আল্লাহর ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের ওপর সমর্পিত থাকবে এবং গুনাহ পরিত্যা করে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে চলবে, এতে সে চিন্তামুক্ত থাকবে। এমন মহামারীতে খুব বেশি পেরেশান হলে মানসিক অবস্থা দুর্বল হয়ে আরো নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَ لاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ–

অর্থ: জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।[৪৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন কোনো ব্যক্তি মহামারীতে পতিত হয় এবং নেকির আশায় সে ধৈর্যসহকারে সেখানে অবস্থান করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ তাআলার হুকুম ব্যতিত কিছুই হয় না, তাহলে সে শহীদ ব্যক্তির সাওয়াবের সমান সাওয়াব পায়।[৪৪]

---

৪১. আল-কুরআন, ৩০: ৪১

৪২. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: ফিতনা, অনুচ্ছেদ: শাস্তি প্রদান, খ. ৪, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮, হাদীস নং-৪০১৯

৪৩. আল-কুরআন, ১০: ৬২

৪৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্লেগ রোগে ধৈর্যধারণকারীর সাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৬২৭, হাদীস নং- ৫৭৩৪

**মহামারী অবস্থায় মুমিন বান্দার করণীয়**

রোগ-শোক ও মহামারীর সময় কোনো মুমিন বান্দা অসুস্থ হয়ে গেলে যথাসম্ভব অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবনের পাশাপাশি তাঁর করণীয় হলো-

(ক) আল্লাহর স্মরণ ও যিকির বাড়িয়ে দেয়া। বেশি বেশি তাওবা ইস্তেগফার ও দুআ করা।

(খ) হাদীসের বর্ণনানুযায়ী নিম্নের দু'টি দুআ বেশি বেশি পাঠ করা-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُوْنِ وَ مِنْ سَىِّءِ الْاَسْقَامِ–

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারাসি, ওয়াল জুযামি, ওয়াল জুনূনি ওয়া মিন সায়্যিল আসকামি)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামী ও দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।[৪৫]

(গ) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দুআ পড়া- বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

(ঘ) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত- 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমীন' দুআটি বেশি বেশি পাঠ করা। কেননা হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে বিপদে পতিত হয়ে এই দুআটি পাঠ করে তিনি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। সুতরাং কোনো মুসলিম যখনই এই দুআ করে আল্লাহ অবশ্যই তার দুআ কবুল থাকেন।[৪৬]

(ঙ) বেশি বেশি দান সাদকা করা। কেননা, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দান-সাদকা ও সৎ কর্ম অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

(ছ) বেশি বেশি কুরআন শরীফ এবং সালাত আদায় করা। কেননা, হাদীসে এ দুই বিষয়ে রোগ মুক্তির কথা বলা হয়েছে।[৪৭]

(জ) পূর্বের চেয়ে বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অযু অবস্থায় থাকা এবং ঘরবাড়ি ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা। যত্রতত্র কফ, থুথু এবং নাকের ময়লা না ফেলা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ আরো ইরশাদ করেন: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[৪৮]

(ঞ) অভিজ্ঞ ডাক্তার ও সরকার কর্তৃক সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার জন্য যেসকল পরামর্শ, ঔষধপত্র এবং নির্দেশনা প্রদান করা হয়, শরীয়ত বিরোধী না হলে তা যথাযথ অনুসরণ করা। একান্তই যদি বের হতে হয়, তাহলে দুআ পড়ে বের হওয়া। এ সংক্রান্ত হাদীসে অনেক দুআ বর্ণিত আছে।[৪৯]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَ اِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَ اَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ يَعْنِى الطَّاعُوْنَ–

অর্থ: আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোনো স্থানে মহামারীর খবর পাও, তখন সেখানে যাবে না। আর যখন তোমাদের বসতি এলাকায় মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়, তখন তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যত্র গমন করবে না।[৫০]

সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয়টি আরো অধিকতর স্পষ্ট হয়। যেমন-

---

৪৫. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: দুআ, অনুচ্ছেদ: আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া, খ. ২, পৃ. ৫১৪, হাদীস নং- ২৪৭০

৪৬. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: দুআ, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই), খ. ২, পৃ. ৪৯৬, হাদীস নং- ৩৫০৫

৪৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধু এবং সালাত একটি শিফা, খ. ৪, পৃ. ৯৫ এবং ৯৮, হাদীস নং- ৩৪৫২ এবং ৩৪৫৮

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৯ (অষ্টম সংস্করণ), অধ্যায়: ২য়, শিশু-কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম, অনুচ্ছেদ: পরিবত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, পৃ. ১৭২

৪৯. সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের দু'আ অধ্যায় দেখা যেতে পারে, বিশেষ করে জামি তিরমিযীতে বিস্তারিত দেয়া আছে।

৫০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মহামাহারীর স্থান হতে অন্যত্র গমন, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৩১০১

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ اِلٰى الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ اُمَرَاءُ الاَجْنَادِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ اَصْحَابُهُ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بَاَرْضِ الشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِىَ الْمُهَاجِرِيْنَ الاَوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَ اَخْبَرَهُمْ وَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بَالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا،فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِاَمْرٍ، وَ لاَ نَرٰى اَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لاَ نَرٰى اَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ، ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِىَ الاَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ– وَ اخْتَلَفُوْا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِىْ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوْا نَرٰى اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَ لاَ تُقَدِّمَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَبَاءِ، فَنَادٰى عُمَرُ فِى النَّاسِ، اِنِّىْ مَصَبِّحٌ عَلٰى ظَهْرٍ فَاَصْبَحُوْا عَلَيْهِ– قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ اَ فِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ اِلٰى قَدَرِ اللهِ– اَ رَاَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ اِبِلُ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ اِحْدَاهُمَا خَصِبَةُ وَ الاُخْرٰى جَدْبَةُ– اَلَيْسَ اِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بَقَدَرِ اللهِ، وَ اِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ– قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ كَانَ مُتَغَيِّبًا فِىْ بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ اِنَّ عِنْدِىْ فِىْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَ اِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَ اَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ– قَالَ فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। উমর ইবন খাত্তাব (রা.) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সারগ নামক এলাকায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর সংগে সৈন্য বাহিনীর প্রধানগণ তথা আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ও তাঁর সাথীগণ সাক্ষাত করেন। তাঁরা তাঁকে অবহিত করেন যে সিরিয়া এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একথা শুনে উমর (রা.) বলেন: আমার নিকট প্রবীণ মুহাজিরদের ডেকে আন। তিনি তাঁদের ডেকে আনলেন। উমর (রা.) তাঁদের সিরিয়ায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কথা অবহিত করে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল। কেউ বললেন: আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন, কাজেই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না। আবার কেউ কেউ বললেন: আপনার সংগে রয়েছেন অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ, কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে আপনি তাদেরকে এই প্লেগের মধ্যে ঠেলে দেবেন। উমর (রা.) বললেন: তোমরা আমার নিকট থেকে চলে যাও। এরপর তিনি বললেন: আমার নিকট আনসারদের ডেকে আনো। আমি তাঁদের ডেকে আনলান। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের ন্যায় মতভেদ করলেন। উমর (রা.) বললেন, তোমরা উঠে যাও। এরপর আমাকে বললেন: এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরায়শী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন, তাঁদের ডেকে আনো। আমি তাঁদের ডেকে আনলাম, তখন তাঁরা পরস্পর কোনো মত পার্থক্য করেননি। তাঁরা বললেন: আপনার লোকজনকে নিয়ে ফিরে যাওয়া এবং তাঁদেরকে প্লেগের কবলে আপনার ঠেলে না দেওয়াই আমাদের কাছে ভাল মনে হয়। তখন উমর (রা.) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, আমি ভোরে সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করব (ফিরে যাওয়ার জন্য)। এরপর ভোরে সকলে এভাবে প্রস্তুতি নিল। আবু উবায়দা (রা.) বললেন: আপনি কি আল্লাহর নির্ধারণকৃত তাকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? উমর (রা.) বললেন: হে আবু উবায়দা! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত! (এ পরিমাণ আশ্চর্য হতাম না, যেমন আশ্চর্য হয়েছি তুমি বলার কারণে)। হাঁ, আমরা আল্লাহর এক তাকদীর থেকে অন্য একটি তাকদীরের দিকে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তোমার কিছু উটকে যদি তুমি এমন কোন উপত্যকায় নিয়ে যাও আর সেখানে দু'টি মাঠ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি সবুজ শ্যামল আর অন্যটি হল শুষ্ক ও ধূসর। এবার বল ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি

তুমি সবুজ মাঠে চরাও তাহলে তা আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, তাহলে তাও আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ।

বর্ণনাকারী বলেন: এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) আসলেন। তিনি এতক্ষণ যাবত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাইরে থাকায় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর উমর (রা.) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করলেন।[৫১]

সহীহ মুসলিমেও এক বর্ণনা এসেছে- আব্দুল্লাহ ইবন আমির ইবন রাবী'আ (রহ.) থেকে বর্ণিত। উমর (রা.) শামের সফরে বের হলেন। সারাগ পর্যন্ত গেলে তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে শামে মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) তাঁকে (হাদীস) অবগত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা যখন কোনো এলাকায় মহামারীর সংবাদ শুনবে, তখন এর ওপরে (দু:সাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যাবে না। আর যখন কোনো এলাকায় তা দেখা দেবে, তখন তা থেকে পালিয়ে বের হয়ে যাবে না। অত:পর হযরত উমর (রা.) সারাগ থেকে ফিরে গেলেন।[৫২]

উক্ত ঘটনায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে (অপর বর্ণনায়) এ কথাও উল্লেখ রয়েছে, উমর (রা.) ঘোষণা দিলেন: আমি আগামীকাল আরোহীর পিঠে আরোহন করে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবো। অতএব, কাল সকালে সকলেই ঐ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। অত:পর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) বলেন- হে উমর! আল্লাহর ফায়সালা হতে পলায়ন করছো? উত্তরে উমর (রা.) বললেন, হে আবু উবায়দা! এ কথা তুমি ছাড়া যদি অন্য কেউ বলতো (এ পরিমাণ আশ্চর্য হতাম না, যেমন আশ্চর্য হয়েছি তুমি বলার কারণে)। উল্লেখ্য, উমর (রা.) এ মতের বিরোধিতাকে অপছন্দ করেছেন। এরপর উমর বললেন –نَعَمْ نَفِرٌّ مِنْ قَدَرِ اللهِ اِلٰى قَدَرِ اللهِ

অর্থ: হাঁ, আমরা আল্লাহর এক ফায়সালা হতে অন্য ফায়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।[৫৩]অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَالطَّاعُوْنُ رِجْزُ اُرْسِلَ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِه بِاَرْضٍ فَلَاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَ اِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَ اَنْتُمْ بِهَا فَلَاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ–

অর্থ: উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: প্লেগ একটি শাস্তি, যা বনী ইসরাইল কিংবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ওপর পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং তোমরা কোনো এলাকায় প্লেগের কথা শুনলে সেখানে যেও না। আর কোনো এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে এবং তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে তোমরা সেখান থেকে পলায়ন করার জন্য বের হবে না।[৫৪]

নবী কারীম (সা.) প্লেগকে এক প্রকার জঘন্য রোগ বা আযাব বলে ব্যাখ্যা করে সকল প্রকার সন্দেহ নিরসন করে দিয়েছেন। কতইনা সুন্দর ইরশাদ করেছেন, যেখানে এহেন কষ্টদায়ক রোগটি ছড়িয়ে আছে সেখানে গিয়ে নিজ হাতে রোগকে দাওয়াত দিও না। আর যদি তোমাদের নিজ এলাকায় এ রোগটি ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উক্ত সংক্রমক ব্যাধিকে অন্য এলাকায় নিয়ে যেয়ো না। একথা বলার উদ্দেশ্য হল, এ ধরনের ব্যাধি থেকে নিজে দূরে থাকো এবং জেনে শুনে নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না। তবে যদি নিজে এ ব্যাধি থেকে বাঁচতে না পারো তবে কমপক্ষে অপরকে বাঁচাতে চেষ্টা করো। কেননা যেভাবে ব্যাধি থেকে নিজেকে নিজে রক্ষা করা প্রয়োজন তদ্রূপ অন্যকে রক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

---

৫১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্লেগ রোগ, খ. ২, পৃ. ১৬২৬, হাদীস নং -৫৭২৯

৫২. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাম, অনুচ্ছেদ: প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা ইত্যাদি, খ. ৬, পৃ. ৩৬২, হাদীস নং- ৫৭৮১

৫৩. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬১, হাদীস নং- ৫৭৭৮

৫৪. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং- ৫৭৬৬

ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রে এটি একটি উত্তম ও কার্যকরী ব্যবস্থা। মহামারী আক্রান্ত অঞ্চল থেকে রোগীরা যদি বেরিয়ে না যায় এবং সে অঞ্চলে যদি বাইরে থেকে লোক না আসে, তাহলে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ অনেক কমে যায়। এ হাদীস থেকে আদৌ মনে হয় না রোগের জীবাণু ছড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রাকৃতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করছে।

**বিশেষ প্রয়োজনে মহামারী এলাকায় আসা-যাওয়া করার বিধান**

মহামারী আক্রান্ত শহরে যারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে গেছে তাদের জন্য সর্বাবস্থায় অন্যত্র যাওয়া বৈধ হবে না। তবে সুস্থ লোকদের এ এলাকা থেকে যদি পলায়ন হিসেবে না হয়; বরং অন্যকোনো প্রয়োজনে বা উপকারের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা বৈধ হবে। এমনিভাবে যে বাইরে আছে কিন্তু কোনো প্রয়োজনে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করতে চাইলে তার জন্যও অনুমতি আছে। ইমাম নববী (রহ.) বলেন-

و فی هذه الاحادیث منع القدوم علی بلد الطاعون و منع الخروج منه فرارا من ذلك اما الخروج لعارض فلا بأس به و هذا الذی ذكرناه هو مذهبنا و مذهب الجمهور قال القاضی هو قول الاكثرین–

অর্থ: এ সকল হাদীসে মহামারী আক্রান্ত শহরে প্রবেশ হওয়া এবং পলায়ন হিসেবে সেখান থেকে বের হওয়া নিষেধ করা হয়েছে। যদি অন্য কোনো ওযরের কারণে বের হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। এইমাত্র যা আমরা উল্লেখ করেছি তা আমাদের (শাওয়াফে) এবং জমহুরের মাযহাব এবং কাজীর বর্ণনা রয়েছে যে, এটাই অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত।[৫৫]

হাফেয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, যদি মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হওয়ার মধ্যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে পলায়ন একেবারেই উদ্দেশ্য না হয়, যেমন পূর্ব থেকেই সফরের প্রস্তুতি নেয়া ছিলো, ঘটনাক্রমে এই সময়ে মহামারী দেখা দিয়েছে, এমতাবস্থায় সকলে একমত যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সফর করলে কোনো অসুবিধা নেই।[৫৬]

এছাড়া চিকিৎসক ও ত্রাণকর্মী যারা অসুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত এবং নিবেদিত, যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবা প্রদানের নিয়তে তাদেরও মহামারী আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করা জায়েয আছে। তারা আল্লাহ তাআলার নিকট বিরাট প্রতিদানপ্রাপ্তও হবে। ইমাম গাযালী (রহ.) এমন উদ্দেশ্যে শহরে প্রবেশ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

لا ینهی عن الدخول لانه تعرض لضرر موهوم علی رجاء دفع ضرر عن کیفیة المسلنین–

অর্থ: মহামারী আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ হওয়া থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হবে না। কেননা তারা বিপদাক্রান্ত সাধারণ মুসলমানদেরকে বাঁচানোর আশায় নিজের জন্য সন্দেহযুক্ত ক্ষতিকে মেনে নিচ্ছে।[৫৭]

---

৫৫. মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারাফ আন-নববী, *শরহুল মুসলিম*, মিশর: কায়রো, আল-মাতবাআতুল মিশরিয়্যাহ বিল আযহার, ১৯৩০ (প্রথম প্রকাশ), খ. ১৪, পৃ. ২০৫

৫৬. *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৯০

৫৭. *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯১

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ: চিকিৎসা ক্ষেত্রে হারাম দ্রব্যের ব্যবহার

ল্যাব্রেটরিতে লিকুইড বা ট্যাবলেট আকারে যেসব ওষুধ তৈরি হয়ে আমাদের কাছে আসে, সেগুলোর অধিকাংশই বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি ও ক্যামিকেল উপাদান দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন মুসলিম হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, প্রতিনিয়ত আমরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করছি এবং তাতে যেসব উপাদান দেয়া হচ্ছে সেগুলোরআসলে কতটুকু হালাল এবংহারাম? কারণ ঔষধে এলকোহলের ব্যবহার একটি সাধারণ বিষয়। আর এ্যালকোহল বা মদ যে হারাম একটি দ্রব্য তা সর্বজন জ্ঞাত।বর্তমানে শুকর ছাড়াও অনেক হারাম প্রাণি থেকে অগণিত ঔষধ তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি বর্তমানে যেসব ঔষধ সরবরাহ করে থাকে এর অধিকাংশ ঔষধের লেভেলে উপাদান লেখা থাকলেও কোন্ প্রাণি থেকে আহরিত সেগুলো লেখা থাকে না। এটি মুসলমানদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। বৃটিশ জার্নাল-এর রিপোর্ট অনুযায়ী- বর্তমানে ৪টি মেডিসিনের প্রায় ০৩টির মধ্যেই বিভিন্ন প্রাণি থেকে আহরিত উপাদান ব্যবহৃত হয়।[৫৮]

সবচেয়ে দু:খজনক বিষয় হলো, বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগের ঔষধ হিসেবে যে ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়, এর অধিকাংশই শুকরের পরিপাকতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়।[৫৯]

### হারাম বস্তু প্রকৃতি বিরোধী

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন-হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা বিবেক ও শরীয়ত অনুযায়ী নিন্দনীয়। শরীয়তের দলীল হচ্ছে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ। আর বিবেকের দলীল হচ্ছে- সেটি মন্দ হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তা হারাম করেছেন। তিনি এ উম্মতের জন্য শাস্তিস্বরূপ ভালোকিছুকে নিষিদ্ধ করেননি, যেমনটি নিষিদ্ধ করেছিলেন বনী ইসরাইলের জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا–

অর্থ: বস্তুত ইয়াহুদীদের জন্য তাদের পাপের কারণে আমি বহু পূত-পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্য হালাল ছিলো এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের কারণে।[৬০]

তাই এ উম্মতের জন্য যা কিছু হারাম করা হয়েছে, তা মন্দ হওয়ার কারণে হারাম করা হয়েছে। তিনি হারামকে নিষিদ্ধ করেছেন, উম্মতে মুহাম্মদীকে ক্ষতি থেকে সুরক্ষা করার জন্য, হারাম গ্রহণ করা থেকে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য। তাই হারামের মাধ্যমে রোগ-শোক থেকে নিরাময় তালাশ করা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হারাম দ্রব্যে যদিও রোগ-ব্যাধি দূরীকরণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু হারাম দ্রব্য অন্তরের ওপর এর চেয়েও বড় ব্যাধির প্রভাব ফেলে। কারণ হারামের মন্দ শক্তিশালী। এতে হারামের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণকারী অন্তরকে রোগাক্রান্ত করে দেহের অসুস্থতা দূর করার প্রয়াস পেলো।

আল্লাহ কর্তৃক কোনো দ্রব্যের হারাম করার দাবি হচ্ছে- এটাকে বর্জন করা এবং সকল উপায়ে এর থেকে দূরে থাকা। যদি হারামকে কোনো অপরিহার্য কারণ ছাড়াই ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে প্রকারান্তরে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়, যা শরীয়তদাতার উদ্দেশ্যের বিপরীত। এছাড়া শরীয়তের দলীল মোতাবেক হারাম জিনিস নিজেই একটা রোগ। তাই হারামকে ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

তাছাড়া হারাম জিনিস স্বভাব-প্রকৃতি ও আত্মার ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ মানব প্রকৃতি নিরাময় প্রক্রিয়ার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যদি নিরাময় পদ্ধতি মন্দ হয়, মানব প্রকৃতিও তা থেকে মন্দ দিক অর্জন করে। সুতরাং ঔষধের সত্তাটাই যদি খারাপ হয়, তাহলে সেটা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য অখাদ্য, অপানীয় এবং বিবেক বিবর্জিত পোশাককে নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা এগুলো আত্মাকে খারাপ ও দূষিত করে তুলে।[৬১]

---

৫৮.*http://www.prevention.com;/health/healthy living/medications-contain-animal-products*(থেকে উদ্ধৃত)

৫৯.*http://blogs.discovery.com*(থেকে উদ্ধৃত)

৬০.আল-কুরআন, ৪: ১৬০

৬১. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৩-৪১৫

সুতরাং এ্যালকোহল কিংবা শুকর থেকে উৎপন্ন জিলাটিন সমৃদ্ধ দ্রব্য নাপাক হওয়ায় তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করাও না জায়েয। এসব দ্রব্য থেকে দূরে থাকা ওপবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব।

**হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ নিষেধ**

রাসূলুল্লাহ (সা.) হারাম ও নাপাক বস্তু ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ইহা সূচীবোধ, পবিত্রতা ও মানবীয় মর্যাদার পরিপন্থী। তবে চরম অপারগতা বা অন্য কোনো উপায় না থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা মানুষ যখন একেবারেই নিরুপায় হয়ে যায় এবং বিকল্প কোনো পথই খোলা না থাকে, তখন জীবন রক্ষা পরিমাণ যে কোনো খাদ্য গ্রহণেরওঅনুমোদন ইসলাম দিয়েছে। নতুবা সকল হারাম ও নাপাক বস্তুই নিষিদ্ধ।[৬২]

عَنِ الْاَعْمَشِ سَمِعْتُ حَيَّانَ جَدَّ  بْنِ اَبْحَرَ الْكَبِيْرِ يَقُوْلُ دَعِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ جَسَدُكَ الدَّاءَ–

অর্থ: আমাশ (রা.) বলেন, আমি ইবন আবহারুল কাবীরের পৌত্রের মাধ্যমে শুনেছি, তিনি বলেন- ঐ সকল ঔষধ বর্জন করো, যা খেলে সুস্থ শরীর অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৬৩]

একজন অসুস্থ ব্যক্তি কোনো ঔষধ সেবনের মাধ্যমে দ্রুত সুস্থতা লাভ করবে, অসুখের অসহ্য যন্ত্রণা দূর হবে এবং তার ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পাবে ঔষধদাতা বা চিকিৎসকের এটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এ প্রত্যাশায়ই একজন রোগী তিক্ত ও স্বাদহীন ঔষধ সেবন করে, ইনজেকশন নেয় এবং অপারেশনের মতো কষ্টকে সহ্য করে।

আমদের সমাজে অনেক হাতুরে ও অনভিজ্ঞ ডাক্তার রয়েছে, যারা ঔষধের সঠিক গুণাগুণ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না জানার ফলে রোগীদেরকে এমন ঔষধ দিয়ে থাকে, যা কোনো একটি রোগকে দূর করে ঠিকই কিন্তু উক্ত ঔষধ আরো অনেক জঠিল রোগ সৃষ্টির কারণ হয়। এছাড়া বর্তমানে এমন অনেক বিবেকহীন ডাক্তার রয়েছে, যারা সস্তা খ্যাতি ও নাম-যশের আকাঙ্ক্ষী এবং নিজেদের লোভকে সংবরণ করতে না পেরে জেনে শুনে এমন ঔষধ দিয়ে ভুল চিকিৎসা করে থাকে। এ সকল ডাক্তার মানুষের শরীর নিয়ে বেআইনীভাবে খেল-তামাশা করার কারণেপরকালে তাকে অবশ্যইহিসাব দিতে হবে। অথচ এ বিষয়টি তাদেরকে প্রকম্পিত করছে না। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَ الدَّوَاءَ وَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوْا وَ لاَ تَدَاوُوْا بِحَرَامٍ–

অর্থ: আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রোগ ও চিকিৎসা দু'টিই পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।[৬৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) নেশাদ্রব্য সর্ম্পকে বলেন–اِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর যে সকল জিনিস হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের জন্য কোনো নিরাময় রাখেননি।[৬৫] হযরত ওয়াইল ইবন হাযরামী (রা.) বর্ণনা করেন-

اِنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ– فَنَهَاهُ، فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَ اللهِ اِنَّهَا دَوَاءُ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لٰكِنَّهَا دَاءُ–

অর্থ: একদা তারিক ইবন সুয়াইদ (অথবা সুয়াইদ ইবনে তারিক) নবী কারীম (সা.)-কে মদ ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তারিক বললেন, হে আল্লাহর নবী! এতো ঔষধ। তখন নবী (সা.) ইরশাদ করেন: না,শরাব কোনো ঔষধ নয়; বরং এটি নিজেই একটি রোগ অর্থাৎ রোগ সৃষ্টির কারণ।[৬৬]

---

৬২. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৩-৪১৫

৬৩. *মাওলানা মুহাম্মদ নুরুয্যামান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৬৪. *সুনান আবু দাউদ*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: গর্হিত ঔষধ, খ. ২, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং- ৩৮৭৪

৬৫. *মাওলানা মুহাম্মদ নুরুয্যামান,তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৬৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: গর্হিত ঔষধ, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং- ৩৮৭৮

**বিশেষ প্রয়োজনে হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের অনুমোদন**

নবী কারীম (সা.)-এর উপরোল্লিখিত ইরশাদাবলীর ভিত্তিতে মুসলিম চিকিৎসকগণের ওপর সর্বপ্রথম যে দায়িত্বটি অর্পিত হয় তাহলো, তারা রোগীদেরকে এমন কোনো ঔষধ ব্যবহার করাবে না- যা হারাম, ক্ষতিকর বা নেশাকর। দ্বিতীয় দায়িত্ব স্বয়ং মুসলমান রোগীর ওপর বর্তায়, তারা এমন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে না, যারা হালাল-হারাম এবং পাক-নাপাকীর কোনো ধার ধারে না। হালাল বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করানোর সুযোগ থাকলে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করানো কোনক্রমেই জায়েয নেই। তবে, হালাল বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করানো সম্ভব না হলে হারাম বস্তু দ্বারাও চিকিৎসা করানো বৈধ।তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারের একথা বলতে হবে যে কোনো হালাল বস্তু দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয় এবং এ হারাম বস্তুই তার জন্য একমাত্র চিকিৎসা। তখন চিকিৎসার জন্য হারামের আশ্রয় গ্রহণ করা জায়েয হবে।

হয়তো কেউ বলতে পারে, হাদীসে যেহেতু হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে হারাম বস্তুর মাঝে রোগ ছাড়া কোনো চিকিৎসা নেই, তাহলে ডাক্তার এ কথা কিভাবে বলবে যে হারাম বস্তুর মাঝেই তার একমাত্র চিকিৎসা রয়েছে এবং তা ব্যবহার করা কিভাবে বৈধ হবে?

আসলে যে সকল হাদীসে হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করানো নিষেধ করা হয়েছে এর অর্থ হলো- হালাল দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করার ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় হারামের মধ্যে চিকিৎসা থাকে না, ফলে তখন হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নেই। কিন্তু হালাল ব্যবস্থায় চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকলে তখন হারাম আর হারাম থাকে না, এর মধ্যে তখন চিকিৎসাও চলে আসে। তাই এ অপরাগ অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা বৈধ হয়ে যায়। যেমন- জীবন রক্ষার্থে ক্ষুধা অবস্থায় হালাল কোনো খাদ্য না থাকলে মৃত জানোয়ার ও শূকরের  গোশত খাওয়াও হালাল। কেননা, আল্লাহ তাআলা হালাল খাদ্য না থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখী ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য হারামকে হালাল করেছেন। তেমনিভাবে হারাম বস্তুতে (হারাম থাকা অবস্থায়) আমাদের জন্য চিকিৎসা থাকে না। অপরাগ অবস্থায় হারাম বস্তু আর হারাম থাকে না; বরং হালাল হয়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায় চিকিৎসা করার কথা হাদীসে নিষেধ করা হয়নি।[৬৭]

এছাড়াও হাদীসে উরাইনা উক্ত মতের স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَاسًا اِجْتَوُوْا فِى الْمَدِيْنَةِ، فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَلْحَقُوْا بِرَاعِيْهِ يَعْنِىْ الاِبِلَ، فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَ اَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوْا بِرَاعِيْهِ– فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَ اَبْوَالِهَا–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। কতিপয় ব্যক্তি মদীনায় তাদের প্রতিকূল আবহাওয়া অনুভব করলো। তখন নবী কারীম (সা.) তাদের হুকুম দিলেন, তারা (রাখালগণ) যেন উটগুলোর কাছে গিয়ে থাকে এবং উটের দুধ ও প্রশ্রাব পান করে। সুতরাং তারা রাখালের সংগে গিয়ে মিলিত হলো এবং উটের দুধ ও প্রশ্রাব পান করতে লাগলো।[৬৮]

উটের প্রশ্রাব নাপাক ও হারাম হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) ওষুধ হিসেবে তা পান করার পরামর্শ দেন এবং হাদীসের বর্ণনানুযায়ী তারা উটের দুধ ও প্রশ্রাব পান করে আরোগ্যও লাভ করে। এতে প্রমাণিত হয়, প্রয়োজনে ওষুধ হিসেবে হারাম বস্তু সেবন করা জায়েয আছে। যেমনিভাবে সাধারণ অবস্থায় রেশমি কাপড় পরিধান পুরুষের জন্য না জায়েয হলেও জিহাদের ময়দানে রেশমি কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়েয হয়ে যায়।[৬৯] তাই বলা হয়-

يجوز التداوى بالمحرم كالخمر و البول اذا اخبره طبيب مسلم ان فيه شفاء و لم يجد له غيره من المباح ما يقوم مقامه والحرمة ترتفع للضرورة فلم يكن متداويا بالحرام–

অর্থ: হারাম বস্তু যেমন মদ, প্রস্রাব, ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয। তবে শর্ত হলো, কোনো মুসলমান ডাক্তার এর মধ্যে রোগ মুক্তির কথা বলতে হবে এবং এর বৈধ কোনো স্থলাভিষিক্ত না থাকতে হবে। কেননা প্রয়োজনের সময় 'হুরমত' দূর হয়ে যায়। অতএব তখন সে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণকারী হবে না।

---

৬৭. মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬
৬৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: উটের প্রস্রাবের সাহায্যে চিকিৎসা, খ. ২, পৃ. ১৬১৬-১৬১৭, হাদীস নং- ৫৬৮৬
৬৯. মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

হারাম দ্রব্য ব্যবহার না করে যদি চিকিৎসার বিকল্প ব্যবস্থা থাকে, এরপরও যদি কোনো ডাক্তার তার ব্যবস্থাপত্রে হারাম ঔষধ লেখে বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি রোগের ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে হারাম দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহলে সে ডাক্তার ও প্রতিষ্ঠান গুনাহগার হবে।

উল্লেখ্য, ঔষধে মিশ্রিত হারাম বস্তু যদি এত কম হয় যে এ ঔষধ বেশি পরিমাণে সেবন করলেও মাতাল হবে না কিংবা অন্য দ্রব্যের সাথে তা পুরোপুরি মিশে এর স্বাদ, রঙ কিংবা গন্ধ কোনটির চিহ্ন না পাওয়া যায়, তবে এমন ঔষধ সেবন করা ও এটা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয আছে।

যে সব ঔষধে নেশাগ্রস্তকারী এ্যালকোহলের সামান্য পারসেন্টিজ রয়েছে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয হওয়া মর্মে 'ইসলামি ফিকাহ একাডেমি'মুসলিম বিশ্বের ফতোয়া ইস্যুকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কমিটির সিদ্ধান্ত রয়েছে। তবে সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার জন্য কোন ঔষধপত্রে এ্যালকোহল ব্যবহার না করাই মুস্তাহাব ও উত্তম। ওয়াশিংটনস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক থট'-এর জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে 'ওআইসি' এর অধিভুক্ত 'ইসলামি-ফিকাহ-একাডেমি'-এর সিদ্ধান্ত নং: ২৩(৩/১১)-তে এসেছে-

দ্বাদশ প্রশ্ন: এমন অনেক ঔষধ আছে যেগুলোতে বিভিন্ন মাত্রার এ্যালকোহল রয়েছে। এর পরিমাণ ০.০১% থেকে ২৫% পর্যন্ত। এ ঔষধগুলোর অধিকাংশ সর্দি, গলা ব্যথা ও কাশি ইত্যাদি সাধারণ রোগের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলোর ঔষধের মধ্যে প্রায় ৯৫% ঔষধ এ্যালকোহল সমৃদ্ধ। তাইএ্যালকোহল ফ্রি ঔষধ পাওয়া খুব কঠিন কিংবা অসম্ভব। এমতাবস্থায় এসকল ঔষধ সেবন করার হুকুম কী?
জবাব: মুসলিম রোগী যদি এ্যালকোহলমুক্ত ঔষধ না পায় তাহলে নির্ভরযোগ্য ও পেশাদারিত্বে বিশ্বস্ত ডাক্তারের পরামর্শ মাফিক কিছু পরিমাণ এ্যালকোহলযুক্ত ঔষধ সেবন করতে পারবে।[৭০]

ওআইসি-এর অধিভূক্ত 'ফিকাহ একাডেমি'-এর সিদ্ধান্তে আরও এসেছে: "ঔষধ তৈরিতে প্রয়োজন হলে এবং বিকল্প না থাকলে নি:শেষ হয়ে যাওয়ার মতো সামান্য মাত্রার এ্যালকোহল সমৃদ্ধ ঔষধ ব্যবহার জায়েয আছে। তবে শর্ত হচ্ছে, একজন সচ্চরিত্র ডাক্তার ঔষধটি সেবনের পরামর্শ দিতে হবে।[৭১]

**চিকিৎসা ক্ষেত্রে মদের ব্যবহার সম্পর্কিত বিধান**

যে দ্রব্য পান করলে মাতাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটাই মদ। এটাকে এ্যালকোহল বলা হোক কিংবা অন্য কোনো নাম দেয়া হোক। এ জিনিসের অল্প পরিমাণ বা বেশি সমান বিধান। নানাবিধ কাজে যেমন- ড্রেসিং করা, শোধন করা, জ্বালানি পদার্থ, পারফিউম তৈরি কিংবা ভিনাগারে রূপান্তরিত করণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য এটি রেখে দেয়া হারাম। আর যে দ্রব্য বেশি পান করলেও মাতাল হয়না, সেটা মদ নয়। এমন দ্রব্য সকল কাজে ব্যবহার করাও জায়েয আছে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত– نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.) নেশাযুক্ত এবং মস্তিষ্কে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কোনো কিছু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৭২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْطُبُ عَلٰى مِنْبَرِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ! اَلَا اِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَ هِىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ–

অর্থ:ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা.)-কে মিম্বরে খুতবা দিতে শুনি। তিনি বলেন, হে লোকসকল! যেদিন শরাব হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়, তখন তা পাঁচটি জিনিসের দ্বারা তৈরি হতো- আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবং যব। আর শরাব তাই যদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন করে।[৭৩]

---

৭০. *ইসলামি-ফিকাহ-একাডেমি*(ম্যাগাজিন), সংখ্যা-৩, খ. ৩, পৃ. ১০৮৭ (থেকে উদ্ধৃত)
৭১. মক্কা মুকাররমাস্থ ফিকাহ একাডেমি এর সিদ্ধান্তবলি, পৃ. ৩৪১ (থেকে উদ্ধৃত)
৭২. মুফতী মুহাম্মদ ইসহাক, *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আল-আবরার প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৫ (পুন: প্রকাশ), পৃ. ৩৪
৭৩. আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া,১৯৯৯, অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার পানীয় ও এর বিধান, অনুচ্ছেদ: মদ হারাম হওয়ার সময় যে সব বস্তু দ্বারা মদ তৈরি করা হতো, পৃ. ৫৬৫, হাদীস নং- ৫৫৭৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন:
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ– অর্থ: প্রতিটি নেশাযুক্ত জিনিসই শরাব এবং প্রতিটি নেশাযুক্ত জিনিসই হারাম।[৭৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُه فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ অর্থ: যার অধিক পরিমাণে নেশা আনে, তার অল্প পরিমাণেও হারাম।[৭৫]

আরবী পরিভাষায় যে কোন পানীয় জিনিসকেই 'শরাব' বলা হয়। তবে মুসলিম পরিভাষায় 'শরাব' শব্দটি নেশাকর বা উত্তেজক পানীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবীতে যাকে 'খমর' বলা হয়, এর সর্ব প্রকারই হারাম।
নবী কারীম (সা.)-এর উপরোক্ত ইরশাদ দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র 'শরাব'ই হারাম নয়; বরং সর্বপ্রকার নেশাদার (মাদক) দ্রব্যও হারাম। তা পরিমাণে অধিক হোক অথবা অল্প হোক।তাছাড়া যতদূর সম্ভব ঐ সকল জিনিস যা খবীস তথা বাজে, ক্ষতিকর এবং নষ্ট হওয়ার কারণে খারাপ মনে হয় এবং ঐ সকল জিনিস যা নাপাক, অকেজো, যেমন লোহার ময়লা ইত্যাদি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার না করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) নাপাক এবং খবীস কোনো দ্রব্যকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এটা সূচীবোধ, পবিত্রতা এবং মানবীয় মর্যাদার পরিপন্থী।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ অর্থ: তাদের ওপর অপবিত্র জিনিসসমূহ হারাম করা হয়েছে।[৭৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত–نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ
অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) খবীস তথা নাপাক ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৭৭]
হযরত দায়লামে হিমইয়ারী (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা শীত প্রধান দেশে বাস করি এবং সেখানে আমরা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করি। আমরা গম দ্বারা এক প্রকার মদ প্রস্তুত করি। এটা পানে আমাদের দেহে শক্তির সঞ্চার হয়; কঠিন কাজে আমাদের শরীরে শক্তি যোগায়; দেহ ও মনকে সতেজ ও চাঙ্গা করে তোলে। তদ্বারা আমাদের অঞ্চলের শীত হতে আত্মরক্ষা করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: ওটাতে কি নেশা হয়? আমি বললাম জ্বি হ্যাঁ, তাতে নেশা হয়। তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: ওটা হতে বেঁচে থেকো, পান করো না। আমি বললাম, আমাদের দেশের লোকেরা ওটা বর্জন করবে না। এবার তিনি বললেন, যদি তারা ওটা পরিহার না করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।[৭৮]

---

৭৪. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্য, অনুচ্ছেদ: নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ, আর সর্বপ্রকার মদই হারাম, খ. ৬, পৃ. ১০২, হাদীস নং- ৫২১৪
৭৫. *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার পানীয় ও এর বিধান, অনুচ্ছেদ: যা অধিক পানে নেশা আনে তা হারাম, পৃ. ৫৬৭, হাদীস নং- ৫৬০৭
৭৬. আল-কুরআন, ৭: ১৫৬
৭৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: গর্হিত ঔষধ, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং- ৩৮৭৬
৭৮. আ. ফ.ম. খালিদ হোসেন,"মাদকাসক্তি নিরোধে মহানবী সা.-এর শিক্ষা", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*,(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত), ঢাকা:ইসলামিকফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ২০০

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চিকিৎসক ও সঠিক নিয়মে ঔষধ সেবন

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম। স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সকল মানুষেরই কাম্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কাল নির্বিশেষে সকলেই সুস্থ থাকতে চায়। আমরা অসুস্থ হলে ডাক্তারগণ চিকিৎসা সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকেন। তাইচিকিৎসাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মহৎ ও পবিত্র পেশা মনে করা হয় এবংসব পেশা থেকে চিকিৎসা পেশাকে আলাদা চোখে দেখা হয়। কারণ পৃথিবীতে যতো পেশা আছে সবকিছু মানুষের প্রয়োজনীয় বা সংশ্লিষ্টতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। আর ডাক্তারী পেশা স্বয়ং মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। যদি মানুষ নিজেই সুস্থ না থাকে, তার দ্বারা অন্য কোনো পেশা বা কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং একজন ডাক্তার মানবতার কাণ্ডারী এবং মানব জীবনকে সুস্থ ও সুখী রাখার জন্য অতন্দ্র প্রহরী। অসুস্থ একজন মানুষের রোগ সারিয়ে মুখে এক চিলতেহাসি ফুটানোর জন্যই ডাক্তার তার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়।

তবে বৈশ্বিক বিভিন্ন কারণে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে পৃথিবীতে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং কোনো ভাবেই এর লাগাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। সুচিকিৎসা নিয়ে রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায় মানুষ পাগলের মত ডাক্তারের কাছে ভিড় জমাচ্ছে। প্রতিটি ঘর এমনকি প্রতিটি ব্যক্তিকেও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালের সাথে সম্পর্ক রাখতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় হাসপাতালের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের জন্য নিত্যনতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করেবিজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালানো হলেওএর চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দৈনন্দিন চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সারাবিশ্বের প্রতিটি দেশেই অসংখ্য প্রাইভেট ক্লিনিক বা হাসপাতাল গড়ে ওঠেছে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের এসব অধিকাংশ প্রাইভেট হাসপাতালে অভিজ্ঞ ডাক্তার না থাকায় সহজ-সরল অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে। অথচ চিকিৎসা সেবা একটি বিরাট বড় আমানত, জীবন ও মানুষের আমানত। রোগীকে আমানত, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতার সাথে উপযুক্ত পরিষেবা দেয়াই একজন চিকিৎসকের ধর্ম। তাই চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ডাক্তারের সেব গ্রহণ করতে হবে এবং হাতুড়ে ডাক্তারকে পরিহার করতে হবে।

**বিজ্ঞ ডাক্তারের পরিচয়**

যেকোনো রোগ থেকে আরোগ্য লাভের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট হতে চিকিৎসা গ্রহণ করা। এতে রোগীর দ্রুত সুস্থতা লাভের যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি অনভিজ্ঞ ডাক্তারের ক্ষতিকর দিক থেকে পরিত্রাণের নিশ্চয়তাও রয়েছে। কারণ একজন বিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর সার্বিক দিক বিবেচনা করে যে চিকিৎসা সেবা দেবে, একজন অনভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমেতা করা সম্ভব হবে না। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ ঔষধ লেখার সময় অনেক বিষয় বিবেচনা করে লেখেন। যেমন- প্রদত্ত ঔষধ বয়স অনুযায়ী রোগীর জন্য ঠিক আছে কিনা, ঔষধের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে কিনা, ডোজের পরিমাণঠিক আছে কিনা, সেবনকৃত অন্য ঔষধের সাথে সমস্যা হয় কিনা, কিডনি ও লিভারের ওপর চাপ বাড়বে কিনা ইত্যাদি। তাই বিজ্ঞ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা সব সময়ই নিরাপদ। সুতরাং একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য রোগীকে সতর্ক থাকতে হবে এবং রোগীকেই তা খুঁজে নিতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَصَابَهُ جَرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ– وَ اَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِىْ اَنْمَارٍ– فَنَظَرَا اِلَيْهِ فَزَعَمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُمَا اَيُّكُمْ اَطَبُّ؟

অর্থ: যায়দ ইবন আসলাম (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তির শরীর যখম হয়ে রক্ত জমা হয়ে গিয়েছিলো। অত:পর লোকটি বনী আনযাম গোত্রের দুই ব্যক্তিকে এর চিকিৎসার জন্য ডেকে আনলেন। তারা পরীক্ষ-নিরীক্ষা করে দেখলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের উভয়ের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান কে অধিক জানে?[৭৯]

৭৯. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জামি', অনুচ্ছেদ: রোগের সময় তাবীয বা ঝাড়ফুঁক করা, খ. ৩, পৃ. ৫৮৫,হাদীস নং-১৭০৮

সর্বোতভাবে মানুষের নানারকম রোগের সাধারণ চিকিৎসা প্রদানকারীকে জেনারেল প্র্যাক্টিশনার বলা হয়। আর কেউ যদি কোনো বিশেষ প্রকারের রোগ বা চিকিৎসা পদ্ধতির চর্চার প্রতি নিবিষ্ট হয়,তখন তাকে সেই রোগ ও পদ্ধতির বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিস্ট বলা হয়। চিকিৎসার সঠিক ব্যবহার শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের বুনিয়াদী পঠনভিত্তিক জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করে না; বরং এর কার্যকারিতা ও প্রচলন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে এই বিজ্ঞানকে পরিশীলিতভাবে প্রয়োগ করা তথা ফলিত কলাবিদ্যায় পারদর্শীতার ওপর। তাই একজন বিজ্ঞ চিকিৎসককে নার্সিং, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঔষধ শিল্পের সাথে জড়িত ফার্মাসিস্ট ও কেমিস্ট ইত্যাদির স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত গুণাবলীও থাকা প্রয়োজন-

১. রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা। কারণ একজন ডাক্তারের যদি সংশ্লিষ্ট রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই না থাকে তাহলে তিনি যে চিকিৎসা দেবেন তা ভুল হতে পারে এবং হিতে-বিপরীত হতে পারে।

২. রোগের কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা। যদিও রোগ আল্লাহ তাআলা দিয়ে থাকেন, তথাপি যেকোনো রোগ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ রয়েছে। রোগের কারণ জানতে বা বুঝতে পারলে খুব সহজেই চিকিৎসা দিয়ে রোগ সারানো সম্ভব হবে।

৩. রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জানা খুবই জরুরী বিষয়, যা বর্তমানে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ ছাড়া অন্যরা এ দিকে খেয়ালই করেন না। অথচ রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সর্ম্পকে অভিজ্ঞতা না থাকলে এবং দুর্বল রোগীর শরীরে শক্তিশালী কোনো ওষুধ প্রয়োগ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

৪. রোগীর দুর্বলতা ও সবলতার দিকে লক্ষ্য রেখে ওষুধ ব্যতীত খাদ্য, আচরণ ও সর্তকতার মাধ্যমে চিকিৎসা করার যোগ্যতা থাকা। অভিজ্ঞহীন অনেক ডাক্তার রয়েছেন যারা সব ধরনের রোগীকে ওষুধ সেবন করিয়েই ভালো করে ফেলতে চান। কিন্তু সব অসুখ যে ওষুধে ভালো হয় না এদিকটি তারা বুঝতে চান না। এমন অনেক অসুখ আছে যা রোগী দুর্বল হওয়ার কারণে ওষুধ সেবনে সক্ষম না হওয়ায় তাদের শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করলে তা হজম করতে পারবে না। তাদেরকে শুধু পুষ্টিকর খাবার, আচরণগত পরিবর্তন এবং সর্তকতা অবলম্বন করলে ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ এদিকটি খুবই খেয়াল করে থাকেন।

৫. রোগীর মেজাজ ও স্বভাব বোঝা অর্থাৎ কার জন্য কী ধরণের ওষুধ প্রয়োজন তা বোঝার যোগ্যতা থাকা। আল্লাহ তাআলার এ পৃথিবীতে প্রত্যেের মেজাজ ও স্বভাব ভিন্ন। সুতরাং একজন বিজ্ঞ ডাক্তার রোগের ধরন দেখেই একজন রোগীকে ওষুধ প্রয়োগ করেন না; বরং রোগী মেজাজ ও আচরণগত স্বভাব ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রেখেই ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। তবে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়।

৬. রোগের কারণে স্বাভাবিক মেজাজের পরিবর্তে নতুন সৃষ্ট মেজাজ বোঝার যোগ্যতা রাখা। অনেক সময় এমন রোগী পাওয়া যায়, যারা রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সমাজের অন্য দশটি স্বাভাবিক মানুষের মতোই জীবন যাপন করতো, কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পরে তার স্বাভাবিক মেজাজ পরিবর্তন হয়ে নতুন মেজাজ বা আচরণ শুরু করে দেয়। তাই একজন বিজ্ঞ ডাক্তার শুধু বর্তমান অবস্থায় ওপর ভিত্তি করেই চিকিৎসা করেন না; বরং তিনি অতীত ও বর্তমান সব দিক খেয়াল করেই চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

৭. রোগীর বয়সের খেয়াল রাখা এবং বয়স কম বেশি হলে চিকিৎসার মধ্যে কী পরিবর্তন হবে তা জানা ও সে অনুপাতে চিকিৎসা করার যোগ্যতা থাকা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর বয়সের প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। একজন চিকিৎসক যদি এ বিষয়ে খেয়াল না রাখেন, তাহলে তিনি চিকিৎসকের কাতারেই গণ্য হবেন না। কারণ একজন বাচ্চা রোগীর ওষুধ সেবনের পরিমাণ এবং একজন বয়স্ক রোগীর ওষুধ সেবনের পরিমাণ কখনো এক হবে না। শুধু ওষুধের ডোজের ক্ষেত্রেই নয়; বরং সবসময় এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. রোগীর অভ্যাস সম্পর্কে অবগত থাকা অর্থাৎ অভ্যাসের পরিবর্তনে চিকিৎসায় কী পরিবর্তন করতে হয় এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা। এ পৃথিবীতে সবার কাজ-কর্ম ও অভ্যাস এক নয়, নিশ্চয় ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং একজন বিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসার সময় রোগীর অভ্যাসগত বিষয়াবলীর প্রতিও খেয়াল রাখেন।

৯. কাল ও ঋতু দেখে চিকিৎসা করা অর্থাৎ ঋতুর পরিবর্তনে ওষুধের কী পরিবর্তন হবে তা জানা থাকা এবং সে অনুপাতে চিকিৎসা করা। অনেক রোগ আছে সিজনালী। সুতরাং বিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে কোনো রোগী আসলেই তাঁরা সারা বছরের

ন্যায় একই চিকিৎসা দেন না; বরং অবস্থায় প্রেক্ষিতে কাল ও ঋতুর প্রতিও খেয়াল রাখেন এবং ওষুধ প্রয়োগের পর ঋতুর কারণে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেয় কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন।

১০. রোগীর দেশ, জন্মস্থান ও তার এলাকার আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা এবং এগুলোর পরিবর্তনে চিকিৎসায় কী পরিবর্তন ঘটে তা জানা থাকা। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ যেখানে জন্ম নেয় বা বসবাস করে সেখানে অবস্থান করলে শরীর সুস্থ থাকে, আবার পরিবর্তন করলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে জন্মস্থান বা এলাকার আবহাওয়ার একটি বিরাট যোগসূত্র রয়েছে। অতীতে বিজ্ঞ ডাক্তারগণ রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্ব দিলেও বর্তমানে তা নেই বললেই চলে। বিষয়টি সাধারণ মনে হলেও  এর যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।

১১. রোগ সৃষ্টির সময়ের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও ঐ সময়ের আবহাওয়ার কী প্রভাব রয়েছে তা জানা থাকা। বৈরি আবহাওয়া অনেক সময় রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়ে থাকে। কারণ বাতাসে সারাক্ষণ অসংখ্য রোগ জীবাণু ভেসে বেড়ায়। তাই বিজ্ঞ ডাক্তারগণ রোগ সৃষ্টির সময় আবহাওয়া কেমন ছিলো প্রয়োজনে সেদিকেও খেয়াল রেখে ব্যবস্থাপত্র করেন।

১২. রোগের বিপরীতমুখী ওষুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা। একজন ডাক্তারের রোগের বিপরীতমুখী ওষুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১৩. ওষুধের ক্রিয়া, পর্যায়, স্তর ও রোগীর শক্তির সামঞ্জস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা।

১৪. শুধু রোগ দূর করাই উদ্দেশ্য না হওয়া; বরং এভাবে রোগ মুক্ত করার জ্ঞান থাকা যেন এর দ্বারা অন্য কোন কঠিন রোগ সৃষ্টি না হয়। যেমন, পেনিসিলেন ইঞ্জেকশন খেলে খুজলী নিরাময় হয়ে যায়, কিন্তু এর সাথে সাথে রোগীও মারা যায়। তাই খাওয়ার পরিবর্তে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ওষুধ পুশ করা হয়। এতে যদিও খাওয়ার তুলনায় ওষুধের প্রভাব কম হয়, কিন্তু রোগী মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়।

১৫. সহজ থেকে সহজতর পন্থায় চিকিৎসা করতে জানা। যেমন- খাদ্য দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব হলে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা না করা।

১৬. একক ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব হলে একাধিক ওষুধ মিশ্রণ করে চিকিৎসা না করা।

১৭. রোগীচিকিৎসা করানোসম্ভব কিনা এ সম্পর্কে পূর্বেই জ্ঞাত থাকা, চিকিৎসা সম্ভব না হলে অযথা চিকিৎসার জন্য রোগীকে উদ্বুদ্ধ না করার মানসিকতা থাকা।

১৮. রোগ যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে আরো বৃদ্ধি না করে তা প্রতিরোধ করার জ্ঞান থাকা এবং এ অনুপাতে চিকিৎসা করা।

১৯. রূহ এবং অন্তরের রোগসমূহ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে পারদর্শী হওয়া। কেননা রূহ ও অন্তর শরীরের ওপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে।

২০. রোগীর সাথে ছোটদের মত নম্র ও স্নেহময়ী আচরণ করার অভ্যাস থাকা।

২১. রোগীকে সর্বদা তার রোগ ন্যূনতম, হালকা ও সাধারণ হওয়ার প্রবোধ দেয়া, তার চিকিৎসা সহজ ও স্বল্প মেয়াদী বলে সান্ত্বনা দেয়া এবং রোগ কঠিন ও মারাত্মক, একথা কখনো না বলার অভ্যাস থাকা।

২২. বর্তমান স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জ্ঞান থাকা ও তা অটুট রাখার চেষ্টা করা।

২৩. হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকা ও তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা।

২৪. রোগের কারণসমূহ সমূলে বিনাশ করার জ্ঞান থাকা এবং এর জন্য চেষ্টা করা। সমূলে বিনাশ না হলেও সাধ্যমত কমানোর চেষ্টা করা। অন্ততপক্ষে রোগ বৃদ্ধি হতে না দেয়ার জ্ঞান থাকা।

২৫. বড় কষ্ট দূর করার লক্ষে ছোট কষ্ট মেনে নেয়ার জন্য বড় ও ছোট কষ্টসমূহনির্ণয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা।

২৬. বড় উপকারের স্বার্থে ছোট উপকার পরিত্যাগ করার লক্ষে উপকারদ্বয়ের পার্থক্য অর্থাৎ কোনটি বড় আর কোনটি ছোট তা নির্ণয় করার জ্ঞান থাকা। ইত্যাদি।[৮০]

৮০. মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন,প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৭০

**একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট রোগীর প্রত্যাশা**

একজন রোগী হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে অনেক কষ্ট-ব্যথা ও অসুস্থতা নিয়ে আসে। পাশাপাশি বেশকিছু খরচেরও সম্মুখীন হয়। রোগীর প্রত্যাশা থাকে চিকিৎসক তাকে অগ্রাধিকার দেবেন, পর্যাপ্ত সময় ধরে দেখবেন, কথা বলবেন, তার কী হয়েছে তা বুঝিয়ে বলবেন, প্রয়োজনে রোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করবেন, রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চিকিৎসকের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সুপরামর্শ পাবে এবং রোগ, চিকিৎসা ও খরচ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাবে, সম্মানজক আচরণও ভবিষ্যতে শারীরিক অসুস্থতার সময় ওই চিকিৎসককে সময়মতো পাওয়া যাবেইত্যাদি।যদিও অনেক সময় রোগী ও ডাক্তারের ভুল বুঝাবুঝির কারণে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যায়, এটা মোটেও কাম্য নয়। কারণ অধিকার রক্ষায় সহিংসতা বা ঔদ্ধত্যতা কোনো সুফল আনে না। তাই রোগ নিজের অধিকার সম্পর্কে জেনে সচেতনতা ও নিয়মতান্ত্রিক চর্চাই ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

**রোগীর কাছে চিকিৎসকের প্রত্যাশা ও অধিকার**

একজন চিকিৎসকের কাছে অনেক রোগী আসে এবং প্রতিদিন তাঁকে অনেক অসুস্থ রোগী দেখতে হয়। তাঁরা রোগীদেরকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থও করে। বর্হিবিভাগ ও আন্ত:বিভাগে প্রতিদিন অনেক অসুস্থ মানুষকে সেবা দিতে হয়। কোনো কোনো রোগী কিছুটা কম আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকে আবার কিছু রোগী থাকে সংকটাপন্ন। ক্ষেত্রমতো প্রতিদিন তিন-চারজনের অস্ত্রোপচারও করতে হয়। মনে রাখতে হবে চিকিৎসকও একজন মানুষ, তাঁর পরিবার আছে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দায়বদ্ধতাও রয়েছে। তিনিও মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন, অসুস্থ হতে পারেন এবং সে অবস্থায়ও তাঁকে রোগী দেখার কাজ করতে হয়। তাই চিকিৎসকেরও প্রত্যাশা থাকে রোগী সময় মতো এবং পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে আসবে। রোগ সম্পর্কিত কথা বলবে এবং পরিমিত কথা বলবে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে এবং কোনো কিছুই লুকাবে না। চিকিৎসক যা বলবে তা শুনবে, পরবর্তী সময়ে সাক্ষাতের সময় অনুযায়ী এসে স্বাস্থ্যের হালনাগাদ অবস্থা জানাবে এবং ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ-পথ্য খাবে।অনেক সময় চিকিৎসকের নিকট জরুরি রোগী আসায় অথবা অস্ত্রোপচার কক্ষে অতিরিক্ত সময় লেগে যাওয়ার কারণে কখনো কখনো রোগীকে দেয়া সময় অনুযায়ী উপস্থিত থাকতে পারেন না। এ নিয়েও অনেক সময় চিকিৎসক-রোগীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

আসলে সেবা দেয়া ও নেয়া পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়। সেবা দানকারী যদি পূর্ণ সাহায্যকারী মনোভাবসম্পন্ন হয়, তাহলে সেবা গ্রহণকারী আরও বেশি উপকৃত হবে। চিকিৎসক যেহেতু কাগজে-কলমে সম্মানী নিয়ে সেবা দেয়, তাই তাদের সাহায্যকারী মনোভাবসম্পন্ন হওয়া উচিত। রোগীদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু অধিকার রয়েছে এবং চিকিৎসকদেরও পেশাদার আচরণের কিছু দিক-নির্দেশনা রয়েছে।চিকিৎসক সমাজকে এসব অধিকার ও দিকনির্দেশনার প্রতি সম্মানবোধ রেখেই পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়। সহানুভূতিশীল এবং দায়বদ্ধ চিকিৎসকই পারে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে। পাশাপাশি রোগীরও ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও সম্মান থাকা উচিত। কেননাসামান্য অর্থের বিনিময়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞাতাসম্পন্ন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে অনেক জটিল ও দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার সুযোগ করে দেয়ার কারণে ডাক্তারের প্রতিও রোগীদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। হাদীস এসেছে– عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

অর্থ: আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া করে না।[৮১]

**রোগীর যা করণীয়**

রোগী যথাসময়ে ডাক্তারের কাছে আসা এবং বিশেষ জরুরি না হলে কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিত। এমন যেনো না হয় রোগীর জন্য ডাক্তারের বসে থাকতে হয়; বরং রোগীই ডাক্তারের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। কারণ একজন ডাক্তারের গুরুতর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সময়ের এদিক-সেদিক হয়ে যেতে পারে। রোগী সঠিকভাবে ডাক্তারকে শারীরিক অসুস্থতা ও অসুবিধার কথা বলা, শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রোগের ইতিহাস নেয়ার সময় চিকিৎসককে

৮১. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, অনুচ্ছেদ: তোমার প্রতি যে ব্যক্তি সদয় ব্যবহার করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা,খ. ২, পৃ. ৪৮, হাদীস নং- ১৯৫৫

সহায়তা করা, মনোযোগী থাকা এবং পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পূর্ববর্তীনির্দেশনা থাকলে তা অনুসরণ করা, কোনো বিষয়ে না বুঝে থাকলে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া, পরবর্তী সময়ে ফলো আপ ভিজিটে আসা। প্রয়োজন ছাড়া চিকিৎসককে অযথা ঘন ঘন মোবাইল, টেলিফোন ও যোগাযোগ না করা। ব্যতিক্রমী কারণ ছাড়া চিকিৎসকের ওপর সাধারণভাবে আস্থা রাখা এবং সমস্ত পরামর্শ মেনে চলা। তবে কোনো কারণে আস্থা না থাকলে চিকিৎসক পাল্টানো যেতে পারে।

**হাতুড়ে ডাক্তারের পরিচয়**

হাতুড়ে ডাক্তার সে সকল ব্যক্তিকে বলা হয়, যারা নিজেদেরকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিয়ে এ পেশায় নিয়োজিত থাকলেও বাস্তবে তারা চিকিৎসা সেবায় অদক্ষ। হাতুড়ে ডাক্তার শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একটি বাংলা বাগধারা, যার অর্থ যে ডাক্তার রোগ হাতড়ে বেড়ায় অর্থাৎ নিজেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা আছে মনে করলেও অধিকাংশ সময়েই রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয় এবং ভুল চিকিৎসা প্রদান করে। যদিও তারা প্রায় সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র ও সব রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকে। অল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অদক্ষ হওয়ার কারণে অনেক সময় রোগী বড় ধরনের বিপদে এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনভিজ্ঞ ডাক্তারের পরিচয়দানে বলা হয়–الذى يسقى الناس السم و عنده انه دواء

অর্থ: অনভিজ্ঞ ডাক্তার ঐ ব্যক্তি যে মানুষকে বিষ পান করায় এবং তার ধারণা হয় যে এটা ঔষধ।[৮২]

কারো কারো মতে, যে লোকদের অসুস্থতার মধ্যে ধ্বংসাত্মক ঔষধ সেবন করায়, সে-ই অনভিজ্ঞ ডাক্তার,
চাই সে জানুক বা না জানুক।কোনো কোনো আলিম একে আরো স্পষ্ট করে লেখেন-

يسقى الناس دواء مهلكا و لا يقدر على ازالة ضرر اشتد تاثيره على المريض–

অর্থ: যে ব্যক্তি লোকদেরকে কোনো ধ্বংসাত্মক ঔষধ সেবন করায় এবং তার প্বার্শ-প্রতিক্রিয়া (যা রোগীর ওপর প্রকাশ পায়) তার দূর করতে সক্ষম না, সে-ই অনভিজ্ঞ ডাক্তার।[৮৩]

মোটকথা, যে ব্যক্তি ঔষধের জ্ঞান রাখে না এবং অনুমান করে ঔষধ দেয় আর প্বার্শ-প্রতিক্রিয়াশীল ঔষধের প্রতিক্রিয়া দূরীভূত করার যোগ্যতা রাখে না, এ রকম ব্যক্তিকে অনভিজ্ঞ ডাক্তার বলা হয়।

প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞানেই বিচক্ষণতার একটি যুগ থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে তা বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ হয়। অবশেষে লিপিবদ্ধরূপ এক বিশেষ জ্ঞান ও পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতীত শুধু অভিজ্ঞার আলোকে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ঐ বিভাগে কাজ করার অনুমতি দেয় না। মৌলিকভাবে মেডিকেল সাইন্স তিনটি বিষয়ে আলোচনা করে। (১) রোগের নিদর্শন ও পরিচয়, (২) ঔষধ ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং (৩) অসুস্থ ব্যক্তির শরীর ঔষধ গ্রহণের যোগ্যতা আছে কি-না।

সুতরাং বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞান চরম উন্নতি লাভ করার ফলে বলা যায়, উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোকে যার কোনো মেডিকেল কলেজের সার্টিফিকেট নেই এবং সরকার কর্তৃক প্রশাসনিকভাবে চিকিৎসা করার অনুমোদন না দেয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মানুষের চিকিৎসা করে থাকে সেই হাতুড়ে ডাক্তার।

হাতুড়ে ডাক্তাররা সাধারণত কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সহকারি হিসেবে কিংবা নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাজে সহায়তা করে বা ঔষধের দোকান অথবা কোনো চিকিৎসকের ডিসপেনসারিতে ঔষধ বিক্রি করার মাধ্যমে চিকিৎসার অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। এ সময়ে কতগুলো সাধারণ রোগের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়। এসব রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের নাম শেখে এবং ক্রমে স্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করাসহ পাশাপাশি ইনজেকশন প্রবেশ করানোর কৌশলও শিখে নেয়। বেশির ভাগ হাতুড়ে ডাক্তার এ ধরনের জ্ঞান নিয়েই তাদের পেশায় যোগদান করে। অনেকের আবার এ প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও থাকে না, বিশেষ করে যারা প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত থাকে।

৮২. মুফতি আন্ওয়ার শাহ্, *ইসলাম ও আধুনিক মেডিকেল মাসাইল*,বি.বাড়িয়া: জামিয়া ফারুকিয়া ওয়ায়েজুল উলূম ইসলামাবাদ, মার্চ ২০১১, পৃ. ১৬

৮৩. ড. ওয়াহবাহ মোস্তফা আল-জুহেলি, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, সিরিয়া: দামেস্ক, দারুল ফিকর, ১৯৮৫ (দ্বিতীয় প্রকাশ), খ. ৫, পৃ. ৪৪৯

বাংলাদেশ, এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশেগুলোর শহরতলী ও গ্রামে অসংখ্য হাতুড়ে ডাক্তার চিকিৎসা পেশায় যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার থেকে শুরু করে কবিরাজ, হোমিও, ইউনানী ও আয়ুর্বেদী হেকিম, আয়া, ধাত্রী, সাপুড়ে, হাড় বসানো ও রক্ত মোক্ষণকারী পর্যন্ত রয়েছে। তারা কখনো কখনো ভুল চিকিৎসা ও ভুল রোগ নির্ণয়ের কারণে রোগকে কঠিন পর্যায়ে নিয়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক হুমকি সৃষ্টি করে। তাই চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন রোগীকে যতদূর সম্ভব এমন হাতুড়ে ডাক্তারকে প্রত্যাখান করতে হবে।

বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের রুলস অনুযায়ী এমবিবিএস পাস ছাড়া কেউ ডাক্তার লিখে প্রাক্টিস করতে পারবে না। সুতরাং চিকিৎসা বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়েও নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দেয়া মানবতা বিরোধী একটি অপরাধ। এমন হাতুরে ডাক্তারগণের চিকিৎসা প্রদান মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে খেলা করার নামান্তর। এরূপ চিকিৎসক শুধু আইনের দৃষ্টিতেই অপরাধী নয়; বরং ধর্মীয় ও নৈতিক বিবেচনায়ও গুরুতর পাপী। এজন্য তাকে পরকালেও আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ تَطَبَّبَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذٰلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ–

অর্থ: শুআয়েব (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে (অন্যের) চিকিৎসা করে অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান আছে বলে ইতিপূর্বে জানা যায়নি, এমতাবস্থায় (যদি রোগীর কোনো ক্ষতি হয়) রোগীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব উক্ত চিকিৎসকের ওপর বর্তাবে।[৮৪]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়–ككونه ليس من اهله فهو ضامن لمن طبه بالدية ان مات بسببه

অর্থ: যেমন কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা করার যোগ্য না তবুও চিকিৎসা করে, যদি তার চিকিৎসার কারণে রোগী মারা যায়, তাহলে সে 'দিয়ত'-এর জরিমানা দেবে।[৮৫]

**ইসলামের দৃষ্টিতে হাতুড়ে ডাক্তারের জবাবদিহিতা**

ইসলামী শরীআত যে কোনো কাজের জন্যই যোগ্যতাকে মৌলিক শর্ত সাব্যস্ত করেছে। কারণ যোগ্যতা ব্যতীত যে কাজই আঞ্জাম দেয়া হবে তা সর্বাবস্থায় অবৈধ। যদিও ঘটনাক্রমে মাঝেমধ্যে কিছু ভালো ফলাফলও পাওয়া যায় সেটা ভিন্ন কথা। হযরত বারীদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বিচারক তিন প্রকার। যথা- (ক) যে সত্য সম্পর্কে জানে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা করে, (খ) যে সত্য সম্পর্কে জানে কিন্তু অসত্য ফায়সালা করে এবং (গ) যে সত্যের জ্ঞানই রাখে না এবং অজ্ঞতা সত্ত্বেও
বিচারকার্য সমাধা করে। প্রথম প্রকার জান্নাতী, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার জাহান্নামী-

(رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو فى النار)[৮৬]।

এজন্যই বিচারের দায়িত্ব সম্পর্কে ফোকাহায়ে কিরাম বলেন–و محرم على غير الاهل الدخول فيه قطعا

অর্থ: যোগ্যতা ব্যতীত এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করা অকাট্যভাবে হারাম।[৮৭]

বিচার দায়িত্বের সাথে যেমন মানুষের অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে, তেমনিভাবে চিকিৎসার সাথেও মানুষের জীবন ও সুস্থতার অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। শরীআতে মানবতার সংরক্ষণ মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্যতম। দীনের সংরক্ষণের পর এই শাখাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং একজন ডাক্তারের মূল দায়িত্ব হলো মানুষকে ধ্বংস ও অধিক কষ্ট থেকে বাঁচানো। এজন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ফকীহগণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞ ডাক্তারকে চিকিৎসা থেকে বিরত থাকার ফতোয়া দিয়েছেন।ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন-

৮৪. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: চিকিৎসা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা , খ. ৪, পৃ. ১০৩, হাদীস নং- ৩৪৬৬; *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রক্তপণ, অনুচ্ছেদ: চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করলে তার শাস্তি সম্পর্কে, খ. ২, পৃ. ২৮৫, হাদীস নং- ৪৫৮৬

৮৫. মুফতি আন্ওয়ার শাহ্,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৮৭. প্রাগুক্ত

حتی لو کان فی الحجر دفع ضرر عام کالحجر علی المتطبب الجاهل المفتی الماجن و المکاری المفلس جاز فیما یروی عنه اذ هو دفع ضرر اعلی بالادنی–

অর্থ: যদি হাজর তথা বাধা দেয়ার মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হয়, যেমন অনভিজ্ঞ ডাক্তার, ভবঘুরে মুফতি এবং দরিদ্র ভাড়া দানকারী ইত্যাদি, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ রকম করা জায়েয। কেননা এটা কম ক্ষতি মেনে নিয়ে বেশি ক্ষতি দূর করার নামান্তর।[৮৮]

ফোকাহায়ে কিরামের নিকট এমন দৃষ্টান্তও বিদ্যমান আছে, যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের যে ভুলকে ক্ষমার যোগ্য মনে করা হয়েছে, অযোগ্যের সে ভুলকেই জরিমানার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

الکحال الذرور فی عین رمد فذهب ضوئها لا یضمن کالختان الا اذا غلط فان قال رجلان انه اهل و رجلان انه لیس باهل و هذا من غلطه لا یضمن و ان صوبه رجل و خطاه رجلان فالمخطی صائب و یضمن–

অর্থ: যদি কোনো সুরমাওয়ালা অসুস্থ চোখে ঔষধ দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, তাহলে সে দায়ী হবে না, যেমনিভাবে খাৎনাকারী ভুল করলে দায়ী হয় না। সুতরাং তার যোগ্যতার বিষয়ে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় এবং অপর দুই ব্যক্তি যদি তার অযোগ্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় তাহলে সে দায়ী হবে না। আর যদি এক ব্যক্তি তার যোগ্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং দুই ব্যক্তি তার ভুলের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তারা সঠিক সাক্ষ্যদাতা হিসেবে গণ্য হবে এবং সে দায়ী হবে।[৮৯]

فاذا تعاطی علم الطب و عمله و لم یتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله علی اتلاف النفس و اقدم بالتهور علی ما لم یعلم بعلمه فیکون قد غرر بالعلیل فیلزمه الضمان لذالك و هذا اجماع من اهل العلم–

অর্থ: যে ব্যক্তি ডাক্তারী বিদ্যা দিতে শুরু করে এবং সে অনুযায়ী কাজও করছে, অথচ সে পূর্বে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেনি। যদি সে নিজ অনভিজ্ঞতার কারণে মানুষের জীবন নষ্ট করে এবং দায়িত্বহীনতার কারণে এমন কাজও করে যে সম্পর্কে সে অবগত না, তাহলে সে যেন রোগীকে ধোঁকা দিচ্ছে। অতএব তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে, এ ব্যাপারে সমস্ত আলিম একমত। যদি ডাক্তার নিজ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে রোগীকে দেখানোর কারণে সে চিকিৎসার অনুমতি দেয়, তবুও ডাক্তারী অনভিজ্ঞতার কারণে সাধিত ক্ষতির দায় ডাক্তারের ওপরই ন্যস্ত হবে।[৯০]

তাই এক হাদীসে এসেছে, জারিব (রা.) বলেন, কোনো এক সফরে যাওয়ার সময় আমাদের এক ব্যক্তির মাথা প্রস্তরাঘাতে জখম হয়। এ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করে, এ অবস্থায় কি তায়াম্মুম করতে পারি? তাঁরা বলেন, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম তাই তোমাকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া যায় না। অত:পর সে ব্যক্তি গোসল করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী কারীম (সা.)-কে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন: তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। যখন তারা অবগত ছিল না- তখন জিজ্ঞাসা করলো না কেন? কেননা অজ্ঞতার ঔষধ হলো জিজ্ঞাসা করা।[৯১]

সুতরাং চিকিৎসক যদি অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে রোগীর ক্ষতি করে ফেলে, তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হবে। মুফতি রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.) বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, ডাক্তার দুই ধরনের। (এক) বিজ্ঞ ডাক্তার, (দুই) অনভিজ্ঞ ডাক্তার।

সুতরাং কোনো ডাক্তার যদি রোগীর সম্মতিতে চিকিৎসার সব নিয়ম মেনে চিকিৎসা করে, অস্ত্রোপচার করার পরও যদি দুর্ঘটনাক্রমে রোগীর মৃত্যু, অঙ্গহানি বা অন্য কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে ডাক্তার দায়ী হবে না এবং তার ওপর কোনো জরিমানা বর্তাবে না। তবে বিজ্ঞ ডাক্তার যদি রোগীর অনুমতি ছাড়াই চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার করে এবং তা

৮৮. মুফতি আন্ওয়ার শাহ্,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬; ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৬১
৮৯. মুফতি আন্ওয়ার শাহ্,*ইসলাম ও আধুনিক মেডিকেল মাসাইল*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৯০. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ১৪০
৯১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: বসন্তের রোগী তায়াম্মুম করতে পারে, খ. ১, পৃ. ৬০, হাদীস নং- ৩৩৬

চিকিৎসাশাস্ত্রীয় নিয়ম-নীতিবহির্ভূত হয় আর তাতে রোগী মারা যায়, তাহলে চিকিৎসকের ওপর দিয়ত (রক্তপণ) আরোপিত হবে। কোনো অঙ্গহানি হলে শরীয়াতের নির্ধারিত জরিমানা (অঙ্গের পণ) বর্তাবে।
আর হাতুড়ে ডাক্তারের সঠিক বা ভুল চিকিৎসায় যেকোনভাবেই রোগীর মৃত্যু হলে ডাক্তারের ওপর পূর্ণ দিয়ত (রক্তপণ) বর্তাবে। অঙ্গহানি হলে অঙ্গের পূর্ণ জরিমানা দিতে হবে। ডাক্তার যদি নিজ হাতে অস্ত্রোপচার করে, ইঞ্জেকশন বা সেলাইন পুশ করে কিংবা ওষুধ নিজ হাতে খাইয়ে দেয়, সে ক্ষেত্রেই শুধু ওপরের বিধান প্রযোজ্য। চিকিৎসক যদি শুধু ওষুধ লিখে দেয় বা প্রেসক্রিপশন দেয় এবং এর বেশি কিছু না করে আর ওষুধ সেবন করে রোগীর ক্ষতি হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধান প্রযোজ্য নয়। বিচারক সে ক্ষেত্রে চিকিৎসককে কোনো যৌক্তিক শাস্তি দিতে পারে।

তাই হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা থেকে লোকদেরকে বারণ করা বৈধ তো আছেই, যদি এ রকম অযোগ্যতার সাথে চিকিৎসা করে এবং অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাহলে তার ওপর জরিমানাও ওয়াজিব হবে। হাতুড়ে ডাক্তারকে যদি চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ মনে করে রোগী অনুমতি দিয়েও দেয় তবু সে অপরাধের দায়ী হবে। এমনিভাবে হাতুড়ে ডাক্তারের নির্দেশনায় অসুস্থ ব্যক্তি ওষুধ  সেবন করে মারা গেলে, তহালে ডাক্তারই দায়ী হবে, যদিও অসুস্থ ব্যক্তির ধারণা হয় যে ডাক্তার চিকিৎসাবিদ্যায় অবগত ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতেই ঔষধ নির্বাচন করেছে।[৯২]

তাই ইসলামী ফিকহ হাতুড়ে ডাক্তারের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্ত তাকে প্রশাসনিক শাস্তি প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে। হাফেয ইবনে রুশদ-এর বর্ণনায় আছে:

و ان لم يكن من اهل المعرفة فعليه الضرب و السجن و الدية–

অর্থ: যদি চিকিৎসক চিকিৎসাবিদ্যায় অবগত না হয়, তাহলে প্রহার ও বন্দী করার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং দিয়ত ওয়াজিব হবে।[৯৩] হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى اَبِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيُّمَا طَبِيْبٍ تَطَبَّبَ عَلٰى قَوْمٍ لاَّ يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنُ– قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ اِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوْقِ وَالْبَطُّوَ الْكَىُّ–

অর্থ: আবদুল আযীয ইবন উমার ইবন আবদুল আযীয (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার নিকট যাঁরা আসতেন তাদের বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো যদি ব্যক্তি ডাক্তার না হয়েও রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে কেউ না জানে, এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা দ্বারা কারো ক্ষতি হলে সে যিম্মাদার হবে। আবদুল আযীয (রহ.) বলেন, যদি রক্ত মোক্ষম করতে গিয়ে কোনো শিরা কেটে ফেলে অথবা বড় করে কাটে বা ফাঁড়ে অথবা এমনভাবে দাগ দেয় যে রোগী মারা যায়। তবে তার ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৯৪]

### ডাক্তার বনাম অসহায় রোগী

আমাদের সমাজে অসৎ, হাতুড়ে ও ভুয়া ডাক্তারের অভাব নেই। পত্রিকার পাতা খুললে প্রতিদিনই দেখা যায়, কোনো না কোনো অঞ্চলের অসৎ, হাতুড়ে বা ভুয়া ডাক্তার তথা ডাক্তার নামক কসাই জীবন্ত মানুষটিকে চিকিৎসার নামে কিভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং এমন মৃতের সংখ্যা একবারে কম নয়। যদিও গণমাধ্যমগুলোতে সব খবর ছাপা হয়না। ধোঁকাবাজি এবংভুল চিকিৎসার কারণে যদি তার কাছ থেকে যথাযথ ক্ষতি পূরণ নেয়া হতো অথবা তাকে উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনা হতো, তাহলে চিকিৎসার মতো এ মহান পেশাটিকে তারা কলংকিত করতে পারতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মানুষের জীবন খুবই মূল্যবান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

مَنْ قَتَلَ نَفْساًبِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا، وَ مَنْ اَحْيَاهَافَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا–

৯২. *যাদুল মাআদ*,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৫
৯৩. আহমাদ ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, লেবাননঃ বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৯৮৭ (প্রথম প্রকাশ),খ. ৭, পৃ. ৪৮৩
৯৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রক্তপণ, অনুচ্ছেদ: চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করলে তার শাস্তি সম্পর্কে, খ. ২, পৃ. ২৮৫, হাদীস নং- ৪৫৮৭

অর্থ: কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা অন্য কাউকে হত্যা করা কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তারের কারণে (বিচারের শাস্তিস্বরূপ) না হয়, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করল।[৯৫]

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য মতে, কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধ দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করার অপরাধের সমান। কারণ কোনো ব্যক্তি অন্যায় হত্যায় কেবল তখনই লিপ্ত হতে পারে, যখন তার অন্তর হতে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কিত অনুভূতি লোপ পায়। আর এ অবস্থায় স্বার্থের জন্য সে যে কাউকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। এভাবে গোটা মানবতা তার অপরাধ প্রবণ মানসিকতার লক্ষ্য বস্তুতে পরিগণিত হয়। এ জাতীয় মানসিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সমস্ত মানুষই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং অন্যায় হত্যার শিকার যে-ই হোক না কেন, দুনিয়ার সকল মানুষকে মনে করতে হবে, এ অপরাধ যেন সকলের প্রতিই করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোনো ন্যায় পথে একজনের জীবন রক্ষায় সহযোগিতা করলো, বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত আছে, এমন ব্যক্তি সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং সকল মানুষের জীবন তাঁর নিকট নিরাপদ।[৯৬]

তাই মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য নিয়ে চিকিৎসার নামে খেলা করার অধিকার কারো নেই। অনেক সময় সনদবিহীন হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়াও সার্টিফিকেটধারী অসৎ হেকিম, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণও টাকা-পয়সা বা অন্যকোনো লোভের বশবর্তী হয়ে অপচিকিৎসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না একজন রোগী সর্বাবস্থায় সে একজন মানুষ। সুস্থ হওয়ার মানসে বিশ্বাস করেই তার নিকট এসেছে। এমতাবস্থায় একজন ডাক্তার রোগীকে দ্রুততম সময়ে সুস্থ করে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রয়োজন। সুতরাং যখন কোনো ডাক্তার রোগ নির্ণয়ে অক্ষম অথবা সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়, তখন তার উচিত এ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞ তার নিকট পাঠিয়ে দেয়া। এতে বিন্দুসম কার্পণ্য করা যাবে না। বাস্তবতাকে ভুলে গেলে চলবে না যে ডাক্তারও মানুষ। কোনো ডাক্তারের পক্ষেই সকল ঔষধ বা প্রত্যেক রোগ সর্ম্পকে পারদর্শী হওয়ার দাবি করা সম্ভব না। আর সব বিষয়ে জ্ঞান না থাকা এটা কোনো লজ্জার বিষয় নয়। তাই শুধু অনুমান করে প্রেসক্রিপশন দেয়া উচিত নয়, এতে হীতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, অনেকে নিজের অপারগতাকে স্বীকার করতে চায় না এবং চিন্তা করে ঐ রোগীটি যদি হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে হয়তো মানুষ আমাকে বড় ডাক্তার বলে স্বীকৃতি দেবে না অথবা এভাবে যদি একের পর এক রোগীকে অন্য ডাক্তারের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমার ক্যারিয়ার, ক্লিনিক বা প্যাথলজির ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলবে। তাই এমনটি না করে যে কোনো মূল্যে আগত রোগীর চিকিৎসা করে থাকে।

আবার অনেক অসৎ ডাক্তার মানুষের অসুস্থতার এই দুর্বলতম দিকটিকে পুঁজি করে নিজের হীন স্বার্থ তথা অগাধ ধন-সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছে। রোগের ক্ষেত্রে একজন খুব চালাক বা জ্ঞানী ব্যক্তিটিও একেবারে অজ্ঞ। এসময় একজন ডাক্তার যে পরামর্শ বা ওষুধই দেয় না কেন এটাকে নির্ভুল ও সাদরে গ্রহণ করে সে অনুযায়ীই অগ্রসর হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে ঔষধ সেবন করে থাকে। অথচ অসুখ ব্যতীত অন্য যে কোনো বিষয় হলে হয়তো নিজে ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করতো অথবা যারা এ বিষয়ে পারদর্শী আছে এমন আরো পাঁচজনের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে একেবারেই অসহায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, চিকিৎসা ব্যতীত অন্য যে কোনো বিষয়ে সাধারণভাবে পরামর্শ করলে যেখানে কোনো টাকা লাগে না বা টাকা চাওয়াটাকে লজ্জাকর বিষয় মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে কোনো রোগী কয়েক মিনিটের জন্য একজন চিকিৎসকের ধারস্থ হওয়া বা পরামর্শ নেয়া মাত্রই এলাকাভেদে পাঁচশত থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত গুণতে হয়। আর এই ধরণের রীতি আমাদের মতো অনুন্নতশীল ও উন্নয়নশীল দেশেই বেশি লক্ষ্যণীয়। ফলে বাধ্য হয়েই রোগী একাধিক চিকিৎসক না দেখিয়ে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করে থাকে। এমতাবস্থায় ডাক্তার যদি বিজ্ঞ এবং সৎ না হয়, তাহলে রোগীর জন্য যে কতটুকু বিপদের কথা তা সহজেই অনুমেয়। যে রোগী এসেছিল চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন করে সুস্থ হওয়ার জন্যে, সঠিকভাবে রোগ

---

৯৫. আল-কুরআন, ৫: ৩২

৯৬. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, (অনুবাদ: মুফতী সাইফুল ইসলাম), *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, ঢাকা: বাংলাবাজার, মাকতাবাতুল আশরাফ, এপ্রিল ২০১০, খ. ১, পৃ. ৩১৬

নির্ণয় না করার কারণে বা চিকিৎসকের অবহেলা, অসতর্কতা বা অসততার কারণে তাকে উল্টোভাবে মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। হাদীসে এসেছে عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।[৯৭]

এমন অনেক অসৎ ডাক্তারের সন্ধানও পাওয়া যায়, যারা বিজ্ঞ এবং নিশ্চিত জানে যে এ রোগের সঠিক চিকিৎসা কী, কিন্তু অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে টাকার বিনিময়ে অথবা নিজের পূর্বের শত্রুতার জের ধরে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিপরীতমুখী চিকিৎসা করে বা ঔষধে বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। আবার অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভালো কোম্পানীর উন্নত মানের ঔষধ না দিয়ে নিম্ন মানের ঔষধ দেয়, যাতে রোগীকে বেশি দিন নিজের কাছে ধরে রাখা যায় অথবা বাজে কোম্পানীর এজেন্ট হয়ে ব্যবস্থাপত্রে লিখিত ঔষধের মূল্যের শতকরা ভাগ পাওয়া যায়, যা ইতিপূর্বেই কোম্পানীর সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নির্ধারণ করা আছে। তাই দেশজুড়ে ভুল চিকিৎসায় রোগীর অঙ্গহানি, প্রাণহানি ও মারাত্মক ধরনের শারীরিক ক্ষতির অভিযোগ দিন দিন বেড়েই চলছে। এসব অভিযোগের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে ভয়ংকর সব প্রতারণার চিত্র। যেমন- ডাক্তার না হয়েও চিকিৎসা দেয়া, ওয়ার্ডবয়কে দিয়ে অস্ত্রোপচার ও বিনা প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারে বাধ্য করা ইত্যাদি। নানা কৌশলে নিরীহ রোগীদের প্রতারণা করছে এক শ্রেণির 'অসাধু চিকিৎসা ব্যবসায়ী'। হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। ফলে চিকিৎসা সেবায় সৃষ্টি হচ্ছে ভীতিকর পরিস্থিতি। ডাক্তারের ওপর থেকে ওঠে যাচ্ছে বিশ্বাস। ঝুঁকিতে পড়ছে রোগীদের জীবন। একইভাবে দেশজুড়ে ওষুধ বাণিজ্যেও চলছে সীমাহীন নৈরাজ্য। নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ এবং ওষুধ কোম্পানির দৌরাত্মে জিম্মি হয়ে পড়ছে রোগীরা। রোগীরা জানতেও পারছে না টাকা দিয়ে আসলে তারা কী কিনছে। ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু বা অঙ্গহানি হলেও দোষী চিকিৎসকরা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না হচ্ছে না। কিন্তু ইসলাম ধর্মে ইচ্ছাকৃত হত্যা বা ভুলবশত হত্যা উভয়ের দণ্ডবিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَئاً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِه اِلاَّ اَنْ يَّصَّقُوْا–

অর্থ: কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত হলে তা ভিন্ন বিষয়। কেউ কোনো মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে এবং তার পরিজনবর্গকে দিয়ত অর্পন করবে, যদি না তারা ক্ষমা করে।[৯৮]

অনেক হাতুড়ে ও অনভিজ্ঞ ডাক্তার রয়েছে, যারা রোগীকে মাঝেমধ্যে এমন ঔষধ দিয়ে থাকে যদ্বারা কোনো একটি রোগ ভাল হলেও পাশাপাশি তা অপর কোনো রোগ সৃষ্টিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- যদি এমন কোন ঔষধ হয়, যা এক রোগে উপকারী কিন্তু অন্য কোনো রোগ সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, তবে ঐ ঔষধ বর্জন করো।[৯৯]অন্য এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ يَعْنِىْ اَلسَّمَ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবন বিনাশী ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১০০]

চিকিৎসা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সাময়িকী দ্য ল্যানসেট-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে- পৃথিবীজুড়ে রোগীদের অপ্রয়োজনীয় এবং দামী ঔষধ দেবার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। গবেষণাটিতে আরো বলা হয়েছে, অনেক সময় কম খরচে রোগ নিরাময়ের উপায় থাকলেও রোগীদের ওপর বাড়তি খরচ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশেও সে চিত্র ব্যতিক্রম নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন- ঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে না পারার কারণে ডাক্তাররা ঔষধের প্রয়োগ বেশি করেন। তাছাড়া দামি ঔষধ হলেই যে এর মান ভালো হবে সেটিও ঠিক না। তিনি

---

৯৭. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: পরামর্শদাতা হলো আমানতদার, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদীস নং- ২৮২২
৯৮. আল-কুরআন, ৪: ৯২
৯৯. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
১০০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জীবন বিনাশী ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ , খ. ৪, পৃ. ৯৯, হাদীস নং- ৩৪৫৯

আরো বলেন, এমনও হতে পারে যে কোনো কোম্পানি ফাঁকি দিয়ে আমাদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিচ্ছে। তবে এগুলো দেখার দায়িত্ব হলো, ঐ দেশের সরকারী অফিস, যারা এগুলো দেখার দায়িত্বে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্বাবদ্যালয়ের সাবেক উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার রশিদ-ই-মাহবুব বলেন, ঔষধের যে অপব্যবহার হয় সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একটা এন্টিবায়োটিক দিয়ে অনেক সময় কোনো চিকিৎসক নিশ্চিত হতে পারেন না, তখন তারা কয়েকটা এন্টিবায়োটিক লিখে দেয়। এটাই কিন্তু বেশি ওষুধের প্রবণতা তৈরি করে। বিশ্লেষকরা বলেছেন, রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা নির্ভুল হলে বেশি ঔষধ প্রয়োগের প্রবণতা হয়তো কমে আসবে।[১০১]

এভাবে যখন দীর্ঘ সময় অপ্রয়োজনীয় এবং নিম্নমানের ঔষধ সেবন করার কারণে রোগ নিরাময় না হয়, তখন মনের মধ্যে এক ধরনের ডিপ্রেশন কাজ করে। রোগী ভাবে আমি হয়তো আর কোনো দিন সুস্থ জীবনে ফিরে আসবো না। এতে একজন রোগী ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

প্রত্যেক ডাক্তারই হিপোক্রেটিসের শপথ (Hippocratic Oath) পাঠ করেই চিকিৎসা সেবা শুরু করেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় কোনো কোনো ডাক্তার এই শপথটি ভুলে যেতে বসেছেন। হিপোক্রেটিস হলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি গুরু। প্রায় পৌনে তিন হাজার বছর আগে তাঁর জন্ম। একবারশিষ্যদেরগাছতলায় জড়ো করে তিনি একটি শপথবাক্য পাঠ করান। চিকিৎসকদের ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণ করা একটি শপথ। বহুল পঠিত গ্রীক চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঠ্যসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। ঐতিহাসিক এবং পরম্পরাগত বহু দেশে শপথটিকে চিকিৎসকদের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়।[১০২]

তবে বর্তমানে এর বিভিন্ন আধুনিক রূপও ব্যবহার করা হয়। শপথটির আধুনিক রূপের বাংলা পাঠ হলো-
আমি আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য এবং বিচার দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার শপথ নিচ্ছি যে, আমি সেই পূর্বসূরী চিকিৎসকদের কঠোর সাধনালব্ধ বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিসমূকে শ্রদ্ধা করবো, যার খোঁজ অনুসরণ করে আমি খোঁজ দিচ্ছি এবং এমন সমূহজ্ঞান আমার এবং তাদের মধ্যে যে এই পথে অগ্রণী হবে, আনন্দমনে ভাগ করে নেব। নিরর্থক-চিকিৎসা বা চিকিৎসা-অসার বলে ভাবা মানসিকতা, এই দুইয়ের জালে বাঁধা থাকার রোগীর উপকারার্থে দরকারী সকল ব্যবস্থার প্রয়োগ করবো। আমি মনে রাখবো চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানে এক শিল্পগত সম্বন্ধ আছে এবং ভরসা, সহমর্মিতা এবং বোঝাপড়ায় হয়তো অস্ত্রোপচারের ছুরিটি বা ঔষধালয়ের ঔষধকে তলায় ফেলতে পারে। "আমি জানি না" বলতে আমি লজ্জা করবো না। আমি আমার সহকর্মীকে জানাতে কুণ্ঠিত হবো না, যখন একজন রোগীকে আরোগ্য করতে অন্য কারোর দক্ষতার আবশ্যক হয়।

আমি আমার রোগীদের একান্ত গোপনীয়তাকে সম্মান করবো, যখন তারা তাদের সমস্যাসমূহ গোটা পৃথিবী জানুক বলে আমাকে না বলেন। বিশেষভাবে জীবন এবং মৃত্যুর কথা জড়িত থাকা বিষয়সমূহে আমাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমাকে যদি জীবন রক্ষা করতে দেয়া হয়, ধন্যবাদ। কিন্তু জীবন নেয়াটাও হয়তো আমার ক্ষমতার মধ্যে আছে; আমার নিজের দুর্বলতার প্রতি সচেতন থেকে অতি অমায়িকভাবে এই ভীষণ দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হবে। সর্বোপরি, আমি ঈশ্বরের স্থানে খেলতে কখনোই যাবো না। আমি মনে রাখবো, আমি জ্বরের একটি রেখাংকন, ক্যান্সারের একটি বাড়তে থাকা নমুনাকে চিকিৎসা না করে একজন রোগী ব্যক্তিকে চিকৎসা করবো, যার রোগটি হয়তো তার পরিবার এবং আর্থিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। আমার দায়িত্ব এই সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যদি আমি রোগীর পর্যাপ্ত যত্ন নিই। আমি যখনই পারবো অসুখের প্রতিরোধ করবো, কারণ প্রতিরোধ উপশম অপেক্ষা শ্রেয়।

আমি মনে রাখবো, আমার কাছে সকল মানব যার মন এবং শরীর আছে, সবার প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতার সাথে সমাজের একজন সদস্য হয়ে থাকবো। আমি যাতে সবসময় আমার বৃত্তির উত্তম ঐতিহ্যসমূহের সংক্ষেণার্থে কাজ করি এবং আমি যাতে সুদীর্ঘ সময় তাদের রোগ উপশম করার আনন্দ লাভ করতে পারি, যারা আমার সহায়তা আশা করবে। আমি যদি আমার এই শপথ লঙ্ঘন না করি, তবে আমি সম্মানিত হবো এবং জীবনে সুখ উপভোগ করতে পারবো।

কেউ কেউ তাঁর শপথ বাক্যটি সংক্ষিপ্ত করে নিম্নোক্তভাবে বলে থাকেন-

---

১০১.দৈনিক *কালের কণ্ঠ*,"চিকিৎসকরা কি রোগীদের প্রয়োজনের বেশি ওষুধ দিচ্ছেন"? ০৯.০১.২০১৭ (থেকে উদ্ধৃত)
১০২.*https://bn.m.wikipedia.org/wiki*/"হিপোক্রেটিসের শপথ", (থেকে উদ্ধৃত)

অত:পর আমি শপথ করছি যে জেনেশুনে এবং ধর্মত রোগীর ক্ষতি হয় এমন কোনো ওষুধ দেবো না। শত্রু-মিত্রভেদে সব রোগীকে সমান মনপ্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করবো এবং তার মানসিক দুশ্চিন্তা লঘু করার জন্য সব সময় ভরসা দেবো।[১০৩]

ইসলাম জাগতিক শাস্তির পাশাপাশি পরকালীন জবাবদিহির কথাও বলে। জবাবদিহির চিন্তা মানুষকে সৎ ও নিষ্ঠাবান থাকতে সহায়তা করে এবং অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখে। মানুষের মধ্যে যদি এই চিন্তা জাগ্রত থাকে যে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে সে স্বেচ্ছায়ই অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় শত আইন, শপথ ও নজরদারি করেও অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ، ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ–

অর্থ: তোমরা সেই দিনেকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে। অত:পর প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না।[১০৪]

তাই অসৎ চিকিৎসদের পূর্বের চিকিৎসা সংক্রান্ত অপকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করে মানুষের জীবন নিয়ে খেল-তামাশা বন্ধ করা উচিত।নবী কারীম (সা.)-এর চিকিৎসা বিষয়ক সতর্কতামূলক হাদীস এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পরকালের শাস্তির কথা জানার পরও যদি কোনো ডাক্তার জ্ঞাতসারে ভুল চিকিৎসা করেঅসহায় রোগীর কোনো ক্ষতি করে, তবে তাকে ধিক্কার জানানো ছাড়া আমাদের আর কেনো ভাষা নেই।

**সঠিক নিয়মে ঔষধ সেবন**

সাধারণত আমরা অসুখ হলে ঔষধ গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ওষুধেরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই অসুস্থ হলে প্রথমে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে ঔষধ নির্বাচন করে তা সঠিক নিয়মে সেবন করতে হবে,এটিই হলো চিকিৎসা ও ঔষধ সেবনের মূলমন্ত্র। কিন্তু অন্যান্য দেশে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া যেখানে ওষুধই পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে অসুস্থ হলে অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই ফার্মাসি থেকে ইচ্ছামতো ওষুধ কিনে দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছে, যা খুবই ভয়ানক কথা। অনেকে আবার বাসায় বসে গুগলে সার্চ দিয়ে নিজে নিজেই চিকিৎসক হয়ে ওষুধ সিলেক্ট করে খাওয়া শুরু করে দেয়। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। অর্ধেক জ্ঞান সবসময়ই বিপজ্জনক। কারণ কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী, তা ডাক্তার ছাড়া সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

যেকোনো ব্যথা, জ্বর, কাশি বা অন্যান্য বড় রোগের ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ সেবন করতে বারণ করা হলেও অনেকে তা মানতে চায় না; বরং নিজের মতো করে ওষুধ খেয়ে নেয়। অথচ অতিরিক্ত ওষুধ সেবন সুস্থ শরীরকেও সারা জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করে দিতে পারে, এমনকি কখনো কখনো মৃত্যু ঝুঁকিও রয়েছে। মানুষ ওষুধ সেবন করে অসুখ সারানোর জন্য কিন্তু ওষুধই যদি ক্ষতির কারণ হয়, তা মোটেও কাম্য নয়। সঠিক নিয়মে ঔষধ সেবন না করা এবং অপ্রয়োজনীয় ঔষধ মানুষের শরীরের জন্য যে কী ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনছে তা নিয়ে আমরা একবারও ভাবছি না। ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল (ইসিডিসি)-এর গবেষকরা অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের নাম দিয়েছে ‘সুপারবাগ’। এই সুপারবাগের আক্রমণে শুধুমাত্র ইউরোপীয় মহাদেশেই প্রায় ৩৩ হাজার মানুষ প্রতি বছর মারা যাচ্ছে।অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কারণে শরীরে তৈরি হচ্ছে এক অদ্ভুত অবস্থা। প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মারতে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কাজ করছে না। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া থেকে সংক্রমণ হলে তা সারাতেই দেয়া হয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। সেই ব্যাকটেরিয়া থেকেই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে মানব শরীরে। এই সংক্রমণের নামই হচ্ছে ‘সুপারবাগ’। যেটি ফ্লু, যক্ষ্মা ও এইডসের মতো ভয়ানক সংক্রমণের সমান।[১০৫]

আমরা দেখি সামান্য পেটব্যথা করলে রোগী নিজেই গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নেয়। অনেকে আবার ব্যথানাশক ওষুধের পাশাপাশিনিজেই গ্যাসট্রিকের ওষুধ নির্বাচন করে থাকে। এ ধরনের ওষুধ দীর্ঘদিন সেবন করলে ভবিষ্যতে ভিটামিন বি

---

১০৩. *https://www. proz.com/kudoz/english-to-bengali/medical-general/hippocratic-oatth*.১৪.০৪.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)

১০৪.আল-কুরআন, ২: ২৮১

১০৫. মূনীরুল আলম, দৈনিক *প্রথম আলো*,“মৃত্যুদূত সুপারবাগ বনাম অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার”, ২৭.০৮.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

১২-এর ঘাটতি হয়। অনেক সময় কোমরব্যথা, ঘাড় ব্যথা ইত্যাদি রোগের  জন্যও নিজ থেকে ওষুধ খায় এবং ভালো লাগলে রোগী প্রতিদিন খেতে থাকে। এতে কিডনির ক্ষতি হয়। অনেকে মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড খায়। স্টেরয়েডের অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এতে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, গ্যাসট্রিক আলসার, চুল পড়া, অতিরিক্ত মোটা হওয়া, সাইকোসিস, অস্টিওপরোসিস হতে পারে। অনেকে ইচ্ছা মাফিক অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর দুই দিন ভালো লাগার পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ সেবনের নির্ধারিত কোর্স বা সঠিক নিয়ম রয়েছে, তা পূরণ না করলে পরবর্তীতে রোগে আক্রান্ত হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খেলেও কাজ করবে না। অনেকে আবার ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই দিনের পর দিন ক্যালসিয়াম, ঘুমের ওষুধ এবং মাল্টিভিটামিন সেবন করে চলছে। ডাক্তারের পরামর্শ ও নিয়ম বহির্ভূত দীর্ঘদিন ঘুমের ঔষধ সেবন করলে স্মৃতিশক্তি লোপ, অবসাদ, প্যারালাইসিস এমনকি মৃত্যুও হতে পারে এবং অতিরিক্ত মাল্টিভিটামিন খেলে হাইপার ভিটামিন টক্সিসিটি ও নিউরোপ্যাথি হয়। অথচ ভিটামিন সমৃদ্ধ ভালো খাবার, ফল ও সবজি খেলে মাল্টিভিটামিন খাওয়ার কোনো দরকার হয় না।[১০৬]

আমরা জানি শরীরে ভিটামিন সি সঠিক মাত্রায় থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, হাড়ভালো থাকে, চুল ও ত্বক ঝলমলে থাকে এবং দ্রুত ক্ষত সারে। তাই অনেকে বাচ্চাকে প্রচুর ভিটামিন সি খাওয়ায় এবং বড়রাও ডাক্তারি পরামর্শ না নিয়ে দীর্ঘদিন তা খেয়ে থাকে। যদিও একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি খেতে পারে, কিন্তু এর বেশি খেলেই ডায়রিয়া, বমি, অম্বল, কমজোরি লিভার-হার্ট এমনকী কিডনিতে স্টোনের মতো জটিল সমস্যা! তাই বেশি সুস্থ থাকতে গিয়ে অহেতুক অসুস্থতা ডেকে আনার কোনো মানে হয় না। কারণ অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভালো নয়। নিয়ম না মেনে বেশি ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে। দিনে ২ হাজার মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি খেলে তাই ডায়রিয়া, বমি, অম্বল হতে পারে। ভিটামিন সি আয়রনের খুব ভালো শোষক। তাই বেশি ভিটামিন সি খাওয়া মানেই শরীরে আয়রন বাড়বে। এতে লিভার, হৃদয়, প্যানক্রিয়াস, থাইরয়েড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাপ পড়েস্নায়ুতন্ত্রেও। ভিটামিন সি রক্তে না মেশার কারণে শরীরের কোষে জমে না। রক্তে মেশে না বলেই অতিরিক্ত ভিটামিন সি অনেক সময়স্টোন হয়ে কিডনিতে জমা হয়। এতে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন সি অবশ্যই সঠিক নিয়ম ও পরিমাণ মতো খেতে হবে। তবে, ফল ও খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন সি খেলেতা শরীরের ক্ষতি করে না। এজন্য ফল, সবজি, লেবু, কমলা, স্ট্রবেরি, কিউই, ব্রকলি, ফুলকপি, পালং শাক, সবুজ পাতাওয়ালা সবজি, বাঁধাকপি, শালগম, টমেটো, পেয়ারা ও আঙুরের মতো ফলগুলো নিয়মিত খাওয়া যায়।[১০৭]

বাচ্চাদের একটু জ্বর হলে মা-বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে অনেক সময়চিকিৎসককে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে বলে। জ্বর বিভিন্ন কারণে হতে পারে। একটু বৃষ্টি হলে ছোট বাচ্চার জ্বর ও কাশি-সর্দি হতে পারে। ভাইরাস হলে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নেই, সাধারণ প্যারাসিটামল খেলেই তা ভালো হয়ে যায়। ভাইরাস জ্বরে অ্যান্টি বায়োটিক কাজে আসে না। বাচ্চাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে শুধু শুধু অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানোর অভ্যাস করানো মোটেও ঠিক না। কারণ পরবর্তীতে দেখা যাবে, সাধারণ ঔষধ তার আর কোনো কাজে আসছে না। এটাও বিপদের কথা।

অসুখ হলে ওষুধ খেতে হয় এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সঠিক নিয়মে ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করি না। ওষুধ খেতে আমরা যতটা তৎপর, ওষুধ খাওয়ার নিয়ম মানতে ততটাই উদাসীন। আমাদের এই অবহেলা জীবন রক্ষাকারী ওষুধকে করে তুলতে পারে জীবনবিনাশী বিষ। ওষুধ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যে অনিয়মটা করি, তা হলো চিকিৎসকের পরামর্শ না নেওয়া। আমরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করি, কখনো আত্মীয়, কখনো বন্ধুর পরামর্শ নিই, কখনো চিকিৎসকের চেয়ে ওষুধ বিক্রেতার ওপর বেশি নির্ভর করি। 'অমুক ওষুধে তমুক ভালো হয়েছিল, তাই আমিও ভালো হব' এমন চিন্তা আমাদের মধ্যে কাজ করে। অথচ লক্ষণ এক হলেই অসুখ এক হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার একই রোগে একই ওষুধের মাত্রা রোগীভেদে ভিন্ন হতে পারে। যদিওবা কখনো (বাধ্য হয়ে) চিকিৎসকের পরামর্শ নিই, ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বেঁধে দেওয়া বিধিনিষেধ মানি কম। সময়মতো

---

১০৬. ডা. সোহেল মাহমুদ আরাফাত,*দৈনিককালের কণ্ঠ*, "স্টেরয়েড উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি", ২০.০৮.২০১৭(থেকে উদ্ধৃত)

১০৭.মনীষা দাসগুপ্তা, *https://www.bebeautiful.in/bn/all-things-skin/everyday/benefits-of-vitamin,* "ভিটামিন সি-এর উপকারিতা", ০৭.০৭.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

ওষুধ খাওয়া, খাওয়ার আগে, না পরে তা বুঝে খাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান করা, এসব আমরা খেয়াল রাখি না। বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রার ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি উদাসীন থাকি। সবচেয়ে ভয়াবহ হলো ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া। জ্বর ভালো হয়ে গেছে, অ্যান্টিবায়োটিক আর কী দরকার ভেবে নিজেরাই ওষুধ বন্ধ করে দিই। আবার অন্যদিকে কয়েক দিনে জ্বর ভালো না হলে ওষুধ ঠিক নাই ভেবে তা বন্ধ করে দিই এবং অন্য চিকিৎসকের কাছে নতুন ওষুধের প্রত্যাশায় যাই। যেসব অসুখে দীর্ঘদিন বা আজীবন ওষুধ খেতে হয়, সেখানে আমরা অসুখ নিয়ন্ত্রণে এলেই তা বন্ধ করে দিই, বুঝতে চাই না যে রোগ ভালো হয়নি, নিয়ন্ত্রণে আছে কেবল। ওষুধ শুরুর মতো বন্ধ করার সময়ও আমরা নিয়ম মানি না। যেসব ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করা যায় না, তা নিজেরাই হঠাৎ বন্ধ করে দিই।যক্ষ্মার কথায় বলা যায়- যেখানে কমপক্ষে ছয় মাস ওষুধ খেতে হয়, অথচ অনেকেই কয়েক মাস খেয়ে ভালো হয়ে গেছি মনে করে তা বন্ধ করে দেয়। তখন তা মারাত্মক মাল্টি-ড্রাগরেজিস্ট্যান্স টিবিতে পরিণত হয়, যা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড ইত্যাদি রোগের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ সেবন করতে হয়। এসকল রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সঠিক নিয়মে মেডিসিন খেতে হবে। আমাদের আর্থিক দিকটাও বিবেচনা করা জরুরি। যে চিকিৎসা এখন সুলভে হচ্ছে, ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে ও সঠিক নিয়ম না মেনে নিজের মতো ওষুধ খেলে তা পরবর্তী সময়ে ব্যয়বহুল হয়ে যেতে পারে।[১০৮]

নিয়মিত ওষুধ খেলেও যদি সেবনবিধি না মানা হয়, তবে অনেক ওষুধই অকার্যকর হয়ে যায়। খালি পেটে খাওয়ার ওষুধ ভরা পেটে খেলে তা না খাওয়ার মতোই হবে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এক ওষুধ অন্য ওষুধের উপস্থিতিতে কাজ করে না। অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে এসব ওষুধ একত্রে খেলে লাভ তো হবেই না, বরং ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে।একজন চিকিৎসক ভালোমতোই জানেন, কোন ওষুধের কী সমস্যা আর তাই তা কাকে দেওয়া যাবে, কাকে যাবে না। নিজে থেকে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা সম্ভব নয়, তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা বেশি। ব্যথার ওষুধ খেয়ে পেট ফুটো হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড খেয়ে অনেকেই মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়, যা সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া হঠাৎ ওষুধ বন্ধ করেও অনেকে বিপদে পড়ে, বিশেষ করে স্টেরয়েড হঠাৎ বন্ধ করলে এডিসনিয়ান ক্রাইসিস হতে পারে, যা থেকে রোগী মারাও যেতে পারে।ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ভিটামিন 'এ' বা কৃমির ওষুধের মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে ক্ষতির কারণ।

দুটি বিপরীতধর্মী ওষুধ একসঙ্গে খাওয়া একজন মানুষকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। কারণ দুটি বিপরীতধর্মী ওষুধ একসঙ্গে খেলে একটি আরেকটির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ফলে কোনোটাই শরীরের কোনো কাজে আসে না এবং যে রোগের জন্য ওষুধ খাওয়া হলো সেটাতেও কোনো প্রভাব পড়ে না। পাশাপাশি দেখা দিতে পারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। যেমন- 'অ্যান্টিডিপ্রিসেন্ট' এবং 'মেথাডন' এই দুই ধরনের ওষুধ একসঙ্গে খেলে এমনটা হয়। সাধারণ ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে।

চিকিৎসক কোনো ওষুধ দিলে তার কাছ থেকেই ঐ ওষুধ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে। কখন, কীভাবে এবং কী পরিমাণ সেবন করতে হবে তা সবই জেনে নিতে হবে। অনেক সময় ডাক্তারের লিখে দেয়া ওষুধ দোকানে না থাকালে বা থাকলেও অধিক মুনাফার লোভে অন্য প্রতিষ্ঠানের ওষুধ দোকানিরা দিতে চায়। দুটো ওষুধ আসলেই এক কিনা সেটাও নিশ্চিত হতে হবে ওষুধের 'জেনেরিক' নাম কিংবা তাতে থাকা উপাদানের তালিকা দেখে। ওষুধ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকলে তা সেবনে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কমবে।

ওষুধ যত সাধারণই হোক না কেনো তা চিকিৎসকের বাতলে দেওয়া পরিমাণেই খেতে হবে। কারণ বেশি ওষুধ খেলে তা যকৃতের ওপর বাড়তি চাপ ফেলে এবং বাড়তে পারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মাত্রা। সেইসঙ্গে মাথা ঘোরানো, মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত, বুকে ব্যথা, বমি ও ডায়রিয়াসহ ইত্যাদি সমস্যাও দেখা দিতে পারে। আবার চিকিৎসক যতবার সেবন করতে বলেছেন তার চাইতে কম সেবন করাও ক্ষতিকর।

---

১০৮.ডা. মো: সাইফুল্লাহ রাসেল, *দৈনিক যুগান্তর*,"চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবনে শরীরে যেসব ক্ষতি হতে পারে", ১৪.০১.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া বা আলসেমি করে সঠিক নিয়মে ওষুধ না খাওয়া এটি খুবই বদ অভ্যাস। দীর্ঘদিন ধরে খেতে হয় এমন ওষুধের ক্ষেত্রেইএসব বিপত্তি ঘটে থাকে। এই হেলাফেলার ভবিষ্যত ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্টস, স্টেরয়েড, ব্লাড থিনিং মেডিসিন ইত্যাদি কখনই ভুল করা যাবে না কিংবা মাঝপথে বন্ধ করা যাবে না।[১০৯] আবার কিছু ওষুধ চিকিৎসক খালি পেটে খেতেবলেন। সেগুলো ছাড়া অন্য কোনো ওষুধই খালি পেটে গ্রহণ করা উচিত হবে না। আবার কিছু ওষুধ খাওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর খেতে বলেন, ঠিক সেভাবেই খেতে হবে। ছোটখাট এই বিষয়গুলোকেও অবহেলা করা যাবে না।

অনেক সময় দেখা যায়, নিজে তো ডাক্তারি করিই, অন্যদের অসুস্থতাতেও পরামর্শ দিতে আমরা পিছপা হইনা। রোগ যত সাধারণ বা মারাত্মকই হোক না কেনো, সবার কাছেই কোনো না কোনো চিকিৎসা আছে। আরও ভয়ঙ্কর বিষয় হলো রোগীও চিকিৎসকের পরামর্শের চেয়ে আশপাশের মানুষের পরামর্শে ভরসা করে  বেশি। দু'জনের উচ্চ রক্তচাপ আছে বলেই যে দু'জন একই ওষুধ খেতে পারবে এমনটা নাও হতে পারে। চিকিৎসক ওষুধ দেন রোগীর শারীরিক অবস্থা, বয়স ও অন্যান্য রোগসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে।

তাই ঔষধ সেবনে একজন রোগী নিম্নের বিষয়াবলীর প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত-

* বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শেই ওষুধ সেবন করা, হাতুড়ে ডাক্তার বা চিকিৎসায় অভিজ্ঞ নয় এমর মানুষের পরামর্শে ওষুধ না খাওয়া।

* বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থা, লিভারের রোগ ইত্যাদি) সাধারণ ওষুধ যা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিৎসকের পরামর্শেই সেবন করা।

* ওষুধ কেনার সময় মেয়াদকাল দেখা। কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রোগ সারানোর পরিবর্তে ক্ষতিই করবে।

* চিকিৎসক ওষুধ খাওয়ার যেসব নিয়ম বলে দেবেন (যেমন- কতটুকু ওষুধ, কতক্ষণ পরপর, কত দিন পর্যন্ত এবং খাওয়ার আগে না পরে ইত্যাদি) তা মেনে সেবন করা। প্রয়োজনে তা লিখে রাখা বা অন্যের সাহায্য নেয়া। নিজে থেকে ওষুধের মাত্রা কখনো পরিবর্তন না করা।

* ঔষধ সেবনে বাচ্চা ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্ক থাকা। তাদের ওষুধের মাত্রা, চোখের ড্রপ বা মলম এবং ইনজেকশনের প্রয়োগবিধির (যেমন মাংসে বা শিরায়) ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা।

* চিকিৎসকের প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ খেয়ে সুস্থতা লাভ করা হয়েছে, পুনরায় একই অসুখ হলে পূর্বের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ফার্মেসি থেকে নিজেই ওষুধ ক্রয় করে সেবন না করা। কেননা বিভিন্ন কারণে একই ওষুধ এখন কাজ নাও করতে পারে।

* সামান্য অসুখে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ব্যথার ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়া।

* নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া বন্ধ না করা। সুস্থবোধ করলেও কোর্স সম্পন্ন করা। বিশেষ কোনো সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

* বিশেষ করে বোতলজাত ওষুধ যার কর্ক খোলা হয়েছে সবটুকু শেষ না হলে তা রেখে দিয়ে একই অসুখের জন্য পূর্বের ওষুধ কিছুদিন পর পুনরায় ব্যবহার না করে তা ফেলে দেয়া।

* একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক ও অন্যান্য পদ্ধতির চিকিৎসা সেবা নিলে তা চিকিৎসককে জানানো।

* ওষুধ সব সময় আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা, শুষ্ক স্থানে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা। তবে যেসকল ওষুধ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হয় এবং নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করলে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা।

* চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে লিখিত নামের ওষুধই ক্রয় করা। কোন কারণে তা ক্রয় করতে না চাইলে বা দোকানে না পাওয়া গেলে বিজ্ঞজনের সাথে পরামর্শ করে বিকল্প ঔষধ ক্রয় করা।

ওষুধ বিক্রেতার কর্তব্য প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ বিক্রি করা, শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে যেনতেনভাবে যেকোনো ওষুধ বিক্রি না করা এবং কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করা, দোকানে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা।[১১০]

---

১০৯. *https://m.bdnews24.com/amp/bn/detail/lifestyle.*"ওষুধ খাওয়ার ভুলে অসুস্থতা", ১৪.০১.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

১১০. ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ. *দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন পত্রিকা)*, "ইচ্ছেমতো ওষুধ নয়", ২৯.০৯.২০১৫ (থেকে উদ্ধৃত)

# সপ্তম অধ্যায়

## ইসলামে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনা: তাৎপর্য বিশ্লেষণ

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | সুস্থতা আল্লাহ প্রদত্ত একটি অন্যতম নিয়ামত |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | মানব জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | : | স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবিক আচার-আচরণ ও কাজকর্মের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা |

## প্রথম পরিচ্ছেদ: সুস্থতা আল্লাহ প্রদত্ত একটি অন্যতম নিয়ামত

প্রতিটি মানুষই ভাল ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে চায়। আর তা নির্ভর করে শারীরিক সুস্থতার ওপর। সুস্থ মানুষ মানে সুস্থ পৃথিবী। কেউ পীড়িত বা রোগা থাকলে সর্বক্ষেত্র অসাড় হয়ে ওঠে। এমন ব্যক্তি থেকে পৃথিবী ভালো কিছু আশা করতে পারে না। সুতরাং মানুষ ও পৃথিবীকে সুন্দর ও সুস্থ রাখতে সুস্থ জীবনের কোন বিকল্প নেই। তই স্বাস্থ্য মানুষের পরম সম্পদ। যার স্বাস্থ্য নেই তার মতো হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ নেই। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে জীবন একটি বিড়ম্বনা মাত্র। অপরপক্ষে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দরিদ্র হলেও সুখী। হাদীসে এসেছে- হযরত আবু বকর (রা.) সূত্রে হযরত আওসাত ইবন ইসমাঈল বাজালী (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

... وَ سَلُوا اللهَ الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ اَحَدُ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةَ–

অর্থ: ... তোমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা করো। কেননা ঈমানের পর কাউকে এমন কিছু দান করা হয়নি, যা সুস্থতা থেকে উত্তম হতে পারে।[১]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- اِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوْا شَيْئًا اَفْضَلَ مِنَ الْعَفْوِ وَ الْعَافِيَةِ

অর্থ: নিশ্চয় মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নিয়ামত প্রদান করা হয়নি।[২]

বাস্তবেই স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি বিরাট অট্টালিকায় বসবাস করে এবং কোমল শয্যায় শয়ন করেও শান্তি লাভ করতে পারে না। তাই স্বাস্থ্যবান দরিদ্র ব্যক্তি স্বাস্থ্যহীন ধনবান ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর সুখী। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি আর্থিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে মানুষের চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তিও লোপ পায়। সাধারণত স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকে। সাংসারিক জীবনের সর্বপ্রকার উন্নতি স্বাস্থ্যবান মানুষের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব।

**স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল**

প্রবাদ আছে- A Sound mind in a sound body.অর্থাৎ, সুস্থ দেহ সুস্থ মনের বাস। এছাড়া আরো বলা হয়ে থাকে- স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এ প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা একজন অসুস্থ ব্যক্তি হাড়ে হাড়ে টের পায়।অসুস্থ ব্যক্তির নিকট পৃথিবীরআনন্দ-উল্লাস ও ভোগ-বিলাসিতার সকল উপকরণ বিরক্তিকর মনে হয়। জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট যেমন মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যও তিতা লাগে, তদ্রূপ অসুস্থ ব্যক্তির নিকট পুরো জীবনটাই তিক্ত। সুখের সকল উপকরণ সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে দু:খী। জীবনের সুখ লাভে স্বাস্থ্যের বিকল্প দ্বিতীয়কিছু হতে পারে না। সুতরাং এই বিশেষ নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্যই কর্তব্য। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্যের হেফাযত ও সুরক্ষার মৌলিক বিধিবিধান সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কেননা স্বাস্থ্য ভাল থাকলে জীবন উপভোগসহ সকল কাজেই তৃপ্তিই লাভ করা সম্ভব, কিন্তু স্বাস্থ্যহীন মানুষের জন্য সর্বপ্রকার বিলাসিতা এবং ঐশ্বর্যতাও অতৃপ্তি ও অস্বস্তিকর। হাদীসে এসেছে- হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে এবং আমি সুস্থ থাকি তবে আমি শোকরিয়া আদায় করি। এ অবস্থাটি আমার নিকট এ অবস্থার চেয়ে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় যে আমি অসুস্থতার দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হই এবং ধৈর্য ধারণ করি।" (আমার এ কথা শ্রবণ করে) নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন- يُحِبُّ مَعَكَ الْعَافِيَةَ–وَ رَسُوْلُ اللهِ অর্থ: আল্লাহর রাসূলও তোমার সাথে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে পছন্দ করেন।[৩]

---

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মাআরিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: দুআ, অনুচ্ছেদ: ক্ষমা ও সুস্থতার দুআ খ. ৪, পৃ. ২৭৩, হাদীস নং- ৩৮৪৯; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, (অনুবাদ: আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী),*আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইফা. সেপ্টেম্বর ২০১৪ (পঞ্চম মুদ্রণ), অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে, পৃ. ৩৩১, হাদীস নং- ৭২৯

২. প্রিন্সিপাল হাফেজ নযর আহমদ, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান), *তিব্বে নববী*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম,হক লাইব্রেরী, মার্চ ২০০২ (চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ১৬

৩. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

**সুস্বাস্থ্যের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুআ**

সুস্থতা আল্লাহ তা'আলার এত বড় নিয়ামত যেস্বয়ং নবী কারীম (সা.) নিয়মিত এর জন্য দুআ করতেন এবং প্রতিটি মানুষ যাতে সুস্বাস্থ্য কামনায় আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করে তাও বিভিন্ন হাদীসে নির্দেশনা ও শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে– عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَ التُّقٰى وَ الْعَفَافَ وَ الْغِنٰى

অর্থ: আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) দু'আয় বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিদায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও অভাবমুক্ততা প্রার্থনা করছি।[৪]

অন্য একটি হাদীস আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিয়মিতভাবেসন্ধ্যায় এবং সকালে এ দুআগুলো পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের সুস্থতা ও কল্যাণ কামনা করি।[৫] এছাড়া নবী কারীম (সা.)-এর পবিত্র যবানে প্রায় সর্বদাই এই দু'আ উচ্চারিত হতো-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَ اِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَ نَجَاحًا يُّتْبِعُه فَلَاحًا وَ رَحْمَةً مِّنْكَ وَ عَافِيَةً وَّ مَغْفِرَةً مِّنْكَ وَ رِضْوَانًا–

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঈমানের সাথে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা প্রার্থনা করি এবং উত্তম চরিত্রের সাথে ঈমান প্রার্থনা করি এবং মুক্তি প্রার্থনা করি যারপর কামিয়াবী ও সফলতা নসীব হবে। আপনার রহমত প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট স্বাস্থ্য, সুস্থতা, শান্তি, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি।জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী বলে আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা করবো? তিনি (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি বলবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَ ارْحَمْنِىْ وَ عَافِنِىْ وَ ارْزُقْنِىْ وَ جَمَعَ اَصَابِعَهُ الْاَرْبَعَ اِلاَّ الْاِبْهَامَ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِيْنَكَ وَ دُنْيَاكَ–

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে আরোগ্য দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন। অত:পর তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া অবশিষ্ট চার আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন, এই (চারটি) প্রার্থনা তোমার দীন ও দুনিয়াকে একত্রিত করবে।[৬] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ؟ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ– ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِى– فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ؟ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ– ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ– فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللهِ! اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ؟ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ– فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম (সা.)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দুআ সর্বোত্তম? তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তুমি তোমার রবের নিকট আখিরাতের ক্ষমা এবং দুনিয়ার সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের দুআ করো। অত:পর লোকটি দ্বিতীয় দিন তাঁর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দুআ সর্বোত্তম! তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তুমি তোমার রবের নিকট আখিরাতের ক্ষমা এবং দুনিয়ার সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের দুআ করো। অত:পর লোকটি তৃতীয় দিন তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! কোন দুআ সর্বোত্তম! তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তুমি তোমার রবের নিকট আখিরাতের ক্ষমা এবং দুনিয়ার সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের দুআ করো। যদি তোমাকে আখিরাতের ক্ষমা এবং দুনিয়ার সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য প্রদান করা হয়, তাহলে তুমি সফল।[৭]

---

৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: দু'আ, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই),খ. ২, পৃ. ৪৯২, হাদীস নং- ৩৪৮৯

৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: দু'আ, অনুচ্ছেদ: ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় কী দু'আ করবে, খ. ৪, পৃ. ২৮৫, হাদীস নং- ৩৮৭১

৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গিন দু'আ খ. ৪, পৃ. ২৭০, হাদীস নং- ৩৮৪৫

৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: দু'আ, অনুচ্ছেদ: ক্ষমা ও সুস্থতার দু'আ খ. ৪, পৃ. ২৭২, হাদীস নং- ৩৮৪৮;*জামি আত-*

আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ اَفْضَلَ مِنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বান্দা যত রকম দু'আ করে, "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়ার আরোগ্য এবং আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি" এর চেয়ে উত্তম নয়।[৮]

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُسْئَلَ الْعَافِيَةَ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহর কাছে স্বাস্থ্য-সুস্বাস্থ্য প্রার্থনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোনো প্রার্থনা নেই।[৯]তাই হাদীসে দেখা যায়-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَادَ رَجُلاً قَدْ جُهِدَ حَتّٰى صَارَ مِثْلَ فَرْخٍ فَقَالَ لَهُ اَمَّا كُنْتَ تَدْعُوْ؟ اَمَا كُنْتَ تَسْئَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ؟

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার নবী কারীম (সা.) এক ব্যক্তিকে দেখতে এলেন। লোকটি অসুস্থার কারণে পাখির ছানার মতো (কৃশ) হয়ে পড়েছিল। তিনি লোকটিকে বললেন: তুমি কি তোমার রবের কাছে সুস্থতার জন্য দুআ করছো না?[১০] অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আব্বাস (রা.)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন–يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

অর্থ: হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! আপনি আল্লাহ তাআলার নিকটদুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা প্রার্থনা করুন।[১১] উল্লেখ হাদীসসমূহে বর্ণিত عافية (আফিয়া) শব্দের অর্থ: সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য।[১২]

এজন্যই আল্লাহর সে সকল প্রিয় বান্দা যারা সর্বাবস্থাতেই সবর ও শোকরিয়া আদায় করাকে নিজেদের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করেন এবং অসুখ-বিসুখকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল ও আখিরাতে অধিক মর্যাদা লাভের মাধ্যম মনে করেন, তাদেরকেও অসুস্থতা থেকে সুস্থতার জন্য সাধারণত এরূপ বিনীত ভাষায় দুআ করতে দেখা যায়-"হে করুণাময় প্রভু! আপনি আমার অসুস্থতার নিয়ামতকে সুস্থতার সুমহান নিয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।"মূলত এরূপ দুআ তাঁরা এজন্য করে থাকেন- অসুখ-বিসুখে পতিত হয়ে ধৈর্য ধারণ করা যদিও ওয়াজিব, কিন্তু সুস্থতার সময় শোকরিয়া আদায় করাও ওয়াজিব। বস্তুত ধৈর্য ধারণের চেয়ে শোকরিয়া আদায় করা সর্বাবস্থাতেই আফযল ও শ্রেষ্ঠ। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–نِعْمَتَانِمَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ أَ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

অর্থ: অধিকাংশ মানুষ দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে ধোঁকায় লিপ্ত রয়েছে। যথা: সুস্থতা ও অবসর।[১৩]

---

*তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: দু'আ, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই),খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং- ৩৫১২

৮. *সুনান ইবন মাজাহ*,প্রাগুক্ত,অধ্যায়: দু'আ, অনুচ্ছেদ: ক্ষমা ও সুস্থতার দুআ খ. ৪, পৃ. ২৭৩, হাদীস নং- ৩৮৫১

৯. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: দু'আ, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই),খ. ২, পৃ. ৪৯৯, হাদীস নং- ৩৫১৫

১০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করা,খ. ২, পৃ. ৪৯২, হাদীস নং- ৩৪৮৭

১১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই),খ. ২, পৃ. ৪৯৯, হাদীস নং- ৩৫১৪

১২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকা, বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী: ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৫৫৪,

১৩. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, লেবানন: বৈরুত, মাকতাবাতু আল-মানারুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ২১৫;
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, অধ্যায়: কোমল হওয়া, অনুচ্ছেদ: নবী কারীম (সা.)-এর বাণী: আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, খ. ২, পৃ. ১৭৯৬, হাদীস নং- ৬৪১২;
*জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: স্বাস্থ্য ও অবসর এমন দুটি নিয়ামত যাতে বহু লোক ধোকায় নিপতিত, খ. ২, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং- ২৩০৪

বাস্তবেই পার্থিব ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে অধিকাংশ মানুষ এ দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে চরম উদাসীন থাকে। তারা ধোঁকায় পতিত হয় এবং ভাবে এ স্বাস্থ্য সর্বদাই অটুট থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা কখনও নি:শেষ হবে না। অথচ এগুলো হলো নিতান্তই সাময়িক বিষয়, যা আজ আছে কাল নাও থাকেত পারে। চরম সত্য কথা হল, এক মুহূর্তের জন্যও এগুলোর ওপর ভরসা করা উচিত নয়। বরং সুস্থ ও অবসর অবস্থায় যথাসম্ভব বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ– وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ–

অর্থ: অতএব আপনি যখন অবসর পান প্রত্যক্ষ ইবাদত আদায়ে পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।[১৪] হাদীসেও বর্ণিত আছে–عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ... خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন... তোমার অসুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো[১৫] এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সাতটি বিষয় আসার পূর্বেই আমলের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য যত্নবান হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন, এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো: এমন রোগ যা স্বাস্থ্যকে বিনষ্ট করে দেয়।[১৬]

সুতরাং মানুষের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো, যদি সুস্বাস্থ্যের ন্যায় মহান নিয়ামত অর্জিত হয় তাহলে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করতএর যথাযথ যত্ন নেয়া এবং মর্যাদা ও কদর করা। আর স্বচ্ছলতার দৌলত নসিব হলে এটিকেও আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ নিয়ামত মনে করে শোকরিয়া আদায় করা, কোনভাবেই গর্ব ও অহংকার না করা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আল্লাহ তাআলার একটি বড় নিয়ামত। আল্লাহর দেয়া এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহর বিধান হলো, কোনো নিয়ামতের প্রতি অমর্যাদা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন শুধু এই নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়ারই কারণ হয় না; বরং নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার আল্লাহর আযাবও ডেকে আনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা  ইরশাদ করেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ–

অর্থ: যদি তোমরা (কোনো নিয়ামত পেয়ে এর) কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেবো। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।[১৭]

স্বাস্থ্য ও সুস্থতা যেহেতু আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম নিয়ামত। তাই সুস্থ থাকা অবস্থায় আমরা মৌখিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ বলে যেমন শোকরিয়া আদায় করবো, তেমনিভাবে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে শারীরিক শোকরিয়াও আদায় করা উচিত। পাশাপাশি মানুষ সাধারণত আল্লাহ তাআলার দরবারে পার্থিব উন্নতি লাভ, গোনাহ থেকে মুক্তি, পরকালের নাজাত এবং নিজের প্রয়োজনানুসারে দুআ করে থাকে। বিশেষ করে কেউ অসুস্থ হলে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দুআ করতে থাকেএবং পরহেযগার-মুত্তাকী ব্যক্তিদেরকে দিয়েও দুআ করানো হয়। কিন্তু খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে, যারা সুস্থাবস্থায় নিয়মিত স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য দুআ করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্থ থাকার জন্যও তাঁর সাথীদের দুআ করতে শিক্ষা দিয়েছেন, উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং নিজেও দুআ করেছেন।

---

১৪. আল-কুরআন, ৯৪: ৭-৮

১৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কোমল হওয়া, অনুচ্ছেদ: নবী কারীম (সা.)-এর বাণী: দুনিয়াতে তুমি একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মতো থাকো, খ. ২, পৃ. ১৭৯৬, হাদীস নং - ৬৪১৬

১৬. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: আমলের বিষয়ে প্রতিযোগী হয়ে এগিয়ে যাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং- ২৩০৬

১৭. আল-কুরআন, ১৪: ৭

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেহকে কেন্দ্র করেই যেহেতু স্বাস্থ্য, সুতরাং শরীর যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলে সুস্বাস্থ্যের কামনা করা দূরাশা। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ্ববাসীকে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে এমন সব মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যা প্রতিপালনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ অতি সহজে নিজেরস্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে সক্ষম হবে।দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পাশ কাটিয়ে সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য ভালো খাবার গ্রহণসহ যত আয়োজনই করা হোক না কেন সবকিছু বিফলে যাবে। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আমাদের সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

### স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাদীসে বর্ণিত স্বভাবজাত দশটি মৌলিক নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মৌলিকভাবে এমন দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যা খুবই অর্থবহ। এগুলো বাদ দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রত্যাশা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর তাই মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষই স্বভাবজাত এসকল কার্যক্রম ইসলামী তরীকায় বা ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও সম্পাদন করে থাকে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَ اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَ السِّوَاكُ وَ الْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَ قَصُّ الْاَظْفَارِ وَ غَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَ نَتْفُ الْاِبِطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَّ نَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: দশটি কাজ স্বভাবজাত। (১)গোঁফ ছাঁটা, (২) দাঁড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করানো, (৫) নখ কাটা, (৬) অযু-গোসলের সময় আঙ্গুলের গিরা ও জোড়াসমূহ ধৌত করা, (৭) বগলের পশম পরিষ্কার করা, (৮) নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা (৯) পানির দ্বারা ইসতিঞ্জা করা। রাবী যাকারিয়া বলেন, হযরত মুসআব বলেছেন, আমি দশম নম্বরটি ভুলে গিয়েছি। তবে সম্ভবত তাহলো- কুলি করা।[১৮]

অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَ تَنْفُ الضَّبْعِ ،وَ تَقْلِيْمُ الظُّفْرِ وَ تَقْصِيْرُ الشَّارِبِ–

অর্থ:পাঁচটি কাজ ফিতরাতের[১৯]অন্তর্গত- (১) খাৎনা করা, (২) নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, (৩)বগলের নিচের পশম উপরে ফেলা, (৪)নখ কাটা এবং (৫) গোঁফ ছাঁটা।[২০]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপরোক্ত বাণীতে যে দশটি বিষয়কে মানব স্বভাবের মূল বলা হয়েছে এবং এগুলোকে সুন্নাতে নববীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, তা মানব জীবনের সুস্থতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুবই জরুরী। এগুলোর ওপর আমল করার জন্য হাদীসে কঠোরভাবে তাগিদও এসেছে এবং এগুলোর ওপর আমল না করাকে মাকরূহ তথা অপছন্দের কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উল্লিখিত স্বভাবজাত দশটি বিষয়ে মানুষের শারীরিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার কী কী মৌল বিধান রয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল-

---

১৮.আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ, ২০০৪, কিতাবুত তাহারাহ, অনুচ্ছেদ: মিসওয়াক করা স্বভাবসুলভ কাজ, খ. ১, পৃ. ১৮-১৯, হাদীস নং- ৫২

১৯. فطرة (ফিতরাত) বা স্বভাবগত হওয়ার অর্থ এ কাজগুলো প্রাচীন সকল দীনের অংশ। সমস্ত নবী-রাসূল এর শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যেন এগুলো স্বভাবেরই চাহিদা। যে কারণে কোনো নবীর শিক্ষা থেকে এগুলো বাদ যায়নি।

২০. আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৯, অধ্যায়: সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: স্বভাবসিদ্ধ সুন্নাতসমূহ, পৃ. ৫১৮, হাদীস নং- ৫০৪৩

**(ক) খাৎনা করা**

খাৎনা হলো একটি অস্ত্রপচারের মাধ্যমে মানব শিশ্নের অগ্রচর্ম (প্রিপিউস) অপসারণ। ইংরেজিতে একে Circumcision বলা হয়। যা ল্যাটিন ভাষা Circumcider শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ চারদিক থেকে কেটে ফেলা। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত অগ্রচর্মটিকে ভাজ খুলে প্রসারিত করা হয় এবং পেনিস গ্ল্যান্স বা শিশ্নের গোলাকার অগ্রভাগ হতে অপসারণ করা হয়। ব্যথা ও মানসিক চাপ কমাতে অনেক সময় আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় বা প্রচলিত এনেস্থেশিয়া দিয়ে অবশ করে নেয়া হয়।

মুসলিম সমাজে খাৎনার সংস্কৃতি শত শত বছর ধরে চলে আসছে। এমনকি যুগে যুগে নবী-রাসূলগণও এ সুন্নাত পালন করেছেন। তাই মুসলমানদের জন্য খাৎনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত, যা ওয়াজিবের সমপর্যায় মনে করা হয়। এজন্যই সাধারণ মানুষের পরিভাষায় খাৎনাকে মুসলমানী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং এটাকে মুসলমান হওয়ার নিদর্শন হিসেবেও ধরা হয়।ধারণা করা হয়, প্রাচীন মিশরে নবী ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৩০০ বছর আগে থেকে এটি প্রচলিত ছিল। আবার Grafton Elliots Smith-এর মতে, ১৫০০০ বছরের বেশি সময় আগে এটি চালু হয়েছিল। আর হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম খাৎনা করেন। তারপর থেকে এটি সুন্নাতে ইবরাহীম হিসেবে পালন হয়ে আসছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ وَ اِبْنُ عِشْرِيْنَ وَ مِائَةٍ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذٰلِكَ ثَمَانِيْنَ سَنَةَ– قَالَ سَعِيْدُ اِبْرَاهِيْمُ اَوَّلُ مَنْ اِخْتَتَنَ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম (আ.) যখন খাৎনা করান তখন তাঁর বয়স একশত বিশ বছর।অত:পর তিনি আরো আশি বছর জীবিত ছিলেন। এ রেওয়াতের এক পর্যায়ে রাবী সাঈদ বলেন: ইবরাহীম (আ.) প্রথম ব্যক্তি যিনি খাৎনা করেন।[২১]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত ইবরাহীম (আ.) কাদ্দুস নামক স্থানে বা কাদ্দুম নামক অস্ত্র দ্বারা ৮০ বছর কোনো বর্ণনায় ৯৯ বছর বয়সে খাৎনা করেছিলেন। তখন ইসমাঈল (আ.)-এর বয়স ছিল ১৩ বছর এবং তাদের সকল দাসও খাৎনা করেছিল। বাইবেলে খাৎনার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, আদম (আ.) যখন স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করেন যে আল্লাহ তাওবা কবুল করলে তিনি শরীরের কোনো একটি অঙ্গ কেটে ফেলবেন। এরপর তাঁর তাওবা কবুল হলে তিনি মানত পূর্ণ করতে চাইলেন। কিন্তু কিভাবে করবেন সে ব্যাপারে পেরেশান হয়ে গেলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) এসে এ স্থানটি নির্দেশ করলেন। এরপর তিনি তা কেটে ফেললেন। সম্ভবত তাঁর বংশধররা এ সুন্নাত ত্যাগ করেছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে এ সুন্নাত জীবিত করার নির্দেশ দেন।[২২] রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও খাৎনাকারী ছিলেন। সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে, বাদশাহ হিরাকল বললেন-

اِنِّىْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرْتُ فِى النُّجُوْمِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ– فَمَنْ يَّخْتَتِنُ مِنْ هٰذِهِ الاُمَّةِ؟ قَالُوْا لَيْسَ يَخْتَتِنُ اِلاَّ الْيَهُوْدُ فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَانُهُمْ وَ اكْتُبْ اِلٰى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوْا مَنْ فِيْهِمْ مِنَ الْيَهُوْدِ فَبَيْنَمَاهُمْ عَلٰى اَمْرِهِمْ اُتِىَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ اَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اِذْهَبُوْا فَانْظُرُوْا اَ مُخْتَتِنٌ هُوَ اَمْ لاَ– فَنَظَرُوْا اِلَيْهِ فَحَدَّثُوْهُ اَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَ سَاَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُوْهُ فَقَالَ هِرَقْلُ هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الاُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ–

অর্থ: ...আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খাৎনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন্ জাতি খাৎনা করে? তারা বললো, ইয়াহুদী ছাড়া কেউ খাৎনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন

---

২১.*আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: অধিক বয়সে খাৎনা, পৃ. ৫৫১, হাদীস নং- ১২৬৭

২২. মাওলানা আজিজুল হক আনসারী, *মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)*, ঢাকা, বাংলাবাজার, মীনা বুক হাউস: জানুয়ারী ২০১৯ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ২৬৫-২৬৬

আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে। তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাকল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন- তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখো তার খাৎনা হয়েছে কি-না। তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খাৎনা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জবাব দিলো, তারা খাৎনা করে। তারপর হিরাকল তাদের বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) এ উম্মতের বাদশাহ, তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।[২৩]

অন্য এক হাদীসে এসেছে- হযরত সালিম (রা.) বলেন, হযরত ইবন উমর (রা.) আমার এবং নাঈমের খাৎনা করান এবং এই উপলক্ষে একটি মেষ যবেহ করেন। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেদের মধ্যে আমি এই নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতাম যে, আমার খাৎনা উপলক্ষে একটি মেষ যবেহ করা হয়েছে।[২৪]

মুসলিম বিশ্ব এবং ইসরাইলে খাৎনা করানো বিষয়টি সার্বজনীন একটি ধর্মীয় বাধ্যতামূলক কর্ম। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু অংশে এটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পুরুষের খাৎনাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

**খাৎনার উপকারিতা**

ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে খাৎনা শুধু একটি রুসম বা প্রথা নয়; বরং এটাস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে বহু কল্যাণ সম্বলিত একটি সুন্নাত। নিম্নে খাৎনার কিছু উপকারিতাসমূহ উপস্থাপন করা হলো-

(ক) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, পুরুষের খাৎনা HIV বা মরণব্যাধি এইডস প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং অনেকাংশে সুরক্ষা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, আফ্রিকার যেসব দেশে খাৎনার হার বেশি, সেসব দেশে এইডসের হারও তুলনামূলক কম।

(খ) যাদের খাৎনা করা হয়, তাদেরমূত্রনালিপথের প্রদাহ এবং পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার উভয়ের ঝুঁকি কম থাকে।

(গ) খাৎনা করা হলে প্রস্রাবে বাধা এবং মূত্রথলিতে পাথরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু না করালে বৃক্কে পাথরী রোগে আক্রান্ত হয়।

(ঘ) খাৎনার ফলে পুরুষরা অতিরিক্ত উত্তেজনা ও আজেবাজে চিন্তা থেকে রেহাই পায়।

(ঙ) কোনো কোনোরোগের জীবাণু লিঙ্গের বাড়তি চামড়ার ভেতরে বাড়তে থাকে। ফলে লিঙ্গে একজিমা, ঘা ও এলার্জি হয়।

(চ) যে সকল পুরুষখাৎনা করে না তাদের অধিকাংশ সিফিলিস, গনোরিয়া এবং মারাত্মক এলার্জিতে ভোগে।

(ছ) খাৎনা করানোর ফলে পুরুষাঙ্গের বাড়তি চামড়ায় বিষাক্ত পুঁজ জমা হতে না পারায়বিভিন্নরোগ থেকে নিজে যেমন পরিত্রাণ পায়, তেমনিস্বামীর মাধ্যমে স্ত্রীর মধ্যে ক্ষত রোগসহ অন্যান্য রোগ সংক্রমিত হওয়ার আশংকা থাকে না।

(জ)খাৎনার কারণে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক জাতীয় রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফলে লিঙ্গে ব্যাথা ও জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হয় না।

(ঞ) অনেক সময় বাড়তি চামড়া লিঙ্গের অগ্রভাগের নরম অংশের সাথে মিলিত হয়ে প্রস্রাবের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যা খুবই কষ্টদায়কও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির উপসর্গের কারণ হয়।খাৎনা করালে এসব থেকে সহজেই মুক্ত থাকা যায়।

(ট) যৌন বিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষের খাৎনা করালে স্পর্শকাতরতা বেড়ে যায়। এতে নারী-পুরুষ উভয়ে যৌন মিলনে অধিক আনন্দ উপভোগ করে।

(ঠ) এছাড়া খাৎনা করানোর কারণে ডাক্তারদের পরিভাষায় ফাইমোসিস, প্যারাফাইমোসিস, ব্যালানাইসিস, ব্যালানোপোসটাইটিস ইত্যাদি রোগ থেকে হেফাজত থাকা যায়।[২৫]

---

২৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতবু বাদয়িল ওহী, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, খ. ১, পৃ. ৭, হাদীস নং-৭,

২৪. *আল-আদাবুল মুফরাদ*,প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: খাৎনা উপলক্ষে দাওয়াত, পৃ. ৫৪৯, হাদীস নং- ১২৬৩

ওয়াশিংটনের সৈনিক মেডিক্যাল কলেজের শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. বিজবেল বলেন, আমি প্রথমে খাৎনার বিরোধী ছিলাম। পরে দীর্ঘ গবেষণার ফলে প্রমাণিত হলো, মূত্রথলি ও মূত্রনালিবিষয়ক অনেক জটিল রোগের সমাধান হলো খাৎনা।[২৬]

প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম সম্প্রদায়কে যে খাৎনার নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে এর উপকারসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ইউরোপ, আমেরিকাসহ সারাবিশ্বে খাৎনার প্রচলন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**খাৎনা করানোর ক্ষেত্রে সতর্কতাঅবলম্বন**

হাইপোসডেডিয়াসিস রোগে আক্রান্ত বাচ্চাকে খাৎনা করারো যাবে না। কারণ এটি জন্মগত ত্রুটি। এতে মনে হয় শিশু জন্মগতভাবে খাৎনা হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গের বাড়তি চামড়া পরবর্তীতে অপারেশন করানোর সময় প্রয়োজন হয়। প্রতিটি খাৎনার আগে অবশ্যই BT-CT নামে রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে রক্তক্ষরণ জনিত কোন সমস্যা আছে কিনা। কারণ যাদের এই সমস্যা থাকে, তাদের রক্তপাত বন্ধ হয় না এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমেই খাৎনা করানো উচিত। কারণ অনভিজ্ঞরা চামড়া অতিরিক্ত বা কম কেটে ফেলার কারণে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না। এছাড়া অনভিজ্ঞতার কারণে অনেক সময় খাৎনা করাতে গিয়ে পুরুষাঙ্গের সংবেদনশীল মাথা কেটে ফেলে। খাৎনা করানোর সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকটি খুবই লক্ষ্য রাখতে হবে। অপরিষ্কার অবস্থায় খাৎনা করানোর ফলে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে দুর্দশার সীমা থাকে না।

দেশ বা এলাকা ভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাৎনা করানো হয়। যেমন: ডিসেকশন ম্যাথড, গ্লুটিন ম্যাথড ইত্যাদি। তবে বর্তমানে তুরস্কের স্বনামধন্য ইউরোলজিস্ট জনাব ভিদাত আলী কঙোর আবিষ্কৃত Alisklamp ম্যাথডকে সর্বশেষ আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সারাবিশ্বে এর জনপ্রিয়তা পেয়েছে বলেও মনে করা হয়। কারণ এ পদ্ধতিতে অন্যগুলোর চেয়ে অতিরিক্ত বেশকিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন: কোন প্রকার রক্তপাত হয় না, কোন প্রকার সেলাই করতে হয় না, কোন প্রকার ব্যান্ডেজ করতে হয় না। এছাড়া যেহেতু সেলাই করতে হয় না তাই কসমেটিক আউটপুট অনেক সুন্দর হয়। কোন প্রকার কাটা চিহ্নথাকে না।যেহেতু প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাই কোন প্রকার ইনফেকশন হয় না। ডিভাইস পরানো থাকার কারণে কোন শিক্ষার্থীকে স্কুল বা মাদ্রাসা থেকে খাৎনার জন্য আলাদাভাবে ছুটি নেয়ার প্রয়োজন নয় না।এ পদ্ধতিতে শীত বা গ্রীষ্মের কোন প্রভাব পড়ে না; বরং যে কোন ঋতুতে খাৎনা করা যায়।[২৭]

একজন শিশুর খাৎনা জীবনে বার বার করা হয় না একবারই করা হয়।সুতরাং অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত ডাক্তারের মাধ্যমে সর্বোত্তম পদ্ধতিতেই শিশুর খাৎনা করানো উচিত। সামান্য টাকা বা সময় সাশ্রয় করতে গিয়ে গ্রাম-গঞ্জের অনভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসকের মাধ্যমে খাৎনা করাতে গিয়ে কোন দুর্ঘনায় যেন একটি শিশুরও ভবিষ্যত জীবন নষ্ট না হয় অভিভাবক হিসেবে প্রত্যেকেরই সচেতন থাকা উচিত।

**নাভির নিচ এবং বগলের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা**

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ায় মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষার প্রতি অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মুসলমান কেবল বাহিরেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় বিশ্বাসী নয়; বরং অভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়ও দৃষ্টি রেখেছে। তাই ইসলাম মানুষের শরীরের নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম ও বগলের পশম পরিষ্কার করারও নির্দেশনা দিয়েছে। নাভির নিম্নাংশের লোম ও বগলের পশম যদিও বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু এগুলো নির্দিষ্ট সময়ে পরিষ্কার না করার কারণে স্বভাবের মধ্যে বিষণ্নতা সৃষ্টি হয় এবং মনের মধ্যে মালিন্য ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। কেননা শরীরের

---

২৫. ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই,( অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, আল-কাউসার প্রকাশনী: ২০০৯খ্রি:, খ. ১, পৃ. ২১৭

২৬. *https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life*, date: 07.04.20017.(থেকে উদ্ধৃত)

২৭. ডা. এম.ওয়াই.এফ. পারভেজ, *http://m.facebook. com/permalink.php story*.“খাৎনার ইতিহাস এবংআধুনিক খাৎনা/মুসলমানি”, (থেকে উদ্ধৃত)

অন্যান্য অংশে খুব সহজে আলো বাতাস প্রবেশ করলেও নাভি ও বগলের নিচে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে খুব সহজে এ দু'টি স্থান ঘেমে যায় এবং লোম থাকার কারণে অধিক সময় সিক্ত থাকে। এ দু'টি স্থানের অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি থেকে যে ঘাম নির্গত হয়, তা স্টেফালোককাস হমিনিস নামক ব্যাকটেরিয়া চরম দুর্গন্ধসহ নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। তাই দেখা যায়, নিয়মিতভাবে বগলের লোমপরিষ্কার না করা ব্যক্তির নিকট গেলে পাশ থেকে এর চরম দুর্গন্ধ অনুভব হয় যা খুবই বিরক্তিকর।

এছাড়া নাভির নিচের লোম নিয়মিত পরিষ্কার না করলে ঐ জায়গার লোমকোপের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগ হতে পারে। যৌনবিজ্ঞানীদের মতে, প্রতি সপ্তাহে নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করলে প্রাকৃতিকভাবেযৌনশক্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়, যা পরীক্ষিত।তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মিতবগল ও নাভির নিম্নাংশের লোমপরিষ্কার করা খুবই জরুরী। ইসলামে প্রতি সপ্তাহে এসকল লোম পরিষ্কার করা মুস্তাহাব এবং ৪০ দিনের মধ্যে অন্তত একবার পরিষ্কার করা আবশ্যক। এছাড়া বিনা ওযরে ৪০ দিন পরেও এগুলো পরিষ্কার না করা মাকরূহ তাহরীমি বা মারাত্মক গোনাহর কাজ।[২৮] হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَ تَقْلِيْمَ الاَظْفَارِ وَ قَصَّ الشَّارِبِ وَ نَتْفَ الاِبِطِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مَّرَّةً–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের জন্য চল্লিশ দিন পর পর নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা এবং বগলের পশম উঠিয়ে ফেলার সময় সীমা নির্ধারণ করে দেন।[২৯]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে – عَنْ نَافِعٍ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَلِّمُ اَظَافِيْرَهُ فِىْ كُلِّ خَمْسٍ عَشْرُ لَيْلَةً وَ يَسْتَحِدُّ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ–

অর্থ: নাফি বলেন, ইবন উমর (রা.) প্রতি পনেরো রাত্রির মধ্যে একবার নখসমূহ কাটতেন এবং প্রতিমাসে অবশ্যই একবার ক্ষৌরী করতেন।[৩০]

তাইযে ব্যক্তি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এগুলো পরিষ্কার করে না রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সাথে পানাহার করাকে মাকরূহ বলেছেন। তবে যে বলা হয় ৪০ দিন সময় অতিক্রম করলে কোনো ইবাদত কবুল হয় না তা ঠিক নয় এবং অবাঞ্ছিত লোম কাটা বা পরিষ্কারের পর গোসলও ফরয হয় না। এ লোম সপ্তাহের নির্ধারিত দিনেই কাটতে হবে এরও কোনো প্রমাণ মিলে না। সুতরাং যেকোন দিনে কাটা যাবে এতে কোন সমস্যা নেই। তবে প্রত্যেক সপ্তাহে জুমআর দিন, নখ ও মোচ ইত্যাদি কেটে ফেলার কথা ইবনে উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া লজ্জাস্থান বা সতর ঢেকে রাখা যেহেতু ফরয, তাই নাভির নীচের লোম কোনো পর পুরুষ বা নারী দিয়ে পরিষ্কার করানো বৈধ নয়।

উল্লেখ্য, মূল উদ্দেশ্য যেহেতু লোম পরিষ্কার করা তাই যেসব উপায় গ্রহণের মাধ্যমে লোম পরিষ্কার হবে সেসব উপায়ই গ্রহণ করা যাবে। ব্লেড, ক্ষুর বা কাঁচি দ্বারা গোপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য জায়েয। অনুরূপভাবে হেয়ার রিমুভার জাতীয় ক্যামিক্যাল দ্বারা পরিষ্কার করাতেও শরীয়তের কোনো বাধা নেই। তবে পুরুষের জন্য চেঁছে ফেলা এবং মহিলাদের জন্য উপড়িয়ে ফেলা মুস্তাহাব।

**নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোমের সীমারেখা**

পায়ের পাতার উপর ভর করে বসা অবস্থায় নাভি থেকে চার পাঁচ আঙ্গুল পরিমাণ নিচে যে ভাঁজ বা রেখা সৃষ্টি হয় সেখান থেকেই অবাঞ্ছিত লোমের সীমানা শুরু। ঐ ভাঁজ থেকে দুই উরু পর্যন্ত ডান-বামের লোম, গোপ্তাঙ্গের চারপাশের লোম, অণ্ডকোষ থেকে মলদ্বার পর্যন্ত উদগত লোম এবং মলদ্বারের আশপাশের লোম অবাঞ্ছিত লোমের অন্তর্ভুক্ত।এছাড়া যেসব পশম শরীরে থাকা অবস্থায় অন্যের জন্য দেখা না জায়েয, শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পর বা কাটার পরও তা দেখা না

২৮. মুফতী শফী, মুফতী আবু সাঈদ, মুফতী এরশাদ খান, *ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আশরাফিয়া বুক হাউজ, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৫৬১

২৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তারাজ্জুল, অনুচ্ছেদ: গোঁফ ছাঁটা, খ. ২, পৃ. ২২৫, হাদীস নং-৪২০০

৩০. *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: নাভির নিচের লোম পরিষ্কারের সময় সীমা নির্ধারণ, পৃ. ৫৫৫, হাদীস নং- ১২৭৫

জায়েয। তাই এ ধরনের পশম পরিষ্কার করে টয়লেটের ভেতর ফেলে দেয়াই উত্তম। তবে অন্য কোথাও ফেলতে চাইলে আলাদা কোনোকিছুতে ফেলা উচিত যেন তা দেখা না যায়।

**নখ কাটা**

নখ আসলে আমাদের দেহের সৌন্দর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি এক ধরনের মৃতকোষ, যা কেরাটিন নামের এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। দেখতে সাদা বর্ণের এবং পাতলা। আমরা খালি চোখে না দেখলেও নখ প্রতিদিনই বাড়ে। এক হিসেবে দেখা গেছে, হাত-পায়ের নখ প্রতিবছর গড়ে দুই ইঞ্চি করে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নখের বৃদ্ধিও তুলনামুলকভাবে কমে যায়।স্নায়ু কোষের মাধ্যমে আমরা দেহে ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু নখ মৃতকোষ হওয়ার কারণে এতে কোন স্নায়ু কোষ না থাকায় নখ কাটলে আমরা কোনো ব্যাথা অনুভব করি না। একই কারণে চুল কাটলেও আমরা কোনো ব্যাথা পাই না। যাহোকনখ সৌন্দর্যের প্রতীক হলেও যদি নিয়মিত কেটে সুন্দর করে রাখা না হয় তাহলে নেল পালিশ বা নেল আর্ট যাই ব্যবহার করা হোক না কেন হাতের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না। সুতরাং হাতের সৌন্দর্য প্রকাশে সুন্দর নখের কোনোতুলনা হয় না।তবে নখ কাটা শুধু হাতের বাহ্যিক সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা অতিশয় জরুরীও বটে। আমরা যত কাজই করি না কেন বলতে গেলে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষভাবে আমাদের নখ বেষ্টিত হাতের অগ্রভাগ তথা আঙ্গুলের মাধ্যমেই শুরু করে থাকি। অধিকাংশ কাজের ক্ষেত্রে সরাসরি নখের স্পর্শ লাগায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের নখের মধ্যে অনেক ময়লা ও জীবাণু লেগে থাকে, যদিও তা সব সময় দেখা যায় না। সুতরাং কিছুদিন পর পর নখ কেটে পরিষ্কার না রাখলেএতে ময়লা জমে যায়। আর কোনো কিছু খাওয়ার সময় যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে আঙ্গুলের সহযোগিতা নেয়া হয়, তাই সময়মত নখ না কাটলে নখে লেগে থাকা ময়লা ও জীবাণু খুব সহজেই খাবারের সাথে মিশে পেটে গিয়ে নানা ধরণের রোগ সৃষ্টি করে আমাদেরকে অসুস্থ করে তুলে। সুতরাং শারীরিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে কিছু দিন পর পর নখ কাটা খুবই প্রয়োজন। হাদীসে বর্ণিত আছে-

وَ يَقْلِمُ اَظْفَارَه فِىْ كُلِّ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক পনের দিন পর পর নখ কাটতেন।[৩১]একটি রেওয়াতে আছে-

عَنْ اَبِىْ وَاصِلٍ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ فَصَافَحَنِىْ فَرَاَى فِىْ اَظْفَارِىْ طُوْلاً– فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْأَلُ اَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَ هُوَ يَدَعُ اَظْفَارَهُ كَاَظَافِيْرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيْهَا الْجَنَابَةُ وَالْخَبَثُ وَالتَّفَثُ–

অর্থ: আবু ওয়াসিল বলেন, আমি আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। মোসাফাহার সময় তিনি আমার নখ বড় দেখে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন- তোমাদের কেউ কেউ আসমানের খবর জিজ্ঞাসা করো, অথচ তার হাতের নখগুলো পাখির নখের মতো যাতে জমে থাকে ময়লা-আবর্জনা।

তুলনামূলক মেয়েরা নখ বড় রাখলেও এক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা এবং উভয় হাত-পায়ের জন্য সমান বিধান।পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন নখ বড় রাখার দরুন কোন কারণে যদি নখের গোড়ায় পানি না পোঁছে তাহলে অযু শুদ্ধ হবে না।

অনেকে আবার হাতের নখ সবচেয়ে বেশি লম্বা করে রেকর্ড গড়ার জন্য বছরের পর বছর নখ কাটে না। এটা আসলে পাগলামী বা মানসিক অসুস্থতা ছাড়া কিছুই নয়। শুধু শুধু নিজের এত সুন্দর জীবনটাকে কয়েকটা নখের জন্য বিষিয়ে তোলা সত্যিই বোকামী। উল্লেখ্য, ইসলামের দৃষ্টিতে মানব শরীরের প্রতিটি অঙ্গই সম্মানিত। তাই নখ, চুল বা পশম কাটার পর তা মাটি চাপা দেয়াই উত্তম। শহরে বা অন্য কোথাও মাটি চাপা দেয়ার সুযোগ না থাকলে বাসায় ময়লার ঝুড়িতেও ফেলা যাবে, তবে কমোডে না ফেলাই উচিত। কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) শুক্রবারে এবং কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বৃহস্পতিবারে নখ কাটার অভ্যাস ছিল।[৩২]

---

৩১. আল্লামা আলী ইবন সুলতান মুহাম্মদ আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, লেবাননঃ বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০১ (প্রথমপ্রকাশ), অধ্যায়ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদঃ চিরুনি করা, খ. ৮, পৃ. ২৭৪

৩২. ডা. মোঃ আব্দুল হাই, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম সা.* ঢাকাঃ বাংলাবাজার, মদীনা পাবলিকেশান্স, সেপ্টেম্বর ২০০৮ (ষোলতম সংস্করণ), পৃ. ১০৪

**গোঁফ ছাঁটা**

ঠোঁটের উপরের অংশে গোঁফ গজানো এটা পুরুষ জাতির শরীরের প্রাকৃতিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। বয়:সন্ধিকালে সব ছেলেদেরই গোঁফ ওঠে। অনেকে গোঁফ রাখে, আবার অনেকে রাখে না। এটা সাধারণত ব্যক্তিগত রুচিবোধ হিসেবেই গণ্য করা হয়। নিওলিথিক যুগ থেকে পাথরের ক্ষুর দিয়ে ক্ষৌরী করার প্রচলন শুরু হলেও সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে গোঁফ ছাঁটা বা রাখার ক্ষেত্রে নানা রকম ফ্যাশন চালু হয়েছে। বিভিন্ন জাতি-গোত্রের মত গোঁফেরও রয়েছে নানা নাম। যেমন: দালি গোঁফ, ইংরেজ গোঁফ, ফু মঞ্চু গোঁফ, মেক্সিকান গোঁফ, প্রাকৃতিক গোঁফ, পেনসিল গোঁফ ও টুথব্রাশ গোঁফ ইত্যাদি। কোনো কোনো দেশে আবার বিশেষ চাকরিতে গোঁফ রাখার প্রতি উৎসাহিতও করা হয়। যেমন: ভারতের উত্তর প্রদেশের পুলিশদের গোঁফ রাখায় উৎসাহিত করতে গোঁফদারী পুলিশ সদস্যদের সরকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বেতন দেয়ার ঘোষণা পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে লম্বা গোঁফ রাখার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং গোঁফ ছেঁটে রাখার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে-

عَن ابْن عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّرِبِ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: নাভীর নিচের পশম কামানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা মানুষের ফিতরাত।[৩৩]

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْفِطْرَةُ خَمْسُ اَلْخِتَانُ وَ الْاِسْتِحْدَادُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَ نَتْفُ الاٰبَاطِ –

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি- ফিতরাত পাঁচটি: খাতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা ও বগলের পশম উপড়ে ফেলা।[৩৪] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেন: গোঁফ কেটে ফেলা ফিতরাত (স্বভাবের) অন্তর্ভূক্ত।[৩৫] عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ اَعْفُوا اللُّحٰى–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা মোচ ছেঁটে রাখো এবং দাড়ি লম্বা রাখো।[৩৬] আরেক হাদীসে এসেছে-

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَّمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا–

অর্থ: যায়েদ ইবন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যে ব্যক্তি মোচ কাটে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৩৭]

তবে মোচ একেবারে চামড়ার সাথে লাগিয়ে ছোট করতে হবে এমন নয়, যেন বেশি বড় না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাদীসে এসেছে, মুগীরা ইবন শুবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন... তাঁর (বিলাল রা.) গোঁফ লম্বা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি (সা.) তাঁকে (বিলাল রা.) বললেন: তোমার গোঁফ আমি মিসওয়াকের উপরে রেখে দেব অথবা তিনি বললেন: তুমি তোমার গোঁফ মিসওয়াকের উপর রেখে কেটে ফেল।[৩৮]

---

৩৩. *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: নখ কাটা, খ. ২, পৃ. ১৬৬৭, হাদীস নং -৫৮৯০

৩৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৬৭, হাদীস নং -৫৮৯১

৩৫. প্রাগুক্ত,অনুচ্ছেদ: গোঁফ কাটা, খ. ২, পৃ. ১৬৬৬, হাদীস নং -৫৮৮৮

৩৬. *সুনানু নাসায়ী*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: মোচ কাটা, পৃ. ৫১৮, হাদীস নং- ৫০৪৫

৩৭. প্রাগুক্ত, মোচ কাটা, পৃ. ৫১৮, হাদীস নং- ৫০৪৭

৩৮. *জামি আত-তিরমিযী*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সালুন-তরকারীর বর্ণনা, খ. ২, পৃ. ৬৪৫-৬৪৬, হাদীস নং- ১৬৬

হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) গোঁফ লম্বা না রাখার যে নির্দেশনা দিয়েছেন এটিও স্বাস্থ্য সচেতনার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কেননা গোঁফ লম্বা রাখলে তাতে ধূলা-বালি, ঘাম ও দূষিত রোগজীবাণু লেগে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, যা মুখের খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে পানীয় পদার্থের সাথে খুব সহজেই পাকস্থলিতে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের সমূহক্ষতি সাধন করতে পারে। এছাড়া নাকের ছিদ্রপথে শরীরের অভ্যন্তর হতে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত নির্গত হওয়ায় গোঁফ বড় থাকলে তাতে আটকে থাকা ধূলাবালি ও ঘামের সাথে মিশে বিষাক্ত জীবাণুতে পরিণত হয়। এসব জীবাণু খাদ্য ও অন্য কোনো তরল পদার্থ পান করার সময় মিশে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে মারাত্মক রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত করে থাকে।
তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লম্বা গোঁফ অবস্থায় পানাহার করা মাকরূহ বলা হয়েছে। কেননা গোঁফ যদি সময় সময় ছেঁটে রাখা না হয়, তাহলে যেকোন খাদ্য বা পানীয় গোঁফ ছুঁয়ে মুখের ভেতর প্রবেশ করলে সেগুলোর পবিত্রতা নিয়ে সংশয় যুক্ত হয়। যা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

**দাড়ি রাখা**

দাড়ি রাখা একটি সহজসাধ্য এবং স্বভাবসূলভ আমল হলেও বর্তমানে অনেকের নিকট এটি যেন একেবারেই অসম্ভব একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নিছক জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে দাড়ি রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যেই কেউ কেউ এমন কিছু অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে যার ধরণ দেখেই বোঝা যায়, এগুলো কোনো আমল অনুসন্ধিৎসু মনের উৎরাসিত হতে পারে না; বরং আমল থেকে নিরাপদ দূরত্ব অবলম্বনকারী এবং নিজের বে-আমলের নিরাপদ সুরক্ষার জন্য অযৌক্তিক কিছু বাহানামূলক প্রশ্ন বৈ কিছু নয়।আবার আমাদের চারপাশে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা শশ্রূধারী লোকদেরকে দেখলেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে, দাড়ি রাখাকে সেকেলে ও একটি অযথা কাজ মনে করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং দাড়ি কেন রাখা হলো সেজন্য বিব্রতকর প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলানোর চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। তবে তাদের এই অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও প্রশ্নের কারণে শশ্রূধারীগণের স্পৃহার ওপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করার কথা নয়। কারণ যাঁরা দাড়ি রাখে তারা সবকিছু বুঝে-শুনেই স্বভাবজাত, স্বাভাবিক ও ইতিবাচক একটি কাজ করার জন্য সর্বদাই গর্ববোধ করে থাকে। পক্ষান্তরে, যারা দাড়ি মুন্ডন করে তারা একটি অস্বাভাবিক, স্বভাববিরোধী, নেতিবাচক ও নিন্দনীয় কাজ করে থাকে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আগত বস্তুর ধ্বংস সাধন করার কারণে তাদেরকেই উল্টো প্রশ্ন করা যেতে পারে, তারা কেন এরূপ একটি নিন্দনীয় কাজ করছে? একটি সু-সজ্জিত বাগানকে বাগানের মালিকের অনুমতি ব্যতীত প্রতিনিয়ত উজার করে চলছে? দাড়ি তাদের ইচ্ছায় গজায় না এবং বৃদ্ধিও পায় না; বরং এটি একটি খোদায়ী শিল্প এবং কারিগরী, যা তাদের ইচ্ছা, পরিশ্রম ও উপার্জন ব্যতীতই চামড়ার ভেতর থেকে উত্থিত হয়ে থাকে। তাদেরও উচিত ছিল, অনুমতি ব্যতীত উক্ত খোদায়ী কাজের বিরোধিতা না করে তা সংরক্ষণ করা। কাজেই বাগানের সংরক্ষণকারীগণ নয়; বরং ধ্বংস সাধনকারীরাই তিরষ্কারের অধিক উপযুক্ত। বৃক্ষে ফল আসলে কেউ কারণ তালাশ করে না যে ফল কেন আসল? বরং বৃক্ষে ফল না আসলে এর অস্বাভাবিকতার কারণ খুঁজে বের করা হয়। তেমনিভাবে সুস্থতার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়না বরং অসুস্থতার কারণ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়। তাই বলা যায়, দাড়ির অস্তিত্বই যেহেতু আসল ও স্বাভাবিক বিষয়, মুন্ডন নয়। অতএব যারা দাড়ি রাখে না তাদেরকেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে দাড়ি না রেখে তারা কেন এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ করছে? দাড়ি না রাখার ক্ষেত্রে তাদের নিকট কোনো যুক্তি-প্রমাণ বা হাদীস আছে কি? নাকি শুধুই নিজের আত্ম প্রবঞ্চনা? প্রকৃতপক্ষে দাড়ির অস্বীকৃতি তাবৎ শরীয়ত এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের একটি অভিন্ন শরঈ তাকাযার অস্বীকার ও কার্যক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটানোর নামান্তর।

দাড়ি রাখাকেসাধারণত সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐকমত্য একটি বিধানরূপে বিবেচিত করা হয়। কেননা হাদীসে বর্ণিত 'ফিতরাত' (স্বভাবজাত) শব্দ দ্বারাসমস্ত ধর্ম ও শরীয়তের প্রত্যেক উম্মাহর দাড়ি রাখা প্রমাণিত। কোনো আমল উম্মাতের ঐকমত্যই যেখানেশরঈ দলীলের জন্য যথেষ্টসেক্ষেত্রেপূর্ববর্তী ও পরবর্তীসমস্ত নবী-রাসূল, আউলিয়া এবং উলামায়ে কিরামেরদাড়ি রাখার বিষয়টি নিশ্চয়ই একটি বিরাট শক্তিশালী দলীল।

عَشَرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ اَیْ مِنَ السُّنَّةِ اَیْ سُنَنِ الاَنْبِیَاءِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ اللَّتِیْ اُمِرْنَا بِالاِقْتِدَاءِ بِهِمْ فِیْهَا– اَیْ مِنَ السُّنَّةَ الْقَدِیْمَةِ اللَّتِیْ اِخْتَارَهَا الاَنْبِیَاءُ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ وَ اتَّفَقَتْ عَلَیْهَا الشَّرَائِعُ فَكَاَنَّهَا اَمْرُ جِبِلِّیُّ فُطِرُوْا عَلَیْهِ–

অর্থ: দশটি আমল ফিতরাত তথা স্বভাবজাত-এর অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাসের সুন্নাত। আমাদেরকে সেগুলো অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, সেগুলো সনাতন এবং প্রাচীন সুন্নাত, যেগুলো নবী-রাসূলগণের মনোপূত এবং সকল শরীয়ত সেগুলোর ব্যাপারে একমত। এই আমলগুলো যেন সুস্থ ও সুন্দর সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভূক্ত।[৩৯]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন–قَالُوْا وَ مَعْنَاهُ اِنَّهَا مِنْ سُنَنِ الاَنْبِیَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلاَمِهِ عَلَیْهِمْ

অর্থ: উলামাদের অভিমত হচ্ছে, 'ফিতরাত'-এর উদ্দেশ্য হল এগুলো সব আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সুন্নাত।[৪০]

তাই বলা যায়, দাড়ি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ও একনিষ্ঠ বন্ধু নবী-রাসূলগণের ইউনিফর্ম ছিল। কেননা নবী-রাসূলগণের জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহকেই 'ফিতরাত' তথা স্বভাবজাত-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অনেক হাদীসে 'ফিতরাত' শব্দের পরিবর্তে مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِیْنَ তথা রাসূলগণের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত বা তার সমার্থবোধক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে।[৪১]

হাদীসে বর্ণিত আছে – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اَمَرَ بِاِعْفَاءِ الشَّارِبِ وَ اِعْفَاءِ اللِّحْیَةِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) গোঁফ ছাঁটতে এবং দাঁড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪২]

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, উম্মতের হিদায়েতের কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোথাও দাড়ি রাখার কথা বলেননি; বরং সব জায়গায় দাড়ি লম্বা করার কথা ইরশাদ করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়- পুরুষের দাড়ি রাখা এটাসহজাত প্রবৃত্তি এবং স্বাভাবিক একটি বিষয়। যা মহান সৃষ্টিকর্তা বুঝে-শুনে পুরুষের মুখে দান করেছেন। দাড়ি ইসলামের প্রতীক-চিহ্ন এবং পুরুষের জন্য সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক। পুরুষের মুখে দাড়ি আর মহিলার মাথার লম্বা চুল আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই পছন্দীয়।তাই আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমার যথার্থ তামীলকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সেই স্বভাবজাত ক্রিয়াকে স্ব-প্রশংসা সাব্যস্ত করে ফিরেশতাদের একটি বিরাট জামাআতকে তাসবীহরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন-

سُبْحَانَ مَنْ زَیَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحٰی وَ زَیَّنَ النِّسَاءَ بِالْقُرُوْنِ وَ الذَّوَائِبِ–

অর্থ: পূত:পবিত্র সেই সত্তা! যিনি দাড়ি দ্বারা পুরুষ জাতির এবং খোপা ও বেনী দ্বারা নারী জাতির শোভা বর্ধন করেছেন।

ফিরেশতাদের একটি বিরাট জামাত কর্তৃক পুরুষ জাতির শোভা দাড়ি এবং নারী জাতির শোভা বেনী ও খোপাকে স্মরণ করা এবং সর্বদা এই বাক্যকে তাঁদের তাসবীহ হিসেবে পাঠেরত থাকা বাস্তবিকপক্ষে পুরুষ জাতি কর্তৃক নিজেদের উত্থিত দাড়ির সংরক্ষণ এবং নারী জাতি কর্তৃক নিজেদের বেনী ও খোপার হিফাযত আল্লাহ তাআলার কাম্য হওয়ার সার্বক্ষণিক ঘোষণাবাণী। সুতরাং নারী জাতি কর্তৃক চুল মুন্ডানো যেরূপ তাদের সম্ভ্রম ও নারীত্বের পক্ষে অশোভনীয়, অনুরূপ পুরুষ জাতি কর্তৃক দাড়ি মুন্ডানোও তাদের সম্মান ও পৌরুষত্বের পক্ষে অসমীচীন।[৪৩]

---

৩৯. মাওলানা কারী মোহাম্মদতৈয়্যেব ও মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী, (অনুবাদ: মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী), *শরীয়ার আলোকে ও যুক্তির নিরিখে দাড়ি*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, আজিজিয়া কুতুবখানা, মার্চ ১৯৯৬, পৃ. ১০৫-১০৬

৪০. মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী, পৃ. ১০৬

৪১. *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯৮

৪২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তারাজ্জুল, অনুচ্ছেদ: গোঁফ ছাঁটা, খ. ২, পৃ. ২২৫, হাদীস নং-৪১৯৯

৪৩. মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী,প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৬

**দাড়ি মুন্ডন মুশরিক ও নারীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে**

বর্তমান যুগের মুশরিকদের ন্যায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেআরবেরঅনেক মুশরিক দাড়ি মুন্ডন করত এবং অগ্নি উপাসকরা দাড়ি ছাঁটত। মুসলমানগণ যাতে এরূপ না করে সেজন্য নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন-

خَالَفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللُّحٰى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ–

অর্থ:মুশরিকদের বিরোধিতা করে তোমরা দাড়ি লম্বা করবে এবং গোঁফ ছোট করবে।[৪৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন-

جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَ ارْخُوا اللُّحٰى خَالَفُوا الْمَجُوْسَ–

অর্থ: অগ্নিপূজারীদের বিরোধিতা করে তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।[৪৫]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে উভয় আমলেরই বিরুদ্ধাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, এই উভয় আমলই মুশরিদের রীতি-নীতি।আর সেই রীতি-নীতিতে তাদের বিরুদ্ধাচরণের নির্দেশ দান করার অর্থই হলো, তোমরা দাড়ি মুন্ডনও করবে না এবং ছাঁটবেও না। যেন মুশরিকদের অনুসরণের নাগপাশ মুক্ত হয়ে নবীদের অনুকরণ দ্বারা সৌভাগ্যবান হতে পারে।কিন্তু এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তাআলা ও নবী কারীম (সা.)-এর নাফরমানী করে নির্বিঘ্নে দিনের পর দিন দাড়ি মুণ্ডন করছে, তাদের ব্যাপারে নি:সন্দেহে বলা যায়, তারা স্বেচ্ছায় মুশরিকদের অনুসরণ করে চলছে।

আর হাদীসে ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।[৪৬]

আর তাদের দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়ার বুনিয়াদী কারণ হলো, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুর্বল হয়ে পড়া।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–وَلاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

অর্থ: তোমরা অত্যাচারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না। অন্যথায় জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।[৪৭]

উল্লিখিত আয়াতেও অমুসলিমদের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি এবং বেশ-ভূষায় আকৃষ্ট হয়ে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ বর্তমান যুগের মুসলমানগণ শুধু দাড়ি মুন্ডনের ক্ষেত্রে নয়; বরং মনের সকল অবৈধ খাহেশাত পূরণের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধানকে কোনোতোয়াক্কা না করে অমুসলিমদের রীতি-নীতি অনুসরণের জন্য যেন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। যা একজন মুসলমান দাবিদার ব্যক্তির জন্য একেবারেই অসমীচীন।[৪৮]

দৃষ্টিকে আরেকটু প্রসারিত করে বলা যায়, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ীএকজন মুসলমানদাড়ি মুন্ডিয়েঅমুসলিমদের বেশ-ভূষার মধ্যে প্রবিষ্ঠ হওয়ায় তাদের সাথে সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে যেরূপ একটি বিশেষ পর্যায়ের গুনাহ, অনুরূপ দাড়ি মুন্ডিয়ে পুরুষের পৌরুষদীপ্ত বাহ্যিক বেশ-ভূষা লীন করে মহিলাদের মুখমন্ডলের সাদৃশ্য অবলম্বন করার কারণে আরো একটি বিশেষ পর্যায়ের গুনাহ। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনকরে পুরুষ যদি নারীর অথবা নারী যদি পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তাহলে শরীয়তে দৃষ্টিতে সে অভিশপ্ত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন-

৪৪. আবু বকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন ইবন আলী আল-বায়হাকী, *আল-মুহাযযিব ফী ইখতাছারিস সুনানিল কাবীর*, সৌদি আরব: রিয়াদ, দারুল ওয়াতন লিন-নাসর, ২০০১ (প্রথম প্রকাশ), অধ্যায়: পবিত্রতা, খ. ১, পৃ. ১৫২, হাদীস নং- ৬২৭

৪৫. *আল-মুহাযযিব ফী ইখতাছারিস সুনানিল কাবীর*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, খ. ১, পৃ. ১৫২, হাদীস নং- ৬২৮

৪৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: প্রচারের জন্য অহংকারী পোশাক পরিধান করা, খ. ২, পৃ. ২০৩, হাদীস নং-৪০৩১

৪৭. আল-কুরআন, ১১: ১১৩

৪৮. মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী,প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩-৩৪

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ–

অর্থ:ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ঐসব পুরুষকে লানত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।[৪৯]

তাছাড়া দাড়ি মুন্ডন করা শুধু অমুসলিমদের রীতি-নীতি ও নারীদের অবয়বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণই নয়; বরং দাড়ি কর্তন খোদায়ী সৃষ্টির বিকৃতি সাধন এবং আল্লাহ প্রদত্ত শোভা ও সৌন্দর্যের ধ্বংস সাধনও বটে। আল্লাহ তা'আলা পুরুষ জাতিকে পৌরুষ সুলভ শোভা এবং নারী জাতিকে নারীসুলভ শোভা দান করে ইরশাদ করেন–وَ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

অর্থ:আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রত্যেককে (প্রত্যেকের উপযুক্ত করে) আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে অতি সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন।[৫০] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থ: নিশ্চয় আমি মানব জাতিকে অতি উত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।[৫১]

তাই সেই অতি সৌন্দর্য আকৃতি দানকারীসৃষ্টিকর্তার বিনা অনুমতিতে তাতে হস্তক্ষেপ করা এবং বিকৃতি সাধন করা স্পষ্টতইচরম অন্যায় ও গোনাহ, কোন প্রশংসনীয় কাজ নয়।

**দাড়ি রাখার পরিমাণ**

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছেপুরুষের দাড়ি রাখা যেহেতু একটি সহজাত প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক নিয়ম এবং মৌলিকবিষয়, তাই দাড়ি রাখার ক্ষেত্রে সব হাদীসে শুধু দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ، وَ اَعْفُوْا لِلُّحَى–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা গোঁফ বেশি ছোট করবে এবং দাড়ি বড় রাখবে।[৫২]

কিন্তু এ লম্বার পরিমাণ কতটুকু হবে এবং তা পরিমাপের যন্ত্রই বা কী হবে? এ নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। নতুবা যুগের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ফেৎনা সৃষ্টির সুযোগ পাবে।এ ক্ষেত্রে বলা যায় কেউ যখন মন থেকে কাট-ছাঁটের বিষয়টি বাদ দিয়েইদাড়ি রাখা শুরু করে কেবল তার দ্বারাই শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক দাড়ি রাখা সম্ভব। নতুবা অনেকেই দাড়ি রাখলেও বিভিন্ন প্ররোচনা, বিরূপ মন্তব্য এবং পরিবেশ পরিস্থিতির স্বীকার হয়েবিভিন্ন কাটিং ওফ্যাশনের নামে দাড়ি রেখে মূল গতিপথ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। অবশেষেদাড়ি রাখা কী ওয়াজিব, সুন্নাত, নাকিমুস্তাহাব? এ ধরণের অহেতুকপ্রশ্নের বেড়াজালে আটকেধীরে ধীরে দাড়ির অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায়।নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন-

مَنْ تَهَاوَنَ بِالْاَدَابِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ السُّنَّةِ وَ مَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَّةِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ الْوَاجِبَاتِ وَ مَنْ تَهَاوَنَ بِالْوَاجِبَاتِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ وَ مَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ–

অর্থ: মুস্তাহাবসমূহের সাথে অবহেলা প্রদর্শনকারীকে সুন্নাতসমূহ থেকে বঞ্চিত করার, সুন্নাতসমূহের সাথে অবহেলা প্রদর্শনকারীকে ওয়াজিবসমূহ থেকে বঞ্চিত করার, ওয়াজিবসমূহের সাথে অবহেলা প্রদর্শনকারীকে ফরজসমূহ থেকে

৪৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: পুরুষের নারীর বেশ ধারণ এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা, খ. ২, পৃ. ১৬৬৫, হাদীস নং -৫৮৮৫

৫০. আল-কুরআন, ৪০: ৬৪

৫১. আল-কুরআন, ৯৫: ৪

৫২. *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: দাড়ি বড় রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬৬৭, হাদীস নং -৫৮৯৩

বঞ্চিত করার এবং ফরজসমূহের সাথে অবহেলা প্রদর্শনকারীকে মা'রেফাতে ইলাহী (আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্তি) থেকে বঞ্চিত করার শাস্তি প্রদান করা হবে।[৫৩] অন্যত্র নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন-

اَلاَ وَ اِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى اَلاَ وَ اِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَاعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ–

অর্থ: সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই কিছু সংরক্ষিত স্থান থাকে। আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত স্থান হলো, তার নিষিদ্ধ কার্যসমূহ। সংরক্ষিত স্থানের আশে-পাশে ঘূর্ণ্যমান ব্যক্তির একদিন না একদিন সংরক্ষিত স্থানে অনুপ্রবেশ সুনিশ্চিত।[৫৪]তাই দাড়ি রাখার ক্ষেত্রে ইমাম নববী (রহ.)-এর ভাষ্য হলো-

وَالْمُخْتَارُ تَرْكُهَا عَلٰى حَالِهَا وَ اَنْ لاَّ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيْرٍ وَّلاَ غَيْرِهٖ–

অর্থ: ফাতওয়া হলো দাড়িকে স্ববহালে রাখাই উত্তম, কাট-ছাঁট প্রভৃতির পিছু নেবে না।[৫৫]

তবে অন্যান্য ফকীহগণের মতে, কারো দাড়ি যদি অনেক লম্বা হওয়ার কারণে চেহারা বিকৃতি দেখায় এবং অন্যদের ঠাট্টা-মস্করা করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্য এক মুষ্টির বেশি কর্তন করার অনুমতি রয়েছে।কিন্তু এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখার কোনো সুযোগ নেই।

উল্লেখ্য, এক মুষ্টি দাড়ি পরিমাপের জন্য বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন নেই যে স্কেল, গজ, ফিট বা ইঞ্চির মাধ্যমে একেবারে কড়ায় গন্ডায় হিসেব করে রাখতে হবে। বরং এগুলো ব্যবহার করা সমাজে হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।তাই দাড়ি রাখার মানদন্ডও সৃষ্টিজাত পরিমাপ যন্ত্র না হয়ে এর চেয়েও উন্নত ও উচ্চ মানের যা দাড়ির ন্যায় সর্বদা নিজের কাছেইআল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রত্যেকের নিজের কুদরতী হাত ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে।অনেকেই এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখার সুযোগ খুঁজতে গিয়ে দাড়ির পরিমাণ নিয়ে অনেক বক্তব্য ও তর্ক-বিতর্ক করলেও হক্কানী ফকীহগণের অভিমত হলো, দাড়ি কমপক্ষে একমুষ্টি পরিমাণ রাখা বাঞ্ছনীয়।এজন্য তাঁরা গ্রহণযোগ্য অনেক দলীল এবং যুক্তিও পেশ করেছেন।

কুরআনের বর্ণনা দ্বারা পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের দাড়ি একমুষ্টি হওয়া প্রমাণিত হয়। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত হারুন (আ.)-এর প্রতিনিধিত্বকালে সংঘটিত বাছুর পূজার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মূসা (আ.) প্রত্যাবর্তন করে হযরত হারুন (আ.)-এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ভর্ৎসনাচ্ছলে তাঁর দাড়ি পাকড়াও করলে হযরত হারুন (আ:) বললেন-

يَا ابْنَ اُمَّ لاَ تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَ لاَ بِرَاْسِىْ–

অর্থ: হে আমার মায়ের পেটের ভাই! আপনি আমার দাড়ি ও মাথা পাকড়াও করবেন না।[৫৬]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, হাতের গুটি কয়েক আঙ্গুল দ্বারা দাড়ি পাকড়াও করা সম্ভব নয়; বরং দাড়ি পাকড়াও করতে হলে কমপক্ষে এক মুষ্টি দাড়ি প্রয়োজন হবে। একমুষ্টির কমে দাড়িপাকড়াও যোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত দ্বারা যদিও পূর্ববর্তী একজন নবীর দাড়ি এক মুষ্টি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াতে বিশেষ করে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ(হে রাসূল! আপনি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামগণের অনুসরণ করুন)[৫৭] আয়াতের মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম স্বভাবজাত নিয়ম-নীতিসমূহের ক্ষেত্রে পরস্পর একে অন্যের অনুসরণ করে থাকেন বিধায় সাধারণ জ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত হয়, কোনো পয়গম্বর-এর দাড়ি এক মুষ্টির কম ছিল না। তাই বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে দাড়ির বৃদ্ধি সাধন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামগণের ঐকমত্য সুন্নাত এবং স্বভাবজাত আমল হয়ে থাকলে উপরোক্ত আয়াতে কারীমার আলোকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতও এক মুষ্টি পরিমাণ হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়।

---

৫৩. মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী,প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩
৫৪.প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪
৫৫.প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৭
৫৬. আল-কুরআন, ২০: ৯৪
৫৭. আল-কুরআন, ৬: ৯০

উল্লেখ্য, হাদীসসমূহে এক মুষ্টি দাড়ি রাখার ক্ষেত্রে যে বার বার 'সুন্নাত' বলা হয় এর ব্যাখ্যায় ফকীহগণ বলেন, এর দ্বারা পারিভাষিক 'সুন্নাত' বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা নবী-রাসূলগণের রীতি-নীতি বুঝানো উদ্দেশ্য। কারণ সুন্নাহ (سنة) শব্দের অর্থই হলো- রীতি, নিয়ম, পথ, পন্থা, স্বভাব।[৫৮]

তাই সকল হক্কানী আলেমগণের মতে, এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাত নয়; বরং ওয়াজিব। এর কম রাখলে এক মুষ্টি পরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে।একটি হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَهُ بِاَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) অযু করার সময় পবিত্র মুখমন্ডল মর্দন করতেন, তারপর নিচ থেকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে জাল সদৃশ বানিয়ে খিলাল করতেন।[৫৯]

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, নবী কারীম (সা.)-এর দাড়ি খোঁচা খোঁচা ছিল না এবং ছোটও ছিল না; বরং এতটুকু লম্বা ছিল যারনিচ দিয়ে আঙ্গুল দ্বারা পানি পৌঁছানো যেত। চোয়ালের নিচ দিয়ে আঙ্গুল দ্বারা পানি পৌঁছানো তখনই প্রয়োজন যখন দাড়ি একমুষ্টি পরিমাণ বা ততোধিক লম্বা হয়। এর চেয়ে কমের মধ্যে তো খিলালেরই প্রয়োজন নেই।[৬০]

পুরুষের দাড়ি রাখাটা স্বভাবজাত বিষয় হওয়ার কারণে হাদীসে দাড়ি রাখার জন্য যেমন সরাসরি নির্দেশনা প্রদান না করে এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব বোঝাতে দাড়িকে লম্বা করার হুকুম দেয়া হয়েছে, তেমনি কতটুকু পরিমাণ দাড়ি রাখতে হবে তাও সরাসরি উল্লেখ না করে; বরং এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব ও তাৎপর্য হিসেবে কতটুকু লম্বা হওয়ার পর দাড়ি ছাঁটা যাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একজন পুরুষ দাড়ি তো রাখবেই, তবে আবেগে তাড়িত হয়ে কেউ যেন দাড়িকে লম্বা করতে গিয়ে ইসলামের সৌন্দর্যকে ভূলণ্ঠিত করে ঐ পরিমাণ না রাখে যা নাভী পর্যন্ত বা তারও নিচে যতদূর লম্বা হয় সে পরিমাণ রাখতে থাকে।তাই এ ব্যাপারে ইসলাম একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করে দিয়েছে, মানুষ যাতে দীর্ঘ দাড়িধারী হয়ে নির্বোধ ও অর্বাচীনদের ঠাট্টার পাত্রে পরিণত না হয়, আবার এক মুষ্টির কম দাড়িধারী হয়ে বা একবারেই দাড়ি না রেখে মহিলা ও নপুংশকদের রূপ পরিগ্রহ না করে।হাদীসে উল্লেখ আছে-

اِنَّ اللهَ جَمِيْلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ– অর্থ: আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।[৬১]

তাই দাড়ির ক্ষেত্রেও ইসলামের সৌন্দর্যকে বজায় রাখতে গিয়ে এক মুষ্টি উপরে কাট-ছাঁট করার বিধান রয়েছে, তবে এক মুষ্টি হওয়ার পূর্বে দাড়ি কাট-ছাঁট করার কোন দলীল নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-এর আমল বর্ণিত হয়েছে– وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمَا فَضَلَ اَخَذَهُ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) যখন হজ্জ বা উমরা করতেন, তখন তিনি তাঁর দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরে যতটুকু অতিরিক্ত থাকতো, তা কেটে ফেলতেন।[৬২]

একজন জ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, দাড়ির মধ্যেই কি ইসলাম? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দাড়ির মধ্যেই ইসলাম নয়, তবে ইসলামের মধ্যে দাড়ি রয়েছে। তাই একজন মুসলিমকে একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি অবশ্যই রাখতে হবে।

---

৫৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

৫৯. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা ও এর পন্থাসমূহ, অনুচ্ছেদ: দাঁড়ি খিলাল করা, খ. ১, পৃ. ২৫৭, হাদীস নং- ৪৩২

৬০. মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

৬১ .আবু হাজর মুহাম্মদ সাঈদ ইবন মুহাম্মদ ইবন বাসয়ূনী যাগলুল, *মাওসূ'আত আতরাফিল হাদীসিন নাববীশ শরীফ*, লেবাবন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৯, পৃ. ২১

৬২.*সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: নখ কাটা, খ. ২, পৃ. ১৬৬৭, হাদীস নং -৫৮৯২

**দাড়ি রাখার উপকারিতা**

যে মহান সৃষ্টিকর্তা পুরুষের মুখে দাড়ি স্থাপন করেছেন নিশ্চয়ই তাঅপকার সাধনের জন্য নয়; বরংউপকার সাধনের জন্যই করেছেন। কারণ আমরা বুঝি বা না বুঝি তাঁর প্রতিটি কাজই হিকমতপূর্ণ। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দাড়ি রাখার উপকারিতা হলো-

**চর্মরোগ থেকে মুক্তি লাভ**

সেভ করার কারণে চামড়ায় যে পরিমাণ ক্ষতি হয় শরীরের অন্য কোন অংশ সম্ভবত এ পরিমাণ ক্ষতি হয় না। মূলত সেভের সময় রেজার বা ক্ষুর দিয়ে চামড়া দলতে হয়। আর প্রত্যেক শেভকারীই চায় তার চেহারায় যেন একটি দাড়িও অবশিষ্ট না থাকে এবং চেহারার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তাই বারবার একটি চামড়াকে ব্লেড অথবা ক্ষুর দিয়ে মুন্ডানো হয়। ফলে চামড়া খুবই স্পর্শকাতর হয়ে যাওয়ায় এতে বিভিন্ন ধরণের চর্ম রোগ সহজেই সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কম ধারালো ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে সেভ করলে যথেষ্ট বল প্রয়োগ করতে হয়। এতে জ্বাল পোড়া ও প্রদাহ অনুভূত হয় এবংআমরা দেখতে না পেলেও চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আর চামড়ায় কে নো ক্ষত সৃষ্টি হলে জীবাণু প্রবেশের সুযোগ পায়। এভাবেই শেভকারী বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির শিকার হতে পারে। প্রথমে চেহারায় এক প্রকারের গুটি দেখা দেয় এবং পরবর্তীতেসাইকোসিস বারবেক নামে অন্য এক প্রকার চর্ম প্রদাহ দেখা দেয়। এছাড়া চেহারায় আরো অনেক ছোঁয়াচে রোগ দেখা দেয়। যেমন-

(ক) মুখে ব্রুণ, (খ) চেহারার খুশকী, (গ) মেছতা বা চেহারার কালো দাগ, (ঘ) একজিমা, (ঙ) নাকের গুটি ও মেছতা, (চ) এ্যালার্জি ইত্যাদি।

**অ্যালট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে সুরক্ষা:** অ্যালট্রাভায়োলেট রশ্মি চামড়ার অনুভূতি শক্তিকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ রৌদ্র থেকে ছড়ানো এ রশ্মি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই মুখে দাড়ি না থাকলে উক্ত রশ্মি উন্মুক্ত চোয়ালের উপর সরাসরি পতিত হয়েমুখের চামড়ার রং কালো করে তুলে এবং চামড়ার চর্বিগ্রন্থি গলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি করে।

**মস্তিষ্ক ও চোখের ওপর প্রভাব:** দাড়ির সাথে মস্তিষ্ক ও চোখের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই ক্রমাগত শেভ করলে মস্তিষ্কের মূল গ্রন্থির (যার নি:সৃত রস শরীর বৃদ্ধির সহায়ক) ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এতে স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনা এবং যৌনশক্তি হ্রাস পায়। এছাড়া চোখের জ্যোতি হ্রাসের ক্ষেত্রে শেভ খুবই খারাপ একটি দিক।[৬৩]

**গলা ও বক্ষ সুরক্ষিত রাখা:** মুখে দাড়ি থাকার কারণে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মুখ হয়ে শরীরের ভেতরে পৌঁছাতে পারে না। এতে গলা সুরক্ষিত থাকায় বড় ধরণের কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং তাপমাত্রা ক্রমাগত কমার সময় দাড়ি শরীরকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে গরম রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া দাড়ি লম্বা রাখার ফলে বায়ু সরাসরি বুকে আঘাত করতে পারে না; বরং তা বাধাগ্রস্থ হয়ে ধীর গতিতে এর সুফল ফুসফুসে পোঁছে যায়। এতে ফুসফুস সুরক্ষিত থাকে।

**নিয়মিত শেভ-এর প্রতিক্রিয়া:** নিয়মিত শেভ করলে পিটুইটারি গ্লান্ডে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এতে নার্ভ সিস্টেম এবং যৌন জীবন প্রভাবিত হয়। তাই নিয়মিত শেভ করার অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। ট্রাস্ট মি, আই এম এ ডক্টর- নামক বিবিসির এক অনুষ্ঠান- দাড়ি সম্পর্কিত একটি পরীক্ষা চালিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, ক্লিন শেভ পুরুষের চেয়ে দাড়িওয়ালাদের মুখে রোগ-জীবাণু বেশি রয়েছে এমন কোন প্রমাণ তারা পায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতাল সম্প্রতি এ নিয়ে গবেষণা চালায়। 'জার্নাল অব হসপিটাল ইনফেকশন'-এ প্রকাশিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে, দাড়িওয়ালাদের চেয়ে বরং দাড়ি কামানো পুরুষের মুখেই বেশি রোগ-জীবাণু পাওয়া গেছে। গবেষকরা বলেছেন, মেথিসিলিন-রেসিস্ট্যান্ট স্ট্যাফ অরিয়াস(এম.আর.এস.এ.) নামে যে জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী রয়েছে তা দাড়িওয়ালাদের চেয়ে দাড়ি কামানোদের মুখে তিন গুণ বেশি পাওয়া গেছে। এর কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন, দাড়ি কামাতে গিয়ে মুখের চামড়ায় যে হালকা ঘষা লাগে, তা ব্যাকটেরিয়ার বাসা বাঁধার জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি

৬৩. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩১-২৩৩

করে। অন্য দিকে দাড়ি সংক্রমন ঠেকাতে সাহায্য করে। বেশ কিছু পুরুষের দাড়ি থেকে ব্যাকটেরিয়ার নমুনা সংগ্রহ করে এ ধরনের পরীক্ষা চালানো হয়।[৬৪]

**দাড়ি কাটতে অযথাটাকা ও সময় নষ্ট:** যারা নিজেকে সব সময় হ্যান্ডসাম রাখতে ব্যস্ত তারা প্রায় প্রতিদিনই সেভ করে থাকে। যেন মুখ ভর্তি দাড়ির এতটুকু অংশও কেউ কোনো দিন না দেখতে পারে। এতে অযথা অনেক টাকা ওজীবনের একটি বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায়। একজনের দাড়ি কামাতেযদি গড়ে =১০/-টাকাও খরচ ধরা হয়, সে হিসেবে পৃথিবী জুড়ে কমপক্ষে ৫০ কোটি মানুষের দাড়ি কামাতে প্রতিদিন =৫০০,০০,০০,০০০/-(পাঁচশত কোটি) টাকা ব্যয় হয়। সুতরাং প্রতিমাস এবং প্রতিবছরে দাড়ি কামাতে কত টাকা অযথা ব্যয় হচ্ছে তা ক্যালকুলেটর দিয়ে খুব সহজেই হিসাব বের করা সম্ভব। এমনিভাবে দাড়ি কামাতে অনেক সময়ও অযথা নষ্ট হয়। সত্তর দশকের এক স্টাডিতে দেখা গেছে, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষেরা তাদের সারাজীবনে গড়ে ৩ হাজার ৩৫০ ঘন্টা সময় দাড়ি কাটার পেছনে ব্যয় করে। অর্থাৎ একজন মানুষের সারাজীবনে প্রায় ১৩৯দিন এভাবেই নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং পৃথিবী জুড়ে যদি কমপক্ষে ৫০ কোটি মানুষের ১৩৯দিন করে নষ্ট হয়, তাহলে সর্বমোট ৬ হাজার ৯৫০ কোটি দিন বেহুদা নষ্ট হচ্ছে।অথচ নষ্ট হওয়া এই বিপুল পরিমাণ টাকা ও দিনগুলো দিয়ে ইচ্ছা করলে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজই না করা যেত।[৬৫]

**দাড়ি রাখার আরো ২০টি উপকারিতা**

০১. দাড়ি রাখলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুশি হন।
০২. দাড়ি রাখার দ্বারা সকল নবীগণের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়।
০৩. দাড়ি রাখলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শাফায়াত লাভ হবে।
০৪. দাড়ি রাখলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে।
০৫. দাড়িওয়ালার প্রতি মানুষের সুধারণা থাকে এবং তিনি মানুষের দুআ লাভ করেন।
০৬. অপরিচিত স্থানে দাড়িওয়ালা মুসলমান মারা গেলে সে মুসলমান কি-না তা চেনার জন্য উলঙ্গ করে খাৎনা দেখতে হয় না।
০৭. দাড়িতে চেহারার সৌন্দর্য বাড়ে এবং বীরত্বের পরিচয় বহন করে।
০৮. কিয়ামতের অন্ধকারে মুমিনের দাড়ি নূরে পরিণত হবে।
০৯. ঈমান-আমল ঠিক থাকলে দাড়িওয়ালা ব্যক্তি নবী এবং ওলীগণের সাথে সাক্ষাৎ ও হাশর পাবেন।
১০. দাড়ি রাখার কারণে অনেক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।
১১. দাড়ি ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রতীক।
১২. দাড়ি রাখলে মুনকার-নাকীরের সওয়াল এবং জবাব সহজ হয়।
১৩. লম্বা দাড়ি স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর জীবাণুগুলোকে গলা ও বক্ষে পৌছতে দেয় না।
১৪. দাড়ি গলাকে শীত ও গরমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখে।
১৫. দাড়ির অস্তিত্ব যৌন শক্তিকে বৃদ্ধি করে।
১৬. দাড়ি রাখলে পাইরিয়ার মত মারাত্বক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
১৭. দাড়ি রাখলে সেভ করার অনর্থক সময় ও অর্থ অপচয় থেকে বাঁচা যায়।
১৮. দাড়ি রাখার কারণে গুনাহে জারিয়া (চলমান গুনাহ) থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
১৯. দাড়ি রাখার দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।
২০. দাড়িতে ক্ষুর বা ব্লেড লাগালে চোখের রগের ওপর আঘাত লাগে। ফলে চোখের জ্যোতি কমে যায় এবং মুখের চামড়া শক্ত হয়ে যায়। তাই দাড়ি রাখলে এ সকল ক্ষতি থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ইত্যাদি।[৬৬]

---

৬৪.*https://www. Kalerkantho.com*২৯.০১.২০১৬খ্রি: (থেকে উদ্ধৃত)
৬৫. *https://m.rtvonline.com*(থেকে উদ্ধৃত)
৬৬.*www. Amaderislam*.com."দাড়ি রাখার ২০ উপকারিতা" (থেকে উদ্ধৃত)

সুতরাং দাড়ি রাখার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অমূল্য বাণীসমূহ একদিকে যেমন ধর্মীয় বিধান, অপরদিকে তা স্বাস্থ্য গঠন ও সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, যা বর্তমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা দাড়ি না রেখে যদি বার বার রেজার-ব্লেডের মাধ্যমে তা শেভ করা হয়, তবে স্নায়ুসমূহ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে চোখের জ্যোতি কমে যায় এবং মুখাবয়ব নষ্ট হয়ে যায়।

সবশেষে বলা যায়, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও সৌকর্য এবং শরীরকে পরিপাটি করে রাখা মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণা। পৃথিবীর যে কোনো জাতি চাই সে ধনীবা গরীব, শহুরে বা গ্রাম্য, নেককার বা পাপিষ্ঠ, মুমিন বা অমুসলিম হোক কেউ এর ব্যতিক্রম নয়, সবাই সৌন্দর্যকে পছন্দ করে। ইসলামী শরীয়তও উক্ত প্রেরণাকে বৈধ সাব্যস্ত করে বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং অভ্যন্তরীণ সৌকর্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সার্টিফিকেট প্রদান করে। তাই সৌন্দর্য প্রিয়তা ও সৌকর্য মানসিকতা নিছক মানবীয় স্বভাবজাত প্রেরণাই নয়; বরং শরীয়তের চাহিদাও বটে। পার্থক্য হল, বস্তুপূজারী ব্যক্তিবর্গ উক্ত সৌন্দর্য ও সৌকর্যের উত্তম-অনুত্তমের মানদন্ড জ্ঞান মনে করে স্বীয় স্বভাবজাত কামনা, প্রচলিত নিয়ম-নীতি এবং জাতীয় আচার-উপাচারকে কেন্দ্র করে। আর নবীর পথের পথিকগণ মনে করেন উসওয়ায়ে নবীকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ–

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[৬৭]

একজন মুমিনের দৃষ্টিতে সকল কাজের উত্তম-অনুত্তমের মানদন্ড হল হিদায়েত; অভিলাষ নয়। যার অন্য নাম 'সুন্নাতে আম্বিয়া'। কারণ প্রত্যেক কাঠামোর একটি কার্যকারণ থাকে। যার মাধ্যমে আলোর মুখ দেখা যায়। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম কার্যকারণ থেকে উৎসারিত অন্তর দেশে স্থায়ীত্ব দানকারী সৌন্দর্য কাঠামোই গ্রহণ করা হয়েছে। কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে এই উত্তম কার্যকারণসমূহ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য এবং সৌকর্যের সাথে কোনো না কোনো পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সমবেত হওয়ার মত কোনো সত্ত্বা থেকে থাকলে তাঁরা ছিলেন একমাত্র নবী-রাসূলগণের সত্ত্বা। যারা সরাসরি সমস্ত সৌন্দর্যের আধার, উত্তম কার্যকারণসমূহের মূল উৎস এবং সমস্ত প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পুত:পবিত্র। সত্যিকার কার্যকারণ তাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফয়েজ লাভ করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেই পুত:পবিত্র জামাআতের স্বভাব-চরিত্রকেই বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং অভ্যন্তরীণ সৌকর্যের মানদন্ডরূপে স্থির করা যেতে পারে। অতএব উক্ত পুত:পবিত্র জামাআতের অভ্যন্তরীণ সৌকর্যের সাথে খাপ খাওয়া অভ্যন্তরীণ সৌকর্যসমূহই কাংক্ষিত এবং বাঞ্ছিত হবে, আর পুত:পবিত্র জামাআতের বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে খাপ খাওয়া বাহ্যিক সৌন্দর্যসমূহই উত্তমতার সার্টিফিকেট লাভ করবে। সুতরাং নবী-রাসূলগণের বাহ্যিক সৌন্দর্যের অন্যতম প্রতীকের সাথে সাদৃশ্য রেখে প্রতিটি মুমিনের দাড়ি লম্বা রাখা একান্ত কর্তব্য।

## মিসওয়াক করা

ইসলাম মানব স্বভাব ও প্রকৃতির অনুকূল সম্বলিত একটি ধর্ম এবং কোনো আমলই অনর্থক চাপিয়ে দেয়া হয়নি। প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে যেমন অগণিত সওয়াব রয়েছে, তেমনি পার্থিব জীবনেও রয়েছে অসংখ্য ফায়েদা।দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে এই স্বভাবজাত ধর্মের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করার কারণে আমাদের জীবনে নেমে আসে নানাবিধ বিপদ-আপদ। কিন্তু তা নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য পুনরায় ধর্মের নিয়ম-কানুন মানতে শুরু করলে ইসলাম ধর্ম তখনও মানুষকে পূর্বের ন্যায় উপকার পৌছাতে থাকে। তাই ইসলাম ধর্মে স্বভাব সুলভ ও সহজ-সরল একটি আমল হলো মিসওয়াক করা। একজন মুসলমান দাঁত পরিষ্কারের জন্যমিসওয়াককেসম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে শুধু ব্রাশকে গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন নয়।

তথাকথিত অনেক আধুনিক লোক রয়েছে, যারা মিসওয়াক করাকে বক্রদৃষ্টিতে দেখে এবং এটাকে এক টুকরো লাকড়ি বৈ কিছু মনে করে না। মুখ পরিষ্কারের জন্য ব্রাশ ছাড়া তাদের জীবন যেন অচল, আর যারা ব্রাশ ব্যবহার না করে শুধু মিসওয়াক ব্যবহার করে তাদেরকে এক ধরনের সেকেলে ভাবা হয়। অথচ তারা এতটুকু চিন্তা করে দেখে না বর্তমান ব্রাশের আবিষ্কার কবে হয়েছে এবং কবে থেকে এর প্রচলন শুরু হয়েছে?নিশ্চয় সভ্যতার দাবিদারগণখুব বেশিদিন হয়নি

৬৭ .আল-কুরআন, ৩৩: ২১

সভ্যতার আলো পেয়েছে। কিন্তু এর পূর্বে পৃথিবীময় মানুষের পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবস্থা কত নিম্ন পর্যায়ে ছিল তা একবার ভেবে দেখা উচিত।মানুষ যখন সভ্যতার কথা ভাবতেও পারতো না আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ইসলাম ধর্মের সূচনাকালথেকেঅদ্যাবধি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গাছের শিকড় বা মিসওয়াক ব্যবহার করে আসছে। তাই একথা নিসন্দেহে বলা যায়, মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ব্যবহৃত উদ্ভিদের শিকড় বা মিসওয়াকই হলো আধুনিক ব্রাশের অগ্রপথিক। সুতরাং এটাকে সেকেলে ভেবে বক্র দৃষ্টি প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই।

সত্যিকার অর্থে মিসওয়াক মুসলমানদের জন্য অনেক বড় একটি নিয়ামত। এটা হাতছাড়া করার পর থেকেই মুসলমানদের জীবনে শুরু হয়েছে নানাবিধ পেরেশান। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেও বর্তমানে দৈহিক সুস্থতার উৎসমূলে ফিরে যাওয়া সক্ষম হচ্ছে না। বলা যায়, যেদিন থেকে মিসওয়াকের ব্যবহার ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেদিন থেকেই 'ডেন্টাল সার্জন'-এর সূত্রপাত ঘটেছে। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু দুয়ারা নানক শাহী সম্পর্কে কথিত আছে, মানুষদেরকে মিসওয়াকের উপকারিতা বোঝানোর জন্য তিনিসর্বদা হাতে একটিমিসওয়াক রাখতেন এবং নিজেও মিসওয়াক করে বলতেন- হয়তো এই মিসওয়াক গ্রহণ করো, নতুবা রোগকে বরণ করো। এর দ্বারা তিনি বোঝাতেন চেয়েছেন, মিসওয়াক করার দ্বারা রোগ-ব্যাধি দূরীভূত হয় নতুবা অসুস্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক।হাদীসে এসেছে-

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ–

অর্থ: হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন-যখন রাতে ওঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।[৬৮]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلسِّوَاكُ مِطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন- মিসওয়াক মুখের পবিত্রতাকারী এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।[৬৯]অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْ لآ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-আমার যদি এরূপ ধারণা না হতো যে এ বিষয়টি আমার উম্মতের ওপর কঠিন হয়ে যাবে, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করাকে ফরয করে দিতাম।[৭০] অন্য এক হাদীসে হযরত মিকদাদ ইবন সুরাইহ (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-

قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ–

অর্থ:আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি বললেন-মিসওয়াক করতেন।[৭১]

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنَ لَّيْلٍ وَّ لاَنَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّايَتَسَوَّكُقَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّاَ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) রাত্রে বা দিনে ঘুম হতে ওঠার পর অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[৭২]

---

৬৮. *আস-সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: মিসওয়াক করা, খ. ১, পৃ. ৭৭-৭৮, হাদীস নং- ২৪৫
৬৯. *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: মিসওয়াকের প্রতি উৎসাহ দান, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস নং- ৫
৭০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, অনুচ্ছে: মিসওয়াক করা, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং- ২৮৭
৭১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করা, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস নং- ৫৮
৭২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস নং- ৫৬

**অন্তিম শয্যায় নবী কারীম (সা.)-এর মিসওয়াকের আমল**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যখনমৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলতখন তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত আয়িশা (রা.)-এর ভাই আব্দুর রহমান হাতে মিসওয়াক নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাতে মিসওয়াক দেখে তাকিয়ে থাকলেহযরত আয়িশা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক নিয়ে আসবো? তিনি (সা.) ইশারায় বললেন: হ্যাঁ। হযরত আয়িশা (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন-আমি কি তা নরম করে দেবো? তিনি আবারো ইশারায় হ্যাঁ বললে হযরত আয়িশা (রা.) তা নিজ মুখে চিবিয়ে নরম করে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্তিম শয্যাবস্থায় মিসওয়াক করলেন।[৭৩]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উক্ত আমল দ্বারা বোঝা যায়, মানব জীবনে মিসওয়াকের গুরুত্ব কত অপরিসীম। তাছাড়ানবী কারীম (সা.) মিসওয়াক করাকে এতো গুরুত্ব দেয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: এমনটি কখনো হয়নি যে, হযরত জিবরাইল (আ.) আমার নিকট এসেছেন, আর আমাতে মিসওয়াকের আদেশ দিননি। এতে আমার আশংকা হচ্ছিল যে, (মিসওয়াক করতে করতে) আমার মুখের অগ্রভাগ ছিলে না ফেলি।[৭৪]জানা যায়, হযরত জিবরাইল (আ.) নবী কারীম (সা.)-এর নিকট সর্বমোট ২৪হাজার বার ওহী নিয়ে আগমন করেছেন এবং ২৪হাজার বারই তিনি নবী কারীম (সা.)-কে মিসওয়াকের জন্য বলেছেন।

## মিসওয়াকের উপকারিতা

**(ক) মুখের দুর্গন্ধ নিরসণে মিসওয়াক:** মুখ পরিষ্কার রাখার অন্যতম মাধ্যম হলো দাঁত পরিষ্কার রাখা। দাঁত অপরিষ্কার বা কোনোরোগ-ব্যাধি থাকলে কথা বলার সময় তা থেকে দুর্বিষহ গন্ধ বের হয়। যদ্দারা পাশের লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। এতে তার প্রতি কেবল বিরক্তই হয় না মনে মনে তাকে তিরস্কারও করে। অনেক সময় অন্যের মুখের দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে কারো কারো বমির উদ্রেগ হয়। এতে অন্যের জঠিল রোগও দেখা দিতে পারে। আর কেউ যদিমুখ খুলে জনসম্মুখে বলে ফেলে আপনার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, তাহলে এ ব্যক্তির লজ্জার সীমা থাকে না।ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হলে পরবর্তীতে মানুষের সামনে প্রাণখুলে কথা বলতে হীনমন্যতায় ভুগবে এবং এক পর্যায়ে দেখা যাবেমানুষের সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে মুখের দুর্গন্ধের ভয়ে মানুষের সাথে কথা না বলার কারণে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘদিন একাকী বসবাসের ফলে একসময় মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ কোনো ব্যক্তি যদি নিয়মিত দৈনিক পাঁচবার মিসওয়াক করে তাহলে তার মুখে কোনোক্রমেই দুর্গন্ধ থাকার কথা নয়। বাস্তবেও দেখা যায়, অনেকেমুখের দুর্গন্ধ নিরসণের জন্য উন্নত মানের টুথপেস্ট, ঔষধ, মাজন এবং দুর্গন্ধনাশক বিভিন্ন ঔষধ দিয়ে ব্রাশ করার পরও দুর্গন্ধ নির্মুল হয় না। কিন্তু নিয়মিত মিসওয়াক করার কারণে অল্প দিনের মধ্যেই মুখের দুর্গন্ধ থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়।

**(খ) দাঁত সুরক্ষায় মিসওয়াক:** মানুষের জীবনে দাঁত এক অমূল্য সম্পদ। দাঁতের ওপর ভিত্তি করেই আমরা পৃথিবীর যাবতীয় সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করে থাকি। দাঁত আছে বলেই আমরা মুচকি ও মুক্তা ঝরানো হাসি দিয়ে এবং হৃদয়ের আবেগ ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করে অতি সহজেই প্রিয়জনের মন জয় করতে সক্ষম হই। কোনো কারণেযদি আমরা সেই মূল্যবান দাঁত হারিয়ে ফেলি, তবে এ সুন্দরহাসিই ঘৃণা ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং মানুষের মহব্বত-ভালবাসা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই যার দাঁত নেই তার মত হতভাগা আর কেউ নেই। একজন নারী বা পুরুষের যদি দাঁত না থাকে সে যত সুদর্শনই হোক না কেন তাকে বিশ্রি দেখাবে।তাই দাঁত থাকতে দাঁতের মূল্যায়ন করা উচিত। আরদাঁতের এই মূল্যায়ন একমাত্র মিসওয়াক করার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হতে পারে, অন্য কোনো মাধ্যমে সম্ভব নয়।অনেকেই দাঁত সুরক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাশকে মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত করতে চায়।যদিও ব্রাশ করাকে ইসলাম

---

৭৩. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, (অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী), *আর রাহীকুল মাখতুম*, ঢাকা: বারিধারা, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ শাখা, জুন ২০০৩ (৯ম সংস্করণ), পৃ. ৪৮৯

৭৪ . সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৯ (অষ্টম সংস্করণ), পৃ. ২০২

অসমর্থন করেনি, কিন্তু ব্রাশ কখনো মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কারণ ব্রাশের নিজস্ব কোনো গুণাগুণ নেই। ব্রাশ তৈরির মূল উপাদান হলো প্লাস্টিক, আর প্লাস্টিক কখনো মানব স্বাস্থ্যের উপকারি দ্রব্যহতে পারে না। তাই ব্রাশ করার দ্বারা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকটি অর্জিত হলেও এর বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে একটি ব্রাশ মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়ব্যবহারেরজন্য তখনই উত্তম উপযোগী হতে পারে, যখন তা শুধু একবারই ব্যবহৃত হয় এবং দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত না হয়। কেননা, একবার ব্যবহারের পরই এর মধ্যে জীবাণুর ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পানি দ্বারা পরিষ্কার করলেওতা পুরোপুরি জীবাণু মুক্তহয় না;বরং ক্রমবর্ধমান হয়। তাছাড়া ব্রাশ ধীরে ধীরে দাঁতের উপরের উজ্জ্বল স্তরকে দূরীভূত করে দেয়। ফলে দাঁতের মাঝে ফাঁকা সৃষ্টি হয়ে দাঁতগুলো মাড়ী থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। আর খাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো দাঁতের ফাঁকে জমে মাড়ী ও দাঁতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। পক্ষান্তরে মিসওয়াক করার ক্ষেত্রে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই; বরং নিয়মিত মিসওয়াক করার কারণে দাঁতসমূহ দিন দিন আরো বেশি শক্ত ও মজবুত হয় এবং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিপায়। কারণ মিসওয়াকের নিজস্ব অনেক গুণাগুণ রয়েছে। গাছের শিকড়ে জীবাণু প্রতিরোধক ও জীবাণু ধ্বংসাত্মক যে রসালো পদার্থ থাকে দাঁত সুরক্ষায় তা খুবই উপকারী।

**(গ) দাঁতের হরিদ্রতা দূরীকরণে মিসওয়াক:** ব্রাশ বা অন্য কোন ক্ষার জাতীয় দ্রব্য দিয়ে দীর্ঘ দিন দাঁত পরিষ্কার করলে অনেক সময় দাঁতের শুভ্র আস্তর ওঠে গিয়ে হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে নতুন নতুন আঁশ দিয়েনিয়মিতমিসওয়াক করলে দাঁতের হরিদ্রতা দূরীকরণে অতি দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

**(ঘ) মুখের ঘা নিরাময়ে মিসওয়াক:** জীবাণুর আক্রমণে এবং অনেক সময় গরমের তীব্রতা ও প্রখরতার কারণে মুখের ভেতর তথা গাল, মাড়ী, জিহ্বা এবং তালু ইত্যাদিতে ঘা হতে পারে, যার বিষাক্ততা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে জীবনকে বিষাদময় করে তুলে। এ ক্ষেত্রে তাজা মিসওয়াক দ্বারা নিয়মিত দাঁত মাজলে সৃষ্ট মুখের লালাসমূহ মুখের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে মুখের ঘা অল্প দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যায়।

**(ঙ) মুখের স্বাদ বৃদ্ধিকরণে মিসওয়াক:** মুখের স্বাদ সবসময় এক রকম থাকে না। যেকোন সময়মুখের আস্বাদন শক্তি হ্রাস পেতে পারে। আর এ সময় যদি প্রত্যহ পীলু গাছের তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করা হয়, তাহলে অচিরেই মুখের স্বাদ ফিরে পাওয়া যায় এবং দিন দিন এ স্বাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা অন্য কোনো দামি ঔষধ সেবন করেও এ রকম উপকার পাওয়া সম্ভব নয়।

**(চ) দৃষ্টি শক্তি সমুন্নত রাখতে মিসওয়াক:** দাঁতের সাথে চোখের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দাঁতের ফাঁকে খাবারের ছোট ছোট কণা জমে থেকে দুর্গন্ধময় হয়ে চক্ষুরোগ, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং অন্ধত্বের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।চক্ষু রোগের আরও যত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দাঁতের যত্নের প্রতি অমনোযোগিতাও এর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনো ব্যক্তি যদি দৈনিক পাঁচবার মিসওয়াক করে সাধারণত তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় না।

**(ছ) শ্রবণশক্তি সমুন্নত রাখতে মিসওয়াক:** আমাদের সমাজে এমন অনেক রোগী রয়েছে যারা প্রায়ই তাদের কানের ব্যথা, রক্তিমতা, ফোলা ও পুঁজ জমে থাকার অভিযোগ করে থাকে এবং কানের অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের আশায় ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। ডাক্তার যদি অভিজ্ঞসম্পন্ন না হয় তবে রোগের উৎস না খুঁজেইসরাসরি কানের চিকিৎসা শুরু করে দেন।ফলে সাময়িকভাবে রোগী কিছুটা আরামবোধ করলেও পরবর্তীতে ঐ রোগ আবারো দেখা দেয়।এভাবে দীর্ঘদিন কানের সঠিক চিকিৎসা না হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হারিয়ে এক সময় বধিরও হয়ে যেতে পারে। অথচ কানের অধিকাংশ রোগ দাঁতের বিভিন্ন রোগের কারণেও সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ করেদাঁতের মাড়ীতে পুঁজ জমলে কান ফোলা, ব্যথা, পুঁজ ও রক্তিমতা দেখা দেয়। সুতরাং দাঁতের বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পেতে এবং স্থায়ীভাবে মাড়ীর পুঁজ দূর করতে নিয়মিত মিসওয়াক করার কোন বিকল্প নেই।

**(জ) পাকস্থলীর রোগ নিরাময়ে মিসওয়াক:** বর্তমান বিশ্বে পাকস্থলীর রোগ এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলেন, পাকস্থলীর অধিকাংশ রোগ দন্ত রোগের কারণেই হয়ে থাকে। অসচেতনতার অভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাঁত পরিষ্কার না রাখলে মুখের জীবাণু ও মাড়ীর ক্ষত নি:সৃত পুঁজ খাদ্য ও পানির সাথে মিলিত হয়ে অথবা লালার

সংমিশ্রণে ব্যক্তির অজান্তেই পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সমস্ত খাদ্যকে বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। এতে পাকস্থলীতে নানা ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং নিয়মিত মিসওয়াক করলে পাকস্থলীর জটিল জটিল রোগ থেকেঅতি সহজেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

**(ঝ) মস্তিষ্ক সুস্থ ও সতেজ রাখতে মিসওয়াক:** মস্তিষ্ক মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মস্তিষ্ক সুস্থ ও সতেজ না থাকলে মানব জীবন পুরোটাই বৃথা। কেননা সুস্থ মস্তিষ্কের ওপর ভিত্তি করেই মানব জীবনের সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। সুতরাং মানুষের এই মস্তিষ্ক সুস্থ ও সতেজ রাখার জন্য আনুষঙ্গিক বিভিন্ন উপাদান যোগান দেয়ার পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করাও অত্যন্ত জরুরী। উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের সাথে রয়েছে দাঁতের সুগভীর সম্পর্ক। কোনো কারণে দাঁত অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় ও পুঁজযুক্ত হলে এর প্রভাবে উম্মাদনা, প্রচন্ড মাথা ব্যথা, পাইওরিয়া ও মস্তিষ্ক বিকৃতিসহ আরো অনেক রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নিয়মিত মিসওয়াক করলে দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং মস্তিষ্ক থাকবে সুস্থ ও সতেজ। মস্তিষ্কজনিত কোনো ধরণের রোগ তাকে আক্রান্ত করতে পারবে না। কারণ মস্তিষ্কের অসংখ্য উপাদান ও সহায়ক বস্তুর মধ্যে ফসফরাস অন্যতম। আর মিসওয়াকের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা মিসওয়াক করার সময় মুখের লালা ও সূক্ষ্ম গ্রন্থির সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। ফলে মস্তিষ্ককে সুস্থ ও সতেজ রাখতে এবং মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চার করতেমিসওয়াক খুবই কার্যকরী। হযরত আলী (রা.) বলতেন, তোমরা অধিক পরিমাণে মিসওয়াক করো, কারণ মিসওয়াক করার দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়।[৭৫]

**(ঞ) সর্দি-কাশি ও অন্যান্য রোগ নিরাময়ে মিসওয়াক:** স্থায়ী সর্দি-কাশির কারণে রোগীর শ্লেষ্মা জমাট বেঁধে গেলে নিয়মিত মিসওয়াকে শ্লেষ্মা ভেতর থেকে বের হয়ে যায়। তাই বলা হয়, মিসওয়াক হলো সর্দি–কাশির সর্বোচ্চ প্রতিষেধক। এমনকি সর্বদা মিসওয়াক করলে নাক ও গলার অপারেশন করার মত পরিস্থিতি খুব কমই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া নিয়মিত মিসওয়াক করলে ঘাড় ব্যথা, টনসিল, গলা ব্যথা ও জ্বালা-পোড়া, গলার স্বর হ্রাস পাওয়া,স্মরণ শক্তি হ্রাস পাওয়া, মাথা ঘুরানো, হৃৎপিন্ডের ঝিল্লিতে পুঁজ জমা ও থাইরয়েড গ্ল্যান্ডসহবিভিন্ন জটিল রোগ থেকে অতি সহজে স্থায়ী নিরাময় লাভ করা সম্ভব।

আল্লামা যুবায়রী হানাফী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মিসওয়াকের দশটি উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। যথা: মাড়ি শক্ত হওয়া, মুখ পরিষ্কার হওয়া, গলা থেকে কফ বের হওয়া, মুখ ও পেটের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে মিসওয়াক সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করে গবেষকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মিসওয়াকে অধিক পরিমাণে টনিক এসিড (অম্লদ্রব্য) থাকে, যা দাঁতকে জীবাণু ওপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া এ বিষয়টিও বর্তমানে স্বীকৃত যে হার্টের বাল্ব আক্রান্তকারী (Step to coecus) ব্যাকটেরিয়া মুখবিবরীয় পথেই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আর মিসওয়াক ব্যবহারে উক্ত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে যায়।[৭৬]

**শয়নের পূর্বে মিসওয়াক করা**

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাত্রের খাবার যত আগে খাওয়া যায় ততই উত্তম। তাই রাত্রের খাবার এশার নামাযের পূর্বে খাওয়াই সুন্নাত। সে হিসেবে অযু বা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে মিসওয়াক সুন্নাত হওয়ায় একজন নামাযী ব্যক্তি এশার সালাতের সময় মিসওয়াক করার কারণে তার শয়নের পূর্বে রাত্রের মিসওয়াকও হয়ে যায়। এতে সে বিরাট ক্ষতি থেকে হিফাজত থাকে। মানুষের দাঁত সাধারণত নষ্ট হয় শয়নকালে।দিনের বেলায়মানুষ কখনো কথা বলছে, কখনো আহার করছে, আবার কখনো পান করছে অর্থাৎ দিনের বেলায় মুখ সর্বক্ষণ গতিশীল থাকায় রক্তলসিকা কাজ না করতে পারার দরুণ দাঁতের ফাঁকে অবশিষ্ট খাদ্য কণা পঁচনসহ রোগ সৃষ্টির কোনো সুযোগ পায় না। কিন্তু রাতের বেলায় শয়নকালে দীর্ঘ সময় মুখ বন্ধ থাকার কারণে রক্তলসিকা অবশিষ্ট খাদ্য কণা পঁচনসহ রোগ সৃষ্টির কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ পায়। এ কারণেই রাতের বেলায় দাঁত অধিক খারাপ হয়। তাই বর্তমানে ডেন্টাল সার্জনগণ বলেন, দাঁত সুরক্ষায় প্রত্যেকটি প্রাপ্ত

---

৭৫. *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯
৭৬. *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৮

বয়স্ক মানুষের দৈনিক কমপক্ষে তিনবার ব্রাশ করা প্রয়োজন। রাতে শয়নকালে একবার, সকালে নাস্তার পর একবার এবং দুপুরে খাওয়ার পর একবার। অগত্যা কেউ যদি দৈনিক মাত্র একবার ব্রাশ করতে চায়, সে যেন রাত্রে শয়নের পূর্বে করে নেয়।সুস্থতা অর্জন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিসওয়াকের আমলটি যে কত বিজ্ঞান সম্মত, তা গবেষণারত বর্তমান ডেন্টাল সার্জনগণকে দিন দিন অভিভূত করেই যাচ্ছে।হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা.) রাতে ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করতেন। রাতে শয়নকালে মিসওয়াক করা ছিল তাঁর মহান অভ্যাস।

অন্য হাদীসে আছে – كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

অর্থ: হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীকারীম (সা.) যখনইরাতে (সালাতের জন্য) ওঠতেন, তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।[৭৭]

**সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করা**

সালাত ব্যতীত অন্যান্য সময় মিসওয়াক করার অনুমোদন থাকলেও বিভিন্ন হাদীসে মূলত সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশনা রয়েছে এবং এটাই সুন্নাত। এর অন্যতম চারটি হিকমত রয়েছে। যথা-

(ক) সাধারণ নিয়ম হলো, যে যতো বেশি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় সে ততো বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উত্তম পোশাক পরিধান ও সতর্ক অবস্থায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে সালাত যেহেতু মহাপরাক্রমশালীআল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণ-গান করা ও তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলার মাধ্যম যাকে মুমিনের মিরাজ বলা হয়ে থাকে। তাই সালাতের সময় মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরার নিমিত্ত মিসওয়াক করা অত্যাবশ্যক। পবিত্র কুরআনে সালাতের সময় উত্তম পোষাক পরিধান করারওনির্দেশ রয়েছে। ইরশাদহচ্ছে – يٰبَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

অর্থ: হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করো।[৭৮]

(খ) সালাত হলো একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় আমল। তাই এ সালাত যথাসম্ভব খুশু-খুযু তথা একাগ্রতার সাথে আদায় করা উচিত। যদি আহারের পর মিসওয়াক বিহীন অযু করে সালাত আদায় করা হয়, তাহলে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের ক্ষুদ্রাংশ জিহ্বায় লেগে সালাতের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

(গ) কুরআন-হাদীসে ফরয সালাত সাধারণত জামাআতের সাথেই আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে। সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় যদি নামাযীর মুখ থেকে দুগর্ন্ধ বের হয়, তাহলে অন্য সালাত আদায়কারীরও কষ্ট হবে। সবচেয়ে উত্তম পরিবেশে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম জায়গা মসজিদে সালাতের মতো একটি মহান আমল সৃষ্টিকর্তার সামনে আদায়ের সময় যদি মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে এর চেয়ে লজ্জার কোনো বিষয় হতে পারে না। তাই এ সময় মিসওয়াক করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে নেয়া উচিৎ।

(ঘ) মুমিন ব্যক্তি সালাতে দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দুআ-ইস্তিগফার ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে জীবনে অনাবিল শান্তি লাভ করে থাকে। কিন্তু মিসওয়াকের ন্যায় একটি সহজ আমল ত্যাগ করলে মুখের দুর্গন্ধের কারণে নামাযী ব্যক্তি নিজেই অস্বস্তিতে ভোগতে থাকে। এতে সালাতের মাধ্যমে যে প্রশান্তি ও ফায়েদা লাভ করার কথা ছিল, তা থেকে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি বঞ্চিত থেকে যায়।

তাই মিসওয়াকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষে বিভিন্ন হাদীসে মিসওয়াক করে সালাত আদায়কারীর অতিরিক্ত সাওয়াবের কথাও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে।

---

৭৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: মিসওয়াক করা, খ. ১, পৃ. ৭৭-৭৮, হাদীস নং- ২৪৫

৭৮. আল-কুরআন, ৭: ৩১

**যে সকল ডাল মিসওয়াকের অধিক উপযোগী**

যেকোন বৃক্ষের শিকড় বা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করলেই সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, যদিও উপকারিতা লাভের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। তবে এমন বৃক্ষের মিসওয়াক দাঁতের জন্য উপযোগী যার আঁশগুলো অধিক কোমল, যা দাঁতের মাঝে ফাঁকা সৃষ্টি করে না এবং মাড়ীতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না। সে দিকে থেকে পীলু, নিম, বাবলা ও কাণির বৃক্ষের মিসওয়াকই উত্তম।গবেষণায় দেখা গেছে,মিসওয়াক হিসেবে পীলু বৃক্ষের মিসওয়াকই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ও উপকারি।হিন্দি ভাষারপীলু বৃক্ষকে আরবীতে এরাক ও ল্যাটিন ভাষায় সালভাডোরা পিরসিকা বলা হয়। আর ইংরেজরা অধিক ব্যবহারের কারণে এর নাম দিয়েছে টুথ ব্রাশ ট্রি (Tooth Brush Tree)।

হাকীম আল বেরুনী মিসওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, বৃক্ষের মিসওয়াক যুগ যুগ ধরে দাঁত পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরাক নামক মিসওয়াকের ব্যাপারে তিনি বলেন, দাঁত পরিষ্কারের জন্য যে সকল বৃক্ষের মিসওয়াক ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে এরাক বৃক্ষের মিসওয়াক সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। তিনি তাঁর বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণিত করার জন্য আবু হানফিা দাগুরী, ইবনে রেজওয়ান, ইবনে জালজাল প্রমুখের সূত্র উল্লেখ করেছেন। মুখ ও দাঁতের সুরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম পীলু বৃক্ষের শিকড় ব্যবহার করার রীতি আরব দেশে পাওয়া যায়।পরবর্তীতে প্রত্যেক যুগে এই বৃক্ষের ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিজ্ঞানীদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই পীলু বৃক্ষ। বর্তমানে আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে এই বৃক্ষ নিয়ে গভীর গবেষণা চলছে। তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত, মুখও দাঁতের সুরক্ষায় পীলু বৃক্ষের চেয়ে অধিক কার্যকরীআর কিছু নেই।কেননা পীলু বৃক্ষের শিকড়ে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। আর দাঁত সুরক্ষার প্রধান উপাদানই হলো ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। তাই অনুসন্ধানের আলোকে একথা স্বীকৃিত, যে মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে সেখানেই পীলু বৃক্ষ বেশি জন্মে। আর এ জন্যই কবর স্থানের মাটিতে মানুষের হাড় বিগলিত হওয়ায় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বেশি থাকার কারণে সেখানে পীলু বৃক্ষও অধিক পরিমাণে জন্মে।পীলু বৃক্ষের মিসওয়াক তাজা ও নরম অবস্থায় চাবালে তা থেকেএক ধরণেরতিক্ত ও তেজস্ক্রিয় পদার্থবেরিয়ে আসে। এ পদার্থই রোগ জীবাণুর ক্রমবিকাশকে প্রতিহত এবং দাঁতসমূহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।পীলু বৃক্ষে আরো যে সকল উপাদান পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ-

**(ক) ট্রাই মিথাইল অ্যামিন (Tri Methyl Amin)**: এটা পীলু বৃক্ষের প্রধান উপাদান। এর রাসায়নিক সংকেত হলো (CH3)3N। এটা বর্ণহীন তরল এবং আঁষটে গন্ধযুক্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মুখের মধ্যে বিশেষত দাঁতে রয়ে যাওয়া খাদ্য কণাকে একত্রিত হওয়া থেকে বাঁধা প্রদান করে। মিসওয়াকের অন্যান্য অংশ আরও অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে জীবাণু প্রতিরোধ করে।

**(খ) ক্লোরাইড (Chlorides):** এ বৈশিষ্ট্যের কারণে মুখের আবরণী ঝিল্লি ও অন্যান্য অংশে তরল পদার্থের পরিমাণে ভারসাম্য বজায় থাকে। এটা মূলত প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট লবনাক্ত পদার্থ। এর উপস্থিতির ফলে বিভিন্ন উপাদানের কর্মগত শৃংখলা বজায় থাকে।

**(গ) ফ্লোরাইড (Flouride) ও সিলিকা (Silica):** পীলু বৃক্ষে প্রাকৃতিকভাবেই ফ্লোরাইড ও সিলিকা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। সাধারণত দাঁতের মাজনে কৃত্রিমভাবে ফ্লোরাইড যুক্ত করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পীলু মিসওয়াকের স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। ফ্লোরাইড বিশেষত শিশুদের দাঁতকে ক্ষয়িত হওয়া থেকে রক্ষা করে। অধিকন্তু মিসওয়াকে বিদ্যমান সিলিকা যান্ত্রিক কৌশলে দাঁতকে উজ্জ্বল করে।

**(ঙ) গন্ধক(Sulpher)**: পীলু বৃক্ষে বিদ্যমান গন্ধক জীবাণু নাশক ও বিষ প্রতিষেধক গুণসম্পন্ন হওয়ায় মুখের সুস্থতা অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**(চ) ভিটামিন সি (Vitamin-C):** দাঁতের সুস্থতা ও মাড়ীর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভিটামিন সি এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পীলু বৃক্ষে এই উদ্ভিজ উপাদানটি প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে দাঁত নষ্ট হওয়া ও মাড়ী ফুলে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। ডাক্তারগণ বহুদিন থেকে দাঁতের মাড়ী ফুলা রোগের চিকিৎসায় মিসওয়াককে ব্যবহার করছেন।

**(ছ) রঞ্জক পদার্থ:** মিসওয়াকের উপরের আবরণেবিদ্যমান রঞ্জক পদার্থ দাঁতের বাইরের শক্ত স্তর অর্থাৎ এনামেলকে রক্ষা করে।এজন্য পীলু মিসওয়াকের অগ্রভাগের সূক্ষ্ম আঁশগুলো কেটে কেটে ব্যবহার করা উচিত, যেন প্রত্যেকবারই নতুন আঁশ ব্যবহার হয় এবং এর তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ সুস্থতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী হয়।

পীলু ছাড়া নিম, বাবলা ও কাণির গাছের মিসওয়াকও অনেক ভাল। যদিও এগুলো কিছুটা কটু ও তিক্ত তথাপি দাঁতের জন্য খুবই উপকারি। এগুলোর মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে, যা দাঁতকে করে মজবুত ও উজ্জ্বল। ব্যবহারকারীকে অসংখ্য রোগ থেকে হিফাজত করে এবং মুক্তি দেয়।

**যে পন্থায় মিসওয়াক করলেঅধিক উপকার পাওয়া যায়**

মিসওয়াকের উপকারিতার কথা পড়ে বা শুনে অনেকেই একটি শুষ্ক ডাল নিয়ে অযত্নের সাথে মিসওয়াক করা শুরু করে দেয়। অবশেষে কিছুদিন ব্যবহার করে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফলাফল না পাওয়ার কারণে হতাশা হয়ে মিসওয়াককে বেহুদা ও বৃক্ষের একটি সাধারণ ডাল মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যা আদৌ ঠিক নয়। কারণ যেকোন বিষয়ই নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন না করলে তা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় না। তাই মিসওয়াকের পুরোপুরি উপকারিতা পেতে হলে নিম্নের বিষয়াবলীর দিকেও খেয়াল রাখতে হবে-

(ক)মিসওয়াক হিসেবে পীলু,নিম, বাবলা বা কাণির বৃক্ষের ডাল ব্যবহার করা।
(খ) মিসওয়াক ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা হওয়া।
(গ) মিসওয়াক মধ্যম পর্যায়ের মোটা হওয়া (প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ন্যায়)।
(ঘ) প্রথমে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখা, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে নরম করে আলতুভাবে মিসওয়াক করা।
(ঙ) দাঁতের উপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে উপরে মিসওয়াক করা। এমনিভাবে জিহ্বাহও উপর থেকে নিচে এবং নিচ হতে উপরে মিসওয়াক করা। হাদীসে উল্লেখ আছে–كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا

অর্থ: নবী কারীম (সা.) দাঁতের প্রস্থে মিসওয়াক করতেন।[৭৯]

এভাবে মিসওয়াক করার দ্বারা দাঁতের মাড়ি ক্ষয় হয় না এবং দাঁত সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুন্দর ও ঝকঝকে থাকে।
(চ) প্রত্যেকবার মিসওয়াকের ক্ষেত্রে অগ্রভাগের সূক্ষ্ম আঁশগুলো কেটে ফেলে দেয়া, যেন প্রত্যেকবারই নতুন আঁশ ব্যবহার হয় (বিশেষ করে নির্ধারিত কোনো রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে)।
(ছ) মিসওয়াক ধরার ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ও কনিষ্টাঙ্গুল মিসওয়াকের নিচে রাখা এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল উপরে রাখা।
(জ) তাজা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা।
(ঝ) বসে মিসওয়াক করা ।
(ঞ) তাড়াহুড়ানা করে একটুসময় নিয়ে মিসওয়াক করা এবং
(ট) নিয়মিত মিসওয়াক করা।[৮০]

উল্লেখ্য, মিসওয়াক কোনো সাময়িক আমল নয় যে নির্দিষ্ট কয়েক দিন, মাস বা বছর আমল করলেই যথেষ্ট হবে; বরং এটা জীবনব্যাপী একটি আমল। মানুষ যেহেতু আমৃত্যুখাবার খায় ও সালাত আদায় পড়ে, তাই এই আমলটি তাকে আজীবন চালিয়ে যেতে হবে, এতে আমলকারীরই ফায়েদা রয়েছে।প্রথমত এর দ্বারা দৈনিক পাঁচবার গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত আদায় হয়, দ্বিতয়ত খাবারের ক্ষুদ্রাংশ দাঁতের ফাঁকে অবশিষ্ট থেকে দাঁতসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মক ক্ষতির যে সম্ভাবনা ছিল, তা থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়।

৭৯. আবুল হুসাইন আবদুল বাকী ইবন মারযুক আল-বাগদাদী, *মু'জামুস সাহাবাহ*, লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৫. খ. ১, পৃ. ৯০
৮০. *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬-৪৩

**নাকে পানি দেয়া**

নবী-রাসূলগণের যে দশটি স্বভাবজাত আমলকে 'সুন্নাত' হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে নাকে পানি দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। শারীরিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমানগণ এসব সুন্নাতকেঅন্যতম রক্ষাকবচ মনে করে থাকে।অনেকেনাকে পানি দেয়াকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করলেও মানব শরীর সুস্থ রাখার জন্য এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।কেননা আমরা বেঁচে থাকার জন্য নাকের মাধ্যমেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকি। বাতাসে উড়ে বেড়ানো অসংখ্য রোগ-জীবাণু নাকের লোমে আটকে থাকে এবং শ্বাস নেয়ার সময় এগুলো দেহের ভেতর প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে অযুর সময় ও গোসলেনাকে পানি প্রবেশ করালে পানির সাথে এসব জীবাণু খুব সহজেই বের হয়ে আসে। এতেঅগণিত রোগ থেকে শরীর সুস্থ থাকে। সুতরাং অবহেলা ও অহেতুক মনে না করে অযু ও গোসলের সময় গুরুত্ব সহকারে নাকের ভেতর পানি পৌঁছনো উচিত।

ফরয গোসলে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরয। শুধু আঙ্গুল দ্বারা নাকের ভেতরের অংশ কোনো মতে ভিজিয়ে নিলেই হবে না। এর দ্বারা ফরয গোসল আদায় হবে না। নাকে পানি পৌঁছানোর পদ্ধতি হলো- ডান হাতের তালুতে পানি নিয়ে নাকের ছিদ্রে পৌঁছানোর পর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা নাকের ভেতরের অংশ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং রোযাদার না হলে যতদূর সম্ভব নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে। এভাবে তিনবার পানি প্রবেশ করাতে হবে, যাতে কোনো অংশ শুকনা না থাকে। অবশ্য অযুর সময় কেবল নাকের ছিদ্র পর্যন্ত পানি পৌঁছালেই সুন্নাত আদায় হবে।[৮১]হাদীসে অযুর ক্ষেত্রে এ নির্দেশনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) লাকীত ইবন সাবরা (রা.)-কে ইরশাদ বলেন: আর তুমি যদি রোযাদার না হও তাহলে উত্তমরূপে নাকে পানি পৌঁছাবে।[৮২]

**ইসতিঞ্জায় ঢিলা–কুলুখব্যবহার করা**

সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কথাসব ধর্মেই বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতার বিষয়ে এত সুষ্ঠু ও নিখুঁত দিক নির্দেশনা রয়েছে, যা অন্য কোনো ধর্মে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ইসতিঞ্জা সংক্রান্ত সাধারণ মাসআলার ওপর এত ব্যাপক আলোচনা করেছেন, যা অধ্যয়ন করলে রীতিমতো বিস্ময় লাগে। তাৎপযপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে কিছু লোকএসকল আলোচনাকে শুধুই ঢিলা-কুলুপ ও ইসতিঞ্জার মাসায়েল বলে হাসি-তামাশা করে উড়িয়ে দিলেওচিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেএসব নিছক মাসআলা নয়; বরং সুস্থতা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। বস্তুতইসতিঞ্জায় ঢিলা-কুলুপ ও পানি ব্যবহার করাকেবাহ্যিকভাবেসাধারণ ব্যাপার মনে হলেও এতে স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনার বিরাট হিকমত লুকিয়ে রয়েছে।

বর্তমানে আমরা যাদেরকে সভ্য জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেই, তাদের অধিকাংশইইসতিঞ্জা তথা প্রস্রাব-পায়খানার পর কেবল টয়লেট পেপার বা কাপড় দ্বারা পরিচ্ছন্ন হলেও প্রকৃত মুসলমানগণ ইসতিঞ্জার সময় ঢিলা, পাথর, টয়লেট পেপার বা কাপড় ব্যবহারের পাশাপাশি পানি ব্যবহার করতেও দেখা যায়।অধিকাংশ হাদীসে ইসতিঞ্জার সময় ঢিলা ও পানি ব্যবহারকে অত্যাবশ্যকীয় করে এমন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দিয়েছে, যার দৃষ্টান্ত অন্যকোনো সংস্কৃতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ يَّسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যদ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।[৮৩] অন্য হাদীসে এসেছে-

---

৮১. মুফতী শফী, মুফতী আবু সাঈদ, মুফতী এরশাদ খান, *ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আশরাফিয়া বুক হাউজ, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৯৭

৮২. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: ভালোভাবে নাকে পানি দেয়া, খ. ১, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ৮৭

৮৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: পাথর দ্বারা ইসতিঞ্জা করা, খ. ১, পৃ. ১৭, হাদীস নং- ৪০

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِتَّبَعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ اِبْغِنِیْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। আর তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন: আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিঞ্জা করবো।[৮৪]

মল-মূত্র ত্যাগ করার পর পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা পরিষ্কারের জন্য পানি ব্যতীত অন্য যেসকল বস্তু ব্যবহার করা হয় তাকেই ঢিলা-কুলুখ বলা হয়। হাদীসে পাথর ব্যবহারের কথা বলা হলেও এর দ্বারা একেবারে স্বচ্ছ পাথর ভাবার অবকাশ নেই; বরং মাটি মিশ্রিত ছোট ছোট পাথর বোঝানো হয়েছে। যা আমাদের দেশের অনেকটা মাটির ঢিলার মতো। কেননা সাধারণ জ্ঞানেও বোঝা যায় স্বচ্ছ এবং ধারালো পাথর দ্বারা মলদ্বারের মত স্পর্শকাতর জায়গা পরিষ্কার করা কোনক্রমেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

প্রস্রাব-পায়খানা পুরোটাই ময়লা, জীবাণু এবং রোগ-ব্যাধিপূর্ণ যা মানুষের শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং এর কিছু অংশ শরীরে বা হাতে লেগে থাকলে অগণিত রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই হাদীসে বর্ণিত ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার নিশ্চয় বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মত একটি পদ্ধতি। কেননা মাটিতে রয়েছেএ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং উৎকৃষ্ট মানের রোগ প্রতিরোধ পদার্থ।ঢিলার ব্যবহার গবেষণা জগৎকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে। কেননা মাটির যে কোন অংশই জীবাণনাশক। যখন ঢিলা ব্যবহার করা হয় তখন গুপ্তাঙ্গে মাটি লাগার কারণে বাইরের অংশে বিদ্যমান জীবাণু মৃত্যুবরণ করে। এমনকি গবেষণা দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে, ঢিলা ব্যবহার করলে পুরুষাঙ্গ ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে।
পক্ষান্তরে, টয়লেট পেপার তৈরি করতে অগণিত ক্যামিক্যাল ব্যবহার করতে হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো ক্যামিক্যাল এতটাই বিপদজ্জনক যে এর দ্বারা চর্মরোগ, একজিমা ও স্কীনের কলার পরিবর্তনকারী যত ভয়াবহ রোগ আছেএসবই জন্ম নিতে পারে। তাই বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে দেখা যায়পুরুষাঙ্গে ভয়াবহ রোগ বিশেষ করে ক্যান্সার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হলে রিপোর্টে তারা শুধু দু'টি বিষয়কে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত ইসতিঞ্জার সময় টয়লেট পেপার ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয়ত পানি ব্যবহার না করা।

উল্লেখ্য, ইসতিঞ্জা হতে পবিত্র হওয়ার জন্য অনেককে দেখা যায়, ঢিলা-কুলুপ নিয়ে মানুষ চলাচলের জায়গায় নির্লজ্জভাবে ঘোরাফেরাসহ নানাধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। এটি খুবই নিন্দনীয় কাজ। ইসলাম বিদ্বেষীরা এতে অশালীন উক্তি করা সুযোগ পায়। সুন্দর নিয়ম হলো ইসতিঞ্জার পর প্রয়োজনে এমন জায়গায় হাঁটাহাঁটি করা যাতে সাধারণ মানুষের নজর না পড়ে। এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা ও আমল।হাদীসে এসেছে-

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ–

অর্থ: মুগীরা ইবন শোবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন পায়খানায় গমন করতেন, তখন বহুদূর যেতেন।[৮৫]অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لاَ يَرَاهُ اَحَدٌ–

অর্থ: জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন পায়খানার ইরাদা করতেন তখন তিনি এতদূরে যেতেন তাঁকে কেউ দেখতে পেতো না।[৮৬]

**ইসতিঞ্জার সময় বাম পায়ের উপর চাপ দিয়ে বসা**

---

৮৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: পাথর দিয়ে ইসতিন্‌জা করা, খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬, হাদীস নং- ১৫৫
৮৫.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: মলমূত্রের সময় নির্জনে গমন, খ. ১, পৃ. ১২, হাদীস নং- ১
৮৬.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা,অনুচ্ছেদ: মলমূত্রের সময় নির্জনে গমন, খ. ১, পৃ. ১২, হাদীস নং- ২

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সুন্দরতম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেখানে যে অঙ্গকে রাখা দরকার সেখানেই তা স্থাপন করেছেন। আমরা যদি আমাদের শরীর নামক যন্ত্রের কল-কজার দিকে তাকাই, তাহলে তা সহজেই অনুমেয় হয়। মানুষের পরিপাক তন্ত্র রয়েছে বাম দিকে। তাই মানুষ আহার করার পর এর নির্যাস নিংড়িয়ে রক্ত মাংসের সাথে মিশে যায় এবং অবশিষ্ট অতিরিক্ত অংশ সমস্ত নাড়িভূঁড়ি হয়ে বাম দিকের নাড়িতে একত্রিত হয়ে থাকে। আর পায়খানার সময় এখান থেকেই মলের আকৃতিতে তা বের হয়। তাবারানীতে এসেছে-

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَمَرَنَا اَنْ نَتَوَكَّاءَ عَلَى الْيُسْرٰى وَ نَنْصِبَ الْيُمْنٰى–

অর্থাৎ, সুরাকা ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন: আমরা যেন পায়খানা করার সময় বাম পায়ের উপর চাপ দিই এবং ডান পা খাড়া রাখি।

চিকিৎসকগণ বলেন, যদি বাম পায়ের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত খাদ্যাংশ ধারণকৃত নাড়ীর ওপর চাপ দেয়া হয়, তাহলে মল বের হওয়ার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়। সমস্ত মল অতি সহজে বের হয়ে আসে। পাকস্থলী পরিষ্কার হয়। এতে এ্যাপেনডিসাইটিস, কুষ্ঠ-কাঠিন্য, সর্বদা কষা, পাইলস এবং হৃদরোগ থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে পায়খানা করলে গ্যাস, পাকস্থলীর তাপমাত্রা, বদহজম এবং মূত্রাশয় রোগ কমে যায় এবং একাধারে এ নিয়ম পালন করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। মন প্রফুল্ল থাকে, মনের অস্থিরতা ও অশান্তি দূর হয়। মানুষের মধ্যে নতুন করে কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যমতা সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য কারো যদি সালাতের পূর্ব মুহূর্তে খুব বেশি ইসতিঞ্জারপ্রয়োজন হয়, তাহলে ইসতিঞ্জা সেরে সালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। বস্তুত এই সূক্ষ্ম বিষয়টি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ঐ মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে প্রস্রাব-পায়খানাকে আটকে রাখার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কেননা প্রস্রাব-পায়খানা আটকে রাখায় নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। এতে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি হয় মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, স্নায়ু ও কিডনীতে। কখনো প্রস্রাব-পায়খানা আটকে গেলে বমি এবং মাথা ঘোরা শুরু হয়ে যায়।

**কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসে মলমূত্র ত্যাগ না করা**

কাবা গৃহ প্রতিটি মুসলমানের জন্য অতি সম্মানের একটি বিষয় এবং আল্লাহ তাআলাও কাবাতে পরিপূর্ণ বরকত রেখে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই অতি সম্মানীয় কাবা ঘরের দিকে মুখ করে বা পিঠ প্রদর্শন করে মলমূত্র ত্যাগ করা চরম বেয়াদবি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْتَقْوَى الْقُلُوْبِ–

অর্থ: যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা তার আন্তরিকতার পরিচায়ক।[৮৭]
আর কাবা শরীফ নি:সন্দেহে আল্লাহ তাআলার একটি অন্যতম নিদর্শন।

এছাড়া বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, কাবাগৃহের চতুর্দিকে পজিটিভ বা ইতিবাচক আলোকরশ্মি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, যদিও আমরা খালি চোখে তা দেখতে পাই না। আর মলমূত্র ও থুথু ইত্যাদি হলো নেতিবাচক বিচ্ছুরণের অংশ। তাই এগুলো যদি কাবার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে ত্যাগ করা হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য সার্বক্ষণিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।বিখ্যাত প্যারাসাইক্লোজিস্ট ডা. কমন বীমন তার সারা জীবনের গবেষণার আলোকে বলেছেন, কাবা শরীফ থেকে সর্বদা এক ইতিবাচক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই সেদিকে নেতিবাচক আলোকরশ্মির গতি অবশ্যই ক্ষতির কারণ হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ لاَ يَسْتَدْبِرْهَا–

৮৭. আল-কুরআন, ২২: ৩২

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আমি তোমাদের পিতৃতুল্য। আমি তোমাদেরকে দীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব, তোমাদের কারো যখন পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়, সে যেন কিবলাকে সম্মুখে ও পেছনে রেখে না বসে।[৮৮]

**ঢিলা–কুলুখ হিসেবে গোবর,হাড্ডি এবং নাপাক বস্তু ব্যবহার না করা**

প্রস্রাব-পায়খানা করার পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করা ইসলামের একটি অন্যতম মৌলিক নির্দেশনা, যা প্রকৃত মুসলমানের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং মলমূত্র ত্যাগের পর গোবর, হাড্ডি বা নাপাক জিনিস ব্যবহার করে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। কারণ যে জিনিস নিজেই অপবিত্র তা অন্যকে কোনক্রমেই পবিত্র করতে পারে না। আর এগুলো স্বাস্থ্যের জন্যও হুমকি স্বরূপ। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَائِطَ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِيَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَ اَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَ قَالَ هٰذَا رِكْسٌ–

অর্থ: আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) একবার শৌচ কাজে যাওয়ার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির জন্য খোঁজাখোঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই এক খণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র।[৮৯]

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ ... نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ عَظْمٍ–

অর্থ: সালমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন... রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে গোবর বা হাড্ডি দিয়ে ইসতিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।[৯০]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ... وَ كَانَ يَاْمُرُ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ وَّ يَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন... রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি পাথরের দ্বারা ইসতিঞ্জা করার নির্দেশ দিতেন এবং সর্ব প্রকার নাপাক বস্তু এবং জরাজীর্ণ হাঁড়ের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করতেন।[৯১]

গোবর হলো গরুর বিষ্টা আর প্রতিটি বিষ্টাই রোগ-জীবাণু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।বিশেষ করে গোবরের মধ্যে রয়েছে পেশী সংকোচন টিটেনাস এবং টাইফয়েডরোগের জীবাণু। এর দ্বারা ঢিলা-কুলুখ নিলে এসব জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। অপরদিকে মানুষ কোন পশুর গোশত খাওয়ার পর হাড় ফেলে দিলেও অন্যান্য জীব-জন্তুতা খায়। এসব জন্তুর কতকের মুখের লালায় থাকে মারাত্মক রোগ-জীবাণু। যেমন, কুকুর বা কোনো কোনো প্রাণির মুখের লালায় বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এসব প্রাণির উচ্ছিষ্ট হাড় দিয়ে ঢিলা বা কুলুখ নিলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। শুধু তাই নয়, খাওয়ার পর সাধাণত নোংরা জায়গাতেই হাড় ফেলানো হয়। এতে হাড়ের মধ্যে ধুলা-বালু ও ময়লা-আবর্জনাসহ নানা ধরনের রোগ-জীবাণু লেগে থাকে। তাছাড়া হাড় হলো অসমতল ও অমসৃণ একটি বস্তু, যদ্বারা ঢিলা-কুলুখ নিলে মানব দেহের নাজুক ও নরম গুপ্তাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই স্বাভাবিক।তাই স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী এসব জিনিস দ্বারা ঢিলা-কুলুখ নিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

**বাতাসের দিকে মুখ করে এবং গর্তে প্রস্রাব না করা**

---

৮৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: কিবলার দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করা মাকরূহ, খ. ১, পৃ. ১৩, হাদীস নং- ৮

৮৯ . *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অযু, অনুচ্ছেদ: গোবর দিয়ে ইসতিন্জা না করা, খ. ১, পৃ. ৫৬, হাদীস নং- ১৫৬

৯০ . *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: কিবলার দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করা মাকরূহ, খ. ১, পৃ. ১৩, হাদীস নং- ৭

৯১ . *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: কিবলার দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করা মাকরূহ, খ. ১, পৃ. ১৩, হাদীস নং- ৮

সাধারণত বাতাসের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করলে বাতাসের চাপে প্রস্রাবের ছিঁটা উড়ে এসে কাপড় ও শরীরে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে দেহ ও পোশাক উভয়টি অপবিত্র হয়ে যায়। আর অপবিত্রতা হলো রোগ-ব্যাধির উৎস। সুতরাং প্রস্রাবের জন্য এমন দিক নির্বাচন করা উচিৎ যেদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয়না।হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْجُحْرِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[৯২]

হাদীসে গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করার অন্যতম কারণ হলো- গর্তসাপ, বিচ্ছু,ইঁদুর এবং অনেক বিষাক্ত প্রাণির আবাস্থল। তাইবিষাক্ত প্রাণির গর্তে প্রস্রাব করলেগর্ত থেকে এসব প্রাণি বের হয়েপ্রস্রাবকারীর ক্ষতি সাধন করতে পারে। অনেক জায়গা লবণাক্ত হওয়ায় গর্তেএসিড ও নাইট্রোজেন থাকে। এমন জায়গার গর্তে প্রস্রাব করলে প্রস্রাব নিজেই এক প্রকার এসিড হওয়ার কারণে উভয় প্রকার এসিড মিলে বিষাক্ত বাষ্প সৃষ্টি হয়ে মানব দেহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

**পায়খানার পর মাটি দ্বারা হাত পরিষ্কার করা**

প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি দ্বারা হাত পরিষ্কার করার পর হাতে এমন কিছু অদৃশ্য জীবাণু লেগে থাকে, যা সাধারণ পানি বা সাবান দিয়ে ধৌত করলেও অনেক সময়ধ্বংস হয় না। পূর্বে বলা হয়েছে মাটি হলো এক প্রকার উন্নতমানের এন্টিসেপটিক, যা অনেক শক্তিশালী জীবাণুকেও ধ্বংস করার কার্য ক্ষমতা রাখে।এমনকিমাটি কুকুরের রোগ-জীবাণুও ধ্বংস করে দেয়। আর সাধারণ রোগ-জীবাণুকে সাথে সাথে নষ্ট করে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে।তাই পায়খানা করার পর মাটি দ্বারা হাত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যদিও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে মাটি পাওয়া কিছুটা দুষ্কর, তথাপি এটাকে যারা সুন্নাত মনে করে গুরুত্ব দেবে, তাদের জন্য কিছু মাটি সংগ্রহ করা মোটেও কষ্ট সাধ্য নয়, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّاَ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী কারীম (সা.) টয়লেটে গমন করতেন তখন আমি তাঁর জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অত:পর তিনি ইসতিঞ্জা করে মাটিতে হাত ঘষতেন। অত:পর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম, যদ্দারা তিনি অযু করতেন।[৯৩]

**বাম হাত দিয়ে মলমূত্র পরিষ্কার করা**

মলমূত্র ত্যাগের পর ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জনকরাই উত্তম পদ্ধতি। শৌচ কার্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে হাদীসের এমন নির্দেশনায়স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যথেষ্ট হিকমত লুকায়িত আছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হাতসমূহের কার্যাবলী বন্টন করে দিয়েছেন। হাতে গোনা কতক মানুষ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল মানুষেরই বাম হাতের তুলনায় ডান হাত অধিক শক্তিশালী। শরীরের ডান হাত থেকে সব সময় অদৃশ্য পজেটিভ আলোকরশ্মি বের হয়, আর বাম হাত থেকে নির্গত হয় নেগেটিভ আলোকরশ্মি। মানুষ যত কাজ করে এসবের মধ্যে শৌচ কর্ম একটি নেগেটিভ বা নেতিবাচক কর্ম হওয়ায় এক্ষেত্রে ইসলাম বাম হাত ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়ে শারীরিক সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেছে। সুতরাং শৌচ কার্য সম্পন্ন করতে ডান হাত ব্যবহার করলে দেহের অলৌকিক সিস্টেমে অসাঞ্জস্যতা ও পরিবর্তন দেখা দেবে, যার অশুভ প্রভাব মস্তিষ্ক ও মেরুদন্ডের ওপর পড়ে। এছাড়াখাওয়ার জন্য সবসময় ডান হাত ব্যবহৃত হয়। তাই শৌচ কাজে যদি ডান হাত ব্যবহার করা হয়, তাহলে খাবারের সাথে অনেক সময় রোগ-জীবাণু মিশ্রিত হয়ে শরীরের ভেতর প্রবেশ করে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। হাদীসে এসেছে-

---

৯২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা,অনুচ্ছেদ: গর্তে প্রস্রাব করা নিষেধ, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস নং- ২৯

৯৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: ইসতিঞ্জার পর মাটিতে হাত ঘষা, খ. ১, পৃ. ১৮, হাদীস নং- ৪৫

عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِیِّصَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُکُمْ فَلاَ یَاْخُذَنَّ ذَکَرَہُ بِیَمِیْنِہٖ وَ لاَ یَسْتَنْجِیْ بِیَمِیْنِہٖ–

অর্থ: আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন প্রশ্রাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ সম্পন্ন না করে।[৯৪]

অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ کَانَتْ یَدُ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ الْیُمْنٰی لِطُهُوْرِہٖ وَ طَعَامِہٖ وَ کَانَتْ یَدُہُ الْیُسْرٰی لِخَلاَئِہٖ وَ مَا کَانَ مِنْ اَذًی–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং তাঁর বাম হাত শৌচকর্ম ও এ ধরনের নিকৃষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত হতো।[৯৫]

### দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না করা

ইসলামের বিধি-বিধান মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন পরিব্যপ্ত, তেমনিএর প্রতিটি আমলেই রয়েছে অসংখ্য উপকারিতা। তাই প্রস্রাব দাঁড়িয়ে না বসে করবে এমন একটি ব্যক্তিগত সাধারণ বিষয়েও ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَکُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِصَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْہُ مَا کَانَ یَبُوْلُ اِلاَّ جَالِسًا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে, নবী কারীম (সা.) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি কেবল বসেই প্রস্রাব করতেন।[৯৬]

বনী ইসরাঈলদের শরীআত অনুযায়ী কাপড়ের কোন অংশে প্রস্রাব-পায়খানা লাগলে তা কেটে ফেলার বিধান ছিল। এমনকি শরীরের কোনো অংশে তা লাগলে উক্ত স্থানের চামড়া কেটে ফেলা হতো। কিন্তু ইসলামী শরীআত আমাদেরকে সহজ করে দিয়ে বলেছে, শরীর বা কাপড়ে কোনো নাপাক লাগলে তা শুধু ধৌত করে নিলেই পবিত্র হয়ে যায়। এমনকি কোনো ওযরবশত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করারও অনুমতি দিয়েছে, যা হাদীসেও প্রমাণিত।[৯৭]তবে দাঁড়িয়ে এবং বসে প্রস্রাব করা নিয়ে ইসলামী ফকীহগণের অনেক মতামত রয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর সুচিন্তিত অভিমত হলো, বর্তমানে যেহেতু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অমুসলিম ও কাফির-মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছে, এজন্য এর খারাপ দিকটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আর যে মাকরূহ তানযিহী অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়, ইহার মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।[৯৮]

সুতরাং বর্তমানে ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয নয়। আর এর ওপরই ফাতওয়া।[৯৯]

ইসলাম পূর্ব যুগে তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী পুরুষরা মলমূত্র ত্যাগের সময় কোনোরূপ পর্দা করতো না। পর্দার আড়ালে গিয়ে বসে প্রস্রাব করাকে তারা নারীদের কাজ মনে করে নিজেরা সব সময় খোলা জায়গায় অনাবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে বীরত্বের পরিচয় দিতো। কোনো পুরুষ এমনটি করতে না পারলে তাকে কাপুরুষ ভাবা হতো। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সর্বপ্রথম বসে ও পর্দা করে মলমূত্র ত্যাগ করতে দেখে তারা বিস্ময় প্রকাশ করতো। হাদীসে এসেছে-

---

৯৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরা, খ. ১, পৃ. ৫৫, হাদীস নং- ১৫৪

৯৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: ইসতিঞ্জা করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা মাকরূহ, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস নং- ৩৩,

৯৬. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছে: ঘরের ভেতর বসে প্রস্রাব করা, খ. ১, পৃ. ২১, হাদীস নং- ২৯

৯৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিতবুল অযু, অনুচ্ছেদ: দাঁড়িয়ে এবং বসে প্রস্রাব করা, খ. ১, পৃ. ৭২, হাদীস নং- ২২৪

৯৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: প্রচারের জন্য অহংকারী পোশাক পরিধান করা, খ. ২, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ৪০৩১

৯৯. মোহাম্মদ কামরুল হাসান, *আহ্কামুল হাদীস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী: আগষ্ট ২০১৯ (৭ম মুদ্রণ), পৃ. ২৮

عَنْ عُمَرَ رَاٰنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرَ لاَ تَبُلْ قَائِمًا–

অর্থ: ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন, হে ওমর! তুমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না।[১০০]

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সম্পর্কে ইসলামের এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষভাবে সমর্থন করে থাকে। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন-

(১) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে পেটের ওপর কোনো চাপ না পড়ায় দূষিত বায়ু বের হতে পারে না; বরং তা উপর দিকে ওঠে যায়। ফলে অস্থিরতা, রক্ত চাপ ও হৃদযন্ত্র বাড়ে এবং খাদ্যনালী দিয়ে বার বার হিক্কা আসতে থাকে।
(২) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাবের থলি সরু ও লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে এবং প্রস্রাবের দূষিত পদার্থগুলো থলির নিচে গিয়ে জমা হয়। অথচ বসে প্রস্রাব করলে প্রস্রাবের থলিতে চাপ লেগে সহজেই এসব দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়।
(৩) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(৪) দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাবের বেগ কমতে থাকে।
(৫) যারা নিয়মিত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে তাদের শেষ জীবনে ডায়াবেটিস, জন্ডিস ও কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি বেশি থাকে।
(৬) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে পুরুষের যৌনশক্তি কমতে থাকে এবং পুরুষাঙ্গ নরম হয়ে যায়।
(৭) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে পরিবেশ দূষিত হয়েএর প্রভাবে দেহে বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে।
(৮) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে পরিমাণের তুলনায় বেশি প্রস্রাব বের হয়, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।
(৯) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে এর ছিটা দেহে ও কাপড়ে লেগে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও প্রস্রাব হলো রোগ-জীবাণু মিশ্রিত একটি পরিপূর্ণ বিষাক্ত পদার্থ। যা অনেক সময় মূত্রদ্বারেরপুঁজ, রক্ত ও কিডনীতে ইনফেকশন জাতীয় রোগের কারণে প্রস্রাবের সাথে বিদ্যমান থাকে। আর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে এমব বিষাক্ত ছিঁটা শরীর ও কাপড়-চোপড়ে লেগে বিভিন্ন রোগ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

জ্যান্ট মিলন বলেন, আমার নিকট খোসা-পাঁচড়া, ফোঁড়া, চর্ম খসে যাওয়া, নিতম্বের আশপাশে এলার্জি এবং গোপন অঙ্গের ক্ষত ইত্যাদি রোগী আসলে তার কাছে আমার সর্বপ্রথম প্রশ্ন থাকে, তুমি কি প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকো? তন্মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশ লোকই প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকে না; যার কারণে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আমার নিকট আসে।

সুতরাং বর্তমানে আমাদের সমাজে প্যান্টের চেইন খুলে প্রস্রাব করে পানি দ্বারা পবিত্র না হয়েই আবার চেইন এঁটে দেয়ার যে প্রবণতা রয়েছে, এতেপ্রস্রাবের ফোঁটা শরীরে লেগে চর্মরোগসহ অন্যান্য অসংখ্য রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কিডনীতে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে।দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কারণে কিডনী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকায় প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব আসা, প্রস্রাব করতে কষ্ট হওয়াএবং বীর্য পাতলা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যা এক পর্যায়ে জীবনকে বিষয়ে তুলে। তাছাড়া দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা ব্যক্তিত্বহীন একটি ছেলেমী কাজও বটে।

১০০. *জামি আত-তিরমিযী* ,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ- দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা নিষেধ, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস নং- ১২

**হাত ধোয়া**

দশটি স্বভাবজাত আমলের মধ্যে হাত ধোয়া একটি অন্যতম আমল।আমরা সাধারণত খাওয়ার শুরু, শেষ এবং খাবার তৈরি ও পরিবেশন করার সময় হাত ধোয়াকে জরুরী মনে করলেও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরও যে হাত ধৌত করা উচিত তা অনেকে প্রয়োজনবোধ করি না। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে হাত ধোয়া ও হাত পরিষ্কার রাখা সুস্বাস্থ্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। হাত ধোয়ার অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরাট প্রভাব রাখে। সুস্থ থাকার প্রাথমিক শর্তই হলো সাবান বা অন্য যেকোনো এন্টিসেপটিক ব্যবহার করে সুন্দরভাবে হাত ধোয়া। অনেকেই এ বিষয়টি জানলেও বাস্তবে এর অনুসরণকারীর সংখ্যা অনেক কম। তাই বিশ্বব্যাপী সবাইকে হাত ধোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ও হাত ধোয়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী 'গ্লোবাল হ্যান্ড ওয়াশিং ডে' পালন করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসে পুরো পৃথিবী বিপর্যস্ত । প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। যদিও অনেক দেশ এর টীকা আবিষ্কার করেছে, তথাপি বিশ্বময় প্রতিটি মানুষের নিকট তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই এর মারাত্মক ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিরোধই সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে মনে করা হচ্ছে। আর তা করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমেই। ইসলাম মানুষকে সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তথা সর্বত্র পরিচ্ছন্ন জীবনের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ আরো ইরশাদ করেন: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[১০১]

বিশ্বজুড়ে খুব গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হচ্ছে, কোভিড-১৯ তথা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বারবার হাত ধোয়া। এই ভাইরাস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রথম উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে World Health Organization প্রতিটি মানুষকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (২০ সেকেন্ড) সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ওপর জোর দিচ্ছে। কারণ ভাইরাসটির বাইরের দিকে একটা চর্বির আবরণ রয়েছে, যা সাবানের ক্ষারে ভেঙে যায়। সে কারণে বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধৌত করলে হাতে লেগে থাকা জীবাণু দূর করা সম্ভব। এজন্য সারা পৃথীবীর সবাই এখন বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস করছে। যদিওহাঙ্গেরিয়ান চিকিৎসক ইগনাজ স্যামেলওয়াইজকে হাত ধোয়ার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে গিয়ে তাঁকে প্রায় খুন করা হয়েছিল।

ডা. ইগনাজ স্যামেলওয়াইজ প্রথম এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেন। তিনি পিউপেরাল ফিভার, যা চাইল্ড বেড ফিভার নামে পরিচিত ছিল সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। ১৮৪৬ সালে তিনি একজন ফিজিশিয়ানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পিউপেরাল সেপসিস এর মধ্যে কানেকশন খোঁজার চেষ্টা করেন। ১৮৪০ সালে স্যামেলওয়াইজ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা সাধারণ হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে প্রসবকালীন নারীদের মৃত্যুর ওপর গবেষণা করতে গিয়ে এ বিষয়টি লক্ষ্য করেন। অত:পর ১৮৪৭ সালে স্যামেলওয়াইজ পুরুষ ডাক্তারদের প্রসূতি বিভাগে স্বাস্থ্যবতী মায়েদের পরীক্ষা করার আগে নিজেদের হাত এবং তাদের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ক্লোরিনেটেড লাইম দিয়ে ধোয়ারনির্দেশ দেন এবং এতে তিনি অবিশ্বাস্য ইতিবাচক ফলাফল পান। ঐ বিভাগে মৃত্যুর হার ১৮.২৭ শতাংশ থেকে ১.২৭ শতাংশে নেমে এল। শুধু তাই নয়, ১৮৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে একজন নারীরও মৃত্যু হলো না। ডা. স্যামেলওয়াইজ এরপর হাত ধোয়ার উপকারিতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন এবংতিনি এই নতুন পদ্ধতি সে সময়ের অনুমোদিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে নিয়ে গেলে তাঁর সহকারীরা এই ভেবে প্রত্যাখ্যান করেন যে ডা. স্যামেলওয়াইজ তত্ত্ব মেনে নেয়ার অর্থই হল তারা অর্থাৎ চিকিৎসকরাই রোগীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। ভিয়েনা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষও তাঁর হাত ধোয়ার তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে। উদ্বিগ্ন ডা. স্যামেলওয়াইজ চিকিৎসকদের কাছে খোলা চিঠি লেখলেন এবং হাঙ্গেরিতে ফিরে এসে ১৮৬১ সালে হাত ধোয়া নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করলেন। কিন্তু এতেও কোন লাভ হল না। জীবাণু তত্ত্ব বিষয়টি তখনো সেভাবে

১০১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৯ (অষ্টম সংস্করণ), অধ্যায়: ২, শিশু-কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম, অনুচ্ছেদ: পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, পৃ. ১৭২

প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সে সময়ের সায়েন্টিফিক সোসাইটির লোকজন বিশ্বাস করতো রোগ বালাই হয় খারাপ আত্মার মাধ্যমে।

অবশেষে ডা. স্যামেলওয়াইজ মরিয়া হয়ে সকল গাইনি এন্ড অবসের ডাক্তারদের চিঠি লেখতে শুরু করলেন, তারা যেন হাত ও ইনস্ট্রুমেন্টস ধুয়ে কাজ আরম্ভ করে, এতে জীবন বাঁচবে। যেকোনো আড্ডাতে ডাক্তার বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময়ও তিনি এই হাত ধোয়ার থিওরি তুলে ধরতেন। এতে সবাই বিরক্ত হতো। হাত ধোয়ার কথা বলার কারণে তখনকার সব চিকিৎসকরা তাঁকে 'পাগল' বলে আখ্যা দেন। অপরদিকে ডা. স্যামেলওয়াইজ হাত ধোয়া নিয়ে হাসাহাসি করা লোকজনদের 'ইরেসপনসিবল মার্ডারার' বলতেন। সবাই তাঁকে পাগল বলার কারণে আস্তে আস্তে তিনিও ডিপ্রেশনে ভুগতে লাগলেন। অত:পর ১৮৬৫ সালে নার্ভাস ব্রেকডাউনের কারণে তাঁকে 'মেন্টাল এসাইলামে' দেয়া হলো। কেউ বললো, তাঁর 'নিউরো সিফিলিস' হয়েছে এবং কেউ বলল, 'বদ আত্মা' ভর করেছে। মাত্র ১৪ দিন পর মেন্টাল এসাইলামের গার্ডরা তাঁকে প্রচন্ড পেটানোর ফলে তাঁর হাত ও শরীরে ক্ষত হয় এবং এই ক্ষত থেকে পচন ধরে তাঁর ডান হাতে গ্যানগ্রিন হয়। অত:পর রক্তের বিষক্রিয়া হয়ে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ১৩ আগস্ট ১৮৬৫ সালে তিনি মারা যান।

অত:পর ডা. ইগনাজ স্যামেলওয়াইজের মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পর বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক জোসেফ লিসার সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে হাত ধোয়া ও ইনস্ট্রুমেন্টস জীবাণুমুক্ত করার ওপর জোর দিলেন। চিকিৎসকরা ১৮৭০ সাল থেকে এ পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। ডা. ইগনাজ স্যামেলওয়াইজের কাজ লুই পাস্তরের জীবাণু তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি বলা হলেও মহান এই মানুষটি মৃত্যুর শেষকৃত্যে মাত্র দুই থেকে তিনজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কথা 'হাংগেরিয়ান মেডিক্যাল সোসাইটি' তাদের পেপারে প্রকাশ পর্যন্ত করেনি।

হাত ধোয়ার মতো সাধারণ ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে একজন চিকিৎসককে একঘরে এবং উন্মাদ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনটাও দিতে হয়েছিল সেদিন, যা বর্তমানে বার বার হাত ধোয়া আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের যুগে দাঁড়িয়ে সে কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয় বৈকি। এটাই ইতিহাসের নির্মম সত্য। যদিও জীবাণু তত্ত্ব অর্থাৎ রোগের উৎপত্তি জীবাণু থেকে হতে পারে এ কথাটি আবিষ্কারের অনেক বছর পর তাঁর স্বীকৃতি মেলে।

আসলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জীবাণু ছড়ানোর বিষয়টি মানুষের জানাই ছিল না। সে সময় হাত ধোয়ার প্রচলনটা ছিল সেরেমোনিয়াল। ওয়াশরুম থেকে এসে, খাওয়ার আগে, কোনো নোংরা জিনিস ধরার পরে, এমনকি কোনো ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউর কিংবা ওটির আগে ডাক্তারগণও হাত ধুতেন না। অথচ আজ থেকে প্রায় দেড়হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষকে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরও হাত ধোয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কারণ নিদ্রাকালীন হাত কিসের সাথে লেগেছে তা জানা থাকে না।[১০২] অনেক সময় ঘুমের অচেতন অবস্থায় নিজের হাত লজ্জাস্থান, পায়খানার রাস্তা এবং শরীরের ক্ষতসহ বিভিন্ন জায়গায় চুলকানোর ফলে নখের ভেতর নানা ধরনের রোগ-জীবাণু লেগে থাকে।এই জীবাণুযুক্ত হাত খাবার বা পানি স্পর্শ করলে খুব সহজেইতা বিষাক্ত হয়ে অসংখ্য রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন মারাত্মক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ইসলাম নিদ্রা থেকে ওঠার সাথে সাথে হাত ধোয়ার পরামর্শ দিয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اِسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَاِنَّه لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন তার হাত তিন বার ধৌত করার পূর্বে পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানে না ঘুমানোর পর তার হাত শরীরের কোন কোন স্থানে বিচরণ করেছে।[১০৩]

১০২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

১০৩. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে হাত ডুবিয়ে দেয়া মাকরূহ, খ. ২, পৃ. ৮৫ ,হাদীস নং- ৬৪৩

সুতরাং হাত পরিষ্কার রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস, যার মাধ্যমে সহজেই অসুস্থতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের পরিচিত অনেক রোগই পরিষ্কার পানি আর সাবান দিয়ে হাত না ধোয়ার কারণে ছড়ায়। মানুষ এবং অন্যান্য পশুর বিষ্ঠায় সালমোনেলা, ই-কোলাই এবং নোরোভাইরাসের মতো জীবাণু থাকে, যা ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ। শুধু তাই নয়, এগুলো শ্বাসনালীর সংক্রমণ (যেমন এডিনোভাইরাস এবং হ্যান্ড-ফুট-মাউথ) রোগেরও কারণ। তাই টয়লেট ব্যবহারের পর ভালভাবে হাত না ধোয়ার কারণে সাধারণত জীবাণু সবচেয়ে বেশি ছড়ায়। এ ধরনের জীবাণু বাচ্চাদের ডায়াপার বদলানোর পর ভালোভাবে হাত না ধুলে, দুষিত কোনো কিছু স্পর্শ করলে এবং অধিক সময় কাঁচা মাংস নিয়ে কাজ করলেওমানুষের হাতে আসতে পারে।আর হাতে লেগে থাকা এসব জীবাণু যদি ভালভাবে ধুয়ে না ফেলা হয় তাহলে শুধু বাহক নয়; বরং তার সংস্পর্শে যেই আসবে সবাই সংক্রমিত হতে পারে।

**কখন হাত ধোয়া উচিত**

হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধোয়ার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত অবস্থায়ও হাত ধোয়া উচিত-

* খাওয়ার আগে ও পরে, খাবার তৈরি করার আগে, মাঝখানে ও পরে, অসুস্থ কারো সেবা করার আগে ও পরে, শরীরের কাটা, ছেড়া বা ক্ষতস্থান চিকিৎসা করার আগে ও পরে, প্রস্রাব-পায়খানা করার পর, বাচ্চাদের ডায়াপার বদলানো বা পায়খানা পরিষ্কার করার পর, নাক ঝাড়া ও হাঁচি দেয়ার পর, কোনো পশুপাখি বা এর খাবার ও বিষ্ঠা ধরার পর, পোষা জীব-জন্তুর খাবার ধরার পর, যেকোনো নোংরা ও আবর্জনা ধরার পর।

**হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি**

* প্রথমে পরিষ্কার পানিতে হাত ভেজানো, অত:পর হাতে সাবান নেয়া,  হাতে হাত ঘষে ফেনা তৈরি করা, আঙ্গুলের ফাঁকে ও নখের ভেতর পরিষ্কার করা, অন্তত ২০ সেকেন্ড হাত ঘষে পরিষ্কার করা, পরিষ্কার চলমান পানিতে হাত ভালভাবে ধুয়ে নেয়া, সবশেষে পরিষ্কার তোয়ালে বা টিস্যু দিয়ে হাত মুছা অথবা বাতাসে শুকিয়ে নেয়া।

**নিয়মিত হাত ধোয়ার উপকারিতা**

* মানুষ প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে নিজের চোখ, নাক বা মুখে হাত দেয়। এভাবে হাত দেয়ার কারণে হাতে লেগে থাকা জীবাণু শরীরে খুব সহজে প্রবেশ করতে পারে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে নিয়মিত হাত ধুলে এসকল জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।
* হাত না ধুয়ে খাবার তৈরি বা পরিবেশন করলে হাতে লেগে থাকা জীবাণু খুব সহজেই খাবারে প্রবেশ করতে পারে। এমনকি কিছু পরিবেশে অনেকক্ষণ থাকলে খাবারের সেই জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে বহুগুণে বেড়ে যেতে পারে। অত:পর উক্ত খাবার খেয়ে মানুষ অসুস্থ হতে পারে।
* হাত থেকে জীবাণু অন্যান্য জিনিসপত্রেও ছড়িয়ে যেতে পারে। যেমনঃ সিঁড়ির রেলিং, টেবিল, খেলনা, কাপড় এবং খাবার ইত্যাদি।
* কিছুক্ষণ পর পর হাত ধোয়া ডায়রিয়া, শ্বাসনালীর সংক্রমণ, ত্বক ও চোখের সংক্রমণ থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত হাত ধোয়ার কারণে শতকরা ৩১ ভাগ ডায়রিয়া সংক্রমণ কমায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে পেটের যেসকল রোগ হয় তা শতকরা ৫৮ ভাগ কমায় এবং শ্বাসনালীর সংক্রমণ ঠাণ্ডা-ফ্লু ইত্যাদি কমায় শতকরা ১৬ থেকে ২১ ভাগ।

**দৈহিক সুস্থতায় চুল পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা**

চুল মানব শরীরের সৌন্দর্যের অন্যতম একটি অংশ হওয়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই চুলের যত্ন নিয়ে থাকে। সবার চুলের ধরন সমান না হওয়ার কারণে চুলের যত্নে রয়েছে ভিন্নতা। শরীরের মত চুলেরও পুষ্টির প্রয়োজন আছে। সঠিক পুষ্টি ও পরিচর্যা না পেলে চুল লম্বা, শক্ত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয় না। ফলে চুলের ত্বকে বিভিন্ন রোগ, চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং ছত্রাকের আক্রমণে চুল নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিন পর পর যদি চুল পরিষ্কার করা না হয়, তাহলে ক্রমান্বয়ে মাথার খুলি আদ্র হয়ে চুলের গোড়াকে দুর্বল করে দেবে এবং খুব তাড়াতাড়ি চুল পড়ে যাবে। প্রতিদিন আমাদের মাথায় কমপক্ষে পঞ্চাশটি চুল নতুন করে গজায় এবং সমপরিমাণ চুল পড়ে। চুল পড়া কমাতে পারলে আমাদের মাথা ঘন চুলে

ভরে যাবে। সুতরাং নিয়ম করে চুল আঁচড়ানো, চুলে শ্যাম্পু ও তেল দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশনা হলো– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرُ فَلْيُكْرِمْهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যার মাথায় চুল থাকে, সে যেনো এর পরিচর্যা করে।[১০৪] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ دَارِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَحُكُّ رَاْسَهُ بِالْمِدْرٰى–

অর্থ: সাহল ইবন সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন লোক একটি ছিদ্র পথ দিয়ে নবী কারীম (সা.)-এর ঘরে উঁকি মারে। নবী কারীম (সা.) তখন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন।[১০৫] হাদীসে আরো আছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَا حَائِضُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিয়েছি।[১০৬]

عَنْ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اِذَا اَرَدْتُّ اَنْ اُفَرِّقَ رَاْسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَعْتُ الْفِرْقَ مِنْ يَّافُوْخِهِ وَ اُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাথায় সিঁথি কাটার ইচ্ছা করতাম, তখন আমি তাঁর চুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করতাম এবং কপালের চুলকে নাক বরাবর তাঁর চোখের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিতাম।[১০৭]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَفَرَأَى رَجُلاً ثَائِرَ الرَّاْسِ فَقَالَ اَمَا يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ–

অর্থ: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) আমাদের নিকট আগমন করে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার মাথার চুল এলোমেলো। তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না, যা দিয়ে সে তার মাথার চুল বিন্যস্ত করে নেবে?[১০৮]

সুতরাং হাদীসের নির্দেশনা ওবর্ণনার আলোকে চুলের সঠিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরী।

**সঠিক নিয়মেচুল আঁচড়ানো**

বারবার চুল আঁচড়ালে চুল ভালো থাকে, এই ধারণাটি ভুল। চুলের সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য দৈনিক ১০০ বারের অধিক চিরুনি দিয়ে ব্রাশ করা উচিত নয়। বারবার এবং খুব জোরে চুল আঁচড়ালে চুল ছিঁড়ে যায় বা শিকড়সহ ওঠে আসতে পারে। এছাড়া চুল অতিরিক্ত ব্রাশ করার কারণে বাইরের চকচকে আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ এ বাহ্যিক আবরণটিই চুলের প্রতিরক্ষার কাজ করে থাকে। চুলের বাহ্যিক আবরণ মাথার ঘর্মগ্রন্থি থেকে নি:সৃত তৈলাক্ত পদার্থের সাহায্যে চুলের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখার চেষ্টা করে। ফলে চুলের ওপর আলো পড়লে চুল ঝলমলে দ্যুতি ছড়িয়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের উপস্থিতি প্রমাণ করে। কিন্তু বারবার ব্রাশ করলে চুলের বাহ্যিক আবরণে ঘর্মগ্রন্থি নি:সৃত তৈলাক্ত পদার্থ যথার্থ মাত্রায় বিস্তৃতি লাভের সুযোগ না পাওয়ায় চুলের ওপর আলো প্রতিফলিত হতে পারে না বলে চুল নিষ্প্রাণ ও রুক্ষ দেখায়। চুলের বাহ্যিক আবরণের এ ক্ষতি একপর্যায়ে চুলের শাঁসও আক্রান্ত হতে পারে। ঘন ঘন চুল ব্রাশের কারণে মাথার ত্বকে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থি মাত্রাতিরিক্ত উদ্দীপ্ত হয়ে 'সেবাম' নামক তৈলাক্ত পদার্থেরও বাড়তি নি:সরণ ঘটায়। এ তৈলাক্ত পদার্থে চুল সিক্ত হয়ে নেতিয়ে যাওয়ায় চুল আঠালো ও চুপসানো দেখায়। খুশকি থাকা অবস্থায় বারবার মাথা আঁচড়ালে মাথার ত্বকে 'সেবোরিক ডার্মাটাইটিস' নামক খুশকিজনিত প্রদাহ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এ প্রদাহ থেকে মাথায় সোরিয়াসিস ও অ্যাকজিমা হতে পারে।

---

১০৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিরুনি করা, অনুচ্ছেদ: চুল পরিপাটি করে রাখা, খ. ২, পৃ. ২২০, হাদীস নং- ৪১৬৩

১০৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: চিরুনি করা, খ. ২, পৃ. ১৬৭৩, হাদীস নং -৫৯২৪

১০৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা আঁচড়িয়ে দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬৭৩, হাদীস নং -৫৯২৫

১০৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিরুনি করা, অনুচ্ছেদ: সিঁথি কাটা, খ. ২, পৃ. ২২৩-২২৪, হাদীস নং- ৪১৮৯

১০৮. *সুনানু নাসাঈ*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: চুল বিন্যস্ত রাখা, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং- ৫২৩৬

চুল রুক্ষ হলে বা ময়লা জমে গিয়ে জট পড়তে পারে। এজন্য কখনো গায়ের জোরে টেনে টেনে জট ছাড়ানো উচিত নয়। ধৈর্যের সাথে চুলের জট ছাড়াতে হবে, তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাড়াহুড়া করলে শুধু চুল ছিঁড়েই যায় না, অনেক সময় চুলের গোড়াও উপড়ে যায় এবং চুল স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই চুলের গোড়ার দিক থেকে জট ছাড়াতে শুরু না করে নিচের দিক থেকে ছোট ছোট অংশে চুল নিয়ে আঁচড়ে জট ছাড়াতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে হবে। তাই হাতে সময় নিয়ে চুল আঁচড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে চুলের জট ছাড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, গোসল করার পর ভেজা চুল সবচেয়ে নাজুক থাকার কারণে চুলের ফলিকল খোলা থাকে। এ সময় চুল আঁচড়ালে বা কোনো স্টাইলিং-এর চেষ্টা করলে চুল ভেঙে গিয়ে চুল পড়ার সমস্যা বাড়ায়। এজন্য চুল আঁচড়ানো বা স্টাইলিংয়ের আগে চুল শুকিয়ে নিতে হবে। তবে কোঁকড়া বা ওয়েভি চুল স্বাভাবিকভাবেই বেশি শুষ্ক প্রকৃতির হয়। শুকনো অবস্থায় এই চুল আঁচড়ালে চুল ভেঙে ঝরে যেতে পারে এবং চুলের ডগাও ফেটে যেতে পারে। এ ধরনের চুল একটু ভিজিয়ে আঁচড়ানোই ভালো।

যদিও অনেক হাদীসে প্রদিতিন চিরুনি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কেউ চুলের যত্ন ও পরিচর্যা করতে গিয়ে প্রতিদিন চিরুনি করলে সে হাদীসের বিপরীত কাজ করেছে। মূলত প্রতিদিন চুল আঁচড়ানো যেনো বিলাসিতার জন্য না হয়, সেজন্যই নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاِرْفَاهِ سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الْاِفْرَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُّلُ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। উবায়দ নামক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এক সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিলাসিতা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন, চুল আঁচড়ানোও এর অন্তর্গত।[১০৯] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَامَرَهُ اَنْ يُّحْسِنَ اِلَيْهَا وَ اَن يَّتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ–

অর্থ: আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মাথায় অধিক চুল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: কেশ বিন্যস্ত করে রাখবে এবং প্রত্যহ চিরুনি করবে।[১১০]

### ভালো মানের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো

চুলের যত্নে সঠিক চিরুনি বেছে নেয়া খুবই জরুরি। একই চিরুনি সব ধরনের চুলের জন্য মানানসই নয়। তাই চুল বিশেষজ্ঞদের মতে, নিজের চুলের জন্য উপযুক্ত চিরুনি দিয়ে নিয়মিত চুল আঁচড়ালে চুল বশে থাকার পাশাপাশি সুন্দরও থাকবে। বড় দাঁতের কাঠের চিরুনি অথবা কচ্ছপের খোলস দিয়ে তৈরি চিরুনি ব্যবহার করা উত্তম। প্লাস্টিক বা লোহার চিরুনি ব্যবহার না করাই ভালো। চিরুনির নিচের প্রান্ত যেন সরু না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোঁকড়া চুলের জন্য মোটা দাঁড়ার চিরুনি, লম্বা চুলের জন্য প্যাডল ব্রাশ, কার্লি বা ঘন চুলের জন্য পিন ব্রাশ এবং অন্যান্য পাতলা ও সূক্ষ্ম চুলের জন্য নরম ও নমনীয় দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করা উচিত। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে হাতীর দাঁতের চিরুনি ব্যবহারের প্রচলন ছিল বলে হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর আযাদকৃত গোলাম হযরত ছাওবান (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন–يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِّنْ عَصْبٍ وَ سِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ

অর্থ: হে ছাওবান! তুমি ফাতিমার জন্য একটি ইয়ামানের চাদর এবং হাতীর দাঁতের দু'টি চিরুনি কিনে দাও।[১১১]

প্রথমে মাথার উপর চিরুনি বসিয়ে টেনে চুলের নিচের অংশ যাকে আমরা আগা বলি সেই পর্যন্ত নামাতে হবে। এভাবে ডান পাশ থেকে শুরু করে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাম পাশে যেতে হবে এবং পুনরায় বাম পাশ থেকে ডান পাশে আসতে হবে। এভাবে দিনে ৭০ বার চুলে ব্রাশ লাগিয়ে আঁচড়ানো, অত:পর সমস্ত চুল উঠিয়ে মাথা সামনের দিকে ঝুকিয়ে গোড়া থেকে শুরু করে আগা পর্যন্ত টেনে টেনে ৩০ বার ব্রাশ করা। এভাবে সারাদিনে ৩/4 বারে মোট একশত বার ব্রাশ করা উত্তম। এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন চুল আঁচড়ালে চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে এবং ময়লা জমতে পারে না। খুলির চুল আঁচড়ানো

---

১০৯. *সুনানু নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: চুল আঁচড়ানো, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং- ৫২৩৯

১১০. *সুনানু নাসাঈ*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: চুল বিন্যস্ত রাখা, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং- ৫২৩৭

১১১.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিরুনি করা, অনুচ্ছেদ: হাতীর দাঁত ব্যবহার, খ. ২, পৃ. ২২৬-২২৭, হাদীস নং- ৪২১৩

এমন একটি ব্যায়াম যা চুল গজানোর হার বাড়ায় এবং যথানিয়মে চুল আঁচড়ালে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পেয়ে চুল দীর্ঘায়ু হয়।

**চুলের যত্নে শ্যাম্পু**

চুল পড়া বন্ধ করার পাশাপাশি চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমরা শ্যাম্পু ব্যবহার করে থাকি। প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে চুল রুক্ষ হয়ে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই নিয়ম করে শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার এবং সপ্তাহে একদিন হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার চুল শ্যাম্পু করার ফলে মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল চুলে প্রবেশ করে চুল হাইড্রেট রাখে। তবে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ও হেয়ার মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। কয়েক দিন পরপর বাজারে নতুন নতুন কনসেপ্ট নিয়ে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ও হেয়ার মাস্ক আসে এবং সুপার পাওয়ারের মাধ্যমে চুলে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসার শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ড চটকদার বিজ্ঞাপনও দেয় হাজার বার। এসব বিজ্ঞাপনে অভিভূত হয়ে যেকোন শ্যাম্পু এবং চুলের অন্যান্য আইটেম ব্যবহার করা যাবে না। ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে অথবা অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে হবে নিজের চুলের জন্য কোনটি উপযোগী এবং সেটিই ব্যবহার করতে হবে। ঘন ঘন শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ও হেয়ার মাস্ক পরিবর্তন করা যাবে না। বারবার এগুলো পরিবর্তন করা চুলের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হেয়ার এক্সপার্টদের মতে, ঘন ঘন শ্যাম্পু পরিবর্তন করলে মাথার ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে চুল পড়া বেড়ে যেতে পারে এবং স্ক্যাল্পে চুলকানি হতে পারে। চুলের জন্য কোনো প্রোডাক্ট ক্রয়ের পূর্বে এর উপাদানগুলো অবশ্যই দেখে নিতে হবে। কিছু অ্যালকোহল চুলের ক্ষতি করে, আর কিছু অ্যালকোহল চুলের জন্য ভালো। যেমন চুলের ক্ষতিকর কিছু অ্যালকোহল হল- প্রোপাইল অ্যালকোহল, ইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, প্রোপানল, এসিড অ্যালকোহল, ডিনাট অ্যালকোহল ইত্যাদি। এগুলো চুল শুষ্ক ও রুক্ষ করে দেয়। আবার সিটাইল অ্যালকোহল চুলে কন্ডিশনারের কাজ করে। নানা কারণে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় চুল শ্যাম্পু করার সময় পাওয়া যায় না। ফলে অনেকে ড্রাই শ্যাম্পুর ওপর ভরসা করে। মাঝেমধ্যে ড্রাই শ্যাম্পু করলে সমস্যা নেই, কিন্তু ঘন ঘন এর ব্যবহার স্ক্যাল্পের ক্ষতি করে। ড্রাই শ্যাম্পু চুল পরিষ্কার করতে পারে না, এটা শুধু স্ক্যাল্প থেকে সব ময়েশ্চার শুষে নেয়। এতে মাথার ত্বক ড্রাই হয়ে যায়। ড্রাই শ্যাম্পুর অত্যধিক ব্যবহার করার দ্বারা চুলের গোড়া ক্ষতি করে চুল পড়া বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি চুলের বৃদ্ধিও কমিয়ে দিতে পারে।

**মাথায় তেল ব্যবহারের সঠিক নিয়ম**

মাথায় তেল ব্যবহার করার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। নিয়মিত মাথায় তেল ম্যাসাজ করার দ্বারা চুল দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি চুলকে প্রয়োজনীয় শক্তিও দেয়। মাথায় তেল দেয়াকে কার্যকরী করে তুলতে সঠিক নিয়মগুলো হলো-

(১) তেল দেয়ার আগে কিছুটা গরম করে নেয়া। মাথার তালুতে কুসুম গরম তেল ব্যবহার করলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

(২) সাধারণ নারকেল তেলের সাথে কয়েকটি এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নেয়া যায়। নতুন চুল গজানোর জন্য ক্যাস্টার অয়েল এবং রিল্যাক্সের জন্য ল্যাভেন্ডার অয়েল মেশানো খুবই কার্যকরী।

(৩) তেল দেয়ার পর হালকা হাতে চুল ম্যাসাজ করতে হবে। বেশি জোড়ে ম্যাসাজ করলে চুল আরো বেশি জট বেঁধে যাবে এবং চুল ছিঁড়ে যাবে।

(৪) লম্বা চুলে তেল দেয়ার পর হালকাভাবে চুল বেঁধে নিতে হবে। খুব বেশি শক্ত করে চুল বাঁধলে এর আগা ফেটে যায়। তাই কিছুটা ঢিলে করে বেনী বেঁধে নেয়াই ভালো।

(৫) সাধারণত সবাই চুলে তেল দেয়ার পর আঁচড়ে থাকে। কিন্তু তেল দেয়ার আগেই চুল আঁচড়ানো উত্তম।

(৬) তেল দেয়ার পর কমপক্ষে এক ঘন্টা অপেক্ষা করা উচিত। অত:পর শ্যাম্পু দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় তেল সারা রাত মাথায় রেখে পরের দিন শ্যাম্পু করে নেয়া।

**চুল সুন্দর ও সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত কিছু বিধি-নিষেধ**

* চুল উপযোগী ভাল ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু ব্যবহার করা এবং একই সাথে কয়েক ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু বা কন্ডিশনার ব্যবহার না করা।

* প্রতিদিন শ্যাম্পু ব্যবহার না করে সপ্তাহে ২/৩ বার শ্যাম্পু ব্যবহার করা। চুলে শ্যাম্পু দিয়ে সাথে সাথে না ধুয়ে এক/দুই মিনিট অপেক্ষা করা।

* চুলের ভেতরে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মাথার ত্বকে স্ক্রাব বা আলতুভাবে ঘষে-মেজে শ্যাম্পু করা এবং ভালভাবে পানি দিয়ে মাথা এমনভাবে ধৌত করা যাতে শ্যাম্পু অবশিষ্ট না থাকে। অত:পর একইভাবে কন্ডিশনার ব্যবহার করা।

* চুল উপযোগী ভালো মানের চিরুনি ব্যবহার করা, যেকোনো চিরুনি দিয়ে চুল না আঁচড়ানো।

* প্রতিদিন ৩/৪ বার চুল আঁচড়ানো। তবে সব মিলিয়ে দৈনিক চুলে ১০০ বারের অধিক যেন ব্রাশ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা এবং তা যেন বিলাসিতার জন্য না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা।

* মাথা ধোয়ার পর চুল না আঁচড়িয়ে ধোয়ার আগে চুল আঁচড়ানো।

* তাড়াহুড়া করে হ্যাঁচকা টান দিয়ে চুলের জট না ছাড়ানো। ধৈর্যের সাথে হাতে সময় নিয়ে আস্তে আস্তে অল্প করে চুল নিয়ে জট ছাড়ানো।

* কোঁকড়ানো বা ওয়েভি চুল আঁচড়ানোর পূর্বে একটু ভিজিয়ে নেয়া।

* ঘুমানোর পূর্বে চুল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নেয়া। ভিজা চুল নিয়ে না ঘুমানো।

* সুইমিং পুলের রাসায়নিক মিশ্রিত পানির কারণে চুল যাতে দুষিত না হয়, সেজন্য নামার আগেই অন্য পানি দিয়ে চুল ভিজিয়ে নেয়া।

* সবসময় গোড়া শক্ত করে চুল না বাঁধা।

* চুল পড়তে থাকলে চুলে তেল দেয়া বন্ধ রাখা।

* চুলে হিট দেয়া এবং হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানো বন্ধ করা।

* সূর্যের তাপ পরিহার করা।

* মাথা ধৌত করার পর তেল না দিয়ে ধৌত করার কমপক্ষে এক ঘন্টা পূর্বে চুলে তেল দেয়া। তবে রাত্রে তেল দেয়া উত্তম এবং এক দিনের বেশি সময় তেল মাথায় না রাখা। এছাড়া তৈলাক্ত চুলে সূর্যের কিরণ না লাগানো।

সুতরাং নিস্তেজ চুল, খুশকি এবং অতিরিক্ত চুল পড়া চুলের জন্য অনেক বড় সমস্যা। এসকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ও চুল সুস্থ রাখতে হলে চুলের পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য বিধির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং চুলের বিভিন্ন দুর্দশা থেকে চুলকে রক্ষা করতে হলে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণপূর্বক চুল আঁচড়ানোর কৌশলও অনুসরণ করতে হবে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মানব জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব হওয়ার কারণে একাকী চলতে পারে না।তাকে সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে হয়। এজন্য পারিপার্শ্বিক সকল দিক সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখা মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য পশু-পাখি ও প্রাণির ন্যায় যেভাবে ইচ্ছা মানুষ জীবন-যাপন করতে পারে না বিধায় নিজের স্বার্থেই পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে। সুতরাং মানব বসতীকে সর্বপ্রকার দূষণমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরি করা, মানুষের চলাচলের পথ পরিচ্ছন্ন রাখা এবংঘুমানোর বিছানা ঝাড়াইত্যাদি মানুষের একান্ত কর্তব্য। দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) জোর তাকীদ দিয়েছেন এবং চলাচলের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু ও ময়লা-আর্বজনা দূরীভূত করাকে তিনি ঈমানী কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।তাই স্বাস্থ্য রক্ষায় পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানব জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِىْ حَسَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ طَيِّبُ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفُ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمُ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادُ يُحِبُّ الْجُوْدَ، فَنَظِّفُوْا اَرَاهُ قَالَ اَفْنِيَتَكُمْ وَ لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ–

অর্থ: সালিহ ইবন আবু হাসসান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা পবিত্র, পবিত্রতা তিনি ভালবাসেন; তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি ভালবাসেন; তিনি দয়ালু, দয়া তিনি ভালবাসেন; তিনি দানশীল, দানশীলতা ভালবাসেন। রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন, তোমাদের ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইয়াহুদীদের মতো হয়ো না।[১১২]

**বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ না করা**

আমাদের জন্য পানি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি অন্যতম নিয়ামত। পানি ছাড়া পৃথিবীর সকল প্রাণির জীবনই অচল। পান করা ও পাক-পবিত্র হওয়া থেকে শুরু করে মানুষের জীবন ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পানি ছাড়া যেন এক মুহূর্ত চলে না। সারাবিশ্বে বিশুদ্ধ পানির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন উপায়ে পানি পেয়ে থাকি, যেমন- সাগর, নদী-নালা, খাল-বিল-ঝিল, পুকুর, কূপ, হ্রদ, ঝর্ণা এবং বৃষ্টির পানি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রবাহমান, তা নি:সন্দেহে পবিত্র। আর যে সমস্ত পানি পুকুর বা হাউজে আবদ্ধ থাকে, তা যদি ১০X১০ তথা ১০০বর্গফুট বড় হয় (ফিকাহবিদগণের পরিভাষায় যাকে দাহ্ দার দাহ্ বলা হয়) তাহলে ঐবদ্ধ পানিকেও পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। মূলত বদ্ধ পানি পবিত্র থাকার শর্ত হল- পানির রং, গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তন না হওয়া। সে হিসেবে বলা যায়- পানির পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং মাটি বা অন্য কিছুর সংমিশ্রণের দ্বারা পানির আসল অবস্থায় পরিবর্তন না আসে, তাহলে তা পবিত্র। তাই পানি যেন অপবিত্র না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لاَ يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ–

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: তোমাদের কেউ যেন স্থির তথা যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো প্রস্রাব না করে। পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।[১১৩] অন্য হাদীসে এসেছে – عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّكِدِ–

অর্থ: জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বদ্ধ পানিতে প্রশ্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[১১৪]

যদিও হাউজ বা পুকুরের স্থির পানিতে প্রস্রাব করার কারণে পানির রং বদলায় না, স্বাদ নষ্ট হয় না এবং দুর্গন্ধও সৃষ্টি হয় না, এমনকি শরীয়তের দৃষ্টিতে এই পানি নাপাকও হয় না। তথাপি নবী করীম (সা.)-এর স্বভাবগত রুচিবোধ ও

---

১১২. *জামি আত-তিরমিযী* ,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খ. ২, পৃ. ২৯৪, হাদীস নং- ২৭৯৯

১১৩. *সহীহ আল-বুখারী* , প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: স্থির পানিতে প্রস্রাব করা, খ. ১, পৃ. ৭৬, হাদীস নং -২৩৯

১১৪. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ, খ. ২, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ৬৫৫

পরিচ্ছন্নতা এটাকে পছন্দ করেনি যে কেউ বদ্ধ অথবা প্রবাহমান পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করুক, আর তা অন্য লোকদের জন্য কষ্ট ও বিরক্তির উদ্রেক হোক। কোনো কোনো ধর্মের অনুসারীদের দেখা যায়, তারা গোসলের সময় পানিতে প্রস্রাব করাকে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মনে করে। এটা খুবই নির্লজ্জ কাজ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। কারণ পৃথিবীতে যত প্রকার রোগ আছে এর মধ্যে পানি বাহিত রোগ অত্যন্ত মারাত্মক এবং বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে। পানি বাহিত রোগ অন্য যেকোনো রোগ থেকে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রবাহমান পানিতেও প্রশ্রাব-পায়খানা করার কারণে এর জীবাণু অতি দ্রুত ও সহজে স্রোতের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে, আর বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করার কারণে তা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য মরণব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর দ্বারা পানিবাহিত রোগ যেমন-আমাশয়,ভাইরাস জন্ডিস, টায়ফয়েড, কলেরা, প্যারাসাইট এবং জন্ডিসসহ অসংখ্য রোগ দেখা দেয়। মানুষের প্রস্রাব-পায়খানা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ও ঘৃণিত পদার্থ, যা কারো নিকটই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এমন একটি নিকৃষ্টতম পদার্থকে মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও জরুরী পদার্থ তথা পানির মধ্যে ধারণ করা মোটেই সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ নয়। তাই মানব জাতির সবচেয়ে দরকারি বস্তু পানি যাতে বিশুদ্ধ থাকে এবং সবাই নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারে সেজন্য নবী কারীম (সা.) স্বাস্থ্য নীতির আলোকে এমন এক পদ্ধতি ইরশাদ করেছেন, যা একেবারেই নিখুঁত এবং নির্মল। শুধু আইনের ধারা রক্ষা করে চললেই জীবন সুখময় হয়ে ওঠে না এবং হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হয় না; বরং এর জন্য আরো এমন কিছু সতর্কমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যদ্দারা মানব জীবন অর্থবহ সুখের সন্ধান লাভ করতে পারে। আর এ সমস্ত সুন্দরতম এবং কল্যাণময় দিক-নির্দেশনামূলক পদক্ষেপ খুঁজে পাওয়া যায় নবী কারীম (সা.)-এর অমীয় বাণীসমূহে।

**স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারতৈরি করা**

মানব শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যথেচ্ছা বা অস্বাস্থ্যকর শৌচাগারে মলমূত্র ত্যাগ করা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাছাড়া অনেক টাকা খরচ করে নিজের ইচ্ছামত টয়লেট তৈরি করলেই যে তা স্বাস্থ্যসম্মত হবে এমনটি নয়। বরং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মলমূত্র ত্যাগে হাদীসে বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করাই মানব শরীরের জন্য অধিক উপকারি। যদিও ইট, পাথর ও কংক্রিটের বর্তমান যুগে ঐসব সনাতন পদ্ধতিসমূহ আমাদের নিকট বাস্তবে কঠিন বা অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে মানুষ যেখানে চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন করার স্বপ্ন দেখছে, সে তুলনায় মানব শরীর সুস্থ রাখার জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)কর্তৃক ব্যবহৃত ও বর্ণিত শৌচাগার ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা মোটেই অসম্ভব নয়। প্রয়োজন শুধু একটু মানসিকতা ও প্রচেষ্টা। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی اِنِّیْ کُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ یَّبُوْلَ فَاَتٰی دَمِثًا فِیْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُکُمْ اَنْ یَّبُوْلَ فَلْیَرْتَدْ لِبَوْلِهٖ مَوْضِعًا–

অর্থ: আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি প্রস্রাব করার ইচ্ছাপোষণ করেন। অত:পর তিনি একটি প্রাচীরের পাদদেশের নরম ঢালু জায়গায় গমন করে প্রস্রাব করলেন। উক্ত কাজ সেরে তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তোমাদের কেউ যখন প্রস্রাব করতে চায়, সে যেন নিচু নরম স্থান নিরূপণ করে।[১১৫]

বিশিষ্ট স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী লেভেন পাওয়েল উসূলে ছিহহাত নামক গ্রন্থে লিখেন, মানব জাতির জীবন-মরণ উভয়ই মাটিতে নিহিত রয়েছে। যখন থেকে আমরা মাটিতে মলত্যাগ করা ছেড়ে দিয়ে শক্ত জমিন তথা কমোড ইত্যাদি ব্যবহার আরম্ভ করেছি, তখন থেকেই পুরুষদের যৌন দুর্বলতা এবং পাথরী রোগ অধিক হারে দেখা দিয়েছে এবং এর প্রভাব প্রোস্টেট গ্রন্থিতেও পড়ছে।আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَرَةً اُخْرٰى

১১৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: প্রস্রাব করার স্থান নির্ধারণ করা, খ. ১, পৃ. ১২, হাদীস নং- ৩

অর্থ: আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে মাটিতে ফিরিয়ে নেব এবং আমি তোমাদেরকে পুনরায় মাটি হতেই বের করব।[১১৬]

মূলত মাটি কোমল ও উর্বর হওয়ায় মলমূত্রের জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) ও বিষাক্ত প্রভাবকে চুষে নেয়। আর মলমূত্রের জায়গা শক্ত বা পাকা হলে অদৃশ্য সৃষ্ট গ্যাস, বিষাক্ত প্রভাব এবং জীবাণু মানব শরীরে ফিরে এসে অসুস্থ করে তুলে। নরম মাটিতে মলমূত্রের ছিঁটা শরীর ও কাপড়ে লাগার কোনো সম্ভাবনা না থাকলেওআধুনিক কমোডে তা সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ-

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি ইঁটের ওপর তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।[১১৭]

মানুষ দিন দিন অধিক আরাম প্রিয় হওয়ায় দু'টি ইটের ওপর মলমূত্র ত্যাগের এই প্রাচীন পদ্ধতির শৌচাগার বাদ দিয়ে বর্তমানে কমোড ও ফ্লাশের প্রচলন শুরু করেছে। কমোডের উপর মানুষ শরীরের নিম্নাংশ বিছিয়ে চেয়ারের মত বসে। একজন রোগীর জন্য এ পদ্ধতি আরামদায়ক ও ফলপ্রসু হলেও সুস্থ মানুষের জন্যসবসময় এ পদ্ধতিতে মলমূত্র ত্যাগ করা মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এতে শরীরে নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এভাবে বসলে শরীরের সাথে সাথে অন্ত্রগুলোওবিশ্রাম নেয়া শুরু করে, পাগুলো পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয় না এবংউরুদ্বয়, বাহু যুগল ও দেহের উপরি অংশের চাপ নাড়ীর ওপর পুরোপুরি না পড়ায় নাড়ীর মুখ পূর্ণরূপে খোলে না। ফলেপায়খানাও ঠিক মত বের হয় না। অথচ হাদীসে আছে, মল ত্যাগের সময় বাম পায়ের ওপর একটু ভর দিয়ে বসা। কারণ আমাদের খাদ্যথলি বাম দিকে থাকায় বাম পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসলে খাদ্য থলিতে চাপ পড়েপায়খানার মুখ খুলে যায়। এতে মল খুব দ্রুত এবং সহজে বের হয়ে আসে, কিন্তু কমোডে বসলে সে সুযোগ থাকে না।

কমোড কয়েক প্রকার হয়ে থাকে, প্রতিষ্ঠিত এবংঅপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত কমোড কাজে লাগানো হয় যেখানে নগরবাসী ময়লা নিষ্কাশনের বিশেষ ধরনের পাইপ স্থাপন করে থাকে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে পারে। আর অপ্রতিষ্ঠিত কমোড ধাতুর পাইপ দ্বারা দেয়ালের উপরি অংশে লাগানো পানির হাউজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যার মধ্যে একটি শিকল কমোডের উপর উপবেশনকারীর উপর ঝুলন্ত থাকে। কাজ শেষে শিকল টানলে হাউজ থেকে তীব্রবেগে পানি পাইপ হয়ে কমোডের মধ্যে পড়ায় সমস্ত আবর্জনা বয়ে নিয়েনিচের ময়লার পাইপে ফেলে।হাউজটাওএমনভাবে বানানো হয়,কিছুক্ষণেরমধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেপানিতে ভরে যায়। এর মধ্যে আনুমানিক ৮/১০ লিটার পানি সব সময়ই থাকে। সেটা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আবার তা থেকে পানি সরানো সম্ভব। এ ধরনের কমোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন প্রিয় মানুষের ক্ষেত্রে অনেক পানির প্রয়োজন পড়ে। শুষ্ক এলাকায় যেখানে মানুষের খাবারের পানি সংগ্রহ করাই দুরূহ সেখানে এ ধরনের ব্যবস্থা করা অনেকাংশে অসম্ভব। আর যদি কেনো বিত্তবান ব্যক্তি নিজের অর্থবলে এ ব্যবস্থা করে, তবুও মানব জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় জিনিস তথা পানিকে এভাবে অপচয় করা ঠিক নয়।তবে এ ধরনের কমোডে বসে পবিত্রতা অর্জন করা সকলের জন্য সম্ভব নয়। শরীরের সংশ্লিষ্ট অঙ্গের পরিচ্ছন্নতার জন্য শুধুমাত্র টয়লেট পেপারই ব্যবহার করতে হয়। মাটি, কাপড়, তুলা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না। কারণ তা কমোডের ভেতরে পড়লে নিচের পাইপ বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের কমোড নির্মাণ করতে প্রয়োজন পড়ে হাজার হাজার টাকার, যা নিম্ন আয়ের লোকদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। পাশাপাশি টয়লেট পেপারেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্যও কিছু টাকা ব্যয় করতে হয়। তদুপরি কমোডের নিচের পাইপ বন্ধ হয়ে গেলে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও কমোড পরিচ্ছন্ন বিশেষজ্ঞ এনে পরিষ্কার না

---

১১৬. আল-কুরআন, ২০: ৫৫

১১৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: দুই ইঁটের ওপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা, খ. ১, পৃ. ৫৪, হাদীস নং -১৪৫

করলে তা অকেজো হয়ে পড়ে। হাউজে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা দিলে বা পানি সরবরাহ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে কমোড দুর্গন্ধে ভরে যায়। এ দুর্গন্ধ বাড়ি-ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে ।

দ্বিতীয় প্রকারের কমোড স্থানান্তরযোগ্য ও পার্ট খুলে পরিষ্কার করা যায়। এটিও ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যময় নয়। কেননা একবার ব্যবহারের পর পরিষ্কার না করে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং ঘরে উপযুক্ত ও যথেষ্ট পরিমাণ কমোড রাখতে হবে নতুবা একবার ব্যবহারের পর সাথে সাথে তা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রাখা উচিত। এমন কমোডের সাথে প্রস্রাবের জন্য পৃথক পাত্রেরও ব্যবস্থা করতে হয়। যার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন রয়েছে।এছাড়া বর্তমানে আরো অনেক উন্নত মানের এবং বহু ধরনের কমোডও রয়েছে।

আফ্রিকা ও এশিয়ার কোনো কোনো দেশে এমন কমোডের প্রচলন শুরু হয়েছে, যার উপর প্রাচীন পদ্ধতিতে পায়ের ওপর ভর দিয়েই বসতে হয়। এর উপরে ফ্লাশ করার হাউজ থাকে এবং এর উপরে বসেই পানি ব্যবহার করার ব্যবস্থা রাখা হয়। তাই এটা প্রথম প্রকারের তুলনায় পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে কিছুটা উন্নত। কিন্তু এর ব্যবস্থা করতে যথেষ্ট খরচ পড়ে এবং পানির অপচয় হয়। আর হাউজ, নালা, নর্দমা এবং পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলোও সৃষ্টি হয়।

যাহোক, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান কমোড পদ্ধতি অনেকের নিকট অস্বস্তিকর। বিশেষ করে যে সকল মুসলমান দেহ ও পোশাকে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতার স্পর্শ পছন্দ করে না, তারা এমন লাকড়ী বা ধাতুর একটি কাঠামোর উপর নিজের শরীর লাগিয়ে বসতে কোনোভাবেই রাজি হবে না,যার মধ্যে সর্বদা বহু মানুষের মলমূত্র পড়তে থাকে। সেটাকে যতই ধোয়া-মোছা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হোক না কেন।

হাদীসে এসেছে–عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ–

অর্থ: মুগীরা ইবন শোবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) যখন পায়খানায় গমন করতেন, তখন বহুদূর যেতেন।[১১৮]

বর্তমানে শহরে বা গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাসায় সংযুক্ত বাথরুম রয়েছে। যেখানে মলমূত্র ত্যাগ এবং অযু-গোসল একটি কক্ষেই সম্পন্ন করা হয়।অথচ বাথরুমকে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আঁতুরঘর বলা হয়। যেখানে অগণিত ক্ষতিকারক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব লিডসের এক গবেষণা অনুযায়ী জানা যায়, প্রতিবার ফ্লাশ করার সময় সি. ডিফিসিল নামক ব্যাকটেরিয়া প্যানের ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে ভেসে ওঠতে পারে এবং ৯০ মিনিট পর্যন্ত এরা জীবিত থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া অন্ত্রের প্রদাহ, ডায়রিয়া, মারাত্মক বমি এবং পেটের বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এসকল ব্যাকটেরিয়াবাথরুমের দেয়ালসহ প্রতিটি জিনিসে ছড়িয়ে থাকে। বাসস্থানের কক্ষের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে টয়লেটে গমনকৃত ব্যক্তির সাথে এসব ব্যাকটেরিয়া ঘরের ভেতর চলে আসে। তাই যতটুকু সম্ভব বাসস্থান থেকে টয়লেট দূরে স্থাপন করা এবং শৌচাগার ও অযু-গোসলের কক্ষ পৃথক রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর এজন্যই শৌচাগারে মাথা ও শরীর ঢেকে এবং পায়ে জুতা পরিধান করে যাওয়া সুন্নাত বলা হয়েছে। কেননা মাথার চুলের গোড়ায় রয়েছে শরীরের সবচেয়ে বেশি লোমকূপ, যেখান দিয়ে টয়লেটের ক্ষতিকর জীবাণুসমূহপ্রবেশ করে আমাদের মস্তিষ্ককে খুব সহজে আক্রমণ করার সুযোগ পায়। সুন্নাত হিসেবে মাথা ঢেকে শৌচাগারে গেলে সে সুযোগটি আর থাকে না। যেমন দেখা যায়, অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার ও নার্সসহ সকলকে মাথায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে। কারণ একটাই, আর তাহলো অপারেশন থিয়েটারের জীবাণুসমূহ যেন মাথার চুলের লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে আক্রমণ করতে না পারে। তেমনিভাবে সুন্নাত হিসেবে শরীর ঢেকে এবং পায়ে জুতা পরিধান করে শৌচাগারে প্রবেশ করলে শরীরের লোমকূপ এবং পায়ের তলার সরাসরি ছিদ্র দিয়ে জীবাণুসমূহ প্রবেশ করার সুযোগ না থাকায় আমাদের শরীর শৌচাগারের কুপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এছাড়া টয়লেট নাপাক ও নোংরা স্থান হওয়ায় প্রকৃত মুসলমানগণ একই কক্ষে অযু-গোসল করাকে পছন্দ করেন না। তারা শৌচাগার এবং অযু-গোসলের কক্ষ ভিন্ন ভিন্ন রাখার পক্ষে। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, ইসলামে অযু অনেক

১১৮.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: মলমূত্রের সময় নির্জনে গমন করা, খ. ১, পৃ. ১২, হাদীস নং- ১

বড় একটি ইবাদত এবং অযুর সময় হাদীসের বর্ণনানুযায়ী বহু দুআ-দুরূদ পড়ার নির্দেশনা রয়েছে। যা বাথরুমে অযু আদায় করার সময় পড়া সম্ভব নয়।যদিও তাবেঈ ইকরিমাসহ (রহ.)অনেকে বলে থাকেন-

لاَ يَذْكُرُ اللهَ وَ هُوَ عَلَى الْخَلاَءِ بِلِسَانِهِ وَ لٰكِنَّ بِقَلْبِهِ–

অর্থ: টয়লেটে থাকা অবস্থায় মুখে উচ্চারণ করে যিকর করবে না, তবে মনে মনে করতে পারে।[১১৯]

এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত স্থায়ী ফাতওয়া কমিটি বলেছে-

مِنْ آدَابِ الإِسْلَامِ اَنْ يَّذْكُرَ الإِنْسَانُ رَبَّهُ حِيْنَمَا يُرِيْدُ اَنْ يَّدْخُلَ بَيْتَ الْخَلَاءِ اَوِ الْحَمَّامِ، بِاَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ " اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ"– وَ لاَ يَذْكُرُ اللهَ بَعْدَ دُخُوْلِه، بَلْ يَسْكُتُ عَنْ ذِكْرِه بِمُجَرَّدِ الدُّخُوْلِ–

অর্থ: ইসলামের শিষ্টাচার হলো মানুষ যখন টয়লেট বা গোসলখানায় প্রবেশ করবে তখন তাদের প্রতিপালকের স্মরণ করবে এভাবে যে, প্রবেশের পূর্বে বলবে-اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

তথা হে আল্লাহ, আমি নাপাক নর-নারী জিন শয়তান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।[১২০]

প্রবেশ করার পর মুখে যিকর পাঠ করবে না; বরং প্রবেশ করার সাথে সাথে যিকর পাঠ করা বন্ধ করে নীরবতা অবলম্বন করবে।

শুধু তাই নয়, গোসলখানায় সবসময় ইসতিঞ্জা করলে ওয়াসওয়াসা নামক মানসিক রোগ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَلاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِيْهِ قَالَ اَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ–

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, অত:পর সে স্থানে গোসল করে। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, অত:পর সেখানে অযু করে। কেননা অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ) এটা হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।[১২১]

উল্লেখ্যইসলামে কমোড, পট,ফ্লাশ বা বাসায় সংযুক্ত বাথরুম ব্যবহার করা এসব কোনটাই নিষিদ্ধ নয়। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হাদীসে প্রদর্শিত ইসতিঞ্জার নিয়মনীতিগুলো যে কতটুকু স্বাস্থ্যবিধি সম্মতএবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিবাচক সে সম্পর্কে অবগত করা। ইসলাম চায় এ কাজে এমনসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক যদ্বারা সর্বোৎকৃষ্টভাবে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা যায় এবং যা কারও জন্য কষ্টসাধ্য না হয়।

উল্লিখিত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে ইচ্ছা করলেই বাসায় সংযুক্ত বাথরুম বা কমোড ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া সম্ভব নয়। তাই স্থাপিত এসব বাথরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করলে কিছুটা হলেও স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করা সম্ভব হবে।

* টাইলস বা পাকা বাথরুম যতটা সম্ভব শুকনা রাখা। কারণ ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া বেশি জন্মে।

* বাথরুম সবসময় বন্ধ না রাখা। সবসময় বন্ধ থাকলে বাথরুমের পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়। খুব অসুবিধা হলে সুতি কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া। প্রতিদিন কিছুটা সময় বাথরুমের জানালা খুলে রাখলে বাতাস চলাচল ঠিক থাকে।

* ধূমপান করা এমনিতেই এটি বাজে নেশা। আর সংযুক্ত বাথরুমে ধূমপান করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

* ভেজা গামছা বা তোয়ালে বাথরুমের হ্যাঙ্গারে না রাখা। এতে বাথরুমের ভেজাভাব থেকে যায়।

* বাথরুমের ভেতর ছোট টবে গাছ রাখা। দেখতে ভালো লাগার পাশাপাশি পরিবেশও সতেজ থাকে।

---

১১৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আস-সানাআ'নী, *সুবুলুস সালাম*, লেবাবন: বৈরুত, দারুল আরকাম, তা. বি.অধ্যায়: পবিত্রতা, পৃ. ৮৯

১২০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অদ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: শৌচাগারে কী বলতে হয়? খ. ১, পৃ. ৫৩, হাদীস নং -১৪২

১২১.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: গোসলখানায় প্রস্রাব করা, খ. ১, পৃ. ১৫-১৬, হাদীস নং- ২৭

* বাথরুমের স্যান্ডেল আলাদা রাখা। কারণ বাথরুমে স্যান্ডেলে অসংখ্য জীবাণু লেগে থাকে। তাই রুমের স্যান্ডেল যদি বাথরুমেও ব্যবহার করা হয়, তাহলে পুরো ঘর জীবাণুতে ভরে যায়।

* মাঝে মধ্যেবাথরুমে সুগন্ধি মোম জ্বালানো এবং ঘরেররুম ফ্রেশনার স্প্রে করার সময় বাথরুমও স্প্রে করা, এতে বাথরুম দুর্গন্ধ মুক্ত হয়।

* বাথরুমের সামনে রাবারের অ্যান্টি স্কিড ম্যাট রাখা। যাতে প্রত্যেকবার পা মুছে বাথরুমে প্রবেশ করা এবং পা মুছেবের হওয়া যায়।

* বাথরুমের বেসিন, কমোড এবং বাথটাব পরিষ্কার রাখার জন্য আলাদা আলাদা ব্রাশ এবং স্ক্রাবিং প্যাড ব্যবহার করা। প্রতিবার ব্যবহারের পর এগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নেয়া এবং শুকানোর পর ব্রাশ হোল্ডারে রাখা।

* বাথরুম ফিটিংস পরিষ্কার করার পর অবশ্যই অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল লিক্যুইড দিয়ে মুছে নেয়া এবং বছরে একবার বাথরুম পরিষ্কারের ব্রাশ ও মব পরিবর্তন করা।[১২২]

* প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার হারপিক, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার বা এ জাতীয় জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে বেসিন, কমোড ও বাথরুমের টাইলস পরিষ্কার করা।

* বাথরুমের কলে মরিচা পড়লে বাসন মাজার লিক্যুইড সাবানের সাথে ভিনেগার মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে দাগ ধরা জায়গায় ভালো করে ঘষে সামান্য গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়া।

* কমোডের ঢাকনা লাগিয়ে ফ্লাশ করা। ঢাকনা না লাগিয়ে ফ্লাশ দিলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পানির কণার সাথে ব্যাকটেরিয়া মিশে টয়লেটে ভেসে বেড়ায়। এ সকল জীবাণু দীর্ঘসময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

* মেকআপ সামগ্রী এবং টুথব্রাশ টয়লেটের ভেতরে না রাখা। দাঁত মাজার পর টুথব্রাশ বাথরুমে রেখে দিলে তা সহজে শুকাতে চায় না। আর এই ভেজা পরিবেশেই সংক্রমণ জাতীয় ব্যাকটেরিয়া বেশি জন্ম নেয়।অত:পর ব্রাশ থেকে এসকল ব্যাকটেরিয়াসমূহ মুখে প্রবেশ করে। একটি টুথব্রাশে প্রায় ১০ মিলিয়ন বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে। অনুরূপভাবে মেকআপ সামগ্রীতেও বাথরুমের ব্যাকটেরিয়া চলে আসে এবং ত্বকের লোমকূপ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ব্যবহারকারীকে অসুস্থ করে তুলে।

* টয়লেট টিস্যু ব্যতীত অন্যান্য টিস্যু বা স্যানিটারি ন্যাপকিন, ট্যাম্পন, তুলা ও ব্যান্ডেজ ইত্যাদি ব্যবহার না করা। বেশিরভাগ টিস্যু ফ্লাশযোগ্য হিসেবে দাবি করা হলেও আসলে তা নয়। টয়লেট টিস্যু ব্যতীত অনেক সাধারণ টিস্যু ১০ মিনিটেও পানির সাথে মিশে না; বরং আমাদের অজান্তেই আটকে থাকে। এতে বাথরুমের লাইন ও ড্রেন আটকে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

* বাথরুমে কোন সময় তোয়ালে না রাখা। কারণ বাথরুমের কমোড এবং মেঝে পরিষ্কার করা হলেও সাধারণত দেয়াল পরিষ্কার করা হয় না। দেয়ালে থাকা অসংখ্য জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া বাথরুমে টাঙ্গিয়ে রাখা তোয়ালেতে চলে আসে। অত:পর তোয়ালে ব্যবহার করার সময় তা আমাদের শরীরে চলে আসে। তাই বাথরুমে তোয়ালে না রাখাই নিরাপদ। বিশেষ করে ভেজা তোয়ালে রেখে পরবর্তীতে তা ব্যবহার করা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

* লুফা বা শরীর পরিষ্কার করার ছোবা ব্যবহার করার পর তা বাথরুমে না রাখা। ভেজা লুফায় প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাই ব্যবহারের পর রোদে শুকিয়ে পুনরায় বাথরুমে রাখা। এতে লুফায় থাকা জীবাণুসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়।

* বাথরুমে বেশি সময় বসে না থাকা। কারণ সিরামিকের কমোডে বেশিক্ষণ বসে থাকার কারণে অর্শরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অনেকের বাথরুমে বসে বই পড়া বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করার অভ্যাস আছে। এক জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৭৫ আমেরিকান বাথরুমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে। বই বা ফোন বাথরুমের বেসিন বা

---

১২২.*www.banglatribune.com*বাথরুম থাকুক জীবাণুমুক্ত; *https://m.bdnews24.com.*বাথরুমের ভুলগুলো (থেকে উদ্ধৃত)

ওয়াশ কাউন্টারে রাখলে ব্যক্তির অজান্তেই কিছু শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়া বই ও ফোনে চলে আসে। অত:পর এসব ব্যাকটেরিয়া শরীরে নানা রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে।[১২৩]

**যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করা এবং মলমূত্র আটকিয়ে না রাখা**

মুসলমানদের নিকট মসজিদ হলোপৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থান, যা নিজের ঘর থেকেও শতগুণ বেশি ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। শুধু মুসলমান নয় প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীই তার ইবাদতের স্থানকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়ে থাকে।হাদীসে এসেছে বায়তুল্লায় এক রাকাআত নামায পড়া অন্যস্থানে এক লক্ষ রাকাআত নামায আদায়ের মর্যাদা রাখে। এরপরেই আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জায়গা হলো নবী কারীম (সা.)-এর মসজিদ বা মসজিদে নববী। যেখানে এক রাকাআত সালাত আদায় করা অন্যস্থানে পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নামাযের সমান সাওয়াব। সুতরাং বায়তুল্লার মত মসজিদে নববীও মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র। আমাদের কোনো পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যদিটয়লেটের নির্ধারিত স্থান ছাড়া ঘরের অন্য কোনো জায়গায় প্রস্রাব করতে চায়, তাহলে আমরা তা কোনমতেই মেনে নেব না; বরং উত্তেজিত হয়ে তাকে মারতে যাবো, কমপক্ষে বাধা তো দিবই। তেমনিভাবে মসজিদে নববীতে কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে অপবিত্র করুক কোনো মুসলমানওতা বরদাশত করতে পারে না এটাই স্বাভাবিক। এমনি একটি ঘটনা আমরা হাদীসে পাই-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَه النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِه سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَ لَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ–

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে (নববীতে) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে দিল। এমতাবস্থায় অন্যান্য লোকেরা তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। নবী কারীম (সা.) তাদের বললেন- লোকটিকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।কারণ, তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি।[১২৪] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَ قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَ الظِّلِّ–

অর্থ: মুআয ইবন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাক। পানিতে থুথু ফেলা, রাস্তায় ও ছায়াদার স্থানে মলত্যাগ করা।[১২৫]

অনেক সময় আমাদেরও চরম পর্যায়ের মলমূত্রের চাপ দেয়। তাই বলে যেখানে সেখানে মলমূত্র যেমন ত্যাগ করা যাবে না, তেমনি মলমূত্র বেশিক্ষণ আটকিয়েও রাখা যাবে না। কারণ মলমূত্র আটকিয়ে রাখা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যা নিম্নের আলোচনা থেকে বোঝা যায়।

একজন অমুসলিম মসজিদে নববীর মত মর্যাদাপূর্ণ মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে দৃশ্যটি একবার কল্পনা করলে কোনো মুমিনের স্থির থাকার কথা না। তাও আবার নবী কারীম (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের সামনে। সংগত কারণেই সাহাবয়ে কিরাম (রা.) উত্তেজিত হয়ে গিয়ে থাকবেন। তাই উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বাধা দিতে চাইলেন। আর এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কিন্তু দূরদর্শী ও বিজ্ঞের প্রতীক নবী করীম (সা.) তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবাগণকে উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিকে প্রস্রাবরত অবস্থায় বাধা দিতে তো দিলেনই না; বরং উল্টোভাবে তিনি সাহাবায়ে কিরামগণকে ইরশাদ করলেন: লোকটিকে প্রস্রাব করতে দাও এবং পরে জায়গাটি পানি দিয়ে ধুয়ে দেবে। তিনি আরো বলেন, তোমাদেরকে মানুষের সাথে সহজ ও সুন্দর আচরণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, মানুষের সাথে কঠোর ও রূঢ় ব্যবহার এবং তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের পাঠানো হয়নি। মসজিদের মর্যাদা নবী কারীম (সা.)-এর নিকটও ছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তিনি একজন অপরিচিত গ্রাম্য ব্যক্তি যার কোনো সামাজিক মর্যাদা বা পরিচিতি

---

১২৩. *https://m.daily-bangladesh.com*প্রবন্ধ: টয়লেট থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে হবে; (থেকে উদ্ধৃত)
*https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla*,প্রবন্ধ: বাথরুম ও টয়লেটে আমরা যেসব ভুল কাজ করি, আজই সতর্ক হন (থেকে উদ্ধৃত)

১২৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: মসজিদে প্রস্রাবের উপর পানি ঢেলে দেয়া, খ. ১, পৃ. ৭২, হাদীস নং -২২০

১২৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: যেসকল স্থানে প্রস্রাব করা নিষেধ, খ. ১, পৃ. ১৫, হাদীস নং- ২৬

নেই, এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি কেন মসজিদের মত পবিত্রতম জায়গায় প্রস্রাব করার কারণে কোন বাধা দিলেন না, এমনকি অন্যরা বাধা দিতে গেলে তিনিইবা কেন উল্টোভাবে তাদেরকে বাধা দিলেন?

আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন।

ইরশাদ হচ্ছে– وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ–

অর্থ: আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১২৬]

কাজেই তিনি যেমন ছিলেন আখিরাতের জন্য কল্যাণকামী, তেমনি ছিলেন পার্থিব জগতেরও কল্যাণকামী। তিনি প্রতিটি কাজের অন্তর্নিহিত ফলাফল ও পরিণামের বিষয় চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিতেন। মানব জীবনে সুস্থ থাকার জন্য সময়মত প্রস্রাব করা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি সময়মত এবং স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করতে পারাওআল্লাহ তাআলার এক বিশেষ নিয়ামত। এটি যে কত বড় নিয়ামত, যারা সময়মত এবং স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করতে পারে না তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই বোঝা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন লোকটিকে প্রস্রাবরত দেখলেন, এমতাবস্থায় বাধা দেয়া স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একবারেই নিষেধ এবং প্রস্রাব আটকিয়ে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর বিষয়। সুতরাং প্রস্রাবরত ব্যক্তিকে বা প্রস্রাবের বেগের সময় বাধা দেয়া হলে কিডনীসহ প্রস্রাবনালীতে নানা ধরণের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি (সা.) গ্রাম্য ব্যক্তিটিকে বাধা দিয়ে কোনোধরনের ক্ষতি সাধন করতে চাননি। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়- নবী কারীম (সা.) একই সাথে মসজিদের ভেতর প্রস্রাবকারীর প্রস্রাবের মধ্যে পানি ঢালারও নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ প্রস্রাবের মধ্যে যেহেতু অনেক ধরনের রোগ-জীবাণু থাকে, যা সংক্রমিত হয়ে তাঁর সাথীবর্গ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি পানি ঢালার ব্যবস্থা করে সে সকল জীবাণুও ধ্বংস করে দিলেন।

উল্লেখ্য, মসজিদে নববী যদিও ঐ সময় পাকা না হওয়ায় লোকটির প্রস্রাব মাটিতে পড়ে শুকিয়ে গিয়ে সাথে সাথে তা পবিত্র হয়ে যেত, তথাপি সাহাবে কিরাম (রা.)-এর ক্রোধকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশমিত করা এবং তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য প্রস্রাবে পানি ঢেলে তা পরিষ্কার ও পবিত্র করে নেয়া ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওতী হিকমত।

**কুকুরের লেহনকৃত পাত্র মাটি দ্বারা পরিষ্কার করা**

প্রতিটি দেশেই কম-বেশি কুকুর দেখতে পাওয়া যায় এবং বর্তমানে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে কুকুরের ক্ষতিকর লালা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যদিও অনেকে পূর্বেই ভ্যাকসিন নিয়ে থাকে, কিন্তু সবার সেই সামর্থ্য নাও থাকতে পারে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রতিটি কুকুরকেই ভ্যাকসিন দেয়া সম্ভব নয় এবং যুগের পরিক্রমায় সবসময় ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) লুই পাস্তুরের জলাতঙ্ক রোগের টীকা আবিষ্কারের বহু পূর্বেই বিশ্ববাসীর জন্য অতিসহজ পদ্ধতি ও কোনো খরচ ছাড়াই কুকুরের লালার ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে, তবে তা সাতবার ধৌত করবে।[১২৭] অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: কুকুর যদি কারো পাত্র লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে সাতবার তা পানি দ্বারা ধৌত করবে। প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে।[১২৮] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَ الثَّامِنَةَ عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ–

১২৬.আল-কুরআন, ২১: ১০৭

১২৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: কুকুর পাত্র থেকে পানি পান করলে, খ. ১, পৃ. ৬০, হাদীস নং -১৭২

১২৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা, খ. ১, পৃ. ২১, হাদীস নং- ৭১,

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন কুকুর কোনো পাত্র লেহন করে তখন তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করো।[১২৯]

কুকুরের লালার ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত মাটি দ্বারা পবিত্র করার কী প্রভাব রয়েছে, এর বৈজ্ঞানিক রহস্য উদঘাটনে জার্মানী প্রসিদ্ধ ডাক্তার ক্রখ বলেন, আমাকে কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর নীতিমালা অনুসরণ করতে বলি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কুকুরের ঝুটার পাত্রকে সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ধৌত করবে। কাজেই এর রহস্য জানার জন্য আমি মাটির সকল প্রকার উপাদানকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলাম এবং কুকুরের চিকিৎসায় তা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। অবশেষে আমার নিকট একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে কুকুরের ঝুটার বিষাক্ত প্রভাব দূর করার ক্ষেত্রে মাটিই একমাত্র উপাদান। তাই মাটির উপাদানগুলো নিয়ে আমি গবেষণা আরম্ভ করলাম এবং প্রতিটি উপাদানকে কুকুর কামড়ানোর রোগে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার শুরু করলাম। অবশেষে মাটির একটি উপাদানব্যবহার করতেই রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় যে এটা ঐ রোগেরই ঔষধ। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) মাটি দিয়ে পাত্র ধৌত করতে উদ্বুদ্ধ করার মূল কারণ হলো, মাটিতে এমন একটি উপাদান রয়েছে, যা কুকুরের লালাকে একেবারে নি:শেষ করে দেয়। এ বিষয়ে আরো বিস্তর গবেষণা হতে পারে।

উল্লেখ্য কুকুরের মুখের লালায় ক্যাপনোসাইটোফাগা ক্যানিমোরসেস নামক ব্যাকটেরিয়া থাকে। কেউ আক্রান্ত হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিনের মাথায় জ্বর, মাংসপেশীতে ব্যথা, বমি, শরীরে দুর্বলতা এবং অনেক ক্ষেত্রেডায়রিয়া দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীরের সমস্যা না হলেও কিছু ক্ষেত্রে রক্তকে দূষিত করে তোলে এই ব্যাকটেরিয়া।তাছাড়া কুকুরের লালার রেবিস নামক ভাইরাস থেকে জলাতঙ্ক রোগ হয়। এটি একটি স্নায়ুজনিত রোগ। ভাইরাসটি কুকরের লালা থেকে ক্ষতস্থান বা মুখে গেলে সেখান থেকে স্নায়ু পৌঁছে এ রোগ সৃষ্টি হতে পারে। ফলে মস্তিষ্কের প্রদাহের সাথে খাদ্য নালিতে তীব্র সংকোচন হতে পারে।

কুকুরের লালায় যে সকল জীবাণু থাকে পানি দ্বারা পাত্র যতই ধৌত করা হোক না কেন, এর প্রভাব কিছু না কিছু থেকেই যায়। তাই শুধু পানি দিয়ে ধৌত করাই যথেষ্ট মনে না করে হাদীসের নির্দেশনা মোতাবেক অন্তত একবার হলেও মাটি দ্বারা ঘষে নেয়া উচিত।

**নিয়মিত বিছানা ঝাড়া ও কাপড় পরিবর্তন করা**

দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গড়ে এক তৃতীয়াংশ সময় আমাদের বিছানায় কাটে। রাতে ঘুমানো বা দিনে একটু বিশ্রাম নিতে চাইলে আমরাক্লান্ত শরীরটাকে বিছানার সাথে লাগিয়ে দিই। এক্ষেত্রে বিছানার চাদর সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি ঘুমের পূর্বে বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নেয়া উচিত। নতুবাবিছানা থেকেই আমাদের শরীর নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বিশেষ করে অ্যাজমা, কাশি, হাঁচি, রাইনাইটিস, অ্যালার্জি, একজিমা (অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস) প্রভৃতি রোগ হওয়ারসাথে সাথেশরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যেতে পারে। তাই এ বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরী। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَوَى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهِ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ– ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الاَيْمَنِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কেউ ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে, তখন সে যেন তার কাপড় দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা, সে জানে না তার অজ্ঞাতে সেখানে কী এসে পড়েছে। এরপর সে যেন ডান পার্শ্বে শয়ন করে।[১৩০]

---

১২৯. *সুনান আবু দাউদ*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা, খ. ১, পৃ. ২১-২২, হাদীস নং- ৭৪

১৩০.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব-নিদ্রা সম্পর্কীয়, অনুচ্ছেদ: ঘুমানোর সময় যে দু'আ পড়তে হয়, খ. ২, পৃ. ৩৪৭, হাদীস নং- ৫০৫০

অনেকেই বিছানা ঝাড়া বা চাদর পরিষ্কার রাখার সাথে শরীর সুস্থ থাকা বা না থাকার বিষয়টি গুরুত্ব না দিলেওস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমাদের ব্যবহৃত বিছানার চাদরে প্রতিদিন নানা ক্ষতিকর উপাদান এবং জীবাণু বাসা তৈরি করে, যা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর মধ্যে একটি হল- ডাস্ট মাইটস। কেউ যদি মাইক্রোস্কোপের নিচে বিছানার চাদর রেখে একবার দেখে তাহলে তার মাথা ঘুরে যাবে এবং ঐ বিছানায় ঘুমাতে সাহস করবে না। কারণ বিছানার চাদরে কোটি কোটি ডাস্ট মাইটস বা এক ধরনের ছোট ছোট পোকা থাকে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এগুলো আমাদের ত্বকের মৃত কোষ খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা যদি একবার বিছানার চাদরে জন্ম নেয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষাধিকে গিয়ে পৌঁছে। আর এমন ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে আমাদের শরীর ততোবেশি খারাপ হওয়ার আশংকা বাড়বে। তা থেকে নিস্তার পেতেই প্রতিদিন বিছানার চাদর ভালভাবে ঝাড়া এবং কিছুদিন পর পর ব্যবহৃত চাদরটি ভাল করে ধৌত করা উচিত।

এছাড়া বিছানায় আর কী কী ক্ষতিকর উপাদান থাকে, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

**(ক) মৃতকোষ:** প্রতিদিন শোয়ার সময় যদি বিছানা ঝাড়া এবং কিছু দিন পর পর চাদর ধৌত করা না হয়, তাহলে কোটি কোটি মৃত কোষে বিছানা ভরে যায়। আর এমনটা হলে পোকা মাকড়ের পাশাপাশি নানা ক্ষতিকর জীবাণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কারণ আমাদের শরীরের মৃতকোষগুলি পোকাদের অত্যন্ত পছন্দের খাবার। ফলে সুস্বাদু খাবারের লোভে এই সব পোকা বিছানায় এসে ভিড় করে। এতে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

**(খ) কীট-পতঙ্গ:** অনেক সময় বালিশের নিচে, বিছানার চাদরে ও কাঁথায় কীট-পতঙ্গ এবং বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। সুন্নাত হিসেবে বিছানা ঝাড়ার কারণে তা বের হয়ে আসে এবং মারাত্মক ক্ষতি থেকে নিজেকে হিফাযত করা সম্ভব হয়। বিছানায় সাপের কামড়ে মারা গেছে, এমন ঘটনা আমাদের আশেপাশে প্রায়ই ঘটতে শোনা যায়।

**(গ) ধুলা-বালু:** আমাদের বিছানা প্রতিনিয়ত অগণিত ধুলাবালুর মাধ্যমে অপরিষ্কার থাকে। যদিও সেগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। ঘুমানোর সময় যদি সেসকল ধুলাবালু ঝেড়ে পরিষ্কার করা না হয় তাহলে শরীরের লোম কুপ, নাক ও মুখ দিয়ে প্রবেশ করে আমাদেরকে অসুস্থ করে তুলবে।

**(ঘ) তেল:** ঘুমানোর সময় আমাদের শরীর থেকে তৈলাক্ত পদার্থ নির্গত হয়ে চাদরে লেগে থাকে। প্রতিনিয়ত শোয়ার সময় এভাবে তেল লাগতে লাগতে বিছানো চাদর এক সময় অপরিষ্কার হয়ে যায়। যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

**(ঙ) ঘাম:**গরমকালে ঘুমানোর সময় আমরা প্রচুর ঘেমে থাকি। আর সে ঘাম বিছানায় লেগে চাদর থেকে দুর্গন্ধ বের হয় এবং নানাবিধ ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়। যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

**(চ) খাবারের টুকরো:** অনেকেই বিছানায় বসে খাবার খায়। ফলে খাওয়ার সময় বিছানা নোংরা হয়। যদি সেই নোংরা চাদর ঝেড়ে বা ধুয়ে পরিষ্কার করা না হয় তাহলে বিছানা পোকা মাকড়ের রাজ্য হয়ে ওঠে।

**চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের আরো কিছু পরামর্শ**

বিছানার চাদরে লেগে থাকা বিভিন্ন রোগ জীবাণু ও ক্ষতিকর দিক থেকে পরিত্রাণ পেতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণের কিছু পরামর্শ নিম্নরূপ:

* যেহেতু প্রতিদিন চাদর ধৌত করা সম্ভব নয়, তাই প্রতি দু'/তিন দিন অন্তর চাদর ধৌত করা এবং প্রতিবার ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে বিছানা ঝেড়ে নেয়া।

* শুধু চাদর নয়, বালিশও পরিষ্কার রাখতে হবে। তবে চাদরের ন্যায় সপ্তাহে সপ্তাহে বালিশ ধৌত না করলেও চলবে।

* অসুস্থ ব্যক্তির বিছানার চাদর প্রতিদিন পরিবর্তন করতে হবে। এমনটা করলে রোগী ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা পায়।

* অনেকেই সঠিক পদ্ধতিতে বিছানার চাদর ও বালিশ ধোয় না। ফলে ধোয়ার পরেও ডাস্ট মাইটস এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে যায়। তাই কুসুম গরম পানিতে কাপড় কাচা সাবান বা পাউডার মিশিয়ে ভাল ভাবে চাদর ধোয়া এবং সূর্যের আলোতে চাদর শুকিয়ে নেয়া।

*চাদরের সাথে কোনোক্রমেই অন্যান্য জামা কাপড় না ধোয়া।

* বিছানার সাদা চাদর ভালভাবে পরিষ্কার করতে চাইলে সাবান পানিতে অর্ধ কাপ লেবুর রস মিশিয়ে নেয়া। এতে জীবাণু ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি রং আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে।

**রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রাখা**

ইসলাম ধর্ম শুধু ইবাদত-আকীদার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর বিধানাবলী জীবনের প্রতিটি বিষয়কে বেষ্টন করে রেখেছে। তাই এ ধর্মকে চমৎকার জীবন ব্যবস্থাওবলা হয়। ইসলাম সম্পর্কে যে যতো বেশি জানবে ততই মুগ্ধ হবে। কারণ ইসলাম প্রত্যেকের অধিকার সঠিকভাবে ঘোষণা দিয়েছে। মানবাধিকার, নারী অধিকার, পিতা-মাতা অধিকার ইত্যাদি তো বটেই পশু-পাখির অধিকারের পাশাপাশি রাস্তার অধিকারও দিয়েছে। রাস্তার মতো সাধারণ একটি বিষয়েও ইসলাম ধর্মে নির্দেশনা রয়েছে,এটা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। বাস্তবে মানব জীবনেরাস্তাও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাস্তা ছাড়া কোথাও যাওয়া কত যে কষ্টকর সেটা জঙ্গলে গেলেই বোঝা যায়। তাই যেখানেই মানুষ ও সমাজ রয়েছে, সেখানেই রাস্তা আছে। রাস্তা কারো একা চলার জন্য তৈরি করা হয় না। রাস্তায় আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সব শ্রেণির মানুষ চলাচল করে। রাস্তার পাশে যেহেতু অনেক ঘর-বাড়ি, দোকানপাট এবং মানুষের চলাচল থাকে,তাই হাদীসে রাস্তার অনেক হক বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: রাস্তায় দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালাম বিনিময় করা, পথিককে পথ বলে দেয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে অন্যতম হলো রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং রাস্তা প্রশস্ত করা। সুতরাং মানব কল্যাণে রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত রাখার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াকে ঈমানের একটি শাখাও বলা হয়েছে। হাদীসে আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعُ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَوْضَعُهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তমটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।[১৩১] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِتَّقُوا الأَعِنَيْنِ قَالُوْا وَ مَا الأَعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الَّذِيْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা এমন দু'টি কাজ হতে বিরত থাকো যা অভিশপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই অভিশপ্ত কাজ দু'টি কী? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে।[১৩২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَ قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَ الظِّلِّ–

অর্থ: মুআয ইবন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাক। পানিতে থুথু ফেলা, রাস্তায় ও ছায়াদার স্থানে মলত্যাগ করা।[১৩৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) রাস্তাঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করাকে অভিশপ্ত কাজ বলার দ্বারা বোঝা যায়, মানুষ চলাচল রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাস্তা হলো এলাকার সকল মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম। অনেক গরীব মানুষ জুতা ছাড়াই রাস্তা দিয়ে হাঁটে। সুতরাং রাস্তায় যদি মলমূত্র ত্যাগ করা হয় তাহলে খালি পায়ে সরাসরি বা জুতার মধ্যে ঐ নাপাক জিনিস লাগলে ঘৃণার উদ্রেগ হয়। শুধু তাই নয়, অনেক সময় খেয়াল না করার কারণে এসব মলমূত্র নিজেদের

---

১৩১. *সুনানু নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, ১৯৯৯, অধ্যায়: ঈমান এবং এর বিধানাবলী, অনুচ্ছেদ: ঈমানের শাখা-প্রশাখা, পৃ. ৫১৪, হাদীস নং- ৫০০৫

১৩২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: যেসকল স্থানে প্রস্রাব করা নিষেধ, খ. ১, পৃ. ১৫, হাদীস নং- ২৫

১৩৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: যেসকল স্থানে প্রস্রাব করা নিষেধ, খ. ১, পৃ. ১৫, হাদীস নং- ২৬

ঘর-বাড়ি এবং দূরদূরান্তেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে রোগ-জীবাণু দ্বারা নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়াওরাস্তার অন্যান্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، فَقَالُوْا مَا لَنَا بُدٌّ، اِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجَالِسَ، فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا– قَالُوْا وَ مَا حَقُّ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَ كَفُّ الاَذَى، وَ رَدُّ السَّلاَمِ، وَ الاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ–

অর্থ: তোমরা রাস্তার বসা থেকে বিরত থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বললেন, আমাদের তো প্রয়োজন হয়, পরস্পরে প্রয়োজনীয় কথা বলতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেলে: বসতেই যদি হয় তবে রাস্তার হক আদায় করে বসো। সাহাবীগণ বললেন, রাস্তার হক কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, রাস্তার হক হলো- (১) দৃষ্টিকে অবনত রাখা, (২) কাউকে কষ্ট না দেয়া, (৩) সালামের জবাব দেয়া, (৪) সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা।[১৩৪]বিভিন্ন বর্ণনায় আরো কিছু বিষয় এসেছে। যেমন-

(ক) পথহারাকে পথ দেখিয়ে দেয়া, (খ) মযলুম ও বিপদগ্রস্তের সাহায্য করা, (গ) বোঝা বহনকারীকে (বোঝা উঠানো বা নামানোর ক্ষেত্রে) সহযোগিতা করা, (ঘ) ভাল কথা বলা এবং হাঁচির জবাব দেয়া ইত্যাদি।রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ شُعْبَةً– فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ–

অর্থ: ঈমানের শাখা সত্তরটিরওকিছু বেশি অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কথা স্বকার করা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।[১৩৫]

অন্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-কে কিছু নসীহত করেন। তন্মধ্যে একটি উপদেশ ছিল وَ اِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَ الشَّوْكَةَ وَ الْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ–

অর্থ: রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা এবং হাড্ডি সরানোও সদকা।[১৩৬]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَمَرَّ رَجُلُ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَ اللهِ لَاُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمَسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيْهِمِ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ– وَ فِيْ رِوَايَةٍ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি হেঁটে চলার সময় রাস্তার ওপরে একটি গাছের শাখা দেখে বলে, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানদের (যাতায়াতের পথ) থেকে এটা সরিয়ে ফেলবো, যাতে এটা তাদের কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- আল্লাহতার এই ভালো কাজটি পছন্দ করে তাকে মাফ করে দিলেন।[১৩৭]

عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَنْتَفِعُ بِهِ– قَالَ اَعْزِلِ لْاَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ–

---

১৩৪. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: রাস্তায় বসা, খ. ২, পৃ. ৩২০, হাদীস নং- ৪৮১৫

১৩৫. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা, খ. ১, পৃ. ২২৭, হাদীস নং- ১৫৩

১৩৬. *জামি আত-তিরমিযী*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা , অনুচ্ছেদ: উত্তম কর্ম সম্পাদন করা, খ. ২, পৃ. ৪৯, হাদীস নং- ১৯৫৬

১৩৭. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তান, করাচি, বুশরা পাবলিশার্স: ২০০৯, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার ফযীলত, খ. ৭, পৃ. ২৫৭, হাদীস নং- ৬৬৬৫

অর্থ: আবূ বারযাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যদ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন, মুসলিমদেরযাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।[১৩৮]

অনেক সময় রাস্তায় চলতে গিয়ে কষ্টদায়ক বস্তু আমাদের নজরে পড়লেও এটা সরকারের কাজ মনে করে আমরা তা সরাই না। যদিও রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে থাকতে দেখলে তা সরিয়ে দেয়া একজন মুসলমানেরও দায়িত্ব ও ঈমানের দাবি।যা ইতিপূর্বে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ছোট খাটো কষ্টদায়ক জিনিস যেমন: ভাঙ্গা ডাল, ধারালো পাথর, কাঁটা, কাঁচ, নোংরা দ্রব্য এবং কলার ছাল ইত্যাদি পথে না ফেলা এবং রাস্তায় পড়ে থাকলে তা নিজ দায়িত্বে সরিয়ে দেয়া উচিত। কারণ এসবক্ষুদ্র জিনিসেও অনেকসময় পথিক ব্যথা পেতে পারে। ভাঙ্গা ডাল ও পাথরে আঘাত লেগে পায়ের নখ ওঠে গিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে, কাঁটা, কাঁচ ও নোংরা দ্রব্যের মাধ্যমে পা কেটে যেতে পারে এবং কলার ছালে পিছলা খেয়ে পা ভেঙ্গে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এসব দ্রব্য পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে বা নিজের দায়িত্ব নয় মনে করে এড়িয়ে গেলে এমনওহতে পারে যে নিজেই অথবা আপজনের মধ্যে কেউ মারাত্মক আঘাত পেতে পারে। তখন নিজেরই হাসপাতালে দৌড়াতে হবে। সুস্থ হওয়া বা না হওয়া পরের বিষয়। তাছাড় বড় ধরনের কোনো জিনিস হলে যেমন কোনো বড় গাছ ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে থাকলে, কোনো পশু মরে দুর্গন্ধ হলে বা কোনো গাড়ি নষ্ট হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় প্রশাসন বা সরকারকে খবর দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এতেও হাদীসে ওপর আমল হবে।

রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা প্রশস্ত রাখার হাদীসসমূহ যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য রক্ষা বা সুস্থতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু পরোক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করলে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ হওয়ার চেয়ে একজন মানুষ যাতে অসুস্থই না হয় এবং স্বাস্থ্যহানী ঘটার কোনো কারণই তার সম্মুখীন না হয়ইসলাম ধর্ম সবসময় সেদিকেই বেশি খেয়াল রেখেছে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন–اِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيْقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ اَذْرُعٍ

অর্থ:যখন তোমরা রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ করবে তখন তা সাত হাত প্রশস্ত সাব্যস্ত করা হবে।[১৩৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্মাণ বিদ্যা শিখানোর জন্য পৃথিবীতে আগমন করেননি। তিনি শহরের পরিকল্পনাবিদ বা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞও ছিলেন না। তিনি ছিলেন নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত। তাঁর আগমন ঘটেছিল মানবতার মহান শিক্ষকরূপে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জীবনের কোনো একটি দিকও তাঁর দৃষ্টি থেকে আড়াল ছিল না। তিনি রাস্তা ও গলি পথকে প্রশস্ত রাখতে বলে নগর প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদকেও দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেননি।

যেকোনো আধুনিক শহর উন্নয়নের মূলে রয়েছে প্রশস্ত রাস্তা। বিশ্বের যেসকল উন্নত রাষ্ট্র বা শহর রয়েছে, এর প্রতিটি রাস্তা খুবই প্রশস্ত। এজন্য একটি মডেল শহর তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমেই রাস্তা কতটুকু প্রশস্ত হবে তা ভাবা হয়। যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য রাস্তা প্রশস্ত না হলে খাদ্য, শিক্ষা, বস্ত্র এবং চিকিৎসাসহ কোনো ধরণের সেবাই সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। সরু রাস্তা দিয়ে যোগাযোগ করতে কেউই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। অনেক এলাকা বা অনুন্নত দেশ রয়েছে শুধু রাস্তাঘাট প্রশস্ত না হওয়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে প্রদত্ত খাদ্য ও চিকিৎসার মতো মৌলিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। তাছাড়া রাস্তা সরু হলে পয়:নিষ্কাষণ থেকে শুরু করে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা ড্রেনের মাধ্যমে দূরে কোথাও ফেলার সুযোগ না

---

১৩৮*আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার,আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার ফযীলত, খ. ৭, পৃ. ২৫৮, হাদীস নং- ৬৬৬৮

১৩৯ .*আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বাগান ও ফসলী জমির বর্গাচাষ, অনুচ্ছেদ: রাস্তার পরিমাণ, যখন তাতে মতবিরোধ হয়, খ. ৫, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং- ৪১৩৬; *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিচার, অনুচ্ছেদ: বিচার সম্পর্কে আরো আলোচনা, খ. ২, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং- ৩৬৩৩

থাকায় তা আটকে পুরো এলাকা একটি ডাস্টবিনে পরিণত হবে। ফলে কলেরা, আমাশয়, ডায়রিয়াসহ যাবতীয় রোগের বিস্তৃতি ঘটে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানী হতে পারে। যেসকল ঘনবসতি এলাকায় সরু রাস্তা রয়েছে সেখানে আগুন লাগার মতো কোনো অঘটন ঘটলে বিপদের শেষ নেই। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন সময় মতো সেখানে পৌঁছেআগুন নিভাতে পারে না। এতে শত শত মানুষ আগুনে পুড়ে মারা যায় এবং হাজার হাজার মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে আমৃত্যু দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়। বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশগুলোতে এমন চিত্র অহরহ ঘটে থাকে। যা কোনভাবেইকাম্য নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাধরণত গাধা, ঘোড়া এবং উটের মাধ্যমেই মানুষ চলাচল করতো এবং আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে সারাবিশ্বে লোক সংখ্যা খুব বেশি না থাকা সত্ত্বেও তিনি রাস্তাকে সাত হাত প্রশস্ত রাখার নির্দেশা প্রদান করেছেন। যা মানব জীবনের সার্বিক পরিবেশ নির্মল ও সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**খাবার পাত্রে মাছি বসলে করণীয়**

আমরা মাছিকে সাধারণত একটি উড্ডয়নশীল তুচ্ছ ও ঘৃণিত প্রাণি হিসেবেই মনে করি। এটা অধিকাংশ সময় ময়লাযুক্ত স্থানে বসে এবং সেখানেই বসবাস করে। ফলে কেউই এ প্রাণীটিকে পছন্দ করে না। তবে দু'ধরনের মাছির DNA গবেষণা করে  দেখা গেছে, এদের শরীরে ছয়শোরও বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে এবং এগুলো মানবদেহে সংক্রমণের জন্য দায়ী। যেমন: পেটের পীড়া, রক্ত দূষণ এবং নিউমোনিয়া।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, মাছি তার পা, পায়ের পাতা ও পাখার সাহায্যে এসব ব্যাকটেরিয়া এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারে এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই মাছি জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এ গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রের পেন স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডোনাল্ট ব্রায়ান্ট বলেছেন, লোকজনের কিছু ধারণা আছে যে মাছি ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের মতো প্যাথোজেন বহন করে। তবে এর মাত্রা আসলেই যে কতো ব্যাপক হতে পারে সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই।

যে দু'ধরনের মাছির শরীর থেকে সংগৃহীত মাইক্রোবের DNA বিশ্লেষণ করে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে তার একটি house fly আর অন্যটি blue flay. পৃথিবীর প্রায় সবখানেই আছে house fly এবং গবেষণায় এই মাছির শরীরে ৩৫১ ধরনের ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। আর যে blue flay মাছিটি সাধারণত গরমের দেশে পাওয়া যায় এদের শরীরে পাওয়া গেছে আরো ৩১৬ ধরনের ব্যাকটেরিয়া। তাই মাছি এতো ছোট হওয়া সত্ত্বেও এটি যে কোনো মহামারীর উৎস হয়ে ওঠতে পারে।প্রফেসর ব্রায়ান্ট বলেন, ভুলে গেলে চলবে না, যখন কোথাও মহামারীর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন সেখানে এই মাছি খুব দ্রুত পরিস্থিতির আরো মারাত্মক অবনতি ঘটাতে পারে।

বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলেন, অসুখ বিসুখের ব্যাপারে এখন এই মাছিকে পূর্ব সতর্কতা হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সিঙ্গাপুরে ন্যানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভর্সিটির অধ্যাপক স্টিফেন শুস্টার বলেছেন, মাছিকে বায়োনিক ড্রোন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। খুব ছোট্ট একটি জায়গায় যেখানে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে মাছিকে ছেড়ে দিয়ে তারপর সেই মাছিকে আবার ধরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যেতে পারে সেখানে কী কী রোগ জীবাণু বাসা বেঁধে আছে।

তবে সবচেয়ে বেশি জীবাণু বহন করে house fly. এরা সবচেয়ে নোংরা। ময়লা আবর্জনার উপর বসে এবং সব ধরনের পঁচে যাওয়া খাদ্য, প্রাণীর মরদেহ, মলমূত্র ও বিষ্ঠা থেকে তারা নিজেদের খাবার সংগ্রহ করে। একারণে এরা মানুষ, প্রাণী ও গাছপালার জীবাণু পরিবহনের জন্য দায়ী। আর মৃত প্রাণীর শরীরে সাধারণত যে মাছিটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় blue flay.নগর এলাকায় এদের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানা বা দোকানপাটে এবং কসাইখানায় এদের বিচরণ বেশি।

সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির এ যুগে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সর্ম্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন জানা যায়- মাছি মানুষের শত্রু, সে রোগ-জীবাণু বহন করে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে এবং তার ডানায় নি:সন্দেহে ভাইরাস রয়েছে। তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন খাদ্যে পতিত রোগ-জীবাণু বহনকারী সে মাছিকেই ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَامْلِقُوْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحْدِ جَنَاحَيْهِ دَاءُ وَّ فِىْ الْاٰخِرِ شِفَاءُ– وَ اِنَّهُ يَتَّقِىْ بِجَنَاحِيْهِ الَّذِىْ فِيْهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ–

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কোনো খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তোমরা তাকে পাত্রের মাঝে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দেবে। কেননা, এর এক ডানায় রোগ এবং অপর ডানায় শিফা থাকে। আর মাছি খাবারে পতিত হওয়ার সময় ঐ ডানা নিক্ষেপ করে, যাতে রোগ-জীবাণু থাকে। কাজেই তোমরা তাকে পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে।[১৪০]

এ বিষয়ে কিং আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর ওয়াজীহ বায়েশরী উল্লিখিত হাদীসের সত্যতা যাচায়ের জন্য মাছি নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা চালান। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিছু পাত্রের মধ্যে কয়েকটি মাছি ধরে জীবাণুমুক্ত টেস্ট টিউবের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। তারপর নলটি একটি পানির গ্লাসে উপুড় করেন। মাছিগুলো পানিতে পতিত হওয়ার পর উক্ত পানি থেকে কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পান, সেই পানিতে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। তারপর জীবাণুমুক্ত একটি সূঁচ নিয়ে মাছিকে ঐ পানিতে আবার ডুবিয়ে দেন। তারপর কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, সেই পানিতে আগের মতো আর জীবাণু নেই; বরং অনেক কম। তারপর মাছিটিকে আবার ডুবিয়ে দেন এবং কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে আবার পরীক্ষা করে দেখেন যে যতোবার মাছিকে ডুবিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, ততোই জীবাণু কমছে। অবশেষে ডক্টর ওয়াজীহ বায়েশরী এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, মাছির একটি ডানায় রোগ-জীবাণু রয়েছে এবং অপরটিতে রয়েছে রোগ নাশক ঔষধ ।

সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম চিকিৎসা সম্মেলনে কানাডা থেকে দু'টি গবেষণা রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, যাতে বর্ণিত ছিল- মাছির ডানায় এমন কিছু বস্তু রয়েছে, যা জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। শায়খ মোস্তফা ও খালীল মোল্লা এ বিষয়ে জার্মান ও ব্রিটেন থেকে রিসার্চসমূহ সংগ্রহ একটি বই প্রকাশ করেছেন। যার মূল বিষয় ছিল- নিশ্চয় মাছির একটি ডানায় রয়েছে রোগ এবং অপর ডানায় রয়েছে রোগ নাশক ঔষধ।

তাই মাছি যখন কেনো খাদ্যে বসে তখন যে ডানায় জীবাণু থাকে সে ডানাটি খাদ্যে ডুবিয়ে দেয়। অথচ তার অপর ডানায় থাকে প্রতিরোধক ভাইরাস। যদি মাছিকে ডুবিয়ে দেয়া হয় তাহলে প্রতিরোধক ভাইরাস খাদ্যের সাথে মিশে ক্ষতিকর জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেই খাদ্য স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য অনুকূল থাকে। নতুবা এ খাদ্যই জীবাণুযুক্ত হয়ে মানব ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

অবশেষে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মাছির ডানায় লেগে থাকা ক্ষুদ্রতম জীবাণু দেখার মতো কোনো অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার না হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) ইলমে অহীর মাধ্যমে মাছি সংক্রান্ত বিপদজ্জনক দিক বর্ণনা করে আমাদেরকে স্বাস্থ্য রক্ষার কবচ বলে দিয়েছেন।

---

১৪০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাবারে মাছি পড়লে, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং- ৩৮৪৪

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবিক আচার-আচরণ ও কাজকর্মের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা

পৃথিবীতে বসবাসকারী অসংখ্য সৃষ্টজীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই হলোআশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিবেক-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও কাজকর্মে মানুষ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা অন্য কোনো প্রাণির চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সম্মান মানুষের নিজস্ব কোনোঅর্জন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার দান। ইরশাদ হচ্ছে– وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ–

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি মানবজাতিকে সম্মানিত করেছি।[১৪১]

অন্যান্য প্রাণির চেয়ে মানবজাতি বেশি জ্ঞানের অধিকারী হলেও জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে সমান না হওয়ায় সবাই সত্য বিষয়টি সবসময় উপলব্ধি করতে পারে না। তাছাড়া মানুষ যে পরিবেশ ও সময়ে বসবাস করে এর প্রভাব তার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ায় এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মানবীয় দুর্বলতার কারণে সকল কাজের ভালো-মন্দের ফলাফল জানা না থাকায় মানুষের ভাবনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সব সময় পূর্ণাঙ্গ হয় না। ফলে মানব রচিত নিজস্ব কোনো মতবাদ সাময়িকভাবে কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পরবর্তীতে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়।

তাইআল্লাহ তা'আলা মানব জাতির প্রতি করুণা করে যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলা সবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের চলার আলোকবর্তিকাস্বরূপ প্রেরণ করে অহীর মাধ্যমে এমন কতিপয় মানবীয় মৌল ও সার্বজনীন অমোঘ নীতি প্রদান করেছেন, যা অনুসরণ করে মানুষ খুব সহজে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা অর্জন করতে পারে। এ পরিচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বর্ণিত এমন কিছু মানবিক আচার-আচরণ ও কাজকর্মসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো, যা স্বাস্থ্য রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

**হাঁচি শরীরের জন্য নিয়ামক**

হাঁচি মানুষের শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা ছোট-বড় সকল মানুষই দিয়ে থাকে। যদিও আমরা হাঁচিকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করে থাকি, কিন্তু শরীরের জন্য এটি খুবই উপকারি এবংএর মাধ্যমে আমাদের বিরাট নিয়ামত অর্জিত হয়। হাঁচি দিলে শরীরে আটকে পড়া ধোঁয়া ও গ্যাস বের হয়ে যায় এবং হাঁচি দেয়ার পরপরই শরীর কিছুটা হালকা অনুভূত হয়। এ নিয়ামতটি অর্জিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার বিধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যমীনে ভূমিকম্প হলে তা যেমন কেঁপে ওঠে, তেমনি হাঁচির মাধ্যমেও শরীরে যেন একটি ভূমিকম্প বয়ে যায়। তাই হাঁচি দেয়ার পর শোকরিয়া স্বরূপ 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতে হয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّ لْيَقُلْ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَ يَقُوْلُ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদকরেন:তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসাএবং তার ভাই বা সাথী যেন এরূপ বলে- يَرْحَمُكَ اللهُ। তথা আল্লাহ তোমার রহম করুন।এরপর হাঁচিদাতা যেন আবারো বলে-– يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ তথা আল্লাহ তোমাদের হিদায়েত দান করুন এবং তোমাদের মন্দকে ভাল করে দিন।[১৪২] অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ... قَالَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللهَ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمُحَامِدِ وَ لْيَقُلْ لَّهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَ لْيَرُدَّ يَعْنِىْ عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْ–

অর্থ: হিলাল ইবন ইয়াসাফ (রহ.) থেকে বর্ণিত। ... সালিম ইবন উবায়দ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে- আলহামদু লিল্লাহ! এভাবে তিনি (সা.) প্রশংসার অন্যান্য পদ্ধতিও বলে দেন। আর হাঁচির সময় পাশে যে থাকে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ! এর জবাবে হাঁচি দাতা যেন বলে- يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْ তথা আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন।[১৪৩] অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

---

১৪১. আল-কুরআন, ১৭: ৭০

১৪২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: হাঁচির জবাব কিভাবে দেবে, খ. ২, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫, হাদীস নং- ৫০৩৩

১৪৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: হাঁচির জবাব কিভাবে দেবে, খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং- ৫০৩১

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মুসলমানের ওপর তার ভাইয়ের জন্য পাঁচটি জিনিস ওয়াজিব। তা হলো: (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) কেউ হাঁচি দিলে এর জবাব দেয়া, (৩) দাওয়াত কবুল করা, (৪) রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা এবং (৫) জানাযায় শরীক হওয়া।[১৪৪]

হাদীসের ভাষ্য মতে, একজন মুসলমান হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়বে, আর যে মুসলমান তার আশে-পাশে থাকবে সে জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। এরপর হাঁচিদাতা আবারো বলবে- 'ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ'। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সামন্য একটি হাঁচির জন্য এতোকিছু দুআ পড়ার প্রয়োজনীয়তা কেন?

এতগুলো দুআ পড়া আসলে অযথা নয়; বরং হাঁচির মধ্যে যে শারীরিক উপকারিতা রয়েছে তা আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় মাত্র। কারণ হাঁচির উপকারিতা সম্পর্কে বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদেরকে অনেক কিছু জানালেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে হাঁচি যে মানব শরীরের জন্য এতো জরুরী তা কারো জানা ছিল না। ঐ সময় যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ব্যাখ্যাও প্রদান করতেন, তবু তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো। কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে তখনকার মানুষের তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। তাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে হাঁচি প্রদানের শুধু নিয়মাবলীর নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, এর উপকারিতা সম্পর্কে ইরশাদ করেননি। হাঁচির উপকারিসম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

হাঁচি হলো আমাদের শ্বাসযন্ত্রের অনেকগুলো প্রতিরক্ষা কবচের মধ্যে একটি। শরীরের জন্য অনাকাংক্ষিত কোনো জৈব কণা যখন আমাদের শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগে ঢুকে পড়ে, তখন তা বের করে দেয়ার জন্য আমাদের শ্বাসযন্ত্র খুবই সমন্বিত প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণে বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে তা প্রবল বেগে বের করে দেয়, যেন এই প্রবল বেগে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় ঐ অনাকাংক্ষিত জৈব কণাটি বেরিয়ে যায়। হাঁচি যেহেতু একটি স্নায়ুবিক প্রতিক্রিয়া, তাই আমাদের শ্বাসনালীতে যখন জীবাণুর মাত্রা বেড়ে যায় তখন এগুলো বের করে দিতে মস্তিষ্কে একটি স্নায়ুবিক বার্তা পৌছায়, এরপরই হাঁচির সৃষ্টি হয়।

শুধু তাই নয়, আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি অংশ হলো হাঁচি। মানুষের নাকের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় শরীরের পক্ষে কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ বা ব্যাকটেরিয়া নাকের মধ্য দিয়ে শরীরে ঢোকার চেষ্টা করলেই স্নায়ু কেন্দ্রে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলেই আমাদের হাঁচি আসে। সুতরাং হাঁচি আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থারই একটি অংশ। সারাদিনের ব্যস্ততায় মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্ম করে থাকে। অনেকের পেশাগত কারণে ধুলোবালিতেও কাজ করতে হয়। ফলে ধুলোবালি নাকের ভেতর প্রবেশ করে। আল্লাহ তাআলা নাকের পশমগুলোকে এসব বালিকণা এবং তাতে বিদ্যমান জীবাণু প্রতিরোধ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। একটি হাঁচিতে প্রায় ৩ হাজার জীবাণু দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। আর মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় এক সাথে দু'টি হাঁচি দিয়ে থাকে। এভাবে দু'টি হাঁচির সাথে প্রায় ৬ হাজার রোগ-জীবাণু শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, হাঁচির সময় নাক দিয়ে ঘন্টায় প্রায় ১৬০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বের হয়ে আসে। হাঁচিকে বন্ধ করতে চাইলে ডাইভারট হয়ে এ চাপঅন্য অঙ্গে এর প্রভাব পড়ে। যেমন- হাঁচি আসলে তা সুযোগ না দিয়ে বন্ধ করলে তা ডাইভারট হয়ে কান, ব্রেইন, ঘাড়, ডায়াফ্রাম ইত্যাদি অঙ্গের অনেক ক্ষতি করে। এতে কখনো কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে এবং শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।[১৪৫]

আমাদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম রগসমূহে কখনো কখনো বায়ু আটকে যায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কুদরতিভাবে হাঁচির মাধ্যমে প্রেসার দিয়ে নাসিকা পথে এ বায়ু বের করে দেয়া হয়। যদি মস্তিষ্কে এ বাতাস আটকে থাকে, তাবে প্যারালাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য হাঁচি দেয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতে হয়। এমনকি

১৪৪. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: হাঁচি সম্পর্কে, খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং- ৫০৩০

১৪৫.মুফতি জাওয়াদ তাহের, *https://m.dailyinqilab.com.*হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ কেন বলি, ১৩.১১.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)

হাঁচি দেয়ার সময় আমাদের হার্টের কার্যক্রম ২মিলি সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ের মধ্যে আমরা মারাও যেতে পারি। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তেমনটি না ঘটার কারণে তাঁর দরবারে শুকরিয়া জানাতেই আলহামদুলিল্লাহ বলা হয়।[১৪৬]

**হাঁচি দেয়ার সঠিক নিয়ম**

**(ক) হাত বা কাপড় মুখে রাখা:** হাঁচি দেয়া মানুষের স্বভাবগত প্রক্রিয়া হলেও এক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখা উচিত। আমাদের সমাজে এমন অনেক অসচেতন লোক রয়েছে যারা হাঁচি দেয়ার সময় কোনো দিকে খেয়াল করে না। ফলে লাগামহীনভাবে একের পর এক হাঁচি দিয়ে পুরো পরিবেশ বিষিয়ে তুলে। এমনকি হাঁচি দিতে গিয়ে নাকের শ্লেষা পর্যন্ত অন্যের শরীরে গিয়ে পড়ে। যা খুবই অস্বস্তিকর ও ঘৃণ্য ব্যাপার। হাঁচি দেয়ার সময় যেহেতু অসংখ্য রোগ-জীবাণু শরীর থেকে বের হয়, তাই হাঁচি আসলে তা না ফিরিয়ে যথাসম্ভব হাত বা রুমাল দিয়ে আস্তে করে মুখ ঢেকে নিচের দিকে হাঁচি দেয়া। এতে ভদ্রতা বজায় রাখার পাশাপাশি অন্যের শরীরে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না।

**(খ) নিম্ন আওয়াজে হাঁচি দেয়া:** অনেকে খুব উচ্চ আওয়াজে হাঁচি দিয়ে থাকে। এটিও একটি দৃষ্টিকটু কাজ এবং বদ অভ্যাস। এ ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ অসতর্ক অবস্থায় একের পর এক উচ্চ আওয়াজে হাঁচি দিতে থাকেল প্রচন্ড মাথা ব্যথ্যা হতে পারে, গলার রগ ছিঁড়ে যেতে পারে এবং টনসিলেরও সমস্যা হতে পারে। অথচ ইচ্ছা করলে এই বদ অভ্যাসটি পরিহার করে নিম্ন আওয়াজেও হাঁচি দেয়া যায়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا عَطِسَ وَضَعَ يَدَهُ اَوْ ثَوْبَهُ عَلٰى فِيْهِ وَ خَفَضَ اَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি তাঁর হাত অথবা কাপড় তাঁর মুখে রাখতেন এবং যথাসম্ভব আস্তে শব্দ করে হাঁচি দিতেন।[১৪৭]

**(গ) হাঁচির জবাব তিনবার দেয়া:** আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা দুই-তিনবার নয়; বরং টানা বিশ-পঁচিশটি পর্যন্ত হাঁচি দিয়ে প্রতিবারেই 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে থাকে। ফলে পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তি হাঁচির জবাব প্রতিবারেই দেবে কিনা এ নিয়ে দ্বন্দ্বে থাকে। এর সমাধান কল্পে হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ثَلْثًا فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتْهُ وَ اِنْ شِئْتَ فَكُفَّ–

অর্থ: উবায়দ ইবন রিফাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব তিনবার দেবে। এরপর যদি তুমি ইচ্ছা কর জবাব দিতে পারো এবং নাও দিতে পারো।[১৪৮]

অন্য হাদীসে এসেছে–عَنْ اَبِىْ هُرِيْرَةَ قَالَ سَمِّتْ اَخَاكَ ثَلاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامُ

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের হাঁচির জবাব তিনবার দেবে। এরপরও যদি সে হাঁচি দেয়, তবে মনে করবে তা সর্দির কারণে।[১৪৯]

**(ঘ) হাঁচি দিয়ে কেউ আলহামদুলিল্লাহ না বললে:** হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত হলেও শ্রোতার জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব। কিন্তু কেউ যদি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বলে তবে এর উত্তর দেয়ার কোনোপ্রয়োজন নেই। কারণ হাঁচি দিয়ে যে ব্যক্তি শোকরিয়াস্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে নারাজ তার জন্য আল্লাহর দরবারে রহমতের দুআ করা স্বভাবতই অনুচিত। তাই হাদীসে এসেছে-

---

১৪৬. মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা, *https://www.kalerkantho.com/islamic-life.*হাঁচি আল্লাহর নিয়ামত, ২৪.০৬.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

১৪৭.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: হাঁচি সম্পর্কে, খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং- ৫০২৯

১৪৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: হাঁচির জবাব কতবার দিতে হবে, খ. ২, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং- ৫০৩৬৪৯৫২

১৪৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: হাঁচির জবাব কতবার দিতে হবে, খ. ২, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং- ৫০৩৪

عَنْ اَنَسٍ قَالَ عَطِسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدُهُمَا وَ تَرَكَ الْاٰخَرَ قَالَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلَانِ عَطَسَا فَشَمَّتَّ اَحَدُهُمَا وَ تُرِكَ الْاٰخَرُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَ اِنَّ هٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি নবী কারীম (সা.)-এর সামনে হাঁচি দেয়। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দেন এবং অন্যজনের হাঁচির জবাব দেননি। তখন তাঁকে (সা.) বলা হয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'জন হাঁচি দিল অথচ আপনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন আর অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন না ব্যাপার কী? তখন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: এ ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলায় আমি তার হাঁচির জবাব দিয়েছি। আর অন্য ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেনি (কাজেই আমি তার জবাব দেইনি)।[১৫০] অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجَاءَ اَنْ يَّقُوْلَ لَهَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَكَانَ يَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ–

অর্থ: আবু বুরদা (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নবী কারীম (সা.)-এর কাছে এজন্য হাঁচি দিতো যাতে এর জবাবে তিনি (সা.) বলেন: আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন। কিন্তু নবী কারীম (সা.) বলতেন, আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অন্তরকে পরিষ্কার করে দিন।[১৫১]

**হাই দেয়ার সঠিক পদ্ধতি**

প্রত্যেকটি মানুষই প্রতিদিন কারণে অকারণে হাই তুলে থাকে। কখনো কখনো কোনো কাজে বিরক্ত হলে বা অত্যন্ত ক্লান্তবোধ করলে বেশি হাই দিয়ে থাকে। কিন্তু ঘন ঘন হাই তোলা স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। এছাড়া কোনো সুধীমহলে বার বার হাই তুললে মানুষ তাকে ব্যক্তিত্বহীন মনে করে। স্বাভাবিকভাবে হাই তোলা যদিও কোনো দূষনীয় নয়, কিন্তু লাগামহীনভাবে হাই তোলার ক্ষেত্রে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।ইসলাম একটি রুচিশীল ও মানব কল্যাণকামী ধর্ম হওয়ায় যথাসম্ভব নিজেকে সতর্ক রেখে মুখ বন্ধ করে হাই দিতে নির্দেশ প্রদান করে। মুখ খোলে সবার সামনে হা হা করে হাই তুলতে নবী কারীম (সা.) নিষেধ করেছেন।হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَ يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ وَ لَا يَقُلْ هَاهُ هَاهُ فَاِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসে তখন তা যথাসম্ভব প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে এবং হা হা শব্দ করবে না। কেননা এটা শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে, আর এজন্য সে খুশি হয় এবং হাসে।[১৫২]

হাই দেয়ার সময় সাধারণত চোয়ালের জোড়া খুলে যায় এবং বেশি পরিমাণে হাই দিলে চোয়ালের শক্তি আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, অসতর্কভাবে খুব জোড়ে এবং মুখ অধিক ফাঁক করে হাই তোলার কারণে উপরের এবং নিচের চোয়াল একত্র করা সম্ভব না হওয়ায় নিরূপায় হয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। সুতরাং হাই দেয়ার সময় সতর্ক থেকে হাত দ্বারা একটু প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে চোয়াল মাত্রাতিরিক্ত খোলে না। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا تَثَاؤَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ–

১৫০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে না, খ. ২, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং- ৫০৩৯
১৫১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: যিম্মীর হাঁচির জবাব কিরূপে দেবে?খ. ২, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং- ৫০৩৮
১৫২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: হাই তোলা,খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং- ৫০২৮

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন তার মুখ বন্ধ করে নেয়। কেননা মুখ খোলা থাকলে শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।[১৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে عَنْ سُهَيْلٍ نَّحْوَهُ قَالَ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ–

অর্থ: সুহায়ল (রহ.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন সালাতের মধ্যে হাই আসে তখন যথাসম্ভব মুখকে বন্ধ করে রাখবে।[১৫৪]

এছাড়া হাই তোলার সময় মানুষ দীর্ঘ শ্বাস নেয়ায় অধিক বাতাসের সাথে মুখ গহ্বরে অধিক পরিমাণে ধুলাবালি প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় মুখে হাত না রাখলে বাতাসের সাথে ধুলাবালি এবং রোগ জীবাণুশরীরের ভেতর প্রবেশ করতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হাই তোলার সময় যেমন এক বিরাট দীর্ঘ শ্বাস নেয়া হয়, তেমনি এর প্রতিফল হিসেবে একটি দীর্ঘ শ্বাস ছাড়া হয়। আমাদের শরীরের ভেতর থেকে যে শ্বাস ছাড়া হয়, এর নাম কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর প্রতিটি কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে আমাদের শরীর থেকে হাজার হাজার রোগ জীবাণু বের হয়ে আসে। সুতরাং হাই তোলার সময় মুখে মৃদুভাবে হাত রাখলে পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিও এসকল রোগ জীবাণুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। কিছু মানুষের মুখের দুর্গন্ধ এত বিশ্রি থাকে যে নিকটস্থ ব্যক্তির তা সহ্য না হওয়ায় অনেক সময় বমির উদ্রেক হয় এবং পেট পর্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখলে পাশে থাকা ব্যক্তি এমন দুর্গন্ধ থেকে সহজেই পরিত্রাণ পায়।

হাই দেয়ার সময় বা এর প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ(সা.) মুখে বাম হাত ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানের অন্যতম কারণ হলো- হাই তোলার সময় ডান হাত ব্যবহার করলে এর সাথে নির্গত জীবাণু হাতে লেগে যাবে এবং খাওয়ার সময় ডান হাতে লেগে থাকা ঐ জীবাণুগুলো খাবারের সাথে মিশ্রিত হয়ে পেটে প্রবেশ করে নানাবিধ রোগ-ব্যাধির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**ঘন ঘন হাই তোলা থেকে বিরত থাকার উপায়**

**হাঁটা:**অনেকসময় অধিক কাজ করতে গিয়ে বিরক্ত লাগলে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা হাই তুলি। এতে সামনে থাকা ব্যক্তি বা একাধিক মানুষ বিরক্ত হয়। তাই কাজের ফাঁকে বা মিটিং-এর মাঝে অধিক হাই ওঠলে একটু হাঁটা যেতে পারে। ফলে ক্লান্তি এবং একগুঁয়েমি ভাবটা চলে গিয়ে হাই থেমে যাবে।

**পানি পান করা:** ক্লান্ত শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেলেও অনেক সময় লম্বা লম্বা হাই ওঠে থাকে। এমতাবস্থায় পানি পান করলে উপকার পাওয়া যায়।

**লম্বা শ্বাস নেয়া:**অনেক সময় অক্সিজেনের অভাবেও হাই ওঠে। তাই লম্বা লম্বা শ্বাস নিলে তা কমে যায়।লম্বা শ্বাস নিয়ে চেপে রেখে ছেড়ে দিলে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

**হাই তোলা ব্যক্তি এড়িয়ে চলা:**হাই তালা অত্যন্ত ছোঁয়াচে একটি অভ্যাস, যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অজানা। বাস্তবতায় দেখা যায়, কেউ হাই তুললে পাশের ব্যক্তিটিও হাই তোলে। সুতরাং অধিক হাই তোলা ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলাই ভাল। পাশে উপবিষ্ট কাউকে হাই তুলতে দেখলেই সরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসলে সুফল পাওয়া যায়।

**ডাক্তার দেখানো:**অনেক সময়হার্ট ও ফুসফুসের সমস্যা থাকলে ঘন ঘন হাই তোলার সমস্যা হয়। এছাড়া অন্য যেকোন সমস্যার কারণেও অধিক হাই তুললে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

**স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পোশাক-পরিচ্ছদের প্রভাব**

ইসলামী শরীয়তে পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। পোশাক ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শোভা, সৌন্দর্য এবং লজ্জাশীলতার প্রতীক। দেহ ও মানসিকতার ওপর পোশাকের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। মানুষ পোশাক পরিধানের তাগিদ অনুভব করেছিল সেই আদিমকাল থেকেই। আদিম থেকে আধুনিক, সবযুগে আছে পোশাকের কদর। হোক না তা

---

১৫৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: হাই তোলা,খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং- ৫০২৬
১৫৪. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: হাই তোলা,খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং- ৫০২৭

গাছের পাতা কিংবা সুতায় বোনা কাপড়। মানুষ তার লাজুকতায় বশীভূত হয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার প্রবণতা প্রাকৃতিক। তাই নিজে রুচিসম্মত পোশাক পরার পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদেরকেও রুচিসম্মত ও আরামদায়ক পোশাক পরিধান করানো উচিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا– وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ– ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ–

অর্থ: হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[১৫৫]

বাস্তবে মানুষ বিবস্ত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে পোশাকের আবরণে ঢেকে ফেলে। এ চেতনাবোধ স্বভাবজাত। আর ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। ফিতরাতের চাহিদা বিপরীত কোনো নির্দেশনা ইসলামে নেই। এই স্বভাবধর্ম ইসলামে পোশাক নির্বাচন ও পরিধানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা রয়েছে। এসকল নীতিমালা থেকেযা অনুসরণ ও অনুকরণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

পোশাককে আরবিতে 'লিবাস' বলা হয়। এর অর্থ পরিহিত বস্তু বা যা পরিধান করা হয়। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় লেবাস ও পোশাক বলা হয়- যা মানুষের সতর ঢেকে দেয় এবং লজ্জাস্থানকে আবৃত করে। ফিকাহশাস্ত্রের ভাষ্যানুযায়ী- পোশাক তাকেই বলা হয়, যা লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে। আর ন্যূনতম এতটুকু পরিমাণ পোশাক পরিধান করা ফরয।তাই বলা হয়, ফরয পোশাক হলো- যে পোশাক সতর আবৃত করে, গরম ও শীত থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং ক্ষতি থেকে দেহকে হিফাযত করে। আর যে পোশাক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাহলো মুস্তাহাব।পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ

অর্থ: এ পোশাক তোমাদের লজ্জাস্থান আচ্ছাদিত করে।[১৫৬]

**ধর্মীয় দৃষ্টিতে পোশাকের ধরন**

ধর্মীয় দৃষ্টিতে পোশাকের ধরন ৫টি। যথা-

**(১) ফরয পোশাক:** এমন পোশাক যদ্দারা সতর ঢেকে যায়।

**(২) মুস্তাহাব পোশাক:** এমন পোশাক যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পোশাকের মতো বা তাঁর পোশাকের খুব কাছাকাছি অথবা সমকালীন নেককার লোকদের পোশাকের মতো হয়।

**(৩) মুবাহ ও জায়েয পোশাক:** এমন পোশাক যার মধ্যে শরীয়তের সীমানার ভেতর থেকে সৌন্দর্যের প্রতি খেয়াল রাখা হয়।

**(৪) মাকরূহ পোশাক:** এমন পোশাক যা পরিধান করার দ্বারা পরিধানকারীর অহংকার, প্রসিদ্ধি বা অন্যকে ছোট করা উদ্দেশ্য হয়।

**(৫) হারাম পোশাক:** পুরুষ মহিলার মতো এবং মহিলা পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করা হারাম পোশাকের অন্তর্ভূক্ত। নাবালেগ ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রেও এ মাসআলা প্রযোজ্য হবে।[১৫৭]হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلرَّجُلُ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَ الْمَرْاَةُ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীলোকদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের পোশাক পরিধানকারিণী স্ত্রীলোকদের ওপর লানত করেছেন।[১৫৮]

عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ اِنَّ امْرَاَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ–

---

১৫৫.আল-কুরআন, ৭: ২৬

১৫৬.আল-কুরআন, ৭: ২৬

১৫৭. মাওলানা মুহাম্মদ কামরুল হাসান, *ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম*, ঢাকা: মিরপুর, মিডিয়া দাওয়াতী সেন্টার, জানুয়ারী ২০১৭, পৃ. ১৮৩

১৫৮.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: মহিলাদের পোশাক, খ. ২, পৃ. ২১২, হাদীস নং- ৪০৯৮

অর্থ: আবু মুলায়কা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি আয়িশা (রা.)-কে (পুরুষের) জুতা পরিধানকারিণী এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলাদের ওপর লানত করেছেন।[১৫৯]

পুরুষ ও নারীর কাপড় পরিধানের উদ্দেশ্য সতর ঢাকা। যে কাপড় দ্বারা এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, তা পরাও জায়েয নয়। এমনিভাবে মুসলমানের জন্য অমুসলমানের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা জায়েয নয়। যেমন- হিন্দুদের মতো ধুতি ও গলায় পৈতা পরা, কপালে সিঁদুর বা চন্দন লাগানো, বৌদ্ধদের মতো গেরুয়া পোশাক পরিধান করা এবং খ্রিস্টানদের মতো ক্রুশ বা ক্রুশের বিকল্প কিছু পরিধান করা ইত্যাদি। প্রাণির ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করাও নিষিদ্ধ।

**কাপড় পরিধানের কয়েকটি সুন্নাত**

(১) জামা-পায়জামা, কামিজসহ সব ধরনের পোশাক পরিধানের সময় ডান হাত ও ডান পা আগে প্রবেশ করানো।

(২) পুরুষের জন্য পায়জামা, লুঙ্গি, জামা, জুব্বা ও আবা-কাবা টাখনুর ওপরে রাখা।

(৩) সাধারণ কাপড় পরিধানের সময় এই দুআ পড়া- আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি কাসানি হাজা, ওয়া রাযাকানিহি মিন গাইরি হাউলিম মিন্নি ওয়া লা কুওয়াহ। আর নতুন কাপড় পরিধানের সময় এই দুআ পড়া- আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি কাসানি মা উওয়ারি বিহি আউরাতি ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফি হায়াতি।[১৬০]

(৪) বিসমিল্লাহ বলে কাপড় খোলা শুরু করা এবং খোলার সময় বাঁ হাত ও বাঁ পা আগে বের করা।

(৫) জুতা প্রথমে ডান পায়ে তারপর বাম পায়ে পরা এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পা তারপর ডান পা থেকে খোলা।

(৬) নতুন কাপড় ক্রয় করলে পুরনো কাপড় গরিবদের দিয়ে দেয়া।[১৬১]

**পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা**

মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পোশাক অন্যতম। খাবার না খেয়ে মানুষ অনেকটা সময় পার করে দিতে পারলেও পোশাক ছাড়া মানুষের যেন এক মুহূর্তও চলে না।মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো প্রাণী কাপড় পরিধান করে না। কথায় বলে– اَلنَّاسُ بِالِّبَاسِ অর্থাৎ, পোশাকেই মানুষের পরিচয়। সুতরাংআমাদের সমাজেও প্রতিটি মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী পোশাক পরিধান করে থাকে এবং এই পোশাক-পরিচ্ছদেই অনেকাংশে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, কৃষ্টি-কালচার, রুচি ও স্বভাব-চরিত্রফুটে ওঠে। তাই ইসলামে পোশাকের ওপর গুরুত্বরোপ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধানের নির্দেশ প্রদান করেছে। তবে অনেকে নিজেকে নিরহংকার বা সূফী হিসেবে পরিচয় দেয়ার জন্য অথবা হীনভাব দেখানো বা পোশাকের প্রতি কেনো গুরুত্ব না দিয়ে অপরিষ্কার এবং নিম্নমানের পোশাক পরিধান করে থাকে। ইসলাম এটাকে কখনো সমর্থন করে না এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিও এমন নয়।হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ اَ لَكَ مَالٌ؟ قَالَ نَعَم– قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ؟ قَالَ قَدْ اَتَانِىَ اللهُ مِنَ الْاِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيْقِ– قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَ كَرَامَتِهِ–

অর্থ: আবুল আহওয়াস (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি নবী কারীম (সা.)-এর নিকট ময়লা কাপড় পরিধান করে গেলে, তিনি ইরশাদ করেন: তুমি কি সম্পদশালী নও? বলেন, হাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন: তুমি কোন ধরনের সম্পদের অধিকারী? জবাবে তিনি বলেন, মহান আল্লাহ আমাকে উট, বকরী, ঘোড়ার পাল ও গোলাম দান করেছেন। তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছেন, তখন এর নিয়ামত ও কারামতের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশ পাওয়া উচিত।[১৬২]অন্য হাদীসে এসেছে-

---

১৫৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১২, হাদীস নং- ৪০৯৯

১৬০. মাওলানামুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

১৬১. প্রাগুক্ত

১৬২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখা,খ. ২, পৃ. ২০৭, হাদীস নং- ৪০৬৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَاَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ اَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ– وَ رَاَى رَجُلاً اٰخَرَ عَلَيْهِ ثِيَابَ وَ سِخَةٌ فَقَالَ اَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ–

অর্থ: জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট এসে এক ব্যক্তির মাথার চুল এলোমেলো দেখে ইরশাদ করেন: এ ব্যক্তির কি চুল আঁচড়ানোর মত কিছু নেই? অপর এক ব্যক্তির পরিধানে ময়লা কাপড় দেখে বলেন: সে কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য পানি পায়না?[১৬৩]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَيِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يَّرٰى اَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلٰى عَبْدِهِ–

অর্থ: আমর শুয়াইব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন।[১৬৪]

عَنْ قَيْسِ بْنِ نَصْرٍ التَّغْلِبِىِّ... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى لاَ يُحِبُّ الْفَحْشَ وَ لاَ التَّفَحُّشَ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَالشَّامَّةِ فِى النَّاسِ–

অর্থ: কায়স ইবন নাসর তাগলিবী (রা.) থেকে বর্ণিত।... রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: নিশ্চয় মহান আল্লাহ বেহুদা কথোপকথনকারী এবং ময়লা-অপরিষ্কার থাকা ব্যক্তিকে ভালবাসেন না। যাতে তোমরা লোকদের মাঝে অপয়া হও।[১৬৫]

মনোবিজ্ঞানীগণ পোশাক পরিচ্ছন্নতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকেন। কারণ পরিচ্ছন্ন পোশাক মানুষের পুরো জীবনের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরিধান করে মানুষের সাথে মিলিত হলে সমাজে তার প্রতি সম্মানের দৃষ্টি পড়েনা; বরং তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর এ হীনদৃষ্টি উভয়কে মনস্তাত্ত্বিক রোগে আক্রান্ত করে তোলে। তাইভালো পোশাক পরিধান করলে মন-মানসিকতা যেমন প্রফুল্ল থাকে, তেমনি অপরিষ্কার ও ময়লাযুক্ত পোশাক পরিধান করলে নিজের কাছেই নিজেকে বিব্রত লাগে।

তাছাড়া মুসলিম সমাজে'মুআনাকা' বা বুকে বুক মিলানোর একটি সুন্নাত চালু রয়েছে। কারো কাপড় ময়লা থাকলেঅপরজন স্বাভাবিকভাবেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুআনাকা করতে বিব্রতবোধ করবে। যদিও পরিবেশ-পরিস্থিতি বা ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় মনের বিরুদ্ধেঅপরিচ্ছন্ন কাপড় পরিহিত ব্যক্তির সাথেওমুআনাকা করতে হয়, কিন্তু এটি একটি রুচি বিবর্জিত কাজ, যা মোটেও সমীচীন নয়।

সুতরাং পোশাক আল্লাহ তা'আলার এক স্মারকচিহ্ন। পোশাক পরিধান করে উপরোক্ত নিয়ামতের কথা নতুন করে স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। তাই মানুষকে ভালো এবং নতুন পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেইসলাম শুধু নির্দেশনাই প্রদান করেনি; বরং উৎসাহও প্রদান করেছে। এমনকি নতুন পোশাক পরিধানকারী যদি নিম্নের দু'আটি পড়ে তাহলে এটি তার গোনাহ মাফের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ لَّبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَ لاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَ تَاَخَّرَ–

অর্থ: মুআয ইবন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে দুআটি পড়বে- "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন এবং এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমার শক্তি ও চেষ্টা ব্যতীত" তার আগের ও পরের জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[১৬৬]

---

১৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৭, হাদীস নং- ৪০৬২

১৬৪. *জামি আত-তিরমিযী*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন, খ. ২, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং- ২৮১৯,

১৬৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: পায়ের টাখনুর নিচে লুংগী পরিধান করা,খ. ২, পৃ. ২১০-২১১, হাদীস নং- ৪০৮৯

১৬৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, খ. ২, পৃ. ২০২, হাদীস নং- ৪০২৩

عَنْ اَبِىْ شَعِيْدِ الْخُدرِىْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ اِمَّا قَمِيْصًا اَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ مَا صُنِعَ لَهُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ- قَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ وَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا لَبِسَ اَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا قِيْلَ لَهُ تُبْلِىَ وَ يُخْلِفُ اللهُ تَعَالٰى-

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তা জামা হোক বা পাগড়ী, তিনি এর নাম নিয়ে এই দুআ পড়তেন- হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই। আপনি আমাকে এ পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট এর বরকত এবং যার জন্য তা নির্মিত হয়েছে, তার বরকত প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট খারাবী যার জন্য তা তৈরি হয়েছে, তার অমংগল হতে পানাহ চাচ্ছি। রাবী আবু নাযরা (রহ.) বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর সাহাবীগণের এই অভ্যাস ছিল, যখন তাদের কেউ নতুন কাপড় পরিধান করত, তখন লোকেরা তাকে বলত: তুমি এ কাপড় পরিধান করে পুরানা করো এবং আল্লাহ তোমাকে আরো নতুন কাপড় পরিধান করান।[১৬৭] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُتِىَ بِكِسْوَةٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ صَفِيْرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ اَحَقُّ بِهٰذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ- فَقَالَ اِيْتُوْنِىْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِىَ بِهَا فَاَلْبَسَهَا اِيَّهَا ثُمَّ قَالَ اَبْلِىْ وَ اَخْلِقِىْ مَرَّتَيْنِ وَ جَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى عَلَمٍ فِى الْخَمِيْصَةِ اَحْمَرَ وَ اَصْفَرَ وَ يَقُوْلُ سَنَاهُ سَنَاهُ يَا اُمَّ خَالِدٍ- وَ سَنَاهُ فِىْ كَلَامِ الْحَبْشَةِ الْحَسَنُ-

অর্থ: খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কয়েকটি কাপড় হাদিয়া আসে। যার মধ্যে একটি ডোরা কাটা পশমী চাদরও ছিল। তিনি (সা.) বলেন: তোমরা কাকে এ চাদর পাওয়ার উপযুক্ত মনে করো? তখন সকলে চুপ থাকলে তিনি (সা.) বলেন: তোমরা উম্মু খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন তাকে আনা হলে তিনি (সা.) তাকে সে চাদর পরিয়ে দেন এবং দু'বার এরূপ বলেন: তুমি একে পরিধান করে পুরানা করে ফেল। আর তিনি সে চাদরের লাল ও হলুদ রংয়ের ডোরার দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন: সানাহ, সানাহ! হে উম্মু খালিদ! উত্তম কোনো বস্তুকে হাবশী ভাষায় সানাহ বলা হয় (খুব সুন্দর বা চমৎকার)।[১৬৮]

উম্মতকে নতুন এবং মূল্যবান পোশাক পরিধানের ছবক প্রদানের নিমিত্ত অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও মূল্যবান পোশাক পরিধান করেছেন। হাদীসে আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ مَلِكَ ذِىْ يَزَنَ اَهْدٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حُلَّةً اَخَذَهَا بِثَلٰثَةٍ وَّ ثَلٰثِيْنَ بَعِيْرًا اَوْ ثَلٰثٍ وَّ ثَلٰثِيْنَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا-

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা যী-য়াযান বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য একজোড়া কাপড় হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন, যা তিনি তেত্রিশটি উট বা উষ্ট্রীর বিনিময়ে খরিদ করেন এবং তিনি তা কবুল করেন।[১৬৯]

عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اشْتَرٰى حُلَّةً بِبِضْعَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ قُلُوْصًا فَاَهْدَاهَا اِلٰى ذِىْ يَزَنَ-

অর্থ: ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ ইবন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) যী-য়াযান বাদশার জন্য বিশ থেকে অধিক উষ্ট্রীর বিনিময়ে একজোড়া কাপড় খরিদ করে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন।[১৭০]

---

১৬৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০২, হাদীস নং- ৪০২০
১৬৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: নতুন কাপড় পরিধানকারীকে কী বলে সম্ভাষণ জানাবে? খ. ২, পৃ. ২০২, হাদীস নং- ৪০২৪
১৬৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রেশম ও পশমের কাপড় পরিধান করা, খ. ২, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ৪০৩৫
১৭০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ৪০৩৬

একদা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) কোনো কারণে ইয়ামেনের তৈরি একটি উত্তম পোশাক পরিধান করে বের হলে কতিপয় লোক তাচ্ছিল্যতার সাথে বলেন, তুমি এ কী পরিধান করেছ? উত্তরে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন-

مَا تَعِيْبُوْنَ عَلَيَّ لَقَدْ رَاَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْحُلَلِ-

অর্থ: তোমরা এ পোশাক পরিধান করার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করছ! আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এর চেয়েও উত্তম পোশাক পরিধান করতে দেখেছি।[১৭১]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার বান্দাদেরকে উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন- يٰبَنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا- اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

অর্থ: হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করো। আর খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[১৭২]

এছাড়া বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা হাজারো প্রচেষ্টা করে মানুষকে এ থেকে পরিত্রাণ দেয়ার কোনোকূল-কিনারা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হিসেবে বার বার হাত ধোয়ার পাশাপাশি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরিধানের কথা বলা হচ্ছে। কারণ ময়লা কাপড় থেকে দ্রুত রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা ব্যাপক ক্ষতি বয়ে আনে। হাসপাতালে বা যে ঘরে কোনো ত্বকের ইনফেকশনে আক্রান্ত অথবা কলেরা বা ডায়রিয়ার রোগী রয়েছে, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় ময়লা কাপড় রোগ বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাকে দুর্গন্ধ, ময়লা-আবর্জনা ও বিভিন্ন জীবাণু লেগে থাকে। অনেক জীবাণু খুব দ্রুত রোগ-ব্যাধি বিস্তারকারী হওয়ায় গোটা পরিবেশেতা বিস্তার ঘটিয়েপরিস্থিতিকে কলুষিত করে তুলে।

তাই বাড়িতে থাকলেও দিনে অন্তত দু'বার জামা-কাপড় বদলানোর কথা বলা হয়। কারণ ব্যবহৃত পোশাকে সবসময়েই নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস এসে জমে। সারাদিন একই জামা পরিধান করলে সেখান থেকেও সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। যে কাপড় পরিধান করে বাইরে থেকে ঘরে এসেছে এতে যে লক্ষ লক্ষ জীবাণু রয়েছে, তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা ব্যবহৃত জামা প্রতিদিন একবার ধোয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে।

স্বভাবতই বাজারে গিয়ে পোশাকের হাজারো সংগ্রহ দেখে অনেক সময় উত্তম ও মূল্যবান পোশাক ক্রয় করতে মন চায়। এক্ষেত্রে প্রায়ই দীনদ্বার ব্যক্তি এমন উত্তম পোশাক ক্রয় করা অপচয় হয় কিনাসংশয়ে থাকে। বাস্তবতা হলো প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী আরামদায়ক ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষে নি:সন্দেহে মূল্যবান এবং উত্তম পোশাক পরিধান করা যাবে। এতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলাرِيْشًاশব্দ উল্লেখ করেছেন যার অর্থই হলো- আমি তোমাদের সাজসজ্জার জন্য পোশাক তৈরি করেছি।رِيْشًا-এর মৌলিক অর্থ পাখির পালক। পাখির পালক হলো পাখির জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের উপায় এবং তার শরীর রক্ষার উপকরণ। সাধারণ ব্যবহারেرِيْشশব্দটি পালক, সম্পদ, সৌন্দর্য, উত্তম পোশাক, সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়।[১৭৩] আর পোশাকের মাধ্যমেই একজন মানুষের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তাই পোশাক হওয়া উচিত দৃষ্টিনন্দন, যেন প্রকৃতপক্ষেই তা দেহাবয়বকে সুশোভিত করে। রং-ঢংহীন, দৃষ্টিকটু এবং ঘৃণার উদ্রেক করে এমন পোশাক পরিধান করা এ মূলনীতির পরিপন্থী। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয়। কোনো বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই যারা আল্লাহর হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করাকে হারাম মনে করে সেসব লোক

---

১৭১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৪, হাদীস নং- ৪০৩৮

১৭২ . আল-কুরআন, ৭: ৩১

১৭৩. *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয়, যা অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ– قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ– كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ–

অর্থ: আপনি বলুন: আল্লাহর সাজসজ্জাকে যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন: এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা বুঝে।[১৭৪]

পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গকে আল্লাহ তাআলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন এবং তাঁরা এসব নিয়ামতের শোকরিয়া আদায়ে প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ (সা.)ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ির বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম।বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) ৪০০ গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালিক (রহ.) সবসময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারাবছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বস্ত্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয় দিন ব্যবহার করতেন না। মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোনো দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে ওঠাকে পছন্দ করেন। তাই নিয়ামত ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃকজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করাঅকৃকজ্ঞতা।

একবার প্রখ্যাত সূফী হযরত আবুল হাসান আলী শাযালী (রহ.) অত্যন্ত দামি কাপড় পরিহিত ছিলেন। জনৈক সূফী তাঁকে এমতাবস্থায় দেখে প্রতিবাদ করে বললেন, আল্লাহ ওয়ালাদের এতো মূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পোশাক পরিধান করার কী প্রয়োজন? হযরত শাযালী (রহ.) বললেন, ভাই! এটা হলো মহান প্রতাপশালী এবং মহা শক্তিশালী আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞার বহি:প্রকাশ। আর তোমার এ সহায়-সম্বলহীনতা হলো ভিক্ষুকদের মতো, তুমি এ অবস্থার দ্বারা মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করছো। প্রকৃতপক্ষে ছেঁড়া-ফাটা, পরানো এবং তালি দেয়া নিম্ন মানের কাপড় পরিধান করার মধ্যেই পরহেযগারী সীমাবদ্ধ নয় এবং অত্যন্ত মূল্যবান ও গৌরবময় পোশাক পরিধান করার মধ্যেও নয়। পরহেযগারী মানুষের নিয়ত ও সার্বিক চিন্তাধারার ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃত সত্য কথা হলো, মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতানুযায়ী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সমতা রক্ষা করে চলবে। সহায়-সম্বলহীনতার বেশ ধারণ করে নিজের আত্মাকে যেমন অহংকারী হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না, তেমনিভাবে চমক লাগানো ও মূল্যবান চাকচিক্যময় পোশাক পরিধান করার পর গৌরব ও অহংকারও প্রদর্শন করা যাবে না।এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শখ হয় যে আমার পোশাক সুন্দর হোক, মাথায় তেল থাকুক, জুতাগুলোও উত্তম হোক। এভাবে অনেকগুলো জিনিসের কথা বললো। এমনকি সে বলল, আমার হাতের লাঠিটিও অত্যন্ত সুন্দর হোক। রাসূলুল্লাহ (সা.) তদুত্তরে ইরশাদ করলেন: এসব কথা পছন্দনীয়, আল্লাহ তাআলাও সুন্দর রুচিকে ভালবাসেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যার অন্তরে অনু পরিমাণও অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এক ব্যক্তি ওঠে বললো, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) প্রত্যেক ব্যক্তিই তো এটা চায় যে, তার কাপড় এবং জুতা জোড়া সুন্দর হোক (এও কি অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত?) রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন (অর্থাৎ উত্তম পোশাক অহংকার নয়, বরং তা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত)। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো সত্যের পরোয়া না করা এবং অন্যকে হীন ও নিকৃষ্ট মনে করা।তবে পোশাক যদি নিজের মনোরঞ্জন বা

১৭৪. আল-কুরআন, ৭: ৩২

আরামের উদ্দেশ্য না হয়ে শুধুমাত্র লোক দেখানো ও নাম-যশ এবং গর্ব-অহঙ্কারের জন্য হয়, তাহলে এমন পোশাক পরিধান করা জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী-

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ الْبَسُوْا وَ تَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَ لاَ مَخِيْلَةٍ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا اَخْطَئَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌاَوْ مَخِيْلَةٌ–

অর্থ: তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো এবং দান করো, তবে অপচয় ও অহংকার পরিহার করো। ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পরিধান করো, যতক্ষণ না দু'টো জিনিস তোমাকে বিভ্রান্ত করে- অপব্যয় এবং অহঙ্কার।[১৭৫]

বর্তমান যুগ হচ্ছে ফ্যাশনের যুগ। মানুষের চিন্তা-চেতনা বদলে যাওয়ায় এবং রুচির বিকৃতি ঘটায় পছন্দ-অপছন্দ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। পুরো পৃথিবীর মানুষ আজ ফ্যাশনের পেছনে দৌড়াচ্ছে। গতকালের ফ্যাশন আজ পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারীরা বেশ অগ্রসর এবং অধিকাংশ নারীই ফ্যাশনপুজারী। তাদের নিকট পোশাক যেন নিজের জন্য নয় অন্যের জন্য। পোশাক পরিধান করে অপরের সামনে গেলে এ সর্ম্পকে দু' একটি স্তুতি যেন শোনতেই হবে। এক অনুষ্ঠানে এক ধরনের স্যুট পরলে অন্য অনুষ্ঠানের সময় তা পাল্টাতেই হবে। বিভিন্ন প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রকাশের তাড়নায় বর্তমানে ফ্যাশনের নামে এমন সব উদ্ভট ধরনের পোশাকপরিধান করা হয়, যা নারী জাতির জন্য খুবই লজ্জাজনক। সত্যিকথা বলতে ফ্যাশনের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। এক সময় বড় ও ঢিলেঢালা পোশাক ছিল ফ্যাশন, বর্তমানে চলছে সংক্ষিপ্ত পোশাকের ফ্যাশন। অতীতে যা ছিল নন্দিত, বর্তমানে তা হয়ে গেল নিন্দিত। সুতরাং ফ্যাশন অস্থির। পক্ষান্তরে শরীয়ত হলো স্থির এবং সবকিছুর মাপকাঠি। তাই পোশাকের ক্ষেত্রেও ফ্যাশনের পেছনে না দৌড়ে মুসলমান হিসেবে কুরআন-হাদীসে কী বলা আছে তা অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

### পোশাকের রং ও ধরনে মানুষের ওপর প্রভাব

#### সাদা পোশাক

সাদা এমন একটা রং যা আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের, কবির কবিতায়, গীতিকারের গীতে এবং শিল্পীর তুলিতে অসংখ্যবার জয়ধ্বনি হয়েছে। সাদা রং নিয়ে আমাদের মুগ্ধতা আর ভালো লাগার যেন শেষ নেই।তাইতো ঘরের দেয়াল থেকে শুরু করে বিছানার চাদর এবং খাবারের বাসন থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র আমরা শুভ্রতায় মুড়ে দিই। কারণ এ রংটি আমাদের হৃদয়ে শুভ্রতা ও  সজীবতার পরশ এবং পবিত্রতার অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে জাগিয়ে তোলে। সাদা কবুতরকে বিশ্বব্যাপী শান্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের জীবনেওশান্তি ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সাদা রংয়ের এক বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

সাদাকে বলা হয় মৌলিক রং। রংধনুর সাত রংয়ের আলোর মিশেলে নাকি সাদা আলোর সৃষ্টি হয়। এজন্যই সব রংয়ের মাঝে সাদা রংটি তার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল। সাদা রংয়ের সংস্পর্শে আসলে অন্যরকম ভালো লাগায় মন ভরে ওঠে। সাদা পোশাকে মন যেমন সাদা ও প্রফুল্ল হয় অন্য কোনো পোশাকে তা হয় না। সুতরাং নিজের প্রিয় পোশাকটি যদি সাদা হয় তাহলে ভালো লাগায় এক ভিন্নমাত্রা যোগ হয়। সাদা পোশাক পরিধান করলে শুধু নিজের কাছেই ভালো লাগে না; বরংসাদার শুভ্রতায় আশেপাশে থাকা মানুষের মনও ভালো হয়ে যায়। সাদার আবেদন শুধু তার শুভ্রতায় নয়, এটি অন্যতম আরামদায়ক পোশাকও বটে এবং শত শত বছর ধরে ফ্যাশনের ক্ষেত্রে সাদা পোশাকের আলাদা কদরও রয়েছে।

পোশাকের রং নিয়ে প্রত্যেকেরই কিছু নিজস্ব পছন্দ থাকে এবং একেকজন একেক রংয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করলেও সব রং ছাপিয়ে সাদা রংয়ের ভিন্ন একটি গুরুত্ব রয়েছে। তাইআন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভদ্র ও মার্জিত পোশাক হিসেবে

---

১৭৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী- বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদিগের জন্য ... খ. ২, পৃ. ১৬৪০

সাদাকে মাপকাঠি ধরা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যে কেনো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের শালীন পোশাক হলো সাদা রংয়ের ফুল হাতার পোশাক। আর এ কারণেই বিশ্বজুড়ে ডাক্তার ও নার্সরা তাদের পোশাকের ওপর বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে সাদা রংয়ের অ্যাপ্রোন পরিধান করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও সাদা পোশাককে পছন্দ করতেন এবং তিনি অধিকাংশ সময় সাদা পোশাক পরিধান করতেন। তাই সাদা কাপড় পরিধান করা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি সুন্নাত। তিনি উম্মতের জন্য যেমন ছিলেন রূহানীর চিকিৎসক, তেমনি ছিলেন শারীরিক চিকিৎসকও। নানা উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি সাদা পোশাকের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيْضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ– وَ كَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করবে। কেননা, তা তোমাদের জন্য উত্তম কাপড়। আর তোমরা সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদের দাফন করবে।[১৭৬]অন্য এক হাদীসে আছে– عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَه قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ–

অর্থ: আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-এর নিকট আসলাম। তাঁর পরিধানে তখন সাদা পোশাক ছিল।[১৭৭]

চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ চর্ম, এলার্জি এবং উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের সর্বদা সাদা পোশাক পরিধানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ক্রোমোপেথী নীতি অনুযায়ী সাদা পোশাক মস্তিষ্ক, হৃদপিন্ড ও চর্মের সংরক্ষক।

সাদা কাপড় সর্বপ্রকার আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে থাকে। সাদা পোশাক তাপ শোষণ না করায় গ্রীষ্মকালেও তাগরম হয় না এবংগ্রীষ্মকালের জন্য এটি বিশুদ্ধ ও শান্তির রঙ। সাদা রংয়ের স্বচ্ছতা ও আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে বলেই গরমকালে আরাম অনুভূত হয়। তাই গরমে তাপের তীব্রতা কম অনুভব করতে সাদা পোশাক পরা উচিত। অপরদিকে তীব্র শীতের মওসুমে ঠান্ডার কারণে তা শীতলও হয় না।রং ও আলো বিশেষজ্ঞগণ বলেন- সাদা পোশাক হল ক্যান্সার থেকে প্রতিরক্ষার সর্বোত্তম ঔষধ। এছাড়া সাদা পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তি ঘামের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ও ছোতো রোগের ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

সাদা কাপড় পরিধানের আরেকটি তাত্ত্বিক বিষয় হলো, সাদা কাপড়ে যদি সামান্যতমও দাগ লাগে তবে তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হওয়ায় মানুষ তাড়াতাড়িতা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। সাদা কাপড় ছাড়া অন্য রংয়ের কাপড়ে দাগ লাগলে তা সহজে দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তাড়াতাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করার প্রয়োজন বোধ অনুভব করে না। ফলে তা অপরিষ্কার থেকে যায় এবং এই অপরিষ্কার কাপড় দিনের পর দিন ব্যবহার করার কারণে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে।

বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতাভারতবর্ষের জনসাধারণকে সাদা পোশাক পরিধান করতে দেখে খুবই প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমি ভারতবর্ষের লোকদের দেখেছি, তারা সাদা পোশাক পরিধান করে। এর উপকারিতা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি।[১৭৮]
খলিল জিবরান ছিলেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও লেখক। তিনি সাদা পোশাককে সাদা ফুলের সমতুল্য মান্য করতেন। তিনি বলেন, গোলাপের সাদা পাঁপড়ি ও আমার দেহের সাদা পোশাক উভয়টিই সম পর্যায়ের। আর উভয়টিই আমার আনন্দের সামগ্রী।

**সবুজ পোশাক**

---

১৭৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: সাদা কাপড়, খ. ২, পৃ. ২০৬-২০৭, হাদীস নং- ৪০৬১
১৭৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: সাদা পোশাক, খ. ২, পৃ. ১৬৫১, হাদীস নং-৫৮২৭
১৭৮. *সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান*, খমাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সাদা রং প্রিয় হলেও এর পাশাপাশি রঙ্গীন পোশাকের মধ্যে সবুজ পোশাককেও ভালবাসতেন। কারণপ্রতিটি রং থেকে অদৃশ্য কিছু আলোক রশ্মি বের হয়েমানুষের মনের ওপর খুবই প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে শরীর ও মনের প্রশান্তি আনার ক্ষেত্রে সবুজ রংয়ের তুলনা হয় না। বিশ্বের প্রায় সকল গাছ, ঘাস এবং লতা-পাতার রং সবুজ। তাই একে প্রকৃতির রং বলার পাশাপাশি সবচেয়ে পরিপূর্ণ রং মনে করা হয়। মস্তিষ্কের প্রশান্তির জন্য সবুজ রংয়ের বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে এই রং। সবুজ রং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবংপেশী ও স্নায়ুচাপ কমানোর পাশাপাশি সব ধরনের চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। তাই বিজ্ঞানীরা সুযোগ পেলেই বারবার সবুজের দিকে তাকানোর কথা বলেন। সম্ভব হলে সবুজ রংয়ের জিনিস দিয়ে অফিসের ডেস্ক সাজানোর কথাও বলা হয়। সম্প্রীতি, প্রকৃতি, নিরপেক্ষতা ও অপ্রতিরোধের ভারসাম্য রাখার জন্য এই রংয়ের ব্যবহার করা হয়। সূর্যের যে সাতটি রং রয়েছে সবুজ তার মধ্যে অন্যতম। গাছের পাতা যদি এই সূর্যরশ্মি না পেত তাহলে আমাদের পৃথিবী এতো সুন্দর ও দৃষ্টি নন্দন না হয়ে এক বিরান ভূমিতে পরিণত হতো। পৃথিবীতে সবুজের বিস্তৃত উপস্থিতি প্রাণের অস্তিত্ব নিশ্চিত করায় একে নিশ্চয়তার প্রতীক বলেও মনে করা হয়।

তাছাড়া আমরা সবাই জানি, ডাক্তাররা সবসময় সবুজ শাক-সবজি খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন। কারণ সবুজ শাক-সবজিতে যে লুটেইন গিক্সাথিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, তা ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য খুবই উপকারি। আর এজন্যই চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সবাইকে সবুজ রংয়ের প্রতি বেশি বেশি দৃষ্টিপাত করার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْنَا لِاَنَس يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ اَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوْ اَعْجَبَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ–

অর্থ: কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি, নবী কারীম (সা.)-এর কোন ধরনের পোশাক অধিক প্রিয় ছিল? অথবা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন ধরনের পোশাক অধিক পছন্দ করতেন? তিনি বলেন- 'হিবারা' অর্থাৎ ইয়ামনের তৈরি সবুজ ডোরা বিশিষ্ট চাদর।[১৭৯] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ رَمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ اَبِىْ نَحْوَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَرَاَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ اَخْضَرَيْنِ–

অর্থ: আবুল রামছা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদিন আমি আমার পিতার সাথে গিয়ে নবী কারীম(সা.)-কে দু'টি সবুজ রংয়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই।[১৮০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমন সবুজ পোশাক ভালোবাসেন, তেমনি আল্লাহ তাআলাও সবুজ পোশাক পছন্দ করেন। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা জান্নতীদের জন্য সবুজ রংয়ের পোশাক নির্বাচন করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لاَ نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً– اُولٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الاَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا–

অর্থ: যারা বিশ্বাশ স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম স্থুল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।[১৮১]

---

১৭৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: সাদা কাপড়, খ. ২, পৃ. ২০৬, হাদীস নং- ৪০৬০
১৮০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: সবুজ রং, খ. ২, পৃ. ২০৭, হাদীস নং- ৪০৬৫
১৮১. আল-কুরআন, ১৮: ৩০-৩১

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোনোমুসলমানকে বস্ত্র দ্বারা তার শরীর আবৃত করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করিয়ে তার শরীরও আবৃত করবেন।[১৮২]

সুতরাং সবুজ বর্ণ, বাগ-বাগিচা, ফুল ইত্যাদি দর্শন করা আত্মা ও শারীরিক প্রশান্তি লাভে যেমন খুবই উপযোগি, তেমনি সবুজ পোশাকও দৈহিক প্রশান্তির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রদ। ক্রোমোপ্যাথি বিশেষজ্ঞগণের মতে, সবুজ পোশাক শরীরের অগণিত রোগ-ব্যাধির জন্য শিফা। এবিষয়ে তাদের পূর্ণাঙ্গ গবেষণাও রয়েছে। তাদের গবেষণা মতে- সবুজ পোশাক আলসার, গ্যাষ্ট্রিক, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক খিঁচুনী, নৈরাশ্য, উচ্চ রক্তচাপ ও চর্ম রোগসহ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে।সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক পছন্দনীয় সবুজ রং কতই না মূল্যবান ও বরকতময়।

**লাল পোশাকের নিষিদ্ধতা**

আবহমানকাল ধরে মানুষ লাল রংকে নিষেধের রং হিসেবে জেনে এসেছে। ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে খেলার মাঠের লাল কার্ড সর্বত্রই নিষেধাজ্ঞা। রক্ত এবং আগুন উভয়ই লাল। রক্তপাত মানুষকে মেরে ফেলে এবং লাল আগুন সব কিছুকে ধ্বংস করে ফেলে। ক্রমে লাল হয়ে ওঠে সর্বজন স্বীকৃত বিপদ সংক্ষেত এবং চরমের প্রতীক।লালকে বিপ্লবের রং হিসেবেও গণ্য করা হয়। স্মরণাতীতকাল থেকে লাল রং অগ্নি, আবেগ, আসন্ন বিপদ ও ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রোমানরা যুদ্ধের ক্ষেত্রে শরীরের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড জাগ্রত করতে লাল পতাকা ব্যবহার করতো। কারণ লাল রং দেখলে এড্রিনাল হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়তি শক্তি অনুভব হয়। স্পারটারাও ঐ একই কারণে লাল পতাকা ব্যবহার করতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) পোশাক হিসেবে লাল রংকে পছন্দ করতেন না। লাল রং মানুষের শরীরে যে কুপ্রভাব বিস্তার করে এখন তা বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত। হাদীসে এসেছে-

عَن ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثَرِ الْحُمْرِ وَ الْقَسِّيِّ–

অর্থ: বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) আমাদের লাল রঙ্গের মীছারা (এক ধরনের কাপড়) ও কাসসী (সিরিয়া বা মিসর থেকে আমদানীকৃত এক ধরনের কাপড়) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।[১৮৩] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى رَوَاحِلِنَا وَ عَلٰى اِبِلِنَا اَكْسِيَةً فِيْهَا خُيُوْطُ عِهْنٍ مُمْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَا اَرٰى هٰذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتّٰى نَفَرَ بَعْضُ اِبِلِنَا فَاَخَذْنَا الاَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا–

অর্থ: রাফি ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বের হই। এ সময় তিনি (সা.) আমাদের উটের পালানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, যার উপর পশমের তৈরি লাল রংয়ের দাগ বিশিষ্ট জীন-পোশ ছিল। তা দেখে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদের ওপর লাল রংয়ের প্রাধান্য দেখছি না? আমরা তাঁর (সা.) এ কথা শুনে এত দ্রুত দাঁড়িয়ে যাই যে এতে কোনো কোনো উট ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। অত:পর আমরা জীন-পোশ পালান থেকে সরিয়ে ফেলি।[১৮৪]

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ مَّيَاثِرَةِ الأُرْجُوَانِ–

অর্থ: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) লাল রংয়ের জীন-পোশ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১৮৫]

---

১৮২. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিয়ামত, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই), খ. ২, পৃ. ১৯৬, হাদীস নং- ২৪৪৯

১৮৩.*সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: কাসীস পরিধান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৫৫, হাদীস নং-৫৮৩৮

১৮৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: লাল রং, খ. ২, পৃ. ২০৮, হাদীস নং- ৪০৭০

১৮৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: রেশমী কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞা, খ. ২, পৃ. ২০৬, হাদীস নং-৪০৫১

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثَوْبَانَ اَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি দু'টি লাল রংয়ের কাপড় পরিহিত অবস্থায় নবী কারীম (সা.)-এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে সালাম করেন। কিন্তু নবী কারীম (সা.) তার সালামের জবাব দেননি।[১৮৬]

বাস্তবে লাল রং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং মানুষকে সহজেই ক্ষেপিয়ে তুলে। যুক্তরাষ্ট্রের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যান্ড্রু এলিয়ট বলেন, লাল রং আমাদের শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো বাড়িয়ে দেয়। কারণ একে বিপদ সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেন, মানুষ যখন রাগান্বিত হয় অথবা কাউকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয় তখন তার মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা দেখা দেয়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কোনো মানুষ যখন লাল রং দেখে তখন তার প্রতিক্রিয়াগুলো খুব দ্রুত এবং প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। যদিও মানুষ রংয়ের এই উত্তেজক কার্যকারিতার ব্যাপারে সজাগ নয়। অন্য এক গবেষণায় দেখা যায়, দক্ষতার সাথে মানসিক এবং যান্ত্রিক কাজ সম্পাদনে লাল রং নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন, প্রতিযোগী দুই খেলোয়ারের মধ্যে একজন লাল পোশাক পরে থাকলে অপরজনের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। একইভাবে পরীক্ষার আগে লাল রং দেখলে কোনো শিক্ষার্থীর খারপ রিজাল্ট করতে পারে।

যাবতীয় আলোর মধ্যে লাল রংয়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হওয়ায় একে সবচেয়ে শক্তিশালী রং বলা হয়। লাল রং মানুষকে উদ্দীপিত করে এবং হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। লাল রংয়ের সংস্পর্শে থাকলে সময় তুলনামূলক দ্রুত অতিবাহিত হচ্ছে বলে মনে হয়। লাল রং শরীরের হরমোনের ওপর বিরোপ প্রভাব ফেলায়এক ধরনের বিশেষ আর্দ্রতা শরীর থেকে বের হয়ে রক্তের সাথে যুক্ত হয়। আর এই আর্দ্রতা থেকেই মনস্তাত্ত্বিক ও ক্রোমোপ্যাথী বিশেষজ্ঞগণের মতে-উচ্চ রক্তচাপ, কামোত্তেজনা, চর্মরোগ, মাংসগ্রন্থি ফোলা, এবং কোমরে উপরের অংশে মাংস পেশীতে খিঁচুনীসহ ইত্যাদি রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়।

১৮৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: লাল রং, খ. ২, পৃ. ২০৭-২০৮, হাদীস নং- ৪০৬৯

**রেশমী পোশাক**

পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক ব্যবহার করা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَ الذَّهَبِعَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ وَ اُحِلَّ لِاِنَاثِهِمْ–

অর্থ: রেশমী পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম ও তাদের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।[১৮৭]

অন্য হাদীসে এসেছে –عَنْ عُمَرَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الاٰخِرَةِ

অর্থ: উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) ইরশাদ করেন: যে লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, পরকালে সে তা পরবে না।[১৮৮]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ اَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَ عَنْ لُبِسَ الْحَرِيْرِ وَ الدِّيْبَاجِ وَ اَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ–

অর্থ: হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও মিহিন রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও তাতে বসতে বারণ করেছেন।[১৮৯]

অনেকে মনে করেন, রেশম অহংকার ও গৌরব প্রকাশের একটি বিলাসী মাধ্যম। রেশমী পোশাক পরিধানেশরীরে তীব্র তাপ ও অস্থিরতা অনুভব হয় এবং স্বীয় প্রকৃতিতে ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে হানাফী মাযহাব মতে, বিশেষ প্রয়োজনে যেমন কোনো ব্যথা বা চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য অথবা সাধারণভাবে অনুর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়েয আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যুবাইর (রা.) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে চর্ম রোগের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।[১৯০]অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের বেশি পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১৯১] বারা ইবন আযেব (রা.) বলেন-

نَهَانَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الْحَرِيْرِ وَ الْاَسْتَبْرَقِ وَ الدِّيْبَاجِ وَ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِىِّ وَ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.) আমাদের ৭টি জিনিস থেকে নিষেধ করেছে। স্বর্ণের আংটি বা তিনি বলেছেন স্বর্ণের বলয়, মিহি রেশম, মোটা রেশম ও রেশম মিশ্রিত কাপড়, রেশম এর তৈরি লাল বর্ণের পালান বা হাওদা, রেশম মিশ্রিত কিসসী কাপড় ও রূপার পাত্র। [১৯২]

তবে পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক দু'টি কারণে হারাম হতে পারে। (১) এটিকে পুরুষের কঠিন শ্রম ও সংগ্রামী জীবন যাপনের পরিপন্থী গণ্য করা হয়েছে। (২) ইসলামের সর্বজনীন সাম্যের দৃষ্টিতে পোশাকে সে মানকে পছন্দ করা হয়েছে, যা একজন সাধারণ মানুষের জন্যও সহজলভ্য। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানেও পুরুষের জন্য রেশমী কপিড় ব্যবহার ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।[১৯৩]

তবে এ বিষয়ে বিজ্ঞানের আলোকে আরো বিস্তর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

**সুতি কাপড় পরিধান করা**

---

১৮৭. *জামি আত-তিরমিযী*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: পুরুষদের রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার, খ. ১, পৃ. ৭১৫, হাদীস নং- ১৭২০

১৮৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৫৩, হাদীস নং-৫৮৩৪

১৮৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: স্বর্ণের আংটি, খ. ২, পৃ. ১৬৬০, হাদীস নং-৫৮৬৩

১৯০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: চর্মরোগের কারণে পুরুষের রেশমী কাপড়ের অনুমতি, খ. ২, পৃ. ১৬৫৫, হাদীস নং-৫৮৩৯

১৯১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৫২, হাদীস নং-৫৮২৯

১৯২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: সাদা পোশাক, খ. ২, পৃ. ১৬৫১, হাদীস নং-৫৮২৭

১৯৩. *বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক নির্ধারণ*, *ইসলামী আইন ও বিচার*, পৃ. ১০৪

আমাদের দেশে সুতি, রেশমি, পলিয়েস্টার, উলেন, নাইলনসহ নানা ধরনের কাপড় পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সুতি কাপড়ই বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। কারণ সুতি কাপড় সব মৌসুমেই পরিধান করা যায়। সেই সাথে গরমের দিনে সুতি কাপড় শরীরের ঘাম চুষে নেয়।

নবী কারীম (সা.)-এর পোশাকও সুতি কাপড়েরছিল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও সুতি কাপড়েরঅনেক উপকারিতা রয়েছে, যা জানাথাকলে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সুতি কাপড়ের কয়েকটি উপকারিতা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

(১) কারো শরীরে যদি আগুন লেগে যায় তাহলে শরীরে সুতি কাপড় থাকলে তাতে ক্ষতি কম হয়।

(২) সুতি পোশাক গরম সহিষ্ণু হয়, তাই উষ্ণ দেশসমূহে সুতি কাপড় পরিধান করা খুবই আরামদায়ক।

(৩) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে, যারা সুতি কাপড় পরিধান করে তাদের শরীর চর্ম রোগে আক্রান্ত হয় না। পলিয়েস্টার বা নায়লন সুতার পোশাক শরীরের সাথে ঘর্ষণে তীব্র গরম হয়ে এর তাপ শরীরের তাপের সাথে মিশে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে চর্ম রোগের সৃষ্টি হয়।

(৪) সুতি কাপড় দেহের তাপের ভারসাম্য রক্ষা করায় চর্ম রোগ ও মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৫) পলিয়েস্টার কাপড়ের পোশাক দুটি মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করে। একটি হলো মহিলাদের লিকোরিয়া আর অপরটি হল পুরুষদের যৌন রোগ।

ডা. লূথর জার্মানের প্রসিদ্ধ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, যখন থেকে মানুষ সুতি পোশাক পরিধান পরিত্যাগ করেছে, তখন থেকে তারা নিম্নোক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত হতে বাধ্য হয়েছে-

(ক) চর্ম ক্যান্সার,(খ) চামড়ার মাংসগ্রন্থির ক্যান্সার,(গ) মহিলাদের বক্ষ ক্যান্সার,(ঘ) টিসু ক্যান্সার,(ঙ) হরমুন ক্যান্সার, (চ) চর্ম চুলকানী এবং (ছ) একজিমা।[১৯৪]

**পাগড়ী পরিধান করা**

রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন রং-এর পাগড়ী ব্যবহার করতেন। যথা- (১) সাদা (২) সবুজ এবং (৩) কাল।

পাগড়ী হলো নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নাত। এর অনেক ফযীলত ও উপকারিতা রয়েছে। পাগড়ী পরিধানকারী ব্যক্তি লু-হাওয়া (sun stroke) থেকে রক্ষা পায়। নিয়মিত পাগড়ী পরিধান করলে স্থায়ী সর্দি হয় না। আর হলেও তা তেমন ক্ষতিকর হয় না। মাথা ব্যথার জন্য পাগড়ী খুবই উপকারী। পাগড়ী ব্যবহারকারী ব্যক্তির মাথা ব্যথার আশঙ্কা খুব কম হয়। হাদীসে এসেছে –عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءَ–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বিজয়ের বছর যখন মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল।[১৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَرَاَيْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتْفَيْهِ–

অর্থ: আমর ইবন হুরায়ছ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি নবী কারীম (সা.)-কে মিম্বরের উপর কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। যার পার্শ্বদেশ তাঁর দু'কাঁধের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।[১৯৬] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ رُكَانَةَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ–

অর্থ: রুকানা (রা.) বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনছি, আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো, আমরা টুপির উপর পাগড়ী ব্যবহার করি এবং তারা তা করে না।[১৯৭]

---

১৯৪. *সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১০

১৯৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: পাগড়ী, খ. ২, পৃ. ২০৮-২০৯, হাদীস নং- ৪০৭৬

১৯৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৯, হাদীস নং- ৪০৭৭

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُوْلُ عَمَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَ مِنْ خَلْفِىْ–

অর্থ: আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন, যার প্রান্তভাগকে তিনি সামনের ও পেছনের দিকে ঝুলিয়ে দেন।[১৯৮]

পাগড়ী মস্তিষ্ক শক্তিশালীকরণ ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর। পাগড়ীর ঝুলন্ত প্রান্ত মেরুদন্ড ফোঁলা রোগ থেকে রক্ষা করে। পাগড়ীর প্রান্ত দেহের নিম্নভাগের অর্ধাঙ্গ রোগ ও শীত, গরম ঋতুজনিত রোগ থেকে রক্ষা করে। পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রলাপ ও উন্মত্ততা রোগের আশঙ্কা কম থাকে। অনেকে বলেন, নিয়মিত পাগড়ী পরিধান করলে spinal cordসুরক্ষিত থাকা শরীরের স্নায়ু প্রক্রিয়া এবং মাংসপেশী প্রক্রিয়া সঠিক ও সুশৃঙ্খল থাকে। আর এটা শুধুমাত্র পাগড়ীর দ্বারাই সম্ভব। সাদা পাগড়ী দ্বারা মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের স্নায়ুতে গরমের প্রখরতাজনিত ব্রেইন স্ট্রোক ইত্যাদি খুব কম হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পাগড়ী ব্যবহার করো। কেননা এর দ্বারা ধৈর্য ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাবে। বহির্বিশ্বের ডাক্তারগণ মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রোগীর মাথায় পাগড়ীর ন্যায় এক প্রকার কাপড় বাঁধে। বিশেষজ্ঞগন বলেন, পাগড়ীর বাঁধলে মানুষের মধ্যে বিপদাপদ বরদাশত করার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ নানাবিধ মানসিক রোগ হতে মুক্তি পায়।[১৯৯]

**পুরুষের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানের বিধান**

বর্তমান যুগের মানুষ এতটাই ফ্যাশনপ্রেমী যে নিজেকে একটু ফুটিয়ে তোলার জন্য নিজের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকেও বাদ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। দুনিয়ার এই মিথ্যা মোহ মানুষকে ভুলিয়ে দেয় ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলোও। এতে তারা শুধু আখিরাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং দুনিয়াতেও নিজের অজান্তে অনেক কিছু হারায়। তেমনি একটি ট্রেন্ড টাখনুর নিচে পুরুষের কাপড় পরিধান করা। যা শরীয়তে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। দু:খের বিষয় হলো, অধিকাংশ মানুষই এই কঠিন গুনাহে লিপ্ত। এ বিষয়ে হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: ইযার (লুংগি/পায়জামা)-এর যে পরিমাণ টাখনুর নিচে যাবে, সে পরিমণ জাহান্নামে যাবে।[২০০] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِرْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفُ السَّاقِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ– وَ اِيَّاكَ وَ اِسْبَالَ الاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَ اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ–

অর্থ: জাবির ইবন সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত।... রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি তোমার লুংগী ও পাজামাকে পায়ের গোছার উপর রাখবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে পায়ের টাখনো পর্যন্ত রাখবে। সাবধান, তুমি লুংগি বা পাজামাকে পায়ের টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করবে না। কেননা এতে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায় এবং মহান আল্লাহ গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।[২০১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

---

১৯৭ . *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: পাগড়ী, খ. ২, পৃ. ২০৯, হাদীস নং- ৪০৭৮

১৯৮ . প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৯, হাদীস নং- ৪০৭৯

১৯৯. শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুর হক, *কোরআন হতে বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, হাছানিয়া লাইব্রেরী, আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ১৫৮

২০০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: টাখনুর নিচে যা থাকবে তা জাহান্নামে যাবে, খ. ২, পৃ. ১৬৪১, হাদীস নং-৫৭৮৭

২০১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: লুংগী/পায়জামা ঝুলিয়ে টাখনুর নিচে পরিধান করা, খ. ২, পৃ. ২০৯-২১০, হাদীস নং- ৪০৮৪

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজের গর্ব-অহংকার প্রকাশের জন্য নিজের কাপড় (পায়ের টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।[২০২]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُّصَلِّى مُسْبِلاً اِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَاءَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَ هُوَ مُسْبِلُ اِزَارِهِ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى لاَ يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি তার লুংগি পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে সালাত আদায় করা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন, তুমি যাও এবং অযু কর। সে ব্যক্তি অযু করে আসলে তিনি আবার বলেন: যাও অযু কর। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কী হয়েছে, আপনি তাকে অযু করতে বলছেন, আর সে অযু করার পর আপনি নীরব থাকছেন? তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: এ ব্যক্তি লুংগি ঝুলিয়ে সালাত আদায় করে অথচ যে এভাবে সালাত আদায় করে আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না।[২০৩]

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ ثَلٰثَةٌ لاَّ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ– قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوْا وَ خَسِرُوْا فَاَعَادَهَا ثَلٰثًا قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ خَابُوْا وَ خَسِرُوْا– قَالَ الْمُسْبِلُ وَ الْمَنَّانُ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ اَوِ الْفَاجِرِ–

অর্থ: আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তাদেরকে গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, এরা কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা বরবাদী ও ধ্বংসের শিকার হবে? তিনি (সা.) একথাটি তিনবার ইরশাদ করেছেন। আমি বলি: এরা কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা বরবাদী ও ধ্বংসের শিকার হবে? তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: যারা গর্বভরে কাপড় পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে, উপকার করে খোঁটা দেয় এবং যে সব ব্যবসায়ী মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে।[২০৪]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ عَنِ الاِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَزْرَةُ الْمُسْلِمِ اِلٰى نِصْفُ السَّاقِ وَ لاَ حَرَجَ اَوْ لاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَ مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ مِنَ النَّارِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا لَّمْ يَنْظُرِ اللهُ اِلَيْهِ–

অর্থ: আবদুর রহমান (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে পাজামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আপনি একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট প্রশ্ন করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: একজন মুসলমানের পাজামা পায়ের গোছার অর্ধেক হয়ে থাকে, তবে তা পায়ের টাখনু পর্যন্ত হলেও তাতে কোনো ক্ষতি এবং গোনাহ নেই। অবশ্য এর নিচ পর্যন্ত হলে সে দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে নিজের পাজামা ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।[২০৫]

অনেকের ধারণা শুধু সালাতের সময়ই টাখনুর উপর কাপড় ওঠাতে হয় অন্য সময় টাখনুর নিচেও পরা যায়, এটা ভুল ধারণা। পুরুষের জন্য পায়জামা, লুঙ্গি বা অন্যান্য কাপড় সব সময় টাখনুর উপর পরিধান করার হুকুম রয়েছে, শুধু সালাতের সময় নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এ নির্দেশনা সব সময়ের জন্যই দিয়েছেন। অনেকের মনে প্রশ্ন

২০২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৯-২১০, হাদীস নং- ৪০৮৫
২০৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১০, হাদীস নং- ৪০৮৬
২০৪ . প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১০, হাদীস নং- ৪০৮৭
২০৫. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: লুংগী/পায়জামার সীমা, খ. ২, পৃ. ২১১-২১২, হাদীস নং- ৪০৯৩

জাগতে পারে, টাখনুর নিচে কাপড় পরলে ধর্মের কী অসুবিধা? আসলে অসুবিধা ধর্মের নয়, অসুবিধা আমাদের নিজেদের। কারণ পুরুষের পায়ের টাখনুতে টেস্টোস্টেরন নামক যৌন হরমোন থাকে, যা সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের প্রয়োজন। টাখনুকে ঢেকে রাখলে টেস্টোস্টেরন হরমোন শুকিয়ে যায়। যার প্রভাবে শরীরে অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয়। শুক্রাণু কমে যাওয়ায় সহজে বাচ্চা হয় না। তাছাড়া টেস্টোস্টেরনের অভাব মস্তিষ্ক ঘোলাটে করে দেয়। এতে মনোযোগ নষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তিও কমে আসে। পুরুষের টাখনুর নিচে সবসময় লুঙ্গি, পায়জামা বা প্যান্ট পরিধান করলে টাখনু ফুলে যাওয়া, যকৃত ও উম্মাদনা রোগ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ পুরুষের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধমনী আবৃত থাকায় দেহে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া পুরুষরা সাধারণত বাইরের সকল কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই পুরুষের পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলে থাকলে রাস্তার ধূলোবালি, ময়লা আবর্জনা ও মলমূত্র ইত্যাদি কাপড়ে লেগে যাওয়ার আশংকা থাকে। আর এসব ময়লা-আবর্জনার সাথে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু মিশে থাকে। এ রোগ-জীবাণু ও ময়লা পদার্থ কাপড়ের সঙ্গে মিশে শরীরের বিভিন্ন স্থানে এমনকি পেটের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এতে খুব সহজেই অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

মৌলিকভাবে পোশাকের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা- (ক) আব্রু ঢাকা, (খ) রোগ-জীবাণু কিংবা ক্ষতিকর উপাদান থেকে শরীরকে রক্ষা করা এবং (৩) শরীরের সৌন্দর্য বিকশিত করা। পোশাক পরিধানে যেন এ তিনটি উদ্দেশ্য অর্জিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্যগত কারণে পোশাক ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক হওয়া উচিত, আঁটসাঁট পোশাক পরা উচিত নয়। আঁটসাঁট পোশাক স্বাস্থ্যের জন্য বেমানান ও ক্ষতিকর। এতে শরীরে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবেশে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং শরীর ও বাইরের আবহাওয়া একই ধরনের গরম হয়ে যাওয়ায় শরীর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তাছাড়া পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো, পোশাকের মাধ্যমে বিজাতির সাদৃশ্য গ্রহণ কিংবা অনুকরণ না হওয়া অর্থাৎ যে ধরনের পোশাক বিজাতীয় পোশাক হিসেবে পরিচিত সে ধরনের পোশাক না পরা। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাশাব্বুহ' বলা হয়। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ–

অর্থ: ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন পরিগণিত হবে।[২০৬]

সুতরাং যদি এমন কোনো বিষয়ে অন্য জাতির অনুসরণ করা হয় যা এমনিতেই শরীয়ত পরিপন্থী ও দূষনীয়, তাহলে এ ধরনের 'তাশাব্বুহু' নি:সন্দেহে হারাম। পক্ষান্তরে যে বিষয়টি আসলে দূষণীয় ও শরীয়ত পরিপন্থী নয়; বরং অনুমোদনযোগ্য তাহলে এ প্রকারের কাজও যদি অন্য জাতির অনুসরণের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাও পরিত্যাজ্য।

অতএব কোনো মুসলমান যদি অন্য ধর্মের সাদৃশ্যতার লক্ষে প্যান্ট পরিধান করে তাহলে তা নাজায়েয হবে। শুধু তাই নয়, প্যান্ট পরিধান পোশাকের প্রধান মূলনীতি তথা সতর আবৃত করতেও ব্যর্থ। কারণ প্যান্ট সাধারণত খুব আঁটসাঁট হওয়ায় দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়, যা সতর আবৃতকরণের পরিপন্থী। আর প্যান্ট সাধারণত টাখনুর নিচে সবসময় ঝুলে থাকার কারণে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নিষিদ্ধম হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তবে কেউ যদি উল্লিখিত বিষয়সমূহ থেকে সর্তক থেকে প্যান্ট পরিধান করে, তাহলে তা হারাম না হলেও মাকরূহ হওয়া থেকে মুক্ত হবে না।

মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, তাশাব্বুহ এবং মুশাবাহাত দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। তাশাব্বুহ হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের অনুকরণ করা এবং অনুকরণীয় ব্যক্তি বা জাতির মতো হওয়ার চেষ্টা করা। পক্ষান্তরে, মুশাবাহাত হলো, অন্যের মতো হওয়ার ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও অন্যের মতো হয়ে যাওয়া। আর কোনো কাজ অনিচ্ছকৃতভাবে অন্য জাতির অনুরূপ হয়ে গেলে সে কাজটা যদিও হারাম হয় না, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত মুশাবাহাত থেকেও উম্মতকে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা অপরাপর জাতি থেকে স্বতন্ত্র থাকার চেষ্টা করবে। মুসলিম উম্মাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এমন যেন না হয় যে প্রথম দর্শনে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না এ ব্যক্তি মুসলিম নাকি অমুসলিম।

---

২০৬. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: প্রচারের জন্য অহংকারী পোশাক পরা, খ. ২, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ৪০৩১

মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিজাতীয় অনুকরণ করলে সত্যিই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। দেখা মাত্র সালাম দেবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। এ ধরনের বেশ ধারণ করা একজন ঈমানদারের ক্ষেত্রে কখনো শোভা পায় না।

তবে বর্তমান যুগের সার্বিক বিবেচনা ও প্রেক্ষাপট চিন্তা করে এ বিষয়ে ফাতওয়া দিতে গিয়ে মুফতীগণ বলেন- পুরুষের জন্য অহংকারবশত টাখনুর নিচে জামা-পায়জামা পরিধান করা মাকরূহ তাহরিমী এবং অহংকারের নিয়ত না থাকলে মাকরূহে তানযিহী। আর জখম ইত্যাদি ওযরের কারণে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা জায়েয।

আবার অনেকে বলে- বর্তমানে কোট, প্যান্ট, শার্ট মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সর্বস্তরে কর্মজীবী মানুষের পোশাকে পরিণত হয়েছে। এগুলো এখন বিশেষ কোনো ধর্মের পোশাক নয়। তাই এগুলো পরিধান করা নাজায়েয হবে না। তবে এগুলো নেককার লোকদের পোশাক নয় বিধায় নি:সন্দেহে অনুত্তম।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ يُدُكُمِّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الرُّسْغِ-

অর্থ: আসমা বিনত ইয়াযিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।[২০৭]

**জুতা পরিধান করা**

জুতাকে আমরা যতই ক্ষুদ্র বিষয় মনে করি না কেন, বর্তমান সভ্যতায় মানুষের ব্যবহার্য উপাদানের মধ্যে জুতা অন্যতম। শহরাঞ্চলে জুতা ছাড়া এক মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না, তাছাড়া এটি এখন সজ্জারও অংশ। বর্তমানে বয়স-লিঙ্গ-দেশ-কাল ভেদে জুতার রয়েছে বাহারি ডিজাইন। কিন্তু জুতার এই ডিজাইন, ধরন এবং সহজ লভ্যতা একদিনে আমাদের কাছে আসেনি। এর পেছনে রয়েছে মানব জাতির অনেক সাধনা। স্পেনের সবচেয়ে প্রাচীন গুহায় ১৫,০০০ বছর আগের গুহাচিত্রে দেখা যায়, আদিম মানুষের পায়ে পশুর চামড়ায় জড়ানো থাকতো এবং ৫,০০০ বছর আগে বরফ যুগের সময়ে তৎকালীন মানুষেরা খড়যুক্ত চামড়ায় মোড়া জুতা পরিধান করতো বলে জানা যায়। আমরা যে নানা ধরনের জুতার ব্যবহার করছি এটা যেদীর্ঘ বিবর্তনের ফসল তা অনস্বীকার্য। তবে ইচ্ছা মাফিক যেকোনো জুতা ব্যবহার করা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ প্রকারভেদে জুতা ব্যবহারের ওপরও মানুষের সুস্থতা এবং অসুস্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। জুতা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রজ্ঞাময় নির্দেশনা ও ব্যক্তিগত আমল রয়েছে। যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানব জাতি সুস্থ থাকার জন্য যথোপযুক্ত জুতা ব্যবহারেও মহৌষধের ন্যায় অনেক উপাদান রয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا يَقُوْلُ اَسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا اَنْتَعَلَ-

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেণ, আমি নবী কারীম (সা.)-কে এক যুদ্ধে ইরশাদ করতে শুনেছি: তোমরা বেশি বেশি (সময়) জুতা পরিধান করে থাকবে। কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরিহিত থাকে, ততক্ষণ সে সওয়ার থাকে।[২০৮]

পা-কে ক্ষতবিক্ষত ও ময়লা-আবর্জনা থেকে হিফাযত রাখার জন্য জুতা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মনে করা হলেও বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, জুতা ব্যবহারের সাথে মানব জীবনের সুস্থতা এবং অসুস্থতার সম্পর্ক সুনিবিড়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তিনি সবসময় চামড়ার জুতা ব্যবহার করতেন, যা ছিল একেবারেই সমান।[২০৯] কারণ পা এবং ইন্দ্রিয় এ দুয়ের সমন্বয়ের ফলেই আমাদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও হাঁটা সম্ভবপর হয়। আর মানুষের শরীরের অন্য যেকোনো জায়গা অপেক্ষা পায়ে অধিক হাড় থাকায় জুতা চামড়ার ন্যায় নরম ও মোলায়েম দ্রব্য

২০৭. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: কামীস/জামা, খ. ২, পৃ. ২০২-২০৩, হাদীস নং- ৪০২৭

২০৮. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক ও সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: জুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ২২৪, হাদীস নং- ৫৪৮৮

২০৯. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাদুকার বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৩১-৬৩২, হাদীস নং- ৭৫-৮০

না হয়ে যদি প্লাস্টিক, রাবার বা কাঠের মতো শক্ত অন্য কোনো দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর বিরূপ প্রভাবে মানব শরীর খুব সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়বে।

**ভালো মানের জুতা সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক**

মানুষের উভয় পায়ে প্রায় ২লক্ষ লোমকূপ রয়েছে, যেগুলো দিয়ে শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে থাকে। এ সকল বিষাক্ত পদার্থ পায়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ঘামের মাধ্যমে বের হওয়া এসকল বিষাক্ত পদার্থ চামড়ার জুতার সাথে মিশে ধ্বংস হয়ে যায়। আর জুতা যদি ভালোমানের না হয়ে প্লাস্টিক, কাঠ বা অন্য কোন শক্ত দ্রব্যের হয়, তাহলে বের হওয়া এসকল বিষাক্ত পদার্থ তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হতে না পেরে পুনরায় পায়ের লোমকূপের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এতে পা ও শরীর জ্বালা-পোড়াসহ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইন্ডিয়ায় পূর্বের রাজা-বাদশাহগণ বংশানুক্রমে সেলিমশাহী নামক এক ধরনের জুতা ব্যবহার করতেন। এর কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁরা মূলত নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই এমন জুতা ব্যবহার করতেন। বাদশাহ জহির উদ্দিন বাবর বলেন: আমি যখন হিন্দুস্তানের মাটিতে পা রাখলাম, তখন এখানকার মাটি, পরিবেশ ও মৌসুমের বিভিন্নতার ফলে সেলিমশাহী জুতাই আমার পছন্দ ছিল।[২১০]

**ব্রেন ও অন্যান্য অঙ্গের ওপর জুতার প্রভাব**

কোনো কারণে পায়ে চোট লাগলে এর প্রভাব পায়ের চেয়েও মারাত্মক প্রভাব পড়ে ব্রেনের ওপর। তাই পায়ের আরামের সাথে ব্রেনের আরামের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কথিত আছে, বিজ্ঞানী নিউটন কোনো কারণে মস্তিষ্কের চাপ অনুভব করছিলেন, সাথে সাথে তিনি জুতার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং প্রতি সাপ্তহে জুতা পাল্টাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি এক জোড়া জুতায় আরাম বোধ করলে তিনি তা ব্যবহার করতে লাগলেন। তাই বলা হয়, জুতা ভালো হলে ব্রেনও ভালো থাকে, জুতা শক্ত হলে ব্রেনও শক্ত হয় এবং জুতা নরম হলে ব্রেনও নরম হয়। এ কথাগুলো যদিও রূপক অর্থে বলা হয়, তথাপি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবান করলে এবং অভিজ্ঞতায় বেশ তথ্য পাওয়া যায়।

ফিজিও থেরাপিস্টদের মতে, বর্তমানে ব্যবহৃত চারদিকে বেড়ীওয়ালা সংকীর্ণ, হাইহিল, রাবার ও প্লাস্টিকের জুতা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ভালো মানের জুতা পরিধান না করলে এর প্রভাবে শিরা-উপশিরায় খিঁচুনি, মাথা ব্যথা, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, স্নায়ুবিক রোগ, মূত্রথলিতে রোগ এবং সার্বক্ষণিক পেরেশানী দেখা দেয়। তাছাড়া হাঁটার সময় পায়ের সাথে জুতার ঘর্ষণের কারণে এক প্রকার উষ্ণতা সৃষ্টি হয়। জুতা কাঠ, রাবার, প্লাস্টিক বা শক্ত কোনো জিনিসের দ্বারা তৈরি হলে এ উষ্ণতা অগণিত রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভালোমানের চামড়ার জুতা হলে এ উষ্ণতা সাথে সাথে নি:শেষ হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার রোগ সৃষ্টি হয় না।

**বাচ্চাদের ওপর জুতার প্রভাব**

বাচ্চাদের পায়ের চামড়া খুবই নরম থাকায় তাদের জুতা বেশ সচেতনতার সাথে নির্বাচন করা উচিত। কারণ বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের শরীর বেশি গরম থাকে এবং প্রচুর ঘামে। সারাদিনে জুতার সাথে পায়ের কয়েক হাজার বার ঘর্ষণ হয়। সুতরাং জুতার ভেতর পায়ে ঘষা লাগলে শরীরের উষ্ণতা সৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যায়। মানুষের চামড়ার সাধারণ উষ্ণতা হচ্ছে ৯০ ডিগ্রী। গরমের মৌসুমে পরিশ্রম বেশি করলে পায়ের উষ্ণতা ৯৫ ডিগ্রী থেকে ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু জুতার সোল মোলায়েম না হয়ে শক্ত হলে এ উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫ ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এছাড়া বাচ্চাদের জুতা ভালো মানের না হলে পায়ের ঘষায় ঘামের কারণে জুতার আঠা ওঠে যেতে পারে। এতে ঐ বিষাক্ত আঠা পায়ে লাগলে পায়ে চর্ম রোগ হতে পারে এবং জুতার সোল ভালো না হলে অধিক ঘামের কারণে পা সামনে বা পিছনে পিছলে গিয়ে বাচ্চা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে অনেক ব্যাথা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**হাইহিল জুতার ক্ষতিকর দিক**

বর্তমানে ফ্যাশন জগতে মেয়েদের কাছে হাইহিলের জুতা খুবই জনপ্রিয়। শুধু শহরের মেয়েরাই নয়, বর্তমানে গ্রামের মেয়েরা এবং মডেল থেকে শুরু করে সাধারণ মেয়েরাও হাইহিলের জুতা ব্যবহার করে থাকে। হাইহিল জুতা ব্যবহার

---

২১০. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৬

করা সত্যিকার অর্থে মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অস্বাভাবিক উঁচু হিল পরলে গোড়ালি উঁচু হয়ে থাকে, এতে চলার সময় পা যেকোনো মুহূর্তে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এদিক-সেদিক বেঁকে গিয়ে হাঁটু ও গোড়ালিতে অস্বাভাবিক চাপ পড়ে পা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই বলা হয়, হাইহিলে রয়েছে, 'হাই রিস্ক'। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, দুই ইঞ্চি হিলের জুতা পরিধান করার কারণে অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস বা গেঁটে বাতের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। আর অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস এমন একটি যন্ত্রণাদায়ক রোগ, যা অস্থিসন্ধিগুলোর অবনতি ঘটায়। পুরুষদের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক নারী গেঁটে বাতের রোগে ভোগে। এর অন্যতম কারণ হলো, অধিকাংশ মেয়েদের হাইহিল জুতার ব্যবহার। হাইহিল জুতা ব্যবহারের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো, এতে হাঁটুর মধ্যকার কার্টিলেজ ক্ষয় হয়ে যায়। তাই রোগ-ব্যাধি ও যন্ত্রণা মুক্ত জীবন গড়তে ফ্ল্যাট বা সমান জুতা ব্যবহারের কোনো তুলনা হয় না।

**জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব**

**(ক) বসে জুতা পরিধান করা সুন্নাত:** জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদবের মধ্যেও হিকমত রয়েছে। জুতা বসে পরিধান করা সুন্নাত। দাঁড়িয়ে এক পায়ে ভর দিয়ে অন্য পায়ে জুতা পরিধান করতে গেলে শরীরের ব্যালেন্স রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বসা অবস্থায় জুতা পরিধান করার ক্ষেত্রে পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে স্যান্ডেল বা অন্য কোনো সাধারণ জুতা যেগুলো অনায়েসে দাঁড়ানো অবস্থায় পরিধান করতে কোনো অসুবিধা হয় না, সেসব জুতা দাঁড়িয়ে পরিধান করাতে কোনো সমস্যা নেই। হাদীসেএসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান না করে।[২১১]

**(খ) প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা সুন্নাত:** প্রথমে কোন পায়ের জুতা পরিধান করতে হবে এবং কোন পায়ের জুতা পরে পরিধান করতে হবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ নির্দেশনাও আমাদের দিয়ে গেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِالْيَمِيْنِ وَ اِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَاْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيَمِيْمُ اَوَّلَهَا تُنْعَلُ وَ اٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে তখন সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে। আর যখন কেউ জুতা খুলবে তখন সে যেন বাম পা থেকে শুরু করে। তাহলে ডান পা পরার সময় আগে থাকবে এবং খোলার সময় শেষে থাকবে।[২১২]

**(গ) উভয় পায়ে জুতা পরিধান করা:** কখনো চলার পথে বা অন্য কোনো কারণে একটি জুতা অপরিধান যোগ্য হয়ে পড়লে এবং অন্য জুতাটি ভালো থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু একটি জুতা পরিধান করে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছেন। জুতা পরিধানের আদব হলো, হয়তো দু'টি পরা নতুবা দু'টিই খুলে রাখা। কারণ এক পায়ে জুতা না থাকলে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা না হওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। এতে পড়ে গিয়ে ব্যথা পাওয়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি এক জুতা পরিধান করে দীর্ঘ পথ হাঁটালে পা ও কোমড়সহ সারা শরীরে ব্যথা এবং পা ফোলে যেতে পারে। তাছাড়া এক জুতা পরিধান করে হাঁটা ব্যক্তিত্বহীনতারও পরিচায়ক। কোনো ভদ্র মানুষ এক জুতা পরিধান করে কখনো হাঁটতে পারে না। তেমনিভাবে এক মোজা পরিধান করেও চলাফেরা করতে হাদীসে নিষেধ এসেছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِى النَّعْلِ الْوَاحِدِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا–

---

২১১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: জুতা পরিধান, খ. ২, পৃ. ২১৭, হাদীস নং- ৪১৩৫

২১২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৭, হাদীস নং- ৪১৩৯

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা না করে। হয়তো দু'টি জুতা পরবে, নতুবা দু'টিই খুলে রাখবে।[২১৩]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِىْ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحُ شِسْعَهُ وَ لاَ يَمْشِىْ فِىْ خُفٍّ وَّاحِدٍ وَ لاَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কারো জুতার ফিতা যখন ছিঁড়ে যাবে, তখন সে যেন একটি জুতা পরে চলাফেরা না করে, যতক্ষণ না সে অন্যটি ঠিক করে নেয়। আর তোমাদের কেউ যেন একটি মোজা পরিধান করে চলাফেরা না করে এবং বাম হাতে না খায়।[২১৪]

অন্য হাদীসে এসেছে– عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর জুতায় দু'টি ফিতা লাগানো ছিল।[২১৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত হলো- যখন কেউ কোথাও বসবে, তখন সে তার জুতা খুলে পাশে রাখবে।[২১৬]

**মাঝেমধ্যে খালি পায়ে হাঁটা**

জুতা আমাদের নিত্যদিনের অপরিহার্য একটি অনুষঙ্গ। তবে ইদানিং নামি ব্র্যান্ডের দামি জুতা বেশির ভাগই সৌন্দর্য সর্বস্ব, এতে শারীরিক উপকারিতা খুবই কম। বরং কিছু কিছু জুতা পরিধানের কারণে পায়ের পাতা দুর্বলও হয়ে যেতে পারে এবং বেশি উঁচু ও অসমতল জুতা পরলে পায়ের তলা সমানভাবে মাটিতে না পড়ার কারণে শারীরিক গড়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া সর্বক্ষণ পায়ের সাথে জুতা আটকে থাকায় আমাদের শরীরে অসংখ্য রোগ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগের জীবাণু জুতার সংকীর্ণতার কারণে জুতার সাথে লেগে থেকে আমাদের অজান্তেই শরীরে ব্যাধি ছড়ায়। জুতা যদি প্লাস্টিক বা নিম্ন মানের হয় তবে তো কথা নেই। কেননা ঐ সকল জুতার উত্তাপে পা খুবই গরম হয়ে যায়। যদিও আমরা ঐ অসহ্য গরম প্রতিদিন ব্যবহার করার কারণে সহ্য করে নিতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। তাই মাঝেমধ্যে আমাদেরকে জুতা থেকে পা বের করে জমিনের উপর খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস করা উচিত। কারণ খালি পায়ে হাঁটার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা, যা বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْمُرُنَا اَنْ نَّحْتَفِىَ اَحْيَانًا–

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। ফুযালা ইবন উবায়দ বলেন: নবী কারীম (সা.) আমাদেরকে মাঝে মাঝে খালি পায়ে থাকারও নির্দেশ দিতেন।[২১৭]

---

২১৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: জুতা পরিধান, খ. ২, পৃ. ২১৭, হাদীস নং- ৪১৩৬
২১৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৭, হাদীস নং- ৪১৩৭
২১৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৬-২১৭, হাদীস নং- ৪১৩৪
২১৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৭, হাদীস নং- ৪১৩৮
২১৭. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিরুনি করা, খ. ২, পৃ. ২২০, হাদীস নং- ৪১৬০

**খালি পায়ে হাঁটার উপকারিতা**

**(ক) উন্নত দেহ গঠন:**যুগের সাথে স্টাইল ও ফ্যাশন মিলাতে গিয়ে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ নিজের পায়ের গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জুতা পরিধান না করায় ধীরে ধীরে পায়ের তলার গঠন খারাপ হতে শুরু করে। আর একবার পায়ের গঠন খারাপ হয়ে গেলে এর প্রভাব সরাসরি আমাদের শরীরের ওপর পড়ে। ফলে ব্যাক পেইন, ঘাড়ে যন্ত্রণা এবং গোড়ালিতে ব্যথাসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। তাই সুস্থ ও সুন্দর দেহ গঠনে এবং দুর্বল পা যুগলকে পুনরায় চাঙ্গা করে তুলতে খালি পায়ে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। এতে ক্রমান্বয়ে পায়ের শক্তি বাড়তে থাকে এবং উন্নত দেহ গঠনে সহায়ক হয়।

**(খ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** একটা সময় ছিল যখন বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটতেন, আর বলতেন এভাবে হাঁটলে নাকি শরীরে কোনো রোগ আসে না। আসলে তাদের দীর্ঘায়ু লাভের সিক্রেটটা হয়তো তাই ছিল। কারণ আমাদের পায়ের তলায় রয়েছে একাধিক সেন্সারি নার্ভ, যা খালি পায়ে হাঁটার সময় অ্যাকটিভ হয়ে শরীরের ভেতরে পজেটিভ এনার্জি তৈরি করে ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে নানাবিধ সংক্রমণের আশঙ্কা একেবারে শূণ্যের কোঠায় চলে আসে। এছাড়া খালি পায়ে হাঁটলে বাতাস লাগার দরুণ পায়ে লেগে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসগুলো নি:শেষ হয়ে যায় এবং মাটিস্থ ইন্টি সেপটিক তথা পচন নিরোধক পদার্থের কারণে ছোট ছোট জীবাণুও নষ্ট হয়ে যায়।

**(গ) স্মৃতিশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি:** মস্তিষ্কের ভেতরে এমন কিছু সূক্ষ্ম নিউরন রয়েছে যেগুলো সাধারণত অকার্যকর অবস্থায় থাকে। মাঝেমধ্যে জুতা ছাড়া হাঁটলে সেসকল নিউরন মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে অ্যাকটিভ হয়ে ওঠে। এতে স্মৃতিশক্তি ও মেধা তথা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। খালি পায়ে হাঁটার কারণে শরীরে আয়নের যে ভারসাম্য বজায় থাকে, এতে স্মৃতিশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি পায়।

**(ঘ) হার্টের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি:** শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকলে ব্লাড ক্লট এবং আর্টারিতে ময়লা জমার আশঙ্কা কমে যায়। তখন স্বাভাবিকভাবেই হার্টেও নানাবিধ রোগের সম্ভাবনা থাকে না। খালি পায়ে হাঁটার কারণে ব্লাড সেলগুলো খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এতে রক্ত ঘন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পেয়ে হার্টের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

**(ঙ) পেশী ও হাড়ের মজবুত:** খালি পায়ে হাঁটার সময় ভেনাস রিটার্ন বেড়ে গিয়ে বেশি পরিমাণে রক্ত হার্টে পৌঁছতে থাকায় পেশী ও হাড় আরও শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া আমাদের শরীরের অধিকাংশই পানি। তাই শরীর যত বেশি মাটির সংস্পর্শে আসবে ততই কার্যক্ষম থাকবে।

**(চ) দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা:** আমাদের পায়ের তলায় একাধিক প্রেসার পয়েন্ট রয়েছে, যা চোখের সাথে সরাসরি যুক্ত। খালি পায়ে হাঁটলে গোটা দেহের ভার পায়ের ওপর থাকায় পায়ের প্রেসার পয়েন্টগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে, এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। বলা হয়ে থাকে- পায়ের তলায় যতোবেশি চাপ পড়ে, দৃষ্টিশক্তি ততো উন্নতি লাভ করে। এছাড়া চোখের জন্য সবুজ রং খুবই উপকারী হওয়ায় চোখের সুস্থতার জন্য খালি পায়ে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে নিয়মিত হাঁটলে দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়।

**(ছ) মানসিক অবসাদ দূর:**নিয়মিত খালি পায়ে হাঁটলে মানসিক অবসাদ কমতে শুরু করে। সেই সাথে অ্যাংজাইটি লেভেলও নিম্নমুখী হয়ে আসে। খালি পায়ে হাঁটার সময় আমাদের মস্তিষ্কের অন্দরে এন্ডোরফিন নামক একটি ফিল গুড হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ায় ডিপ্রেশন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না।

**(জ) রক্ত চলাচল বৃদ্ধি:** খালি পায়ে হাঁটার সময় মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সারা শরীরে রক্ত চলাচল ঠিক মতো শুরু হওয়ায় অক্সিজেন সমৃদ্ধি রক্ত বেশি করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছে গিয়ে তাদের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

**(ঝ) সুনিদ্রা লাভ:** সারাবিশ্বে নিদ্রাহীন রাত কাটানো লোকের সংখ্যা সীমাহীন। একটু ঘুমের জন্য যারপর নাই চেষ্টা করে এবং অনেকে ঘুমের জন্য চরম মাত্রায় ঔষুধও সেবন করে থাকে। কিন্তু নিয়মিত খালি পায়ে হাঁটলে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে হয় না। কারণ খালি পায়ে হাঁটার সময় আমাদের শরীর থেকে নেগেটিভ এনার্জি বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে স্ট্রেস রিলিজও হয়। শুধু তাই নয়, খালি পায়ে হাঁটার কারণে মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ায় ঘুম আসতে কোনো অসুবিধা হয় না।

**সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা সুন্নাত**

পৃথিবীতে নানা ধরনের মানুষের বসবাস এবং তাদের হাঁটার স্টাইলও ভিন্ন। অনেকে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটে, অনেকে বুক উঁচিয়ে হাঁটে, অনেকে শিরদাঁড়া সোজা রেখে হাঁটে আবার অনেকে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। কিন্তু সব হাঁটার ধরন স্বাস্থ্য সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে হাঁটতেন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে, তা খুবই স্বাস্থ্য সম্মত এবং অনেক উপকারী। হাদীসে এসেছে–عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا مَشٰى كَاَنَّهُ يَتَوَكَّأُ

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন চলতেন, তখন তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতেন।[২১৮] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে-

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَهْوِىْ فِىْ صُبُوْبٍ–

অর্থ: আবু তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি। তাঁর গায়ের রং ছিল সাদা এবং মনোমুগ্ধকর। আর তিনি যখন চলতেন, তখন মনে হত তিনি (সা.) নিচু স্থানের দিকে অবতরণ করছেন।[২১৯]

**সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটার উপকারিতা -**

**(ক) পায়ের সুস্থতা:** সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটলে পায়ের পাতার উপর সবটুকু ভর পড়ে, এতে গোড়ালীতে কখনো রোগ হয় না এবং ব্যথাও হয় না।

**(খ) ক্লান্তিহীন সফর:** সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটলে দীর্ঘ সফরেও ক্লান্তি আসে না।

**(গ) দৃষ্টিশক্তি প্রখরতা:** এমন ভঙ্গিতে হাঁটলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

**(ঘ) অস্থিরতা দূর:** সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটলে অস্থিরতা দূর হয়।

হাঁটা এবং দৌড়ানো এ দু'টি শব্দের ৪টি ইংরেজি শব্দ রয়েছে। যথা: (১) Walking(২) Roving (৩) Jogging(৪) Running। সাধারণত সমউচ্চতায় সম্মুখের দিকে দেহ সঞ্চালনের গতি বোঝাতে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ৪ ধরনের গতি বোঝাতে এ ৪টি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন-

* Walkingহলো সাধারণভাবে হাঁটা। দাঁড়িয়ে থাকার সময় দু'টি পা-ই মাটি স্পর্শ করে থাকে। হাঁটার সময় সাধারণত একটি পা মাটিতে এবং অপর পা পদক্ষেপের জন্য ভূমি হতে আলাদা থাকে। তবে হাঁটার সময় কোনো এক অবস্থায় দু'টি পা-ই মাটি স্পর্শ করে।

* Rovingঅর্থও হাঁটা তবে অতি দ্রুত হাঁটা। দ্রুত হাঁটার (Roving) সময় পা অপেক্ষাকৃত কম সময় মাটি স্পর্শ করে থাকে। মাটির চেয়ে পা মাটির উপরে বেশি সময় থাকে।

* Jogging হলো দ্রুত হাঁটা (Roving) এবং দৌড়ানোর মাঝামাঝি আরেকটি গতির নাম, যা দ্রুত হাঁটার চেয়ে বেশি কিন্তু দৌড়ানোর চেয়ে কম গতিতে চলা। মূলত জগিং বলতে একটু কম গতিতে দৌড়ানোকে বোঝায়। জগিং-এর সময় একটি পা থাকবে মাটিতে এবং আরেকটি পা সর্বদা মাটির উপরে থাকবে।

* Running হলো দৌড়ানো যা আমরা সবাই বুঝি। লাফ দেয়ার সময় যেমন দু'টি পা-ই এক সঙ্গে ভূমির উপরে থাকে, দৌড়ানোর সময় সেরূপ ঘটে থাকে। অবশ্য কিছুটা কম সময়। দৌড়ানোর সময় কোনো এক অবস্থায় বা মুহূর্তে দু'টি পা ভূমি থেকে আলাদা হয়, তবে ক্ষণিকের জন্য। যদি বহুক্ষণ পর্যন্ত দু'টি পা-ই ভূমি থেকে আলাদা বা উপরে থাকে, সে অবস্থাকে উড়া বা উড্ডয়ন বলা হয়।

যাহোক দেহের মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ অঙ্গ হলো হৃৎপৃণ্ড। মস্তিষ্কও একটা পর্যায়ে বিশ্রাম নেয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ড জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো সময়ই বিশ্রাম নেয় না। এটা একটি Pumping Station-এর মতো। প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড হতে ৫ লিটার রক্ত শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে তরল পদার্থ সাধারণত উপর থেকে নিচের দিকে যায়। তাই হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত মাথার দিক অপেক্ষা নিচের দিকে অর্থাৎ পায়ের দিকে বেশি প্রবাহিত হয়। সুতরাং হাঁটা,

২১৮. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: নবী করীম সা.-এর চলন, খ. ২, পৃ. ৩২৫, হাদীস নং- ৪৮৬৩
২১৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৫, হাদীস নং- ৪৮৬৪

দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো বা অল্প দৌড়ানোর ফলে পায়ের দিকে রক্ত বেশি প্রবাহিত হয় এবং পায়ের মাংস সেলগুলো (Cell)বেশি কর্মঠ হয়। তবে দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য নিয়মিত যে সকল শারীরিক ব্যায়াম রয়েছে এবং সমউচ্চতায় সম্মুখের দিকে দেহ সঞ্চালনের জন্য উল্লিখিত যে সকল পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যায়াম বিশেষজ্ঞগণ বর্তমানে জগিং-কেই প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন। কারণ জগিং যেমন দীর্ঘক্ষণ করা যায়, তেমনি দীর্ঘ মেয়াদী এর ফলাফলও খুব চমকপ্রদ। এজন্য স্বাস্থ্য সচেতন পাশ্চাত্যবাসীদের অধিকাংশকে জগিং করতেই দেখা যায়। নালা বা খালের পাশে যেমন বালি জমে তেমনি শিরা-উপশিরায়ও চর্বি জমে। তাই মৃদু দৌড়, জোরে দৌড় এবং লাফালাফির সময় শিরা ও ধমনীতে জমে থাকা চর্বিগুলো রক্তকণিকা ঠেলে নিয়ে যায়। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন রক্ত প্রবাহের গতি বৃদ্ধি পায়।

*** দৈহিক কাজের উপকারিতা**

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক Dr. R.S. Papen Barger একবার উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট এ্যাটাকে ধূমপান ও অলসতার প্রতিক্রিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ২০,০০০ রেলওয়ে শ্রমিকের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করেন, যারা হেঁটে হেঁটে কাজ করতো অর্থাৎ তাদের কাজের প্রকৃতি ছিল শারীরিক। তিনি একই ধরনের গবেষণা করেন ২০,০০০ অফিস কর্মকর্তাদের ওপর, যারা চেয়ারে বসে বসে কাজ করতো।

Dr. R.S. Papen Barger-এর গবেষণার জরিপে প্রাপ্ত একটি তথ্য হলো- যারা চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ করেন, তাদের হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা যারা দাঁড়িয়ে এবং হেঁটে কাজ করেন তাদের থেকে প্রায় দ্বিগুণ।

তাই যারা বসে বসে কাজ করে তাদের হার্ট এ্যাটাক কমানোর একটি পদ্ধতি হল দৈনিক অন্তত ১ ঘন্টা দ্রুত হাঁটা জগিং করা, আর এটা দিনে দু'বারকরতে হবে। সকালে ৩০ মিনিট এবং বিকালে ৩০ মিনিট অর্থাৎ দৈনিক ২৪ ঘন্টা মধ্যে এমন কায়িক পরিশ্রম করা যাতে দেহ ঘর্মাক্ত হয়। তবে হাঁটার গতি অবশ্যই স্বাস্থ্যের পক্ষে যতটুকু দ্রুত হাঁটা সম্ভব এর বেশি করা উচিত নয়। কেউ দ্রুত হাঁটছে নাকি শ্লথ গতিতে হাঁটছে তা নির্ণয়ের একটি ফর্মুলা হলো- কিছুক্ষণ দ্রুত হাঁটা বা দৌড়ানোর পর এক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে হার্টবীট গণনা করতে হবে। যদি হার্টবীট প্রতি মিনিটে ১০০ বার হয় তাহলে বুঝতে হবে হার্টবীট স্বাভাবিক রয়েছে। আর হার্টবীট যদি প্রতি মিনিটে ১৩০ অতিক্রম করে, তখন বুঝতে হবে ভ্রমণের গতি ব্যক্তির স্বাস্থ্যসম্মত গতি থেকে বেশি হয়ে গেছে।

**দ্রুত ভ্রমণ এবং জগিং-এর গতি**

একটি মানুষের দ্রুত ভ্রমণ বা দৌড়ের গতি কত হওয়া উচিত- এটা নির্ভর করে ভ্রমণের উদ্দেশ্য, ব্যক্তির বয়স, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের Harvard School of Public Health-এর প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীDr. I. Minllee২০ বছরব্যাপী ১,৭৩,০০০ জন মধ্যবয়সী পুরুষের ওপর তাদের হাঁটার গতিবেগ, প্রতিক্রিয়া, স্বাস্থ্যের অবস্থা, খাদ্যরুচি এবং জীবনকাল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছিল। এই গবেষণার ফলে তার প্রদত্ত একটি তথ্য হলো, যারা প্রায় প্রত্যেক দিন দ্রুতবেগে হাঁটে তারা দীর্ঘজীবী হয়। আর যারা সপ্তাহে এক/দু'দিন দৈহিক ব্যায়ামে ঘর্মাক্ত হয়, তারা তাদের থেকে বেশি দীর্ঘজীবী হয়। ড. মিনলী আরো বলেন, আধমনা বা উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ স্বাস্থ্যের ওপর তেমন কোনো শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।[২২০]

হার্ভার্ড চিকিৎসক ড. লী-এর গবেষণায় দেখা যায়, যারা ১২ মিনিটে ১ মাইল (1.6 k.m) দৌড়ায় তাদের আয়ু দীর্ঘতর হয়। তিনি আরো বলেন, হাঁটার গতির সঙ্গে জীবনকালের মেয়াদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুত না হাঁটলে অতিরিক্ত ক্যালরী খাওয়ার ফলে মেটাবলিক রেইট বা ক্যালরিতে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তর (মেটাবলিজম) প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। এতে কোলেস্টোরাল চর্বি শিরা এবং ধমনীতে জমা হয়। আর হাঁটালে যদি দেহ ঘর্মাক্ত না হয়, তবে এ হাঁটা ডায়াবেটিক রোগীদের আশানুরূপ ফল বয়ে আনে না। যুবকদের ঘন্টায় অন্তত ৫ মাইল গতিতে অর্থাৎ ১২ মিনিটে ১

২২০. *জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন*,সংখ্যা: এপ্রিল ১৯৯৫ইং; *উইকলি টাইম ইন্টারন্যাশনাল*, সংখ্যা: ০১ মে ১৯৯৫ইং (থেকে উদ্ধৃত)

মাইল হাঁটা উচিত। যদি কেউ স্বাস্থ্যবান, প্রফুল্ল এবং দীর্ঘজীবী হতে চায় তবে এ ফর্মুলায় হাঁটা অত্যাবশ্যক।[২২১] হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ مَا رَاَیْتُ اَحَدًا اَسْرَعَ فِیْ مَشْیَتِهِ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَكَاَنَّمَا الْاَرْضُ تُطْوٰی لَهُ اِنَّا لَنُجْهِدُ اَنْفُسَنَا وَ اِنَّهُ لَغَیْرُ مُكْتَرِثٍ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, পথ চলার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগামী কাউকে দেখিনি। মনে হতো পথ-পরিক্রমা তাঁর জন্য যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। তাঁর সাথে পথ চলতে গিয়ে আমাদের যথেষ্ট কষ্টের শিকার হতে হতো। পক্ষান্তরে তিনি অনায়েসে পথ চলতেন।[২২২]

**ক্রোধ বা রাগ সম্বরণ করা**

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ পর্যক্ষেণ করে দেখেছেন মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয় মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং আবেগের ভারসাম্যহীনতার জন্যে। মানুষ যদি এসব রিপুগুলোকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে, তবে হৃদরোগের হাত থেকে সহজেই মুক্ত হতে পারে অধিকাংশ মানুষ।

ক্রোধের বিস্ফোরণই হৃদরোগের অন্যতম কারণ। এ সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সেন্ট জর্জেস হাসপাতালের বিখ্যাত ডাক্তার জন হান্টার তাঁর জীবনের বিনিময়ে।

ডাক্তার হান্টার চিকিৎসার ব্যাপারে যেমন ছিলেন ভুবনজয়ী সুনামের অধিকারী, তেমনি বদ-জোজের জন্যও তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার। তাঁর সাথে রোগীরা একটু এদিক সেদিক ব্যবহার করলেই তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে রেগে ক্ষোভে ফেটে পড়তেন। ডাক্তার হান্টার বুঝতে পারলেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লে তাঁর বুকে মৃদু যন্ত্রণা হয়। এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা যেদিন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়, সেদিন এই যন্ত্রণা অসহ্য রকমের হয়ে যায়।

ডাক্তার হান্টার তাঁর বন্ধুদের বলতেন- দেখো, যদি আকস্মিকভাবে আমার মৃত্যু হয় তবে তা এই বদ-মেজাজের জন্যই হবে। আমি জানি, হৃদরোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্রোধের বিস্ফোরণ। কিন্তু জেনেও নিজেকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। নিজের সম্বন্ধে ডাক্তার হান্টারের ভবিষ্যতবাণী ঠিক হয়েছিল।

একবার তাঁর চেম্বারে একজন খুঁতখুঁতে স্বভাবের রোগী এলো। রোগীটি তার কী রোগ হয়েছে, এসব রোগ কেন হয় ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ডাক্তার হান্টারকে উত্যক্ত করে তুলল। হান্টার আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না। বললেন, দেখো বাপু, এতো প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। রোগীর সাথে কথা বলতে বলতে জন হান্টার এক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। আর তারপরই অসহ্য যন্ত্রণা। নিজের বুকে হাত চেপে ধরেই তিনি রোগীকে বললেন- মাফ করবেন, আমি একটু পাশের ঘরে যাচ্ছি। পাশের ঘরে গিয়েই মেঝের উপর ঢলে পড়লেন এবং ক্রোধের বিস্ফোরণেই তাঁর মৃত্যু হল।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্রোধের এ অবস্থায় হৃদযন্ত্রের পেশীর সংকোচন ও বিমোচনে অসংগতি দেখা দেয় এবং রক্ত সঞ্চালনে দেখা দেয় অস্থিরতা। কাজেই ক্রোধের সময় যতদূর সম্ভব ধৈর্য ধারণ করে পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা মোকাবেলা করতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَهلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِیْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَیْظًا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ یُّنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللهُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ عَلٰی رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰی یُخَیِّرَهُ مِنْ اَیِّ الْحُوْرِ شَاءَ–

অর্থ: সাহল ইবন মুআয (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ক্রোধকে সম্বরণ করল অথচ সে কাজ করতে সক্ষম (তার এ সবরের কারণে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকলের সামনে ডেকে বলবেন, তুমি যে হুরকে চাও, পছন্দ করে নিয়ে যাও।[২২৩]

---

২২১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, "দ্রুত ভ্রমণ এবং সুস্বাস্থ্য", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৮

২২২. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাঁটা-চলার বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৩৯, হাদীস নং- ১২৩

একবার হেলসিংকিতে হৃদরোগের সাথে মানসিক কারণ নির্ণয়ের জন্য একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ সিদ্ধান্ত নিলেন, মানসিক চাপ কখনো কখনো তাৎক্ষণিক হৃদরোগের কারণ হতে পারে। তাঁরা এও মত দিলেন, দীর্ঘ সময় ধরে হৃদপিণ্ডে রক্ত সংবহনে গড়ে উঠতে পারে ক্রনিক বৈকল্য, যার পরিণতিতে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

বোস্টনের হার্ভার্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর বিজ্ঞানীরা মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর পর চাপ প্রয়োগ করে দেখেছেন, স্থান সংকুলানের অভাবে ইঁদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীরা মুক্তির জন্য পাগল হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন এসব মুক্তিপিয়াসী প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলের ওপর চাপ প্রয়োগের ফলে দেখা গেছে, ক্রমশ এদের হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা ধীরগতি হয়ে পড়ে, এমনকি কারো কারো হৃদপিণ্ড বিকল হয়ে যায়। তাঁরা এসব প্রাণীর ওপর ইলেকট্রিক শক দিয়ে উত্তেজিত করে দেখেছেন, অত্যধিক উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডলে যে চাপ পড়ে এতে তাৎক্ষণিকভাবে অনেক প্রাণীর মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, স্নায়ুবিক উত্তেজনা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে- উদার-শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ।[২২৪]

উত্তেজিত হলে বা নিজেকে বিপন্ন মনে হলে এ সময় রক্তে অ্যাড্রিনেলিস নামে এক শ্রেণির হরমোন নি:সৃত হতে থাকে। অ্যাড্রিনেলিস বিভিন্ন পেশীতে রক্ত-সঞ্চালন ত্বরান্বিত করে রক্তপেশীর শক্তি যোগায়। এ শক্তি আসলে রক্তে মিশে থাকা ফ্যাড এসিডে যোগায়। এ মন্তব্য করেছেন লন্ডনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসা বিজ্ঞানী মরিস ব্রাউন। দৈহিক কাজ-কর্মে এই শক্তি ব্যয় হলে তখনই দেখা দেয় অসুবিধা। করোনারি ধমনীর ছিদ্রপথ বন্ধ হতে পারে। ফলে হৃদস্পন্দন হয় অনিয়মিত এবং রক্ত সঞ্চালনও হয় বাধাগ্রস্ত।[২২৫] তাই হাদীসে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারীকে শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলা হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا تَعُدُّوْنَ الصُّرَعَةَ فِيْكُمْ قَالُوْا الَّذِىْ لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالِ قَالَ وَ لٰكِنَّهُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করেন: তোমরা কাকে শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলে মনে কর? সাহাবীগণ বলেন, যাকে কেউ ধরাশায়ী করতে পারে না, তাকে। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: না বরং সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা, যে রাগের সময় তার ক্রোধকে সম্বরণ করতেপারে।[২২৬]আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ–

অর্থ: যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণশীলদেরকে ভালোবাসেন।[২২৭]
হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشَرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَ اَنَا غَلاَمٌ لَّيْسَ كُلُّ اَمْرِىْ كَمَا يَشْتَهِىْ صَاحِبِىْ اَنْ اَكُوْنَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِىْ فِيْهَا اُفٍّ قَطُّ– وَ مَا قَالَ لِىْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا اَوْ اَلاَّ فَعَلْتَ هٰذَا–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি মদীনাতে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর খিদমত করি। এসময় আমি বালক ছিলাম এবং আমার সব কাজ তাঁর ইচ্ছা মাফিক হতো না। কিন্তু তিনি কোনো দিন আমার উপর বিরক্ত হয়ে উহ্ বলেন নি এবং এরূপও কোন দিন বলেন নি: তুমি একাজ কেন করলে বা তুমি একাজ কেন করনি?[২২৮]
অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

---

২২৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: ক্রোধ সম্বরণের ফযীলত, খ. ২, পৃ. ৩১৬, হাদীস নং- ৪৭৭৭
২২৪. নুরুল ইসলাম মানিক, "আবেগ ও হৃদরোগ" প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬
২২৫. প্রাগুক্ত
২২৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: ক্রোধ সম্বরণের ফযীলত, খ. ২, পৃ. ৩১৬, হাদীস নং- ৪৭৭৯
২২৭. আল-কুরআন, ৩: ১৩৪
২২৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: সহিষ্ণুতা ও নবী করীম সা.-এর পূত চরিত্র, খ. ২, পৃ. ৩১৫, হাদীস নং- ৪৭৭৪

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ... حَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حَتّٰى قَامَ فَنَظَرْنَا اِلٰى اَعْرَبِيٍّ قَدْ اَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَ كَانَ رِدَاءً خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الاَعْرَابِيُّ احْمِلْ لِيْ عَلٰى بَعِيْرَى هٰذَيْنِ فَاِنَّكَ لاَ تَحْمِلُ لِيْ مِنْ مَالِكَ وَ لاَ مِنْ مَالِ اَبِيْكَ ... ثُمَّ دَعَا رَجُلاً فَقَالَ لَهُ احْمِلْ لَهُ عَلٰى بَعِيْرَيْهِ هٰذَيْنِ عَلٰى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَّ عَلَى الاٰخَرِ تَمْرًا– ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرِفُوْا عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে দাঁড়ালে, আমরাও দাঁড়িয়ে যাই। এসময় দেখি, একজন বেদুঈন আরব তাঁকে ধরে তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে টানছে, যাতে তাঁর গলা লাল হয়ে যায়। রাবী আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সে ব্যক্তির চাদরটি ছিল মোটা কাপড়ের। নবী কারীম (সা.) তার দিকে তাকালে সে বলে, আপনি আমার এ দু'টি উটের পিঠ শস্য দিয়ে ভরে দিন, কেননা, আপনি আপনার মাল থেকে দিচ্ছেন না এবং না আপনার পিতার মাল থেকে।.... অত:পর নবী কারীম (সা.) এক ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, এ ব্যক্তির দু'টি উটের পিঠ শস্য দিয়ে ভরে দাও। এক উটের পিঠে যব এবং অন্য উটের পিঠে খেজুর দিয়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) আমাদের দিকে ফিরে বলেন: তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে চলে যাও।[২২৯]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَادِمًا وَ لاَ امْرَأَةً قَطُّ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো সময় তাঁর কোনো গোলাম বা স্ত্রীকে মারপিট করেননি।[২৩০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلِيْمٍ... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَسُبَّنَّ اَحَدًا... لاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَ اِنْ تَكَلَّمَ اَخَاكَ وَ اَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ–

অর্থ: জাবির ইবন সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত।... রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি কখনো কাউকে গালি দেবে না।... তুমি কখনো কোনো উত্তম বস্তুকে অধম মনে করবে না, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় হাসি মুখে কথা বলো, এটাও একটা ভালো কাজ।[২৩১]

আনাস (রা.) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠাতে চাইলে, আমি মুখে বলি, আল্লাহর শপথ! আমি যাবো না। আর আমার মনে এরূপ ইচ্ছা ছিল যে আমি যাবো, যেখানে যাওয়ার জন্য নবী কারীম (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আমি বের হই এবং বাজারের মধ্যে কয়েকজন ছেলেকে খেলাধুলা করতে দেখি। (ফলে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি।) এমন সময় পেছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এসে আমার কাঁধে হাত রাখেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি মুচকি হাসছেন। তিনি বলেন: হে উনায়স! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম, সেখানে যাও। আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এখনই যাচ্ছি।

রাবী আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ। আমি সাত বা নয় বছর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতকরেছিলাম। কিন্তু আমার জানা নেই, আমি কোন দিন কোনো কাজ করলে তিনি (সা.) আমাকে বলেছেন: কেন তুমি একাজ করলে? আর আমি কোনো কাজ না করলে, তিনি কোনো দিন বলেন নি: তুমি একাজ কেন করনি?[২৩২]

**ক্রোধ সম্বরণ করার দু'আ**

---

২২৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৫, হাদীস নং- ৪৭৭৫

২৩০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা, খ. ২, পৃ. ৩১৭, হাদীস নং- ৪৭৮৬

২৩১. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: লুংগী/পায়জামা ঝুলিয়ে টাখনুর নিচে পরা, খ. ২, পৃ. ২০৯-২১০, হাদীস নং- ৪০৮৪

২৩২. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: সহিষ্ণুতা ও নবী করীম সা.-এর পূত চরিত্র, খ. ২, পৃ. ৩১৫, হাদীস নং- ৪৭৭৩

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ صَرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا تَجُرُّ عَيْنَاهُ وَ تَنْفُخُ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنِّىْ لاَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هٰذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِىْ يَجِدُ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

অর্থ: সুলায়মান ইবন সারাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দু'ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সামনে পরস্পর গালাগালি করে, ফলে তাদের একজনের চোখ লাল হয়ে যায় এবং গলার রগ ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আমি এমন একটা দুআ জানি, যদি কেউ রাগের সময় তা পাঠ করে, তবে তার ক্রোধ চলে যায়। তাহলো- اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই।[২৩৩]

عَنْ اَبِىْ وَائِلِ الْقَاصِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بِنْ مُحَمَّدٍ السَّعْدِىِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلُ فَاَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ اِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَ اِنَّمَا تُطْفَئُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأَ–

অর্থ: আবু ওয়ায়েল কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা উরওয়া ইবন মুহাম্মদ সাদী (রা.)-এর নিকট যাই। সে সময় তাঁর সাথে কোনো এক ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, যাতে তিনি রাগান্বিত হন। তখন তিনি ওঠে যান এবং অযু করেন এবং বলেন: আমার পিতা, আমার দাদা আতীয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: শয়তানের কারণে রাগের সৃষ্টি হয়, আর শয়তানের আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পানি দ্বারাই আগুন নির্বাপিত হয়। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন অযু করে।[২৩৪]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِىْ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন দু' ব্যক্তি গালি-গালাজ করে, তখন প্রথম গালি-গালাজকারীর ওপর সে গোনাহ বর্তায়, যতক্ষণ না মাজলুম ব্যক্তি (অর্থাৎ যাকে গালি দেয়া হয়েছে) কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করে।[২৩৫]

---

২৩৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ক্রোধের সময় কী বলবে, খ. ২, পৃ. ৩১৬, হাদীস নং- ৪৭৮১

২৩৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৬, হাদীস নং- ৪৭৮৪,

২৩৫. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: গালি-গালাজ, খ. ২, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং- ৪৮৯৪

# অষ্টম অধ্যায়

## ইসলামে রোগ ও রোগের দর্শন: সুস্থতার রক্ষাকবচ হিসেবে অযু, সালাত ও সিয়াম


| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | রোগ একটি কষ্টি পাথর |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | রোগে ধৈর্যধারণকারীর ফযীলত |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | সুস্থতার রক্ষাকবচ হিসেবে অযু, সালাত ও সিয়াম |

## প্রথম পরিচ্ছেদ: রোগ একটি কষ্টি পাথর

রোগ-ব্যাধি মুসলমানের জন্য ঈমান পরীক্ষার একটি কষ্টি পাথর। পৃথিবীতে যতদিন মুমিন বেঁচে থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় রোগ-ব্যাধি দিয়ে ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। পরীক্ষা মানেই পরীক্ষিত হওয়ার আতংক, এরপরও পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়, সফলতা অর্জন করতে হয়। এর কোনো বিকল্প নেই। মৃত্যু যেমন ধ্রুব সত্য, কেউ তা রোধ করতে পারে না, তেমনি মুমিন বান্দার জীবনে রোগ-ব্যাধিও আসবে এটাই স্বাভাবিক। তবে একজন মুমিন এক্ষেত্রে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে হবে, একটি স্বর্ণকেও আগুনে পুড়িয়েই খাঁটি করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে যতো বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, তিনি ঠিক ততো বেশি তাকে ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বিভিন্নভাবে এতো কঠিন পরীক্ষা নিয়েই পরবর্তীতে 'খলিলুল্লাহ' তথা আল্লাহর বন্ধু উপাধি দিয়েছিলেন। হাদীসে এসেছে-

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ الْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন শ্রেণির মানুষের ওপর সর্বাধিক বিপদ-আপদ এসে থাকে? ইরশাদ করলেন: নবী-রাসূলগণের ওপর। অত:পর সালিহীন বা পূণ্যবানদের ওপর।[১]

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়নতায় যে যতো বেশি মজবুত, তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয়। যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়।[২]

মুসলমান মাত্রই বিশ্বাস করে, সুস্থতা ও অসুস্থতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। নবী-রাসূলগণও অসুস্থ হয়েছেন। যাঁরা ছিলেন সকল মাখলুকের সেরা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও কয়েকবার অসুস্থ হয়েছেন। তাঁকেও অসুস্থতার কষ্ট বরদাশত করতে হয়েছে। সুতরাং কেউ অসুস্থ হলে এটা বলার সুযোগ নেই যে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রোগ দিয়েছেন বা তাকে দুনিয়াবী আযাবে গ্রেফতার করেছেন। অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন পরীক্ষাস্বরূপ, তেমনি মুমিন বান্দার সুসংবাদও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَ الاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ، وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ–

অর্থ: আর আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন (স্বাস্থ্য) ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। সুতরাং আপনি ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দিন।[৩]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন- যে কোনো মুসলমানের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি (কোনো আঘাত লাগে) এর পরিবর্তে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সে কারণে তার একটি গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৪] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ–

---

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, (অনুবাদ: আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪ (পঞ্চম মুদ্রণ), অনুচ্ছেদ: অসুস্থতার কথা প্রকাশ করা কি অভিযোগ? পৃ. ২৩৭, হাদীস নং- ৫১২; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: মুসিবতে ধৈর্য ধারণ, খ. ২, পৃ. ১৭৯-১৮০, হাদীস নং- ২৩৯৮

২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী', (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)*, বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ-এর নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত, ১৪১৩ হিজরি, পৃ. ৮৮৭

৩. আল-কুরআন, ২: ১৫৫

৪. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তান: করাচি, বুশরা পাবলিশার্স, ২০০৯, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: মুমিন ব্যক্তি কোনো রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা বিঁধলে তার সাওয়াব, খ. ৭, পৃ. ২১০, হাদীস নং- ৬৫৫৬

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তার ওপর মসিবত ঢেলে দেন।[৫]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–لاَ تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِنَّه لاَ يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ–

অর্থ: তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না,কেবল কাফির সম্প্রদায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।[৬]

عَنْ اَبِيْ يَحْيٰ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّاَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ–

অর্থ: আবু ইয়াহইয়া সুহাইব ইবন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মুমিনের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর। (কেননা) তার সকল কাজই কল্যাণপ্রদ। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারগুলো এ রকম নয়। তার জন্য আনন্দের কিছু ঘটলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আবার যখন সে কোনো বিপদে পতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য মঙ্গলজনক।[৭]

আমরা একটু রোগ-শোক এবং বালা-মুসিবতে পতিত হলেই নিরাশ হয়ে পড়ি এবং নিজেকে নিরুপায় মনে করে শরীয়ত বিরোধী এবং উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকি। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থতাকে মুমিন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, অতীত দিনের পাপমোচনকারী, উপদেশ গ্রহণের উপায় এবং আখিরাতে শাস্তি লাঘবকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং রোগ-শোকের সময় অধিক কাতর ও নিরাশ না হয়ে ধৈর্যের সাথে সুন্নাত মোতাবেক চিকিৎসা করাই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা কাউকে কষ্ট দিলে তা অবশ্যই লাঘব করবেন। কোনো কষ্টই দীর্ঘস্থায় নয়। তিনিই মানুষকে কষ্ট থেকে স্বস্তি দান করেন।পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ– وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ–

অর্থ: আর অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে এবং নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব যখনই অবসর পাও একান্তে ইবাদত করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।[৮]

মানব জীবনে দু:খ-কষ্ট ও বালা-মুসিবত অবশ্যম্ভাবী এবং এটা আল্লাহর নির্দেশেই আসে। আর আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে রোগ-শোক ও বালা-মুসিবত থেকে উদ্ধার করে থাকেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ– وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ–

অর্থ: আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি আপনারর কল্যাণ করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।[৯]

ভালো এবং মন্দ উভয় অবস্থা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরীক্ষা করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ، وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً– وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ–

অর্থ: প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[১০]

---

৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ, খ. ২, পৃ. ১৬০৫, হাদীস নং -৫৬৪৫; মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, পাকিস্তান: করাচি, মাকতাবাতুল বুশরা, ২০11, অধ্যায়: কিতাবুল জামি, অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তির সাওয়াব লাভ, খ. ৩, পৃ. ৫৮৩, হাদীস নং- ১৭০৪৩

৬.আল-কুরআন, ১২: ৮৭

৭. মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী, (অনুবাদ: হাফেয মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ), *রিয়াদুস সালেহীন*, ঢাকা: বাংলাবাজার, খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮, অনুচ্ছেদ: ধৈর্যশীলতা, পৃ. ৫৩, হাদীস নং- ২৭

৮. আল-কুরআন, ৯৪: ৫-৬

৯. আল-কুরআন, ৬: ১৭

১০. আল-কুরআন, ২১: ৩৫

আমরা মুসীবতে পড়লে দিশেহারা হয়ে যাই। আমাদের এই করুন অবস্থার জন্য প্রায়ই বিভিন্ন অবস্থাকে দায়ী করে থাকি। কিন্তু মনে রাখতে হবে সমস্ত মুসিবত আল্লাহর নির্দেশেই আসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ، وَ مَنْ يُّؤْمِنْ م بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ– وَاللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمُ–

অর্থ: আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে সম্মুখ অবগত।[১১]

বালা-মুসিবতে আমাদের করণীয় কী, সে সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর তাহচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা। ইরশাদ হচ্ছে–اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةُ قَالُوْا اِنَّا لِلّهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

অর্থ: আর তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রতিই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।[১২]

সুতরাংঅসুস্থতা দ্বারা মুমিন বান্দার স্তর উন্নত হয়। তাই অসুস্থতাকে অশুভ নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ না করে একে সাফল্যের কষ্টি পাথর হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

**রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা**

আল্লাহ তা'আলাই বান্দাকে রোগ দিয়ে থাকেন এবং রোগ থেকে আরোগ্য প্রদানের মালিকও তিনি। আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর কোনো বান্দাকে রোগ থেকে আরোগ্য দেয়ার ইচ্ছা না করেন, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষেশজ্ঞ ডাক্তারও তাকে চিকিৎসা করে রোগ সারাতে পারবে না। তাই দেখা যায়, একই রোগের জন্য একই ডাক্তারের পরামর্শে একই ঔষধ সেবন করে কেউ সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছে এবং কেউ অসুস্থই থেকে যাচ্ছে। আবার কেউ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এমনও হয় কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তার যার চিকিৎসায় হাজার হাজার রোগী সুস্থ হচ্ছে অথচ তিনি নিজেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যাচ্ছেন। তাই সুস্থতা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয়ে মানুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোনো মানুষই অসুস্থ থাকতো না, সবাই সুস্থ থাকতো। সুতরাং দু:খ-কষ্ট, অশান্তি এবং রোগ-শোক আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আবার তিনিই মানুষকে তা থেকে উদ্ধার করে নিয়ামত দান করেন।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ اِذَا مَسَّ الاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّه مُنِيْبًا اِلَيْه ثُمَّ اِذَا خَوَّلَه نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَاكَانَ يَدْعُوْآ اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ–

অর্থ: যখন মানুষকে দু:খ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অত:পর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিলো।[১৩]
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الاَرْضِ، ءَاِلَهُ مَّعَ اللهِ–

অর্থ: বলো তো কে নি:সহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে কোনো উপাস্য আছে কি?[১৪] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَه اِلاَّ هُوَ، وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىٍْ قَدِيْرُ وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه، وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ–

অর্থ: আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের ওপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।[১৫]

---

১১. আল-কুরআন, ৬৪: ১১
১২. আল-কুরআন, ২: ১৫৬
১৩. আল-কুরআন, ৩৯: ৮
১৪. আল-কুরআন, ২৭: ৬২
১৫. আল-কুরআন, ৬: ১৭-১৮

পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যাদের মস্তিষ্ক আছে কিন্তু চিন্তা করতে পারে না, হাত আছে ধরতে পারে না, পা আছে হাঁটতে পারে না, চোখ আছে দেখতে পারে না, কান আছে শুনতে পারে না, জিহ্বা আছে অথচ কথা বলতে পারে না। সর্বপোরি মানুষের দেহের সবকিছুই ঠিক আছে কিন্তু ভেতরে রূহ না থাকার কারণে তিল পরিমাণ নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। একটু ভেবে দেখা উচিত- কার হুকুমে এসব মানুষ পাগল, প্যারালাইজড, অন্ধ, বধির কিংবা বোবা হয়। পক্ষান্তরে, যারা চিন্তা করতে, ধরতে, হাঁটতে, দেখতে, শুনতে বা কথা বলতে পারছে তাদের সে সকল অঙ্গ কোন শক্তির বলে সঠিকভাবে কাজ করছে। সেগুলোতে তো পৃথক কোনো যন্ত্রাংশ স্থাপন করা হয়নি? এসবই একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সচল রয়েছে।আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ، قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً–

অর্থ: তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, রূহ আমার পালনকর্তার একটি হুকুম মাত্র। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[১৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–و اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

অর্থ: এবং আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে আরোগ্য দান করেন।[১৭]

সুতরাং যে স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণে আমাদের জীবন এবং যাঁর ইচ্ছার ওপর আমাদের সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্ভর করে, এমতাবস্থায় বুদ্ধিমানের কাজ হবে আল্লার নিকট দু'আর মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ করত নিজেদের অসুস্থতার আরোগ্য লাভের পথ প্রশস্ত করা।

**আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের রোগে আক্রান্ত হওয়া**

সৃষ্টজীব মাত্রই রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হয়। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, তরুলতা যারই দেহ ও প্রাণ আছে, তারই ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে এবং শত্রু আছে। রোগ-ব্যাধিই হচ্ছে তার শত্রু। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। রোগের আক্রমণ থেকে কেউই রক্ষা পায়নি। আল্লাহর নবী হযরত আইউব (আ.) জটিল রোগে আক্রান্ত অবস্থায় দীর্ঘ আঠারো বছর কষ্ট ভোগ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ–

অর্থ: এবং স্মরণ করো আইয়ুব (আ.)-এর কথা, যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি তো দু:খ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১৮]

এমনিভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট যিনি সবচেয়ে প্রিয় ও সম্মানী বান্দা রাসূলুল্লাহ (সা.)ও বার বার রোগাক্রান্ত হয়েছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشَدُّ عَلَيْهِ الْوَجْعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে অধিক রোগ যাতনা ভোগকারী অন্য কাউকে দেখিনি।[১৯] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا– قَالَ اَجَلْ اِنِّىْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، قُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ؟ قَالَ اَجَلْ ذٰلِكَ–

---

১৬. আল-কুরআন, ১৭: ৮৫

১৭. আল-কুরআন, ২৬: ৮০

১৮. আল-কুরআন, ২১: ৮৩

১৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগের তীব্রতা, খ. ২, পৃ. ১৬০৬, হাদীস নং- ৫৬৪৬; *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: মুমিন ব্যক্তি কোনো রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা বিঁধলে তার সাওয়াব, খ. ৭, পৃ. ২০৭, হাদীস নং- ৬৫৫২; *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: মুসিবতে ধৈর্য ধারণ,খ. ২, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং- ২৩৯৭

অর্থ: আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন: হাঁ, তোমাদের দু'ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম: এটি এজন্য যে আপনার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে?তিনি বললেন: হাঁ, ব্যাপারটি এমনই।[২০]

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ فِى الْبَيْتِ رِجَالُ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب... فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجْعُ وَ عِنْدَكُمْ الْقُرْاٰنَ–

অর্থ: আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এল, তখন ঘরের মধ্যে অনেক মানুষের সমাবেশ ছিল। যাঁদের মধ্যে উমর ইবন খাত্তাব (রা.)ও ছিলেন। ... তখন উমর (রা.) বললেন: নবী কারীম (সা.)-এর ওপর রোগ যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠছে, আর তোমাদের কাছে কুরআন বিদ্যমান।[২১]...

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ مَيِّتُ قَالَ وَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِىْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لاَ تَلُدُّوْنِىْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِىْ؟ قُلْنَا كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) ও আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর মৃত দেহ মোবারকে চুমু দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন: আয়িশা (রা.) আরো বলেন: নবী কারীম (সা.)-এর অসুখের সময় আমরা তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তখন তিনি আমাদের ইশারা দিতে থাকেন, তোমরা আমার মুখে ঔষধ ঢেলো না। আমরা মনে করলাম এটা ঔষধের প্রতি একজন রোগীর অরুচি প্রকাশ মাত্র। এরপর তিনি যখন সুস্থবোধ করলেন তখন বললেন: আমি কি তোমাদেরকে আমার মুখে ঔষধ ঢেলে দিতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম: আমারা তো ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ অনীহা মনে করেছিলাম।[২২]...

অন্য হাদীসে এসেছে- আনাস (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) একদা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি উসামা (রা.)-এর কাঁধে ভর করে আসেন।[২৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ بِلاَلُ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَ يَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ– قَالَتْ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّى يَقُوْلُ–

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحُ فِىْ اَهْلِه + وَ الْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكٍ نَعْلِه

وَ كَانَ بِلاَلُ اِذَا اَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُوْلُ–

اَلاَ لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَ حَوْلِىْ اِذْخِرُ وَ جَلِيْلُ–

وَ هَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةً + وَ هَلْ تَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةً وَ طَفِيْلُ–

---

২০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ ..., খ. ২, পৃ. ১৬০৬, হাদীস নং- ৫৬৪৮; *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: মুমিন ব্যক্তি কোনো রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা বিঁধলে তার সাওয়াব, খ. ৭, পৃ. ২০৯, হাদীস নং- ৬৫৫৪

২১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: তোমরা ওঠে যাও, রোগীর একথা বলা, খ. ২, পৃ. ১৬১২, হাদীস নং- ৫৬৬৯

২২. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রোগীর মুখের ভেতর ঔষধ ঢেলে দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬২৬, হাদীস নং- ৫৭১২ এবং *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাম, অনুচ্ছেদ: মুখে (জোর করে) ঔষধ ঢেলে দেয়া অপছন্দনীয়তা, খ. ৬, পৃ. ৩৫০, হাদীস নং- ৫৭৫৫

২৩. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঠেস দেয়া, খ. ২, পৃ. ৬৪১, হাদীস নং- ১৩৫

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَ صَحِّحْهَا وَ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَ مُدِّهَا وَ انْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন(মদীনায়) আসলেন, তখন আবু বকর (রা.) ও বিলাল (রা.) জ্বরাক্রান্ত হলেন। তিনি বলেন: আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং বললাম: আব্বাজান, আপনার কেমন লাগছে? হে বেলাল! আপনি কেমন অনুভব করছেন? আয়িশা (রা.) বলেন: আবু বকর (রা.) যখন জ্বরাক্রান্ত হতেন তখন তিনি আবৃত্তি করতেন-

"সব মানুষ সুপ্রভাত ভোগ করে আপন পরিবার পরিজন নিয়ে। আর মৃত্যু অপেক্ষমান থাকে তার জুতার ফিতার চেয়েও সন্নিকটে।"

আর বেলাল (রা.)-এর নিয়ম ছিল যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত, তিনি তখন উচ্চস্বরে বলতেন-

"হায়! আমি যদি লাভ করতাম একটি রাত কাটানোর সুযোগ এমন উপত্যকায় যেখানে আমার পাশে আছে ইযখির ও জালীল ঘাস। যদি আমার অবতরণ হতো কোনো দিন মাযিন্না অঞ্চলের কূপের কাছে, যদি আমার চোখে ভেসে আসত শামা ও তাফীল।"

আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আমাদের কাছে মদীনাকে প্রিয় বানিয়ে দিন, যেভাবে আমাদের কাছে মক্কা প্রিয় ছিল এবং মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দিন। আর মদীনার মুদ্দ ও সা'কে বরকতময় করে দিন এবং মদীনার জ্বরকে স্থানান্তরিত করে 'জুহফা' অঞ্চলে স্থাপন করে দিন।[২৪]

**যে কখনো অসুস্থ হয়নি**

অসুস্থ না হওয়াকে অনেকেই নিজেদের সর্তকতা, খাদ্যাভাস, ব্যায়াম, স্বাস্থ্য সচেতনা এবং ডাক্তারের নিকট নিয়মিত চেক-আপ করানোর ফসল মনে করে থাকে। আর যারা প্রায়শই অসুস্থ থাকে, সুস্থ ব্যক্তিরা নিজেদেরকে পণ্ডিত মনে করে রোগীদেরকে সুস্থ থাকার লম্বা লম্ব নসীহতও করে থাকে। অথচ কুরআন-হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মাঝেমধ্যে রোগ-শোক হওয়া মুমিনের জীবনে রহমত ও বরকত লাভের মাধ্যম। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। হাদীসে এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুখ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একজন সাহাবী বললেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا الاَسْقَامُ؟ وَ اللهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ–

অর্থ: হে আল্লাহর রাসূল! অসুখ কী জিনিস? আল্লাহর শপথ! আমি তো কখনো অসুস্থ হইনি?

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا

অর্থ: তুমি এখান থেকে উঠে যাও, তুমি আমাদের দলভূক্ত নও।[২৫] অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ اَخَذَتْكَ اُمُّ مِلْدَانٍ؟ قَالَ وَ مَا اُمُّ مِلْدَانٍ؟ قَالَ حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَ اللَّحْمِ– قَالَ لاَ– قَالَ فَهَلْ صُدِعْتَ؟ قَالَ وَ مَا الصُّدَاعُ؟ قَالَ رِيْحٌ تَعْتَرِضُ فِى الرَّأْسِ، وَ بَضْرِبُ الْعُرُوْقَ– قَالَ لاَ– قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَىْ فَلْيَنْظُرْهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন নবী কারীম (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি কখনো উম্ম মিলদান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছো? উত্তরে লোকটি জিজ্ঞেস করলো, উম্ম মিলদান কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: শরীরের চর্ম ও মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তাপ। লোকটি বললো, না।তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি কখনো মাথা ব্যথা হয়েছে? লোকটি আবারজিজ্ঞেস করলো, মাথা ব্যথা কী?

---

২৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: জ্বর, প্লেগ ও মহামারী দূরীভূত হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তির দুআ করা, খ. ২, পৃ. ১৬১৪, হাদীস নং- ৫২৪৫

২৫. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ: ২০০৪, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: গুনাহ মার্জনাকারী রোগ, খ. ২, পৃ. ৮৮, হাদীস নং- ৩০৮৮

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: মাথার স্নায়ুজনিত কারণে সৃষ্ট ব্যাথা। উত্তরে লোকটি বলল, না। লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমরা যদি কোনো জাহান্নামী লোককে দেখতে চাও তাহলে একে দেখে নাও।[২৬]

### রোগ-ব্যাধি আযাব নয় রহমত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জীবনে রোগ-ব্যাধি কোনো আযাব নয়; বরং তাঁর রহমত ও করুণা প্রাপ্তির অছিলা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের একটি বিশেষ উপায়। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যেকোনো উন্নতি সাধনের জন্যই মানুষকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সুতরাং অসুস্থতা নামক একটু কষ্ট স্বীকার করে যদি বিশেষ মর্যাদা লাভ করা যায় তাহলে এটাকে আযাব মনে না করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত। নবী কারীম (সা.)-এর মুখ নি:সৃত আল্লাহ তা'আলার বাণী-

اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ–

অর্থ: আমি যদি আমার কোনো বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি জিনিসের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করবো। আনাস (রা.) বলেন, দু'টি প্রিয় জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়।[২৭]

عَنْ عَامِرِ الرَّامِ اَخِى الْخُضْرِ قَالَ اِنِّىْ لِبِلَادِنَا اِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَّ اَلْوِيَةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا لِوَاءُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَتَيْتُه وَ هُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَه كِسَاءٌ وَّ هُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اَصْحَابُه فَجَلَسْتُ اِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ اَعْفَاهُ اللهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهِ وَ مَوْعِظَةً لَّهُ فِىْ مَا يَسْتَقْبِلُ وَ اِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ ثُمَّ اُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَلَقَهُ اَهْلُهُ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ اَرْسَلُوْهُ–

অর্থ: আমির রাম (যিনি খুযর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের শহরে ছিলাম। হঠাৎ আমরা কিছু নিশান ও পতাকা দেখতে পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি: এসব কী? লোকেরা বললো, এসব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিশান। তখন আমি তাঁর কাছে আসি। এসময় তিনি একটি গাছের নিচে কম্বলের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীরাও চারদিকে উপবিষ্ট ছিলেন। আমিও তাঁদের সংগে সেখানে বসে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন ধরনের অসুখ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন: যখন কোনো মুমিন রোগগ্রস্ত হয়, এরপর আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করেন, ঐ অসুখ তার বিগত জীবনের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় এবং তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য তা নসীহতস্বরূপ হয়। অপরপক্ষে, যখন কোনো মুনাফিক অসুস্থ হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ওঠে, তার উদাহরণ ঐ উটের ন্যায়, যাকে তার মালিক বেঁধে রাখার পর পুনরায় বন্ধনমুক্ত করে দেয়। অথচ সে জানে না, তাকে কী জন্য বাঁধা হয়েছিল এবং কেন বন্ধন মুক্ত করা হলো।[২৮]

### দু:খ-কষ্ট এবং রোগ-ব্যাধি গোনাহের কাফ্ফারা

অনেকেই মনে করে পাপের কারণেই মানুষের দু:খ-কষ্ট ও রোগ-ব্যাধি হয়। এমন ধারণা ঠিক নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রোগ দর্শনের দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুসলমানের দু:খ-কষ্ট ও রোগ-ব্যাধি পাপের কারণে নয়; বরং পাপের ক্ষতিপূরণ বা কাফফারাস্বরূপ। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ فِىْ جَسَدِهِ وَ اَهْلِهِ وَ مَالِه حَتّٰى يَلْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ–

২৬. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, পৃ. ২৩০, হাদীস নং- ৪৯৭

২৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে তার ফযীলত, খ. ২, পৃ. ১৬০৭, হাদীস নং- ৫৬৫৩

২৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: গোনাহ মার্জনাকারী রোগের বর্ণনা, খ. ২, পৃ. ৮৮, হাদীস নং- ৩০৮৮

অর্থ: আবু সালামা ও আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মুমিন পুরুষ ও নারীর জান-মাল এবং পরিবার-পরিজনের ওপর বালা-মুসিবত লেগেই থাকে, অত:পর সে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তার আর কোনো গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না।[২৯] অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ ذُکِرَتِ الْحُمَّی عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَسُبَّهَا فَاِنَّهَا تَنْفِی الذُّنُوْبَ کَمَا تَنْفِی النَّارُ خَبَثَ الْحَدِیْدِ–

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখে জ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হলে এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিল। তখন নবী (সা.) ইরশাদ করলেন: জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তাপ পাপসমূহকে এমনভাবে বিদূরীত করে, যেমন আগুন লোহার মরিচা দূর করে।[৩০]

অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার কাছে জ্বরের চেয়ে প্রিয়তর আর কোনো রোগ নেই, ইহা আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রাপ্য সাওয়াব প্রদান করে থাকেন।[৩১] হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اُمِّ الْعَلاَءِ قَالَتْ عَادَنِیْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَا مَرِیْضَةٌ فَقَالَ اَبْشِرِیْ یَا اُمَّ الْعَلاَءِ فَاِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ یَذْهَبُ اللهُ بِهِ خَطَایَاهُ کَمَا تَذْهَبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ–

অর্থ: উম্মুল আলা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে এসে বললেন- হে উম্মুল আলা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, মুসলমানদের অসুখের দ্বারা আল্লাহ তাদের গুনাহ তেমনি দূর করে দেন, যেমনি অগ্নি স্বর্ণ-রূপার মরিচা দূর করে দেয়।[৩২]

অন্য একটি হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর যামানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে কোনো একজন লোক উক্ত মাইয়্যেতকে উদ্দেশ্য করে বললো-বাহ! কী চমৎকার মৃত্যুবরণ করলো। কোনোরকম রোগে আক্রান্তও হলো না! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন-

وَیْحَكَ وَ مَا یُرِیْدُكَ لَوْ اَنَّ اللهَ ابْتِلاَهُ بِمَرَضٍ یُکَفِّرُ بِهِ مِنْ سَیِّاٰتِه–

অর্থ: তোমার জন্য আফসোস! এসব কী বলছো? তুমি কি জানো আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে কোনো রোগে আক্রান্ত করতেন তবে তার গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যেতো।[৩৩]

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْخُدْرِیِّ وَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا یُصِیْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَ لاَ وَصَبٍ وَ لاَ هَمٍّ وَ لاَ حُزْنٍ وَ لاَ اَذًی وَ لاَ غَمٍّ حَتّٰی الشَّوْکَةِ یُشَاکُهَا اِلاَّ کَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَایَاهُ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয় এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৩৪] আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُصِیْبُهُ اَذًی اِلاَّ حَاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَایَاهُ کَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে কোনো মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তার থেকে গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে বৃক্ষ থেকে পাতাগুলো ঝরে যায়।[৩৫]

---

২৯. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, পৃ. ২২৯, হাদীস নং- ৪৯৬

৩০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মাআরিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জ্বর, খ. ৪, পৃ. ১০৫, হাদীস নং- ৩৪৬৯

৩১. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং- ৫০৫

৩২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মহিলা রোগীদের সেব করা, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৩০91

৩৩. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জামি, অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তির সাওয়াব লাভ, খ. ৩, পৃ. ৫৮৩, হাদীস নং- ১৭০৪

৩৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ, খ. ২, পৃ. ১৬০৫, হাদীস নং- ৫৬৪১

عَنْ اَبِیْ سَعِيْدٍ وَ اَبِیْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَّصَبٍ وَّ لاَ نَصَبٍ وَّ لاَ سَقَمٍ وَّ لاَ حَزَنٍ حَتّٰى الْهَمَّ بِهَمَّةٍ اِلاَّ كُفِّرَ بِه مِنْ سَيِّئَاتِه–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন- মুমিনের এমন কোনো ব্যথা, কষ্ট, ক্লান্তি, রোগ, পেরেশানি বা কোনো ছোট থেকে ছোট কষ্ট নেই, যার দ্বারা তার পাপ দূর না হয়।[৩৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّیْ لاَعْلَمُ اَشَدُّ اٰيَةٍ فِیْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اٰيَةُ اٰيَّةٍ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ قَوْلُ اللهِ تَعَالٰى مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِه– قَالَ اَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ اَنَّ الْمُسْلِمَ تُصِيْبُهُ النَّكْبَةُ اَوِ الشَّوْكَةُ فَيُكَافٰى بَاَسْوَءِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কুরআনের সবচেয়ে কঠিন আয়াত সম্পর্কে অবহিত আছি। তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন: হে আয়িশা! তা কোন আয়াত? তিনি বলেন: তা আল্লাহর এ বাণী –مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِه– তথা যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করবে, তাকে এর বিনিময় দেয়া হবে।তখন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: হে আয়িশা! তুমি কি এ বিষয়ে অবগত নও যে কোনো মুসলমানের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে বা কাঁটা বিদ্ধ হয়, তখন তা তার বদ-আমলের জন্য কাফ্ফারাস্বরূপ হয়ে যায়?[৩৭]

হযরত আয়িশা (রা.) হতে আরো বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন-

لاَ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ حَتّٰى الشَّوْكَةُ اِلاَّ قُصَّ بِهَا اَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ–

অর্থ: মুমিন এমন কোনো কষ্ট পায় না এমনকি তার কোনো কাঁটা বিঁধে না যার ওছিলায় তার গোনাহ মাফ করা হয় না।[৩৮] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ يَّعُوْدُهُ فَقَالَ لاَ بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللهِ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক রোগীকে দেখার জন্য তার নিকট গিয়ে বললেন: কোনো ক্ষতি নেই, ইনশাল্লাহ গোনাহ থেকে তোমার পবিত্রতা লাভ হবে।[৩৯]

হযরত আতা ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন কোনো আল্লাহর বান্দা রোগাক্রান্ত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দু'জন ফিরিশতা প্রেরণ করেন এবং বলেন, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যারা তাকে দেখতে আসে সে সমস্ত লোককে কী বলে দেখো। যদি সে আগন্তুকদের কাছে আল্লাহর প্রশংসা করে তখন দু'জন ফিরিশতা সেই প্রশংসা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়। অত:পর আল্লাহ তা'আলা সেই ফিরিশতাদ্বয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেন- সে কী বলেছে, অথচ তিনি তা সবচেয়ে বেশি অবগত আছেন। অত:পর ফিরিশতাদের সেই প্রশংসার কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنْ تَوَفَّيْتُهُ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ اِنْ اَنَا شَفَيْتُهُ اَنْ اُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّنْ لَحْمِه وَّ دَمًا خَيْرًا مِّنْ دَمِه وَ اَنْ اُكَفِّرَ عَنْه سَيِّاٰتِه–

অর্থ: আমি যদি (এই রোগের মাধ্যমে) তাকে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করাই তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যদি রোগ থেকে সুস্থ করে দিই, তবে তাকে উত্তম গোশত এবং রক্ত দ্বারা পরিবর্তন করে দেবো (অর্থাৎ ভালো স্বাস্থ্য দান করবো) এবং তার পাপরাশিকেও মাফ করে দেবো।[৪০]

---

৩৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগের তীব্রতা, খ. ২, পৃ. ১৬০৬, হাদীস নং- ৫৬৪৭

৩৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: মুমিন ব্যক্তি কোনো রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা বিঁধলে তার সাওয়াব, খ. ৭, পৃ. ৬১২, হাদীস নং- ৬৫৬৩

৩৭. *সুনান আবু দাউদ*,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মহিলা রোগীদের সেবা করা, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৩০৯২

৩৮. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জামি, অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তির সাওয়াব লাভ, খ. ৩, পৃ. ৫৮৩, হাদীস নং- ১৭০২

৩৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগীর সামনে কী বলতে হবে এবং তাকে কী জবাব দিতে হবে, খ. ২, পৃ. ১৬১০, হাদীস নং- ৫৬৬২

৪০. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জামি, অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তির সাওয়াব লাভ, খ. ৩, পৃ. ৫৮৩, হাদীস নং- ১৭০১

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ عَادَ مَرِيْضًا وَ مَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بَهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَبْشِرْ فَاِنَّ اللهَ يَقُوْلُ هِىَ نَارِىْ اُسَلِّطُهَا عَلٰى عَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النار فِى الْاٰخِرَةِ–

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) আবু হুরায়রাকে সাথে নিয়ে এক জ্বরাক্রান্ত রোগীকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার ওপর চাপিয়ে দিই, যাতে আখিরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিনিময় হয়ে যায়।[৪১]

৪১. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জ্বর, খ. ৪, পৃ. ১০৫, হাদীস নং- ৩৪৭০

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রোগে ধৈর্যধারণকারীর ফযীলত

আমরা কয়েক দিন অসুস্থ থাকলে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়ি এবং আল্লাহকে বিভিন্ন অভিযোগ দিতে শুরু করি। অথচ হযরত আইয়ুব (আ.) দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পরও আল্লাহর কাছে তার অবস্থা জানাতে সাহস পাননি। কতই না অপরিসীম ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন তিনি এবং পবিত্র কুরআনে তাঁর ধৈর্যের প্রশংসা করাহয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا– نِعْمَ الْعَبْدُ– অর্থ: আমি তাঁকে পেলাম ধৈর্যশীল, চমৎকার বান্দা সে।[৪২]

তিনি কুষ্ঠের ন্যায় এমন এক দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে হিম্মত করতো না এবং স্ত্রী ছাড়া সবাইতাকে ঘৃণা করতো। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোনো সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের একটি বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে, তাই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি জবাব দিলেন: আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের ফলে তিনি দুআ করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়। অথচ আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং নিজের অভাব ও দু:খ-কষ্ট পেশ করা অধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দু'আ করতে বাধ্য করলো।[৪৩] এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দু:খ-কষ্ট তথা অসুস্থতা থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ– فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَابِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ–

অর্থ: এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন: আমি দু:খকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দু:খকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত। আর এটা ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।[৪৪]

সুতরাং বিপদাপদ, দু:খ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখকে চলমান জীবনের সফলতার এক একটি ধাপ মনে করে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এতেই মুমিন বান্দার অগণিত কল্যাণ নিহত রয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় ধৈর্যেরও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ–

অর্থ: আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা কাজ পরীক্ষা করে নেব।[৪৫]

তাই মুমিনের উচিত, দু:খ-কষ্টের সময় সবর করা, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় খুশি থাকা এবং সবরকারীদের জন্য তিনি যে পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন তা প্রাপ্তির আশা রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

অর্থ: কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।[৪৬] ইরশাদ হচ্ছে-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ–

---

৪২. আল-কুরআন, ৩৮: ৪৪

৪৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৭

৪৪. আল-কুরআন, ২১: ৮৩-৮৪

৪৫. আল-কুরআন, ৪৭: ৩১

৪৬. আল-কুরআন, ৩৯: ১০

অর্থ: আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত।[৪৭]

হাদীসে এসেছে- হযরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা.) বলেন, একদা আমার চক্ষুরোগ হলো। তখন নবী কারীম (সা.) আমাকে দেখতে আসলেন। তিনি তখন আমাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন: যায়িদ, এভাবে যদি তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকে, তবে তুমি কী করবে? আমি বললাম, ধৈর্যধারণ করবো এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা করবো। তিনি ইরশাদ করলেন: এভাবে তোমার চক্ষুরোগ যদি অব্যাহত থাকে আর তুমি এতে ধৈর্যধারণ করো সাওয়াবের প্রত্যাশা করো, তবে তুমি এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে।[৪৮]

অন্য হাদীসে এসেছে- জাবির (রা.) থেক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: দুনিয়ায় যারা বিপদ-আপদে নিপতিত হয়েছে তাদেরকে যখন কিয়ামতের দিন বিনিময় প্রদান করা হবে, তখন বিপদ-আপদ ব্যক্তিরা আশা করবে দুনিয়ায় যদি তাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা হতো।[৪৯]

সুতরাং সদাসর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ও রোগবালাই থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করার পরও যদি কোনো একজন মুমিন বিপদাপদ অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হয়, তাহলে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর প্রতিদান আশা করবে।

**রোগে ধৈর্য ধারণ করা জান্নাত লাভের ওছিলা**

রোগের কারণে মানুষের মধ্যে সাময়িক দু:খ-কষ্ট, শারীরিক দুর্বলতা ও পেরেশানী দেখা দিলেও এতে রোগীর মধ্যে যে অনুতাপ, কোমলতা, বিনয়, বশ্যতা, আল্লাহভীতি এবং পরকালের স্মরণকে তেজোদ্দীপ্ত করে, তা সুস্থাবস্থায় হয় না। ফলে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মানসিকতা সৃষ্টি এবং মুমিন বান্দা জান্নাতবাসী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। সর্বোপরি কুরআনের ভাষায় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।[৫০] হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحِ قَالَ قَالَ لِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِه الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَ اِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ– قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَ لَكِ الْجَنَّةُ وَ اِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَكِ– فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَّ اَتَكَشَّفَ فَدَعَالَهَا–

অর্থ: আতা ইবন আবী রাবাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাবো না? আমি বললাম: অবশ্যই। তখন তিনি বললেন: এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, সে নবী কারীম (সা.)-এর নিকট এসেছিলো। তারপর সে বললো: আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার ছতর খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন: তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পারো তুমি জান্নাত পাবে। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যেন তোমাকে নিরাময় করেন। মহিলা বলল: আমি ধৈর্য ধারণ করবো, তবে আপনি আল্লাহর নিকট এতটুকু দুআ করুন যেন আমার সতর খুলে না যায়। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জন্য ঐ দু'আই করলেন।[৫১]

---

৪৭. আল-কুরআন, ২: ১৫৬-১৫৭

৪৮. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: চক্ষু রোগীকে দেখতে যাওয়া পৃ. ২৪৮, হাদীস নং- ৫৩৪

৪৯. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই),খ. ২, পৃ. ১৮০-১৮১, হাদীস নং- ২৪০২

৫০. আল-কুরআন, ২: ১৫৩

৫১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগীর ফযীলত, খ. ২, পৃ. ১৬০৭, হাদীস নং- ৫৬৫২

এমন অনেক রোগ আছে চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সুস্থ হয় না। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি হাহুতাশ না করে সুন্নাত অনুযায়ী চিকিৎসার পাশাপাশি ধৈর্যধারণ করে এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

হাদীসে এসেছে– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُوْنُ شَهِيْدُ وَ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: উদরাময় রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ এবং প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ।[৫২]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْنَا اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَهَا نَبِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنَ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَنْ يُّصِيْبَهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلَ اَجْرِ الشَّهِيْدِ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.)-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহর নবী কারীম (সা.) তাঁকে অবহিত করেন, এটি হচ্ছে এক প্রকারের আযাব। আল্লাহ যার ওপর তা পাঠাতে ইচ্ছা করেন পাঠান। কিন্তু আল্লাহ এটিকে মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব প্লেগ রোগে কোনো বান্দা যদি ধৈর্য ধারণ করে এই বিশ্বাস নিয়ে আপন শহরে অবস্থান করতে থাকে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোনো বিপদ তার ওপর আসবে না, তাহলে সেই বান্দার জন্য থাকবে শহীদ ব্যক্তির সওয়াবের সমান সওয়াব।[৫৩]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَخْبَرَه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ... وَ مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ قَالَ الْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَّ الْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَّ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَّ الْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَّ صَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شَهِيْدٌ–

অর্থ: জাবির ইবন আতীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আব্দুল্লাহ ইবন ছাবিত (রা.)-এর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আসলে তিনি তাঁকে বেহুঁশ অবস্থায় পান। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জোরে ডাক দিলেও তিনি কোনো জবাব দেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন" পাঠ করেন।... (এক পর্যায়ে) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: শাহাদাত বলতে তোমরা কী মনে করো? তিনি বলেন: আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়ে যাওয়াকে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও আরো সাত ধরনের শহীদ আছে। যথা: (১) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীও শহীদ, (২) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারীও শহীদ, (৩) পক্ষাঘাতে মৃত্যুবরণকারীও শহীদ, (৪) পেটের রোগের কারণে (কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদিতে) মৃত্যুবরণকারীও শহীদ, (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ, (৬) কোন কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারীও শহীদ এবং (৭) যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যাবে সেও শহীদ।[৫৪]

সুতরাং অসুস্থ বা যেকোনো বিপদে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ও সালাতেরর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনেও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

অর্থ: তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা করো।[৫৫]

৫২. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্লেগ রোগের বর্ণনা, খ. ২, পৃ. ১৬২৭, হাদীস নং- ৫৭৩৩

৫৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: প্লেগ রোগে ধৈর্যধারণকারীর সাওয়াব, খ. ২, পৃ. ১৬২৭, হাদীস নং- ৫৭৩৪

৫৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত, খ. ২, পৃ. ৯১, হাদীস নং- ৩১১০

৫৫. আল-কুরআন, ২: ৪৫

**রোগকে গাল-মন্দ ওমৃত্যুর জন্য প্রার্থনা না করা**

মুমিনের জীবনে রোগ-শোক হওয়া ও বালা-মুসিবত আসা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, বরং বিপদাপদ না আসাটাই অস্বাভাবিক। তাই কোনো মুমিনের জীবনে যদি রোগ-শোক না আসে, তাহলে বুঝতে হবে তার সমস্ত প্রতিদান হয়তো এ দুনিয়াতেই আল্লাহ তাকে দিয়ে দিচ্ছেন। আবার অনেক সময় সামান্য অসুখ-বিসুখ হলে পেরেশান হয়ে রোগকে গাল-মন্দ করা শুরু করে দেয়। কখনো এমন কিছু কথাও বলে ফেলে, যা সরাসরি কুফুরী। আবার অনেকে রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর জন্যও প্রার্থনা করে থাকে। এটা একেবারেই নিষেধ। হাদীসে এসেছে-জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন। একদা নবী কারীম (সা.) উম্মে সাইব অথবা উম্মে মুসায়্যিব (রা.)-এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে হে উম্মে সাইয় অথবা উম্মে মুসায়্যিব? তুমি কাঁপছো কেন? তিনি বললেন –اَلْحُمّٰى لَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا অর্থ: ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত, আল্লাহ এর কল্যাণ না করুন। একথা শুনে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন –لَا تَسُبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ–

অর্থ: জ্বরকে গালি দিও না। কারণ এটা আদম সন্তানের গোনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে (কামারের) হাঁপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।[৫৬] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ، فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَ تَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ –

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যেনো (রোগে পতিত হয়ে) কষ্ট হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি চরম অসহ্যের কারণে কিছু বলতে হয়, তাহলে সে যেন বলে- হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখো, যতদিন পর্যন্ত আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়।[৫৭]

অন্য রেওয়ায়েতে আনাস ইবন মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ–

অর্থ: তোমাদের কেউ যেনো কোনো দু:খ-কষ্টে আপতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে।[৫৮]
আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُ مِنْكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَ اِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা সে যদি নেককার হয় তাহলে হয়তো তার নেকি আরো বৃদ্ধি পাবে। আর যদি বদকার হয় তাহলে হয়তো সে তাওবার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।[৫৯]

---

৫৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: মুমিন ব্যক্তি কোনো রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা বিঁধলে তার সাওয়াব, খ. ৭, পৃ. ২১২-২১৩, হাদীস নং- ৬৫৬৫
৫৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগীর মৃত্যু কামনা করা নিষেধ, খ. ২, পৃ. ১৬১২, হাদীস নং- ৫৬৭১
৫৮. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কাফন-দাফন, অনুচ্ছেদ: মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা,খ. ১, পৃ. ৪৩৭, হাদীস নং- ৯৭০
৫৯. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী,প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মৃত্যু কামনা করা, পৃ. ৪১৯, হাদীস নং- ১৮১৯

**ধৈর্য ধারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমবেদনা লিপি**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– سَلاَمُ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَلْحَمْدُ اِلَيْكَ اللهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللهُ لَكَ الاَجْرَ وَ الْهَمَكَ الصَّبْرَ وَ رَزَقَنَا وَ اِيَّاكَ الشُّكْرَ– فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَ اَمْوَالَنَا وَ اَهْلِيْنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَنِيْئَةً–وَ عَوَارِيَةُ الْمُسْتَوْدِعَةِ نُمَتِّعُ بِهَا اِلٰى اَجَلِ مَّعْدُوْدٍ يَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَّعْلُوْمٍ– ثُمَّ اَفْرِضُ عَلَيْنَا الشُّكْرِ اِذَا اَعْطٰى– وَ الصَّبْرُ اِذَا ابْتَلٰى فَكَانَ اِبْنُكَ مِنْ مَّوَاهِبِ الاَلٰهِيَّةِ وَ عَوَارِيَةُ الْمُسْتَوْدِعَةِ مَتَّعَكَ غِبْطَةً وَّ سَرُوْرًا يَّقْبِضُه بِاَجْرٍ كَثِيْرٍ– اَلصَّلٰوةَ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْهُدٰى اِنْ صَبَرْتَ فَاصْبِرْ– وَ لاَ يَحْبِطُ جَزْعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمُ– وَ اعْلَمْ اِنَّ الْجَزْعَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَ لاَ يَدْفَعُ حُزْنًا مَا هُوَ نَازِلُ– وَ اصْبِرْ فَاِنَّ اللهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ–

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি। যিনি পরম করুণাময় ও দয়াশীল। আল্লাহর রাসূল-এর পক্ষ হতে মু'আয ইবন জাবল (রা.)-এর প্রতি। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। অত:পর আল্লাহ তোমাকে বড় প্রতিদান প্রদান করুন এবং ধৈর্য ধরার তাওফীক দান করেন। আমাদেরকে এবং তোমাকে শুকরিয়া আদায়কারী করুন।

নিশ্চয়ই আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি মহান আল্লাহর উত্তম দান এবং ধার গ্রহণ করা আমানত স্বরূপ। যার থেকে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফায়দা নিচ্ছি এবং তিনি নির্ধারিত সময় আবার তা কব্জা করে নিচ্ছেন। তাই আমাদের ওপর তাঁর দানের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব এবং তিনি যখন আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন তখনও ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। তোমার পুত্র মহান আল্লাহর দান এবং তোমার নিকট ধার দেয়া আমানত ছিল। আল্লাহ তাকে তোমার জন্য লোভনীয় এবং সুখ ও উল্লাসের কারণ বানিয়েছিলেন। তিনিই তাকে তোমার থেকে এক বড় প্রতিদানের বদলে নিয়ে গেছেন। এখন তুমি যদি ধৈর্য ধরো তবে রহমত, বরকত ও হিদায়েত লাভ করবে। তোমার অধৈর্য যেনো তোমার প্রতিদানকে নষ্ট করে তোমাকে লজ্জিত না করে।
আর খুব স্মরণ রেখো, অধৈর্যের মাধ্যমেকিছুই অর্জিত হয় না এবং আগত পেরেশানীও তাতে দূর হয় না। ধৈর্য ধারণ করো। কারণ আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই নেককার লোকদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।[৬০]

উল্লেখ, অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে গিয়ে কোনো রোগী যেনো আল্লাহ তা'আলার কাছে ধৈর্যধারণ করার মতো শক্তি যেনো আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেন এই দুআ না করে ; বরং আল্লাহ তাআলা যেনো তাকে সুস্থ করে দেন সেই দুআ করবে। কারণ যিনি ধৈর্যধারণ করার দুআ কবুল করতে পারেন তিনি তো সুস্থতাও দান করতে পারেন। মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সুস্থ থাকা, বিপদে বা অসুস্থ হয়ে ধৈর্যধারণ নয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ... وَ سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً وَ هُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَئُلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَاَلْتَ اللهَ الْبَلاَءَ فَاسْاَلْهُ الْعَافِيَةَ–

অর্থ: মুআয ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত।... নবী কারীম (সা.) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, সে বলছে- হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ধৈর্যধারণের শক্তি চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ চাইলে; বরং তুমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা কামনা করো।[৬১]

---

৬০. ডা. মো: আব্দুল হাই, (অনুবাদ: মুফতী মুহাম্মদ অলি উল্লাাহ), *আহকামে মাইয়্যেত.* ঢাকা: বাংলাবাজার, মুদ্দাসিরা প্রকাশনী, জুলাই ২০১৭, পৃ. ১২৯

৬১. ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবীহ*,পাকিস্তান: করাচি, মাকতাবাতুল বুশরা, ২০১০, অধ্যায়: দুআ, অনুচ্ছেদ: বিভিন্ন সময়ের দুআ, খ. ২, পৃ. ৫০৩, হাদীস নং- ২৪৩২

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুস্থতার রক্ষাকবচ হিসেবে অযু, সালাত ও সিয়াম

**কুরআন-হাদীসে অযুর গুরুত্ব ও তাৎপর্য**

স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম ব্যবস্থাপত্র হলো সর্বদা শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। আর শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উত্তমরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সর্বদা মর্দন করা প্রয়োজন। অনেক সময় শরীরের চামড়ায় ময়লা জমে লোমকূপ বন্ধ হয়ে গেলে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। সুতরাং অযু এমন একটি আমল, যা একজন মুসলমান প্রতিদিন একাধিক বার করে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতেরজন্য সাধারণত পাঁচ বার অযু করা একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। ফলে সালাত আদায়কারী মাত্রই অযুতে অভ্যস্থ। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে অযু এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমল, যা অন্য কোনো ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। এর দ্বারা শরীরের ঐ সকল অঙ্গসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, যেসব অঙ্গ দিয়ে রোগ জীবাণুসহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ রাখার সহজ পদ্ধতি হলো, শরীরের ঐ সকল অঙ্গগুলোর সংরক্ষণ করা যেদিক দিয়ে রোগ-জীবাণুপ্রবেশ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব দেহে রোগ-ব্যাধি প্রবেশের রাস্তাসমূহের বাধা দানে অযু অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে। তাই অযু  হল সুস্থ থাকার অন্যতম মাধ্যম এবং অসংখ্য রোগের শিফা।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্রময়, মহিয়ান-গরিয়ান সত্তা। তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করতে বান্দাকে পবিত্রতা অর্জন করে তাঁর গুণগান করতে হয়। তবে বান্দা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে আল্লাহ তাআলা তাঁর মহিমান্বিত গ্রন্থ আল-কুরআনে তা বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ–

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কুনই পর্যন্ত ধৌত করো, তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করো।[৬২]

অযুর গুরুত্ব বর্ণনায় হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তির হাদস হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে অযু করে।[৬৩]অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা।[৬৪]
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَ كَثْرَةُ الْخَطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَ اِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمْ الرِّبَاطُ–

অর্থ: আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু অবহিত করবো না, যদ্দারা আল্লাহ গুনাহসমূহ দূর করবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে অযু করা, মসজিদসমূহের দিকে অধিক পদ চালনা করা এবং এক সালাতের পর পরবর্তী সালাতের অপেক্ষায় থাকা। এটাই রিবাত (মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা), এটাই রিবাত, এটাই রিবাত।[৬৫]
অন্য হাদীসে এসেছে-

---

৬২. আল-কুরআন, ৫: ৬
৬৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না, খ. ১, পৃ. ৫০-৫১, হাদীস নং- ১৩৫
৬৪. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, অনুচ্ছেদ: পবিত্রতা সালাতের চাবি, খ. ১, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং- ২৭৬
৬৫. আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৯, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: পূর্ণরূপে অযু করার ফযীলত, পৃ. ৩৩, হাদীস নং- ১৪৩

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ– فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِاَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ– فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ– حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: কোনো মুসলমান কিংবা কোনো মুমিন বান্দা যখন অযু করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ দূরীভূত হয়ে যায়, যার দিকে তার দুই চোখের দৃষ্টি পড়েছিল এবং যখন দুই হাত ধোয়, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দুই হাত ধরেছিল। যখন উভয় পা ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার উভয় পা অগ্রসর হয়েছিলো। ফলে (অযু শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ হতে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়।[৬৬]

হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি-

مَا مِنِ امْرِىءٍ يَتَوَضَاُ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلَاةَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصَلِّيَهَا–

অর্থ: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে সালাত আদায় করে তার এ সালাত ও পরবর্তী সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।[৬৭]

অযুর ফরয চারটি। যথা- (১) সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা, (২) কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা, (৩) মাথা মাসেহ করা এবং (৪) টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

এছাড়া অযুতেউভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, ঘাড় মাসেহ করা ইত্যাদি সুন্নাত বা মুস্তাহাব রয়েছে। কিন্তু অযুর প্রতিটি আমলই মানব শরীর সুস্থতার একেকটি রক্ষাকবচ। চাই তা ফরয, সুন্নাত বা মুস্তাহাব হোক। নিম্নে পর্যায়ক্রমে অযুর বিভিন্ন আমল ও চিকিৎসা কেন্দ্রিক উপকারিতাসমূহ উপস্থাপন করা হলো-

**অযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়া**

অযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) অযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়তেন এবং উম্মতকেও তা পড়তে নির্দেশ প্রদান করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ–

অর্থ: রাবাহ ইবন আবদির রহমান ইবন আবী সুফয়ান ইবন হুআয়তিব (রহ.) হতে তাঁর দাদীর সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলেনি, তার অযু হয়নি।[৬৮] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَضُوْءً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ مَعَ اَحِدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ وَ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا بِسْمِ اللهِ فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ قَالَ ثَابِتُ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَمْ تَرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِيْنَ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সফরে) নবী কারীম (সা.)-এর কতক সাহাবী পানির খোঁজ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারো সাথে পানি আছে কি? (কেউ তা এনে দিলে) তিনি পানিতে তাঁর হাত রেখে বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে অযু করো। আমি তাঁর আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়ে পানি

---

৬৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযুর পানির সাথে গুনাহ ঝড়ে যাওয়া, খ. ২, পৃ. ৩৯, হাদীস নং- ৫৭৭
৬৭. *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: নির্দেশ মুতাবেক অযু করার সাওয়াব, পৃ. ৩৩, হাদীস নং- ১৪৬
৬৮. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা, খ. ১, পৃ. ২৫, হাদীস নং- ২৫

প্রবাহিত হতে দেখলাম। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও অযু করলেন। সাবিত (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাদের সংখ্যা কতজন দেখেছেন? তিনি বললেন, প্রায় ৭০জন।[৬৯]

**উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা**

অযু করতে গিয়ে প্রথমেই উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতে হয়। কেননা তারপরই কুলি করতে হবে। অযুর সময় উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত। সুতরাং হাত যদি অপরিচ্ছন্ন ও জীবাণু মিশ্রিত থাকে, তাহলে সেসব রোগ-জীবাণু মুখের ভেতর দিয়ে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে অসংখ্য ব্যাধি জন্ম দেবে। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নেই। মেশিন ও যন্ত্রপাতি নিয়েকাজ করতে গিয়ে কখনো হাতে ক্যামিক্যাল লেগে যাওয়াস্বাভাবিক। আর দীর্ঘসময়ক্যামিক্যাল হাতে লেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।এছাড়া এমন অনেক লোক রয়েছে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে, যাদের হাতে কোনো না কোনো কাজ লেগেই থাকে। সেসব জিনিসের সাথে লেগে থাকা জীবাণু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাতে লেগে থাকলে শীঘ্রই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। তাই অযুর মাধ্যমে হাতসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার রাখলে চর্ম রোগ, ঘামাচি, চর্মের জ্বালা-যন্ত্রণা এবং ছেতোইত্যাদি রোগ-ব্যাধি থেকে খুব সহজেই বেঁচে থাকা সম্ভব।

তাছাড়া অযু করার উদ্দেশ্যে হাত ধৌত করার সময় আঙ্গুলের গোড়া থেকে বের হওয়া রশি একপ্রকার বৃত্ত সৃষ্টি করে। ফলে মানব দেহে বিচরণশীল বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া আরো গতিশীল হয়ে ওঠে। এ বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং আঙ্গুলের মধ্যে কমনীয়তা সৃষ্টি হয়। যদ্বারা মানুষের কর্মদক্ষতা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَارَادَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِىْ وَضُوْئِهِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَ لاَ عَلٰى مَا وَضَعَهَا–

অর্থ: জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে অযু করতে চাইলে সে যেন তার হাত ধৌত করার পূর্বে তা পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না যে তার হাত রাতে কোথায় অতিবাহিত করেছে এবং সে তার হাত কোথায় রেখেছিল।[৭০]

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের আলিমগণ অযুর প্রারম্ভে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নত বলেছেন।

**কুলি করা**

পানি নিয়ে মুখের ভেতর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে নাড়া-চাড়া করার পর ফেলে দেয়াকে কুলি বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবেই কুলি করতেন। কুলি করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারি। কেননা কুলির মাধ্যমে পানির স্বাদ, গন্ধ ও রং সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আহারের পর খাবারের ছোট ছোট কণা দাঁতের ফাঁকে আটকে থেকে দুর্গন্ধযুক্ত এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে এবং লালার মাধ্যমে তা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে দুর্গন্ধময় এই পদার্থ দাঁত ও মাড়ীর সীমাহীন ক্ষতি সাধন করে। কুলি ও মিসওয়াক করার দ্বারা এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এছাড়া বাতাসে অসংখ্য ধ্বংসাত্মক রোগ-জীবাণু উড়ে বেড়ায়, যা চর্ম চোখে দেখা যায় না। সেসবরোগ-জীবাণুও বাতাসের সাহায্যে মুখে প্রবেশ করে পাকস্থলীতে চলে যায়। কুলির মাধ্যমে সেসব রোগ-জীবাণু থেকে মুখকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে মুখের কিনারা ফেটে যাওয়া যা এইডসের প্রাথমিক লক্ষণ, মুখে দাদ হওয়া, মুখে ছেতো রোগ হওয়া, দাঁত ও মুখ গহ্বর বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হতে হিফাজত থাকে।

উল্লেখ্য, অযুর কুলিতে গড়গড়া করার বিধান থাকায় নামাযী ব্যক্তি টনসিল ও গলার অসংখ্য রোগ থেকে যেমন মুক্তি লাভ করে, তেমনি বার বার গলায় পানি পৌঁছানোর কারণে গলার ক্যান্সার থেকেও রক্ষা পায়।মোটকথা, কুলি করা এমন একটি আমল যদ্বারা মানুষ এমন সব রোগ থেকে পরিত্রাণ পায়, যা দেখা দিলে মানবজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যেতো।

হাদীসে এসেছে-

---

৬৯. *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা, পৃ. ২৬, হাদীস নং- ৭৮

৭০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানো, খ. ১, পৃ. ২৪১, হাদীস নং- ৩৯৫

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ يَعْنِىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ وَ الْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَ لِحْيَتِهِ عَلٰى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَ الْاِسْتِنْشَاقِ–

অর্থ: তালহা (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে এমন সময় উপস্থিত হই যখন তিনি অযু করছিলেন এবং অযুর পানি তাঁর মুখমণ্ডল ও দাড়ি দিয়ে গড়িয়ে সিনার (বুকের) উপর পড়ছিল। আমি তাঁকে দেখলাম যে তিনি পৃথক পৃথকভাবে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন।[৭১]

অন্য হাদীসে এসেছে-আমর ইবন আবু হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.)-কে নবী কারীম (সা.)-এর অযু সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের দেখাবার জন্য নবী কারীম (সা.)-এর মতো অযু করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধইলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার তাঁর চেহারা মুবারক ধুইলেন। অত:পর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাথা মাসেহ করলেন। তারপর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন।[৭২]

**নাকে পানি দেয়া**

বেঁচে থাকার জন্য মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো নাক। কেননা শ্বাস-নি:শ্বাসের একমাত্র পথ হলো এই নাক। আমরা বাতাস থেকে যে অক্সিজেন বা শ্বাস গ্রহণ করি, তাতে অসংখ্য রোগ-জীবাণু লালিত-পালিত হয় যা নাকের ভেতর দিয়ে অতি সহজেই মানব দেহে প্রবেশ করে।সুতরাং রোগ-জীবাণু ও ধুলোবালি মিশ্রিত শ্বাস যদি সর্বদা নাকের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে, তাহলে শরীরে বিপদজনক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর ফুসফুস সবসময় জীবাণু, ধোয়া ও ধুলোবালি মুক্ত বাতাস গ্রহণ করতে চায়। এরকম বাতাস সাধারণত একটি ট্রাংকের ন্যায়কয়েক ফুট লম্বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা এয়ার কন্ডিশনারের মাধ্যমেই সরবরাহ করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই এয়ার কন্ডিশনার মাত্র দেড়-দুই ইঞ্চি নাকের মধ্যেই স্থাপন করে দিয়েছেন। যদ্বারা বাতাসকে সিক্ত করে গ্রহণ করার জন্য নাক প্রতিদিন ১ গ্যালনের এক চতুর্থাংশ সিক্ততা তৈরি করে।আর পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেয় নাকের ভেতরের পর্দা। নাকের ভেতর এই পর্দা নামক যন্ত্রের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছানো বাতাসকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। বিশেষ করে স্থায়ী সর্দিতে নাকে জখম দেখা দিতে পারে। এ সকল রোগীদের জন্য নাক ধৌত করা খুবই জরুরী।

শুধু তাই নয়, নাসিকা ছিদ্র দিয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০০ ঘনফুট বাতাস মানবদেহে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু নাকের মধ্যে যে অনুবীক্ষণ ক্ষুদ্র মার্জনী ও অদৃশ্য পশম রয়েছে, তা বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশকারী ক্ষতিকর রোগ-জীবাণুসমূহকে ধ্বংস করে দেয়ার কারণে আমরা সুস্থ থাকি। রোগ জীবাণুকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আটক করা ছাড়াও নাকে রয়েছে আরো একটি প্রতিহতকরণ পদ্ধতি, যাকে ইংরেজিতে Lysoziam বলা হয়। নাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি আওয়াজকে শ্রুতি মধুর করে। নাকের ভেতরের পর্দা আওয়াজকে শ্রুতি মধুর করতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে, আর কান দেয় মস্তিষ্কে আলোর যোগান। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে নাকের রয়েছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। তাই ফুসফুসে সরবরাহকৃত বাতাসকে পরিষ্কার, আর্দ্র, উষ্ণ ও উপযোগী বানিয়ে দেয় নাক। তাই অযুতে নাক পানি দিয়ে তা পরিষ্কারের কথা হাদীসে এসেছে। সালামা ইবন কায়স (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِذَا تَوَضَّأْتَ فَسْتَنْثِرْ– অর্থ: যখন অযু করো তখন নাক ঝেড়ে নাও।[৭৩]

অযুর কারণে একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচবার পরিষ্কার করতে নাকে পানি দিয়েথাকে। তাই নাকের মধ্যে কোনো প্রকার রোগ জীবাণু লালিত-পালিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।বিশেষ করে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাক পরিষ্কার

---

৭১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: গড়গড়া করা ও নাক পরিষ্কার করার মধ্যে পার্থক্য, খ. ১, পৃ. ৩০, হাদীস নং- ১৩৯

৭২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস নং- ১৮৬

৭৩. *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: নাক ঝাড়ার নির্দেশ, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ৮৯

করতে পানি দিয়ে ধৌত করা খুবই জরুরী। কেননা জাগ্রত অবস্থায় মানুষ অনেক সময় মুখের মাধ্যমেও নিশ্বাস নিয়ে থাকে। কিন্তু রাতে শয়নকালে মুখবন্ধ থাকায় নাক দ্বারা নি:শ্বাস গ্রহণ করে এবং ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অনেক গাঢ় পদার্থ নাকে এসে জমা হয়।শ্বাস-নি:শ্বাস সঠিকভাবে প্রবেশ করা এবং বের হওয়া তথা স্বাস্থ্যগত সুস্থতার জন্য বিছানা হতে ওঠার সাথে সাথে উক্ত জমাট পদার্থকে বের করা অপরিহার্য। এজন্যই ইসলাম ঘুম হতে ওঠেই ফজরের সালাত আদায়ের নিমিত্ত অযু করার মাধ্যমে নাক পরিষ্কার করার শিক্ষা দিয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ অযু করলে সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে।[৭৪]

### মুখ ধৌত করা

বর্তমান যুগে চারদিকে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটেই চলছে। তাই এসব মরণ ব্যাধি ও বিষাক্ত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ইত্যাদি কণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পদার্থ বিশেষজ্ঞরা সবসময় পরিবেশ সুস্থ ও নির্মল রাখার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন এবংহাত, মুখ এবং শরীরের খোলা অংশগুলোকে বার বার ধৌত করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। কারণ ক্যামিক্যাল, ধোঁয়া ও ধুলাকণা ইত্যাদি যেন শরীরে বেশিক্ষণ স্থায়ী না হয়। ধোঁয়ার মধ্যে নানা রকম বিপজ্জনক ক্যামিকেল বিদ্যমান থাকে। যেমন: সীসা, লেদ ইত্যাদি। এগুলো চেহারার নরম ত্বকে বেশি সময় লেগে থাকলে এলার্জি, চর্ম ও অন্যান্য রোগ দেখা দেয়। সুতরাং এসকল রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে অযুর মধ্যে নিয়মিত মুখ ধৌত করার কোন বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনে এসেছে – يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো।[৭৫]
অযুর সময় মুখ ধৌত করার আরো কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

### মুখে ব্রণ না হওয়া

নিয়মিত মুখ ধৌত করলে মুখে ব্রণ হয় না, আর হলেও এর পরিমাণ থাকে খুবই নগণ্য, যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন- বাজারে যেসব ক্রীম, স্নো, লোশন এবং অন্যান্য প্রসাধনী পাওয়া যায়, এ সবই ব্যবহারে চেহারায় দাগ সৃষ্টি করে। তাই সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যহ কয়েকবার চেহারা ধৌত করা খুবই ফলপ্রদ। আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি (American Council For Beauty) সংস্থার সম্মানীত সদস্য লেডী হীচার বিস্ময়কর এক তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো প্রকার রাসায়নিক লোশন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। ইসলামী অযু দ্বারাই তারা চেহারার যাবতীয় রোগ থেকে রক্ষা পায়।[৭৬]

### চেহারার এলার্জি হ্রাস

চেহারায় এলার্জির রোগীরা যদি অযুতে উত্তমরূপে চেহারা ধৌত করে, তাহলে এলার্জি হ্রাস পাবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এলার্জি থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো নিয়মিত মুখ ধৌত করা। আর এ ব্যবস্থা কেবল বাধ্যতামূলক দৈনন্দিন অযু দ্বারাই নিশ্চিত করা যায়।

### চেহারার ম্যাসেজ

অযু করার সময় মুখমন্ডল তিন বার ধৌত করা সুন্নাত। এই পদ্ধতিতে চেহারা ধৌত করলে হাত দ্বারা চেহারায় এক ধরনের উত্তম ম্যাসেজ হয়। ফলে এ সময় মুখে রক্ত চলাচলের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় চেহারায় কোমলতা, উজ্জ্বলতা ও নূরানী ভাব চলে আসে। এছাড়া অযুর কারণে চেহারায় জমে থাকা ময়লা ও ধুলাবালি বিদূরীত হয়ে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, অযুতে মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করার যৌক্তিকতা হচ্ছে, প্রথমবার মুখে পানি দিয়ে ময়লা নরম করা হয়। দ্বিতীয়বার পানি দিলে ময়লা দূর হয়ে যায়। আর তৃতীয়বার পানি দেয়ায় ময়লা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়।

---

৭৪. *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: নাক পরিষ্কার করা, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ৮৬

৭৫. আল-কুরআন, ৫: ৬

৭৬. ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, আল-কাউসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ (সংশোধিত সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৪৭

**ভ্রুতে পানির প্রভাব**

অযুর মাধ্যমে চোখের ভ্রুগুলো ভিজে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, ভ্রু ভেজা থাকলে চোখের এমন মারাত্মক রোগ থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যেসব রোগে চোখের দৃষ্টিশক্তি পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

**চক্ষু রোগ থেকে হিফাজত**

কারো চোখে যদি ব্যথা হয়, তাহলে অন্তত সাময়িকভাবে ব্যথা উপশমের জন্য চোখে শীতল পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়। বস্তুত পানি এমন এক মহাপ্রতিষেধক ঔষধ, যদ্বারা চোখের সর্বপ্রকার রোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। ধুলাবালি যেভাবে চেহারা ও নাকের ক্ষতি করে, তেমনি চোখকেও প্রভাবিত করে থাকে। চোখ ওঠা রোগ সাধারণত ধুলাবালির কারণেই হয়ে থাকে। জনৈক ইউরোপিয়ান ডাক্তার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল 'চক্ষু-পানি-সুস্থতা (Eye-Water-Health).' সেই প্রবন্ধে তিনি চক্ষুকে পানি দ্বারা ধৌত করার ওপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে বলেন, তোমরা দিনে কয়েকবার পানি দ্বারা মুখ ধোও, নতুবা তোমরা মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে।[৭৭]

**চোখের ছানির চিকিৎসা**

ঘুমানোর পর চোখের পাতা বন্ধ থাকায় চোখের কোণা ও পাতায় পিচুটি জমে। সকালে ঘুম থেকে ওঠে পানি দিয়ে পিচুটি ভালোভাবে ধৌত না করলে আস্তে আস্তে তা চোখের ছানিতে পরিণত হয়। তাই বর্তমান চোখের ডাক্তারগণ বলেন, মানুষের চোখে যে ছানি পড়ে এর মৌলিক চিকিৎসা হলো সকাল বেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর চোখে ভালোভাবে পানির ছিটা দেয়া। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ অথবা ফজরের সালাতের জন্য জাগ্রত হয়, সে নিশ্চয় অযু করে। এভাবে নিয়মিত সকাল বেলায় চোখে বার বার পানি দেয়ার কারণে চোখের ছানি দূরীভূত হয় এবং চোখের পাতা পড়ে যাওয়া রোগ ও চোখ ফুলে যাওয়া রোগকেও নির্মূল করে দেয়।

**দাড়ি খেলাল করা**

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যাদের দাড়ি হালকা অযু করার সময় তারা দাড়ির গোঁড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে। আর যাদের দাড়ি ঘন হওয়ার কারণে অযুর মধ্যে পানি গোঁড়া পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়, তারা ভেজা হাত দিয়ে দাড়ি খেলাল করবে। অযুর মধ্যে দাড়ি ধৌত বা খেলাল করার কারণে দাড়ির গোঁড়া মজবুত ও শক্তিশালী হয়। দাড়ি ধৌত বা খেলাল করার কারণে সাধারণ রোগ-জীবাণু এবং সংক্রামক রোগ জীবাণুও পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাছাড়া দাড়িতে পানি ব্যহারের ফলে ঘাড়ের মাসল, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এবং গলার রোগ সংক্রমণের কোনো প্রকার সম্ভাবনা থাকে না। উল্লেখ্য, নিয়মিত দাড়িতে পানি পৌঁছালে তাতে উকুন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عن حسن بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له او قال فقلت له اتخلل لحيتك قال و ما يمنعنى و لقد رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يخلل لحيته–

অর্থ: হাসান ইবন বিলাল (রহ.) বলেন, আমি আম্মার ইবন ইয়াসির (রা.)-কে অযু করার সময় তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখলাম। তাঁকে বলা হলো অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি দাড়ি খিলাল করছেন? আম্মার (রা.) বললেন, আমাকে কিসে বাধা দেবে? আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।[৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে-

عن انس يعنى ابن مالك ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وَ قَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন অযু করতেন তখন এক কোষ পানি নিতেন। অতঃপর তা চিবুকের নিচে দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন। তা দিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন আর বলতেন: আমার প্রতিপালক এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৯]

৭৭. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯
৭৮. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: দাড়ি খিলাল করা, খ. ১, পৃ. ২৮, হাদীস নং- ২৯
৭৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: দাড়ি খেলাল করা, খ. ১, পৃ. ৩১, হাদীস নং- ১৪৫

**কুনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা**

শরীরের কুনুই অংশটুকু সাধারণত আবৃত থাকে। এতে নিয়মিত পানি বা বাতাস না লাগলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর নানাবিধ রোগ সৃষ্টির খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। কুনুইতে তিন প্রকার বৃহৎ শিরা (veins) থাকে, যা হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও যকৃতের সাথে সম্পৃক্ত। কুনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করলে উপরোক্ত তিনটি অঙ্গের শক্তি সঞ্চার হয় এবং সেগুলো রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। এছাড়া কুনুই পর্যন্ত হাত ধোয়ার কারণে প্রত্যক্ষভাবে বক্ষের মধ্যে পুঞ্জিভূত উজ্জ্বল আলোক রশ্মির সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেই রশ্মিগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। এতে হাতের মাংশ পেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[৮০]

কুনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হলো-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ–

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কুনই পর্যন্ত ধৌত করো।[৮১]

**মাথাও ঘাড় মাসেহ করা**

সালাতের মধ্যে মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয, আর ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব। মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সিগন্যাল পেলে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। আর আমাদের মস্তিষ্ক সর্বক্ষণ তারল্য (fluid) অবস্থায় ভাসমান (float)থাকে। যার কারণে আমরা চলা-ফেরা করি, হাঁটি, দৌড়াই, লাফালাফি করি অথচ মস্তিষ্কের কোনোই ক্ষতি হয় না। আর এটা যদি কোন অনমনীয় (rigid) জিনিস হতো, তাহলে এতদিনে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এটাকে তারল্য অবস্থায় রেখেছেন। মস্তিষ্ক থেকে কতিপয় সূক্ষ্ম শিরা পথ পদর্শক হিসেবে কাজ করে, ফলে সেগুলো ঘাড়ের পৃষ্ঠ থেকে পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, চুল বৃদ্ধির কারণে যদি ঘাড়ের পৃষ্ঠে পানি পৌঁছানো না হয়, তাহলে সেসব শিরায়শুষ্কতা সৃষ্টি হওয়ায় মানব দেহে এর বিরাট প্রভাব পড়ে। কখনো এমনও হয় যে মানুষের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এজন্য ডাক্তারগণ বলেন, ঘাড় মাসেহ করার জায়গা দিনে কয়েকবার ভেজা রাখা দরকার। ঘাড় মাসেহ করার দ্বারা মানব দেহে বিশেষ এক শক্তি সঞ্চারিত হয়, যার সম্পর্ক মেরুদন্ডের অস্থি-মজ্জা এবং মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে রয়েছে। নামাযী ব্যক্তি যখন ঘাড় মাসেহ করে, তখন হাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে মেরুদন্ডে পুঞ্জিভূত হয় এবং মেরুদন্ডের হাড়কে স্বীয় গমন পথ বানিয়ে পূর্ণ দেহের মাংসপেশী ও স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। যদ্বারা মাংসপেশীগুলোতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। তাছাড়া নিয়মিত মাথা ও ঘাড় মাসেহ করার কারণে পাগল হওয়া রোধ করে। রূহানিয়াত বিশেষজ্ঞরা মানব দেহকে যে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'হাবলুল ওয়ারিদ'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

অর্থ: আমি মানুষের শাহরগের চেয়েও অধিক সন্নিকটে।[৮২]

এ শাহরগ মাথা ও ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। আর এজন্যই মাথা ও ঘাড় মাসেহ করলে শাহরগের মাধ্যমে সারা শরীরে এর শীতলতা অনুভূত হয়। এমনকি সঠিক পদ্ধতিতে নিয়মিত মাথা ও ঘাড় মাসেহ করলে উচ্চ রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাছাড়া বর্তমান শিল্প উন্নয়ন যুগে বিভিন্ন ক্ষতিকর ক্যামিকেল ও ধুলা-বালু চুলে লেগে থাকার কারণে চুল ও মাথার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই নিয়মিত পাঁচবার মাথা মাসেহ করলে এসকল ক্ষতি থেকে সহজেই মুক্ত থাকা যায়। মাথা মাসেহ করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ– وَامْسَحُوْا بِرُئُوْسِكُمْ ...

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যখন সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেবে তখন ... তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করো।[৮৩]

হাদীসে এসছে-

---

৮০. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯-৫০

৮১. আল-কুরআন, ৫: ৬

৮২. আল-কুরআন, ৫০: ১৬

৮৩. আল-কুরআন, ৫: ৬

عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما و ادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দুই হাতে মাথা মাসেহ করেছেন। তিনি উভয় হাতকে সামনে ও পেছনে নিয়েছেন। মাথার সম্মুখ ভাগ হতে আরম্ভ করে উভয় হাত ঘাড়ের দিকে নিতেন, অত:পর পিছন দিক হতে পুনরায় সামনের দিকে এনে আরম্ভ করার স্থানে পৌঁছাতেন। তারপর তাঁর দুই পা ধুয়েছেন।[৮৪]

**পা ধৌত করা**

আমরা যেমন নিয়মিত মুখমন্ডল ধৌত করে এর সৌন্দর্যতা সংরক্ষণ করি, তেমনি নিয়মিতভাবে আমাদের পাসমূহও ধৌত করে তা সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধুলাবালি ও জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় পাসমূহ। আর মানব দেহের ইনফেকশন সর্বপ্রথম শুরু হয় পায়ের আঙ্গুল হতে। তাই ইসলাম মানব জাতির জন্য অযুর মাধ্যমে দিনে পাঁচবার পা ধৌত করা ও আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার নির্দেশ দিয়েছে, যেন পা ও আঙ্গুলের মধ্যে কোনো প্রকার জীবাণু আটকে না থাকে। পা ধৌত করার দ্বারা অসংখ্য রোগ-ব্যাধিরও অবসান ঘটে। যেমন: অস্থিরতা (depression),ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা, মস্তিষ্ক শুষ্কতা, অনিদ্রা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি নি:শেষ হয়ে যায়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) রোগীদের পায়ে বেশি ইনফেকশন হয়ে থাকে। তাই এ সমস্ত রোগীদের বেশি বেশি পা ধৌত করার জন্য ডাক্তারগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যা একজন নামাযী ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচবার অযু করার দ্বারা ডাক্তারের এই পরামর্শ সহজেই পালন করতে সক্ষম। অযুতে পা ধৌত করার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ ... وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ–

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেবে তখন ... তোমরা উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করো।[৮৫] হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ من مكة الى المدينة حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤا و هم عجال فانتهينا اليهم و اعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আমরা মক্কা হতে মদীনায় ফিরছিলাম। রাস্তায় এক জায়গায় পানি পাওয়া গেল। কিছু লোক তাড়াতাড়ি আসরের সময়ে এগিয়ে আসলো এবং তাড়াহুড়া করে অযু করলো। আমরা তাদের নিকট পৌঁছে দেখলাম, তাদের পায়েরটাখনু চকচক করছে, তাতে পানি পৌঁছেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: আফসোস ঐ টাখনুগুলোর জন্য যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তোমরা পূর্ণভাবে অযু করো।[৮৬]

**অযু ও উচ্চ রক্তচাপ**

কেউ কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে সে যেন অযু করে নেয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ وَائِلِ الْقَاصِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عُرْوَةَ بِنْ مُحَمَّدٍ السَّعْدِىِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلُ فَاَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ اِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَ اِنَّمَا تُطْفَئُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأَ–

অর্থ: আবু ওয়ায়েল কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা উরওয়া ইবন মুহাম্মদ সাদী (রা.)-এর নিকট যাই। সে সময় তাঁর সাথে কোনো এক ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, যাতে তিনি রাগান্বিত হন। তখন তিনি ওঠে যান এবং

---

৮৪. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: মাথা মাসেহ-এর সময় সামনে থেকে শুরু করে পিছনের দিকে যেতে হবে, খ. ১, পৃ. ২৮-২৯, হাদীস নং- ৩২

৮৫. আল-কুরআন, ৫: ৬

৮৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: উভয় পা পুরোপুরি ধোয়ার আবশ্যিকতা, খ. ২, পৃ. ৩৪, হাদীস নং- ৫৭০

অযু করেন এবং বলেন: আমার পিতা, আমার দাদা আতীয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: শয়তানের কারণে রাগের সৃষ্টি হয়, আর শয়তানের আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পানি দ্বারাই আগুন নির্বাপিত হয়। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন অযু করে।[৮৭]

ডাক্তারগণও উচ্চ রক্তচাপের সময় অযু করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সুতরাং উভয় বিধান, লক্ষণ ও উপসর্গকে একত্র করে গবেষণা করলে আমাদের সামনে যে দিকটি উন্মুক্ত হয়ে ওঠে তাহলো- ক্রোধের সময়ও উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। তাই এ অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করে নেয়, তাহলে তার উচ্চ রক্তচাপ কমে যায়। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হার্টএ্যাটাক, ব্রেইন স্ট্রোকসহ নানা ধরণের মরণ ব্যাধি থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাই অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের অযু করিয়ে তারপর প্রেসার পরীক্ষা করলে তাদের প্রেসার হ্রাস পাওয়া যায়।

**মানসিক রোগ নিরাময়ে অযু সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র**

মুলতান শহরের নাশতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার প্রফেসর জনাব নূর আহমদ নূর বলেন, পাশ্চাত্যের দেশসমূহে নৈরাশ্য (depression) রোগ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে। সেখানে মহল্লায় মহল্লায় মানসিক হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে। আর মনস্তাত্বিকগণ সবসময় তাদরে চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকেন।পক্ষান্তরে, এ রোগটি মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে দীনদার লোকদের মাঝে। তাই পাশ্চাত্যের ডাক্তারগণ এর রহস্য উদঘাটনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে পশ্চিম জার্মানীর ডাক্তারগণ নৈরাশ্য রোগের চিকিৎসায় অনেক গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগের চেয়েও অধিক কার্যকরী  হলো ব্যবহারিক কিছু আচরণ, যা নিয়মিত পালন করলে অতি দ্রুত ফল পাওয়া যায়। তাঁরা বলেন, নৈরাশ্য বা মানসিক রোগীকে প্রত্যহ পাঁচবার মুখমন্ডল ধৌত করালে কয়েক মাসের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠবে। তাঁরা আরো বলেন, অবসাদগ্রস্থ রোগীদেরকে প্রত্যহ পাঁচবার হাত, মুখ এবং পা ধৌত করালে রোগী অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। অবেশেষে তাদের একজন একটি প্রবন্ধ লিখে উপসংহারে বলেন, এ রোগ মুসলমানদের মাঝে খুবই কম হয়, কেননা তারা প্রত্যহ কয়েকবার মুখ, হাত ও পা ধুয়ে থাকে অর্থাৎ অযু করে। তদ্রুপ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন মনোবিজ্ঞানী ডা: সালামত আযীয। তিনি বলেন, অযু মানসিক রোগ উপশমের একটি উত্তম ব্যবস্থাপত্র।পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক রোগীদেরকে প্রত্যহ কয়েকবার অযুর ন্যায় শরীরে পানি দিয়ে থাকে। আর ইসলাম সেই প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বেই দৈনিক পাঁচবার অযু করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে।[৮৮]

**ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে অযু করার একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব**

অযুতে সর্বপ্রথম হাত ধৌত করা, তারপর কুলি করা, অত:পর নাকে পানি দেয়া,এরপর মুখমন্ডল ধৌত করা, হাত ধোয়া, মাথা মাসেহ করা, ঘাড় মাসেহ করা এবং সর্বশেষ পা ধৌত করা। এভাবে তারতীব অনুযায়ী অঙ্গসমূহ ধৌত করতে হয়। এটি এমন একটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতি, যার দ্বারা অর্ধাঙ্গ রোগ হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।[৮৯]
হাদীসে এসেছে-

عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع فى العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع فى العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع فى الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع فى الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يتوضأ–

অর্থ: নুআয়ম ইবন আবদিল্লাহ আল-মুজমির (রহ.) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে অযু করতে দেখলাম। তিনি পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অত:পর ডান হাত ধৌত করলে, এমনকি বাহুর কিছু অংশও ধৌত করলেন, অত:পর বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধৌত করলেন, অত:পর মাথা মাসেহ করলেন। অত:পর তিনি ডান

৮৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: ক্রোধের সময় কী বলবে, খ. ২, পৃ. ৩১৬, হাদীস নং- ৪৭৮৪
৮৮. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩-৫৪
৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২

পা গোছার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন, এরপর বাম পা গোছার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। অত:পর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এভাবে অযু করতে দেখেছি।[৯০]

অযুর প্রতিটি অঙ্গ কতবার ধৌত করতে হবে এ সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলোতে দেখা যায় অঙ্গসমূহ একবার, দুইবার ও তিনবার ধৌত করা যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَفَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অযুর সংবাদ দেবো কি? অত:পর তিনি (প্রত্যেক অঙ্গ) এক-একবার ধৌত করলেন।[৯১]

উমার (রা.) বলেন–رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাবুক অভিযানকালে অযুর প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করতে দেখেছি।[৯২]

অযুর প্রতিটি অঙ্গ দুইবার করে ধৌত করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী কারীম (সা.) অযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধৌত করেছেন।[৯৩]
হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরএকবার ও দুইবার করে প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে-

هذا وظيفة الوضوء ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا الوسيط من الوضوء الذى يضاعف الله الاجر لصاحبه مرتين–

অর্থ: ইহাই (একবার ধৌত করা) অযুর ফরয, অত:পর দুইবার করে ধৌত করে বলেন, ইহাই মধ্যম পদ্ধতির অযু, ইহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অযুকারীর জন্য সওয়াব দ্বিগুণ বৃদ্ধি করবেন।[৯৪]

অত:পর অযুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا–

অর্থ: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) অযুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেছেন।[৯৫]

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, বিশেষজ্ঞ আলিমগণের অভিমত হলো, অযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলে অযু হবে, দু'বার করে ধৌত করা উত্তম, আর তিনবার করে ধৌত করা সবচেয়ে উত্তম। তবে তিনবারের অধিক ধৌত করাতে কোনো ফায়েদা নেই। ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি তিনবারের অধিক ধৌত করে, আমার ধারণা মতে তার গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৯৬]

উল্লিখিত হাদীসসমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা.) অযুর অঙ্গগুলো একবার বা দুইবারও ধৌত করেছেন। এছাড়া তিনি তিনবার করেও ধৌত করেছেন ফযীলত লাভের জন্য, ফরয হিসেবে নয়।
অযু করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিম্নের দুআ পাঠ করতেন-

---

৯০. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযুতে মুখমন্ডলের শুভ্রতা এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয় মুস্তাহাব, খ. ২, পৃ. ৪০, হাদীস নং- ৫৭৯

৯১. *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা, পৃ. ২৬, হাদীস নং- ৮০

৯২. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: একবার একবার করে অযুর অঙ্গ ধৌত করা, খ. ১, পৃ. ২৩৮, হাদীস নং- ৪১২

৯৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: অুযতে দু'বার করে ধোয়া, খ. ১, পৃ. ৫৬, হাদীস নং- ১৫৮

৯৪. আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, মিশর, কায়রো, দারুল হারামাইন, ১৯৯৭ (প্রথম প্রকাশ), অধ্যায়: পবিত্রতা, খ. ১, পৃ. ২৩৭, হাদীস নং ৫৩৪

৯৫. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযুতে প্রতি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া, খ. ১, পৃ. ৩২, হাদীস নং- ৪৪

৯৬. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযুতে প্রতি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া, খ. ১, পৃ. ৩২, হাদীস নং- ৪৪-এর ব্যাখা

من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من ايها شاء–

অর্থ: উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। তাঁর জন্য জান্নাতের ৮টি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছা মত যে কোনো দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৯৭]

৯৭. প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: অযু করার পর দুআ, খ. ১, পৃ. ৩৬, হাদীস নং- ৫৫

## সালাত

### কুরআন-হাদীসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ আমল হলো সালাত। আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হলো এই সালাত। একজন বান্দা সালাতের মাধ্যমে যতো তাড়াতাড়ি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে থাকে, অন্য কোনো আমলের মাধ্যমে ততো তাড়াতাড়ি নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা, সালাতের মাধ্যমেই একজন বান্দার সবচেয়ে বেশি আল্লাহর দাসত্বের বহিপ্রকাশ ঘটে থাকে।

সালাত এমন একটি ইবাদত যা মানুষকে তার আত্মার নিকটবর্তী করে দেয়। মানুষ যখন স্বীয় আত্মাকে জানতে পারে, তখন তার সম্মুখে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাকে পথ প্রদর্শন করছেন। এ বোধ জাগ্রত হলে মানুষ বুঝতে পারে নিজের মর্যাদা কতো মহান এবং সে আল্লাহর কতটা কাছাকাছি পৌঁছেছে। ফলে এ পদ্ধতির প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। মানুষ যখন একনিষ্ঠভাবে সঠিক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করে, তখন সে চরম আনন্দ লাভ করে। তার আত্মা আলোকিত হয়ে ওঠে। এ মহাআনন্দে তার আত্মা এত হালকা হয় যে নিজের দেহের কথাও ভুলে যায়। তখন মনে হয় সালাত আদায়কারী যেন আল্লাহর অতি নিকটেই অবস্থান করছে। আর এ কারণেই সালাতকে মুমিনের মিরাজ বলা হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমান পরকালের যেমন কল্যাণ লাভ করে তেমনি দুনিয়াতেও অসংখ্য ফায়েদা হাসিল করে। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানের জন্য সালাতের চেয়ে কোনো উত্তম নিয়ামত হতে পারে না। তাই ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা ৮২বার সালাত কায়েম করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং পবিত্র হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা.) অসংখ্য বার সালাতের তাগিদ করেছেন। তাই প্রতিটি মুসলানকে সময় মতো অবশ্যই সালাত আদায়ে যত্নবান হতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا–

অর্থ: নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করে দেয়া হয়েছে।[৯৮] একজন মুমিনের আখলাক ও বৈশিষ্ট্য তো এমনই হওয়া উচিত যে সালাতের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হবে এবং সালাতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে যথাযথ নিয়মানুযায়ী নিয়মিত সালাত আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–- الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

অর্থ: যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত।[৯৯]

অন্যত্র তিনি বলেন-وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اُلٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُكْرَمُوْنَ

অর্থ: আর যারা নিজদের সালাতকে হিফাযত করে, তারাই জান্নাতসমূহে সম্মানিত হবে।[১০০]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

অর্থ: তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা করো।[১০১]

একদা নজদ অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রথমেই ইরশাদ করেন –خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ

অর্থ: দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয।[১০২]

অন্য হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে নির্ধারিত সময়ে বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করবে- তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে

৯৮. আল-কুরআন, ৩: ১০৩
৯৯. আল-কুরআন, ৭০: ২৩
১০০. আল-কুরআন, ৭০: ৩৪-৩৫
১০১. আল-কুরআন, ২: ৪৫
১০২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: সালাত ফরয হওয়ার বর্ণনা, খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ৩৯১

যে, আল্লাহ তার সমস্ত পাপ মাফ করবেন। অপরপক্ষে যারা এরূপ করবে না তাদের জন্য আল্লাহর কোনো অংগীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের মাফ করবেন অন্যথায় শাস্তি দেবেন।[১০৩]

উল্লেখ্য, সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে হাদীসে অসংখ্য উৎসাহ ও তাগিদ প্রদান করা হয়েছে এবং সালাত আদায় না করলে এর ভয়াবহ শাস্তির কথাও এসেছে। এছাড়া ঈমানের পরেই যে সালাতের স্থান একথা সকল মুসলমানই অবগত আছে।

**সালাত অসংখ্য রোগের চিকিৎসা**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনানুযায়ী কোনো মানুষ নিয়মিত এই স্বর্গীয় ইবাদত তথা সালাত আদায় করলে এর বরকতে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দু:খ-কষ্ট মুছে যায় এবং এ সালাতের মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। কারণ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, সালাত হলো সকল রোগের শিফা বা প্রতিষেধক এবং সফলতার মাধ্যম। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَا نَائِمٌ، اَشْكُوْ مِنْ وَّجْعِ بَطْنِىْ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ أَ فِىْ بَطْنِكَ وَجْعٌ؟ قُلْتُ نَعَم يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شِفَاءً–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি পেটের ব্যথায় অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কি পেটে ব্যথা? আমি আরয করলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, ওঠো, সালাত আদায় করো। কেননা, সালাতে শিফা তথা আরোগ্য রয়েছে।[১০৪]

সালাত যে যাবতীয় আত্মিক ও দৈহিক রোগ-ব্যাধির শিফা ও আরোগ্য লাভের মাধ্যম বর্তমানে তা বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও গবেষণার মাধ্যমেও এর প্রমাণ মিলছে। যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীসমূহ সতত মহিয়ান ও শতভাগ পরম সত্য হওয়ার কারণে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা বিজ্ঞানের সত্যায়ন প্রয়োজন নেই।

**সালাতের সময়সূচি এবং রাকাআত সংখ্যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য**

মানব দেহ জড় পদার্থ নয়, বরং যাবতীয় স্থবির ও জড় দেহের বিপরীত। তাই মানুষকে প্রাকৃতিকভাবেই নড়াচড়া করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নড়াচড়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং ইসলাম ধর্মে সালাত এমন একটি শারীরিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে বারবার সুনয়ন্ত্রিতভাবে নড়াচড়া করার সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী ও সময় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন বিধায় তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা মানুষের কল্যাণ ও সুস্থতার জন্য অনেক বড় নিয়ামত। তাই সময়সূচির প্রতি খেয়াল রেখে প্রতিটি মুসলমানের পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করা অবশ্যই কর্তব্য। সিহাহ সিত্তাহ্সহ প্রত্যেকটি হাদীস গ্রন্থে সালাতের সময়সূচি নিয়ে পৃথকভাবে দীর্ঘ বর্ণনা তথা অধ্যায় স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাও পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّيْنَ– الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِہِمْ سَاهُوْنَ–

অর্থ: অতএব দুর্ভোগ সেসব সালাত আদায়কারীর, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বে-খবর।[১০৫]

নিম্নে সালাতের সময়সূচির সাথে মানব জাতির শারীরিক সুস্থতার সর্ম্পক সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**ফজরের সালাত**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাতের শেষ লগ্নে ফজরের সালাত আদায়ে রনির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ–

অর্থ: অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ করো সন্ধ্যায় (মাগরিবের সালাত আদায়ের মাধ্যম্যে) এবং সকালে (ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে)।[১০৬]

---

১০৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: সালাতসমূহের হিফাযত, খ. ১, পৃ. ৭২, হাদীস নং- ৪২৫

১০৪. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সালাত একটি শিফা , খ. ৪, পৃ. ৯৮, হাদীস নং- ৩৪৫৮

১০৫. আল-কুরআন, ১০৭: ৪-৫

এ সময় মানুষ রাতের আরাম শেষে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। স্বাস্থ্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম হলো, কোনো প্রকার ব্যায়ম করার ক্ষেত্রে প্রথমে খবু ধীরে ধীরে অঙ্গ চালনা করতে হয় এবং পরে আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। দৌড় প্রতিযোগিতায়ও দেখা যায়, প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর আরেকটু জোরে তারপর আরও জোরে অর্থাৎ ধীরে ধীরে দৌড়ের গতিবেগ বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই সতেরো রাকাআত সালাত আদায় করলে তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতো এবং এতে দৈহিক শক্তি লোপ পেতো।

তাছাড়া সারারাত নিদ্রা যাওয়ার পর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় পেট খাদ্যশূন্য থাকে। অপর দিকে দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও রাতভর কর্মহীন নিশ্চল থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় ঘুম থেকে ওঠার পর পরই এগুলোকে হঠাৎ বেশি পরিমাণে নড়াচড়া করলে তা দেহ ও মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ফজরের সালাতকে খুবই সংক্ষিপ্ত করে মাত্র চার রাকাআতে নির্ধারণ করেছেন।

তাই বলা হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফজরের সালাতের মূল উদ্দেশ্য হল দু'টি। যথা:

**(ক)** মানুষকে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে আকৃষ্ট করা। ফজরের সালাতে অযু ও মিসওয়াক না করেই সকালের নাস্তা করলে রাতভর মুখে জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া পেটে প্রবেশ করে। এতে পাকস্থলি ফুলে যাওয়া, নাড়ি-ভুড়ি জ্বালা-পোড়া করা ও আলসারের ন্যায় দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে।

**(খ)** খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হালকা ব্যায়াম করা, যা শরীরের জন্য খুবই উপকারি। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের ওপর ফজরের সালাত ফরয না করলে মানুষ প্রতিদিন এতো ভোরে আবশ্যিকভাবে ঘুম থেকে জাগ্রত হতো না এবং মৃদু ব্যায়মও করতো না। এতে মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত এবং অলস হয়ে যেতো। হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখেছেন, হৃদরোগের সাথে ঘুমের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য হচ্ছে, যেসব লোক হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করে তাদের বেশির ভাগই মারা যায় ভোর ৪টা থেকে সকাল ৭টার মধ্যে। এর মানে কী? তাঁরা বলেন, আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, এটা একটা গোলমেলে সময়, এ সময় মানুষের চোখের পাতায় চলে দ্রুত কম্পন এবং এ সময় ঘুমন্ত মানুষের ধমনীর রক্তচাপে দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধিঘটে, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও ঘটে একই অবস্থা। কাজেই হৃদরোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এই বিপজ্জনক মুর্হূর্তটি থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তাই ইসলাম ধর্মে এ সময় ঘুম থেকে ওঠে সালাতে যোগ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যথাসময়ে জামাআতে ফযরের সালাতে অংশ গ্রহণের জন্য যারা নিয়মিত খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করেন, তাদের মধ্যে অনেক হৃদরোগীই অলক্ষে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়।[১০৭]

**যোহরের সালাত**

মানুষ জীবিকা উপার্জনের জন্য সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে। এসময় ধুলা-বালি, মাটি ও বিভিন্ন জীবাণু শরীরে লেগে যায়। কোনো কোনো সময় বিষাক্ত কেমিক্যাল বাতাসে উড়ে এসে দেহের অনাবৃত অংগ-প্রত্যংগে লাগে। সেসব বিষাক্ত পদার্থ বেশি সময় দেহে লেগে থাকলে তা ভয়ানক ক্ষতির কারণ হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যোহরের সালাত ফরয করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে – اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ

অর্থ: সালাত কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় তথা যোহরের সময়।[১০৮]

সুতরাং যোহরের সময় সালাতের জন্য অযু করলে দেহের ধুলোবালি, যাবতীয় বিষাক্ত পদার্থ ও ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং দেহের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে মনে প্রফুল্ল ভাব তৈরি হয় ও চিন্তা চেতনা আলোকিত হয়। এতে নব উদ্যমে কর্ম সম্পাদন করার জন্য মানুষ এক নতুন ও আনন্দময় জীবন লাভ করে। এছাড়া সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে যখন প্রখর উত্তাপ ক্রমশ কমতে থাকে, তখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়। এ গ্যাস বিষাক্ত হওয়ায় মানব দেহেকুপ্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং এ সময় একাগ্রচিত্তে মহান প্রভুর ইবাদত তথা সালাতে মশগুল

---

১০৬. আল-কুরআন, ৩০: ১৭
১০৭. নুরুল ইসলাম মানিক, "আবেগ ও হৃদরোগ", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
১০৮. আল-কুরআন, ১৭: ৭৮

থাকলে এর নূরানী আলোক রশ্মি তাকে ঐ ভয়ানক ও ক্ষতিকর গ্যাস থেকে রক্ষা করে নিরাপদ রাখে এবং কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনা।

**আসরের সালাত**

ভূ-পৃষ্ঠ স্থির নয়, সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সে চলছেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার এ চলা অব্যাহত থাকবে। আমরা জানি ভূ-পৃষ্ঠ দু'ভাবে পরিভ্রমণ করছে, চক্রাকারে এবং লম্বালম্বিভাবে। সুতরাং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠের চক্রাকার পরিভ্রমণ কমে আসে এবং ক্রমান্বয়ে তা আরো বেশি পরিমাণে কমে যায়। এমনকি আসরের সময় এ পরিভ্রমণ এতোই অল্প হয়ে যায় যে দেহের ইন্দ্রিয়গুলোতে এর প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে এ সময় মানুষ, জীবজন্তু, পশু-পাখি সকলের উদ্যম ও অনুভূতি শক্তি কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। প্রত্যেক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষই টের পায়, আসরের সময় তাদের ক্লান্তি, অস্থিরতা ও অলসতা অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। তাই এ সময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য আসরেরসালাত ফরয করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى–

অর্থ: তোমরা সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) ব্যাপারে।[১০৯]

সুতরাং এ সময় অযু করে আসরের সালাত আদায় করলে যাবতীয় ক্লান্তি ও অলসতা দূর হয়ে যায় এবং মস্তিষ্কে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। শুধু তাই নয়, অযু ও আসরের সালাত আদায়কারী ব্যক্তির অনুভূতিতে এমন এক নতুন শক্তির সঞ্চার হয় যদ্বারা যাবতীয় ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার সাথে সাথে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মন-মস্তিষ্কেও এক প্রবল কর্মস্পৃহা জাগ্রত হয়।

**মাগরিবের সালাত**

মানুষ ২৪ঘন্টার মধ্যে পুরোপুরি বিপরীতমুখী দু'টি সময় অতিবাহিত করে। একটি অংশের নাম দিন এবং অন্য অংশটির নাম রাত। ভোর বেলা ওঠে মানুষ ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে দিনের যাত্রা শুরু করে এবং মাগরিবের সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ রাত্রের যাত্রা শুরু করে। মাগরিব তথা সূর্যাস্তের সময় পৃথীবির বুকে বিভিন্ন পজেটিভ ও নেগেটিভ রশ্মির আদান প্রদান হয় এবংবিভিন্ন অশরীর জ্বিন-ভূতের আনাগোনা বেড়ে যায়। তাই এ সময় আল্লাহ তা'আলার করুণা লাভের নিমিত্ত মাগরিবের সালাত আদায় করা খুবই জরুরী। ইরশাদ হচ্ছে–فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ

অর্থ: অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ করো সন্ধ্যায় (মাগরিবের সালাত আদায়ের মাধ্যম্যে)।[১১০]

কেননা এসময় সালাত আদায়ের মাধ্যমে বৈশ্বয়িক উপকারিতা ও পবিত্র কুরআনের আয়াতের অদৃশ্য রশ্মি মানব শরীরে এমন এক নূরানী পরিবেষ্টন তৈরি করে, যদ্বারা এ সময়ের নেতিবাচক কোনো বিষয় তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং সে এ সকল ক্ষতিকর দিক থেকে সহজেই হিফাযত থাকে।

তাছাড়া মানুষ সাধারণত ফজরের পর থেকে শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত রিযিকের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। অত:পর কাজকর্মে শেষ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-নকরী বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে তার ও তার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় উপকরণাদিও রিযিকের সুব্যবস্থার  করেছেন এর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। শুধু তাই নয়, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি সে সীমাহীন আনন্দিতও হয়। সুতরাং পরিতৃপ্ত অবস্থা নিয়ে সে যখন মাগরিবের সালাত আদায় করত পরিবার-পরিজনের নিকট গমন করে তাদের সাথে হাসি-খুশিভাবে কথাবার্তা বলে, তখন তার অভ্যন্তরীণ আলোক রশ্মিগুলো তাদের ওপর বিচ্ছুরিত হয়এবং এ রশ্মির প্রভাবে সন্তানদের অন্তরে পিতা-মাতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ জন্ম লাভ করে। তারা অজান্তেই পিতা-মাতার সদাভ্যাসগুলোও উত্তমরূপে গ্রহণ করে নেয় এবং তাদের মনে মা-বাবাকে ভালবাসা ও মহব্বতের তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মোটকথা, যারা গুরুত্বের সাথে নিয়মিত মাগরিবের সারাত আদায় করে তাদের সন্তানগণ সৌভাগ্যশীল ও পিতা-মাতার অনুগত হয়ে থাকে। এটা এক ধরনের পরীক্ষিত আমল।

---

১০৯. আল-কুরআন, ২: ২৩৮
১১০. আল-কুরআন, ৩০: ১৭

**এশার সালাত**

মানুষ স্বভাবগত লোভী হওয়ায় দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে এশার সময় খেতে বসলে স্বাদ ও লোভের বশীভূত হয়ে চাহিদার তুলনায় সে বেশি খেয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়লে নানাবিধ ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে এশার সালাত আদায়ের বিধান দিয়েছেন। যাতে খাওয়া ও ঘুমানোর মাঝে কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اَدْبَارَ السُّجُوْدِ– অর্থ: রাত্রির কিছু অংশে (এশা) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং সালাতের পশ্চাতেও।[১১১]

এছাড়া মানুষ সারাদিনের ক্লান্তিকর মস্তিষ্ক নিয়ে খাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়লে সে এক ধরনের অস্থিরতায় ভুগবে এবং আরামে ঘুমাতে পারবে না। বর্তমানে ডাক্তারগণও রাতে ঘুমানোর পূর্বে হালকা ব্যায়ামের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। ইসলাম ধর্মে এশার সালাতের মাধ্যমে যা আদায় হয়ে যায়।

**দৈহিক সুস্থতায় সালাত একটি উত্তম ব্যায়াম**

সালাতকে মুসলমানের ধর্মীয় ইবাদত ও পারলৌকিক আযাব থেকে মুক্তির মাধ্যম মনে করা হলেও সালাতের বাহ্যিক কার্যক্রম ও শারীরিক কসরত বিবেচনা করে বলা যায়, সালাত একটি উত্তম ব্যায়ামও বটে। অলসতা, বিষণ্ণতা ও বে-আমলীর এই যুগ-সন্ধিক্ষণে সালাত এমন এক ব্যায়াম সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করলে এর দ্বারা ইহকালীন সকল ব্যথার উপশম সম্ভব। সালাতের মাধ্যমে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটে, তেমনি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হৃৎপিন্ড, লিভার, কিডনি, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, মেরুদন্ড, ঘাড়, বুক এবংসকল প্রকার গ্লান্ড পুষ্টি ও সুস্থতা লাভের অন্যতম সহায়ক। সালাত দেহকে সুডৌল ও সৌন্দর্যমন্ডিত করে।

শারীরিক ব্যায়ামের ক্ষেত্রে বয়সের সাথে সাথে ব্যায়ামেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। বড়দের ব্যায়াম ছোটদের ব্যায়াম থেকে আলাদা। আবার পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যায়ামের পদ্ধতিও ভিন্ন। কিন্তু সালাত এমন এক সর্বজনগ্রাহ্য ব্যায়াম যা নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ তথা সব বয়স এবং সব ধরণের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এতে কারো কোনো ক্ষতি তো হয়ই না; বরং এর দ্বারা সবাই উপকৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া মানুষের বয়:বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দেহের কোল্যাস্টোল চর্বির দ্বারা দেহের শিরাগুলি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। এই ক্ষীণতার কারণে অসংখ্য রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। যেমন, ব্লাড প্রেসার, অর্ধাঙ্গ, হৃদরোগ, বৃদ্ধতা, হজম মন্দা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চর্বির স্ফীতি রোধ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো ব্যায়াম। যা সালাত আদায়ের মাধ্যমে অতি উত্তমভাবে পুরা হয়ে যায়। এজন্যই লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সালাত আদায়কারী ও শ্রমিক শ্রেণির লোকদের মধ্যে এসকল রোগ-ব্যাধি তুলনামূলক খুবই কম হয়ে থাকে।

সালাতের হিকমতপূর্ণ তারতীবের বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। যখন পেট খালি থাকে তখন সালাতের রাকাআত সংখ্যাও কম থাকে। যেমন, ফজর, আসর ও মাগরিবের সময় সালাতের রাকাআত সংখ্যা কম। কিন্তু খাওয়ার পর যোহর ও ইশার সালাতে রাকাআতের সংখ্যা বেশি। কেননা, খাওয়ার দ্বারা চর্বির বৃদ্ধি ঘটে। রমযান মাসে মাগরিবের পর বেশি খাওয়া হয়, তাই ইশার সময় তারাবীর সালাতের রাকাআতের সংখ্যাও বেশি। এভাবে সালাত রূহানী বরকতের সাথে সাথে একটি সামঞ্জস্যশীল দৈহিক ব্যায়ামও হয়ে যায়।

এ. আর. কমর নামে একজন বিশেষজ্ঞ তার ইউরোপের ডায়রিতে লেখেছেন, একদিন আমি সালাত আদায় করছিলাম। একজন ইংরেজ গভীর মনযোগ দিয়ে আমার সালাত আদায় প্রত্যক্ষ করছিলেন। আমার সালাত আদায় শেষ হলে তিনি বললেন, ব্যায়ামের এ পদ্ধতি নিশ্চয় আপনি আমার পুস্তক থেকে শিখেছেন? কারণ আমিও ব্যায়ামের এরকম পদ্ধতিই আমার বইতে উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি এ পদ্ধতিতে ব্যায়াম করবে, সে কখনো জটিল কোন রোগে আক্রান্ত হবে না। অত:পর তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, দন্ডায়মান ব্যক্তি যদি সরাসরি মাথা নিচু করে ব্যায়ামে গমন করে, তাহলে তার স্নায়ু

---

১১১. আল-কুরআন, ৫০: ৪০, (এছাড়া বিভিন্ন ওয়াক্তের সালাতের বিষয়ে আরো দেখা যেতে পারে- ৭: ২০৫, ৩৮: ১৮, ৫০: ৩৯, ১১: ১১৪, ৩০: ১৭, ২: ২৩৮, ১৭: ৭৮)

ও হৃৎপিন্ডের ওপর এর চাপ পড়ে, যা মানব শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ কারণেই আমি আমার বইতে এরকম ব্যায়াম করতে নিষেধ করেছি। আমি লেখেছি, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতে হবে এবং হাত বাঁধতে হবে (অর্থাৎ সালাতের কিয়াম)। এরপর খানিকটা ঝুঁকে হাত এবং কোমরের ব্যায়ম করতে হবে (অর্থাৎ রুকু)। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ব্যায়াম করতে হবে (অর্থাৎ সিজদা)। এ ব্যায়াম শুধু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই করতে পারবে।

ইংরেজ লোকটির কথা শেষ হওয়ার পর আমি তাকে জানালাম, আমি একজন মুসলমান। ইসলাম আমাকে দৈনিক পাঁচবার  এভাবেই সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। আমি কখনো আপনার পুস্তক দেখেনি এবং পাঠও করিনি। আমার এ কথা শুনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং আমার নিকট তিনি ইসলাম সম্পর্কে আরো নানা তথ্য জানতে চাইলেন।[১১২]

পাকিস্থানী ডাক্তার মাজেদ যামান উসমানী ফিজিওথেরাপীতে উচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য ইউরোপে গিয়ে যখন দেখলেন তাকে ব্যায়াম সম্পর্কে যা শেখানো হল তা পুরোপুরি সালাতের মতো। তখন তিনি অবাক হয়ে বললেন, এ যাবৎ আমি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবেই সালাত আদায় করেছি, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি বিস্ময়কর ব্যাপার। সালাত নামক এ ব্যায়াম দ্বারা যেসকল রোগ নিরাময় হয়, তার একটি তালিকা হলো-

(১) মস্তিষ্কের রোগ, (২) স্নায়ুবিক রোগ, (৩) অস্থিরতা ও অবসাদজনিত রোগ, (৪) মানসিক রোগ, (৫) হৃদরোগ, (৬) আর্থ্রাইটিস রোগ, (৭) ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ, (৮) পাকস্থলী ও আলসার রোগ, (৯) ডায়াবেটিস এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট অন্যান্য রোগ এবং (১০) চক্ষু ও গলার রোগ।[১১৩]

ডাক্তার বার্থম জোশেফ আমেরিকান একজন প্রখ্যাত ডাক্তার। এক সাক্ষাৎকারে সালাত ও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে বলেন, সালাত হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি ব্যায়াম। যা শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধি বা অসমতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যিনি সালাতের এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, তিনি সম্ভবত আধুনিক যুগের যান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনা করেই এ পদ্ধতির বিন্যাস ঘটিয়েছেন। গলা পর্যন্ত হাত তোলা, হাত বাঁধা, নিচের দিকে চোখ রাখা, পুনরায় হাত ছেড়ে দেয়া, ঝুঁকে যাওয়া, আবার মাথা অবনত করে মস্তিষ্কের দিকে রক্ত প্রবাহের সুযোগ সৃষ্টি করা, কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে হাঁটু পেতে বসা এবং ঘাড় ফিরিয়ে দুই দিকে সালাম দেয়া এসব কিছুই একটি পরিপূর্ণ ব্যায়ামের পদ্ধতি।[১১৪]

ইতালীর একজন নও মুসলিম মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার জামাল আব্দুর রহমান সালাতের ব্যায়াম কৌশল বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- ব্যায়ামের মূলনীতি হলো, আপনি যদি কোনো রক্তবাহী ধমনী বা অন্যকোনো বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথা ও কষ্ট দূর করতে চান, তবে প্রথমে শরীরের গ্রন্থিগুলো ঢিলে করে দিন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ান। সালাতে বিভিন্ন রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বৈঠক বা আসন রয়েছে। আমি সালাত নামক ব্যায়ামের নীতিগত পদ্ধতি এবং এর জন্য কিছু আসনও নির্ধারণ করেছি। যেমন মেরুদন্ডের ব্যথা দূর করার জন্য আলাদা উপায়ে বসতে হবে এবং হৃদরোগ থেকে মুক্তির জন্য রয়েছে ভিন্ন আসন। এমনিভাবে মূত্রাশয়ের রোগ নিবারণের জন্য আলাদা উপায় রয়েছে।[১১৫]

**সালত একটি উত্তম ব্যায়ামের চার্ট**

মানুষ রাতভর ঘুমিয়ে থাকার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থবির হয়ে রক্ত জমে যায়। শরীর নিস্তেজ, অবসাদগ্রস্থ ও বিষণ্নহয়ে পড়ে। তখন শরীরের জন্য এমন এক ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়, যদ্বারা রক্ত পূর্ণ শরীরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয় এবং শরীর নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্যতা ফিরে পায়। আর এজন্যই তাহাজ্জুদ ও ফজরের সালাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে ইশরাক ও চাশতের সালাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরপর দীর্ঘ বিরতি। এতক্ষণ কাজকর্ম করতে করতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই যোহরের সালাতের জন্য ব্যায়ামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে আসর, মাগরিব ও ইশার সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, ইশার সালাতে বেশি রাকাআত রাখা হয়েছে,

---

১১২. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭-৫৮
১১৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬
১১৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০
১১৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১

কারণ রাতে মানুষ বেশি পানাহার করে। তাই বেশি রাকাআত সালাত আদায়ের মাধ্যমে খাবারগুলো যেন সহজে হজম হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তিরাতের খাবার খেয়ে কোনো প্রকার নড়াচড়া তথা ব্যায়াম না করেই শুয়ে যায়, তার খাবার সহজে হজম হয় না। ফলে তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

**সালাত একটি উত্তম যোগব্যায়াম**

যোগ ব্যায়ামের বিশেষজ্ঞরা সালাতকে নি:শ্বাসপ্রশিক্ষণের একটি সহজ পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তারা বলেন, যোগ ব্যায়ামে নি:শ্বাস প্রশিক্ষণের যে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, তা এক সাথে কেবল সালাতের মাধ্যমেই আদায় করা সম্ভব। সালাত ছাড়া নিয়মিতভাবে তা আদায় করা বলতে গেলে অসাধ্য। ফরয তথা বাধ্যতামূলক সালাত আদায়ের কারণে এ কঠিন কাজটি শরীরের জন্য খুবই উপকারী। একজন সাধারণ মুসলমানও দৈনিক পাঁচবার তা আদায় করে থাকে, যা একজন যোগ ব্যায়ামকারীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। যে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, তাহলো-

(১) কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখা।

(২) রুকু অবস্থায় পায়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং

(৩) সিজদার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠা-নামাকরা।

**সুস্থতার অন্যতম রক্ষাকবচ সালাত**

মুসলমানদের সুস্থতার ক্ষেত্রে সালাত এক অন্যতম রক্ষাকবচ। পারলৌকিক মুক্তির পাশাপাশি সালাতকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইহলৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতিও বলা যায়। সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম এমন কিছু শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা কোনো রোগীর চিকিৎসা শুরু করার প্রারম্ভে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে সালাতের সেসকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো, যা শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দৈহিক উপকারিতা রয়েছে।

**শরীর পবিত্র হওয়া**

সালাত সহীহ শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো শরীর পবিত্র হওয়া। অপবিত্র শরীর নিয়ে সালাত পড়লে সালাত আদায় হয় না। সুতরাং সমুদয় অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র হওয়া যেমন জরুরী, তেমনি কারো অযুর দরকার হলে অযু বা তায়াম্মুম করতে হবে এবং গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে।[১১৬]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

অর্থ: আর তোমরা অপবিত্র হলে পাক-সাফ হয়ে যাও।[১১৭]

তাই সালাতের জন্য শরীর পবিত্র হওয়া মানে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সকল অপবিত্র বিষয় থেকে নিজেকে হিফাযত রাখা। একজন সালাত আদায়কারী যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দৈনিক পাঁচবার নিজের শরীরকে পবিত্র রাখতে সচেষ্ট থাকে, তখন স্বভাবতই তার শরীর রোগ-ব্যাধি মুক্ত থাকে। কেননা অসুস্থ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো শরীর অপবিত্র বা অপরিষ্কার হওয়া। ইসলাম সালাতের মাধ্যমে একজন নামাযীর শরীরকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বিরাট ভুমিকা রাখে। অপবিত্র শরীর নিয়ে মসজিদে গেলে অন্যান্য মুসল্লির ওপরও এর প্রভাব পড়ে। এতে দুর্গন্ধ, চর্মরোগ, খোস-পাচড়া ছাড়াও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করতে পারে।

**কাপড় পবিত্র হওয়া**

সালাত আদায়ের সময় পরনে যাই থাকুক তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

–وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থ: আর আপনার পোশাক পবিত্র করুন।[১১৮] সুতরাং মানব জীবনে পোশাক এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টাই মানুষের শরীরের সাথে কোনো না কোনোভাবে লেগে থাকে। তাই শরীর সুস্থ থাকা

১১৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৯ (অষ্টম সংস্করণ), পৃ. ২৩২

১১৭. আল-কুরআন, ৫: ৬

বা অসুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে কাপড়-চোপড়েরও বিরাট প্রভাব রয়েছে। অপবিত্র এবং অপরিষ্কার কাপড়ে অসংখ্য রোগ-জীবাণু শরীরের লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করে মানুষকে অতিসহজে রোগাক্রান্ত করে তোলে। বাস্তবেও দেখা যায়, পোশাক-পরিচ্ছদ অপবিত্র, অপরিষ্কারও নোংরা হলে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ায় সব মানুষ তাকে অপছন্দ করে। এমনকি অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে নিজের কাছেও অস্বস্তি লাগে। এভাবে দীর্ঘদিন হীনমন্যতায় ভুগতে থাকলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া মানুষ সামাজিক জীব হওয়ায় অন্য মানুষের সাথে মিলে মিশে তাকে বসবাস করতে হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটা তাদের ওপর ফরয করিনি।[১১৯] সুতরাং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন-যাপন করা ইসলাম মোটেও পছন্দ করে না। এই সংঘবদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলাম জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। শুধু নির্দেশ নয়; বরং কোনো কোনো হাদীসে এমন কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে যে বিনা ওজরে জামাআত ছাড়া সালাত পড়লে তা আদায়ই হবে না। সুতরাং একজন মুসলমান যখন দৈনিক পাঁচবার সবার সাথে একত্র হয়ে জামাআতে সালাত আদায় করবে, তখন সামাজিকতা রক্ষার্থে হলেও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা উচিত। কেউ যদি অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র কাপড় পরিধান করে দৈনিক পাঁচবার মসজিদে গিয়ে জামাআতে সালাত আদায় করে, তাহলে তার উভয় পাশে দন্ডায়মান মুসল্লি এবং অন্যান্য মুসল্লিগণও অসুস্থ হয়ে পড়বে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বরং সালাতের মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে সুস্থভাবে সমাজে জীবন-যাপন লাভ করার শিক্ষা দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

অর্থ: হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করো।[১২০]

**জায়গা পবিত্র হওয়া**

সালাত একটি পরিপূর্ণ আমল এবং স্রষ্টার সাথে বান্দার সরাসরি কথা বলার মাধ্যম। তাই যে স্থানে এমন একটি উত্তম আমল আদায় করা হবে তা অবশ্যই পুত:পবিত্র ও রোগ-জীবাণু মুক্ত হওয়া উচিত। জেনে শুনে নাপাক স্থানে অবস্থান করা ইসলাম কোনোক্রমেই অনুমোদন প্রদান করে না। অপবিত্র বা নাপাক স্থানে অসংখ্য সংক্রামক রোগের জীবাণু থাকে। নামাযী যখন অপবিত্র স্থানে দাঁড়াবে তখন পায়ের মাধ্যমে এবং সিজদার সময় নাক, হাত, চোখ এবং কপালের মাধ্যমে সেসব জীবাণু অতি সহজেই শরীরে প্রবেশ করে নামাযীকে অসুস্থ করে তুলবে।

**তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলা**

সালাতের অন্যতম শর্ত হলো, দুই হাত উভয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করা। যাকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়। বাহ্যিকভাবে এ বিষয়টি শারীরিক সুস্থতার সাথে কোনো সম্পৃক্ততা আছে বলে মনে না হলেও এতে মানব দেহ সুস্থ রাখার অনেক উপাদান রয়েছে। মানব মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। আর এ বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলেই আমাদের মন ও চিন্তা-চেতনায় প্রাথমিক ছবি অঙ্কিত হয়ে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবে রূপ লাভ করে। সুতরাং সালাত আদায়কারী যখন তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত উঠিয়ে মাথার দুই পাশে কানের কাছে নিয়ে যায়, তখন এক প্রকার বিদ্যুৎ প্রবাহ মস্তিষ্কের ভেতর চলে গিয়ে মস্তিষ্ক কোষকে আরো বেশি বিদ্যুতায়িত করে। আর মস্তিষ্ক কোষ বিদ্যুতায়িত হলে মস্তিষ্কের ভেতর আলোর চমক দেখা দেয়। অত:পর কানের কাছ থেকে হাত যখন নাভির পাশে নেয়া হয়, তখন হাতের কন্ডেনসার (condenser) থেকে নাভিতে বিদ্যুৎ জমা হয়। তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর সুবহানাকা আল্লাহুম্মা পাঠ করলে রূহ তার পূর্ণ যোগ্যতার সাথে আল্লাহর গুণাবলীতে অভিষিক্ত হয়ে সমগ্র দেহে আলো ছড়িয়ে দেয় এবং দেহের প্রতিটি কোষ নতুনভাবে সজীব হয়ে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে।

**কিয়াম বা দন্ডায়মান হওয়া**

কিয়াম বা দন্ডায়মান হচ্ছে সালাতের অন্যতম রুকন বা শর্ত। একজন সুস্থ ব্যক্তি বসে সালাত পড়লে তা আদায় হয় না। সুতরাং নিয়ত করার পর একজন সালাত আদায়কারী যখন দাঁড়িয়ে সালাত পড়া শুরু করে, তখন তার শরীর সম্পূর্ণরূপে

---

১১৮. আল-কুরআন, ৭৪: ০৪
১১৯. আল-কুরআন, ৫৭: ২৭
১২০. আল-কুরআন, ৭: ৩১

শান্ত ও স্থির হয়ে যায় এবং দেহে বিভিন্ন রকমের প্রভাব পড়ে। যেমন- কিয়ামের মাধ্যমে মানব দেহের মেরুদন্ড শক্তিশালী হয়। কারণ এমতাবস্থায় মস্তিষ্ক থেকে একটি আলো এসে মেরুদন্ডের হাড়কে আলোকিত করে এবং তা দেহের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগে পৌঁছে দেয়, যা মানব দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই সহায়ক। আর মেরুদন্ডের সুস্থতা ও শক্তির ওপর যে ভালো স্বাস্থ্য নির্ভর করে তা অনস্বীকার্য। কিয়ামের সময় মানুষ যে অবস্থায় থাকে কেউ যদি প্রতিদিন ৪৫ মিনিট এরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তবে মস্তিষ্ক ও শিরা-উপশিরায় এক প্রকার শক্তির সৃষ্টি হয়, যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।সালাতে কিয়ামের মাধ্যমে হাত-পায়ের জোড়া ও কোমর শক্তিশালী হয় এবং গেঁটে বাত দূর হয়। তবে শর্ত হচ্ছে, সালাতের সময় কিয়াম হতে হবে অত্যন্ত স্থির, সঠিকভাবে এবং সটান অবস্থায়।

**পা স্বাভাবিকভাবে ফাঁকা রাখা**

সালাতের মধ্যে যেভাবে দু' পা ফাঁক করে দাঁড়াতে শরীয়তে নির্দেশ রয়েছে, সালাত আদায়কারী তার চেয়ে কম পরিমাণে পা ফাঁক করে দাঁড়ালে শারীরিক দিক দিয়ে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সালাতে দাঁড়ানোর স্বাভাবিক নিয়ম হলো, উভয় পা ৪ইঞ্চি থেকে ৮ইঞ্চি ফাঁকা রাখা। তবে অধিক স্বাস্থ্যবান হলে প্রয়োজন অনুযায়ী দাঁড়াবে। সুতরাং পা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সংকীর্ণ করে রাখলে শিরা ও মাংস পেশীর ওপর এর প্রভাব পড়ে, বিশেষ করে অণ্ডকোষের ওপর। এতে প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে সালাতে নির্দেশিত পরিমাণের চেয়ে পা অধিক পরিমাণে প্রসারিত করে দাঁড়ালেও অন্ডকোষের ক্ষতি হয়। এতে শরীরের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এই ধরণের লোকের চালচলন নড়বড়ে এবং দেহ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। পায়ের জোড়ার উপরও এর প্রভাব পড়ে। ফলে পায়ের গোঁড়ালী ও পৃষ্ঠে চাপ বেড়ে যায়।

**ডান হাতের উপর বাম হাত রাখা**

ইসলাম যাবতীয় ভাল কাজে ডান হাত ব্যবহারের জোর তাগিদ দিয়েছে। কেননা ডান হাতে বরকত রয়েছে। বস্তুত মানব দেহে যতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তন্মধ্যে ডান দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বাম দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে একটু পৃথক বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। বিশেষ করে ডান হাত থেকে এক প্রকার অদৃশ্য আলোক রশ্মি নির্গত হয়, যা ইতিবাচক (positive) হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বাম হাত থেকে যে রশ্মি নির্গত হয়, তা নেতিবাচক (negetive) হয়ে থাকে। সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখতে হয়। আর দৃষ্টি বাম হাতের উপর স্থাপিত ডান হাতের উপর দিয়ে সিজদার স্থানে পতিত হলে উক্ত দৃষ্টি ইতিবাচক তরঙ্গমালা অতিক্রম করে, যা চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাই ডান হাতকে বাম হাতের উপরে বাঁধার বিধান দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আরো একটি উপকারিতা হলো, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলে ডান হাত থেকে এক প্রকার শক্তি উৎপন্ন হয়। ফলে দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করতে মানুষের ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোনো কোনো চিকিৎসক হাতের প্যারালাইসিস রোগীদেকে পরামর্শ দেন, তারা যেন বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকে। এতে এক হাত থেকে নির্গত অদৃশ্য আলোক রশ্মিগুলো অপর হাতে স্থানান্তরিত হয়ে হাত নড়াচড়া করার শক্তি সঞ্চয়ে সহায়তা করে।

**পুরুষের নাভির নিচে হাত বাঁধা**

সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যখন নাভী বা এর নিচে হাত বাঁধে, তখন উভয় হাত থেকে এক প্রকার আলোক রশ্মি নির্গত হয়, যা ইতিবাচক ও নেতিবাচক হয়ে থাকে। তারপর এ আলোক রশ্মি একটি অপরটির সাথে মিশ্রিত হয়ে এমন এক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যা নাভীর মাধ্যমে উদরস্থ প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে হৃদপিন্ডকে প্রবল শক্তিশালী করে তোলে। এতে যৌনশক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

**মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধা**

শরীয়তের বিধান হলো, মহিলারা সালাতে সময় বুকের উপর হাত রাখবে। মহিলারা যখন নিয়্যত করে বুকের উপর হাত বাঁধে, তখন এক প্রকার বিশুদ্ধ উত্তাপ তার দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়ে মাংসগ্রন্থিতে বাড়তি শক্তি সঞ্চার করে। এতে মহিলাদের স্তন পুষ্টি লাভ করে। দৈনিক পাঁচবার সালাতে বুকের উপর হাত রাখার ফলে দুগ্ধদানকারী মায়ের দুধেও বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। সালাত আদায়কারী মায়ের বুকের দুধ পান করার কারণে বাচ্চাদের মধ্যে নূর সঞ্চিত হয়। এতে তাদের অভ্যন্তরে এমন একটি চিত্র অংকিত হয়, যদ্দারা শিশুর ধ্যান-ধারণাও নূরানী হতে থাকে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, মহিলারা সালাতে বুকের উপর হাত বেঁধে আল্লাহ তা'আলার দিকে গভীর মনোযোগী হলে তাদের এক প্রকার বিশেষ ধরনের আলোক রশ্মির সৃষ্টি হয়। ডা. ড্রাউনের মতে, সেই রশ্মি হালকা নীল বা সাদা হয়ে থাকে। এসব

আলোক রশ্মি (নূর) দেহাভ্যন্তরে আসা-যাওয়ার কারণে সালাত আদায়কারীর দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সে কখনো দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় না।

**কিরাআত পড়া**

সালাতের মধ্যে অন্যতম একটি রুকন বা শর্ত হলো কুরআন তিলাওয়াত করা। যা ব্যতীত সালাতই সহীহ হয় না। হাদীসে পুরুষ মুসলমানগণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। সে হিসেবে জামাআতে সালাত আদায় করার বদৌলতে ইমামের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও মুক্তাদীগণ ধ্যান সহকারে শ্রবণ করার ফলে উভয়ের মাঝে এক বিশেষ প্রকারের তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত তরঙ্গ উভয়ের মাঝে আলোকোজ্জ্বল রশ্মি ছড়াতে থাকে। এক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের এই অদৃশ্য তরঙ্গ অধিক শক্তিশালী ও মজবুত হলে সেটি মুক্তাদীদের মাঝে প্রতিফলিত হয়। আর মুক্তাদির তরঙ্গশক্তি প্রবল হলে সেটি ইমাম সাহেবের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এভাবে কোনো সময় ইমামের তিলাওয়াতের নূর এবং কোনো সময় মুক্তাদির ধ্যান সহকারে শ্রবণের নূর একে অন্যের মাঝে বিনিময় হওয়া শারীরিক সুস্থতার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই পবিত্র কুরআনকে শিফা বা আরোগ্য ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

অর্থ: আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শিফা ও রহমত স্বরূপ।[১২১]

হাদীসে এসেছে– عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَ الْقُرْاٰنِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা শিফাদানকারী দু'টি বস্তুকে নিজেদের জন্য অবশ্যই গ্রহণ করবে। একটি মধু এবং অপরটি কুরআন।[১২২]

প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক চিকিৎসক লিড বিটার বলেন- প্রতিটি শব্দ একটি ইউনিট। এ ইউনিট থেকে একটি তীব্র আলোক রশ্মি নির্গত হয়। সেই আলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার কালাম পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দই ইতিবাচক হওয়ায় মুক্তাদির ওপর সেই শব্দের প্রভাব পড়লে তাদের রোগ দূর হয়ে যায়। এছাড়া রক্তের লোহিত কণিকা এক প্রকার অদৃশ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে ভাংতে থাকে। এ ভাংগন বৃদ্ধি পেলে এক পর্যায়ে ব্লাড ক্যান্সারের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আর সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের তরঙ্গ এই রোগ থেকে নিরাপদ রাখে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ব্যাধিসমূহ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এসকল রোগ থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইতিবাচক রশ্মিসমূহ নিজের ভেতর স্থানান্তর করা। সাইকোলোজিকেল ডিজিজ বা মানসিক রোগসমূহও বর্তমানে প্রাণঘাতী হিসেবে রূপ ধারণ করেছে। তাই ডিপ্রেশন, এ্যাংজাইটি তথা অবসাদ এবং অস্থিরতার মতো এ ধরণের রোগ-ব্যাধি সালাতেরমাধ্যমে ভালো হয়ে যায়।[১২৩] হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَّقْرَاَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَا تَيَسَّرَ–

অর্থ:আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আল-কুরআনের সহজপাঠ্য কোনো অংশ পাঠ করি।[১২৪]

**রুকু করা**

মানব শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে সালাতে রুকু আদায় করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অন্যতম ব্যবস্থাপত্র। একজন মুসলমান ইচ্ছা করলে সঠিকভাবে রুকু আদায়ের মাধ্যমেই নিজের শরীরের সুস্থতা বজায় রাখতে পারে। কারণ ঝুঁকে রুকু করার সময় উভয় হাত হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতে হয়, যাতে কোমর সম্পূর্ণরূপে সোজা থাকে এবং হাঁটুও ঝুঁকে না যায়। এতে পাকস্থলী শক্তিশালী হয়, ডাইজেস্ট বা হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্ত্র রোগ, পেটে ভাঁজ পড়া, পেট ব্যথা ইত্যাদি রোগ আরোগ্য হয়। এছাড়া রুকুর মাধ্যমে কিডনি এবং হৃৎপিন্ড শক্তিশালী হয়, কোমড় ও পেটে চর্বি জমতে

---

১২১. আল-কুরআন, ১৭: ৮২

১২২. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধু, খ. ৪, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ৩৪৫২

১২৩. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬

১২৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: কোনো ব্যক্তি সালাতে কিরাআত পাঠ ত্যাগ করলে, খ. ১, পৃ. ১২৬, হাদীস নং- ৮১৮

পারে না,দেহে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। রুকুর সময় হৃৎপিন্ড ও মস্তিষ্ক যেহেতু এক বিন্দুতে চলে আসে, তাই হৃৎপিন্ড সহজেই মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়। ফলেমাথা ঠান্ডা ও হৃৎপিন্ড শান্ত থাকে এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রুকু করার সময় হাত নিচের দিকে থাকার কারণে কাঁধ থেকে শুরু করে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো অংশের ব্যায়াম হয়ে যায়, এতে বাহুমূল শক্তিশালী হয়। বার্ধক্যের কারণে দেহে যেসব দূষিত বাড়তি উপাদান জমা হয়, রুকুর কারণে জোড়াসমূহের জমাটবদ্ধ সেসব দূষিত পদার্থ অনায়েসে বের হয়ে যায়।

তাছাড়া, যথাযথ রুকুর মাধ্যমে স্পাইনাল কর্ডের কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। হাত-পা প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া রোগীরা যথাযথ রুকুর মাধ্যমে এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। সালাতে সটান হয়ে দাঁড়ানো এবং রুকুর মাধ্যমে গিরা ও কোমর ব্যথার রোগী খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। রুকুর মাধ্যমে পিত্ত পাথরি রোগ ভালো হয় এবং মস্তিষ্কে ও চোখে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।[১২৫]

সালাতে রুকু করার বিষয়ে পবিত্র কুআনে ইরশাদ হচ্ছে–وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ
অর্থ: আর তোমরা সালাক কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।[১২৬]

**সিজদা করা**

সিজদা হলে ামানুষের সবচেয়ে মূল্যবান অংগ তথা কপাল ঠুকে আল্লাহর কুদরতি পায়ে আরাধনা করার নাম। যা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে একজন মুসলমান সিজদার মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিজেকে বিনীতভাবে উপস্থাপন করার সর্বোত্তম মাধ্যম। সালাত আদায়কারী সিজদায় গমন করলে তার মাথার শিরা-উপশিরাগুলোতে রক্ত চলাচল এতো পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে দেহের অন্য কোনো অবস্থায়ই তাতে এতো বেশি রক্ত প্রবাহিত হয় না। অধিক রক্ত চলাচলের কারণে চোখের দৃষ্টিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতাও অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এছাড়া বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতি ১লক্ষ ৮৬হাজার ২৮২মাইল এবং এ আলো পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে ৮বার আবর্তিত হয়। সালাত আদায়কারী সিজদাবস্থায় যমীনে মাথা রাখার সাথে সাথে মস্তিষ্কের ভেতরে যে রশ্মি রয়েছে তা যমীনের সাথে মিশে গিয়ে মস্তিষ্কের গতিবেগ আলোর গতিবেগে পরিণত হয়। এসময় মস্তিষ্কের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা যমীন শোষণ করে নেয়। এতে সালাত আদায়কারী নিজের অজান্তেই চিন্তার প্রচন্ড চাপ (ফোর্স অব গ্রাভিটি) থেকে মুক্তি লাভ করে। উপরন্তু সিজদার মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের একক স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলার সাথেও বান্দার সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন হয়। রূহানী শক্তি এ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে তার সম্মুখ থেকে যাবতীয় পর্দা সরে গিয়ে অদৃশ্য জগতের চিত্র উদ্ভাসিত হতে থাকে। সালাত আদায়কারী যখন শূন্য ও বাতাস থেকে আলোক রশ্মি নিয়ে মাথা, নাক, হাঁটু, হাত ও পায়ের বিশটি আঙ্গুল যমীনে বিছিয়ে সিজদায় যায়, তখন শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা রক্ত কণিকা এসকল অংগে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হওয়ায় অধিক শক্তিশালী ও লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। উভয় সিজদার মাঝে বসার কারণে গিট ও পায়ের নলা মজবুত হয় এবংবংশ বিস্তারে পুরুষাঙ্গে বিশেষ শক্তি অর্জন হওয়ায় পুরুষত্বের দূর্বলতা দূর হয়। সিজদা করার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ অর্থ: তোমরা আল্লাহকে সিজদাহ করো।[১২৭]

নম্রতা ও একাগ্রচিত্তে দীর্ঘসময় সিজদা করা মস্তিষ্কের রোগ-ব্যাধি আরোগ্য লাভে একটি উন্নত মানের চিকিৎসা। সিজদার সময় যে পরিমাণ রক্ত মস্তিষ্কে সরবরাহ হয়, সে পরিমাণ রক্ত আর কোনো অবস্থায়ই সরবরাহ হয় না। মস্তিষ্কে বেশি পরিমাণে রক্ত সরবরাহের কারণে মস্তিষ্কের দূষিত পদার্থসমূহ বের হয়ে যাওয়ায় তা সুস্থ থাকে এবং মস্তিষ্ক নিজের প্রয়োজনীয় অংশ রক্ত থেকে গ্রহণ করে অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ হৃৎপিন্ডকে দিয়ে দেয়, যা প্রশ্রাবের আকারে বের হয়ে যায়। এছাড়া যে সকল মানুষের পাকস্থলী জ্বালাপোড়া করে এবং জখম হয়ে যায়, সঠিকভাবে সিজদা করার মাধ্যমে তাও নিরসন ঘটে। কেনান সিজদার সময় কপাল যমীনে রাখলে মস্তিষ্কের তরঙ্গ যমীনের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎগতির সাথে সরাসরি মিলিত হয়ে মস্তিষ্কের কার্যকরিতা অনেক বেশি শক্তিশালী করে তোলে। এ অবস্থায় মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায় এবং এই প্রশান্ত মস্তিষ্ক পাকস্থলীকে অধিক পরিমাণে এসিড সৃষ্টি করতে বাঁধা প্রদান করায় পাকস্থলীর ক্ষত ভালো হয়ে যায়।

---

১২৫. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮
১২৬. আল-কুরআন, ২: ৪৩
১২৭. আল-কুরআন, ৪১: ৩৭

উল্লেখ, মানুষের শরীরের বৃত্তের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষের হৃৎপিন্ডে এমন একটি পাম্প আছে যা কখনো নিজের মধ্যে রক্ত টেনে নেয়, আবার কখনো সমগ্র দেহে ছড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ, এটা হতে সারা দেহে তাজা রক্ত আসা যাওয়া করে। মানুষ বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে তুলনামূলকভাবে শরীরের নিম্নভাগে রক্তের চাপ থাকে। যেমন: তিন তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং-এর নিচ তলায় স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বসানো হলে পাম্পটি নিচ তলায় অতিদ্রুত পানি পৌঁছাবে, দ্বিতীয় তলায়তুলনামূলক দেরিতে পানি পৌঁছাবে। কিন্তু তৃতীয় তলায় মোটেও পানি পৌঁছাবে না। অথচ ঐ পাম্পটিই নিচের তলায় পূর্ণরূপে পানি সরবরাহ করছে। এর কারণ হলো, পানি থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনানুযায়ী সর্বস্থানে পানি পৌঁছানোর মত শক্তি তার নেই। এই উদাহরণটি সামনে রেখে বলা যায়, মানুষের হৃৎপিন্ড সর্বদা রক্ত সরবরাহ করে এবং এই রক্ত নিম্নভাগের অঙ্গসমূহে সহজেই পৌঁছে যায়, কিন্তু দেহের উপরিভাগে ঠিকমত পৌঁছে না। যখন এমন কোনো পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে, যার মাধ্যমে মাথা নিচের দিকে চলে যায় এবং হৃৎপিন্ড উপরের দিকে ওঠে যায়, তখন রক্ত পরিপূর্ণভাবে মাথার মধ্যে পৌঁছে যায়।

মানুষ সিজদায় গেলে তার চেহারা রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সে নিজেই অনুভব করে। সিজদা কিছুটা লম্বা হলে মনে হয় রক্ত চেহারার চিকন রগসমূহেও পরিপূর্ণ রূপে পৌঁছে গেছে। সাধারণত মানুষ বসা, দাঁড়ানো এবং শোয়া অবস্থায় থাকে। এই তিন অবস্থায়ই মানুষের হৃৎপিন্ড নিচে এবং মাথা উপরের দিকে থাকে। একমাত্র সিজদাবস্থায়ই মাথা নিচের দিকে ও হৃৎপিন্ড উপরের দিকে থাকে। এতে প্রতিটি পেশী, শিরা ও ধমনীতে ঠিক মতো রক্ত পৌঁছে যায়। এতে সালাত আদায়কারী ব্যক্তির চেহারা সর্বদা উজ্জ্বল ও নূরানী থাকে।

**রুকু ও সিজদায় উভয় হাত সোজা রাখা**

পুরুষের জন্য সিজদা ও রুকুর সময় উভয় হাত সোজা রাখার বিধান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সারাদিন আমরা দু'হাত সোজা করে রাখতে পারি না। কাজের কারণে বা অলসতার কারণেই হোক আমাদের হাতগুলো ভাঁজ করে ও বাঁকা অবস্থায় ঢিলা-ঢালাভাবে রাখি। এতে হাতের স্বাভাবিক কর্ম ক্ষমতা ও শক্তি কমে যায়। সুতরাং রুকু ও সিজদায় হাত সোজা রাখলে হাত, আঙ্গুল ও জোড়াসমূহের জন্য এটি এক প্রকার ব্যায়ামে পরিগণিত হয়। এতে হাত নানা রকম ব্যাধি থেকে মুক্তি পায় এবং হাতের স্বাভাবিক শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে।

**মহিলাদের ভিন্ন রকম সিজদা**

সালাতে পুরুষ ও মহিলার সিজদার মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মহিলাদের জন্য শরীয়াতের নির্দেশনা হলো, তারা যেন সিজদায় হাতের কনুই পুরুষের ন্যায় ছড়িয়ে না রেখে শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখে। কারণ মহিলারা শরীরের সাথে কনুই মিশিয়ে রাখলে স্নায়ু, দুধ সৃষ্টিকারী মাংসপেশী, বক্ষ ও মেয়েলী সৌন্দর্যের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। এমনিভাবে মহিলারা সিজদা অবস্থায় উরুদ্বয়কেও শরীর থেকে পৃথক করবে না। কারণ এভাবে সিজদা করলে অগণিত মেয়েলী রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। জনৈক স্কিন ডাক্তার বলেন, সাধারণত সব মেয়েরাই চায় তার চেহেরা যেন মসৃণ ও লাবণ্যময় হোক। কিন্তু তারা যদি জানতো, সালাতে লম্বা সিজদা করার কারণে চেহারা কী পরিমাণ মসৃণ, লাবণ্যময় এবং তাতে নূর দেখা দেয়, তাহলে মহিলারা সিজদা থেকে মাথাই ওঠাতে না।[১২৮]

**সালাম ফিরানো**

সালাত শেষ করার নিমিত্ত সালাত আদায়কারীকে সালাম ফেরানোর জন্য ডান ও বাম দিকে মাথা ঘুরাতে হয় এবং এক ওয়াক্তের সালাতে বেশ কয়েকবার এ রকম করতে হয়। দুই দিকে ঘাড় ফেরানোর কারণে ঘাড়ের ত্বক শক্তিশালী হয়, ঘাড় ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং বুকের উপরের অংশ মজবুত হয়। এমনকি এভাবে প্রতিদিন নিয়মিত সালামে মাথা ও ঘাড় ফেরানোর কারণে সালাত আদায়কারী হৃদরোগ এবং অভ্যন্তরীণ অনেক রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে।

**ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সালাত আদায় করা**

সালাতের ওয়াজিবসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা একটি অন্যতম জরুরী বিষয়। যদি সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তারতীব পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে দৈহিক ও মানসিক উপকার লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কেননা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সালাতের মাধ্যমে ব্যায়ামের বিষয়টি একটি বিশেষ পদ্ধতি ও পর্যায়ক্রমিকতার সাথে হয়ে থাকে। তাই এ পর্যায়ক্রম রক্ষা করা আবশ্যক। কেউ যদি কিয়াম না করে প্রথমেই সিজদায় চলে যায় অথবা সিজদার পূর্বেই বৈঠক করে নেয়, তাহলে ঐ সকল প্রয়োজনীয় বিষয় যা একজন মানুষের সুস্থতার জন্য একান্ত প্রয়োজন, তা থেকে সে বঞ্চিত হবে। শুধু তাই নয়, এ রকম ধারাবাহিকতা রক্ষা না করার কারণে উল্টো আরো নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

---

১২৮. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯

## সালাত আদায়ে আরো কিছু শারীরিক উপকারিতা

### নিয়মিত সালাত আদায়ে ভুড়ি কমে

সালাতে রুকুর পর সোজাভাবে দাঁড়িয়ে তারপর সিজদায় যেতে হয়। আর সিজদায় যাওয়ার সময় সর্বপ্রথম মাটিতে হাত রাখতে হয়। এটি মেরুদন্ডকে শক্তিশালী ও মজবুত করে তুলে। মহিলাদের ভেতরগত শিরায় শক্তির যোগান দেয়। রুকু থেকে ওঠে সাথে সাথে সিজদায় গেলে দেহের ভেতরগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য একটি ব্যায়ম হয়ে যায়। সিজদার অবস্থাটিও একটি উত্তম ব্যায়াম যা উরুর অতিরিক্ত মাংসপিন্ড কমিয়ে দেয় এবং জোড়াসমূহ খুলে দেয়। শরীরের চর্বি কমে যাওয়া শুরু করলে ভুড়িও কমতে থাকে এবং দেহ সুগঠিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়। তাই কোনো ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সুন্নাত অনুযায়ী ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করলেসে কখনো মোটিয়ে যাবে না। এরপরও যদি কিছু ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ে তাও নিয়ন্ত্রনে চলে আসে।

### সালাত চেহারা কুচকে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ দেয়

মেরুদন্ড ও হাড়ের শিরাগুলো বৈদ্যুতিক তারের মত, যার মাধ্যমে পূর্ণ দেহে জীবন ফিরে আসে। সিজদার সময় রক্তের গতি দেহের উপরিভাগে ধাবিত হওয়ায় চোখ, দাঁত ও সম্পূর্ণ চেহারায় আর্দ্রতা ফিরে আসে ও সতেজ হয়ে ওঠে, গালের কুঞ্চন দূর হয়, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সংযোজন ঘটে, মানুষের দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়, অধিক বয়স পর্যন্ত বার্ধক্য পরিলক্ষিত হয় না এবং শতবছর প্রাপ্ত ব্যক্তিও ঠিক মত চলাফেরা করতে পারে। শুধু তাই নয়, তার মাঝে এক প্রকার বজ্রস্রোত চলতে থাকে, যা শিরা উপশিরায় শক্তির যোগান দেয়। সঠিকভাবে সিজদা করার মাধ্যমে সর্দি, কাশি, কানে কম শোনা ও মাথা ব্যথা ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই দেখা যায়, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না তার চেহারায় এক প্রকার মলিনতা ছেয়ে যায়।

### বক্ষ ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ

দুই পাশে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে সালাত শেষ  করার দ্বারা ঘাড়ের রগ ও পেশীর শক্তি অর্জিত হয় এবং রগ ও পেশীর সাথে সম্পৃক্ত রোগ দেখা দেয় না। শুধু তাই নয়, এর ফলে মানুষউৎফুল্ল ও বলিষ্ঠ থাকে। বুক ও হাসিলীর (গলার নিচের হাড়) শিথিলতা দূর হয়ে যায়। সিনা চওড়া ও বড় হয়। সালাত নামক এই মহান ইবাদতটি তাড়াহুড়া না করে আমরা যখন সবকয়টি আদব ঠিক রেখে একাগ্রচিত্তে ও খুশু-খুযুর সাথে আদায় করবো, তখনই ঐ সকল উপকার লাভ করা সম্ভব হবে।

সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান গ্রন্থে উল্লেখ আছে, পাকিস্তানের একজন হৃদরোগী তার হৃদরোগের নানা রকম চিকিৎসা নিতে নিতে এক পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ায় যান। সেখানে হার্ট স্পেশালিস্ট তাকে পরীক্ষা করার পর কিছু ওষুধ দেন এবং ব্যায়ম করার পরামর্শ দেন। ব্যায়ামের ব্যাপারে ডাক্তার বলেন, আপনাকে আমার ফিজিও ওয়ার্ডে আমার তত্ত্বাবধানে ৮দিন ব্যায়াম করতে হবে। রোগী ব্যায়ম অনুশীলন করে দেখলেন, সে ব্যায়ম সম্পূর্ণ সালাতের মতো। রোগী সঠিক নিয়মেই ব্যায়াম অনুশীলন করছিলেন। ডাক্তার এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বললেন, আপনি কিভাবে এই কঠিন ব্যায়াম এতো তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করলেন? আমার অন্য রোগীদের তো এ ব্যায়াম অনুশীলনে কমপক্ষে ৮দিন সময় লেগে যায়। রোগী জানালেন, আমি একজন মুসলমান, আপনার শেখানো ব্যায়াম তো সম্পূর্ণই সালাতের মতোই। এ কারণেই এ ব্যায়াম অনুশীলনে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। অত:পর ডাক্তার পরদিনই তাকে কিছু ওষুধ এবং কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় করে দিলেন।[১২৯]

### সালাত একটি পূর্ণ মোরাকাবা

মোরাকাবাকে বর্তমানে পাশ্চাত্য জগৎ মেডিটেশন বা ধ্যান নামে অভিহিত করে। সেখানে প্রায় প্রতিটি মহল্লায় মেডিটেশন ক্লাব রয়েছে। সেখানে নারী-পুরুষকে একত্রে বসিয়ে দিয়ে বলা হয়, তারা যেন নিজ নিজ নাকের ডগায় অত:পর নাভীর দিকে মনোনিবেশ করে এবং অন্য সব কিছু ভুলে যায়। আগত লোকগণ আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা এভাবে বসে থাকে এবং চলে যাওয়ার সময় কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে যায়। তারা সেখানেকিছুটা প্রশান্তি অনুভব করার কারণে কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে। অমুসলিমরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পথেই ফিরে

---

১২৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮০-৮১

আসছে। সুতরাং সালাত যে তাকবীরে তাহরীমা থেকে নিয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত একটি পূর্ণ মোরাকাবা বা মেডিটেশন এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলাইরশাদ করেন–اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থ: জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণে (যিকিরে) অন্তরের প্রশান্তি অর্জন হয়।[১৩০]

**প্রশান্তি লাভ ও মানসিক চিকিৎসায়তাহাজ্জুদ সালাত**

টানা ঘুমোতে গিয়ে শেষ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে আমরা অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আসলে এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই; বরং এটি মানসিক প্রশান্তি লাভ ও আত্মিক চিকিৎসায় অত্যন্ত উপকারি। শারীরিক সুস্থতার জন্য একটানা ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, তা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভুল। রাতের প্রথম অংশে ৪/৫ ঘণ্টা ঘুমানো আর রাতের শেষ অংশ থেকে দুপুর পর্যন্ত ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো একই কথা। ঘুম নির্ভর করে গুণগত মানের ওপর, পরিমাণের ওপর নয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর রজার ইকার্চ ১৬ বছর গবেষণা করে এ নিয়ে "At Day's Close: Night in Times Past" নামে একটি চমৎকার বই লেখেন। তাঁর মতে, অতীতের মানুষেরা সন্ধ্যার পর অর্থাৎ সূর্যাস্তের দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই শুয়ে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা ঘুমাত। তারপর ঘুম থেকে ওঠে ১ থেকে ২ ঘণ্টা ধর্মীয় উপাসনা বা ইবাদত অথবা ব্যক্তিগত কাজ করতো। এটাই ছিল মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘুমের অভ্যাস।[১৩১] এ কথাটি প্রমাণ করার জন্য রজার ইকার্চ তাঁর গ্রন্থে ৫০০টি ঐতিহাসিক রেফারেন্স দেন। তাঁর এই অভিমতটি কুরআন-হাদীসের সাথে হুবহু মিলে যায়। কুরআন-হাদীসেও শেষ রাত্রে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করে বলেন-

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا–

অর্থ: এবং তাঁরা রাত্রি অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদায় নত হয়ে এবং দন্ডায়মান হয়ে।[১৩২]
আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রহ.) বলেন-

سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا كَانَ مِنَ السَّحْرِ اَوْتَرَ ثُمَّ اَتٰى فِرَاشَهُ–

অর্থ: একদা আমি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি বলেন, রাত্রের প্রথমার্ধে তিনি নিদ্রা যেতেন, অত:পর জাগ্রত হতেন। সাহরীর সময় হলে তিনি বিতর সালাত আদায় করতেন, এরপর বিছানায় যেতেন।[১৩৩]

ইমাম শুবা ও জুহায়ের (রহ.) উক্ত হাদীসটি আবু ইসহাক ও আসওয়াদ (রহ.) সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَهُ وَ يَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّىْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى فِرَاشِهِ، فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ–

অর্থ: আমি আয়িশা (রা.)-কে নবী কারীম (সা.)-এর কিয়ামুল লাইল সম্মন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি রাত্রের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন এবং শেষার্ধে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ সালাত পড়তেন, তারপর আবার বিছানায় যেতেন, অত:পর মুআযযিন ফজরের সালাতের আযান দিলে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন।[১৩৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণি, তিনি বলেন –اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ حَتّٰى تَزْلَغَ قَدَمَاهُ–

অর্থ: নবী কারীম (সা.) তাহাজ্জুদ সালাত পড়তে থাকতেন ফলে তাঁর দু' পা ফুলে যেতো।[১৩৫]

---

১৩০. আল-কুরআন, ১৩:২৮

১৩১. *www.globalnews.com.bd.*"টানা আট ঘণ্টা ঘুমানোর অভ্যাসটি স্বাভাবিক নয়," ০৫.১২.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

১৩২. আল-কুরআন, ২৫:৬৪

১৩৩. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা. এপ্রিল ২০১০, (চতুর্থ সংস্করণ), হাদীস নং- ১৬০৮

১৩৪. ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, মিশর: কায়রো, দারুল আদইয়ান লিল তুরাস, ১৯৮৮, (তৃতীয় সংস্করণ), অধ্যায়: তাহাজ্জুদ, খ. ৩, পৃ. ৩৯

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা ইসলামের প্রথম দিকে ফরয থাকলেও পরবর্তীতে নফল হিসেবে সাব্যস্ত হয়।[১৩৬] কিন্তু নফল সালাতসমূহের মধ্যে তাহাজ্জুদ সালাত তথা কিয়ামুল লাইলের গুরুত্ব অনেক বেশি। এটা আম্বিয়া, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে' তাবেয়ী এবং আল্লাহ ওয়ালাদের স্বাভাবিক আমল ছিল।[১৩৭] ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ বুখারীতে 'কিতাবুত তাহাজ্জুদ' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন।[১৩৮]

হাসি-খুশি ও সুস্থতাময় জীবন লাভের প্রত্যাশা সকল মানুষই করে থাকে। কিন্তু প্রত্যাশানুযায়ী সবার জীবনে সুখ আসে না। বাহ্যিকভাবে কেউ স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় থাকলেই তাকে সুখী বলা যায় না। সুখময় জীবন লাভ আল্লাহর তা'আলার বিরাট নিয়ামত। এমন জীবন লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে গাইড লাইন হিসেবে মানব জাতির জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানুষ যদি ইসলাম প্রদর্শিত শিক্ষা-দীক্ষা ও আমল-আখলাক বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে এবং অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে নানাবিধ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এ সকল মানসিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হচ্ছে হীনমন্যতা বা ডিপ্রেশন। কেননা একে কেন্দ্র করেই আরো অসংখ্য মানসিক রোগ মানবদেহে জন্ম নেয়। ১৯৮৫ সালে জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাহোরের আল্লামা ইকবাল মেডিকেল কলেজের মনস্তত্ত্ব ও মস্তিষ্ক বিজ্ঞান বিভাগ মানসিক রোগীদের নিয়ে এক গবেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ কর্মসূচিতে অবসাদ বা ডিপ্রেশনের রোগীদের একত্রে রাখা হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ৬৪জন রোগী মনোনীত করা হয়। এদেরকে ৩২জন করে দুই ভাগে ভাগ করে প্রথম দলের ৩২জনের জন্য তাহাজ্জুদ সালাত বাধ্যতামূলক করা হয়। আর দ্বিতীয় দলের ৩২জনকে শেষ রাতে কিছু সময় জেগে থেকে যারা তাহাজ্জুদ আদায় করবে তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়। উক্ত চিকিৎসার সময় অন্য সকল প্রকার ওষুধ সেবন তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। ইতিপূর্বে এসকল রোগী দীর্ঘদিন যাবত অবসাদে ভুগছিল এবং নানা রকমের চিকিৎসাও তারা গ্রহণ করেছিল।

উভয় দলের জন্য রাত ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত জেগে থাকা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। প্রথম দলকে বলা হয়, তারা এ সময় আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবে। এ সময় পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত ২টি আয়াত কয়েকশ বার পাঠ করতে বলা হয়। আয়াত ২টি হলো-

–اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ তথা জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণে (যিকিরে) অন্তরের প্রশান্তি অর্জন হয়।[১৩৯]

–وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ তথা এবং আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে আরোগ্য দান করেন।[১৪০]

প্রথম জামাআতের নামকরণ করা হয় 'রিসার্চ গ্রুপ'। উক্ত সময়ে যিকির, ইবাদত, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও নির্ধারিত কিছু আয়াত বার বার পাঠ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। রোগীদেরকে আরো বলা হয়, তারা যেন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যিকির ও অন্যান্য ইবাদতে মনোনিবেশ করে এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় জামাআতের নাম রাখা হয় 'কন্ট্রোল গ্রুপ'। তাদের জন্যও ২ঘন্টা রাত্রি জাগরণ আবশ্যক ছিল। কিন্তু তাদেরকে প্রথম জামাআতের ন্যায় যিকির, অযীফা, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং তাদেরকে এ ২ঘন্টা অবসর বসে না থেকে ঘরের ছোট-খাট কাজ-কর্ম কিংবা পড়া লেখার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।সপ্তাহে দু'বার এ রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হতো। চার সপ্তাহ পর রোগীদের হেমিলটন ডিপ্রেশন স্কেল দিয়ে নিরীক্ষা করা

---

১৩৫. আবু বকর আল কারাশী, *কিতাবুত তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল*, সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রাশীদ, ১৯৯৮, (প্রথম সংস্করণ), পৃ. ২৭৯

১৩৬. আবু বকর আল জাসসাস, *আহ্‌কামুল কুরআন*, লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, খ. ৩, পৃ. ৬২৭

১৩৭. ড. মোহাম্মদ ইউসুফ, *কুরআন হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায*, ঢাকা: ২০০৭ইং, পৃ. ১০

১৩৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫১

১৩৯. আল-কুরআন, ১৩:২৮

১৪০. আল-কুরআন, ২৬: ৮০

হয়। এতে দেখা যায়, যারা ছোট-খাট কর্ম করেছে এবং বই পড়েছে, তাদের তুলনায় যারা তাহাজ্জুদ সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও  যিকির করেছে তাদের রোগ অনেক কমে গেছে।

**চার সপ্তাহ চিকিৎসার পর ফলাফল**

| জামাআতের নাম | আরোগ্য  লাভকারী রোগীর সংখ্যা | আরোগ্যহীন রোগীর সংখ্যা | মোট |
|---|---|---|---|
| রিসার্চ গ্রুপ | ২৫জন | ০৭ জন | ৩২ জন |
| কন্ট্রোল গ্রুপ | ০৫জন | ২৭ জন | ৩২ জন |
| সর্বমোট: | ৩০জন | ৩৪ জন | ৬৪ জন |

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যায়, রিসার্চ গ্রুপের ৩২জন রোগীর মধ্যে ২৫জন অর্থাৎ ৭৮% রোগী রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছে, যাদের মধ্যে ১৫জন পুরুষ ও ১০জন মহিলা ছিল এবং অবশিষ্ট ৭জন রোগীর মধ্যে ৫জন পুরুষ ও ২জন মহিলার অবস্থা কোন পরিবর্তন হয়নি। পক্ষান্তরে, কন্ট্রোল গ্রুপের ৩২জন রোগী থেকে মাত্র ৫জন রোগী সুস্থ হয়েছে। আর অবশিষ্ট ২৭জন রোগী অর্থাৎ শতকরা ৮৩.২৭%রোগী (১৬জন পুরুষ এবং ১১জন মহিলা) কোনো উপকার পায়নি।[১৪১]

তাই সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ সালাত মুসলমানগণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِنَافِلَةً لَّكَ–

অর্থ: আর রাত্রি বেলায় আপনি তাহাজ্জুদ সালাত পড়ুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত।[১৪২]

সুতরাং তাহাজ্জুদ সালাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সরল ও সোজা পথের ন্যায় পথ প্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি যদি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও মহব্বতের সাথে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে, তাহলে অবশ্যই সে সুখময় জীবন লাভ করবে এবং তার দেহে বিভিন্ন রোগের প্রতিক্রিয়াও কম হবে। কেননা এসব লোক যিকরে ইলাহীর মাধ্যমে অন্তরের এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করে।

তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের মাধ্যমে রোগ মুক্তি মূলত একটি আত্মিক চিকিৎসা। এ চিকিৎসা পদ্ধতি পবিত্র কুরআন থেকেই সংগৃহীত। ধর্মীয় পদ্ধতিতে এ চিকিৎসা যা পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তা বাস্তবিকই বর্তমান কালের অন্যান্য চিকিৎসা থেকে বহুগুণে উন্নত। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءُ فَاِذَا اُصِيْبُ دَوَاءُ بَرِئَ بِاِذْنِ اللّٰهِ–

অর্থ: জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা হলেই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়।[১৪৩]

আল্লাহ তা'আলা সকল রোগীকে শিফা দান করেন। যদিও বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এমন অনেক রোগ রয়েছে যেগুলোর সঠিক ও সফল চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয়নি। যেমনঃ ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদি। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে একজন প্রকৃত মুসলমান বলতেই পারে, এ সকল রোগেরও চিকিৎসা রয়েছে। যার প্রতিষেধক হয়তো জাগতিক চিকিৎসায় নেই, রূহানী চিকিৎসায় রয়েছে। যেমন, মানসিক রোগের উত্তম চিকিৎসা অন্তরের প্রশান্তির মধ্যে লুকায়িত রয়েছে, যা যিকির ও সালাতের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব, অন্য কোনভাবেই লাভ করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- মানব মনের প্রশান্তি একমাত্র আল্লাহর যিকির তথা স্মরণে রয়েছে।[১৪৪] এমনিভাবে তাহাজ্জুদ সালাতও যেকোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। কোনো ব্যক্তি যদি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও গুরুত্বের সাথে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে অবশ্যই সে সুখময় জীবন লাভ করবে এবং তার দেহে বিভিন্ন রোগের প্রতিক্রিয়াও কম হবে। কেননা খাঁটি মুসলমানগণ তাহাজ্জুদের সময় যিকরে

১৪১. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১-৩৩
১৪২. আল-কুরআন, ১৭: ৭৯
১৪৩. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১৪৪. আল-কুরআন, ১৩:২৮

ইলাহীর মাধ্যমে অন্তরে এমন এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করে থাকে, যা মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ এর বিন্দু পরিমাণও খবরও রাখে না। আল-কুরআনকে শিফা বা আরোগ্য বলা হয়েছে। আল-আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ: আর আমি কুরআনের মধ্যে এমন সব জিনিস অবতীর্ণ করেছি, যা ঈমানদার লোকদের জন্য শিফা ও রহমত।[১৪৫]

**সুস্থতা লাভে তারাবীহর সালাত**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন মানুষের পরম বন্ধু এবং মানুষের সকল রোগের সর্বোত্তম ডাক্তার। তিনি মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ যাতে আজীবন সুস্থ থেকে তাঁর ইবাদত করতে পারে সে জন্য স্তরে স্তরে কিছু আমলও স্থাপন করেছেন। তেমনি একটি আমল হল তারাবীহর সালাত। যা রমযান মাসে এশার সালাতের পর আদায় করতে হয়। গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এই তারাবীহর সালাতে রয়েছে সিয়াম সাধনকারীর জন্য বিশাল উপকারিতা। রোযা রেখে সারাদিন উপবাস থাকার কারণে ইফতারের সময় যখন রোযাদারের সামনে নানা ধরণের খাবার উপস্থিত করা হয়, তখন মানুষ স্বভাবজাত লোভী হওয়ায় নিজের অজান্তেই মাত্রাতিরিক্ত আহার গ্রহণ করে নিজের ওপর যুলুম করে থাকে। সারাদিন পাকস্থলী খালি থাকার কারণে হঠাৎ করে একসাথে অধিক খাবার গ্রহণ করার কারণে এর চাপ সামলাতে পারে না। তাই তারাবীহ সালাতের মাধ্যমে এর হজমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা না হলে সারাদিন রোযা রাখার কারণে ইফতার করার পরপরই শরীর অবসন্ন হওয়ায় মানুষ শুয়ে পড়তো এবং পরবর্তী সাহরী খাওয়া তার জন্য দুষ্কর হয়ে যেতো। ফলে দেখা যেত, ইফতারের সময় অনেক খাবার গ্রহণ করার কারণে পেটে পুরোপুরি ক্ষুধা অনুভব না হওয়ায় সাহরী না খেয়েই সারাদিন রোযা রাখতো। আর এতে দিনের শেষ প্রান্তে প্রচন্ড ক্ষুধার কারণে নিস্তেজ হয়ে পড়তো এবং শারীরিক অনেক রোগ দেখা দিতো।

পক্ষান্তরে, জোর করে সাহরী খেলেও পূর্বের খাবার হজম না হওয়ায় বদ হজমসহ নিম্নবর্ণিত নানাবিধ রোগ-ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। যেমন:(ক) হৃদস্পন্দন ও হৃদরোগ,(খ) উচ্চ রক্তচাপ, (গ) পাকস্থলীর উত্তপ্ত হওয়া, (ঘ) মাথা ঘোরানো ও বমি বমি ভাব, (ঙ) দাঁতের মাড়ীর রোগ বিশেষতঃ পাইওয়োরিয়া, (চ) নিম্ন রক্তচাপ, (ছ) শ্লৈষ্মিক আর্দ্রতা ও স্থায়ী সর্দি, কাশি, (জ) দৈহিক অবসন্নতা ও শুষ্কতা এবং (ঝ) ডাইরিয়া ও আমাশয় ইত্যাদি। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জীবনকে সুস্থ ও সতেজ রাখার জন্য এশার সালাতের পর তারাবীর ব্যবস্থা রেখে এমন এক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যাতে উপরোল্লিখিত মারাত্মক রোগসমূহ থেকে পরিত্রাণ পায় ও ক্ষতিকর প্রভাবগুলো দূর হয়ে পূর্বের ন্যায় হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল জীবন ফিরে পায়। তারাবীহ সালাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْغَبُ فِىْ قِيَامِ رَمْضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে রমযান মাসের (রাতে) সালাত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, তবে তিনি (সা.) তা আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব (ফরয-ওয়াজিবের ন্যায়) আরোপ করতেন না। তিনি (সা.) বলতেন: যে ব্যক্তি রমযান মাস ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় দণ্ডায়মান হয়ে তারাবীহ সালাত আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।[১৪৬]

১৪৫.আল-কুরআন, ১৭:৮২

১৪৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত, খ. ১, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ১৩৭১

# সিয়াম বা রোযা

## মানব জীবনে সিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ যখন রূহ বা আত্মার উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন শরীর নিজেই তার কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় একটা সময় সে রিপুর তাড়নায় ভোগ-সম্ভোগ, অবাধ, উচ্ছৃংখলা ও পাশবিকতার স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যায়। সকল নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে নিমজ্জিত হয় পাশব-পঙ্কিলতার অতলান্তে। আর লাগামহীন শরীর পূজার নেশায় ছুটে চলে বেপরোয়াভাবে। অপমৃত্যু ঘটে মনুষ্যত্ব ও সকল সুকুমার বৃত্তির। তখন সকল পাশবিক ও জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আল কুরআনের ভাষায়-

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَ يَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ–

অর্থ: আর যারা অবিশ্বাসী (কাফির) তারা ভোগ-সম্ভোগে নিমগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে, তাদের নিবাস জাহান্নাম।[১৪৭]

প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি স্বাধীনচেতা। আল্লাহ তা'আলা আত্মাকে সৃষ্টি করার পর জানতে চাইলেন, তুমি কে আর আমি কে? নফস সরাসরি জবাব দিল, তুমি তুমি আর আমি আমি। এরপর নফসকে শাস্তি দানের জন্য পানিতে ডুবানো হলো এবং আগুনে পোড়ানো হলো। এভাবে নানা রকম শাস্তি প্রয়োগ করেও নফসের একই উত্তর পাওয়া গেল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আত্মার খানা-পিনা বন্ধ করে দিলেআত্মা ক্রমেই ভেঙে পড়ল এবং স্বীকার করতে বাধ্য হলো আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, রব এবং আমি তাঁর সৃষ্ট আজ্ঞাবহ জীব।[১৪৮]

সুতরাং মানুষকে পাশবিকতার পঙ্কিল থেকে উদ্ধার করে তার দেহ-আত্মা, মন-মস্তিষ্ক, অনুভব-অনুভূতি, ভাব ও ভাবনাকে পাশব আবিলতা ও পঙ্কিলতামুক্ত করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণার্থে সিয়াম সাধনার বিধান রেখেছেন। মানুষের রিপু ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ এই বিধান। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সে লাভ করে আধ্যাত্মিক সজীবতা, আত্মিক দৃঢ়তা এবং তার মাঝে সৃষ্টি হয় কল্যাণ কর্মের স্পৃহা ও উদ্দীপনা। দেহ ও আত্মার মাঝে গড়ে ওঠে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক-সখ্যতা। এভাবে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও মানুষ সিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিবিম্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ঊর্ধ্ব জগতের সাথে গড়ে তুলতে পারে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে পার্থিব মানুষ অনুভব করে অনাবিল অপার্থিব স্বাদ।

মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন-মানুষকে আখলাকে ইলাহী বা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করাই হলো সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য। সিয়াম সাধনা তাকে পূত-পবিত্র ও নিষ্পাপ ফিরিশতাকুলের অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে, পাশবিক ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত করে। ফিরিশতাগণ যেমন সকল জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত পূত-পবিত্র, আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ সম্মান ও মর্যদার অধিকারী, তেমনি মানুষও পাশবিক ও জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সদ্ব্যবহার করে দরবারে ইলাহীতে সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। এমনকি কখনও কখনও তার মর্যাদা হয় ফিরিশতাদের ঊর্ধ্বে।[১৪৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন-

সিয়ামের লক্ষ্য হলো, মানুষকে তার পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে নিষ্কৃতি দেয়া এবং তার জৈবিক চাহিদাসমূহকে স্বাভাবিক ও সুনিয়ন্ত্রিত করা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। সে পৌঁছে যায় পারলৌকিক সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে তার জৈবিক চাহিদা ও পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহ দুর্বল হয়ে যায়, তার মনুষ্যত্ব সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠে। তখন ক্ষুধাকাতর অভুক্ত মানুষের অনাহার ক্লিষ্ট মুখ তার হৃদয়ে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার পবিত্র অনুভূতি জাগ্রত করে।সিয়াম শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার সকল

১৪৭. আল-কুরআন, ৪৭: ১২

১৪৮. ড. এস.এম. আব্দুছ ছালাম, "তাকওয়া অর্জন ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রোযার ভূমিকা", (সংকলন ও সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী), *সিয়াম ও রমযান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৮৬

১৪৯. মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, প্রাগুক্ত, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৩২

পথ রুদ্ধ করে দেয়। রোযাদারকে রক্ষা করে দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদকারী সকল কাজ থেকে। বস্তুত সিয়াম এমন এক দুর্ভেদ্য ঢাল, যা রোযাদারকে শয়তানের সকল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় সহায়তা করে থাকে।[১৫০]

সিয়ামের কল্যাণ ও উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন-মানুষের আত্মিক ও দৈহিক শক্তি সংরক্ষণে সিয়াম অত্যন্ত কার্যকর। একদিকে তা মানুষকে পাশবিক চাহিদার প্রাবল্য আধিপত্য থেকে মুক্ত করে তার দৈহিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে, অপরদিকে তা নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তার আত্মিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উন্নতি সাধন করে। তিনি আরো বলেন- মানুষের আত্মিক সংশোধন ও উৎকর্ষ তার সকল মনোযোগ আল্লাহভিমুখী করার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহভিমুখিতা তার কলব ও অন্তরে সৃষ্টি করে আত্মিক স্থিরতা ও প্রশান্তি। পক্ষান্তরে, উদরপূর্তি ও ভোগ-সম্ভোগের আসক্তি তার কলব ও অন্তরে পেরেশানী ও অস্থিরতার জন্ম দেয়। ফলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়।[১৫১]

**যুগে যুগে সিয়াম**

ইসলামের সিয়াম সাধনা অলীক কোনো বিধান নয় যে মুসলনানদের ওপর এমনিতে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বরং পৃথিবীর সকল ধর্ম মতেই কোনো না রকমের রোযা তথা উপবাস ব্রত পালনের নিয়ম রয়েছে। পুরাকালে কেল্‌ট রোমান অ্যাসিরীয় ও ব্যবিলনীয়দের মধ্যে রোযার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, জরথুস্ত্র ও কনফুসিয়াস অনুসারী, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মেও সিয়াম বা উপবাস পালিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হলো, যেমনিভাবে সিয়াম ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যেনোতোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো।[১৫২]

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল 'সিয়াম' বা রোযা নামের এই ধর্মানুষ্ঠান। তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর শরীয়তে সিয়ামের বিধান দেয়া হয়েছিল বলে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। অবশ্য সেই সিয়ামের ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল তা আমাদের অজানা। বলা হয়ে থাকে, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়ামের বিধান ছিল। এই সিয়াম "সিয়াম আইয়্যামি বীজ" নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ দাহ্‌হাক বর্ণনা করেছেন: হযরত নূহ (আ.) থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে সিয়ামের বিধান ছিল। শেষকালে রমযানের মাসব্যাপী সিয়ামের বিধান দেয়া হলে মাসিক তিন সিয়ামের ফরয বিধান রহিত হয়ে যায়।

এছাড়া সিনাই পর্বত থেকে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ নিয়ে আসার স্মৃতি পালনের উদ্দেশ্যে ইয়াহুদীরা উপবাসের মাধ্যমে বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত দিবস পালন করে থাকে। কথিত আছে, একাধারে ৪০ দিন রোযা পালন করে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হন এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের অনুরূপ রোযা পালনের নির্দেশ দেন। হযরত ঈসা (আ.)-ও ৪০ দিন রোযা রেখে ইঞ্জিল কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনিও তাঁর শিষ্যবর্গকে তা পালনের বিধান দেন। বৌদ্ধ মহাথির পুরোহিত ও ভিক্ষুগণও বিভিন্ন 'চীবর' অনুষ্ঠানে অবশ্য পালনীয় হিসেবে উপবাস উদযাপন করেন। কনফুসিয়াও বিভিন্ন ধরনের উপবাস অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছিলেন। প্রাচীন জাপানী জাতির 'কেন্ট' ধর্মে উপবাস অবশ্যপালনীয় ছিল। তাঁরা এখনো এ রীতি বজায় রেখেছেন। জরথুস্ত্রবাদী পারসিকগণও নানাভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপবাস পালন করে থাকেন। বৈদিক হিন্দু ধর্মে প্রতিটি পূজায় ব্রতী পূজারী ও অনুষ্ঠান উদ্যোগী নর-নারী উপবাস পালন করেন। তাঁদের উপবাস এক নাগাড়ে একদিন, দু'দিন কিংবা তিনদিনের বেশি নয়। বিভিন্ন পূজা পার্বণ ছাড়াও বিশেষ করে বিধবা ও সদ্য পিতৃহারা মাতৃহারাদের জন্য অমাবস্যা-পূর্ণিমা ও একাদশীতে উপবাস পালনের নিয়ত অব্যাহত আছে।

---

১৫০. *প্রাগুক্ত*

১৫১. মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

১৫২. আল-কুরআন, ২: ১৮৩

পারসিকগণ আগের নিয়ম অনুযায়ী ১১ দিন রোযা পালন করেন। কেউ কেউ ৩ দিন আবার কেউ কেউ ৩৩ দিন রোযা পালন করে থাকেন। এসব বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন প্রকার রোযা বা উপবাস পালনের মধ্যে নানা রকম হেরফের রয়েছে। রোযা রেখেও কেউ কেউ দিনে পানীয় ও ফল গ্রহণ বিধেয় মনে করেন, আবার কেউ কেউ ডাল-ভাতকেও উপবাসের আহার্য বলে মেনে নেন। নিরম্বু উপবাসে ক্রমাগত কয়েকদিন দিবা রাত্রি পানি তো দূরের কথা এমনকি থুথু গেলাও নিষিদ্ধ। ইয়াহুদী ও পারসিকদের কোনো কোনো রোযায় পুরুষের পক্ষে মেয়েদের এবং মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের দেখাও পাপ বলে গন্য। বৌদ্ধদের তো অনেক সময় নির্জনবাসেই থাকতে হয়। প্রশিক্ষণের সময় তাদের দিবস শেষে একবার একমুষ্টি ভিক্ষা তুণ্ডল সিদ্ধ করে গ্রহণ করতে হয়। কোনো কোনো ধর্মে উপবাসের সময় বিশেষ সংখ্যকবার বিশেষ নাম জপার নিয়ম রয়েছে। কথিত আছে, 'শ্মাশান-শব-সাধনায়' অমাবস্যার রাত্রে মৃত দেহের উপর বসে বিশেষ ধরনের নাম জপতে হয়। তার আরও পরের দিনসহ মোট তিন দিন তিন রাত নিরম্বু উপবাস থাকতে হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পূজা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই উপবাস পালনের নির্দেশ দেয়। কোনো কোনো স্থলে উপবাসী সেবক (ধর্মাধিকারী) নিজের রক্ত দিয়ে দেবতাকে খুশি করেন এবং পাঁচ, তিন কিংবা একদিন উপবাসীর রক্ত দেবতার খুব প্রিয়। হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে ও মধ্য এশিয়ার কিছু উপজাতীয় লোক রয়েছে যাদের উপবাস জন্ম দিন থেকেই শুরু হয়। জন্মের পর একদিন কিছুই খাবার দেয়া হয় না। এতে কোনো শিশু মারা গেছে বলে কেউ বলতে পারে না। মধ্য ইউরোপ ও পশ্চিম আফ্রিকায় কোনো কোনো গোত্রে শিশুকালেই ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক খাৎনা করায়। খাৎনার দিন এবং তার আগের রাত ও পরের রাত শিশুটি উপবাসে থাকে। তার মা তার জন্য সাতদিন উপবাসী থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে ও হনুলুলো ইত্যাদি এলাকায় পুরোহিতকে বছরে প্রায় ৪০/৫০ দিন উপবাসী থাকতে হয়। এদের মধ্যে মেয়েদের উপবাসে কড়াকড়ি বেশি। তাদের বিয়ের আগে-পরে ৩ দিন করে ৬দিন এবং বিয়ের দিন, এই ৭ দিন উপবাসে থাকতে হয়। এর মধ্যে তারা নির্জন গৃহে একা কাটাবে। বাড়ির বা গোত্রের কারো সে ঘরে যাওয়ার অনুমতি নেই। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সে বেরুতে পারবে, কিন্তু কোনো পুরুষকে যেন সে না দেখে। তারপর যজ্ঞ হয়। আগুন জ্বালিয়ে সবাই নৃত্য করে।...

এভাবে প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের 'উপবাস'ব্রত পালনের নিয়ম আছে বলে জানা যায়। অবিশ্বাস হলেও একথা সত্য, একদা ব্রাজিল অঞ্চলের কোনো সম্প্রদায়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বিশেষ একটা বয়স পেরিয়ে গেলে হত্যা করে 'শিক-কাবাব' করে খাওয়া হতো। আরো আশ্চর্য এই যে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার আগে তাদের ১১, ১৩ বা ১৫ দিন উপবাসী রাখা হতো। বিশ্বের বিচিত্র মানব সমাজের বিচিত্র ইতিহাস 'উপবাস' বা 'রোযা'রইতিহাস আরো বিস্ময়কর।[১৫৩]

উপবাসকে ধর্মের অনুষঙ্গ হিসেবে বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের সময়কাল থেকেই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধদের মধ্যে ভিক্ষু ও গৃহী, দুই ধরনের জীবন যাপন আছে। ভিক্ষুদেরকে অনেক নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়েই চলতে হয়। খাদ্য গ্রহণে সংযমী হওয়া ভিক্ষুদের অবশ্য কর্তব্য। বেলা দ্বিপ্রহরের পর থেকেই ভিক্ষুরা খাদ্য গ্রহণ করেন না। ঊষালগ্ন থেকে দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তারা খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোনরূপ বিলাসিতা বা সন্তুষ্টি তাদের থাকবে না। ভিক্ষুরা পার্থিব সম্পদ উপার্জন করতে পারেন না এবং যে খাদ্য তারা গ্রহণ করেন, সেগুলোও প্রার্থী হিসেবে মানুষের কাছ থেকে তাদের গ্রহণ করতে হয়। এভাবেই ভিক্ষা যা পাওয়া যায়, তা একত্র করে তারা শরীর ধারণের জন্য গ্রহণ করেন। সে কারণেই এ খাদ্যের মধ্যে বিলাসিতা নেই এবং খাদ্যের উপকরণ বিষয়ে কোনোরূপ বিশেষ তৃপ্তি বা সন্তুষ্টির অধিকার নেই। বেলা দ্বিপ্রহর থেকে পরের দিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা উপবাস পালন করে থাকেন। এ উপবাস হচ্ছে দেহকে শাসন করার উপবাস এবং বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তির জন্য উপবাস। উপবাস সময়ে তারা কঠিন খাদ্য গ্রহণ করেন না। একমাত্র পিপাসার্ত হলে পানীয় গ্রহণ করতে পারেন। ভিক্ষুদের এ উপবাস হচ্ছে নিজেদের জন্য, সংযমী হওয়ার জন্য এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকার জন্য। এটা এক প্রকার আত্ম-শাসনের মতো।

১৫৩. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, "সিয়ামে রমযানের তাৎপর্য ও তাকওয়ার গুরুত্ব", *সিয়াম ও রমযান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদের মাঝেও উপবাস পালনের প্রথা দেখা যায়। আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী উপবাস থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রেখে স্বামীর কবরে অথবা দাহ স্থানে গিয়ে থাকে। ... অবশ্য পৃথিবীর সব দেশেই স্বাস্থ্যগত কারণে উপবাস গ্রহণের বিধি আছে।

তবে ধর্মীয় নির্দেশে উপবাস ব্রত সর্বপ্রথম আমরা ইয়াহুদীদের মধ্যেই দেখতে পাই। উপবাস পালনের ক্ষেত্রে তাওরাতে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। ইয়াহুদীরা 'ইয়ুম কিপুর' নামে উপবাস পালন করে থাকে। ইয়ুম কিপুরের উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইয়াহুদীদের ইতিহাসে যেসব ট্রাডেজি ঘটেছিল সে সমস্ত স্মরণ করে উপবাস পালন এবং বিধাতার নিকট ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য আবেদন। ইয়াহুদী বর্ষপঞ্জিতে বছরের যে দিনে ইয়ুম কিপুর হয়, সেদিন হযরত মূসা (আ.) মিসরীয়দের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। ইয়াহুদীরে মধ্যে বছরে ৫টি উপবাস দিন আছে। একটি গৃহে প্রথম সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে সে উপলক্ষেও উপবাস পালন করা হয়। এক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের কথা স্মরণ করা হয়। আরেকটি উপবাসের দিন হলো বিবাহের পূর্বের দিন নব দম্পত্তির উপবাস পালন। এই উপবাসের প্রয়োজন হচ্ছে নতুন জীবনের জন্য নব দম্পত্তিকে প্রস্তুত করা। এ রকম আরও কয়েকটি উপবাস আছে। ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বে ব্যাবিলনীয়রা ইয়াহুদীদের প্রথম মন্দির এবং ৭০ খ্রিস্টাব্দে তাদের দ্বিতীয় মন্দির রোমানদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। এজন্যও ইয়াহুদীরা দুই দিন উপবাস পালন করে থাকে। এসব উপবাসের অর্থ হচ্ছে, দু'টি পুরাতন ট্রাজেডিকে স্মরণ করা এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে এ জন্য বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। তবে এসব উপবাস তাওরাত নির্দেশিত নয়। 'তালমুদ' বলে তাদের ধর্মীয় অনুশাসন বা আদর্শের যে গ্রন্থ ইয়াহুদীদের রয়েছে, তাতে এসব উপবাসের কথা আছে। আর তালমুদে বিভিন্ন ইয়াহুদী পন্ডিত এবং রাবাইদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনা সূচক বক্তব্যও আছে।

কিন্তু তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইয়ুম কিপুরের উপবাস। ইয়ুম কিপুরের উপবাসের অর্থ হচ্ছে শারীরিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে আত্মার শুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং অতীতের কোনো বিচ্যুতি বা পাপের জন্য শরীরকে কষ্ট দেয়া। কৃত অপরাধের জন্য আন্তরিকভাবে গ্লানি বোধ করা। ইয়ুম কিপুর সপ্তম মাসের দশম দিনে পালন করা হয়। লক্ষ্যণীয়, ইয়াহুদীদের অধিকাংশ রোযা বা উপবাস বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক দিসব স্মরণে পালিত হয়ে থাকে। একমাত্র ইয়ুম কিপুর আল্লাহর নির্দেশে পালিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করে দেখলেন, মদীনার ইয়াহুদীরা মহররমের দশ তারিখ তথা আশুরার দিন রোযা রাখে, তখন তিনি এটা ভাল মনে করে মুসলমানদেরকেও এ রোযা রাখতে আদেশ দিয়ে ইরশাদ করেছিলেন–نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ

অর্থ: আমরা তোমাদের (ইয়াহুদীদের) চেয়ে মূসা (আ.)-এর অনুসরণের অধিক হকদার।[১৫৪]

এতে দেখা যায়, এক সময় মুসলমানগণও ইয়ুম কিপুরের রোযা রাখতেন। উল্লেখ্য, ইয়াহুদীরের সপ্তম মাসের দশম দিন এবং মুসলমানদের মহররমের দশম দিন মূলত একই দিন।

কিন্তু মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা'আলা আরবী বছরের পুরো একটি মাস সিয়ামের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আর এ মাসটি হচ্ছে রমযান মাস। অর্থাৎ আরবী বছরের নবম মাস। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে সিয়াম পালিত হয় না। ইসলাম ধর্মে সিয়াম ও সালাত কোনোরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হয় না; বরং পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার জন্য সিয়াম ও সালাত পালিত হয়ে থাকে। সিয়াম পালিত হয়: (ক) তাকওয়া অর্জনের জন্য, (খ) শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য, (গ) আত্মশুদ্ধির জন্য, (ঘ) সত্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য, (ঙ) পার্থিব সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত রাখার জন্য, (চ)বিনয় ও নম্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং (ছ) সর্বোপরি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

কিন্তু ইয়াহুদীদের রোযা বা উপবাস হচ্ছে শুধুই এক ধরনের শারীরিক নিগ্রহের মতো। তাই ইয়ুম কিপুরের রোযা হচ্ছে পঁচিশ ঘন্টার। এক সূর্যাস্ত থেকে পরের দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এসময়ে ইয়াহুদীরা পানাহার এবং যৌন মিলন থেকে বিরত থাকে, গোসল করে না এবং শরীরকে যন্ত্রণা দেয়। ইয়াহুদীদের রোযা হচ্ছে পাপের জন্য অনুশোচনা এবং শাস্তি। ইংরেজিতে যাকে পেনান্স (Penance)বলে। ইসলামে সংযমী হওয়ার কথা থাকলেও শরীরকে কষ্ট দেয়ার কথা নেই। বরং যারা রোযা রাখতে শারীরিকভাবে অক্ষম, দুর্বল বা অসুস্থ তাদের জন্য এ সময় রোযা রাখার বিধান নেই। তারা

---

১৫৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সিয়াম, অনুচ্ছেদ: আশুরার দিন রোযা রাখা, খ. ১, পৃ. ৩৫৩, হাদীস নং- ২৪৪৪

রোযা না রাখার কারণে এর পরিবর্তে ভিন্নভাবে 'কাফ্ফারা' আদায় করবে। এমনকি রমযান মাসে কোনো মহিলা ঋতুবতী হলে ঐ সময় রোযা রাখতে নিষেধ রয়েছে। পরবর্তীতে সুস্থ হলে তারা ঐ সকল রোযা কাযা করে নেবে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ– يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ–

অর্থ: আর তোমাদের যারা পীড়িত থাকবে বা ভ্রমণে, তারা অন্য সময়ে তা (রোযা) এর সমপরিমাণ সংখ্যায় পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের প্রতি কঠিন করতে চান না।[১৫৫]

কিন্তু ইয়াহুদীদের ক্ষেত্রে ইয়ুম কিপুরের রোযা অবশ্যই পালন করতে হবে, তাতে যদি শরীরের ক্ষতিও হয়, তাও পালন করতে হবে। এতে পরিস্কার বোঝা যায়, মুসলমানদের রোযা বা সিয়াম কোনোরূপ পেনান্স (Penance) নয়।[১৫৬]

রমযানকে তাওরাতে (Old Testament) 'হাত্ব' অর্থাৎ পাপ মোচনকারী বলা হয়েছে। আর বাইবেলে (New Testament) একে বলা হয়েছে 'ত্বাব' অর্থাৎ পবিত্রকারী। এ মাসে সিয়াম পালনকারী পাপমুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায় বলে 'হাত্ব' ও 'ত্বাব' বলা হয়। আর এ রমযানের সাধনার বলে আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্য লাভের সুযোগ হয় বলে 'যাবুর' কিতাবে একে বলা হয়েছে, 'কুরবাত' বা নৈকট্য এবং আল-কুরআনে একে বলা হয়েছে 'রামাদান'। এটি 'রমদ'(رمض) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন, যা অর্থ দাহ, উত্তাপ, দহন।[১৫৭] কৃচ্ছতা সাধনের দহনে মুমিনের দেহ মন পবিত্র হয় বলে এ নাম দেয়া হয়েছে। এর আর একটি অর্থ হলো 'রহমত'। হেমন্তকালের প্রথমে যে বৃষ্টি হয়, তাতে ফসল ফলনের বিশেষ রহমত থাকে। তাই আরবগণ সিয়ামের এ মাসকে রহমতের মাস বা রামাদান বলে।[১৫৮]

**Autophagyও রোযা**

মুসলিমরা রোযা রাখলে তাকে বলা হয় 'সিয়াম'। খ্রিস্টানরা রাখলে বলে 'ফাস্টিং'। হিন্দু বা বৌদ্ধরা রাখলে তাকে বলা হয় 'উপবাস'। বিপ্লবীরা রাখলে তাকে বলা হয় 'অনশন'। আর মেডিক্যাল সাইন্সে রোযা রাখাকে বলা হয় 'অটোফেজি' (Autophagy)। তবে মুসলিমদের রোযা রাখার ধরনের সাথে অন্যদের কিছু পার্থক্য আছে।[১৫৯]

**Autophagy-এর সংজ্ঞা**

আভিধানিক অর্থ: Autophagy শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ। Autoঅর্থ নিজে নিজে এবং phagy অর্থ খাওয়া। সুতরাং Autophagy মানে নিজে নিজেকে খাওয়া, আত্ম-ধ্বংসকারী, আত্মভক্ষণ।[১৬০]

**পারিভাষিক সংজ্ঞা**

শরীরের কোষগুলো বাহির থেকে কোনো খাবার না পেয়ে নিজেই যখন নিজের অসুস্থ কোষগুলো খেতে শুরু করে, তখন মেডিক্যাল সাইন্সের ভাষায় তাকে Autophagy বলা হয়।[১৬১]

খুব বেশি দিন হয়নি, মেডিক্যাল সাইন্স 'অটোফেজি'র সাথে পরিচিত হয়েছে। আমাদের ঘরে যেমন ডাস্টবিন থাকে অথবা কম্পিউটারে যেমন রিসাইকেল বিন থাকে, তেমনি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের মাঝেও একটি ডাস্টবিন আছে। সারাবছর শরীরের কোষগুলো খুব ব্যস্ত থাকার কারণে ডাস্টবিন পরিষ্কার করার সময় পায় না। ফলে কোষগুলোতে অনেক আবর্জনা ও ময়লা জমে যায়। শরীরের কোষগুলো যদি নিয়মিত তাদের ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে না পারে, তাহলে কোষগুলো একসময় নিষ্ক্রিয় হয়ে শরীরে বিভিন্ন প্রকারের রোগের উৎপন্ন করে। ক্যান্সার বা ডায়াবেটিসের মতো অনেক বড় বড় রোগের শুরু হয় এখান থেকেই।

---

১৫৫. আল-কুরআন, ২: ১৮৫

১৫৬. সৈয়দ আলী আহসান, "ইসলামে সিয়াম এবং তার তাৎপর্য" *সিয়াম ও রমযান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

১৫৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী: ২০০৫ প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৪৩২

১৫৮. ড. কাজী দীন মুহম্মদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৫৯. *https:/muktopran.com/autophagy-and-fasting/*"ফাস্টিং থেকে অটোফেজি, মানব দেহে প্রাকৃতিক এক নিরাময় প্রক্রিয়া"! ২৯.০৪.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

১৬০. *https://bn.m.wikipedia.org/wiki/*"আত্মভক্ষণ" (থেকে উদ্ধৃত)

১৬১. প্রাগুক্ত

মানুষ যখন খালি পেটে থাকে তখন শরীরের কোষগুলো অনেকটা বেকার হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা আমাদের মতো অলস হয়ে বসে থাকে না। তাই প্রতিটি কোষ তার ভেতরের আবর্জনা ও ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করে। কোষগুলোর আমাদের মতো আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই বলে তারা নিজের আবর্জনা নিজেই খেয়ে ফেলে। মেডিকেল সাইন্সে এই পদ্ধতিকে বলা হয় অটোফেজি। এ বিষয়টি আবিষ্কার করার কারণে ২০১৬সালে জাপানের ইয়োশিনোরি ওহশোমিকে চিকিৎসা শাস্ত্রেনোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।[১৬২] জানা যায়, প্রফেসর ইয়োশিনোরি ওহশোমিনিজেও সপ্তাহে ০২দিন উপবাস তথা রোযা রাখেন এবং এরপর থেকে আধুনিক মানুষেরাও ব্যাপকভাবে রোযা রাখতে শুরু করে। আর একজন মুসলমান প্রতিবছরই এক মাস রোযা রেখে শরীরের অটোফেজি করে নেয়।[১৬৩]

সুতরাং বছরে কিছু সময় মানুষের জন্য এমনভাবে অতিবাহিত করা উচিত, যেন সে ডায়েটিং করে তার হজম প্রক্রিয়াকেকিছু সময়ের জন্য অবসর রাখে, এভাবে তার মধ্যে বিদ্যমান আর্দ্রতা, যা সময় সাপেক্ষে বিষে পরিণত হয়ে যায়, রোযা রাখার দ্বারা তা নি:শেষ হয়ে যায়। আর এই মারাত্মক আর্দ্রতা নি:শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে অনেক জটিল জটিল রোগ নি:শেষ হয়ে যায়। এভাবেই হজম প্রক্রিয়া পূর্ব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

**শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধনে সিয়াম**

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম সাধনা একটি অন্যতম স্তম্ভ। এটি একটি শারীরিক ইবাদত। আল্লাহ তাআলার নিকট সিয়াম বা রোযা এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হচ্ছে – اَلصِّيَامُ لِىْ وَ اَنَا اَجْزِىْ بِهِ

অর্থ: সাওম বা রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেবো।[১৬৪]

স্বাস্থ্য রক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ (সা.) রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা রোযা রাখো এবং সুস্থ থাকো।[১৬৫]

সকল মুসলমান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত প্রত্যেকটি হুকুমই ইহকালীন লাভ-ক্ষতির হিসেব না কষে পরকালীন মুক্তির প্রত্যাশায় পালন করে থাকে। দীর্ঘ এক মাস কঠিন সিয়াম সাধনাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে অমুসলিমরা স্বভাবতই প্রশ্ন করতে পারে, মুসলমানগণ দীর্ঘ এক মাস দিনের বেলা খানা-পিনা ছেড়ে দিয়ে শুধু শুধু ক্ষুধায় কাতর হওয়াতে কী-ই বা উপকার রয়েছে? আর রোযা না রাখলেই বা কী ক্ষতি হবে? রোযার ব্যাপারে এত কড়াকড়ির করে আল্লাহ তাআলা কি তাঁর স্বীয় বান্দাদেরকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন নাকি আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের রোযার মুখাপেক্ষী? ইত্যাদি।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী সিয়াম সাধনা করতে গিয়ে একজন মুসলিম সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হয়। এছাড়াও মুসলমানগণ এ সময় সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থেকে নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। একারণে রোযা যে শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতিই সাধন করে তা নয়; বরং শারীরিক ও মানসিক উন্নতিও ঘটায়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন– وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থ: আর যদি তোমরা রোযা রাখো, তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর।[১৬৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন– اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَ هِىَ حِصْنٌ مِّنْ حُصُوْنِ الْمُؤْمِنِ

অর্থ: রোযা ঢালস্বরূপ, উহা মুমিনের দুর্গসমূহের মধ্যে একটি দুর্গ।[১৬৭]

---

১৬২. মো: আরিফুর রহমান, *https://www.prothomalo.com/life/durporobash.*"খাবার বিজ্ঞানী ইয়োশিনোরি ওহশোমি ও অটোফেজি",আপডেট: ০৮.১০.২০১৬ (থেকে উদ্ধৃত)

১৬৩ . ডা. সজল আশফাক, *https://www.bd-pratidin.com/health.*"খাবার রোজা, অটোফেজি এবং শরীরের প্রাকৃতিক শুদ্ধতা", ২৮.০৫.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

১৬৪. মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, *হাদীসে কুদসী*, ঢাকা: ইফাবা, জুন ২০১৫ (একাদশ মুদ্রণ), পৃ. ১৩৩, হাদীস নং- ১৬৯

১৬৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ সা.*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ১৪, পৃ. ২৪০

১৬৬. আল-কুরআন, ২: ১৮৪

ঢাল এবং দুর্গ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে একজন যোদ্ধাকে সার্বিক আঘাত থেকে রক্ষা করে, রোযাও তেমনি রোযাদারকে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় অবগত আছেন যে কোন জিনিসে মানব জাতির কল্যাণ রয়েছে এবং কোন জিনিসে অকল্যাণ রয়েছে। কোন জিনিসে সুস্থতা রয়েছে এবং কোন জিনিসে অসুস্থতা রয়েছে।

**স্বাস্থ্য সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে সিয়াম**

জীব বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আমরা জানি যে প্রতিটি প্রাণীর শরীর একটি উচ্চতর এবং সূক্ষ্ম জৈব রাসায়নিক কারখানা রয়েছে এবং এটিকে সচল রাখতে প্রয়োজন হয় শক্তি। উক্ত শক্তির যোগান দিতে স্রষ্টা জীব জগতের জন্য নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন। সাধারণত একজন মানুষের এই শক্তি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কমপক্ষে দৈনিক তিন বার খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। তবে মানুষ উন্নত আত্মা সম্পন্ন জীব হওয়ায় মানুষের সঙ্গে অন্যান্য পশুর পার্থক্য হলো মানুষ তার ক্ষুৎ-পিপাসা এবং যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রমযান মাস প্রকৃতপক্ষে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ রাখারই শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন হলো, রোযার সময় দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত থাকা আমাদের শরীরকে কিভাবে প্রভাবিত করছে? রোযা আমাদের শরীরের জন্য কি আদৌ উপকারি, না কি রোযা আমাদের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক মুসলিম এবং অমুসলিম বিজ্ঞানী এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছেন এবং চালাচ্ছেন।

স্বাস্থ্যের ওপর পরিমিত খাবারের প্রভাব আমাদের খাদ্য দ্রব্যের পরিমাপের সুবিধার্থে যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে ক্যালরী বলে। ম্যাক কে এবং তার সহযোগি বৈজ্ঞানিক দলের গবেষণায় দেখা যায়, দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য হিসেবে গৃহীত মোট ক্যালরীর পরিমাণ কমিয়ে আনা হলে জীবনকাল বাড়ে। ১৯৮৯ সালে নিউট্রেশন জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার পর অনেক বিজ্ঞানী ক্যালরী রেস্ট্রিকটেড ডায়েট এবং বিভন্ন ধরনের ফাস্ট তথা উপোস-এর উপর গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লক্ষ্যণীয়, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মেও বিভিন্ন ধরনের উপোস থাকার ধর্মীয় রীতির প্রচলন আছে। যেমন অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানদের ক্যালরী রেস্ট্রিকটেড ফাস্টিং যেখানে দৈনন্দিন গৃহীত খাবারের ৪০% কমিয়ে আনা হয়, অল্টারনেট ডে ফাস্টিং যেখানে একদিন পরপর ২৪ ঘন্টার জন্য পানি ব্যতীত সব ধরনের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হয়। ক্যালরী রেস্ট্রিকশনের উপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, দিনের গৃহীত ক্যালরীর পরিমাণ কমিয়ে আনলে তা শারীরিক স্থায়িত্ব বাড়ায় এবং বেশ কিছু জটিল অসুখের ফলে সৃষ্ট জটিলতা কমিয়ে আনে। যেমন রক্তনালীতে চর্বি জমে সৃষ্ট অ্যাথেরোস্ক্লিরোসিস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি রোগ এবং নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ।

মানব শরীরে যেসকল গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত তা হলো- আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, মিনারেল ও পানি। মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্মে যে শক্তি ব্যয় হয়, তা আসে খাদ্য থেকে। সাধারণত খাদ্য গ্রহণ এবং শক্তি ব্যয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকতে হয়। দীর্ঘ দিন ধরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে তা অতিরিক্ত মেদ হিসেবে জমা হয় এবং প্রয়োজনের চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরের স্বাভাবিক গঠন ভেঙ্গে যেতে থাকে। যেহেতু মুসলিমদের দীর্ঘ একটি মাস রোযা রাখতে হয়, স্বাভাবিকভাবেই এতে ওযন কিছুটা হ্রাস হয়। তবে সাহরী ও ইফতার নামক সুন্দর ব্যবস্থার কারণে এই ওযন কমে যাওয়ার হার আশংকাজনক পর্যায়ে হয় না। রোযার সময় মানবদেহে শারীরবৃত্তীয় কি কি ধরনের পরিবর্তন হয় তা জেনে নিলে আমাদের জন্য মানবদেহে রোযার প্রভাব বুঝতে সুবিধা হবে।
রোযার সময় সাহরীতে যে খাবার গ্রহণ করা হয় তা সারাদিনের উপোসের প্রাথমিক সঞ্চয় হিসেবে লিভারে শর্করা জমা হতে সাহায্য করে। এরপর দিনের কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে যে শক্তি ব্যয় হয় তার একটি অংশ উক্ত শর্করা হতে আসে এবং একটি অংশ আসে রমযান মাসের পূর্বে এবং রমযান মাসে ইফতার থেকে সাহরী পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের এডিপোজ টিস্যুতে জমাকৃত চর্বি বিপাকের মাধ্যমে। ফলে রমযান মাস শেষে একজন রোযাদারের শরীরের কিছুটা ওযন হ্রাসও হতে পারে। তবে তা নির্ভর করছে ইফতার ও সাহরীর সময় এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে রোযাদারের

১৬৭. মোমতাজ উদ্দীন আহমদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং- ১৭২

খাদ্যাভাস্যের ওপর। লক্ষ্যণীয়, অন্যান্য সময় মুসলিমরা তিনিট প্রধান মিল (সকাল, দুপুর ও রাতের খাবার) গ্রহণ করলেও রমযানে দুটো প্রধান মিল (সাহরী ও ইফতারের খাবার) গ্রহণ করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, রমযান মাসে মুসলিমদের খাবারের সময়ের সাথে সাথে খাবারের ধরনেও বেশ পরিবর্তন আসে। আমাদের দেশে রমযান মাস এলে ইফতারের সময় আলুর চপ, পেঁয়াজু, বেগুনী, জিলাপী জাতীয় ভাজাপোড়া খাবারের সাথে হালিম, ছোলা, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া হয়। এছাড়া খেজুরসহ বিভিন্ন ফল ও ফলের রস, চিড়া, দধি, কলা প্রভৃতি খাবার গ্রহণ করা হয়। বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাউ জাতীয় খাবার গ্রহণের প্রবণতাও বেড়ে যায়।

জনাব জি ফ্রস্ট ও এস পিরানী ১৯৮৭ সালে ১৫জন সৌদি যুবকের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন যে রমযান মাসে যদিও তাদের খাবার গ্রহণের বারের সংখ্যা কমে গেছে, অপরদিকে শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। রোযার সময় যেহেতু পানি পান থেকেও বিরত থাকতে হয়, সেহেতু দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে ঘাম, মল ও মূত্রের মাধ্যমে পানির পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থায় বিভিন্ন হরমোনের মাধ্যমে কিডনি রক্তে পানি ধরে রাখার চেষ্ট করে।

মানুষের শরীরে ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদানের জন্ম হয়, যার অধিকাংশ খাদ্য ও পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যন্ত্র চালিত যানবাহনের কারণে পরিবেশ দূষিত হওয়ায় মানুষ বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ক্যান্সার, ব্লাড প্রেসার, ফুসফুস, হার্ট ও ব্রেন টিউমার ইত্যাদি।

বিভিন্ন মেশিন দীর্ঘ দিন কাজ করার ফলে এর মাঝে ময়লা-আবর্জনা জমার কারণে শক্তি কিছুটা কমে যায়। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দেয়। তাই সার্ভিসিং এর মাধ্যমে উক্ত ময়লাগুলো পরিষ্কার করলে পূর্বের মত শক্তি আবার ফিরে আসে। আর যদি তা না করা হয়, তাহলে পরিশেষে উক্ত মেশিন অকেজো হয়ে যায়। মানুষের শরীরটাও আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর হুকুমে পরিচালিত একটা অলৌকিক মেশিন। এই মেশিন যেহেতু আলাদা করে সার্ভিসিং করা যায় না, তাই যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভালো জানেন, এই অলৌকিক মেশিনটি সুস্থ রাখতে হলে কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সৃষ্টিকর্তাই এই রোযার পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সার্বিক সুস্থ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি অন্যতম রক্ষাকবচ। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের জন্য সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যে রহমত, বরকত, ফযীলত ও মাগফিরাতের পথ দেখিয়ে গেছেন, দিন দিন এর যথার্থতা ফুটে ওঠছে।

**মানব দেহের ওপর রোযার প্রভাব**

মৌসুম এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে রোযার সময় ১২ থেকে ১৯ ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। রাত লম্বা হলে সাধারণত ইফতারের পর সাহরীর আগে দু'একবার খাবার খেতে হয়। কেউ কেউ বলেন, রোযা রাখার কারণে দৈহিক দূর্বলতা দেখা দেয়। আবার অনেকে বলে, রোযা রাখার ফলে দেহে কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। রোযা রাখার ফলে দুই ওয়াক্তের আহারের ব্যবধান কিছু বেশি হয়। ২৪ ঘন্টায় যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় এতে যতটুকু পুষ্টি অর্জন করে, তা দেহের জন্য যথেষ্ট। রোযায় দেহের পুষ্টি অন্য সময়ের চেয়ে মোটেই কম হয় না। তবে বাস্তবতা হলো, রমযান মাসে মানুষ প্রোটিন এবং কার্বো হাইড্রেটযুক্ত জিনিস অধিক পরিমাণে খেয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, রমযান মাসে দেহ সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি খাদ্যপ্রাণ লাভ করে।

সামগ্রিকভাবে রোযাদারের দেহের অবস্থা রমযানে কেমন থাকে, তা পর্যক্ষেণের জন্য একবার এক উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে ১৩ জন রোযাদারের একটি গ্রুপ মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে ৬ মাসের একজন গর্ভবতী মহিলাও অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং উল্লিখিত ১৩ জনের সংগে ২৭ বছর বয়স্ক এমন একজনকেও মনোনীত করা হয়, যে রোযা রাখেনি। এভাবে ১৪ জনকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় নিম্নোক্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করা হয়- (ক) ওযন (খ) শারীরিক উত্তাপ (গ) নাড়ি (ঘ) রক্ত চলাচল (ঙ) দৈহিক সুস্থতা অসুস্থতা (চ) সামগ্রিক দৈহিক অবস্থা (ছ) রক্ত ও প্রশ্রাবের রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ।

উল্লিখিত গ্রুপে গর্ভবতী মহিলা বাদে অন্য তিনজন মহিলার বয়স ছিল যথাক্রমে ১৭,২৭ এবং ৪০ বছর। অবশিষ্ট পুরুষদের বয়স ছিল ২২ থেকে ৬৯ বছর। সব নারী পুরুষ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এদের গ্রহণ করা খাদ্যের মধ্যে প্রতিদিন ৩ হাজার ক্যালোরি রেকর্ড করা হয়। রমযান শুরুর এক সপ্তাহ আগে তাদের বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা

হয়েছে, যেন পরবর্তী সময়ের অবস্থার সাথে তাদের শারীরিকস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যায়। সে সময় নাস্তা খাওয়ার আগে পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্রাব ও রক্ত সংগ্রহ করা হয়। তারপর ইফতার করার পর পরই আবার প্রস্রাব এবং রক্ত সংগ্রহ করা হয়। অথচ রোযাদাররা এক চুমুক পানি দ্বারা ইফতার সম্পন্ন করেছিলেন।

তাদের ওপর পরিচালিত এ জরীপের সময় ছিল ১ম রমযান, ১০ রমযান, শেষ রমযানের দিন এবং রোযার ৩ সপ্তাহ পর। প্রসংগত উল্লেখ্য, উক্ত গ্রুপে রোযা না রাখা ব্যক্তির দেহে ওযনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। কারণ রমযান ছাড়া সাধারণ সময়েও কমবেশি হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

**পাউন্ডের হিসেবে ওযন**

| বিভিন্ন ব্যক্তির ধরন | রমযানের আগে | ১ম রমযান | ১০ম রমযান | শেষ রোযার দিন | রোযার ৪সপ্তাহ পর |
|---|---|---|---|---|---|
| রোযা না রাখা ব্যক্তি | ১৪২ | ১৪০ | ১৪২ | ১৪০ | ১৪২ |
| রোযার ব্যক্তি | ১২২ | ১২২ | ১১৯ | ১২১ | ১২১ |
| গর্ভবতী মহিলা | ১০৬ | ১০৬ | ১১০ | ১০৮ | ১১৭ |

উল্লেখ্য, গর্ভধারণের সময়ে ওযন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপরে যে চিত্র দেয়া হয়েছে এর মধ্যে ২ জনের ওযন ৭ পাউন্ড কমে গেছে। একজনের ওযনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। গর্ভবতী মহিলার ওযন রমযানে ৪ পাউন্ড বেড়ে গেছে। ৭ ব্যক্তির ওযন ৪ সপ্তাহ পর তাই রয়েছে, যা রমযানের আগে ছিল। নার্ভ এবং দৈহিক উত্তাপের ওপর রোযার কোনো প্রভাব পড়েনি। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ রমযানের মতোই অক্ষুণ্ণ ছিল। মোটকথা, সামগ্রিকভাবে রক্ত চলাচলে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি।

খাদ্যে শর্করার পরিমাণ কারো ক্ষেত্রেই শতকরা ৭মিলিগ্রামের নিচে ছিল না। রমযানে শর্করার পরিমাণ ছিল কম। এছাড়া রক্তে রাসায়নিক উপাদান রমযানে স্বাভাবিক পরিমাণে বজায় ছিল। এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়নি। সাধারণভাবে গ্রুপের লোকেরা রমযানে ২৪ ঘন্টায় সে পরিমাণ পানিই ব্যবহার করেছে যে পরিমাণ অন্য সময়েও করতো। প্রস্রাবের পরিমাণেও তেমন একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়নি। এটা ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবের কারণে হয়েছিল। প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিতেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। রক্তে শর্করার পরিমাণের ক্ষেত্রেও কোনো তারতম্য হয়নি।উল্লেখ্য, পরীক্ষায় যাদের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক প্রমাণিত হয়, তাদের ওপরই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। কাজেই গুরুতর রোগীদের ক্ষেত্রেও যে একই রকম ফলাফল পাওয়া যাবে, একথা বলা যায় না। কিডনীর রোগী বা ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিন্ন রকম ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১৬৮]

**রোযা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়**

অজ্ঞ শ্রেণির অনেকেই মনে করে, রোযা রেখে সারাদিন উপবাস থাকলে শরীর অতিকায় ক্ষীণ ও জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং বিভিন্ন রোগ মানুষকে আক্রমণ করে। এটি একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। কেনান মানব জীবনে খাদ্য ও পানীয় বস্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়একটি বিষয়, শরীর গঠনের উপকরণ ও বেঁচে থাকার মূল উপাদান মনে করা হলেওঘন ঘন খাদ্য গ্রহণ করলে স্বাস্থ্য অটুট ও সবল থাকার ধারণা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নিতান্ত ভুল ও অবান্তর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বরং কম খাওয়াকেই বর্তমানে শরীর সুস্থতার মূল চাবিকাঠি বলা হয়। মানুষ তার শরীর ও আত্মা নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর যে সকল উপাদান তথা পানি, মাটি ও বাতাস রয়েছে,মানুষের শরীরওতা দিয়েই গঠিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

অর্থ: মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করে আনবো।[১৬৯]

সুতরাং আমরা যে সকল খাবার খাই এর মধ্যেও রয়েছে পানি, মাটি ও বাতাস। বাতাসে পাওয়া যায় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড। পানিতে রয়েছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এবং মাটিতে পাওয়া যায় লৌহ ধাতু,

---

১৬৮. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৮-৫৯

১৬৯. আল-কুরআন, ২০: ৫৫

দস্তা, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, মেগনেসিয়াম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি। এ সমস্ত উপাদানের পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে প্রোটিন, চর্বি এবং ভিটামিন ইত্যাদি।মানুষের এ সকল খাদ্য শরীরে প্রধানত দু'টি কাজ করে। যথা: (ক) শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয়া ও তাপমাত্রা রক্ষা করা এবং (খ) কোষের কার্যক্রম রক্ষা করা ও কোষ বিভাজনে সহায়তা করা।

তাই বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য দেহকে শক্তি যোগান দিয়ে থাকে এবং দেহের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। এ বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি সঞ্চয় হয়, তা কোষের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং খাদ্য উপাদানগুলো সূক্ষ্ম পদক্ষেপ ও ধারাবাহিকভাবে উত্তাপের মাধ্যমে ভিটামিন, চর্বি ও সার্বিক শক্তিতৈরি করে। সেখানে রয়েছে অ্যামিনো এসিড, আলোক শক্তি ও বিদ্যুৎ শক্তি। এই সমস্ত শক্তির মাধ্যমে শরীর তার বিভিন্ন যন্ত্র পরিচালনা করে। যেমন: হৃদপিন্ড, ফুসফুস, রক্ত ও পাকস্থলী ইত্যাদি। জীবন পরিচালনায় সার্বিক কাজকর্ম ও নড়াচড়ায় যথোপযোগী এই শক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত শক্তি বিশেষ ভাণ্ডারে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত থাকে। সেখান থেকে প্রয়োজনের সময় তা ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, মানুষ যদি খাওয়া থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখে, তাহলে তার সঞ্চিত শক্তি ভাণ্ডার থেকে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কমপক্ষে ১মাস এবং উর্ধ্বে ৩মাস শক্তি সরবরাহ করতে পারে। অথচ ইসলাম একজন মুসলিমকে সিয়াম সাধনার জন্য সাধরণত দৈনিক ১২ থেকে ১৯ ঘন্টা পানাহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এই সামান্য সময় পানাহার থেকে বিরত থাকা বিজ্ঞানেরদৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ নিরাপদ। রোযার কারণে তার শরীরে কোনো ধরনের ক্ষতি তো হয়-ই না; উল্টো এ সিয়াম সাধনায় সে বিশাল উপকৃত হয়। সুতরাং সিয়াম নামক এই শারীরিক ইবাদতটির মধ্যে শুধু নৈতিক উন্নতি ও গুণাবলী অর্জনের ক্ষমতাই নয়; বরং তা মানব দেহ সুস্থতা ও সুরক্ষার একটিসুনিশ্চিত রক্ষাকবচ।

**কোলেস্টোরাল নিয়ন্ত্রণে রোযা**

কোলেস্টোরাল মানব শরীরের একটি অতি প্রয়োজনীয় লিপিড। এটি দেহ কোষের পাতলা আবরণ গঠনের ও হজমের পিত্তরসে ব্যবহৃত হয় এবং এটি স্নায়ু কোষকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া মানব দেহের ইস্ট্রজেন ও এন্ড্রোজেন নামক প্রজনন হরমোন তৈরিতে এর ভূমিকা প্রধান এবং এটি সকল প্রকার স্টেরয়েড সংশোধনের মূখ্য ভূমিকাও পালনকরে থাকে। রক্তে স্বাভাবিক কোলেস্টোরালের পরিমাণ হলো ১২৫-১৫০ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ মি.লি. সেরাম (প্লাজমা)। কিন্তু এর পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে উচ্চ রক্ত চাপ ও হৃদপিণ্ড রোগ সৃষ্টি হয়ে মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়। কিন্তু শরীরের কোলেস্টোরাল মাত্রা সীমিত রাখতে রোযা ও রমযান মাসের পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও অতিরিক্ত সালাত যথেষ্ট সহায়ক।[১৭০]

**ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রোযা**

রোযা মানুষকে ডায়াবেটিস থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে। মানব দেহের অগ্নাশয়ে উৎপন্ন ইনসুলিন নামক হরমোন রক্তে মিশে রক্তের শর্করাকে জীবকোষে প্রবেশ ও কার্যকরী করতে সাহায্য করে। ইনসুলিনের অভাব হলে শরীরে শর্করা কাজে লাগতে পারে না। এর ফলে চর্বি ও প্রোটিন থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। ফলে ডায়াবেটিস রোগী দুর্বল ও ক্লান্ত হয় এবং বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। কিন্তু রমযানের একমাস রোযা পালন এবং বছরের অন্যান্য সময় অতিরিক্ত রোযা ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু। একমাস সিয়াম সাধনার কারণে অগ্নাশয় পূর্ণ বিশ্রাম পায় এবং দিনের বেলায় অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন নির্গত কম হয় বিধায় তা বিশেষ উপকারিতা লাভ করে। এভাবেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত রোযা রাখার প্রতি উৎসাহের প্রকৃত রহস্য।

**রোযা স্থূলকায়ত্ব থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম**

রোযা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় স্থূলকায় (Fatty) লোকেরা। ধনিক শ্রেণির কিছু সংখ্যক স্থূলকায় লোক দৃষ্টিগোচর হয়, যারা শুধু ভালো ভালো খাবার খেতে পছন্দ করে, বারবার খায় এবং তারা যেন শুধু খাওয়ার জন্যই বেঁচে থাকে

---

১৭০. ডা. দেওয়ান এ.কে.এম. আবদুর রহমান, *চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯২ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৯

(They live to eat)। বারবার খেতে খেতে তাদের শরীরে চর্বি জমা হয় এবং তারা অস্বাভাবিক মোটা হতে থাকে। এই চর্বি যে শুধু চামড়ার নিচেই জমা হয় তা নয়; বরং এই চর্বি কোলেস্টোরাল (Cholesterol) আকারে শিরা-উপশিরা (Arterus and Arterioles), ধমনী (Veins) এবং হৃদপিণ্ডে (Heart) জমা হয়। ফলে তাদের শরীরে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। রক্ত চলাচল কিভাবে হৃপিণ্ডের কাজের ব্যঘাত ঘটায়। শরীরের শিরাগুলো হৃদপিণ্ড থেকে বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে টিসুর দিকে নিয়ে যায়, আর ধমনীগুলো টিসু থেকে দূষিত রক্ত বহন করে টিসুর দিকে নিয়ে যায়। সেখানে এই রক্ত আবার বিশুদ্ধ হয়। এইভাবে রক্তের সার্কুলেশনকে নদী-নালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নদী-নালার গভীরতা যতোবেশি থাকে, ততোবেশি পানি এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এই নদী-নালার তলদেশে যখন বালি বা পলিমাটি জমা হয়, তখন নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় অধিক পানি ঐ নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। শরীরের ভেতরেও ঠিক এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়। অধিক খাদ্য গ্রহণের কারণে বেশি কোলেস্টেরাল শরীরে জমা হয়ে শিরা-উপশিরার ভেতরের লাইনিং (Inner Lining)-এর গভরতা কমিয়ে দেয়। ফলে পর্যাপ্ত রক্ত এগুলো বহন করতে পারে না। আর এজন্যই একদিকে উচ্চ রক্তচাপের (High Blood Pressure) সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে শরীরের টিসুগুলো ঠিকমত পুষ্টি পায় না। এতে রোগীর ভোগান্তি চলতে থাকে। এ ধরনের লোকের জন্য রমযানের রোযা অত্যন্ত উপকারী। রোযার দিনে বাধ্যতামূলক সারাদিন অনাহার থাকায় শরীরের জমানো কোলেস্টেরালগুলো শরীরের কাজে ব্যবহৃত হয়। এভাবে রমযানের রোযা ও বছরের অন্যান্য রোযা মানুষকে স্থূলকায়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে।[১৭১]

**কিডনী সুরক্ষায় রোযা**

মানুষের শরীরে বেশির ভাগই পানি। এই পানি এবং পানির মধ্যে দ্রবণীয় বহু উপাদানই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের শরীরের পেটের পিছনের অংশে শিরদাঁড়ায় দুই পার্শ্বে স্থাপিত দুইটি কিডনী, আর প্রতিটি কিডনীতে ১০ লক্ষ একক ছাঁকুনী থাকে, যার নাম নেফরন। এরা পালাক্রমে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ কাজ করে, বাকিরা বিশ্রামে নেয়। এই কিডনী রক্তকে ছাঁকুনী বা দূষণমুক্ত করে অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো মূত্রের সাথে বের করে দেয়। রোযার দিনে সেহরীতে পান করা পানির বেশির ভাগই অতিরিক্ত বিবেচিত হওয়ায় সকালে প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এতে কিডনী অতিরিক্ত পানি শরীর থেকে বের করার ক্ষমতার অনুশীলনে অবতীর্ণ হয়। আবার দুপুরে না খাওয়া এবং পানি পান না করার কারণে বিকালে রক্তে পানির ভাগ কমে যায়। কিন্তু শরীরের ভাঙা-গড়ায় যে সব দূষিত পদার্থ উৎপত্তি হয় তা পানির ওপর নির্ভর না করার কারণে পানি কমার জন্য দূষিত পদার্থের আধিক্য এবং প্রস্রাব গাঢ় হয়ে যায়। তাই কিডনীকে বিকালে গাঢ় মূত্র তৈরি করতে এবং সকালে পাতলা মূত্র তৈরি করার বিপরীতধর্মী অনুশীলনে অবতীর্ণ হতে হয়। এক মাসের অনুশীলনান্তে নিয়োজিত কিডনীদ্বয় ক্লান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং বর্ধিত শক্তি নিয়ে বাকি ১১ মাস কাজ করে থাকে।

**পেপটিক আলসারও রোযা**

পেপটিক আলসার হলো এসিড (Acid) পেপসিনজনিত কারণে অন্ত্রের ঘা হওয়া। পেপসিন (Pepsin) হচ্ছে আমিষ জাতীয় খাদ্য হজমকারী জারক রস। এসিড পেপসিনের হজম থেকে পাকস্থলীতে পাহারাদারী করার জন্য পাকস্থলী হতে উৎপন্ন মিউকোস তৈরি হয়, যার প্রতিরোধে পাকস্থলী সুস্থ থাকে। কোনো কারণে এ প্রতিরোধ ভেঙে পড়লেই এসিড পেপসিন দ্বারা পাকস্থলী নিজেই হজম হয়ে গাত্রে ঘা বা আলসার হতে থাকে। এরূপ ঘা বা আলসার পাকস্থলীতে হলে একে গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং ঘা ডিওডেনামে হলে একে ডিউডেনাল আলসার বলে। গলার নিচের অংশে হলে এসোপেজিয়্যাল আলসার এবং অপারেশনের পর অন্ত্রের সংযোগস্থলে ঘা হলে একে এনাস্টমেটিক আলসার বলে। এছাড়া মেকলস ডাইভার্টিকুলামেও (Meckels Divertoculum) পেপটিক আলসার হতে পারে। তবে বেশির ভাগ গ্যাস্ট্রিক আলসারেই রোযার উপবাসে কোনো ক্ষতি হয় না; বরং আরো ভাল থাকে। ডিওডেনাল আলসার উপবাসে বা ক্ষুধার সময়ে কিছুটা ব্যথ্যা হয় ঠিক, কিন্তু বাস্তবতা হলো ডিওডেনাল আলসারের মূল কারণ ক্ষুধা নয়; বরং হেলিকোরেক্টর পাইলোরী নামের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বা ইনফেকশন। ইনফেকশনের জন্য আলসার হচ্ছে, উপবাস বা রোযার জন্য নয়। তবে হেলিকোরেক্টর পাইলোরী ইনফেকশন ক্ষুধা বা উপবাসে বাড়ে। কিছুকাল পূর্বেও ডিওডেনাল আলসারের রোগীর পারফোরেশন অর্থাৎ ডিউডেনামে ঘা হয়ে ছিদ্র হয়ে যাওয়ার জন্য রোযা বা উপবাসকে দায়ী করা হতো। এমন

---

১৭১. ডা: ক্যাপ্টেন আবদুল বাছেত, "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সিয়াম", *সিয়াম ও রমযান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫

রোগীর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোযার পূর্বেই হেলিকোরেক্টর পাইলোরী নির্মূল করে নেয়া যায়। এছাড়া দৈনিক একবার বা দুইবার ঔষধ খেয়ে পেপটিক আলসারকে রোযায় ভাল রাখা যায়। বাস্তবে রোযার সময় কেউ খাওয়ার কথা চিন্তা করে না, খাওয়ার গন্ধ পাওয়া যায় না, খাবার তৈরি করার কোনো দৃশ্যও চোখে পড়ে না বিধায় পাকস্থলীর সেফালিক ধাপে (Cephalic phase) অর্থাৎ মস্তিষ্ক উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত হয় না। তাই মস্তিষ্কের আদেশের প্রেক্ষিতে এসিড ক্ষরণ না হওয়ায় পরবর্তী পাকস্থলী ধাপে (Gastric phase) এবং অন্ত্রীয় ধাপ (Intestinal phase)-এও ক্ষরণ হয় না এবং এসিড না থাকায় পেপসিনও তৈরি হয় না। রোযার মানসিকতা তথা আল্লাহ প্রেমের নিমগ্নতায় খাওয়া-দাওয়ার কোনো ভাবনাই থাকে না। তাছাড়া ২/৪ দিন রোযা অতিবাহিত হওয়ার পর এসিড পেপসিন ক্ষরণের অবস্থাভেদের পরিবর্তন ঘটে এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এ পর্যায় পৌঁছার পর রোযাদারের আর তেমন কষ্ট হয় না। এছাড়াও রোযাদার রোযার পবিত্রতার জন্য ঝগড়া-বিবাদ, বিতর্ক, উত্তপ্ত ও অশালীন বাক্য বিনিময় করে কোনো কৃত্রিম উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি করে না। এই রোযার মাধ্যমে মস্তিষ্কের যে স্থিতিস্থাপক অবস্থা তৈরি হয় তা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পেপটিক আলসার রোগীর কথা ভেবেই ট্রানকোলাইজার (মস্তিষ্ক শীতল করার) ঔষধের ব্যবস্থা দেন। আল্লাহ তাআলা এভাবে রোযাদারকে এসিড ক্ষরণের তিনটি ধাপই বন্ধ করে দেন। আবার তিনিই বিকালে বিপরীত অবস্থায় রোযাদারকে পাকস্থলীর এসিড পেপসিন ক্ষরণের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করেন। কারণ এবার খাদ্য পাকস্থলীতে খুব শীঘ্র যাচ্ছে। তাই পাকস্থলীতে তার নিজস্ব কর্মে আবার জাগিয়ে তোলার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর হাদীসে ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দারে মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ লোকগুলি যারা সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়।[১৭২]

রোযাদার ইফতার সামনে নিয়ে বসে থাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং তাঁর মানুষ সৃষ্টির যৌক্তিকতা প্রকাশের জন্য ফিরিশতাদেরকে ডেকে দেখান যে, আমার বান্দারা উপবাস থেকে খাবার সামনে নিয়েও কার নির্দেশের অপক্ষোয় এবং কিসের অপেক্ষায় খাবার না খেয়ে বসে আছে? কারো নিষেধ নেই তবুও সে খাচ্ছে না কেন? দেখুন, আল্লাহর রাসূলের বিধান কিভাবে তাঁর বান্দাদেরকে খাবারের দৃশ্য, ঘ্রাণ তৈরি করা ইত্যাদির মধ্যে কাজে লাগিয়ে দিয়ে আবার পাকস্থলীতে সেপালিক ধাপের এসিড ক্ষরণ করিয়ে পর্যায়ক্রমে বাকি ২টি ধাপের এসিড ক্ষরণও করান। তাতে হজমের কাজের জন্য পাকস্থলী তথা পরিপাক তন্ত্রকে সার্বিক প্রস্তুতিতে নিয়ে যান। এছাড়াও পেপটিক আলসারের চিকিৎসায় অধুনা কোনো চিকিৎসকই বলেন না যে একটু একটু করে খাবেন এবং রোজ ৪বার ঔষধ সেবন করবেন। বরং বর্তমানে এমন ঔষধও বের হয়েছে যা দিনে ১বার বা ২বার খেলেই যথেষ্ট এবং ঘা ভালো হওয়ার জন্য খাবারের কোনো ভূমিকাই নেই। অতএব রোযা নিয়ে পেপটিক আলসারের রোগীর কোনো ভয় নেই। তারপর রোগীর অবস্থা দেখে যদি কোন অভিজ্ঞ দীনদার চিকিৎসক রোযা না রাখার পরামর্শ দেন, সেটা ভিন্ন কথা এবং শরীর সুস্থ হলে কাযা হওয়া রোযাসমূহ পরবর্তীতে আদায় করে নেয়া যাবে।[১৭৩]

**গবেষণামূলক তথ্য**

১৯৫৯ সালের রমযান মাসে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন উচ্চপদস্থ গবেষক-ডাক্তার রমযান মাসে রোযার ওপর গবেষণাকালে ৭ জন রোযাদার ও ৫ জন বে-রোযাদার ভলান্টিয়ারের পাকস্থলীর এসিড (Hcl) পরীক্ষা করেন (Gastric Juice Analysis)। রোযার আগে ও পরে বে-রোযাদার কন্ট্রোলদের এসিড প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে, কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। রোযাদারদের সংখ্যা কম বলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ১৮ জন ভলান্টিয়ারের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়। উভয় পর্যায়ে মোট ২৫ জন রোযাদারের মধ্যে ১৭ জনের এসিড স্বাভাবিক (Isochlorhydria), ৭ জনের বেশি (Hypochrlorhydric) এবং ১জনের কম (Hypochrlor-hydria) ছিল। রোযার মাসে চতুর্থ সপ্তাহে এদের এসিড দাঁড়ায় ২০ জনের স্বাভাবিক আর ৫ জনের বেশি। ৭ জনের বেশি এসিড রোযা শেষে স্বাভাবিক হয়ে যায় ও ২ জনের বেশিই থাকে। তবে ১৭ জনের স্বাভাবিক এসিড রোযা শেষে ১৪ জনের এসিড স্বাভাবিক থাকে আর ৩ জনের এসিড

---

১৭২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *হাদীসে-রাসূল (সা.)*, ঢাকা: বাংলাবাজার, মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৪৩২ হিজরী, পৃ. ৮৭

১৭৩. ডা: কে. এম. আবদুল আজিজ, "চিকিৎসা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে রোযা", *সিয়াম ও রমযান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৫০

বাড়ে। একজনের কম এসিড রোযা শেষে স্বাভাবিক হয়। সুতরাং রোযার এসিড বৃদ্ধির তুলনায় হ্রাস পায় অনেক বেশি।[১৭৪]

**পাকস্থলির এসিড**

কেউ কেউ মনে করে, রোযায় পাকস্থলীর এসিড (Gastric Hcl) বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পাকস্থলীর বা ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশে (Doudnum) ঘা (Peptic Ulcer) হতে পারে। বর্তমান গবেষণায় একথা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া এরূপ ধারণা শারীরিকবিদ্যারও বিপরীত। রোযায় পেপটিক আলসার হয় বলে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। ডাঃ ক্লীভ পেপটিক আলসার নামক একটি গবেষণামূলক পুস্তকে লেখেন- বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এ রোগ অনেক কম অথচ দক্ষিণ ভারত, জাপান, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় এ রোগ অত্যন্ত বেশি। এছাড়া ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় মুসলমান ও মালয়েশিয়ার মালয়ী মুসলমানদের তুলনায় ঐসব দেশের চীনাদের মধ্যে এ রোগ বেশ কয়েক গুণ বেশি।[১৭৫]

এছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান ও জাপানী বন্দি শিবিরের অনাহারক্লিষ্ট যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে কারো Peptic Ulcer বা Ulcer ছিদ্র হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ডা. ক্লীভ জোর দিয়ে বলেন- Fasting does not produce organic disease.[১৭৬]

**শরীরের চর্বি এবং ওযনের ওপর রোযার প্রভাব**

রোযারত মুসলিমদের শরীরের চর্বি, ওযন এবং বডি ম্যাস ইনডেক্স নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা চালিয়েছেন। তবে তাদের গবেষণার ফলাফল মিশ্র পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ, কোনো পরীক্ষায় দেখা গেছে রমযান মাস শেষে রোযাদারদের ওযন হ্রাস পেয়েছে, কোনোটায় অপরিবর্তিত আছে এবং কোনোটায় ওযন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, রোযায় মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। যদিও দিনের বেলা তারা না খেয়ে থাকছে, কিন্তু ইফতারের সময় বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করছে। এছাড়া সাহরীর সময়ও বেশি ক্যালরী সঞ্চয় করে নেয়ার জন্য বেশি খাচ্ছে। ২০১২ সালে ট্রাবেলসী এবং তাঁর সহযোগীরা দু'ধরনের রোযাদারদের ওপর গবেষণা চালান। যাদের একদল ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে এরাবিক এক্সারসাইজ যেমন, সাইকেল চালানো ও সাঁতার কাটা অনুশীলন করেছে এবং আরেক দল ইফতারের পর একই অনুশীলনগুলো করেছে। তাঁরা দেখেন যে, রোযা শেষে প্রথমোক্ত দলের শরীরের চর্বি কমলেও পরবর্তী দলে তা অপরিবর্তিত রয়েছে।

২০১৩ সালে ঐ একই বিজ্ঞানীদের গ্রুপ তিউনিশিয়ান বডি-বিল্ডারদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা যায়, রোযা শেষে তাদের বডি ফ্যাট ও লিন বডি ম্যাস (চর্বিহীন শরীরের মূল ওযন)-এ কোনো পরিবর্তন আসেনি। এর কারণ হিসেবে ধারণা করা হয়, বডি-বিল্ডিং-এ শক্তির খরচ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এ রকম হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত গবেষণাগুলো থেকে ধারণা করা হয়, রমযান মাসে ইফতার ও সাহরীর সময় খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা গেলে ওযন কমবে। যাদের বডি ম্যাস ইনডেক্স আদর্শ সীমা অতিক্রম করে গেছে যা ২৪ ও তার বেশি, তারা রমযান মাসকে ওযন কমানোর জন্য একটি উত্তম সময় হিসেবে নিতে পারেন।[১৭৭]

**হজম প্রক্রিয়ার ওপর রোযার প্রভাব**

আমরা জানি, হজম ব্যবস্থা দেহের অনেক অংগ-প্রত্যংগের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর প্রতিটি অংগ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মুখ, জিহ্বা, মাড়ি, মুখের লালা, গলা এলিমেন্টারি ক্যানেল (গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত খাদ্যবাহী নালী ইত্যাদি)। এছাড়া রয়েছে খাদ্য গ্রহণকারী অন্ত্র, লিভার এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। এসকল অংগ-প্রত্যঙ্গগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এর একটি অন্যটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটি চালু হলে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির ন্যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যগুলোও  কাজ করা শুরু করে দেয়। আমরা যখন খেতে শুরু করি বা খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি, তখনই এসকল অংগ-প্রত্যংগ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি অংগ তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায়

---

১৭৪. প্রাগুক্ত

১৭৫. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক লিখিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইফা. ডিসেম্বর ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৮৪

১৭৬. *প্রাগুক্ত*

১৭৭. আহসান মাহমুদ, *https://www.prothomalo.com/life.* "রমজান মাসে ডায়েট", আপডেট: ১০.০৫.২০১৮(থেকে উদ্ধৃত)

সমস্ত অঙ্গ ২৪ঘন্টা ডিউটিরত থাকে। সারা বছরের স্নায়ু চাপ এবং অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্য খাওয়ার ফলে তাতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু রোযার কারণে এসব হজম প্রক্রিয়ায় এক মাসের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয়। তবে হজমের ক্ষেত্রে লিভারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং রোযায় লিভারের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে। কারণ লিভার খাদ্য হজম করা ছাড়াও আরো ১৫টি অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করে। ফলে লিভার অধিক কাজ করার কারণে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং হজমের জন্য নির্গত পিত্তের আর্দ্র পদার্থের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, যা লিভারের কাজের ওপরও বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই যকৃতের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। রোযার মাধ্যমে এ হজম ব্যবস্থা প্রতিদিন প্রায় চার থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। যা রোযা ব্যতীত অন্য কোনভাবেই লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর খাবার এমনকি ১ গ্রামের ১০ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাদ্যও যদি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, এতেই হজম প্রক্রিয়ার সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ নিজস্ব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাবি করা হয়, এ বিরতি গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া আবশ্যক।

রোযার রাখার ফলে লিভার রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার ওপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং লিভারের অন্যতম কঠিনতম কাজের মধ্যে একটি হলো হজম হওয়া ও হজম না হওয়া খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। তাই লিভারকে প্রতিটি লোকমা নিয়ন্ত্রেণে রেখে পাকস্থলীর স্টোরে পৌঁছে দিতে হয় এবং খাদ্য হজম হয়ে রক্তের সাথে মিশে যাওয়ার কার্যক্রম তদারকি করতে হয়। রোযা রাখার সময় লিভার শক্তি সঞ্চারক খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয়ার কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। এ সময় লিভার রক্তে গ্লোবুলিন সৃষ্টির কাজে মনোযোগী হতে পারে। রোযার মাধ্যমে গলা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর খাদ্যনালীও বিশ্রাম পায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া এ নিয়ামতের কোনো মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

রোযার মাধ্যমে মানুষের পাকস্থলী অত্যন্ত কল্যাণকর প্রভাব অর্জন করে। এ সময় পাকস্থলী থেকে বের হওয়া লালা চমৎকারভাবে ভারসাম্য খুঁজে পায়। এ কারণে রোযার সময় এসিডিটি সঞ্চিত হয় না। অথচ রোযার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ক্ষুধায় এসিডিটি বেড়ে যায়, কিন্তু রোযার নিয়ত করার পর এসিডিটি তৈরি হওয়া বন্ধ থাকে। এ নিয়মে খাদ্যনালীতে লালা সৃষ্টিকারী কোষ রমযান মাসে বিশ্রামে চলে যায়। যারা সারা জীবনে কখনো রোযা রাখে না, তাদের অনেকেই বলে যে সারাদিন রোযা রেখে হঠাৎ করে সন্ধ্যায় খাবার খেলে হজম ক্রিয়ায় গোলমাল দেখা দেয়। তাদেরএ ধারণার বিপরীতে প্রমাণিত হয়েছে একটি সুস্থ পাকস্থলী সন্ধ্যায় ইফতার করার পর সফলতার সাথে হজমের কাজ সম্পন্ন করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

রোযা পাকস্থলীর অন্ত্রসমূহকেও বিশ্রাম দেয়, ফলে সেগুলো সজীবতা লাভ করে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর লালা এবং পাকস্থলীর কার্যক্রম জোরদার হয়। রোযার মাধ্যমে অন্ত্রের জাল যেমন নতুন সজীবতা লাভ করে, ঠিক তেমনি হজম নালীর ওপর যে সকল রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে তা থেকেও নিরাপদ রাখে।[১৭৮]

**রক্তের ওপর রোযার প্রভাব**

দিনের বেলায় রোযা রাখার কারণে রক্তের পরিমাণ কমে যায়। এ রক্তস্বল্পতা হৃৎপিন্ডকে খুবই কল্যাণকর বিশ্রাম দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইন্টারসেলুলার বা কোষের আন্ত:সংযোগ কমে যাওয়ার কারণে টিস্যুর ওপর চাপ কমে যায়। টিস্যুর ওপর চাপ অথবা ডায়াসটোলিকের চাপ হৃৎপিন্ডের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোযার মাধ্যমে ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার সব সময়ই কম থাকে। সে সময় হৃৎপিন্ড থাকে বিশ্রামে। বর্তমানে বস্তুবাদী আদর্শে জীবন যাপনের কারণে মানুষ হাইপার টেনশনে ভুগতে থাকে। রমযানের এক মাসের রোযা ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার কমিয়ে দেয়ার কারণে মানুষ অবর্ণনীয় উপকার লাভে সক্ষম হয়। রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে রক্ত চলাচলের ওপর। রক্ত চলাচল কোষের দুর্বলতারকারণে রক্তের মধ্যে অবশিষ্ট রেমন্যান্টিস মিশ্রিত হতে পারে না। অথচ ইফতারের সময় এ রক্ত চলাচল স্বাভাবিকতা অর্জন করে। ফলে রক্ত চলাচলকারী কোষের দেয়ালের মধ্যে চর্বিসহ অন্য উপাদান সঞ্চিত হতে পারে। এ কারণে বর্তমান যুগের অনেক ধরনের বিপজ্জনক রোগ হওয়ার আশংকা দূর হয়ে যায়। রোযার সময় কিডনিও বিশ্রাম লাভ করে। উল্লেখ্য, রক্ত তৈরি হয় হাড়ের টিস্যুর মধ্যে। তাই দেহের যখন রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন একটি

১৭৮. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪-৫৫

স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হাড়ের টিস্যুকে স্টিমুলেট করে, দুর্বল লোকদের মধ্যেও এ ব্যবস্থার কোন ব্যত্যয় দেখা যায় না। রোযার সময়ে রক্তে খাদ্যের উপাদান কম থাকে। টিস্যুর সক্রিয়তার কারণে দুর্বল লোকও রোযা রেখে নিজের ভেতর অধিক রক্ত তৈরি করতে পারে। তবে যে ব্যক্তি রক্তজনিত জটিল রোগে আক্রান্ত হয় তাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে। রোযার মাধ্যমে যেহেতু লিভার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম লাভ করে, তাই এ সময়ে হাড়ের টিস্যু প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ পায়। এর ফলে খুব সহজেই অধিক পরিমাণ রক্ত তৈরি হতে পারে। সুতরাং রোযার বরকতে একজন দুর্বল লোকের ওযন বেড়ে যেতে পারে এবং একজন মোটা মানুষের ওযন কমে যেতে পারে। মোটকথা, মানব দেহের অংগ-প্রত্যংগসমূহ রোযার বরকতে সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।[১৭৯]

**কোষের ওপর রোযার প্রভাব**

রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে মানব শরীরের কোষসমূহের ভারসাম্য সৃষ্টির ওপর। রোযার মাধ্যমে দেহের সেল বা কোষ বিশ্রাম লাভ করে। লালাযুক্ত ঝিল্লিকে বলা হয় ইপিথেলিয়াল সেল। এ সেল বা কোষ দেহের বর্জ নিষ্কাশনের দায়িত্ব পালন করে। রোযার মাধ্যমে এসব কোষ বিশ্রাম পাওয়ার কারণে তাদের পুষ্টি নিশ্চিত হয়। দেহের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সারা বছর রমযান মাসের প্রতীক্ষায় থাকে। কারণ রোযার মাধ্যমে তাদের বিশ্রামের সুযোগ ঘটে। অধিকতর সক্রিয় হওয়ার জন্য নিজের মধ্যে এ সমস্ত সেল সজীবতা লাভে সক্ষম হয়।

**নার্ভ সিস্টেমের ওপর রোযার প্রভাব**

রোযা রাখার সময় কিছু লোকের মধ্যে যে রুক্ষতা ও উগ্রতা লক্ষ্য করা যায়, এর সাথে নার্ভ সিস্টেমের কোনো সম্পর্ক নেই। এ রকম অবস্থার জন্য মানুষের ব্যক্তিগত রুক্ষ স্বভাব এবং উগ্র মেজাজ দায়ী। রোযা রাখার সময়ে নার্ভ সিস্টেম সম্পূর্ণ শান্ত থাকে। ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত প্রশান্তি আমাদের মনের সকল কলুষ, কালিমা ও ক্রোধ দূর করে দেয়। অধিকতর খুশুখুযু বা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের কারণে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় সকল প্রকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের ওপর যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তা প্রায় সম্পূর্ণই লোপ পায় রোযার কারণে। রোযা রাখার ফলে আমাদের যৌন আকাঙ্ক্ষাও সুপ্ত থাকে। তাই আমাদের মনস্তত্ত্বের ওপর বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

রোযা এবং ওযুর সম্মিলিত প্রভাবে যে রকম দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্ম নেয়, এর ফলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর নার্ভ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এক অপার্থিব প্রশান্তিতে মন পরিপূর্ণ হয়ে যায়।[১৮০]

**বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে রোযার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা**

(১) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডা: শেলটন তাঁর 'সুপিরিয়র নিউট্রিশন' গ্রন্থে লেখেছেন- উপবাসকালে শরীরের মধ্যকার প্রোটিন, চর্বি, শর্করা জাতীয় পদার্থগুলো স্বয়ং পাচিত হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোষগুলোর পুষ্টি বিধান হয়।

(২) নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔষধ ও শল্য চিকিৎসার প্রখ্যাত ডা: অ্যালেকসিস বলেন- উপবাসের মাধ্যমে লিভার রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়, ফলে ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি, পেশীর প্রোট্রিন, গ্রন্থিসমূহ এবং লিভারে কোষসমূহ আন্দোলিত হয়। অভ্যন্তরীণ দেহ যন্ত্রগুলোর সংরক্ষণ এবং হৃদপিণ্ডের নিরাপত্তার জন্য অন্য দেহাংশগুলোর বিক্রিয়া বন্ধা করে রাখে। খাদ্যাভাব কিংবা আরাম-আয়েশের জন্য মানুষের শরীরের যে ক্ষতি হয়, রোযা তা পূরণ করে দেয়।

(৩) ডা: আইজাক জেনিংস বলেন- যারা আলস্য ও গোঁড়ামীর কারণে এবং অতিভোজনের কারণে নিজেদের সংরক্ষিত জীবনী শক্তিকে ভারাক্রান্ত করে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়, রোযা তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে।

(৪) বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী নাস্টবারনার বলেন- ফুসফুসের কাশি, কঠিন কাশি, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা কয়েক দিনের রোযার কারণেই নিরাময় হয়।

---

১৭৯. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫

১৮০. ডা. দেওয়ান এ.কে.এম. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, ২২

(৫)  ডাঃ দেওয়ান এ.কে.এম. আব্দুর রহীম বলেন- রোযাব্রত পালনের কারণে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়।

(৬) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডাঃ আব্রাহাম জে হেনরি রোযা সম্পর্কে বলেন- রোযা হলো পরমহিতৈষী ওষুধ বিশেষ। কারণ রোযা পালনের ফলে বাতরোগ, বহুমূত্র, অর্জীণ, হৃদরোগ ও রক্তচাপজনিত ব্যাধিতে মানুষ কম আক্রান্ত হয়।

(৭) পেপটিক আলসারের রোগীরা রোযা রাখলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও হাঁপানি রোগীদের জন্যও রোযা উপকারী।

(৮) রোযার ফলে মস্তিষ্কের সেরিবেলাম ও লিমরিক সিস্টেমের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ার কারণে মনের অশান্তি ও দুশ্চিন্তা দূর হয়, যা উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের জন্য মঙ্গলজনক। বহুমূত্র রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোযা খুব উপকারী। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেছে, একাধারে ১৫দিন রোযা রাখলে বহুমূত্র রোগের অত্যন্ত উপকার হয়।

(৯) কিডনী সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা রোযা রাখলে এ সমস্যা আরো বেড়ে যাবে ভেবে রোযা রাখতে চায় না। অথচ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন- রোযা রাখলে কিডনীতে সঞ্চিত পাথর কণা ও চুন দূরীভূত হয়।

(১০) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে- সারা বছর অতিভোজ, অখাদ্য, কুখাদ্য, ভেজাল খাদ্য খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে যে জৈব বিষ জমা হয়, তা দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এক মাস রোযা পালনের ফলে তা সহজেই দূরীভূত হয়ে যায়।

(১১) ১৭৬৯সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডা: পিটার ভেনিয়ামিনড রোযা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সে রিপোর্টে তিনি মানুষকে রোযা রাখার উপদেশ দেন। তাঁর যুক্তি ছিল, রোযার কারণে পরিপাকতন্ত্র একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশ্রাম পায়। ফলে সুস্থ হওয়ার পর তা ঠিকমত নিজের কাজ চালাতে পারে।

(১২) মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ডাঃ পি.জি. স্পাসকী বলেন, রোযার মাধ্যমে কালাজ্বর এবং শরীরের অন্যান্য পুরাতন রোগ মেডিসিন ছাড়াই ভাল হয়ে যায়। এছাড়ামস্কোর মানসিক রোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. নিকোলাইড বিগত ৫০বছর থেকে নিয়মিত রোযা পালন করে আসছেন।

(১৩) জার্মান ডাক্তার ফেডারিক হ্যানিম্যান বলেন, রোযার মাধ্যমে মৃগীরোগ ও আলসারের চিকিৎসা করা যায়। এছাড়াও পেটের অসুখ, অজীর্ণ, বদহজম ও গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা করা যায়।

(১৪) প্রখ্যাত গ্রন্থ Science calls for fasting-এ বলা হয়েছে- After a fast properly taken, the body is literally born afresh.অর্থঃ সঠিকভাবে রোযা রাখলে মনে হবে যেন নবজীবন লাভ করেছে।

(১৫) চিকিৎসা বিজ্ঞানী ম্যাক ফ্যাডেন বলেছেন- The longer one fasts the greater becomes his intellectual power and the clearer his intellectual vision.
অর্থঃ সিয়াম সাধনা করলে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

(১৬) চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. ডিউই বলেন, রোযা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে দেহের জীবাণুবর্ধক অন্ত্রগুলি ধ্বংস হয়, ইউরিক এসিড বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়। রোযা চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদি রোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারি। মেদ ও কোলেস্টেরাল কমানোর ক্ষেত্রে রোযার তুলনা হয় না। সর্বোপরি রোযা মনে শান্তি আনে, কুপ্রবৃত্তি প্রশমিত করে, দীর্ঘ জীবন দান করে। আজ উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন জটিল রোগের প্রশমনের ব্যবস্থা পত্রে চিকিৎসকগণ রোযা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি আরো বলেন- সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, উপবাসের ফলে অনেক জীবাণু মারা যায়। সুতরাং রোযা রাখার কারণে জীর্ণ ও ক্লিষ্ট রুগ্ন মানুষটি উপোস থাকছে না, সত্যিকার অর্থে উপোস থাকছে রোগটি।

(১৭) প্রফেসর বি.এন. নিকেটন দীর্ঘায়ু লাভ সম্বন্ধে নিজের আবিষ্কৃত একটি ঔষধের উপকারিতা প্রসঙ্গে ১৯৬০ সালের ২২ শে মার্চ লন্ডনে একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন, যদি কেউ নিম্নের তিনটি নিয়ম পূর্ণাঙ্গভাবে সারাজীবন পালন করে, তাহলে তার শরীরের দূষিত পদার্থ বের হয়ে যাবে এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রতিরোধ করবে।
প্রথমত মেহনত খুব বেশি করা। এমন একটি পেশা গ্রহণ করতে হবে, যা মানুষকে ব্যস্ত রাখে, তাহলে শরীরের রগ থাকবে সতেজ। তবে এ জন্য শর্ত হলো, এরূপ ব্যস্ততা মানসিক দিক থেকে শক্তিবর্ধক হতে হবে। যদি কাজটি ভালো না লাগে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা। বিশেষভাবে চলাফেরা খুব বেশি করা।

তৃতীয়তঃ পছন্দ মাফিক খাদ্য খাওয়া। তবে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার উপবাস থাকা।

(১৮) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী এ কে এম আবদুর রহীম বলেন, সমস্ত শরীরে সারা বছর যে জৈব বিষ দেহের স্নায়ু ও অন্যান্য জীব কোষকে দুর্বল করে দেয়, রোযা সমস্ত রক্ত প্রবাহকে পরিশোধন করে সমগ্র প্রবাহ প্রণালীকে নবরূপ দান করে। রোযা উর্ধ্ব রক্ত চাপ জনিত ব্যাধিসমূহ দূর করতে সাহায্য করে।

(১৯) Alexheig বলেন- সর্দিজনিত বধিরতা, অস্থি ফোলা ও দাঁতের রোগ সিয়ামে নিরাময় হয় এবং খাদ্যে অরুচি ও অনীহা দূর করে।[১৮১]

(২০) বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেন- সবচেয়ে ভালো ওষুধ হচ্ছে উপবাস এবং বিশ্রাম। এছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস বলেছেন- আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যেই একজন ডাক্তার বসবাস করে। আমাদের উচিত সেই ডাক্তারকে কাজ করতে দেয়া। আর এটি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। আর তা হলো উপবাস, উপবাস করলেই সেই ডাক্তার কাজ করতে পারে।[১৮২]

**খেজুর দ্বারা ইফতার ও আধুনিক বিজ্ঞান**

রোযা রাখার পর স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। তাই এমন দ্রব্য দ্বারা ইফতার করা উচিত, যা সহজে হজম হয় এবং দেহে শক্তি যোগায়। তাই দেখা যায়, রমযান মাস আসলে মুলমানদের খেজুর খাওয়ার প্রবণতা খুবই বৃদ্ধি পায়। বলা যায়, খেজুর ছাড়া যেনো ইফতারই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আসলে ইফতারিতে খেজুর খাওয়ারও অনেক হিকমত ও উপকারিতা রয়েছে এবং খেজুর দিয়ে ইফতার করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। হাদীসে আছে-রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা খেজুর দ্বারা রোযার ইফতার করবে। কেননা খেজুর অত্যন্ত বরকতময় ফল। যদি খেজুর না পাও তবে পানি দ্বারা ইফতার করো। কেননা পানি শরীয়তের ভেতর-বাহির পাক করে দেয়।[১৮৩]

খেজুরের আলোচনা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনেও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মারয়াম (আ.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেনঃ তুমি এ খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও, (দেখবে) তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে।[১৮৪]

তাই বলা যায়, খেজুরের উপকারিতা অনেক। বর্তমানে তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। কুয়েত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত 'খেজুরের উপকারিতা' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প থেকে খেজুরের গুণাগুণ সম্পর্কে জানা যায় যে, ইফতারিতে খেজুর রোযাদারদের স্বাস্থ্যের জন্য ০৬টি উপকারি ভূমিকা রাখে। যথা-

০১. খেজুর সহজ পাচ্য। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর খেজুর খেলে পাকস্থলীর ওপর কোনো চাপ পড়ে না।
০২. খেজুরে যে শর্করা থাকে তা দ্রুত শোষিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শরীর দ্রুততার সঙ্গে শক্তি পায়। সারাদিনের ক্লান্তি, কষ্ট নিমিষেইলাঘব হয় ।
০৩. খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। রোযা রাখলে পানি কম পান করা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠ্যকাঠিন্যে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু খেজুর খেলে এ সম্ভাবনা কমে যায়।
০৪. রোযা রেখে সারাদিন অভুক্ত থাকার পর খুব বেশি পরিমাণে খেতেমন চায়। এতে রোযার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঠিকমত পালিত হয় না। কিন্তু ইফতারিতে খেজুর খেলে ক্ষুধাভাব কমায়। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়।
০৫. খাবার ডাইজেস্ট বা পরিপাকের জন্য পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত রস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেজুর পাকস্থলী থেকে রস নিঃসরণ হার বাড়িয়ে খাবার পরিপাকে সহায়তা করে।
০৬. রক্তের অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য রাখে।[১৮৫]

---

১৮১.ড. এ. কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন, "রোযা : সামগ্রিক পরিশুদ্ধির নিয়ামক" *সিয়াম ও রমযান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১৮২.ডা. সজল আশফাক, *https://www.bd-pratidin.com/health.*"খাবার রোজা, অটোফেজি এবং শরীরের প্রাকৃতিক শুদ্ধতা", ২৮.০৫.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

১৮৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *হাদীসে-রাসূল (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৮৪. আল-কুরআন, ১৯: ২৫

১৮৫. আফতাব চৌধুরী, *ইনকিলাব (অনলাইন পত্রিকা)*, খেজুরের উপকারিতা, ১৬.০৪.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

**খেজুরের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা**

| ক্রম | নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০১. | প্রোটিন | ২.০ |
| ০২. | ফ্যাট | ২.০ |
| ০৩. | কার্বো হাইড্রেট | ২৪.০ |
| ০৪. | ক্যালোরি | ২.০ |
| ০৫. | সোডিয়াম | ৪.৭ |
| ০৬. | পটাশিয়াম | ৭৫৪.০ |
| ০৭. | ক্যালসিয়াম | ৬৭.৯ |
| ০৮. | ম্যাগনেসিয়াম | ৫৮.৯ |
| ০৯. | কপার | ০.২১ |
| ১০. | আয়রণ | ১.৬১ |
| ১১. | ফসফরাস | ৬৩৮.০ |
| ১২. | সালফার | ৫১.৬ |
| ১৩. | ক্লোরিন | ২৯০.০ |

এছাড়া খেজুরের মধ্যে প্যারোক্সাইডেসও পাওয়া যায়। রোযার সময়ে ভোর রাতে সেহরী খাওয়ার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু পানাহার করা যায় না। এ কারণে দেহে ক্যালোরি এবং উত্তাপ ক্রমাগত কমতে থাকে। তাই খেজুর দিয়ে ইফতার করলে দেহের ক্যালোরি এবং উত্তাপে ভারসাম্য ফিরে আসে। দেহ নানা প্রকার রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

তাছাড়া যাদের দেহে লো ব্লাড প্রেসার, প্যারালাইসিস, ফ্যাসিয়াল প্যারালাইসিস এবং মাথা ঘোরানোর ব্যাধি রয়েছে, খেজুর দ্বারা ইফতারের ফলে তারা উপকার লাভ করে। খাদ্যে প্রোটিন কমে যাওয়ার কারণে দেহে আয়রনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। খেজুর এ আয়রন শূণ্যতা পূরণ করে। যাদের মাথায় খুশকি আছে, রোযা রাখলে তাদের খুশকি আরো বেড়ে যায়। খেজুর এক্ষেত্রেও উপকারী।[১৮৬]

কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, রোযাদারের জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী। গ্রীষ্মকালের রোযাদার পিপাসায় একটু বেশি কাতর হয়ে পড়ে। সুতরাং ইফতারের সময় প্রথমেই ঠান্ডা পানি পান করলে পাকস্থলীতে গ্যাস ও লিভার ইনফ্ল্যামেশন হওয়ার আশংকা থাকে। তাই খেজুর খাওয়ার পর পানি পান করলে নানা রকম রোগের আশংকা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

কিছুদিন আগেও মনে করা হতো, রোযার একমাত্র উপকারিতা হচ্ছে হজম শক্তিতে আরাম পাওয়া। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা ক্রমে আরো জানতে পেরেছি, রোযা আসলে একটি তিব্বি মুজিযা অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা রোযা রাখার বিষয়ে আলোচনা করার পর আয়াতের শেষ দিকে ইরশাদ করেছেন-

–إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থঃ যদি তোমরা তা বুঝতে পারো।[১৮৭]

---

১৮৬. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২

১৮৭. আল-কুরআন, ২: ১৮৪

# নবম অধ্যায়
## পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও শস্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | রোগ নিরাময়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ফল-মূলের ব্যবহার |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | শারীরিক সুস্থতা লাভে বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | : | হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতি |

## প্রথম পরিচ্ছেদ: হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও শস্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা

স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিচর্যায় ভেষজ উদ্ভিদ তথা ভেষজ ওষুধ ব্যবহারের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন ও ঘটনাবহুল। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সুস্থ থাকার জন্য বহু ধরনের ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। এ ধরনের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় অসংখ্য গাছ-গাছড়া, ফলমূল ও বিভিন্ন পদার্থ। তাই বলা হয়, উদ্ভিদই হচ্ছে মানব সমাজের ঔষধ আহরণের প্রথম সূত্র। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ শতাব্দীতে চীনে ঔষধী গাছ-গাছড়া তালিকার সংকলনের খোঁজ পাওয়া যায় এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে মিসরীয়রা লতাগুল্ম, খনিজ লবণ, জীবজন্তু ও অন্যান্য বস্তু হতে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে ঔষধ বানাতে শিখেছিল। এর পর থেকেই শুরু হয় ঔষধের ক্রমবিকাশ। ডায়সকরিডেস ছিলেন একজন গ্রীক চিকিৎসক। তিনি খ্রিস্টিয়প্রথম শতাব্দীতে আয়ুর্বেদীয়ঔষধীর যে তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন তা প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে চিকিৎসা শাস্ত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে ১২ শতকে আরবরা অতি উন্নত ভেষজ প্রক্রিয়া ও নীতি আবিষ্কার ও প্রণয়নে সক্ষম হয়েছিল  এবং তেতো ঔষধের সাথে গোলাপ জল ও ফলের রস মিশিয়ে তাকে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট করার তৎকালীন আরবীয় প্রক্রিয়ার পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে আজকের সুগার কোটিং। ১৬শ শতকে প্যারাসেলসাস নামক জনৈক গ্রীক চিকিৎসক ও ভেষজবিদ প্রথমবারের মত অভিমত প্রকাশ করেন যে ঔষধ প্রস্তুত করতে ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করতে রাসায়নিক দ্রব্যকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

১৭৮০ সনের দিকে উইলিয়াম উইদারিং ফক্সগ্লোভ গাছের পাতা থেকে ডিজিটালিস আহরণ করেন। এ ডিজিটালিস হৃদরোগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। অত:পর ১৯শ শতকের প্রথমভাগে ভেষজ শাস্ত্র গবেষণা এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ নেয়। আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞান শুরু হয় ১৯০৯ সনে। জার্মান জীবাণু বিশারদ পল এরলিখ সিফিলিসের প্রতিকারের জন্য এ সময় সাফল্যজনকভাবে স্যালভারসন নামক স্ব আবিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহার শুরু করেন। আজকের দিনের ভেষজ বিদ্যার শুরুতে সালফা জাতীয়ঔষধই ছিল প্রধান অস্ত্র ।

প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ নিরাময়ে ভেষজের ক্ষমতা ও উপযোগিতার কথা সবারই জানা আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। আর এজন্যই উদ্ভিদের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করে কিভাবে খুব সহজে রোগ সারানো যায় এবং এ সংক্রান্ত অতীতের হারানো জ্ঞানভাণ্ডার কিভাবে উদ্ধার করা যায় আধুনিক গবেষকরা বর্তমানে তা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সুতরাং ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতিই যেহেতু প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎস এবং প্রায় ৭০ শতাংশ ওষুধই ভেষজ পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়, তাই হাদীসেও বর্ণিত কিছু উদ্ভিদ ও শস্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

### সিনা বা সোনামুখী

সিনা একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সিনা প্রাচীনকালে যে পরিমাণ ব্যবহৃত হতো, বর্তমানে ঠিক সে পরিমাণই ব্যবহার হচ্ছে। এটা আমাদের দেশে 'সোনা পাতা বা সোনামুখী' নামে সুপরিচিত। আরবীতে- সানামাক্কী, ফারসীতে- বার্গে সানা, উর্দুতে- সানা, হিন্দিতেসোনা কা পাত, ইংরেজিতে- Senna/Tinavele Senna বলা হয়। ইউনানী পরিভাষায় এটাকে বার্গে সানা বলা হয়।[১]

**পরিচিতি:** সোনাপাতা ২ থেকে ৩ ফুট উঁচু উদ্ভিদ। পাতার ডাটার দু'দিকে ৭ থেকে ৮ জোড়া পাতা থাকে। পাতা ছোট মেহেদী বা তেতুল পাতার মত ক্রমশ আগার দিকে সরু  এবং ফুল হলুদ বর্ণের হয়। এর ফল চেপ্টা ধরনের।

**প্রাপ্তিস্থান:** সোনাপাতা হিজায অঞ্চলে অধিক পরিমাণে জন্মে থাকে। তবে বাংলাদেশসহ উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও পাওয়া যায়। দুই-আড়াই শত বছর পূর্বে এই উপ-মহাদেশে এর উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানেও তা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে।

**মিযাজ:** ১ম শ্রেণির উষ্ণ ও শুষ্ক।

**বর্ণ:** কাঁচা অবস্থায় হলুদাভাব সবুজ এবং শুকনো হলে হলুদাভাব সোনালী বর্ণ হয়।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, ঢাকা: ইসলামিক  ফাউন্ডেশন, ২০০৮, খ. ১৪, পৃ. ২২৪

**স্বাদ:** তিতা স্বাদযুক্ত।

**গন্ধ:** বন্য গন্ধযুক্ত।

**মাত্রা:** সোনাপাতা ৩ থেকে ৫ গ্রাম পর্যন্ত সেবন করা যায়।

**প্রতিক্রিয়া:** অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনে অন্ত্রনালীর জন্য ক্ষতিকর।

**সংশোধন:** গোলাপ ফুল এবং আনিসুন এর সংশোধক।

**প্রতিনিধি:** সোনাপাতার স্থলে বানর লাঠি ব্যবহার করা যায়।

**বিশেষ ক্রিয়া:** মুছলেহ বা বিরেচক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।[২]

**উপকারিতা**

সিনা বা সোনাপাতা খুবই উপকারী একটি ভেষজ জাতীয় ঔষধ। হাদীসে এটা ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا ذَا كُنْتِتَسْتَمْشِيْنَ قُلْتُ بِالشُّبْرُمِ، قَالَ حَارٌّ حَارٌّ– ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَى فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِيْ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَى– وَ السَّنَى شِفَاءٌ مَنَ الْمَوْتِ–

অর্থ: হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের জুলাব নিয়ে থাকো? আমি বললাম, শিবরমের। তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: এটাতো ভীষণ গরম জিনিস।অত:পরআমি সোনাপাতা দ্বারা জুলাব নিলাম, তখন তিনি (সা.) বললেন: কোনো ঔষধ যদি মৃত্যু থেকে শিফা দিতো, তাহলে সেটা হতো সোনা পাতা। আর সোনাপাতা হলো মৃত্যু থেকে শিফাদানকারী।[৩]

ইউনানী ডাক্তারগণের মতে সোনাপাতা অনেক রোগের প্রতিষেধক। এটা ত্রিমিশ্রণ তথা শ্লেষ্মা (কাশি), পিত্তরস ও পাগলামী নাশক। তাছাড়া সোনাপাতা কোমর ব্যথা, ফ্লুরিসি বা পার্শ্ব ব্যথা, নিউমোনিয়া, উরুর উপরাংশের ব্যথা, গিঁটবাত, মস্তিষ্ক পরিষ্কারকারী এবং পালা জ্বরে ব্যবহৃত হয়। সোনাপাতা ব্যবহার পূর্ণ মাথা ব্যথা, মাথার এক পার্শ্বের ব্যথা এবং মৃগী রোগীর জন্য খুবই উপকারী। সোনাপাতা ব্যবহারে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

উল্লেখ্য, সোনাপাতা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ প্রকারগুলো হলো- সিনায়ে মাক্কী বা হেজাজী, সিনায়ে রোমী, সিনায়ে মিসরী, সিনায়ে আসকারী এবং সিনায়ে হিন্দী। সিনার আরও একটি প্রকার আছে, যা সর্বত্র পাওয়া যায়। এটি রক্ত পরিষ্কার করে, কোনী নূখা ও শ্বাস কষ্ট নিরাময়ে বিশেষ উপকারী এবং ক্রিমিনাশক। সোনা পাতা চোখের পর্দা কাটে এবং শুল বেদনা দূর করে। পরিমিত মাত্রায় ৩ মাস সেবনে গিঁটেবাত ভালো হয়ে যায়।[৪] সোনাপাতা কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগের চিকিৎসায় খুবই কার্যকরী। পাকস্থলির প্রদাহজনিত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এটা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন।[৫]

**শিবরম**

শিবরম এক প্রকার মিষ্টি ধরনের চারাগাছ যা বাঁশের কঞ্চির মত সোজা ও চিকন গিরাযুক্ত হয়ে থাকে। এর চারা গাছের উচ্চতা প্রায় এক হাত পরিমাণ হয়। এ গাছের গায়ে এক প্রকার পশম বা লোম বিশেষ থাকে যা উঠিয়ে ফেললে ভেতর থেকে চিকন সূতার মতো তন্তু বেরিয়ে আসে। এর রং সবজু-লাল অথবা সাদাটে হলুদ বর্ণের এবং ফুল নীল রংগের হয়ে থাকে। স্বাদ তিক্ত এবং স্বভাব গরম ও রুক্ষ। তবে এটা চতুর্থ পর্যায়ের গরম ও রুক্ষ ঔষধ। এটা শরীরের যেকোন দূষিত পদার্থ প্রস্রাবের সাথে বের করে দেয়। সিদ্ধ করেও এর পানি পান করা যায়। পেটের কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করতে খুবই উপকারী। তবে এর চেয়ে সিনা তথা সোনাপাতা অধিকতর উপকারী এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত।[৬]

---

২. হাকীম আবদুর রব খান, *ইউনানী মেটিরিয়া মেডিকা*, ঢাকা: কাঁঠালবাগান, গ্রীণরোড, বিসিরাম প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭

৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মাআরিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জুলাব ব্যবহার, খ. ৪, পৃ. ১০০, হাদীস নং- ৩৪৬১

৪. প্রিন্সিপাল হাফেজ নযর আহমদ, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান), *তিব্বে নববী*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, মার্চ ২০০২ (চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ৮৮

৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২৫

৬. প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২২

কোনো কোনো প্রকারের শিবরম অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে থাকে, যা জীবন সংহারক বিষের চেয়ে কম নয়। এ ঔষধটি কফ এবং পাগলামীকে দাস্তের মাধ্যমে নিরাময় করে। শিবরমের তীব্র ও খারাপ প্রতিক্রিয়া এবং বিষাক্ততার কারণে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত এটা ব্যবহার করা আদৌ ঠিক নয়। এ ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর ইরশাদ লক্ষ্যণীয়– عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَسْتَمْشِيْنَ قَالَتْ بِالشِّبْرَمِ قَالَ حَارٌّ حَارٌّ

অর্থ: আসমা বিনত উমাইস (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জোলাবের জন্য কী ব্যবহার কর? তিনি বললেন: শিবরম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: হাররুন! হাররুন! তথা এটা গরম এটা গরম।[৭] এই শব্দটি حَارٌّ حَارٌّ পড়া যায় অর্থাৎ খুব গরম এবং حَارٌّ جَارٌّ পড়া যায় অর্থাৎ গরম এবং অধিক দাস্ত সৃষ্টিকারী। তাই নবী করীম (সা.) জোলাবের জন্য শিবরম-এর পরিবর্তে কালো জিরার ব্যবহারকে প্রধান্য দিয়েছেন।[৮]

**মুসাব্বর বা ঘৃতকুমারী**

স্বাস্থ্য রক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধনে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার সেই প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। আয়ুর্বেদ বা ইউনানীতে ভেষজ উদ্ভিদের কোন বিকল্প নেই। আমাদের খুব পরিচিত মুসাব্বর বা ঘৃতকুমারী এমনই একটি গুণী উদ্ভিদ। রাস্তার পাশে প্রায়ই কিছু লোককে ঘৃতকুমারী পাতা বিক্রি করতে দেখা যায়। গরমের সময় ঘৃতকুমারীর শরবতও বেশ বিক্রি হয়। ঘৃতকুমারীকে আরবীতে- মুসাব্বর, ফারসীতে- ছেব্‌র, উর্দুতে- ঘিকোয়ার, হিন্দিতে- ঘিউকুমারী এবং ইংরেজীতে- Aloe Vera বলা হয়।

মুসাব্বর বা ঘৃতকুমারী লিলিজাতীয় গাছ।এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Aloe Vera। এটি Asphdelaceae (Aloe Family) পরিবারের উদ্ভিদ। সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৫০ ধরনের ঘৃতকুমারী গাছ পাওয়া যায়। কথিত আছে, ঘৃতকুমারীর অ্যালোভেরা নামটি এসেছে সৌন্দর্যবর্ধনের দেবীর লাতিন নাম অ্যালোভেরা থেকে। সুদূর অতীতেও ঘৃতকুমারীর ব্যবহারের বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। রানী ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্যের মূল রহস্য নাকি ছিল এই অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী। সম্রাট আলেকজান্ডার, বাদশাহ সোলায়মান, নেপোলিয়ন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও মহাত্মা গান্ধী ঘৃতকুমারী ব্যবহার এবং নিয়মিত এর রস পান করতেন বলে জানা যায়।

**পরিচিতি:** ঘৃতকুমারী একটি বহুজীবি ভেষজ উদ্ভিদ। দেখতে ফণিমনসা ক্যাকটাসের মতো হলেও এটা ক্যাকটাস নয়। আরো ভাল করে বললে, ঘৃতকুমারী দেখতে অনেকটা আনারসের গাছের মতো। পাতাগুলো চওড়া, পুরু ও গাঢ় সবুজ। নিচের দিকটা আংশিক বৃত্তাকার এবং এটি একটি কাণ্ডবিহীন উদ্ভিদ। পাতার ভেতরের মাংসল শাঁস পিচ্ছিল লালার মত উৎকট গন্ধযুক্ত ও তিতা স্বাদের। ঘৃতকুমারী গাছ গড়ে ৬০-১০০ সেন্টিমিটার উঁচু এবং পাতা ১০-২০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এর হলুদ বর্ণের যে আঠালো নির্যাস বের হয় তা শুকিয়ে মুসাব্বর তৈরি করা হয়। পুষ্পদন্ড লম্বা লাঠির ন্যায় সরু মাথায় লেবু বর্ণের ফুল হয়। শীতের শেষে ঘৃতকুমারীর ফুল ও ফল হয়। ঘৃতকুমারীর ডাটা, ছাল এবং পাতার মাংসল পিচ্ছিল অংশ ও শুষ্ক রস এর সবই ব্যবহার হয়।[৯]

**প্রাপ্তিস্থান:** ঘৃতকুমারী বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। এছাড়া ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মে। ঘৃতকুমারীর আদি বাস উত্তর আফ্রিকা এবং কেনারিদিপুঞ্জে। ক্যারলিনিয়াস সর্বপ্রথম অ্যালোভেরার নামকরণ করেন।

**মিযাজ:** ঘৃতকুমারী ২য় শ্রেণির উষ্ণ ও শুষ্ক।

**বর্ণ:** গাছ সবুজ এবং শুকনো লালা হলুদ ও কাল বর্ণের হয়।

**স্বাদ:** অত্যন্ত তিতা স্বাদযুক্ত।

**গন্ধ:** অত্যন্ত উগ্র গন্ধযুক্ত।

**মাত্রা:** ১ থেকে ৭ গ্রাম পর্যন্ত সেবন করা যায়।

---

৭. আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, মিশর, কায়রো, দারুল হারামাইন, ১৯৯৭ (প্রথম প্রকাশ), অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং- ৭৫১৮

৮. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

৯. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-২৮৬

**প্রতিক্রিয়া:** অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারে পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীর জন্য ক্ষতিকর।
**সংশোধন:** ঘৃতকুমারী কাতিরা, গোলাপ ও মসতগী এর সংশোধক।
**বিশেষ ক্রিয়া:** ঘৃতকুমারী কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও মেদরোগে বিশেষ উপকারী।[১০]

ঘৃতকুমারীর পাতার মধ্যে যে স্বচ্ছ জেলির মত বস্তু পাওয়া যায়, তাকে আমরা জেল বলে জানি। পাতার ঠিক নিচেই থাকে হলুদ রং-এর ল্যাটিস এবং এর নিচেই এই জেল পাওয়া যায়। বহুগুণে গুণান্বিত এই উদ্ভিদের ভেষজ গুণের শেষ নেই। ঘৃতকুমারী নানা ধরনের ভিটামিন ও খনিজের এক সমৃদ্ধ উৎস। ভিটামিন-এ, সি, ই, ফলিক অ্যাসিড, কোলিন বি-১, বি-২, বি-৩, (নিয়াসিন) ও ভিটামিন বি-৬ এর দারুণ উৎস এটা। অল্প সংখ্যক উদ্ভিদের মধ্যে ঘৃতকুমারী একটি, যাতে ভিটামিন বি-১২ আছে। প্রায় ২০ ধরনের খনিজ আছে ঘৃতকুমারীতে। এর মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেমিয়াম, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়ম, সোডিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম, কপার, ম্যাংগ্যানিজ, ফলিক্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদি।[১১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেও যে মুসাব্বর বা ঘৃতকুমারী ব্যবহার হতো, তা নিম্নোক্ত হাদীসে পাওয়া যায়-

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ تُوَفِّى اَبُوْ سَلَمَةَ وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبْرًا- فَقَالَ مَا ذَا يَا اُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ اِنَّهُ هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ- قَالَ اِنَّهُ يَشَبُّ وَجْهَهُ-

অর্থ: হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালমার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাশরীফ আনলেন। এ সময় আমার মুখে মুসাব্বর লাগিয়ে রেখেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সালমা এগুলো কী? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো হলো মুসাব্বর, এর মধ্যে কোনো সুগন্ধি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: এটা চেহারাকে পরিষ্কার ও সজীব করে।[১২]

**ঘৃতকুমারীর উপকারিতা**

**১. সুস্থ হার্ট:** হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে ঘৃতকুমারীর জুস খুবই উপকারী। কেননা ঘৃতকুমারী কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এটি ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণ করে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে এবং রক্তে অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। দূষিত রক্ত দেহ থেকে বের করে রক্ত কণিকা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ফলে হৃদযন্ত্র দীর্ঘদিন সুস্থ থাকে।

**২. ওযন হ্রাস:** ওযন কমাতে ঘৃতকুমারীর জুশ বেশ কার্যকরী। ক্রনিক প্রদাহের কারণে শরীরে মেদ জমে। ঘৃতকুমারীর জুসের অ্যান্টি ইনফ্লামেনটরী উপাদান এই প্রদাহ রোধ করে ওযন হ্রাস করে থাকে। পুষ্টিবিদগণ এসকল কারণে ডায়েট লিস্টে ঘৃতকুমারীর জুস রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[১৩]

**৩. অ্যালক্যালাইন সমৃদ্ধ:** সুস্বাস্থ্যের জন্য খাবার-দাবারে অ্যালক্যালাইন ও অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাদ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ৮০/২০ বা ৮০ ভাগ অ্যালক্যালাইন সমৃদ্ধ খাবার ও ২০ ভাগ অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন পুষ্টিবিদেরা। ঘৃতকুমারী এমন খাবার যা অ্যালক্যালাইন তৈরি করে। কিন্তু আজকাল নগর জীবণে আমাদের খাদ্যাভাস এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে প্রায়শই অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগতে হয়। ফলে অতিরিক্ত অ্যাসিডের ভোগান্তি থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মাঝে ঘৃতকুমারী খাওয়া প্রয়োজন।

**৪. অ্যামাইনো ও ফ্যাটি অ্যাসিড-এর উৎস:** মানব দেহের নানা প্রয়োজনীয় প্রোটিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইনো অ্যাসিড। এমন ২২টি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে ৮টি অত্যাবশ্যক। ঘৃতকুমারীতে শরীরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই ৮টি অমাইনো অ্যাসিডই বিদ্যমান। আর এতে মোট অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে ১৮ থেকে ২০ ধরনের। এছাড়া নানা ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিডেরও দারুণ উৎস এই ঘৃতকুমারী।

---

১০. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬
১১.*https://bn.m.wikipedia..org/wiki.*ঘৃতকুমারী(থেকে উদ্ধৃত)
১২. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১৩.মোহাম্মদ নূর আলম গন্ধী, *https://www.jugantor.com/lifestyle.*ঘৃতকুমারীর ঔষধিগুণ, ১২.১০.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)

**৫. দাঁত ও মাড়ির উপকার সাধন:** ঘৃতকুমারীর জুস দাঁত ও মাড়ির ব্যথা উপশম করে। দাঁতে কোন ইনফেকশন থাকলে তাও দূর করে দেয়। নিয়মিত ঘৃতকুমারীর জুস খাওয়ার ফলে দাঁত ক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**৬. প্রদাহ ও ব্যথা প্রতিরোধ:** শরীরের নানা ধরনের প্রদাহ দূর করতে খুবই কার্যকর ঘৃতকুমারী। এতে বি-সিসটারোল সহ এমন ১২টি উপাদান আছে যা প্রদাহ তৈরি হওয়া ঠেকায় এবং প্রদাহ হয়ে গেলে তা কমিয়ে আনে। এছাড়া ঘৃতকুমারী মাংসপেশীর ব্যথা কমাতে সাহায্য করে এবং হাত-পায়ের জয়েন্টের ব্যথার স্থানে ঘৃতকুমারীর জেলের ক্রিম লাগালে ব্যথা কমে যায়।[১৪]

**৭. হজমশক্তি বৃদ্ধি:** হজমের সমস্যা থেকেই শরীরে অনেক রোগ বাসা বাঁধে। তাই সুস্বাস্থ্যের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে খাবার-দাবার পরিপাক বা হজমের প্রক্রিয়াটি ঠিকঠাক রাখা। পরিপাক যন্ত্রকে পরিষ্কার করে হজম শক্তি বাড়াতে ঘৃতকুমারী অত্যন্ত কার্যকর। এটি অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে এবং অন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া রোধ করে, যা হজমশক্তি বাড়িয়ে থাকে। ঘৃতকুমারী ডায়রিয়ার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করে।

**৮. ডায়াবেটিস প্রতিরোধ:** ঘৃতকুমারী জুস রক্তে সুগারের পরিমাণ ঠিক রাখে এবং দেহে রক্ত সঞ্চালন বজায় রাখে। ডায়াবেটিসের শুরুর দিকে নিয়মিত এর জুস পান করতে পারলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**৯. ত্বকের যত্ন:** ত্বকের যত্নে ঘৃতকুমারীর ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘৃতকুমারীর অ্যান্টি ইনফ্লামেনটরী উপাদান ত্বকের ইনফেকশন দূর করে ব্রণ হওয়ার প্রবণতা কমিয়ে দেয়।

**১০. চাপ ও রোগ প্রতিরোধ:** ঘৃতকুমারী দারুণ অ্যাডাপ্টোজেন। শরীরের প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে বাহ্যিক নানা চাপ ও রোগ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী উপাদানকে অ্যাডাপ্টোজেন বলা হয়ে থাকে। ঘৃতকুমারী দেহের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতির সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করে তোলে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। শারীরিক ও মানসিক চাপ মোকাবেলার পাশাপাশি পরিবেশগত দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকে সুরক্ষা দিতে পারে ঘৃতকুমারী। এছাড়া ঘৃতকুমারী হল অ্যান্টি মাইকোবিয়াল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান সমৃদ্ধ একটি গাছ। নিয়মিত এর জুস পান করলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দেহের টক্সিন উপাদান দূর করে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

**১১. মুখের দুরগন্ধ ও ঘা নিরাময়:** ঘৃতকুমারীতে আছে ভিটামিন-সি, যা মুখের জীবাণু দূর করে মাড়ি ফোলা, মাড়ি থেকে রক্ত পড়াব ন্ধ করে এবং মুখের ঘা দূর করতেও অত্যন্ত উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, ঘৃতকুমারীর জেল মাউথ ওয়াশ-এর বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এবং ঘা-এর জায়গায় এর জেল লাগিয়ে দিলে মুখের ঘা ভাল হয়।

**১২. ক্যান্সার প্রতিরোধ:** ঘৃতকুমারীতে রয়েছে অ্যালো ইমোডিন, যা স্তন ক্যান্সার ছড়ানো থেকে রোধ করে। এছাড়াও অন্যান্য ক্যান্সার প্রতিরোধে ঘৃতকুমারী অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।

**১৩. রক্তচাপ কমানো:** ঘৃতকুমারীর অনেক গুনাগুনের মধ্যে আরেকটি হল রক্তচাপ কমাতে এর কোন তুলনা নেই। এর ঔষধি গুণ রক্তচাপ কমায় এবং রক্তে কোলেস্টেরল ও চিনির মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে সাহায্য করে।

**১৪. ক্ষতিকারক পদার্থ অপসারণ:** ঘৃতকুমারীর রস খুবই আঠালো। এমন উদ্ভিদের আঠালো রস খাদ্যনালী দিয়ে দেহের ভেতরে প্রবেশের সময় পুরো পরিপাকতন্ত্রকে পরিষ্কার করতে করতে যায়। এই রস দেহের অভ্যন্তরীণ নানা টক্সিন বা দূষিত উপাদান শুষে নিয়ে মলাশয় দিয়ে বের হয়ে যায়। ফলে দেহকে ভেতর থেকে দূষণ মুক্ত করতে ঘৃতকুমারীর তুলনা নেই। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষতিকর পদার্থ দেহের মধ্যে প্রবেশ করে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। ঘৃতকুমারীর রস পান করলে এসকল ক্ষতিকর পদার্থ দেহে প্রবেশ করতে পারে না। আর প্রবেশ করলেও তা শরীর থেকে অপসারণ হতে সাহায্য করে।

**১৫. কোষ্ঠ্য-কাঠিন্য নিরাময়:** ঘৃতকুমারী জেলে প্রায় ২০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা ইনফ্লামেশন এবং ব্যাকটেরিয়া রোধ করে বদ হজম এবং বুক জ্বালাপোড়া দূর করে। ঘৃতকুমারীর জুস পান করার দারুণ ব্যাপার হলো এটা কোষ্ঠ্য-কাঠিন্য ও ডায়ারিয়া দুই ক্ষেত্রেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পরিপাক ও রেচন যন্ত্রকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া

---

১৪. আফতাব চৌধুরি, *https://m.dailyinqilab.com.*ঘৃতকুমারীর উপকারিতা,২৩.০৩.২০১৬ (থেকে উদ্ধৃত)

মুক্ত রাখে বলে ঘৃতকুমারীর রস পান করলে পেটে ক্রিমি হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না কিংবা ক্রিমি থাকলেও তা দূর হয়ে যায়।

**১৬. ত্বক ও চুলের মহৌষধ:** আধুনিক প্রসাধনী সামগ্রীর অন্যতম কাঁচামাল হল ঘৃতকুমারী। ত্বক ও চুলের জন্য এটা দারুণ উপকারী। এটা ত্বকের নানা ক্ষত সারিয়ে তুলতে কার্যকরী। রোদে পোড়া, ত্বকে ফুসকুড়ি পড়া ও পোকার কামড়ের মতো বাহ্যিক সমস্যাগুলো সারিয়ে তুলতে সহায়ক এটা। এমন বাহ্যিক ক্ষতে ঘৃতকুমারীর রস মাখলেও ব্যথার উপশম হবে। কেননা বেদনানাশক হিসেবেও এটা অতুলনীয়। চুল পরিষ্কার ও খুশকি দূর করতে, চুলে পুষ্টি জোগাতে এবং চুল ঝলমলে রাখতে ঘৃতকুমারীর রসের জুড়ি নেই।[১৫]

কথিত আছে, খ্রিস্টপূর্ব চারশত বছর পূর্ব হতে ইউনানী চিকিৎসকগণ ঘৃতকুমারী ব্যবহার করে আসছে। ঘৃতকুমারীর নানা গুণের কথা ৫হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এ অঞ্চলের মানুষ জানে।[১৬]

**সরফজাল বা বিহিদানা**

বিহিদানাকে আরবীতে- হাব্বুস সরফজাল, ফারসীতে- তোখমে সরফজাল, উর্দুতে-তোখমে বিহি, হিন্দিতে- বিহিদানা এবং ইংরেজিতে- Quince seed বলা হয়।

**পরিচিতি:** বিহিদানা বড় গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতায় ঢাকা বহু বক্রাকার শাখা-প্রশাখা যুক্ত। গাছের ছাল কাল। পাতার কিনারাগুলো অসমান, তবে কাটা এবং বৃন্ত ছোট। ফুল সাদা বর্ণের ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট এবং করাতের ন্যায় কাটা। বড় ফল দেখতে আপেলের মত এবং গায়ে সরু লোম যুক্ত। ফলের ভেতরে ৫টি বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক ভাগে অনেকগুলো বীজ থাকে। মার্চ ও এপ্রিল ফুল হয়, অত:পর ফল হয়। মাজখানের গ্রন্থকারের মতে বিহিদানা ৩প্রকার। বিহিদানা বীজ ব্যবহার হয়।

**প্রাপ্তিস্থান:** বিহিদানার আদি জন্মস্থান ইউরোপ এবং আমেরিকা। সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিহিদানা চাষ হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে বিহিদানা চাষ হয়। পারস্য সাগরের বন্দর হতে বিহিদানা ভারতবর্ষে আনা হয়।

**মিযাজ:** বিহিদানা ২য় শ্রেণির শীতল ও আর্দ্র।

**বর্ণ:** লাল মিশ্রিত কাল বর্ণের।

**স্বাদ:** আঠালো এবং অম্ল স্বাদযুক্ত।

**মাত্রা:** ৩ থেকে ৮ গ্রাম এবং লোয়াব **১২**গ্রাম।

**প্রতিক্রিয়া:** অতিরিক্ত মাত্রায় বিহিদানা সেবনে পাকস্থলীর শীতল ভাব হয় এবং শরীর দুর্বল হয়।

**সংশোধন:** উষ্ণ প্রকৃতির দ্রব্য এর সংশোধক।

**বিশেষ ক্রিয়া:** কিডনী রোগ ও শুক্রতারল্যে বিহিদানা বিশেষ উপকারী।[১৭]

বিহিদানা উপকার সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। হযরত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِيَدِه سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ دُوْنَكَهَا يَا طَلْحَةُ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ–

অর্থ: আমি একবার নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হই। এ সময় নবী করীম (সা.)-এর হাতে একটি বিহিদানা ছিল। নবী করীম (সা.) আমাকে দানাটি দেখিয়ে ইরশাদ করলেন: হে তালহা! এটা নিয়ে নাও, নি:সন্দেহে এটা চিত্ত সতেজকারী।[১৮] এ হাদীসটিই অন্য সনদে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-

فَإِنَّهَا تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تَطِيْبُ النَّفْسَ وَ تَذْهَبُ بِطْخَاءَ الصَّدْرِ–

১৫. *https://www.prothomalo.com/life.*ঘৃতকুমারীর যত গুণ, আপডেট: ১৩.০৭.২০১৫ (থেকে উদ্ধৃত)

১৬. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

১৮. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, লেবানন: বৈরুত, মাকতাবাতু আল-মানারুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ৩২০

অর্থ: নিশ্চয় এটা (বিহিদানা) ক্বলবের শক্তি বৃদ্ধি করে, মন প্রশান্ত করে এবং দম বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাসকষ্ট দূর হয়।অন্য এক বর্ণনায় আছে–وَ يَجْلُوا الْفُؤَادَ অর্থ: এটা মনকে স্বচ্ছ করে। এছাড়াও এ বিষয়ে হাদীসে অনেক উপকারিতার কথা বলা হয়েছে।[১৯]

**উপকারিতা:** বিহিদানা দেহের ও অন্ত্রের সৃষ্টি কারক, ধারক এবং উষ্ণতা নিবারক। উষ্ণ জ্বর, যক্ষ্মা, সর্দিকাশ, মুখের জ্বালা-পোড়া ও উষ্ণ জনিত কাশিতে উপকারী। বিহিদানা দগ্ধস্থানে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয়। বিহিদানা পানিতে ভিজিয়ে পরের দিন কাপড়ে ছেকে মিশ্রিসহ সেবনে বালক ও বৃদ্ধদের উদরাময় রোগে অতি তাড়াতাড়ি কাজ হয় (Surgen G.F. Ponder)। মূত্রাশয়ের পীড়া এবং শুক্রতারল্যে বিহিদানা বিশেষ কার্যকরী (Surgen Major Roob)।[২০]

বিহিদানা বহুল পরিচিত এবং টকমিষ্টি জাতীয় একটি ফল। বিহিদানা দ্বারা শরবত ও মোরব্বা তৈরি করা হয়। এটা দেহের শক্তি বর্ধক ও চিত্তের প্রশান্তি ও আনন্দদায়ক। পেট, যকৃৎ, হৃদকম্পন ও মানসিক দুর্বলতায় খুবই উপকারী ও আরামদায়ক। এটা দম বন্ধ হয়ে যাওয়া ও শ্বাসকষ্ট রোগ দূর করে।[২১]

### কুসত (قسط) বা ঊদে হিন্দ

ইংরেজি wood শব্দটি এসেছে আরবী 'ঊদ' শব্দ থেকে, যার অর্থ কাঠ। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত 'ঊদে হিন্দ' অর্থ হল, হিন্দুস্থানের কাঠ। এ কাঠ তৎকালে শুধু ভারতে জন্মাতো বলে আরবগণ একে 'ঊদে হিন্দ' নামকরণ করেন। ইউনানী শাস্ত্র মতে এর নাম কুসতে হিন্দী বা কুসতে শীরীন। আমাদের কাছে যা চন্দন গাছ নামে পরিচিত। এটাকে আগর কাঠও বলা হয়।

চন্দন একটি খুবই সুগন্ধিময় গাছ হলেও এতে হাজারো ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। আর এজন্যই প্রাচীন ভারতে চন্দনকে পূণ্য অর্জনের উপকরণ হিসেবে সম্মান করা হতো এবং সেকালে কপালে চন্দনের ফোঁটা ছাড়া পূজাই শুদ্ধ হতো না। রূপ চর্চার জন্য চন্দনের খ্যাতি যুগ যুগ ধরে। আকর্ষণীয় নজরকাড়া ত্বকের জন্য নিয়মিত চন্দন ব্যবহারের জুড়ি নেই। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকায় ব্রণ ও ত্বকের নানাবিধ সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। বর্তমান সময়েও বিভিন্ন রকম কসমেটিক্স ও সুগন্ধীতে ব্যবহারের জন্য চন্দন কাঠ ব্যাপক সমাদৃত। সংস্কৃতিতে একে 'অনিন্দিতা' বলা হয়। এটা অনেক মূল্যবান কাঠ। এক কেজি উপযোগী কালো চন্দন কাঠের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) একে ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন, তোমরা এই ঊদে হিন্দ ব্যবহার করবে। কেননা, এতে ৭ প্রকার রোগের চিকিৎসা রয়েছে। শিশুদের আলজিহ্বা ফুলে ব্যথা হলে তা পিষে পানির সাথে মিশিয়ে ফোঁটা ফোঁটা আকারে নাকের ছিদ্রে দেবে। নিউমোনিয়া হলে পিষে পানি সহযোগে পান করাবে।[২২]
হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىْ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ يُسْتَعطُّ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ يُلَدَّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ–

অর্থ: উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি: তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা এর মধ্যে সাত ধরনের চিকিৎসা (নিরাময়) রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্য তা সেবন করা যায়।[২৩]
অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

---

১৯. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৭,
২০. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২,২১৩
২১. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২৫
২২. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২৩
২৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮,অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ভারতীয় ও সামুদ্রিক এলাকার চন্দন কাঠের ধোঁয়ার সাহায্যে নাকে ঔষধ টেনে নেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬১৮,হাদীস নং- ৫৬৯২

عَنْ اَنَسٍ ...قَالَ النَّبِىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اَمْثَلَ مَا تَدَايْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ وَ الْقُسْطُ الْبَحْرِىُّ وَ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। ... নবী (সা.) বলেন: তোমরা যে সকল জিনিসের দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল শিংগা লাগানো এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ ব্যবহার করা। তিনি আরো ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের শিশুদের জিহবা, তালু টিপে কষ্ট দিও না। বরং তোমরা চন্দন কাঠ (ধোঁয়া) ব্যবহার করাও।[২৪]

عَنْ اُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِاِبْنٍ لِىْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلٰى مَا تَدْغَرْنَ اَوْلٰدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ، عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىِّ، فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ– مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَ يَلُدُّهُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ–

অর্থ: উম্মে কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্র সন্তানকে নিয়ে নবী (সা.)-এর নিকট গেলাম। ছেলেটির আলাজিহ্বা ফোলার কারণে আমি তা দাবিয়ে দিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন: এ ধরণের রোগ-ব্যাধির দমনে তোমরা নিজেদের সন্তানদের কেন কষ্ট দিয়ে থাক। তোমরা ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার কর। কেননা, তাতে সাত রকমের নিরাময় বিদ্যমান। তন্মধ্যে আছে পাজরের ব্যথা। আলাজিহ্বা ফোলার কারণে এটির ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়। পাজরের ব্যথার রোগীকে তা সেবন করানো যায়।[২৫]

হযরত ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) কর্তৃক একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে-
একদা নবী কারীম (সা.) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান। এ সময় হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট একটি শিশু ছিল। সে নিউমোনিয়ায় খুবই কাতর ছিল। নবী করীম (সা.) তাকে কুসতে হিন্দী নামক ঔষধ ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। হযরত আয়িশা (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর পরামর্শানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করায় শিশুটি আরোগ্য লাভ করে।[২৬] হযরত যায়েদ ইবন আরকাম (রা.) বলেন-

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِىِّ وَالزَّيْتِ–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে কুসতে বাহরী এবং জায়তুন তেল দ্বারা নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৭] অন্য এক হাদীসে যায়েদ ইবন আরকাম (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে তিনি كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَ الْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْا–

অর্থ: নিউমোনিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসেবে যায়তুন ও ওয়ারসের খুব প্রশংসা করতেন।[২৮]

এই ঊদে হিন্দ বা কুসত দুই ধরনের রয়েছে। একটি হলো কুসতে বাহরী বা সাদা কুসত এবং অন্যটি হলো কুসতে হিন্দী বা কালো কুসত (কুসতে আসওয়াদ)। স্বাদের দিক থেকেও কুসত দুই প্রকার। একটা হলো কুসতে হালুয়ে বা মিষ্টি কুসত। অন্যটি হল কুসতে মুররা বা তিক্ত কুসত। মূলত কুসতের স্বাদ যে শুধু তিক্ত বা মিষ্ট তা নয়; বরং এর প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

তিক্ত বা কালো কুসত দিয়ে তৈরি হয় বিরল ও মহামূল্যবান সুগন্ধি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর মাধ্যমে বানানো ঔষধ শুধু বাহ্যিক প্রয়োগ তথা প্রলেপ, মালিশ ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিক্ত কাঠে তৈরিকৃত ঔষধ পাকস্থলীর বায়ু ও ওয়ারাম বা ফোলা ব্যাধি নিরাময় করে। তাছাড়া শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী করে এবং খিঁচুনী (পেশী সংকোচন) রোগ দূর করে। হাঁপানী, এজমা, নিউমোনিয়া শ্লেষ্মা (কফ) রোগের জন্যও বিশেষ উপকারী।মিষ্টি কুসত বা চন্দন কাঠের শিকড় সুঘ্রাণযুক্ত হয়। এটা শরীরের অঙ্গসমূহ তথা হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, যকৃৎ,

২৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রোগ নিরাময়ের জন্য শিংগা লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৬১৯, হাদীস নং- ৫৬৯৬
২৫. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রোগীর মুখের ভেতর ঔষধ ঢেলে দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬২২, হাদীস নং- ৫৭১৩
২৬. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং- ৭৫৩৩
২৭. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং- ৭৫২০
২৮. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৪, হাদীস নং- ৭৫২১

অন্ডকোষ ইত্যাদির জন্য শক্তিবর্ধক। এছাড়া রঅন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও শক্তিশালী করে। মস্তিষ্ক জনিত রোগ, প্যারালাইসিস মুখের অর্ধাঙ্গ ও কম্পন রোগের জন্যও বিশেষ উপকারী।

নিম্নে কুসত বা চন্দন কাঠের আরো কিছু উপকারিতা উপস্থাপন করা হলো-

**১. উচ্চ রক্তচাপ উপশম:** উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে সাদা চন্দন কাঠের ১ চা চামচ গুঁড়া আধা কাপ দুধের সাথে মিশিয়ে খালি পেটে পান করার পর ৭-৮টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তচাপ কমে যাবে। এছাড়া নিয়মিত ২ থেকে ৩ মাস খেলে ব্রঙ্কাইটিস রোগেও উপকার পাওয়া যায়।

**২. ঘামাচি দূর:** ঘাম ও ঘামাচি দূর করতে চন্দন কাঠ অতুলনীয়। চন্দনের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া ও কর্পূরসহ একত্রে মিশিয়ে শরীরে মাখলে ঘামাচি দূর হবে। এ ছাড়া চন্দনের বেনামূল ও কর্পূর মিশিয়ে মাখলে অতিরিক্ত ঘাম হবে না।

**৩. চর্মরোগ নিরাময়:** যেকোন চর্মরোগ, হাত ও চামড়ার চুলকানিতে চন্দন কাঠের গুঁড়া পেস্ট বানিয়ে ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ব্রণ ও মুখের দাগ দূর করতে চন্দনের গুঁড়া যে কোনো ফেস প্যাকের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে জাদুকরী ফল পাওয়া যায়।

**৪. ডার্ক সার্কেল দূর:** যদি কারো ডার্ক সার্কেল থাকে তাহলে অল্প পরিমাণ চন্দনের গুঁড়ার সাথে গোলাপ জল মিশিয়ে চোখের চারপাশে লাগিয়ে সারা রাত রেখে সকালে ধুয়ে ফেলুন। এক সপ্তাহের মধ্যে চোখের চারপাশের কালো দাগ দূর হয়ে যাবে।

**৫. অন্যান্য রোগের চিকিৎসা:** গনোরিয়ার চিকিৎসায় চন্দন কাঠের তেল ব্যবহারে অনেক উপকার পাওয়া যায়। দুধের সাথে মিলিয়ে চন্দন কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করলে অনেক দিনের পুরনো কফ, মূত্রথলির প্রদাহ নিরাময় হয়। এছাড়া চন্দন কাঠের গুঁড়া পানির সাথে মিশিয়ে পেস্ট করে মাথা প্রলেপ দিলে মাথা ব্যথা সেরে যায়।

**মাশরুম**

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণে দুনিয়ায় অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এরকম অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানব দেহের জন্য খুবই উপকারী ও ঔষধি গুণে ভরপুর একটি উদ্ভিদ হলো মাশরুম। মাশরুম মোটামুটি সবার কাছেই একটি পরিচিত নাম। এটি এক প্রকার মৃতজীবি ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ, যা Basidiomycetes বা Ascomycetes শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত এবং এটি স্যাঁতসেঁতে মাটিতে উদগত হয়।আমাদের চারপাশের আঞ্চলিক ভাষায় পরিচিত ব্যাঙের ছাতা আর মাশরুম এক জিনিস নয়।[২৯] বিশ্বের প্রায় চিহ্নিত ৩ লক্ষ প্রজাতির ছত্রাকের মধ্য হতে বৈজ্ঞানিকভাবে দীর্ঘ যাচাই-বাছাই করে যে সমস্ত ছত্রাক মানুষের খাওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী, নিরাপদ, পুষ্টিকর ও সুস্বাস্থ্য, যা বিশ্বের সর্বাধুনিক পদ্ধতি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন বীজ দ্বারা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিজ্ঞান সম্মত অর্গানিক উপায়ে সযত্নে চাষ করা হয়, এমন ছত্রাকের ফলন্ত অংশই হচ্ছে মাশরুম।

খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ মাশরুম অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ একটি খাবার। মাশরুমের পুষ্টিমান তুলনামূলকভাবে অত্যধিক এবং এর প্রোটিন অতি উন্নতমানের এবং মানব দেহের জন্য অতিশয় উপকারী। একটি পরিপূর্ণ প্রোটিনের পূর্বশর্ত হিসেবে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় যে ৯টি অ্যাসিডের উপস্থিতি থাকার কথা মাশরুমে অতীব প্রয়োজনীয় এ ৯টি অ্যামাইনো অ্যাসিডই বিদ্যমান রয়েছে। অন্যান্য প্রাণিজ আমিষ যেমন- মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমাদের নিকট নামি-দামি খাবার হলেও এতে চর্বি সম্পৃক্ত থাকায় অতিমাত্রায় গ্রহণ করলে শরীরে কোলেস্টেরাল বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন সমস্যা যেমন মেদ-ভুঁড়ি বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রভৃতি জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাশরুমের প্রোটিনে ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অতিস্বল্প এবং কোলেস্টোরাল ভাঙার উপাদান লোভস্ট্রাটিন, অ্যান্টাডেনিন, ইরিটাডেনিন ও নায়াসিন থাকায় শরীরে কোলেস্টোরাল জমতে পারে না; বরং মাশরুম খেলে শরীরে বহু দিনের জমানো কোলেস্টোরাল ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণমাশরুম কোলেস্টোরাল শূন্য এবং এতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও খুবই সামান্য। মাশরুমে যে এনজাইম ও ফাইবার আছে তা দেহে উপস্থিত অবশিষ্ট খারাপ কোলেস্টোরালের বসতিও উজার করে দেয়।

---

২৯. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২৩

ভিটামিন ও মিনারেলের প্রধান কাজ হলোমানব দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা সৃষ্টি করা। শরীরের চাহিদা মতো প্রতিদিন ভিটামিন ও মিনারেল খেতে না পারলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে নানারূপ জটিল রোগে আক্রান্ত হতে হয়। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে মাশরুমে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ও মিনারেল এবং প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন পটাসিয়াম ও সেলেনিয়াম বিদ্যমান রয়েছে। আর সেলেনিয়াম উপাদানটি শুধু মাছেই পাওয়া যায়। যারা পুরোপুরি নিরামিষভোজী তারা মাশরুমের মাধ্যমে এ উপকারী উপাদানটি গ্রহণ করতে পারে।মাশরুমেএরগোথিওনেইন নামে এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্টআছে, যা মানব দেহের জন্য ঢালের মতো কাজ করে। মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ রয়েছে, যা অন্য কোন উদ্ভিজ্জ উৎসে নেই।[৩০]

মাশরুমে রয়েছে উচ্চমাত্রার আঁশ এবংস্বল্প পরিমাণে সোডিয়াম। মাশরুমে কোলেস্টোরাল কমানোর অন্যতম উপাদান ইরিটাডেনিন, লোভাস্টটিন, এটাডেনিন, কিটিন এবং ভিটামিন বি, সি ও ডি থাকায় নিয়মিত মাশরুম খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ নিরাময় হয়। মাশরুমের ফাইবার বা আঁশ পাকস্থলী দীর্ঘক্ষণ ভরা থাকতে সাহায্য করে। মাশরুম রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ওযন কমাতে সহায়তা করে। মাশরুমে নিয়াসিন ও রিবোফ্লবিনও রয়েছে, যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এতে ৮০-৯০ ভাগ পানি থাকায় ত্বককে নরম ও কোমল রাখে। মাশরুমে পলিফেলন ও সেলেনিয়াম নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এতে মানুষের শরীরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সালফারও রয়েছে। এ অত্যাবশ্যকীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো মারাত্মক কিছু রোগ যেমন- স্ট্রোক, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ এবং ক্যান্সার থেকে শরীরকে রক্ষা করে। এটি মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শীতকালে মাশরুম দৈনন্দিন কিছু অসুখ যেমন- কফ ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে। সূর্যের আলোর সংস্পর্শে যে মাশরুম উৎপন্ন হয়, তাতে প্রচুর ভিটামিন ডি থাকে, যা ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের শোষণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকায়রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এছাড়া নিয়মিত মাশরুম খেলে ব্রেস্ট ক্যান্সার ও প্রোস্টেট ক্যান্সার হওয়ারও ঝুঁকি কম থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) মাশরুমকে বনূ ইসরাঈলদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশেষ নিয়ামত 'মান্না'র সাথে তুলনা করেছেন এবং মাশরুম খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَ جَابِرٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ –

অর্থ: আবু সাঈদ ও জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কাম'আত হলো 'মান্না' (বনূ ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত আসমানী খাবার) এর শ্রেণিভুক্ত এবং এর রস চোখের জন্য শিফা।[৩১]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَالْكَمْاَةَ، فَقَالُوْا هُوَ جُدَرِىُّ الْاَرْضِ فَنُمِىَ الْحَدِيْثُ اِلَى رَسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِىَ شِفَا مِنَ السَّمِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে আলোচনা করছিলাম এবং কাম'আম প্রসঙ্গে বললাম। তাঁরা বললেন, এটা হলো ভূমির আবর্জনা। কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোচরীভূত হলো। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: কাম'আত হচ্ছে মান্না এর অন্তর্ভূক্ত এবং আজওয়া হচ্ছে জান্নাতী খাবারের অন্তর্ভূক্ত। আর তা হলো বিষের প্রতিষেধক।[৩২]

উল্লেখ্য, সাদা রঙের মাশরূম খাদ্যবস্তু,কিন্তু কালো রঙের মাশরূম অখাদ্য ও বিষাক্ত।[৩৩]
মাশরুমের মধ্যে প্রায় ৭হাজার প্রজাতি আছে, তন্মধ্যে ১০০ প্রজাতির মতো মানুষের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। এটি মাংসল ছত্রাক থেকে হয়, যা আদিকাল থেকে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

---

৩০. *https://daktarbhai.com.*মাশরুমের পুষ্টিগুণ এবং বিভিন্ন উপকারিতা, ১২.০৮.২০১৮ (থেকে উদ্ধৃত)
৩১. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মাশরুম ও আজওয়া খেজুর, খ. ৪, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ৩৪৫৩
৩২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৬, হাদীস নং- ৩৪৫৫
৩৩. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২৩

**১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুমের পুষ্টিমান**

১০০ গ্রাম মাশরুমে প্রোটিন ২৫-৩৫ গ্রাম, ভিটামিন ও মিনারেল ৫৭-৬০ গ্রাম, শর্করা ৫-৬ গ্রাম, চর্বি ৪-৬গ্রাম। পক্ষান্তরে আহার উপযোগীপ্রতি ১০০ গ্রাম খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ হলোঃ ১০০ গ্রাম মাংসে ২২-২৫ গ্রাম, ১০০ গ্রাম মাছে ১৬-২২ গ্রাম, ডিমে ১৩ গ্রাম, ডালে ২২-৪০ গ্রাম। সুতরাং মাশরুমকে আমরা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ হিসেবে চিনলেও একই সঙ্গে এটি একাট অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবারও। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, অ্যামাইনো এসিড, অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদি রয়েছে।

**ব্যবহার:** মাশরুম উদ্ভিজ্জ বিশ্বের মাংস নামে পরিচিত। ভোজ্য মাশরুম রান্নায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মাশরুমে শস্য, ডাল, শাক সবজি হতে অনেক বেশি প্রোটিন এবং অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান থাকে, যার পরিমাণ ১টি ডিমের চেয়েও বেশি।মাশরুমে নাইসিন নামক খনিজ পদার্থ রয়েছে, যা অন্য কোন সবজির চেয়ে দশ গুণ বেশি। মাশরুম একটি এন্টিঅক্সিডেন্ট ধারণকারী উচ্চতর খাদ্য উপাদান, যা স্তন ক্যান্সার, উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং মেদ প্রতিরোধে সাহায্য করে। গর্ভবতী মহিলার শরীরে রক্ত স্বল্পতার চিকিৎসা হিসেবে মাশরুম ব্যবহৃত হয়। তাই হাকীম ও কবিরাজদের পরামর্শ মতো মাশরুম ব্যবহার বা প্রয়োগ করতে পারলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাবে। FAO-এর সূত্র মোতাবেক একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ২০০-৫০০ গ্রাম সবজি গ্রহণ করা অপরিহার্য। উন্নত বিশ্বের প্রত্যেকে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ গ্রাম সবজি আহার করে থাকে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রত্যেকে প্রতিদিন গড়ে মাত্র ৪০-৫০ গ্রাম (আলু বাদে) সবজি গ্রহণ করার কারণে ৮৭% লোক অপুষ্টিতে ভুগছে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১০০টি দেশে মাশরুম চাষ হয়। যার ৭০% উৎপন্ন হয় চীনে। উৎপাদিত মাশরুমের ৮৫%-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয় ৩০%, জার্মানী ১৭%, যুক্তরাজ্য ১১%, ফ্রান্স ১১% ইটালী ১০% এবং কানাডা ৬%। বর্তমানে জাপান, কোরিয়া এবং চীনে চায়ের সাথে ব্যাপকভাবে মাশরুমের ব্যবহার হচ্ছে।থাইল্যান্ড, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতসহ প্রভৃতি দেশে খাদ্য তালিকায় এবং দৈনন্দিন খাদ্য টেবিলে অপরিহার্য সবজি হিসেবে ধীরে ধীরে মাশরুমও ইতোমধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছে।

মাশরুমের কতিপয় স্বাস্থ্যকর দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো-

* মাশরুমে কোলেস্টোরাল কমানোর অন্যতম উপাদান ইরিটাডেনিন, লোভাস্টটিন, এনটাডেনিন, কিটিন এবং ভিটামিন বি সি ও ডি থাকায় নিয়মিত মাশরুম খেলে উচ্চ রক্তচাপ (হাই ব্লাড প্রেসার) ও হৃদরোগ নিরাময় হয়।
* মাশরুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি. রয়েছে। শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনে এই উপাদানগুলো অত্যন্ত কার্যকরী।
* ক্যান্সার ও টিউমার প্রতিরোধে মাশরুম বেশ উপকারী।
* হেপাটাইটিস বি ও জন্ডিস প্রতিরোধ করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
* খাদ্য হজমে মাশরুম সাহায্য করে।
* আমাশয় নিরাময় করতে মাশরুমের যথেষ্ট উপকারিতা রয়েছে।
* মাশরুমে নিউক্লিক এসিড ও এন্টি এলার্জেন থাকায় এবং সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকায় কিডনি রোগ ও এলার্জি রোগের প্রতিরোধক।
* মাশরুমে স্ফিংগলিপিড এবং ভিটামিন-১২ বেশি থাকায় স্নায়ুতন্ত্র ও স্পাইনাল কর্ড সুস্থ রাখে। তাই মাশরুম খেলে হাইপার টেনশন দূর হয় এবং মেরুদণ্ড দৃঢ় থাকে।
* মাশরুমের খনিজ লবণ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।[৩৪]

**রোগ নিরাময়ে কালিজিরার অতুলনীয় গুণাবলী**

কালিজিরাকে বলা হয় 'মৃত্যু ছাড়া সর্ব রোগের মহৌষধ।' কালিজিরাকে অনেকে কালো হীরাও বলে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎসক ও কবিরাজগণনানা অসুখ-বিসুখে কালিজিরাকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সব অঙ্গের রোগ নিরাময়ে কালিজিরার জুড়ি নেই। সর্দি-কাশি, আমাশয়, ফুসফুসের প্রদাহ, মাথার

৩৪. ডা. মাও. লোকমান হেকিম, *https://m.dailyinqilab.com.*"মাশরুমের উপকারিতা", ১৭.০২.২০১৬ (থেকে উদ্ধৃত)

যন্ত্রণা থেকে শুরু করে জন্ডিস সব রোগেই উপযুক্ত দাওয়াই এই কালিজিরা। কালিজিরাকে আরবীতে হাব্বাতুস সাওদা, ফারসীতে- শূনীয, উর্দুতে- সিয়াদানা, হিন্দিতে-কলৌঞ্জী এবং ইংরেজিতে- Black cumin বলা হয়।[৩৫]

**পরিচিতি:** কালিজিরার গাছমৌড়ী গাছের মতোবা তার চেয়ে কিছু বড় হয়। পত্রদন্ডের উভয় দিকে ছোট ছোট জোরা পাতা হয়। ফুল সাদা, নীল অথবা হালকা পীত বর্ণের হয়ে থাকে। ফল গোলাকার এবং বীজ আনিসুনের মত ত্রিকোণাকার কাল বর্ণের। কালিজিরার কার্যকারিতা ৭বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হয়।[৩৬]

**প্রাপ্তিস্থান:** কালিজিরা দক্ষিণ ইউরোপ থেকে এসেছে। ভারত বর্ষের পশ্চিম ভাগে এর চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে কালিজিরা জন্মে।

**মিযাজ:** কালিজিরা ৩য় শ্রেণির উষ্ণ ও শুষ্ক।

**বর্ণ:** কালিজিরা বাহ্যিকভাবে কালো এবং ভেতরে সাদা।

**গন্ধ:** কালিজিরা সুগন্ধময় লেবু বা কাবাব চিনির গন্ধযুক্ত।

**স্বাদ:** কালিজিরা বিরেচক, তিক্ত রসধারী এবং রসুনের মত স্বাদযুক্ত।

**মাত্রা:** কালিজিরা ১ থেকে ৩ বা ৭ গ্রাম পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

**প্রতিক্রিয়া:** অতিরিক্ত মাত্রায় কালিজিরা সেবনে ডিপথেরিয়া ও মাথ ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং মূত্রাশয়ের জন্য ক্ষতিকর।

**সংশোধন:** কালিজরা শির্কাতে ভিজিয়ে শোধন করতে হয়। এছাড়া কাতিরা গাম ও অন্যান্য শীতল দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার করলে সংশোধন হয়।

**প্রতিনিধি:** কালিজিরার অভাবে আনিসুন এবং শুলফাবীজ ব্যবহার করা যায়।

**বিশেষ ক্রিয়া:** কালিজিরা মাথা ব্যথা নিবারক ও গর্ভস্থ সন্তান নির্গত কারক এবং মূত্র ও ঋতুকারক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।[৩৭]

**উপকারিতা:** কালিজিরা- বায়ু নিস্বারক, পাকস্থলীর শক্তিবর্দ্ধক ও শরীরের দূষিত রসের ও ধাতুসমূহের মোনজেজ বা শোধক হিসেবে কাজ করে। কালিজিরা পানিতে সিদ্ধ করে সেবনে গর্ভস্থ জীবিত বা মৃত সন্তানপ্রসূত হয়। ঋতু পরিস্কার করে এবং প্রস্রাব ও স্তন্য দুগ্ধ বর্দ্ধক। সেকেনজাবিনের সাথে সেবনে মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর পাথুরী নির্গত হয় এবং পালাজ্বর নাশক। কালিজিরার তেল, কুন্দর ও জৈতুন তেল একত্রে পুরুষাঙ্গে মালিশ এবং অল্পমাত্রায় সেবন করলে অত্যন্ত কাম উত্তেজনা হয় ও পুরুষত্বহীনতা দূর করে। আতশী শিশির মাধ্যমে প্রাপ্ত তেল কোমড়ে ও লিঙ্গে মালিশ করলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং শীতল জনিত ব্যথা ও পেশীর দুর্বলতায় অত্যন্ত উপকারী। সর্দি, কাশি ও বুকের ব্যথানাশক এবং বমিভাব, কামলা, প্লীহা এবং বায়ুজনিত শূলরোগে বাহ্যিক প্রলেপ এবং আভ্যন্তরীণ সেবনে বিশেষ উপকারী। জোকামের রোগী কালিজিরা ভাজা পাতলা কাপড়ে বেঁধে ঘ্রাণ নিলে উপকার পায়। মৃগী রোগের চক্রের সময় কালিজিরা ঘ্রাণ নিলে চক্র কমে যায়। কালিজিরা পোড়া ধোয়া মৃগী, নজলা ও জোকামে উপকারি। গরম পানির সঙ্গে ৯ গ্রাম পরিমাণ কালিজিরা সেবনে কুকুরের বিষ নষ্ট হয় এবং শীতল প্রকৃতির বিষ নাশক। কালিজিরা পুড়ে শিয়াল মুত্রের রসে সেবনে অর্শরোগে অত্যন্ত  উপকারী। কালিজিরা সির্কাতে ভিজিয়ে ঘ্রাণ নেয়া শীতল জনিত মাথা ব্যথা ও লাকোয়া রোগে উপকারী এবং সেবনে কৃমি নাশক। কালিজিরার জোসান্দায় গড়গড়া করলে দাঁত ব্যথায় উপকারী।কালিজিরা বাটা প্রলেপ, মাথা ব্যথা, সন্ধিব্যথা, দাদ, ধবল ও চুলকানিসহ সর্ব প্রকার ব্যথা নিবারক। বার বার ব্যবহার এবং ঘিয়ের সাথে মুখে ব্যবহার করলে মুখমন্ডল উজ্জ্বল ও বর্ণ পরিস্কার হয়। কালিজিরা পোড়া ছাই, মোম এবং তেলের সাথে লাগালে মস্তকের ক্ষতে উপকারী এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারে সেস্থানে চুল গজায়। কালিজিরা পোড়া ধোঁয়া দিলে বিষাক্ত পোকাদি পালায়। হাকীমগণ স্ত্রীলোকদের ঋতুস্রাবের গন্ডগোলে ও প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য কালিজিরা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। আলকিন্দি চুলকানির মলমে কালিজিরা ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আলবিরুনী বলেছেন,

---

৩৫. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

৩৭. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*,প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২২-২২৩

মৃত্যুকে যদি কোনো জিনিস রুখতে পারে তা হলো কালিজিরা। তিনি মাথা ব্যথায় পুলটিশ হিসেবে কালিজিরা ব্যবহার করতেন।[৩৮] কালিজিরা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامُ– قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ السَّامُ الْمَوْتُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন- কালিজিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। ইবন শিহাব বলেন: 'সাম' অর্থ হলো মৃত্যু।[৩৯]

হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রতিদিন ২১টি কালিজিরার ১টি পুটলি তৈরি করে পানিতে ভেজাবে এবং পুটলির পানির ফোঁটা এ নিয়মে নাশারন্দ্রে ব্যবহার করবে-প্রথমবার ডান নাশারন্দ্রে ২ ফোঁটা এবং বাম নাশারন্দ্রে ১ ফোঁটাভ দ্বিতীয়বার বাম নাশারন্দ্রে ২ ফোঁটা এবং ডান নাশারন্দ্রে ১ ফোঁটা। তৃতীয়বার ডান নাশারন্দ্রে ২ ফোঁটা ও বাম নাশারন্দ্রে ১ ফোঁটা।[৪০]

ইউনানী অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও বলেন, কালিজিরা ঠান্ডা জাতীয় ব্যাধি, সর্দি, কফ ও কাশি ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত উপকারি। পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) ও কম্পন রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্যও কালিজিরার তেল মালিশ করা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দি, কাশি, বুকের ব্যথা, পাকস্থলিতে বায়ু সঞ্চয় (অম্লপিত), শুল বেদনা ও প্রসূতি রোগে অত্যধিক উপকারি। ব্রণ দূরীকরণের জন্যও উত্তম ঔষধ এবং এতে শ্লেষ্মা, পুরাতন জ্বর, মূত্র থলির পাথর ও পান্ডু রোগ (কামিলা, জন্ডিস) আরোগ্য লাভ করে। তাছাড়া ইহা হায়েয বা অধিক ঋতু স্রাব, মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রাব প্রতিরোধক ও কৃমিনাশক।[৪১]

**রোগ অনুযায়ী কালিজিরার ব্যবহার বিধি**

**০১. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি:**এক চা-চামচ পুদিনা পাতার রস বা কমলার রস অথবা এক কাপ রং চায়ের সাথে এক চা-চামচ কালিজিরার তেল মিশিয়ে দিনে তিনবার করে নিয়মিত সেব্য। যা দুশ্চিন্তা দূর করে। এছাড়া কালিজিরা মেধা বিকাশের জন্য কাজ করে দ্বিগুণ হারে। কালিজিরা নিজেই একটি অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিসেপটিক। কালিজিরা খেলে আমাদের দেহে রক্ত সঞ্চালন ঠিক মতো হয়, এতে করে মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালনও বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মরণ শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

**০২. মাথা ব্যথা নিরাময়:** কপালের দুই পাশ এবং কানের পাশে দিনে ৩-৪ বার কালিজিরার তেল মালিশ করলে মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যায়। এছাড়া ১/২ চা-চামচ কালিজিরার তেল মাথায় ভালোভাবে লাগাতে হবে এবং এক চা-চামচ কালিজিরার তেল সমপরিমাণ মধুসহ দিনে তিনবার সেব্য।

**০৩. সর্দি উপশম:** এক চা-চামচ কালিজিরার তেল সমপরিমাণ মধু বা এক কাপ রং চায়ের সাথে মিশিয়ে দৈনিক ৩বার সেব্য এবং মাথা ও ঘাড়ের ব্যথা ভাল না হওয়া পর্যন্ত মালিশ করতে হবে। এছাড়া এক চা-চামচ কালিজিরার সঙ্গে তিন চা-চামচ মধু ও দুই চা-চামচ তুলসী পাতাররস মিশিয়ে খেলে জ্বর, ব্যথা, সর্দি-কাশি দূর হয়। সর্দি বসে গেলে কালিজিরা বেটে কপালে প্রলেপ দিন। একই সঙ্গে পাতলা সুতি পরিষ্কার কাপড়ে কালিজিরা বেঁধে শুকতে হবে। এতে শ্লেষ্মা তরল হয়ে ঝরে পড়বে। আরো দ্রুত ফল পেতে হলে বুকে ও পিঠে কালিজিরার তেল মালিশ করতে হবে।

**০৪. বাতের ব্যথা দূরীকরণ:** বাতের ব্যথার স্থান ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতে কালিজিরার তেল মালিশ করতে হবে। অত:পর এক চা-চামচ কাঁচা হলুদের রসের সাথে সমপরিমাণ কালিজিরার তেল সমপরিমাণ মধু বা এক কাপ রং চায়ের দৈনিক ৩বার করে ২/৩ সপ্তাহ সেব্য। এছাড়া ১০/১২ ফোঁটা কালিজিরার তেল গরম পানিতে মিশিয়ে খেলেও বাত রোগের উপকার হয়।

---

৩৮. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮-৩৩০

৩৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কালিজিরা, খ. ২, পৃ. ১৬১৭, হাদীস নং- ৫৬৮৮

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৪১. শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুর হক, *কোরআন হতে বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, হাছানিয়া লাইব্রেরী, আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ১৫৩

**০৫. বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ নিরাময়:**চর্ম আক্রান্ত স্থান ধুয়ে পরিস্কার করে তাতে মালিশ করে এক চা-চামচ কাঁচা হলুদের রসের সাথে সমপরিমাণ মধু বা এক কাপ রং চায়ের সাথে দৈনিক ৩বার করে ২/৩ সপ্তাহ সেব্য।

**০৬. হার্টের ব্যবস্থাপত্র:**এক চা-চামচ কালিজিরার তেলসহ এক কাপ দুধ খেয়ে দৈনিক ২বার করে ৪/৫ সপ্তাহ সেব্য এবং শুধু কালিজিরার তেল বুকে নিয়মিত মালিশ করতে হবে।

**০৭. ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ:** প্রতিদিন সকালে রসুনের দু'টি কোষ চিবিয়ে খেয়ে এবং সমস্ত শরীরে কালিজিরার তের মালিশ করে সূর্যের তাপে কমপক্ষে ৩০ মিনিট অবস্থান করতে হবে এবং এক চা-চামচ কালিজিরার তেল সমপরিমাণ মধুসহ প্রতি সপ্তাহে ২/৩ দিন সেব্য যা ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ রাখে। এছাড়া কালিজিরা বা এর তেল বহুমুত্র রোগীদের রক্তের শর্করার মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং নিম্ন রক্তচাপকে বৃদ্ধি করে ও উচ্চ রক্তচাপকে হ্রাস করে।

**০৮. অর্শরোগ নিরাময়:** এক চা-চামচ মাখন ও সমপরিমাণ তেল চুরন/তিলের তেল, এক চা-চামচ কালিজিরার তেলসহ প্রতিদিন খালি পেটে ৩/৪সপ্তাহ সেব্য।

**০৯. শ্বাস কষ্ট বা হাঁপানি রোগ উপশম:** যারা হাঁপানি বা শ্বাস কষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত, তাদের জন্য কালিজিরা এক মহৌষধ। খাদ্য তালিকায় কালিজিরার ভর্তা রেখে প্রতিদিন খেলে শ্বাস কষ্ট উপশম হয়। এছাড়া এক চা-চামচ কালিজিরার তেল, এক কাপ দুধ বা রং চায়ের সাথে দৈনিক ৩বার সেব্য।[৪২]

**১০. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ:** ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমে কালিজিরা খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এক চিমটি পরিমাণ কালিজিরা এক গ্লাস পানির সাথে প্রতিদিন সকালে খালি পটে খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়া সকালে খালি পেটে ১২-১৩ ফোটা কালিজিরার তেল ও ১৫-১৬ ফোটা মধু খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

**১১. যৌনশক্তি বৃদ্ধি:** কালিজিরা নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি করে। প্রতিদিন কালিজিরা খাবারের সাথে খেলে পুরুষের স্পার্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষত্বহীনতা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। ১৫-১৬টি কালিজিরা ছোট ১টি পেঁয়াজ ও ২ চা-চামচ মধুসহ বিকালে বা রাতে খেলে চির যৌবন রক্ষা হয়। এছাড়া এক চা-চামচ মাখন, এক চা-চামচ যায়তুন তেল সমপরিমাণ কালিজিরার তেল ও মধুসহ দৈনিক ৩বার ৪/৫ সপ্তাহ সেবন করা যেতে পারে।

**১২. অনিয়মিত মাসিক স্রাব বা মেহ/প্রমেহ থেকে পরিত্রাণ লাভ:** যেসব মহিলা অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যায় ভোগে, তাদের পিরিয়ড শুরুর ৫-৭দিন আগে থেকে অল্প গরম পানিতে ৫০০ মিলিগ্রাম কালিজিরা মিশিয়ে সকালে ও বিকালে খেলে পিরিয়ড নিয়মিত হবে।

**১৩. বুকের দুধ বৃদ্ধি:** যেসব মায়ের বুকের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ নেই, তাদের জন্য কালিজিরা সেবন খুবই উপকারী। মায়েরা প্রতি রাতে শোয়ার আগে ৫-১০ গ্রাম কালিজিরা মিহি করে দুধের সাথে খেলে মাত্র ১০-১৫ দিনে দুধের প্রবাহ বেড়ে যাবে। এছাড়া বুকের দুধ বাড়ানোর জন্য ডাক্তারগণ ভাতের সাথে কালিজিরার ভর্তা খাওয়ার জন্যও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

**১৪. ত্বকের তারুণ্য লাভ:** ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য কালিজিরা খুবই ফলপ্রসু। এতে লিনোলেইক ও লিনোরেনিক নামের এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিড থাকে, যা পরিবেশের প্রখরতা, স্ট্রেস ইত্যাদি থেকে ত্বককে রক্ষা করে, ত্বককে সুন্দর করে এবং ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে। মধু ও কালিজিরার পেস্ট বানিয়ে ত্বকে লাগিয়ে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা রেখে ধুয়ে নিলে ত্বক উজ্জ্বল হয়। এছাড়া ব্রণের সমস্যা থাকলে আপেল সাইডার ভিনেগারের সাথে কালিজিরা মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে আক্রান্ত স্থানে নিয়মিত লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ব্রণ দূর হয় এবং শুষ্ক ত্বকের জন্য কালিজিরার গুঁড়া ও কালিজিরার তেলের সাথে তিলের তেল মিশিয়ে ত্বকে লাগালে এক সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখে যাবে।

**১৫. আমাশয় নিরাময়:** আমাশয় নিরাময়ে কালিজিরা এক মহৌষধ। সামান্য কালিজিরা ভেজে গুঁড়ো করে ৫০০ মিলিগ্রাম হারে ৭-৮ চা চামচ দুধে মিশিয়ে সকাল ও বিকালে ৭ দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

---

৪২. *https://www.prothomalo.com/life.*ওজন কমানোসহ কালিজিরার তিন হালি গুণ,আপডেট: ১৭.০৫.২০১৮ (থেকে উদ্ধৃত)

**১৬. জন্ডিস বালিভারের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ:** এক চা-চামচ ত্রিপলার শরবতের সাথে এক চা-চামচ কালিজিরার তেল দিনে ৩বার করে ৪/৫ সপ্তাহ সেবনকরলে জন্ডিস ও লিভারের বিভিন্ন সমস্যা দূর হয়।

**১৭. রিউমেটিক এবং পিঠ ব্যথা দূর:** কালিজিরার তেল আমাদের দেহে বাসা বাঁধা দীর্ঘ মেয়াদী রিউমেটিক এবং পিঠে ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ১০-১২ ফোটা কালিজিরার তেল গরম পানিতে মিশিয়ে খেলে বাত রোগের উপকার হয়।

**১৮. শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি:** দুই বছরের অধিক বয়সী শিশুদের কালিজিরা খাওয়ানোর অভ্যাস করলে দ্রুত শিশুর দৈহিক ও মানসিক অবস্থার বৃদ্ধি ঘটে। শিশুর মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধিতেও অনেক কাজ করে। তবে দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের কালিজিরা খাওয়ানো উচিত নয়; তবে এর তেল শরীরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**১৯. হজমের সমস্যা দূরীকরণ:** হজমের সমস্যায় ১/২ চা-চামচ কালিজিরা বেটে পানির সাথে খেতে হবে। এভাবে প্রতিদিন ২/৩বার খেলে এক মাসের মধ্যে হজমশক্তি বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি পেট ফাঁপাভাবও দূর হবে।[৪৩]

**২০. লিভারের সুরক্ষা:** লিভার সুরক্ষায় কালিজিরা একটি অনন্য ভেষজ। লিভার ক্যান্সারের জন্য দায়ী আফলাটক্সিন নামক বিষ ধ্বংস করে কালিজিরা।

**২১. চুল পড়া বন্ধ:** নিয়মিত কালিজিরা খেলে চুল পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পায়। ফলে চুল পড়া বন্ধ হয়। আরো ভালো ফল পেতে ২ টেবিল চা-চামচ অলিভ ওয়েল ও এক চা-চামচ কালিজিরা তেল এক সাথে মিশিয়ে গরম করে চুলের গোড়ায় ভালভাবে ১০-১৫ মিনিট ম্যাসেজ করতে হবে এবং এক ঘন্টা পর শ্যাম্পু দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া কালিজিরার তেল চুলের কোষ ও ফলিকলকে চাঙ্গা ও শক্তিশালী করায় দীর্ঘ দিন ব্যবহার করলে নতুন চুল সৃষ্টি হয়।

**২২. চুলকানী উপশম:** কালিজিরা ভাজা তেল গায়ে মাখলে চুলকানিতে উপকার হয়। এতে ১০০ গ্রাম সরিষার তেলে ২৫-৩০ গ্রাম কালিজিরা ভেজে ঐ তেল ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া কালিজিরা বেটে কোনো বিছা বা পোকা-মাকড়ের কামড়ের জায়গায় লাগিয়ে দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই হুলের জ্বালা কমে যায়।

**২৩. কৃমি নাশ:** ভিনেগারে ভিজিয়ে কালিজিরা খেলে কৃমি নষ্ট হয়।

**২৪.পক্ষাঘাতের চিকিৎসা:** প্যারালাইসিস ও কম্পন রোগে নিয়মিত কালিজিরার তেল মালিশ করলে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়।

**২৫. দাঁত ব্যথা নিরাময়:** দাঁত ব্যথা হলে, মাড়ি ফুলে গেলে বা রক্ত পড়লে, তা নিরাময়ে কালিজিরা এক মহৌষধ। প্রথমে কালিজিরা পানিতে ফোটাতে হবে, অত:পর উক্ত পানির তাপমাত্রা যখন কিছুটা কমে উষ্ণ অবস্থায় থাকে, তখন তা দিয়ে কুলি করতে হবে। এতে দাঁত ব্যথা কমে যাবে। মাড়ির ফোলা বা রক্ত পড়া বন্ধ হবে। এছাড়া জিহ্বা, তালু ও মুখের জীবাণু ধ্বংস হবে।

**২৬. মেদ কমানো:** একটি পাত্রে ফুটন্ত পানিতে সমপরিমাণ চা পাতা ও কালিজিরা জ্বাল দিয়ে তাতেচায়ের রং এলে নামিয়ে ছেঁকে সাধারণচায়ের  তো পান করলে বাড়তি মেদ ঝরে যেতে সাহায্য করে।

**২৭. বাধক দোষ নিরাময়:** এ দোষ হলে মেয়েরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, অনেকে শূচীবায়ুগ্রস্ত হয়, অনেকের দেহ স্থুল হয়ে যায়, আবার অনেকে শুকিয়ে যায়, অনেকে কামজ উন্মাদ রোগেও আক্রান্ত হয়, আবার এ দোষে অনেক মহিলা জননগ্রন্থির ক্রিয়াশক্তি হারিয়ে ফেলে। এছাড়া অন্যান্য রোগের আরো অনেক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে কালিজিরা ভেজে গুঁড়ো করে ২/৩ মাস সকাল-সন্ধ্যা ৭৫০মিলিগ্রাম করে সেবন করলে একসল রোগের উপশম হয়।

**২৮. গর্ভাশয়ের দ্বার সঙ্কোচন হওয়া:** প্রসবের পর কালিজিরার ক্বাথ খেলে গর্ভাশয়ের দ্বার সঙ্কুচিত হয় এবং সে সাথে স্তন্য বাড়ে।

**২৯. গলা ফোলা থেকে পরিত্রাণ:** সর্দি-কাশির কারণে গ্লান্ড ফোলে গেলে কালিজিরা, চাল পোড়া এবং মুসাববর সমপরিমাণ নিয়ে বেটে প্রলেপ দিলে এক দিনের মধ্যেই ফোলা ও ব্যথা উভয়ই উপশম হয়।

**৩০. শোথ কমা:** কালিজিরা বেটে প্রলেপ দিলে হাত-পা ফোলাসহ সব শোথ কমে যায়।

**৩১. দাদের চিকিৎসা:** কালিজিরা বেটে প্রলেপ দিলে দাদ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

---

৪৩. মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা, *https://www.kalerkantho.com/islamiclife.* হাদিসে বর্ণিত কালিজিরার বহুবিধ উপকারিতা, আপডেট: ০২.০৩.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)

**৩২. ধবল রোগের চিকিৎসা:** ধবল রোগ সারাতে কালিজিরার বাটা প্রলেপ অত্যন্ত ফলদায়ক। এছাড়া চুলকানির নিয়মে দিলে আরো ভাল হয়।

**৩৩. লাবণ্যতা বৃদ্ধি:** কালিজিরা ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে খেলে মুখ উজ্জ্বল এবং শরীরের রং ফর্সা হয়।

**৩৪. তাড়াতাড়ি সন্তান প্রস্রব:** কালিজিরা পানিতে সিদ্ধ করে খেলে সন্তান প্রসব তাড়াতাড়ি হয়।

**৩৫. প্লীহাবৃদ্ধি, শূল ব্যথা, বুকের ব্যথা নিরাময়:**নিয়মিত কালিজিরা বেটে খেলে এসব রোগ ও ব্যথা থেকে খুব সহজেই নিরাময় লাভ করা সম্ভব।

**৩৬. প্রস্রাবের বাধকতা:** পরিমাণ মতো কালিজিরা খেলে প্রস্রাব পরিষ্কার থাকে এবং প্রস্রাবের বাধকতা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।[৪৪]

**যবের উপকারিতা**

যব একটি অতি পরিচিত, বিস্ময়কর ও আদর্শ খাবারের নাম। মানব দেহ উপকার সাধনে ও সুস্থ সবল রাখার ক্ষেত্রে যবের গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম।যদিও আধুনিক যুগে এটাকে নিম্ন শ্রেণি ও গরীব দু:খীদের খাদ্য মনে করা হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর গুণাবলী জানলে সত্যিই আশ্চার্যান্বিত হতে হয় এবং যব খাওয়ার প্রতি আমাদের সবার আগ্রহ জন্মাবে আশা করা যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি নির্বাচিত খাবার ও পথ্যের মধ্যে যে মানব জাতি সুস্থ থাকার অব্যর্থ ও কার্যকরী ব্যবস্থাপত্র রয়েছে, যব হলো একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।যবে রয়েছে মালটোজ, গ্লুকোজ, স্যাকারিন, লেসিথিন, এল্যানটয়েন, এমাইলেস এন্টিঅক্সিডেন্ট, ক্রোমিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, নাইসন, কপার, প্রোটিন, মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, খনিজদ্রব্য এবং ভিটামিন-বি। নিয়মিত ও নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ যবের ছাতু খেলে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত লাভ হবে। নবী কারীম (সা.) এর যুগে সাধারণ যবের রুটি খেয়েই সাহাবায়ে কিরাম সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছেন। আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী যব এক প্রকার বলবর্ধক খাদ্য। তাই গ্রীসে অলিম্পিক খেলার প্রারম্ভে খেলোয়াড়দের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ খাবার হিসাবে যবকে নির্বাচন করা হতো। এটা দুধে পাকালে উন্নত মানের বল বর্ধক খাবারে পরিণত হয়। আমেরিকাতে হৃদ রুগীদেরকে শুধু যবের খাদ্য পরিবেশন করা হয়।এটা পুরাতন আমাশয় রোগ ও কোষ্ট কাঠিন্য থেকে রেহাই দেয় এবং শিশু রোগ বিশেষ করে শিশুদের লিভার কাজ না করলে তার জন্য যবের খাদ্য খুবই উপকারি।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে জন্মগ্রহণকারী চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিরোক্রেটিসের স্বাস্থ্য মূলনীতির অন্যতম প্রধান ছিল- খাদ্য আপনার ঔষুধ এবং ঔষুধ আপনার খাদ্য হউক। কথাটি ধ্রুব সত্য এবং বর্তমানেও এ কথাটি মেনে চললে হাজারো রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে সুস্থ থাকা সম্ভব। সে বিবেচনায় প্রাচীন কাল থেকে চাষকৃত যবকে বিস্ময়কর খাদ্যের পাশাপাশি অত্যন্ত কার্যকরী ঔষুধও বলা যায়। খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ৯৫০০ বছর থেকে বিশ্বে যবের চাষ করা হয়। ইংরেজিতে একে বার্লি (Barlez)। যব বিভিন্ন রকম খাদ্য, পানীয়, ঔষুধ ও সুষম খাদ্য তৈরীতে বহুবিদ ব্যবহার হয় এবং বিশ্বে মোট খাদ্য শস্য উৎপাদনে যবের স্থান চতুর্থ। যব বেশি বানিজ্যিক ভাবে উৎপাদন হয় কানাডা, জার্মানি, ওআমেরিকাতে। বিশেষ করে জার্মানিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যবের ব্যবহার লক্ষনীয়। আমাদের দেশেও এটি চাষ হয়, তবে কম মাত্রায় যা প্রধানত ছাতু তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।ছাতুর মধ্যে সব রকম পুষ্টিগুণই ভরপুর থাকে। ১০০ গ্রাম ছাতুতে ২০.৬ শতাংশ প্রোটিন, ৭.২ শতাংশ ফ্যাট, ১.৩৫ শতাংশ ফাইবার, ৬৫.২ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট, ২.৭ শতাংশ ভুষি, ২.৯৫ শতাংশ ময়শ্চার ও ৪০৬ ক্যালোরি শক্তি রয়েছে।

হাদীস শাস্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ যথেষ্ট পরিমাণ স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন এবং অল্প হোক বা বেশি হোক তাঁরা সবসময় ঐ সমস্ত খাবারই আহার করতেন, যা বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে খুবই পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর ছিল।ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের অধিকাংশ সময় খাবার হতো যবের রুটি।[৪৫]

---

৪৪. *কোরআন হতে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৪৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: শামায়েল,অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রুটির বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৪২, হাদীস নং- ১৪৫

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন- নবী কারীম (সা.) পরিবারের কারো জ্বর হলে তার জন্য যবের দালিয়া তৈরি করার নির্দেশ দিতেন এবং সেমতে তা তৈরি করে রোগীদের খাওয়ানো হতো।[৪৬]অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزُ تَأْخُذُ أُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُفِيْ قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُإِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَاللهِ مَا فِيْهِ شَحْمُ وَلاَ وَدَكُ–

অর্থ: সাহল ইবনু সাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর দিন আসলে আমরা খুবই খুশি হতাম। এক বৃদ্ধা আমাদের জন্য সিলক (শালগম জাতীয় এক প্রকার সুস্বাদু সবজি)-এর মূল তুলে তা তাঁর হাঁড়িতে চড়িয়ে দিতেন। তারপর এতে অল্প কিছু যব ছেড়ে দিতেন। সালাতের পর আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ খাবার আমাদের সম্মুখে হাজির করতেন। এ কারণেই জুমআর দিন আসলে আমরা খুব খুশি হতাম। আমরা সকালের আহার এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতাম না জুমআহর পর ব্যতীত। আল্লাহর কসম! সে খাদ্যে কোনো চর্বি থাকতো না।[৪৭]

**যবের উপকারিতা**

যবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্লীহা ও পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা বাড়ানো, অজীর্ণ রোগ তথা বদহজম (Dzspepsia) বা পেটের পীড়া দূর করা এবং প্রস্রাবের সমস্যা নিরসনে সহায়তা করা।বলা হয়, পানি যেমন মুখ পরিষ্কার করে, তেমনি যব পেট পরিষ্কার করে। সারাবিশ্বে ১০-১৫ শতাংশ মানুষ আইবিএস (Irritable bowel szndrome) রোগে আক্রান্ত। আইবিএস প্রধানত তিন প্রকার। যথা-(১) কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত পেট ব্যথা, ঢেঁকুর ওঠা, মল কঠিন হওয়া এবং নিয়মিত মল ত্যাগ না হওয়া, (২) ডায়রিয়া জনিত পেট ব্যথা ও অস্বস্তি লাগা, মল ত্যাগের বেগ প্রচন্ড ও ঘন ঘন হওয়া এবং পাতলা বা তরল মল ত্যাগ হওয়া এবং (৩) কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়ার মিশ্ররূপ, সঠিকভাবে খাবার হজম না হওয়া, ঘুম না আসা এবংশরীর অবসাদ লাগা ইত্যাদি। যবের দ্রবণীয় আঁশ মলের পরিমান বাড়িয়ে দ্রুত অন্ত্র খালি করার কারণে আইবিএস নিয়ন্ত্রণে থাকে ও নিরাময় হয়। খাদ্যশস্যের প্রতি ১০০ গ্রাম সাদা চালে খাদ্য আঁশ থাকে মাত্র ০.৪ গ্রাম, আটায় ১৭.৭, ওটসে ১১ এবং যবের ছাতুতে ১৭.৩ গ্রাম। যব কোলেস্টেরল, রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রন রাখে এবং ডায়বেটিস,হৃদরোগ ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। খাদ্য আঁশ ছাড়াও মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ ও সেলেনিয়ামের খুব ভাল উৎস যব।

যবে প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম থাকায় ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে, যা ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে। ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন এবং পৃথিবীর ১০০টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে যবের মধ্যে এক ধরনের এমন উপকারি পথ্য আছে যা রক্তের শর্করার পরিমাণ এবং টাইপ ২ ডায়বেটিস হওয়ার ঝুঁকি কমাতে পারে। ডায়াবেটিসের জন্য উপকারিগ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ায় ছাতুতে উপস্থিত শর্করা খুব ধীরে রক্তে মিশে থাকে। ছাতু খেলে হঠাৎ করে শরীরে শর্করার মাত্রা বেড়েযাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। আমেরিকার ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্টেশন(এফডিএ) হৃদরোগের কোলেস্টেরল কমাতে যবের বেটাফাইবারের উপকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বয়স বাড়ার সাথে নানাবিধ শারীরিক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও কিন্তু ছাতু বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে ৬০ বছরের পর থেকে যদি নিয়মিত ছাতু খাওয়া যায় তাহলে একাধিক বয়সকালীন রোগ শরীরে বাসা বাঁধার কোনও সুযোগই পায় না।মহিলাদের পিরিয়ডের সময় শরীরে দেখা দেয়া পুষ্টির ঘাটতি দূর করতে ছাতুর সরবতের কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে। ছাতুতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ এবং ভিটামিন থাকে, যা শরীরের সচলতা বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।যবে পানিতে দ্রবনীয়, অদ্রবনীয় উভয় খাদ্য আঁশই থাকে। গবেষনায় দেখা যায়, যবের এন্টিঅক্সিডেন্ট কোলন ক্যান্সারের কোষ বেড়েযাওয়া বন্ধ করতে পারে। মহিলাদের

৪৬. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২০

৪৭. আবু বকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন ইবন আলী আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ,২০০৩ (তৃতীয় প্রকাশ), খ. ৭, পৃ. ১৫১

মধ্যে পরিচালিত এক গবেষনায় দেখা গেছে, যবের অদ্রবনীয় আঁশ তাদের পিত্তথলিতে পাথর জমা কমাতে পারে এবং পিত্তের অস্ত্রোপচার ঝুঁকি কমায়।

যবের ছাতুতে প্রোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদান বের করে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে এবং শরীরের ভিতরে প্রোটিনের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করে।

ছাতু হজম শক্তি বাড়ায়, খাবারে রুচি বাড়ে, শরীর ঠান্ডা রাখে, শরীরের জ্বালা ও অস্থিরতা কমায়, ক্লান্তি দূর হয়, শাররীক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও বাড়ে।

শিশুদের জন্য যব খুবই উপকারী একটি খাবার। কারণ শিশুদের সুস্থ রাখতে ও শরীর বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদানগুলির প্রয়োজন তা সবই যবেচর মধ্যে রয়েছে। তাই বাজারের ফাস্ট ফুড ও মুখরোচক খাবারের পরিবর্তে শিশুরদেরকে যদি নিয়মিত যবের ছাতু খাওয়ানো যায়, তাহলে শতভাগ কার্যকরী ফলাফল মিলবে।

আধুনিক গবেষণা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী যবের উপকারিতাসমূহ যেমন অপরিসীম, তেমনিযব দিয়ে তৈরিকৃত তালবীনাও রোগীদের জন্য অনেক ফলদায়ক। রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যান্য রোগের পাশাপাশি বিশেষ করে পাকস্থলী এবং অন্ত্রতে আলসারে আক্রান্ত রুগীদেরকে উন্নত মানের ব্যবস্থাপত্র স্বরূপ সকালের নাস্তায় তালবীনা খাওয়ার নির্দেশ দিতেন।তালবীনা হলো- পিষিত যব দুধে পাকিয়ে তাতে মধু মিশ্রণ করা। আর তালবীনা রান্না করার পদ্ধতি হলো-এক ভাগ যবের ছাতু পাঁচ ভাগ পানি বা দুধের সাথে মিশিয়ে চুলায় হালকা আঁচে জ্বাল দিয়ে তিন-চতুর্থাংশে কমে আসলে নামিয়ে ফেলার আগে পরিমাণ মতো চিনি, মধু বা গুড় মিশিয়ে নামিয়ে ফেলা।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বর্ণনা-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا قِيْلَ له اِنَّ فُلَانًا وَجَعَ لاَ يَطْعَمُ الطَّعَام قَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِيْنَةِ فَحُسُوْهُ اِيَّاهَا وَيَقُوْلُ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا تَغْسِلُ بَطْنَ اَحَدِكُمْ كَمَا تَغْسِلُ اِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسَخِ–

অর্থ: কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এ সংবাদ নিয়ে আসতো যে, অমুক ব্যক্তির পেটে অসুখ খানাপিনা করছে না, তাহলে তালবিনা (যবের দালিয়া) তৈরি করে তাকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিতেন। অত:পর তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম, এটা তোমাদের পেটকে এমনভাবে পরিষ্কার করে, যেমনভাবে কোনো ব্যক্তি স্বীয় চেহারা ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাকে।[৪৮]

কোনো আলসারের রুগী যদি নিয়মিত ২/৩ মাস তালবীনা খায়, তাহলে নিশ্চিত সে আরোগ্য লাভ করবে এবং পুরাতন কোষ্ট কাঠিন্যের জন্য যবের দলিয়া থেকে উত্তম কোনো ঔষধ নেই। এছাড়াও তালবীনা কোলেস্টেরল,উচ্চ রক্তচাপ, পেটের জ্বালা-পোড়া, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তের সুগার ধীরে ধীরে বাড়ার কারণে ডায়াবেটিক রোগের জন্য তালবীনা বা যব খাওয়া খুবই উপকারি। তালবীনা অসুস্থ ও দুর্বল রোগীদের জন্য শক্তিদায়ক পথ্য এবংশিশুদের প্রয়োজনীয় আঁশ, আমিষ এবং খনিজ পদার্থ যোগান দেয়।তাছাড়া কিডনি রোগীদের জন্যও তালবীনা বেশ উপকারি।[৪৯]

যাদুল মাআদ গ্রন্থে তালবীনা সম্পর্কে বলা হয়েছে- এটা দুধ, বার্লি ও মধুর সমন্বয়ে তৈরি এক ধরনের মাজুন (হালুয়া জাতীয়)। এটা পেটের পীড়া, ক্ষুধামন্দা ও শারীরিক দুর্বলতার নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী একটি ঔষধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করতেন, তালবীনা রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে।[৫০]

হাদীসে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে – قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْبِيْنَ–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা অবশ্যই তালবীনা খাবে, যদিও এটি অপছন্দনীয়, তবে উপকারী।[৫১]

৪৮. *যাদুল মাআদ*,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৯-১২০
৪৯. ডা. আলমগীর মতি, *https://www.bd-pratidin.com.* যবের ছাতুতে পুষ্টি, ২১.১২.২০১৬ (থেকে উদ্ধৃত)
৫০. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৯
৫১. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৯

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কোনো বাড়িতে কারো আকস্মিক মৃত্যু হলে হযরত আয়িশা (রা.) তালবিনার বুন্দিয়া রান্নার জন্য নির্দেশ দিতেন। সে মতে তালবিনা পাকানো হতো এবং হযরত আয়িশা (রা.) নিজ হাতে গোস্ত ও রুটির টুকরা এক সাথে মিশিয়ে সারীদ তৈরি করতেন এবং সারীদের মধ্যে তালবিনা মিশিয়ে বলতেন, তোমরা এটা খাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তালবীনা রোগীদের মনে শান্তি আনে এবং দু:খ কিছুটা প্রশমিত করে।[৫২]

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালনকালে খিচুরী, রুটি ও পিঠা পাকানোর প্রচলন রয়েছে। আর এটা সাধারণত মাইয়্যেতের নিকটাত্মীয় স্বজন ও নিজেদের পক্ষ হতে নিয়ে আসে। তবে নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নত খাদ্য হলো তালবীনা ও সারীদ। এটা একদিকে যেমন খাদ্য অপর দিকে শোকের প্রতিষেধকও।[৫৩]

৫২. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তান: করাচি, বুশরা পাবলিশার্স, ২০০৯, অধ্যায়: চিকিৎসা,অনুচ্ছেদ: তালবীনা, খ. ৬, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং- ৫৭৬৩

৫৩. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, তিব্বে নববী, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০০- ১০১

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রোগ নিরাময়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ফল-মূলের ব্যবহার

আমাদের খাদ্য গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো সুস্থ, সবল ও কার্যক্ষম হয়ে বেঁচে থাকা। যে কোনো খাবার খেয়ে পেট ভরা যায় কিন্তু তাতে দেহের চাহিদা মিটিয়ে সুস্থ থাকা যায় না। তাই মানব দেহের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি সাধন এবং দেহকে সুস্থ ও নিরোগ রাখার জন্য নিয়মিত নানা ধরনের ফল খাওয়া অতীব প্রয়োজনী। ফল ছাড়া সুষম খাদ্যের বিষয়ে চিন্তা করাও বোকামী। খাদ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, একজন কর্মক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা ও পুরুষের দৈনিক যথাক্রমে ২৪০০ ও ২৮০০ ক্যালোরি খাদ্যের প্রয়োজন, এর মধ্যে দেহের সুষ্ঠু গঠন ও রোগ প্রতিরোধের জন্যপ্রতিদিন ১৫০-২০০ গ্রাম ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু পুষ্টি জ্ঞান ও সুষম খাদ্য সম্পর্কে অসচতেনতার কারণে আমরা অনেকে ফল খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করি না। আমাদের দেশে অধিকাংশ গ্রামের মানুষ ফলকে রোগীর পথ্য মনে করলেও বাস্তবে ফল হলো সকল মানুষের সুঠাম ও সুস্থ শরীর গঠনে অত্যন্ত সহায়ক একটি খাবার। ফল দেহে আনে বল, মনে আনে প্রশান্তি এবং ভিটামিন ও মিনারেলসের অন্যতম উৎস। আমাদের দেশে বর্তমানে মাথাপিছু ফলের উৎপাদন প্রায় ৭০-৭৫ গ্রাম যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই বিভিন্ন ফলের আবাদ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَاَوْا اَوَّلَ الثَّمرِ جَاءُوْا بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِذَا اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثِمَارِنَا–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের যখন প্রথম কোনো নতুন ফল তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে পেশ করতেন। আর তিনি তা গ্রহণ করে এই মর্মে দুআ করতেন- হে আল্লাহ! আমাদের ফলসমূহে আমাদের জন্য বরকত দাও।[৫৪]

পরকালে মুসলমানের কাঙ্ক্ষিত জায়গা হলো জান্নাত, যার অর্থ বাগান। আর বাগান মানেই অসংখ্য ফলের সমারোহ। পৃথিবীতে মানুষের আগমনের নেপথ্যেও রয়েছে একটি বিশেষ ফলের সম্পৃক্ততা।[৫৫] আর আদিম যুগের মানুষ এই ফল-মূল খেয়েই জীবন ধারণ করতো। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং হাদীসেও বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্যবার তৃণলতা, বৃক্ষাদি, শস্য, ফল-মূল ও বাগানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এতেই বোঝা যায়, মানব জীবন সুস্থ ও সবল রাখার ক্ষেত্রে ফলের গুরুত্ব কতটুকু। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ–

অর্থ: পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি মাটি হতে উৎপন্ন উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা (অবিশ্বাসী) যাদের জানে না, তাদের প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।[৫৬]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান। এই বাগান দু'টি ঘন শাখা-প্রশাখায় ভরা থাকবে। সেখানে উপচে পড়বে দু'টি ঝরনা। এর বাইরে আরও দু'টি ঘন সবুজ বাগান থাকবে, যার মাঝেও বয়ে যাবে দু'টি উচ্ছলিত ঝরনা। নিয়ামত হিসেবে সেই বাগানে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম।[৫৭] পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে– وَ اَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ–

অর্থ: আর আমি তাদেরকে বৃদ্ধি করে দেবো ফলমূল ও গোশত, যা তোমরা কামনা করো।[৫৮]

জান্নাতে পানীয় এবং মাংসের সঙ্গে ফলমূল পরিবেশনার কথা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে পবিত্র কোরআন এবং অসংখ্য হাদিসে বারবার উঠে এসেছে বিভিন্ন বৃক্ষরাজির নাম। এছাড়া পবিত্র কুরআনেএকটি বিশেষ গাছের নাম বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى অর্থ: সিদরাতুল মুনতাহা তথা প্রান্তবর্তী কুল গাছের কাছে।[৫৯]

---

৫৪. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফলের বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৫১, হাদীস নং- ২০১
৫৫. আল-কুরআন, ২: ৩৫, ২০: ১২০
৫৬. আল-কুরআন, ৩৬: ৩৬
৫৭. আল-কুরআন, ৫৫: ৪৬-৬৮
৫৮. আল-কুরআন, ৫২: ২২
৫৯. আল-কুরআন, ৫৩: ১৪

কুরআনের ভাষায় এই গাছের নাম হলো 'সিদর'। ইংরেজিতে এই গাছ 'লোটি ট্রি' নামে পরিচিত। ঘন পাতায় আচ্ছাদিত এই গাছ হযরত মুহাম্মদ (সা.) শবেমিরাজের সময় উর্ধ্বাকাশে গমন এবং মহান আল্লাহর সাক্ষাতের সময় দেখতে পান। সাতটি বেহেশতের মধ্যে সব শেষে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া, যা নেক শরণার্থীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হবে। এই জান্নাতুন মাওয়ার শেষ সীমানা নির্দেশ করার জন্য রয়েছে 'সিদর' নামক গাছ।

পৃথিবীতে অসংখ্য ফলের গাছ রয়েছে এবং বাংলাদেশেও বর্তমানে প্রায় ৭০ প্রকারের ফল জন্মে। নিম্নে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কিছু ফলের গুণাগুণ আলোচনা করা হলো-

**খেজুর একটি মহৌষধি ফল**

খেজুরকে আরবীতে 'তামর' এবং ইংরেজিতে Date বলা হয়। আর শুষ্ক বা শোকনা খেজুরকে উর্দুতে 'খোরমা' ইংরেজিতে Date palm এবং আরবীতে একে খেজুরের ন্যায় 'তামর' বলা হয়ে থাকে।

**পরিচিতি:** খেজুর গাছ সোজা ১০০ থেকে ১২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছের গোড়ার চারদিকে অনেক শিকড় জন্মে। পাতা আমাদের দেশের খেজুর পাতা থেকে অগ্রভাগ সরু লম্বা এবং ধূসর বর্ণের। খেজুর ফল ১ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং অধিক শ্বাস যুক্ত খুব মিষ্টি।

একই ফ্যামিলির Phoenix sylvestris Rox b নামক খেজুর গাছটি আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র জন্মে থাকে। এ গাছ ৩০ থেকে ৫০ ফুট লম্বা হয়। ফল ১ থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা হয় এবং শ্বাস খুব কম। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুল অত:পর ফল ধরে এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

**প্রাপ্তি স্থান:** খেজুর সাধারণত মধ্যপ্রাচ্য তথা ইরান, ইরাক, সৌদী আরব এবং পাকিস্থানে হয়ে থাকে। আমাদের দেশের খেজুর অনেক নিম্ন মানের।

**মিযাজ:** ২য় শ্রেণির উষ্ণ এবং ১ম শ্রেণির আর্দ্র।

**বর্ণ:** খেজুর হালকা লাল বর্ণের খয়েরী।

**স্বাদ:** খেজুর খুব মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

**ঘ্রাণ:** খেজুর সুঘ্রাণযুক্ত।

**মাত্রা:** খেজুর ৬ থেকে ১৫ গ্রাম পর্যন্ত সেবন করা যায়।

**প্রতিক্রিয়া:** খেজুর অঙ্গসমূহের আর্দ্রতা শুকিয়ে দেয়।

**সংশোধন:** মিছরী ও বিহিদানা এর সংশোধক।

**প্রতিনিধি:** খেজুরের অভাবে বাবুল ফল ও মাজু ফল ব্যবহার করা যায়।

**বিশেষ ক্রিয়া:** খেজুর পুষ্টিকারক ও যৌনশক্তি বর্দ্ধক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।

**উপকারিতা:** খেজুর পুষ্টিকর, বলকারক, বীর্যবর্দ্ধক এবং স্নায়ু দুর্বলতা নাশক। শ্বাস-কাশ ও বায়ু নাশক। বমন জ্বর ও অতিসারে উপকারী। শরীর মোট করে এবং বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন কারক। অর্দ্ধাঙ্গ বাতে উপকারী।[৬০]

খেজুরের স্বভাব তীব্র গরম। এ কারণে এটাকে নাতিশীতোষ্ণ ফল বলা হয়। খেজুরের মধ্যে প্রচুর খাদ্যোপাদান রয়েছে। এটা তাজা রক্ত উৎপন্নকারী, হজমশক্তি বর্ধক, যকৃৎ ও পাকাশয় সুস্থ রাখে এবং কামশক্তি বৃদ্ধি করে। শরীরকে মোটা করে, মুখের অর্ধাঙ্গ রোগ, পক্ষাঘাত এবং এ ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশকারী রোগের জন্য খুবই উপকারী। খেজুরের বীচিও রোগ নিরাময়কারী। এটা পাতলা পায়খানা বন্ধ করে। পোড়া খেজুর বীচির চূর্ণ প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করে এবং ক্ষতস্থান পরিস্কার করে। এই চূর্ণ মাজন হিসেবে ব্যবহার করলে দাঁত পরিষ্কার হয়।

খেজুর পেটের গ্যাস, শ্লেষ্মা, কফ দূর করে। শুষ্ক কাশি এবং এজমা রোগে উপকারী।

খেজুর সাধারণত মরু অঞ্চলের একটি ফল। এটি খুবই মিষ্টি, পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ খেজুরকে রমযান মাসের ফল হিসেবেই চেনে। তাই দেখা যায়, সারাদিন রোযা রাখার পর ইফতারের সময় অন্য কোন ফল না থাকলেও খেজুর অবশ্যই থাকে। এই ভুল জ্ঞানের কারণেই সারাবছর এ ফলটি আমাদের মনোযোগের আড়ালে

---

৬০. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

থেকে যায় এবং বছরের অন্যান্য মাসগুলোতে আমরা নানা রকমের ফল ক্রয় করলেও রমযান মাস ছাড়া আমরা মোটেও খেজুর ক্রয় করি না। অথচ পুষ্টিমানে যেমন এটি সমৃদ্ধ, তেমনি অসাধারণ এর ঔষধি গুণ। বলা হয়ে থাকে, বছরে যতগুলো দিন আছে খেজুরে তার চেয়েও বেশি গুণ রয়েছে। অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরপুর এই খেজুর আমাদের শারীরিক নানা সমস্যা দূর করতে বিশেষভাবে কার্যকরী। তাই সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য নিয়মিত খেজুর খাওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৫টি করে খেজুর খাওয়ার অভ্যাস রাখা উচিত। তাহলে হাজারো ধরনের শারীরিক সমস্যা থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি কোলেস্টোরাল ও হাইপারটেনশন থেকে মুক্তি দিতেও খেজুরের জুড়ি নেই। খেজুরে রয়েছে ভিটামিন, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, অ্যামিনো অ্যাসিড, ও ট্রিপটোফেন-মেলাটনিন হরমোন এবং কপারের মতো প্রায় ১৫টি খনিজ উপাদান। যা সুস্বাস্থ্য রক্ষায় খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। এছাড়া ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেকের এলার্জি বেড়ে যায়। সিজনাল এলার্জি প্রতিরোধে সালফার খুবই কার্যকরী। আর প্রাকৃতিক খাবারের মধ্যে খেজুর ব্যতীত খুব কম খাবারেই সালফার থাকে। অনেকেই মনে করে, খেজুর যেহেতু মিষ্টি জাতীয় খাবার, তাই শরীরের জন্য এটি ভাল নয়। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কারণ খেজুর মিষ্টি জাতীয় ফল হলেও এর মধ্যে কোন ক্ষতিকর উপাদান নেই। তাই হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا عَائِشَةُ بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ– قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: হে আয়িশা! যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরের লোকেরা অভুক্ত রয়েছে, কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেছেন।[৬১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُوْنُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَ هِيَ النَّخْلَةَ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যা (বরকত ও উপকারিতায়) মুসলমানের সদৃশ। আর তাহলো- খেজুর গাছ।[৬২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَاْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) শসা তাজা খেজুরের সাথে মিলিয়ে খেতেন।[৬৩]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُوْلُ نُكْسِرُ حَرَّ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا وَ بَرْدَ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তরমুজ তাজা খেজুরের সাথে মিলিয়ে খেতেন এবং ইরশাদ করতেন: আমি এর (খেজুরের) গরমকে এর (তরমুজের) ঠান্ডার দ্বারা এবং এর (তরমুজের) ঠান্ডাকে এর (খেজুরের) গরমের দ্বারা বিদূরিত করি।[৬৪]

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ اَدْخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَّ تَمْرًا وَّ كَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَ التَّمْرَ–

অর্থ: সুলায়ম ইবন আমির (র.) বুসরের দুই ছেলে থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট আসেন। তখন আমরা তাঁর সামনে মাখন এবং খেজুর পেশ করি। আর তিনি (সা.) মাখন এবং খেজুর খুবই পছন্দ করতেন।[৬৫]

---

৬১. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: খেজুর ইত্যাদি খাদ্য পরিবারের লোকজনের জন্য সঞ্চিত রাখা, খ. ৬, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং- ৫৩৩২

৬২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খেজুর বৃক্ষের বরকত, খ. ২, পৃ. ১৫৫৭, হাদীস নং- ৫৪৪৮

৬৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৮০, হাদীস নং- ৩৮৩৫

৬৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০, হাদীস নং- ৩৮৩৬

৬৫. প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৮০, হাদীস নং- ৩৮৩৭

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرَدَتْ اُمِّىْ اَنْ تُسَمِّنِىْ لِدُخُوْلِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ فَلَمْ اَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَئٍ مِّمَّا تُرِيْدُ حَتّٰى اَطْعَمَتَنِى الْقِثَّاءُ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَاَحْسَنِ السَّمَنِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি মোটা করে তোলার ইচ্ছা করেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। পরে তিনি আমাকে তাজা খেজুরের সাথে শশা খাওয়াতে থাকলে আমি দ্রুত হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠি।[৬৬]

সুতরাং নানা রোগের মহৌষধ হিসেবে খেজুরের তুলনা হয় না। পুষ্টিগুণে ভরপুর এ ফলটির গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো-

**০১. শরীরে আয়রণ বৃদ্ধি:** খেজুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ আয়রণ, যা এনিমিয়ার মত মরণঘাতী রোগ থেকে রক্ষা করে। রক্তে লৌহিত কণিকার প্রধান উপাদানের অভাবে রক্তশূণ্যতা দেখা দেয়। তাই শিশু ও গর্ভবতী নারীরা এনিমিয়া সমস্যায় ভুগেন। এজন্য একজন মানুষের প্রতিদিন অন্তত ১০০গ্রাম করে খেজুর খাওয়া উচিত। কারণ এতে ০.৯ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে, যা শরীরে রক্তের লৌহিত কণিকা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, প্রতি ১০০গ্রাম খেজুরে ৬৬.৫ গ্রাম সুগার রয়েছে। তাই ভাল লাগলেই গপাগপ করে বেশি খেজুর খাওয়া যাবে না, এতে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং দিনে চার থেকে পাঁচটি খেজুর খাওয়াই উত্তম।

**০২. ডায়রিয়া প্রতিরোধ:** খেজুরে থাকে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম, যা পেটের ভেতরে অন্ত্রগুলোর ব্যাকটেরিয়াকে বিনাশ করে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করে।

**০৩. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর:** খেজুর কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়। কারো কোষ্ঠকাঠিণ্য হলে রাতে খেজুর পানিতে ভিজিয়ে সকালে ঐ পানি পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

**০৪. শরীরের ওজন কমায়:** যারা দিন দিন অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছে, তাদের খালি পেটে নিয়মিত খেজুর খাওয়া উচিত। এতে শরীরের কোলেস্টোরেল কমবে এবং ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

**০৫. কোলেস্টোরেল নিয়ন্ত্রণ:** খেজুর ক্ষতিকর কোলেস্টোরেল বা এলডিএল নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর ভাল কোলেস্টোরেল বৃদ্ধি করে। রক্ত কণিকাগুলোকে পরিষ্কার করে এবং কোথাও রক্ত প্রবাহ বাধার সৃষ্টি হলে তা দূর করে।

**০৬. শক্তিশালী হার্ট:** ফাইবার সব সময় হার্টকে ভাল রাখে। আর একথা তো সকলেরই জানা যে খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। ফলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা অনেক ক্ষেত্রেই কমে যায়। আর রাতে ভেজানো খেজুর সকালে ওঠে খেলে হার্টের জন্য অনেক উপকারী। খেজুরের বিচি গুড়া করেও খাওয়া যায়। এতে হার্ট ভালো থাকে। খেজুরে থাকা ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম শরীরের পেশি ও হাড়ের গঠন মজবুত এবং শক্তিশালী করে।

**০৭. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ:** খেজুর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খেজুরে থাকা ম্যাগনেশিয়াম আর পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। আর এই দু'টি খনিজ খেজুরে প্রচুর পরিমাণে থাকায় এই ফলটি খেলে রক্তচাপ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই যাদের উচ্চ রক্ত চাপের সমস্যা আছে, তারা প্রতিদিন ৫-৬টি খেজুর খেতে পারেন। এতে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খেজুরে থাকা উচ্চ মাত্রার ভিটামিন 'বি' নার্ভকে শান্ত করে রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে।

**০৮. স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়:** খেজুরে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম ও এর মধ্যে থাকা পর্যাপ্ত মিনারেল শরীরের নার্ভাসনেস দূর করতে সহায়তা করে। এজন্য যারা নিয়মিত খেজুর খায় তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি কম।

**০৯. রুচি বৃদ্ধি:** রুচি বাড়াতে খেজুরের কোন তুলনা হয় না। অনেক শিশুরা খেতে চায় না, তাদেরকেও নিয়মিত খেজুর খেতে দিলে রুচি ফিরে আসবে।

**১০. তাৎক্ষণিক এনার্জি লাভ:** খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি রয়েছে। তাই যদি কারো খুব দুর্বল লাগে বা দেহে এনার্জির অভাব অনুভব হয়, তাহলে ঝটপট কয়েকটা খেজুর খেয়ে নিলে তাৎক্ষণিকভাবে দেহে এনার্জি সরবরাহ হবে।

৬৬. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মোটা হওয়া, খ. ২, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং- ৩৯০৬

এছাড়া শুকনো খেজুরের ওযনের শতকরা ৮০ ভাগই চিনি এবং সে কারণেই খাওয়ার সাথে সাথেই তা রক্তে চলে যায়। এজন্য শুকনো খেজুরকে মরুভূমির গ্লুকোজ বলা হয়ে থাকে।

**১১. ক্যান্সার থেকে দূরে থাকা যায়:** খেজুর বিভিন্ন ক্যান্সার থেকে শরীরকে সুস্থ রাখতে অনেক ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, খেজুর লাংস ও ক্যাভিটি ক্যান্সার থেকে শরীরকে দূরে রাখতে সাহায্য করে।

**১২. খাবার হজমে সহায়তা:** খেজুরের মধে রয়েছে স্যলুবল এবং ইনস্যলুবল ফাইবার ও বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড, যা সহজে সহায়তা করে। এতে করে খাবার হজম সংক্রান্ত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এছাড়া তাজা খেজুর নরম ও মাংসল, যা সহজেই হজম ও সহজ পাচ্য।

**১৩. হাড় শক্ত:** খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'কে', সেলেনিয়াম, কপার এবং ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। যা হাড় শক্ত রাখে এবং ক্ষয়ও রোধ করে।

**১৪. মসৃণ ত্বক:** খেজুরে ভিটামিন সি এবং ডি থাকায় নিয়মিত খেজুর খেলে ত্বক মর্সণ হয় এবং চামড়ায় বলি রেখা পড়তে দেয় না।

**১৫. স্মৃতিশক্তি সতেজ:** খেজুরে যথেষ্ট পরিমাণ পটাশিয়াম থাকায় হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই নিয়মিত খেজুর খেলে ফলে স্মৃতিশক্তি সতেজ থাকে।

**১৬. মনকে আনন্দিত করে:** খেজুরে রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড ও ট্রিপটোফেন, যা সিরাটোনিন হরমোন তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এই মিষ্টি ফল মনে আনন্দের অনুভূতি ছড়িয়ে দেয় এবং মনকে খুশি রাখে।

**১৭. বিষণ্নতা দূর:** বিষণ্নতা ও নার্ভাসের কারণে শরীরে নানা ধরনের অসুখ দেখা দেয়। খেজুরে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস ও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন। যা বিষণ্নতা দূর করতে খুবই কার্যকরী।

**১৮. অন্যান্য উপকারিতা:** নারীদের শ্বেতপ্রদর ও শিশুর রিকেট নিরাময়ে খেজুরের কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত এবং মুখের অর্ধাঙ্গ রোগ, পক্ষাঘাত এবং সব ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশকারী রোগের জন্যও খেজুর বেশ উপকারী। খেজুর জ্বর, মূত্রথলির ইনফেকশন, যৌনরোগ, গনোরিয়া, কণ্ঠনালির ব্যথা বা ঠান্ডাজনিত সমস্যা এবং শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধে বেশ কার্যকরী। খেজুর মস্তিষ্ককেও প্রাণবন্ত রাখে।

বাস্তবেই খেজুর একটি সুস্বাদু ফল হিসেবে পরিচিত হলেও এর মধ্যে অনেক ব্যাধির নিরাময় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা হযরত সাঈদ (রা.)-কে দেখতে যান। তিনি ছিলেন হৃদরোগে আক্রান্ত। সাঈদ (রা.)-এর বুকে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমার হৃদরোগ। তুমি মদীনার আজওয়া খেজুর ব্যবহার করো।[৬৭]

খেজুরের আলোচনা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনেও করেছেন। হযরত মারয়াম (আ.) যখন প্রসব ব্যাথায় কাতর ছিলেন, সে সময় তিনি খেজুর গাছের নিচে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন–وَ هُزِّىْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

অর্থ: আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলবে।[৬৮]

আরবে বিভিন্ন প্রকার খেজুর জন্মে থাকে। বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারায় হরেক রকম খেজুর পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সাড়ে চারশ' জাতেরও বেশি খেজুর পাওয়া যায়। এগুলোর রং, আকার, আকৃতি এবং স্বাদ যেমন ভিন্ন তেমনি এগুলোর ক্রিয়াও ভিন্ন। তবে জনপ্রিয় খেজুর হলো আজওয়া, আনবারা, মারয়াম, বরনী, সাফাওয়ি, মুসকানি, সুগায়ি, সেফরি, খুদরি,ওয়ান্নহ, শাকাবী, মাবরুম ও সুখখাল (এই প্রকার খেজুরের শুধু বীচিই কাজে লাগে) ইত্যাদি। তন্মধ্যে আজওয়া, সালবী, জ্বলি ইত্যাদি খেজুরের বৈশিষ্ট্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। আম্বর খেজুর সম্ভবত আকারে সবচেয়ে বড়, সুস্বাদু ও দামী খেজুর। সুবাখখাল খেজুর শুষ্ক ও উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকে। এটাকে বিচীহীন ফল মনে করা হয়। আমাদের দেশের লোকেরা এ ধরনের বীচিহীন খেজুরকেই আজওয়া মনে করে থাকে।

---

৬৭. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২৩
৬৮. আল-কুরআন, ১৯: ২৫

**আজওয়া খেজুর**

আজওয়া অতি উন্নত পর্যায়ের খেজুর ও তৃপ্তিদায়ক। এ খেজুর মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর ঘনত্বও মধ্যম ধরনের এবং রং কালচে বর্ণের হয়। এই খেজুর সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন-

اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ–

অর্থ: আজওয়া জান্নাতের ফল। এর মধ্যে বিষের নিরাময় রয়েছে।[৬৯] হাদীসে আরো উল্লেখ আছে-

عَنْ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَ لاَ سِحْرٌ–

অর্থ: হযরত সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ভোর বেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন বিষ বা যাদু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৭০]

عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرْضًا اَتَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِيْ فُوَادِيْ فَقَالَ اِنَّكَ رَجُلٌ مَّفْئُوْدٌ ائْتَ الْحَارِثَ بْنَ كَلْدَةَ اَخَا ثَقِيْفٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِّنْ عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَاهُنَّ بِنَوَتِهِنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ–

অর্থ: সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি পীড়িত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখার জন্য আসেন। এসময় তিনি তাঁর হাত আমার বুকের উপর রাখলে আমি তার শৈত্যতা আমার হৃদয়ে অনুভব করি। এরপর তিনি ইরশাদ করেন: তুমি হার্টের রোগী, কাজেই তুমি ছাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিছ ইবন কালদার কাছে যাও। কেননা, সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদীনার আজওয়া খেজুরের সাতটি খেজুর নিয়ে তা বীচিসহ চূর্ণ করে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি বড়ি তৈরি করে দেয়।[৭১]

**বরনী খেজুর**

বরনী খেজুর একেবারে কালো না হয়ে সামান্য লালিমা মিশ্রিত কালো রংগের হয়ে থাকে। এ খেজুরের আকার বড় এবং খুবই মিষ্টি। এর শাঁস অধিক এবং বীচি ছোট হয়। এ কারণে সকলেই এই খেজুর বেশি পছন্দ করে থাকে। আখেরী নবী (সা.) এই খেজুরকে ঔষধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ يُخْرِجُ الدَّاءَ وَ لاَ دَاءً فِيْهِ–

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের খেজুরগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম খেজুর হলো বরনী। এটা রোগ নিরাময় করে এবং এতে কোনো রোগ ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।[৭২]

উল্লিখিত বর্ণনাটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। পূর্ণ হাদীসের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ: একদা হজর নামক স্থানে কিছু লোক একটি প্রতিনিধি দলের আকারে নবী কারীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। কথা প্রসঙ্গে নবী কারীম (সা.) তাদের এলাকার খেজুরের নামের এক বিরাট ফিরিস্তি বর্ণনা করতে লাগলেন।

তখন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আপনি যদি হজরে অর্থাৎ আমাদের এলাকায় জন্ম গ্রহণ করতেন তথাপি এর চেয়ে বেশি নাম জানতেন না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। অন্যাথায় আপনি আমাদের এলাকার এতো খেজুরের নাম জানতে পারতেন না। নবী কারীম (সা.) বললেন: আমার সামনে এই মাত্র তোমাদের দেশের সমস্ত ভূখণ্ড তুলে ধরা হয়েছে এবং আমি এর এক

---

৬৯. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মাশরূম ও আজওয়া খেজুর, খ. ৪, পৃ. ৯৬, হাদীস নং- ৩৪৫৫
৭০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: আজওয়া খেজুর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা, খ. ২, পৃ. ১৬৩৭, হাদীস নং- ৫৭৬৯
৭১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: আজওয়া খেজুর, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং- ৩৮৭৯
৭২. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৬, হাদীস নং- ৭৫২৮

প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। তাই বুঝতে পারলাম তোমাদের এলাকায় খেজুরের মধ্যে বরনী খেজুরই সর্বোত্তম খেজুর। এটা রোগ নিরাময় করে এবং কোনো রোগ বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।[৭৩]

**সতর্কতা**

যাদের মাইগ্রেন বা প্রচণ্ড মাথা ব্যথার সমস্যা রয়েছে, তাদের খেজুর না খাওয়াই ভালো। কারণ ছোট মিষ্টি খেজুর 'টিরামিন' বলে যে পদার্থটি রয়েছে, তা মাথা ব্যথা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। তাছাড়া যারা অধিক ডিপ্রেশনে ভুগে, তাদের জন্যও খেজুর খাওয়া ঠিক নয়। এক্ষেত্রে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

**কুরআনে বর্ণিত তীন ফলের উপকারিতা**

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হাজার বছর আগে তীন বা ডুমুর চাষের খোঁজ পাওয়া যায়। এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে এটি প্রাকৃতিকভাবে জন্মে। পনের শতকে ইংল্যান্ড এবং মেক্সিকোতে ঔষধি গাছ হিসেবে এটি বেশ পরিচিতি লাভ করে এবং ব্যাপকভাবে তীনের চাষ শুরু হয়।

**পরিচিতি:** বাংলায়-ডুমুর, আরবী ভাষায়-তীন এবং হিন্দি-উর্দু-ফারসী ভাষায়-আঞ্জীর এবং ইংরেজিতে- Gular Figবলা হয়।এই গাছটি ৩০ থেকে ৪০ ফুট উঁচু হয়। ছাল পুরু ও মসৃণ লালের আভাযুক্ত ধূসর বর্ণের কাটা কাট। কাঠ ধূসর বর্ণের এবং পাতার অগ্রভাগ ক্রমশ সরু ও তিনটি শিরা বিশিষ্ট। পাতা খসখসে। ফলের আবরণ ভাগ খুবই পাতলা এবং এর অভ্যন্তরে অনেক ছোট ছোট বীজ রয়েছে। এর ফল শুকনো এবং পাকা অবস্থায় ভক্ষণ করা যায়। ফল অপেক্ষাকৃত বড় এবং পাকলে লাল বর্ণ হয়। তীন ফল অতিশয় মিষ্টি এবং নরম। বসন্তকালে ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে। তিন থেকে পাঁচটি লতিযুক্ত বড় বড় ডুমুর পাতার গঠন বিন্যাস কিছুটা মানুষের হাতের ন্যায় এবং সম্ভবত এ কারণে প্রাচীন খ্রিষ্টীয় চিত্রকলা ও ভাষ্কর্যে বহি:স্থ জননেন্দ্রীয়সমূহকে এর পাতা দিয়ে ঢেকে রাখার একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।[৭৪]

**প্রাপ্তিস্থান:** উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে সাধারণত এ প্রজাতির গাছ জন্মে। গ্রামে গঞ্জে যেখানে সেখানে ডুমুর গাছ দেখা যায়, কিন্তু শহরে এ গাছ পাওয়া যায় না। ডুমুর গাছ কেউ লাগায় না, আপনা আপনি হয়। তীন বাংলাদেশসহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মে। বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ হয়ে থাকে আফগানিস্তান থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত। ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৮৮১ সালে তীনের সন্ধান পাওয়া যায়। এর আদি নিবাস মধ্যপ্রাচ্য। শাম ও ফিলিস্তিনে এ গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শামবাসীদের জন্য এটা একটি লাভজনক অর্থকরি ফসল।আরব দেশের তীন গাছ আমাদের দেশের তীন (ডুমুর) গাছ অপেক্ষা অনেক বড় এবং পাতা আমাদের দেশের ডুমুর পাতার ন্যায় খসখসে নয়। বাংলাদেশে যে ডুমুর পাওয়া যায় তার বোটানিক্যাল নাম হলো- Ficus glomerbata Rox.[৭৫]

**মিযাজ:** শুষ্ক তীন ২য় শ্রেণির উষ্ণ এবং ১ম শ্রেণির আর্দ্র। পাকা তীন ১ম শ্রেণির উষ্ণ ও ২য় শ্রেণির শুষ্ক। মতান্তরে ২য় শ্রেণির আর্দ্র। গাছের কস বা দুধ অত্যন্ত উষ্ণ প্রকৃতির।

**বর্ণ:** কাঁচা তীন সবুজ এবং পাকলে হলুদাভাব লাল বর্ণ ধারণ করে।

**স্বাদ:** পাকা তীন অত্যন্ত মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

**গন্ধ:** পাকা তীন সুঘ্রাণযুক্ত।

**মাত্রা:** তীন ২ থেকে ১০টি পর্যন্ত সেবন করা যায়।

**প্রতিক্রিয়া:** অতিরিক্ত মাত্রায় তীন সেবনে যকৃত, পাকস্থলী ও দাঁতের জন্য ক্ষতিকারক।

**সংশোধন:** শুষ্ক তীনের জন্য আখরোট ও আনিসুন এবং পাকা তীনের জন্য সেকেনজাবীন সংশোধক।

**বিশেষ ক্রিয়া:** তীন অত্যন্ত পুষ্টিকারক।

---

৭৩. *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৮

৭৪. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক লিখিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৫৮৩

৭৫. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

**রাসায়নিক উপাদান:** তীনে প্রচুর পরিমাণ শর্করা এবং বিভিন্ন বিজারক চিনি যেমন ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ পাওয়া যায়। এতে ৫০% পর্যন্ত মনোস্যাকারাইড এবং অলিগো-স্যাকারাইড থাকে। এতে কিছু ফিউরানো-কোমারিন যেমন সোরালিন এবং বারগাপটিন পাওয়া যায়। ডুমুরে সাইট্রিক এসিড, ম্যালিক এসিডসহ কিছু জৈব এসিড থাকে। এতে পেকটিন এবং মিউসিলেজ জাতীয় পদার্থ থাকে।

**প্রতি ১০০ গ্রাম তীনে প্রাপ্ত উপাদান**

| ক্রম | নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০১. | ক্যালরি | ৩৫২ |
| ০২. | প্রোটিন | ৬ গ্রাম |
| ০৩. | ফ্যাট | ১.২গ্রাম |
| ০৪. | কার্বোহাইড্রেট | ৯ গ্রাম |
| ০৫. | ফাইবার | ৭ গ্রাম |
| ০৬. | আঁশ | ৩.৮ গ্রাম |
| ০৭. | ক্যালসিয়াম | ২২০ মিলিগ্রাম |
| ০৮. | ফসফরাস | ১৩৩ মিলিগ্রাম |
| ০৯. | আয়রন | ২.৭ মিলিগ্রাম |
| ১০. | সোডিয়াম | ৯ মিলিগ্রাম |
| ১১. | পটাশিয়াম | ৮৬২ মিলিগ্রাম |
| ১২. | ভিটামিন-এ | ৩৪৭ মিলিগ্রাম |
| ১৩. | থায়ামিন (বি ১) | ০.২৫ মিলিগ্রাম |
| ১৪. | রিবোফ্লাভিন (বি ২) | ০.২৫ মিলিগ্রাম |
| ১৫. | নিয়াসিন | ২ মিলিগ্রাম |
| ১৬. | ভিটামিন-সি | ৯.২২ মিলিগ্রাম |

তীন ফল খাদ্য ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হলেওফল হিসেবে যে তীন বা ডুমুর খাওয়া হয় তা মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়। এটি আকারে বেশ বড়, মিষ্টি এবং ফল হিসেবেও খুব জনপ্রিয় ওঅনন্য। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই ডুমুর বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। এছাড়াও স্ন্যাক জাতীয় খাবারেও ডুমুরের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশক্তি, ভিটামিন এ, বি, শর্করা, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও আয়রন।[৭৬]
উল্লেখ্য পবিত্র কুরআনে তীন নামক একটি স্বতন্ত্র সূরা রয়েছে।[৭৭] হাদীসে এসেছে-

أُهْدِىَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَبَقٌ مِنْ تِيْنٍ فَقَالَ لِاَصْحَابِه كُلُوْا فَلَوْ قُلْتُ اِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلَاعَجَمٍ لَقُلْتُ هِيَ التِّيْنُ وَ اَنَّه يَذْهَبُ بِالْبَوَاسِيْرِ وَ يَنْفَعُ النَّقْرِسَ–

অর্থ: একদা হাদিয়া হিসেবে নবী কারীম (সা.)-এর নিকট এক প্লেট তীন (ডুমুর) আসলে তিনি সাহাবাদের বললেন, তোমরা খাও। আমি যদি বলতাম যে জান্নাত থেকে ফল এসেছে, তবে আমি নিশ্চয় বলতাম যে এটা হলো তীন। এটা অশ্ব রোগ দূর করে এবং গেঁটে বাতের ব্যথার জন্য উপকারি।[৭৮]
হাদীসে বর্ণিত নরকস অর্থ ছোট অস্থিসন্ধির ব্যথা, যা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। এটাকে দাউল মাফাসিল বা গেঁটে বাত বলা হয়। আর বাওয়াসির হলো, অর্শ্বরোগ। ডুমুরের রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা। যেমন-

---

৭৬. মেহেনুল হক ইফরান,*https://bn.quora.com.* তীন ফলের উপকারিতা(থেকে উদ্ধৃত)
৭৭. সূরা নং- ৯৫
৭৮. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

**১. ওযন নিয়ন্ত্রণ:** খাদ্য আঁশ সমৃদ্ধ ডুমুর ওযন কমাতে সাহায্য করে। ডুমুরে বিদ্যমান পেকটিন রক্তে কোলেস্টোরেল মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডায়াবেটিস রোগকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। ডায়াবেটিস রোগে ডুমুর গাছের মূলের রস খুবই উপকারি।

**২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ:** তীন বা ডুমুর ফলে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে। আর পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকর। এছাড়াও তীন বা ডুমুর ফল চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। শিশুদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে তীন ফল একান্ত অপরিহার্য।[৭৯]

**৩. স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ:** সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, মেনোপজ পরবর্তী পর্যায়ে স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে তীন ফল সাহায্য করে। আঁশ সমৃদ্ধ ডুমুর খেলে ৩৪% মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম দেখা দেয়।

**৪. হাড় বৃদ্ধি:** ডুমুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াস রয়েছে। অতিরিক্ত হাই-সল্ট ডায়েট মেনে চললে ইউরিনের মধ্য দিয়ে অনেক ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়। এই ক্যালসিয়াম লস প্রতিরোধ করতে ডুমুরের পটাশিয়াম সাহায্য করে। এভাবে ডুমুর হাড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়া ডুমুর হাড়ের ক্ষয়রোগও প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

**৫. শারীরিক দুর্বলতা দূর:** শারীরিক দুর্বলতায় ভোগেন এমন ব্যক্তির জন্য তীন ফল খুবই উপকারি। বিশেষ করে মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁট ফাটার সমস্যা থাকলে তা নিরাময় করতে তীন সাহায্য করে।

**৬. চর্ম রোগ নিরাময়:** কাঁচা তীন বা ডুমুর ফল চর্মরোগের ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। থেঁতো করে ব্রণ ও মেছতায় নিয়মিত লাগালে তা সেরে যায়।

এছাড়া তীন হজমকারক, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও বায়ু নাশক এবং প্রতিবন্ধকতা অপসারক। সর্দি, কাশি, হাঁপানী ও জ্বর নাশক। মৃগী, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ ও ডিপথেরিয়াসহ অন্যান্য বলগম জনিত রোগে উপকারি। প্লীহা বৃদ্ধি ও বুকের ব্যথা নাশক এবং দেহের পুষ্টিজনক ও রক্ত সৃষ্টিকারক। মেযাজ নরম কারক ও মূত্র কারক এবং শরীরের ক্লেদ নাশক ও রতিশক্তি বর্ধক। কিডনীর দুর্বলতা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব রোধক ও পাথুরী নাশক এবং অর্শ ও বসন্ত রোগে উপকারি। মূত্রথলী ও কিডনীর পাথুরীর জন্য দৈনিক ৫টি করে তীন সেবন উপকারি। তীণ দুধের সাথে সিদ্ধ করে প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে। তীন, বাদাম ও পেস্তা সেবনে বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক।[৮০]

**কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যায়তুন ফলের উপকারিতা**

যায়তুন একটি বরকতময় ফল। বাংলায় একে জলপাই, ফারসীতে আবী যাইত, উর্দূতে যায়তুন এবং ইংরেজিতে Oliveবলা হয়ে থাকে। যেসকল ফলের কথা পবিত্র কুরআনে এসেছে এর মধ্যে যায়তুন ফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যায়তুনের আলোচনা সম্ভবত সকল আসমানী সহীফায় এসেছে। তাওরাত ও ইঞ্জিল ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন শরীফে চার জায়গায় যায়তুন শব্দটি উল্লেখ করেছেন। তিনি সূরা তীনে এই বরকতময় ফলের কসম খেয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে – وَالتِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ– وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ– وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ–

অর্থ: শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যায়তুনের এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কার)।[৮১]

উক্ত আয়াতসমূহে ৪টি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে- তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যায়তুন বৃক্ষও বিপুল উপকারি বস্তু।[৮২] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন – يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ–

---

৭৯. মো: মিন্টু হোসেন ও আকমল হোসেন, *https://www.prothomalo.com/life.* ভেষজ গুণের ডুমুর,আপডেট: ১৯.০৯.২০১৮(থেকে উদ্ধৃত)

৮০. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

৮১. আল-কুরআন, ৯৫: ১-৩

৮২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী', (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন-সংক্ষিপ্ত*, বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ-এর নির্দেশ পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত: ১৪১৩ হি., পৃ. ১৪৬৪

অর্থ: আর তিনি এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল। যায়তুন, খেজুর, আঙুর ও সব ধরনের ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৮৩]

যায়তুন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি তা তেল উৎপাদন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও।[৮৪]পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমনেও যায়তুনের কথা উল্লেখ আছে।

**পরিচিতি:** যায়তুন এটি বিশেষ পরিচিত ফল। এ গাছ ৮ থেকে ১৫ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। এর পাতা ৪ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১ থেকে ৩ সেন্টিমিটার প্রশস্ত হয়ে থাকে। আর যায়তুন ফল বেশ ছোট আকারের, লম্বায় ১-২.৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এর পুষ্ট পাকা ফল থেকে তেল বের হয়। যাকে আমরা রওগণ বলে থাকি। রং সবুজাভাব হলুদ হয়ে থাকে।

**প্রাপ্তিস্থান:** ভূমধ্য সাগরীয় এলাকার দেশসমূহে যেমন- লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরাক ও ইরানে ভালো জন্মে। যায়তুন তেলের জন্য চাষ করা হয়। বাংলাদেশেও জলপাই-এর চাষ হয়। তবে যায়তুন ও জলপাই-এর ক্রিয়ার দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে।

**মিযাজ:** যায়তুন ১ম শ্রেণির উষ্ণ ও আর্দ্র।

**বর্ণ:** যায়তুন গাছের পাতা ও ফল সবুজ বর্ণের এবং ফল পাকলে হলুদ মিশ্রিত হয়।

**স্বাদ:** যায়তুন টকযুক্ত হালকা মিষ্টি স্বাদের।

**গন্ধ:** যায়তুন সুগন্ধযুক্ত।

**মাত্রা:** যায়তুন ৬ গ্রাম থেকে ২৫ গ্রাম পর্যন্ত সেবন করা যায়।

**প্রতিক্রিয়া:** ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত রোগী অতিরিক্ত মাত্রায় যায়তুন সেবনে ক্ষতি হয়।

**সংশোধন:** মগজে বাদাম ও আখরোট এর সংশোধক।

**প্রতিনিধি:** যায়তুন তেলের অভাবে বাদাম তেল ব্যবহার করা যায়।

**বিশেষ ক্রিয়া:** যায়তুন ক্ষুধাবর্ধক ও যৌনশক্তি বর্ধক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।

বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধে শান্তির প্রতীক যায়তুন তথা জলপাই-এর পাতা এবং মানুষের শরীরের শান্তির দূত হলো যায়তুনের তেল। যাকে liquid gold বা 'তরল স্বর্ণ' নামেও ডাকা হয়। সেই গ্রিক সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল থেকেই এ তেল ব্যবহার হয়ে আসছে রন্ধন কাজে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে। আকর্ষণীয় ও মোহনীয় সব গুণাবলী এ যায়তুন তেলের মধ্যে রয়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন- খাবারে যায়তুনের তেল ব্যবহারের ফলে শরীরের ব্যাড কোলেস্টরেল নিয়ন্ত্রণ হয় এবং গুড কোলেস্টরেল জন্ম হয়। তাছাড়া পাকস্থলীর জন্য এ তেল খুবই উপকারী। হাদীসে এসেছে-

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَ الْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ–

অর্থ: হযরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) 'যাতুল যাম্ব' তথা ফ্লুরিসি বা পাঁজরের ব্যথাজনিত রোগে এবং অরসের উপকারিতায় যায়তুনের প্রশংসা করতেন।[৮৫]

কোনো কোনো লোক 'অরস' দ্বারা 'যাফরান' বুঝিয়ে থাকেন, তা ঠিক নয়। উল্লিখিত হাদীসে 'যাইত' দ্বারা উদ্দেশ্য যায়তুন। অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِئْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وَ ادَّهِنُوْا بِهِ ، فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ–

অর্থ: উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা যাইতুন তেল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখো, কারণ তা বরকতপূর্ণ গাছ থেকে হয়।[৮৬]

---

৮৩. আল-কুরআন, ১৬: ১১

৮৪. আল-কুরআন, ২৩: ২০

৮৫. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৪, হাদীস নং- ৭৫২১

৮৬. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: যায়তুন তৈল, খ. ৪, পৃ. ৩৪, হাদীস নং- ৩৩১৯

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَ ادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مُبَارَكُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যাইতুন তেল খাও এবং তা দেহে মাখো, কারণ তা বরকতপূর্ণ।[৮৭]

**উপকারিতা:** যায়তুন মোলায়েম কারক ও পাথুরী নাশক। শরীরের প্রোটিনের অভাব দূরকারক এবং শক্তিবর্ধক। অন্ত্রনালীর প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং প্রদাহ ও ক্রিমি নাশক। শরীরের অধিক কোলেস্টোরাল কমায় এবং কুলঞ্জ ও পিত্ত পাথুরী নাশক। যায়তুন তেল ঠোঁট ফুলা, ঘা, ফোড়া, পোড়া ঘা, চুলকানী, অর্শ, বাত ও গন্ডমালা ইত্যাদি রোগে উপকারি। এছাড়া শরীর আর্দ্র কারক, বর্ণ প্রসাদক, স্নিগ্ধকারক এবং শীতল প্রকৃতির ব্যথা ও গুহ্যদ্বারে ক্ষয়নাশক। শিশুদের শীতলতা থেকে রক্ষা করে এবং উষ্ণতা বাড়ায়। হাঁপানী ও ফুসফুসের রোগে যায়তুন তেল ব্যবহার করা হয়। অন্ত্রনালীর প্রতিবন্ধকতায় গ্লিসারিনসহ যায়তুন তেল ব্যবহার করতে হয়। আলকিন্দি যায়তুনের পাতা মাড়ীর ব্যথায় এবং দাঁতের রোগে ব্যবহার করতেন। হুনায়েন ইবন ইসহাক চোখের রোগে যায়তুন তেল ব্যবহার করতেন। আল বিরুনীর ভাষায়- যায়তুন কাঠ পোড়ালে যে তেল হয়, তা পাঁচড়া ও দাঁতের রোগে উপকারী।[৮৮]

যায়তুন তেলের উপকারিতা অপরিসীম। শরীরের ছোট ছোট গ্রন্থি বা সন্ধি, বিশেষত আঙ্গুল, হাঁটু, গোড়ালি ও হাতের কব্জির সন্ধিতে তীব্র ব্যথায় যায়তুন তেল মালিশ করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। ইউনানী পরিভাষায় এই রোগকে 'নিকরেস' বা গেঁটেবাত বলা হয়।[৮৯] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ–

অর্থ: তোমরা যায়তুন তেল খাও এবং এটা মালিশ করো। কেননা এটা এক বরকতময় বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয়েছে।[৯০]

**যায়তুনের পুষ্টিগুণ**

যায়তুন খুবই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ একটি ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম যায়তুনে নিম্নবর্ণিত পুষ্টিগুণ রয়েছে-

| ক্রম | নাম | পুষ্টিগুণের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০১. | খাদ্যশক্তি | ১৪৬ কিলোক্যালরি |
| ০২. | শর্করা | ৩.৮৪ গ্রাম |
| ০৩. | চিনি | ০.৫৪ গ্রাম |
| ০৪. | খাদ্য আঁশ | ৩.৩ গ্রাম |
| ০৫. | চর্বি | ১৫.৩২ গ্রাম |
| ০৬. | আমিষ | ১.০৩ গ্রাম |
| ০৭. | ভিটামিন এ | ২০ আইইউ |
| ০৮. | বিটা ক্যারোটিন | ২৩১ আইইউ |
| ০৯. | থায়ামিন | ০.০২১ |
| ১০. | রিবোফ্লাবিন | ০.০০৭ মিলিগ্রাম |
| ১১. | নিয়াসিন | ০.২৩৭ মিলিগ্রাম |
| ১২. | ভিটামিন বি৬ | ০.০৩১ মিলিগ্রাম |
| ১৩. | ফোলেট | ৩ আইইউ |

৮৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: যাইতুন তৈল, খ. ৪, পৃ. ৩৫, হাদীস নং- ৩৩২০

৮৮. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪, ৩১৫

৮৯. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২৩

৯০. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর, (অনুবাদ: অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক), *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ৭, পৃ. ৫৩৪

| | | |
|---|---|---|
| ১৪. | ভিটামিন ই | ৩.৮১ মিলিগ্রাম |
| ১৫. | ভিটামিন কে | ১.৪ আইইউ |
| ১৬. | ক্যালসিয়াম | ৫২ মিলিগ্রাম |
| ১৭. | আয়রন | ৩.১ মিলিগ্রাম |
| ১৮. | ম্যাগনেসিয়াম | ১১মিলিগ্রাম |
| ১৯. | ফসফরাস | ৪মিলিগ্রাম |
| ২০. | পটাশিয়াম | ৪২ মিলিগ্রাম |

নিম্নে রোগভিত্তিক যায়তুনের উপকারিতা উপস্থাপন করা হলো:

**১. ক্যান্সার প্রতিরোধ:** কালো যায়তুন ভিটামিন ই-এর ভালো উৎস। যায়তুনে আছে মনোস্যাটুরেটিড ফ্যাট। যায়তুনের ভিটামিন ই কোষের অস্বাভাবিক গঠনে বাধা দেয়। ফলে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমে।

**২. হৃদযন্ত্রের উপকারিতা:** মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তনালীতে চর্বি জমলে হার্টএ্যাটাক করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। যায়তুনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হার্ট ব্লক হতে বাধা দেয়। যায়তুনে রয়েছে মোনো-স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা আমাদের হার্টের জন্য খুবই উপকারী।

**৩. ওযন কমায়:** যখন যায়তুনের মোনো-স্যাচুরেটেড ফ্যাড অন্য খাবারে বিদ্যমান স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়, তখন তা দেহের ভেতরের ফ্যাট সেলকে ভাঙতে সাহায্য করে। যায়তুনের তেলেও রয়েছে লো কোলেস্টরেল যা ওযন এবং ব্লাড প্রেশার কমাতে সহায়ক।

**৪. আয়রনের উৎস:** বিশেষ করে কালো যায়তুন আয়রনের উৎস। আয়রন আমাদের দেহে রক্ত চলাচল করাতে সহায়তা করে। আর প্রাকৃতিক আয়রনের উৎসের জন্য যায়তুন-ই সেরা।

**৫. অ্যালার্জি প্রতিরোধ:** গবেষণায় দেখা গেছে, যায়তুন অ্যালার্জি প্রতিরোধে সহায়তা করে। যায়তুনে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা ত্বকের ইনফেকশন ও অন্যান্য ক্ষত সারাতে কার্যকরি ভূমিকা রাখে।

**৬. কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর:** যায়তুনে যে খাদ্য আঁশ আছে, তা মানুষের দেহের পরিপাক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং হজমে সহায়থা করে। নিয়মিত যায়তুন খেলে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। যায়তুন খাবার পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, গ্যাস্টিক ও আলসারের হাত থেকেও মুক্তি দেয়। যায়তুনের তেলে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকায় বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। ফলে কোষ্ঠ-কাঠিন্যের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

**৭. ত্বক ও চুলের যত্ন:** কালো যায়তুনের তেলে আছে ফ্যাটি এসিড ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ত্বক ও চুলের যত্নে কাজ করে। যায়তুনের ভিটামিন ই ত্বকে মসৃণতা আনে। চুলের গঠনকে আরো মজবুত করে। ত্বকের ক্যান্সারের হাত থেকেও বাঁচায়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির (Ultra Violet Ray) কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয় তা রোধ করে যায়তুন।

**৮. চোখের যত্ন:** যায়তুনে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ভিটামিন 'এ' চোখের জন্য খুবই উপকারি। যাদের চোখ আলো ও অন্ধকারে সংবেদনশীল তাদের জন্য ওষুধের কাজ করে যায়তুন।

**৯. হাড়ের ক্ষয়রোধ:** যায়তুনের মনো-স্যাটুরেটেড ফ্যাটে থাকে এন্টি ইনফ্লামেটরি এবং ভিটামিন 'ই' ও পলিফেনাল। যা অ্যাজমা ও বাত-ব্যাথাজনিত রোগের হাত থেকে বাঁচায়। বয়সজনিত কারণে অনেকেরই হাড়ের ক্ষয় হয়। এই হাড়ের ক্ষয়রোধ করে যায়তুনের তেল।

**১০. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** যায়তুনে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যা দেহের ক্যান্সারের জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়ায়।

**১১. বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ:** যায়তুন সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ থেকে মুক্তি দেয়। নিয়মিত যায়তুন খেলে পিত্তথলির পিত্তরসের কাজ করতে সুবিধা হয়। পরিণামে পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা কমে যায়। এর তেলে চর্বি বা

কোলেস্টোরেল থাকে না। তাই তা ওযন কমাতে কার্যকর। তাছাড়া যেকোন কাটা-ছেঁড়া, জ্বর, হাঁচি-কাশি, সর্দি ভালো করার জন্য যায়তুন খুবই উপকারি।[৯১]

**আঙুরের গুণাবলী**

আঙুর সবার কাছে পরিচিত একটি ফল এবং এটিকে অভিজাত ফল হিসেবেও গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে রোগীর পথ্য হিসেবেই আঙুর বেশি ব্যবহৃত হয় এবংঅন্যান্য ফলের তুলনায়দামও একটু বেশি। তবে স্বাস্থ্যের জন্য এটি অনেক ভালো একটি ফল।

**ভাষানুযায়ী নামঃ** বাংলা আঙুর, আরবী- আনার, ফারসী-আঙুর, উর্দু- মুনাক্কা, হিন্দি- দ্রাক্ষা, ইংরেজি- Grape. বোটানিক্যাল-Vitis vinifera Linn.

**পরিচিতিঃ** আঙুর শক্ত লতা জাতীয় গাছ। লম্বা আঁকড়ীর মাধ্যমে গাছে বা মাচায় জড়িয়ে বড় হয়। পাতা করলা বা উচ্ছে পাতার মতো উপরের দিকে লোমযুক্ত এবং বসন্তকালে ঝড়ে যায়। পাতার গোড়ার দিকে হৃদপিণ্ডকৃতির ৫ ভাগে বিভক্ত। কিনারাগুলো দাঁতযুক্ত এবং পাতার মধ্যশিরা ৪ থেকে ৫ জোড়া। ফুল সবুজ বর্ণের সুগন্ধযুক্ত। পাতার অগ্রভাগে মুকুল হয়। ফলে ৩ থেকে ৫টি বীজ হয়। ৬ হতে ৩০০টি পর্যন্ত আঙুর এক সাথে একই থোকায়ধরে থাকে। শীতপ্রধান দেশে ফেব্রুয়ারী হতে জুন মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হয় এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হতে থাকে। সাধারণত ২ বর্ণের আঙুর হয়। যেমন- কালো বা খয়েরী এবং সবুজ বর্ণের। এছাড়া নীল, সোনালী, সাদা, বেগুনি-লাল, লাল-সাদা বিভিন্ন বর্ণেরও রয়েছে। ছোট আকারের আঙুর শুকিয়ে কিসমিস করা হয় এবং গরুর দুধের বোঁটার মতো বড় আকারেরআঙুর শুকিয়ে মুনাক্কা করা হয়। সর্বপ্রকার আঙুরই এক গাছের ফল।[৯২]

**প্রাপ্তিস্থানঃ** বাংলাদেশসহ উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঙুর জন্মে। উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের আঙুর উৎকৃষ্ট।

**মিযাজঃ** পাকা আঙুর ১ম শ্রেণির উষ্ণ ও আর্দ্র। মতান্তরে ২য় শ্রেণির উষ্ণ ও আর্দ্র। কাঁচা আঙুর ২য় শ্রেণির শীতল শুষ্ক।

**বর্ণঃ**কাঁচা আঙুর সবুজ ও কালো বর্ণের এবং পাকলে হলুদাভ ও গাঢ় কালো বর্ণের হয়। শুষ্ক আঙুর কালো ও হলুদ মিশ্রিত হয়।

**স্বাদঃ** আঙুর টকযুক্ত মিষ্টি স্বাদের।

**গন্ধঃ** আঙুর সুগন্ধযুক্ত।

**মাত্রাঃ** আঙুর ২টি থেকে ১০টি পর্যন্ত বা হজমশক্তি অনুযায়ী সেবন করা যায়।

**প্রতিক্রিয়াঃ** অতিরিক্ত মাত্রায় আঙুর সেবনে পাকস্থলী, যকৃত ও প্লীহার ক্ষতিকারক।

**সংশোধনঃ** জিরা, মৌরী ও সেকেন্‌জাবীন এর সংশোধক।

**প্রতিনিধিঃ** এক প্রকার আঙুরের পরিবর্তে অন্য প্রকার এবং আঙুরের অভাবে আঞ্জির ব্যবহার করা যায়।

**বিশেষ ক্রিয়াঃ** আঙুর ভিটামিন সি যুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য এবং হৃদপিন্ড ও যকৃতের শক্তিবর্দ্ধক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।

**ইউনানী মতে উপকারিতাঃ** আঙুর সেবনে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হয়। পাকা আঙুর শীঘ্র পরিপাক হয় এবং সওঘাত ঘটিত ক্লেদ ও বিকৃত ধাতুসমূহ দূর করে। হৃদপিন্ডের শক্তি বর্দ্ধক ও আনন্দদায়ক এবং খাপখান ও গাসী রোগ নাশক। বক্ষস্থল বহিস্কারক। এছাড়া পাকস্থলির কফনাশক, সংকোচক, যকৃত ও কিডনীর সবলকারক। পিপাসা নিবারক ও দেহের অলসতা নাশক। আঙুর গায়ে মাখলে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ দূর হয় ও চুলকানী নাশক। রুবে আঙুর পাকস্থলীর জ্বালা ও পিপাসা নাশক এবং মদ্যপান জনিত মদ্যতা নিবারক ও পাকস্থলি সবলকারক। খতমীর সাথে আঙুর মিশিয়ে প্রলেপ ব্যবহার ফোলা দূর হয় এবং লোমকুপ উন্মুক্ত হয়। আঙুর সেবনের পর ঠান্ডা পানি পান করা নিষেধ। আঙুর বীজ কোষ্টকারক ও বায়ুবর্দ্ধক।[৯৩]

সত্যিই অবাক হতে হয়, মানুষের জন্য নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত রসালো এ ছোট্টফলটিতে আছে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, খনিজ ও ভিটামিন- যা স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য দরকারি। সুস্বাদু এ ফলের আছে নানা খাদ্য ও

---

৯১. মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা,*https://www.kalerkantho.com.* প্রিয় নবীর প্রিয় ফল জয়তুন, ০৫.১১.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

৯২. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-২৯৯

ভেষজ গুণ।আঙুর শুকিয়েতৈরিকৃতকিসমিস পায়েশ, পোলাও এবং অন্যান্য খাদ্য আইটেমে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। আঙুরে রয়েছে ভিটামিন কে, সি, বি-১, বি-৬ এবং খনিজ উপাদান ম্যাংগানিজ ও পটাশিয়াম। আঙুর কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা ও হৃদরোগের মতো রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।আঙুরের বীজ ও খোসায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা বার্ধক্য রোধে কাজ করে। শুধু তাই নয়, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালিগুলোকে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকেও রক্ষা করে। আঙুরের সেলুলাস ও চিনি কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে সহায়ক। যারা রক্ত সঞ্চালনেরভারসাম্যহীনতায় ভোগছে তাদের জন্য আঙুরের জুস খুবই উপকারি। আঙুরের ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের সহায়ক ও ইনসুলিন বৃদ্ধি করে। আঙুরের জুসে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিইনফ্লামিটরির মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রদাহ দূর করে। এই প্রদাহ ক্যানসার রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ হতে পারে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, ডায়রিয়া, ত্বক ও মাইগ্রেনের সমস্যা দূর করতেও আঙুর সহায়তা করে।পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় এই ফলটির কথা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুস্বাদু ফল এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো।[৯৪] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন–فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حبًّا– وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا

অর্থ: অত:পর আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর ও শাক-সবজি।[৯৫] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ– اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ–

অর্থ: তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যায়তুন, খেজুরগাছ, আঙুর এবং ফলফলাদি। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে এমন জাতির জন্য, যারা চিন্তা করে।[৯৬] হাদীসে এসেছে-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنَبُ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِىْ فَقَالَ خُذْا الْعُنْقُوْدَ فَاَبْلِغْهُ اُمَّكَ–

অর্থ: নুমান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য তায়েফ থেকে আঙ্গুর ফল হাদিয়া দেয়া হলে তিনি আমাকে বললেন, এই আঙ্গুরের গুচ্ছ তুমি নাও এবং তোমার মাকে পৌঁছিয়ে দাও।[৯৭]

عَنْ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِيَدِهِ سَفَرَ جَلَةُ فَقَالَ دُوْنَكَهَا– يَا طَلْحَةُ! فَاِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ–

অর্থ: তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর হাতে ছিল এক জাতীয় অম্ল ফল। তিনি বললেন, হে তালহা! এগুলো নাও। এগুলো অন্তরকে শান্তি দেয়।[৯৮]

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত এই ফলটির পুষ্টিগুণের শেষ নেই। এতে প্রোটিন, শর্করা, চর্বি, ক্যালসিয়াম, ফরফরাস, লৌহ, খনিজ, পটাশিয়াম, থিয়ামিন, রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন-এ, বি, সি, সব উপাদানই রয়েছে।তাছাড়া প্রতি কেজি আঙুর থেকে প্রায়৪৫০ ক্যালরি খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। নিম্নে আঙুরের আরো কিছু উপকারিতা উপস্থাপন করা হলো-

**১. কোলস্টেরলের মাত্রা কমায়:** আঙুরে টরোস্টেলবেন নামক এক ধরনের যৌগ থাকার কারণে রক্তে কোলস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

**২. হাড় শক্ত:** আঙুরে প্রচুর পরিমাণে তামা, লোহা ও ম্যাংগানিজের মতো খনিজ পদার্থ থাকে যা হাড়ের গঠন ও হাড় শক্ত করতে কাজ করে।

**৩. অ্যাজমা প্রতিরোধ:** আঙুরের ঔষধি গুণের কারণে এটি অ্যাজমার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। ফুসফুসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ায় ছোট এই ফলটি।

**৪. বদহজম দূর:** নিয়মিত আঙুর খেলে বদহজম দূর হয় এবং অগ্নিমান্দ্য দূর করতেও আঙুর কার্যকর।

**৫. স্মৃতিশক্তি লাভ:** অনেকে ছোট ছোট বিষয় দ্রুত ভুলে যায়, আবার কোনো ঘটনা বেমালুম স্মৃতি থেকে মুছে যায়। এতে হেলাফেলার কিছু নয় এটা একধরনের রোগ। এই রোগ এড়াতে আঙুর ফল বেশ কার্যকরি।

**৬. মাথাব্যথায় আরাম:** হঠাৎ মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেলে এ সময় আঙুর খেলে আরাম বোধ হয়।

---

৯৪. আল-কুরআন, ২৩: ১৯
৯৫. আল-কুরআন, ৮০: ২৭ -২৮
৯৬. আল-কুরআন, ১৬: ১১
৯৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: ফল খাওয়া, খ. ৪, পৃ. ৫৭, হাদীস নং- ৩৩৬৮
৯৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ৩৩৬৯

**৭. চোখের উপকারিতা:** চোখ ভালো রাখতে আঙুর ফল অনেক কার্যকর। তাই বয়সজনিত কারণে যারা চোখের সমস্যায় ভুগছে, তাদের জন্য ভালো দাওয়াই এই ফল।

**৮. স্তন ক্যানসার প্রতিরোধ:** স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিতে থাকা রোগীরা আঙুর ফল খেতে পারে। কারণ আঙুরের উপাদানগুলো ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোষের বিরুদ্ধে কাজ করতে সক্ষম।

**৯. কিডনি সুরক্ষা:** আঙুরের উপাদানগুলো ক্ষতিকারক ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা সহনশীল অবস্থায় রাখে। সেই সঙ্গে কিডনির রোগব্যাধির বিরুদ্ধেও লড়াই করে।

**১০. ত্বকের সুরক্ষা:** আঙুরে থাকা ফাইটো কেমিক্যাল ও ফাইটো নিউট্রিয়েন্ট ত্বকের সুরক্ষায় কাজ করে। এতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখে।

**১১. বয়সের ছাপে বাধা:** শরীরের ফ্রি রেডিকেলস ত্বকে বলিরেখা ফেলে দেয়। আঙুরে থাকা ভিটামিন সি আর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এই ফ্রি রেডিকেলের বিরুদ্ধে লড়ে শরীরে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।

**১২. চুলের যত্ন:** দিঘল চুল একটু অযত্নেই খুশকিতে ভরে যায়। চুলের আগা ফেটে গিয়ে রুক্ষ ও ধূসর রঙের হয়ে অবশেষে চুল ঝরতে থাকে। এসকল সমস্যা এড়াতে আঙুর ফল খাওয়া যেতে পারে। এতে শুধু চুল ভালোই থাকবে না মাথায় নতুন চুলও গজাবে।[৯৯]

**পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ডালিমের উপকারিতা**

ডালিম বাংলাদেশে অতি পরিচিত এবং মোটামুটি সবারই পছন্দের একটি ফল। আমাদের দেশে এটাকে আনার নামেও ডাকে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা ভেবে অনেকেই নিয়মিত ডালিম খায়। ডালিমদানা খাওয়ার পাশাপাশি এর জুসও পান করা হয়। ডালিম হৃদেরাগের ঝুঁকি কমায়, ক্যান্সার প্রতিরোধক, ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক, ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী, হজমে সহায়তাক, নারীদের ডেলিভারি সহজ করে।

**ভাষানুযায়ী নাম:** বাংলা- ডালিম, আরবী-রুম্মান, ফারসী ও উর্দু- আনার, হিন্দি- দারিম্ব, ইংরেজি- Pomegranate. বোটানিক্যাল- Punica granatum Linn.

**পরিচিতি:** ডালিম একটি বহুল পরিচিতি ও সুমিষ্ট ফল। গাছ ১০ থেকে ১৫ ফুট লম্বা হয় এবং কাঠ ফিকা পিত বর্ণের অল্প কালো দাগযুক্ত, যার ভেতরে শক্ত। শাখা-প্রশাখাসমূহ গোলাকার। পাতা সাধারণত ২ থেকে ২.৫ ইঞ্চি লম্বা এবং উভয় দিক সরু এবং উপরিভাগ চকচকে মসৃণ। শাখার অগ্রভাগে দু'টি করে ফুল হয়। ফুল ভেদে ডালিম গাছ দুই প্রকার। (এক) কোনো কোনো গাছে শুধু পুরুস ফুল হয় এবং পাতা লাল বর্ণের। (দুই) কোনো কোনো গাছে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় প্রকার ফুল হয়। ডালিম ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পাকলে হলুদ বা লাল হয়। ফলের ভেতরে বীজের কোষ হয় এবং মিহি পরত দ্বারা বীজ আবৃত থাকে। পাকা ফলে বীজ গোলাপী ও সাদা হয়।

**স্বাদ:** কোনোটি মিষ্টি (মধুর), কোনোটি টক মিষ্টি (কষায় মধুর) এবং কোনোটি টক (অম্লরস) হয়। কোনো কোনো ডালিমের বীজ ছোট ও সামান্য সরু হয় বলে একে বেদানা বলা হয়। এছাড়া কাবুলে এক প্রকার ডালিমকে বেদানা বলা হয় এবং তা সর্বোত্তম। দেশ ভেদে ডালিমের আকৃতি ও স্বাদের পার্থক্য দেখা যায়। এপ্রিল ও মে মাসে ফুল এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে এবং কিছু কিছু গাছে বছরের সবসময় ফল দেখা যায়। ডালিমের ফুল, ফল, রস, বীজ, ফলের ও গাছের ছাল এবং পাতা ব্যবহার হয়।

**প্রাপ্তিস্থান:** ডালিমের আদি জন্মস্থান ভারত বর্ষ। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এটি আফ্রিকার গাছ। বাংলাদেশসহ উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আফগানিস্তান, ইরান ও আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডালিম জন্মে।

**প্রকারভেদ:** ডালিম বেশ কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন: মিষ্টি ডালিম (আরবী- রুম্মানে হালব, উর্দু- আনর শিরীন), টক ডালিম (আরবী- রুম্মানে হামেজ, ফারসী- আনার তুরশ, উর্দু- খাট্টা আনার), টক মিষ্টি আনার (আরবী- রুম্মানে মেজ, ফারসী- আনার মায়খোস, উর্দু- খাট্টা মিঠা আনার)।

---

৯৯. *https://www.prothomalo.com/life.* আঙুর কেন খাবেন?, ২৯.০১.২০১৬ (থেকে উদ্ধৃত)

সাধারণত মিষ্টি ডালিমই সবার কাছে প্রিয় এবং ফল হিসেবে এটাই সকলে খেয়ে থাকে। তাই নিম্নে মিষ্টি ডালিম বিষয়েই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো-

**প্রকৃতি বা মিযাজ:** মিষ্টি ডালিম ১ম শ্রেণির শীতল ও আর্দ্র। খোসা ১ম শ্রেণির শীতল ও আর্দ্র।

**স্বাদ:** মিষ্টি ডালিমের রস মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

**গন্ধ:** পাকা ফল সুঘ্রাণযুক্ত।

**মাত্রা:** রস ২০ থেকে ৫০ গ্রাম এবং খোসা ৩ থেকে ৫ গ্রাম।

**প্রতিক্রিয়া:** অধিক মাত্রায় মিষ্টি ডালিম সেবনে পাকস্থলী দুর্বল কারক এবং জ্বরের জন্য ক্ষতিকর।

**সংশোধন:** টক ডালিম, আদার মোরব্বা ও রুমী মস্তগীএর সংশোধক।

**প্রতিনিধি:** এক প্রকারের ডালিম অন্য প্রকারের পরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য।

**বিশেষ ক্রিয়া:** মিষ্টি ডালিম রক্ত উৎপন্ন করে এবং হৃদপিণ্ড ও লিভারে শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী।

**ইউনানী মতে উপকারিতা:** ক্ষুধা বর্দ্ধক, হৃদকম্প নিবারক, স্বর পরিষ্কারক, মূত্র প্রবাহক, পিপাসা নাশক, শক্তি বর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। উষ্ণ প্রকৃতির লোকের কামোদ্দীপক, রতিশক্তি বর্দ্ধক এবং শরীরে বিশুদ্ধ রক্ত সৃষ্টি কারক।ফোলা দূর করে এবং চর্মের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। খোসাসহ ডালিম কুটে রস বের করে সেবনে দাস্ত বন্ধ করে। এর রুব বা ঘনসার রস অপেক্ষা অধিক উপকারী কিন্তু পাকস্থলি দুর্বল করে। যার জন্য মস্তগী রুমী ব্যবহার করা হয়। মিষ্টি ডালিম উপরে ছিদ্র করে চোখে ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ডালিম রস পুরাতন হলে শক্তি বৃদ্ধি পায়।[১০০]
পবিত্র কুরআনে বহুবার উপকারী এই ডালিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّ رُمَّانٌ– অর্থ: সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম।[১০১] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ–

অর্থ: আর খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙুরের বাগান, যায়তুন ও ডালিম, সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন।[১০২] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ–

অর্থ:তিনিই উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যায়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন- একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।[১০৩]

বাস্তবেই ডালিম খাওয়ার রয়েছে বহু উপকারিতা। ইউনানী শাস্ত্র ছাড়াও বর্তমান পুষ্টি বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে, নিয়মিত ডালিম খেলে দেহের অনেক ফায়েদা রয়েছে। নিম্নে ডালিম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

**১. পুষ্টিগুণ:** ডালিমে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি। মাত্র এক কাপ ডালিম দানায় রয়েছে দৈনন্দিন চাহিদর ৩০ শতাংশ ভিটামিন সি, ৩৬ শতাংশ ভিটামিন কে, ১৬ শতাংশ ভিটামিন বি৯ ও ১২ শতাংশ পটাশিয়াম।

**২. উচ্চ রক্তচাপ কমায়:** ডালিম রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। উচ্চ রক্তচাপে নিয়মিত ডালিম খাওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহেই রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে যায়।

১০০. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬
১০১. আল-কুরআন, ৫৫: ৬৮
১০২. আল-কুরআন, ৬: ৯৯
১০৩. আল-কুরআন, ৬: ১৪১

**৩. আথ্রাইটিস ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা উপশম:** ডালিম আথ্রাইটিসে উপকার করে। এছাড়া এটি হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা উপশম করতে সহায়তা করে।

**৪. হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়:** ডালিম দেহের কোলস্টেরলের ঝুঁকি কমায়। এতে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

**৫. স্মৃতিশক্তি বাড়ায়:** ডালিম স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। আর এ কারণে এটি অ্যালঝেইমার্সের মতো রোগীদের জন্যও উপকারি।

**৬. হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি:** ডালিম আয়রন, ক্যালসিয়াম, শর্করা ও আঁশ (ফাইবার) সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে রক্তে হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করে দেহে রক্ত চলাচল সচল রাখে। ডালিম রস অ্যানেমিয়া ও রক্তের নানা সমস্যা দূর করতেও ভূমিকা রাখে। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, যাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম, তাদের জন্য প্রতিদিন মাঝারি আকৃতির একটি ডালিম বা এক গ্লাস ডালিমের রস খাওয়া খুবই উপকারী।

**৭. প্রাকৃতিক ইনসুলিন:** ডালিম রসে ফ্রুক্টোজ থাকলেও এটি অন্য ফলের রসের মতো রক্তে চিনির মাত্রা বাড়ায় না। তাই ডালিম ডায়াবেটিসের জন্য অনেক উপকারী। অনেকেই একে ইনসুলিনের বিকল্প হিসেবে বলেন। এটি মিষ্টি হলেও সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীদের কোনো সমস্যা হয় না, বরং ডায়াবেটিস রোগী নিয়মিত ডালিম রস খেলে রক্তে চিনির মাত্রা ঠিক থাকে।

**৮. ক্যান্সার প্রতিরোধী:** ডালিম শরীর থেকে মুক্ত ক্ষতিকর উপাদান কমিয়ে ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এই মুক্ত উপাদান অন্যান্য রোগও সৃষ্টি করে। বিশেষ করে স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে এর ভূমিকা প্রমাণিত।

**৯. ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী:** দেহে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে ডালিম। এছাড়া এটি ফাংগাস ইনফেকশনের বিরুদ্ধেই ভূমিকা রাখে।

**১০. শারীরিক অনুশীলনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি:** সুস্থ থাকার জন্য কিংবা ভালো পারফর্মেন্সের জন্য অনেকেই শারীরিক অনুশীলন করে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অনুশীলনের পাশাপাশি ডালিম খাওয়া হলে তা কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

**১১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়:** ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী গুণাগুণ আছে ডালিমে। শরীরের ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়ার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ডালিমের রস।

**১২. হজমশক্তি বাড়ায়:** ডালিমে আছে ডায়াটারি ফাইবার বা আঁশ। দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় দুই ধরনের আঁশ থাকায় এটি হজমশক্তি বাড়ায় এবং অন্ত্রের নড়াচড়া নিয়মিত করে।

**আল-কুরআনে বর্ণিত কলার উপকারিতা**

কলা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ও পরিচিত একটি ফল। এটা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। দেহের এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা রোধে ওষুধের থেকে কলা অনেক কার্যকরী। কলার মধ্যে প্রোটিন, প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ থাকায় বিভিন্ন রোগ থেকে দেহকে রক্ষা করে। এছাড়া কলা শরীরে শক্তি জোগায়, খাদ্য হজমে সহায়তা করে, পাকস্থলীর আলসার দূর করে, বুকজ্বালা রোধ করে, মানসিক চাপ কমায়। শুষ্ক ত্বক ঠিক করা, চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলা কিংবা শরীর থেকে ফ্যাট কমানো- এসব কিছুই করতে পারে কলা। তাই খুব কম ফলই আছে যা কলার মতো সর্বগুণসম্পন্ন।কলায় ভিটামিন ই-৬ ও সি আছে। এতে উপস্থিত নিউট্রিয়েন্টস ত্বকের ইলাসটিসিটি বজায় রাখে।অল্প কলা চটকে মুখে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে হাল্কা গরম পানিতে মুখ ধুয়ে নিলেশুষ্ক ত্বকের আর্দ্রতা ফেরায় এবং ফ্রি অক্সিজেন রেডিক্যালস ও বলিরেখার হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া পা ফাটা খুব সহজেই সারিয়ে তোলে পাকা কলা। কলা চটকে ১০ মিনিট ভালো করে পায়ের গোড়ালি এবং ফাটা অংশে লাগালে কয়েক দিনের মধ্যেই ফাটা ভালো হয়ে যায়। এটি সপ্তাহে চার দিন করা যেতে পারে।

কলায় উচ্চ পরিমাণে পটাশিয়াম থাকায় চোখের নিচের ফোলা ভাব ঠিক করে দেয়। এর জন্য এক টুকরো কলা চটকে চোখের তলার ফোলা অংশের ওপর ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে নিতে হবে।ত্বকের কালো দাগ, অ্যাকনে ও ব্রণের মতো সমস্যার হাত থেকেও রক্ষা করে কলা। এক টুকরো কলার খোসা ব্রণ বা কালো দাগের ওপর খুব হাল্কা করে ঘষে খোসা রং পাল্টে কালো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘষতে হবে। এটা দিনে তিনবার করতে হবে। তাছাড়া কলায় প্রাকৃতিক তেল,

কার্বোহাইড্রেট, পটাশিয়াম ও ভিটামিন থাকায় চুলের জন্য এটি খুবই উপকারি। একটি পাকা কলা চটকে তাতে অল্প একটু আমন্ড তেল মিশিয়ে চুলে ১৫ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে নিলে এবং এভাবেনিয়মিত করলে চুল মজবুত ও সিল্কি হয়।

কলায় ট্রিপটোফেন নামে এক ধরনের প্রোটিন আছে। এই প্রোটিন শরীরে সেরোটোনিন নামের হরমোন তৈরি করে, যা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং যারা ডিপ্রেশনে ভুগে তাদের জন্যও কলা খুব ভালো ব্যবস্থাপত্র।কলায় উপস্থিত পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ব্লাড প্রেশার কমায়। এ ছাড়া এতে পেক্টিন নামের ফাইবার আছে, যা খারাপ কোলেস্টেরল কমায়।বাস্তবে দেখা যায়, একটা কলা খেলেই অনেক্ষণ আর খিদে পায় না। কারণ কলায় প্রাকৃতিক চিনি থাকার কারণে এটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনার্জি দেয়।কলায় প্রোবায়োটিক নামক ব্যাকটেরিয়া থাকায় শরীরকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সাহায্য করে।

তাই এত উপকারি কলার কথা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ– فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ– وَّ طَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ–

অর্থ: যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায়। [১০৪]

স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েব সাইট হেলদি ফুড টিম জানিয়েছে দেহের ১০টি সমস্যা রোধে কলা খাওয়া বেশ উপকারী-

১. কলা শক্তির (এনার্জি) অত্যন্ত ভালো উৎস। তাই অনেক খেলোয়াড়কেই বেশি পরিমাণ কলা খেতে দেখা যায়।

২. কলার মধ্যে রয়েছে এমাইনো এসিড যেটি মানসিক চাপ রোধক হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম- যা বিষন্নতা রোধে কাজ করে।

৩. কলার মধ্যে উচ্চ পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং সামান্য পরিমাণ লবণ থাকায় হৃদপিণ্ড ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে।

৪. প্রতিদিন একটি করে কলা খাওয়া স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।

৫. কলায় প্রচুর পরিমাণ আয়রন থাকার কারণে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায় এবং যেসব রোগী রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া রোগে ভুগছে তাদের জন্য এটি বেশ উপাদেয়।

৬. কলা দেহের হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৭. সন্তানসম্ভবা নারীর জন্য কলা খাওয়া খুবই উপকারী। কেননা এটি সকালে দুর্বলতা কাটাতে কাজ করে এবং রক্তের শর্করার সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

৮. কলা পাকস্থলির এসিডকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকস্থলির আলসার রোধে কাজ করে।

৯. কলায় ছয় ধরনের ভিটামিন রয়েছে, যা রক্তে শর্করা গঠনে কাজ করে।

১০.কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। রোজ সকালে এটি করে পাকা কলা খেলে কোষ্টকাঠিন্য দূর করে শরীরকে সুস্থ রাখে।[১০৫]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-তারা থাকবে থরে বিথরে সজ্জিত কলায়, দীর্ঘ বিস্তৃত ছায়া, সদা বহমান পানি, অবাধ লভ্য অনিশেষ যোগ্য ও প্রচুর ফলমূলে।[১০৬]

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীতে হরেক রকমের উপকারি ফল থাকলেও পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত উপরোল্লিখিত ফলসমূহ মানব শরীর সুস্থ, সবল, সুঠাম ও রোগ মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে নিশ্চয় পৃথক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা আরো গবেষণার দাবি রাখে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।এসব বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ফল, শস্য, কাঠ এবং অন্যান্য যেসব দ্রব্য তোমরা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করো, এসব থেকে তোমরা নিজেদের জন্য জীবিকা আহরণ করো।[১০৭]

---

১০৪. আল-কুরআন, ৫৬: ২৭-২৯

১০৫. শাশ্বতী মাথিন, *https://www.ntvbd.com/health.* কলার ১০ গুণ, আপডেট: ০৪.০৪.২০১৫ (থেকে উদ্ধৃত)

১০৬. আল-কুরআন, ৫৬: ২৯-৩৩

১০৭. আল-কুরআন, ১৩: ৪

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অত:পর এর সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন করেছন। এরপর তা থেকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেছেন। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের কাঁদির পর কাঁদি সৃষ্টি করেছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আঙুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান। এসবের ফলগুলো পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যও রাখে আবার প্রত্যেকে পৃথক বৈশিষ্টেরও অধিকারী। গাছ যখন ফলবান হয় তখন এর ফল ধরা ও ফল পাকার অবস্থাটি একটু গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[১০৮]

১০৮.আল-কুরআন, ৬: ৯৯

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শারীরিক সুস্থতা লাভে বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তথা রসায়ন নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতির আগে পৃথিবীতে ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইউনানী ও আর্য়ুবেদীসহ বিভিন্ন হেকিমি চিকিৎসা পদ্ধতিতে মানুষ তাদের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করতো। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষ যান্ত্রিক সভ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে মানুষ দূরে সরে গেছে। তবে বাহ্যদৃষ্টিতে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ক্যামিস্ট্রি নির্ভর হলেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহার থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারেনি। ফার্মেসী থেকে এক বোতল সিরাপ বা এক পাতা ক্যাপসুল কিনে খেলেও এই সিরাপ, ক্যাপসুল বা ইঞ্জেকশন কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেটি খেয়াল করি না। বাস্তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রাকৃতিক পদার্থের বিভিন্ন উপাদান থেকেই হাজারো ঔষধ তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে আমরা সম্পূর্ণ ডাক্তার নির্ভর হওয়ার কারণে কোন পদার্থ থেকে আহরিত ওষুধ সেবন করছি সেটি হয়তো জানা হয় না। তাই বলা যায়, বর্তমানের সাথে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য হলো- প্রাচীন যুগের মানুষ সরাসরি প্রাকৃতিক পদার্থের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করতো, আর আধুনিক যুগে আমরা সেগুলোই ল্যাব থেকে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করছি। আধুনিক যুগেও প্রায় ৭০ ভাগ ওষুধ যে প্রকৃতি থেকে আহরণ করা হয়, সেটা হয়তো অনেকেই জানে না। নিম্নে শারীরিক সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য লাভে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট এমন কিছু পদার্থের আলোচনা করা হলো-

**মধু অত্যন্ত উপকারি একটি পদার্থ**

মধু মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অপূর্ব নিয়ামত। এটি একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টি দ্রব্য। কোনো মিষ্টি দ্রব্যের কথা বললেই আমরা বলে থাকি মধুর মত মিষ্টি। মৌমাছি পোকা বিভিন্ন ফুল হতে রস সংগ্রহ করে মৌচাকে জমা করে থাকে। আর জমাকৃত এ তরল পদার্থের নামই মধু। আরবীতে একে 'আসল' (عسل), উর্দুতে 'শহদ' এবং ইংরেজিতে 'Honey'বলা হয়। বাংলাদেশের প্রায় গ্রামেই কম-বেশি মধুর চাক পাওয়া যায়। বিশেষ করে যখন গাছে গাছে ফুল ধরে। এছাড়া সুন্দর বনে এবং বিভিন্ন মধুর চাষ প্রকল্পেও মধু পাওয়া যায় বা উৎপন্ন হয়।[১০৯]

**মিযাজ:** মধু ১ম শ্রেণির শুষ্ক এবং ২য় শ্রেণির উষ্ণ।

**বর্ণ:**কালো বর্ণ মিশ্রিত হালকা কমলা বর্ণের।

**স্বাদ:** অত্যন্ত মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

**গন্ধ:** সুগন্ধযুক্ত বন্য।

**মাত্রা:** সহ্য পরিমাণ মাত্রায় সেবন করা যায়।

**প্রতিক্রিয়া:**অতিরিক্ত মাত্রায় মধু সেবনে উষ্ণ প্রকৃতির লোকের জন্য ক্ষতিকর।

**সংশোধন:** সির্কা ও টক দ্রব্য এর সংশোধক।

**প্রতিনিধি:** মধুর পরিবর্তে চিনি ব্যবহার করা যায়।

**বিশেষ:** মধু শীতল ও শ্লেষ্মা জনিত রোগে বিশেষ কার্যকরী।[১১০]

স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং যাবতীয় রোগ নিরাময়ে মধুর গুণাবলী অপরিসীম। প্রাচীন এবং আধুনিক সকল প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রই মধুর সীমাহীন ফায়দা এবং উপকারিতা উল্লেখ করেছে। এমন কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নেই, যেখানে মধুর উপকারিতা স্বীকার করা হয়নি। মধুর একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য হলো এটা সব ধরনের ক্ষতিকর দিক থেকে মুক্ত। মধুর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এটাই একমাত্র বস্তু খোদায়ী ও মানবীয় উভয়বিদ চিকিৎসায় শরীর ও রূহের খোরাক।

আরবী পরিভাষায় মধু পোকাকে 'নাহল' বলা হয়। মানব জীবনে মধুর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা এতো বেশি যে পবিত্র কুরআনে এ নামে একটি স্বতন্ত্র সূরাই বিদ্যমান রয়েছে। যার নাম 'সূরাতুন নাহল' বা মৌমাছির সূরা।[১১১] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- –يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ–

১০৯. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯
১১০. প্রাগুক্ত
১১১. সূরা নং- ১৬

অর্থ: আল্লাহ মধুমক্ষিকার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় ও মধু বের করেন, এতে মানুষের জন্য অসংখ্য রোগের প্রতিকার রয়েছে।[১১২]

মধু যে শেফাদানকারী একটি উৎকৃষ্ট তরল পদার্থ তা আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে ঘোষিত হয়েছে। যা এখনও পূর্বের ন্যায় যথার্থ এবং সমগ্র বিজ্ঞান জগতই এই দাবি স্বীকার করে নিয়েছে। ঔষধের পাশাপাশি মধু উত্তম খাদ্য এবং পানীয়ও বটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) একে 'খাইরুদ্দাওয়া' বা মহৌষধ বলেছেন। মধু সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِىْ ثَلاثَةٍ– فِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، اَوْ شَرْبَةِ عَسْلٍ،اَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَ اَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَىِّ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেন: রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। শিংগা লাগানোতে, মধুপানে এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।[১১৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَ الْعَسَلُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) মিষ্টিজাত দ্রব্য ও মধু বেশি পছন্দ করতেন।[১১৪]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِنْ اَدْوِيَتِكَمْ فَفِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، اَوْ شَرْبَةِ عَسْلٍ، اَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَ مَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىْ–

অর্থ: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি: তোমাদের ঔষধসমূহের মধ্যে কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে তা রয়েছে শিংগাদানের মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়াকে পছন্দ করি না।[১১৫]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ اَخِىْ يَشْتَكِىْ بَطْنَهُ، فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ اَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلاً،ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ، وَ كَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ، اِسْقِهِ عَسَلاً، فَسَقَاهُ فَبَرَاَ–

অর্থ: আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা.)-এর নিকট এসে বললো: আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন তিনি (সা.) বললেন: তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি (একই বিষয়ে) দ্বিতীয়বার আসলে তিনি ইরশাদ করলেন: তাকে মধু পান করাও। অত:পর লোকটি (একই বিষয়ে) তৃতীয়বার আসলে তিনি ইরশাদ করলেন: তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল: আমি অনুরূপই করেছি। তখন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন: আল্লাহ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে আবার মধু পান করালে এবার সে আরোগ্য লাভ করলো।[১১৬]

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মধুর দ্বারা শেফা লাভের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস করায় অবশেষে কিরূপে আল্লাহর হুকুম পূর্ণ হলো। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অন্তর থেকে একীন ও ঈমানের দৌলত বের হয়ে যাওয়ায় আমরা এসকল অনেক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছি।

---

১১২. আল-কুরআন, ১৬: ৬৯

১১৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে, খ. ২, পৃ. ১৬১৫, হাদীস নং- ৫৬৮১

১১৪. *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধুর সাহায্যে চিকিৎসা করা, খ. ২, পৃ. ১৬১৫, হাদীস নং- ৫৬৮২

১১৫. *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৬১৬, হাদীস নং- ৫৬৮৩

১১৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬১৬, হাদীস নং- ৫৬৮৪

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণিত হাদীসে বার বার ইরশাদ হয়েছে- "তাকে মধু পান করাও"। এতে বোঝা যায়, উক্ত রোগের জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মধু সেবনের প্রয়োজন ছিল। অতএব কোন রোগে কতটুকু মধু ব্যবহার করতে হবে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে।

**প্রতি মাসে তিনবার মধু পান করা**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاةٍ كُلَّ شُهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمُ مِنَ الْبَلاَءِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিনদিন সকালে মধু চেটে খায়, তাকে বড় ধরনের কোনো মুসীবত তথা রোগ-ব্যাধি আক্রান্ত করবে না।[১১৭]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ عَسَلَ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (সা.) মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।[১১৮]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً–

অর্থ: নবী কারীম (সা.)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) যখন যয়নব বিনত জাহাশ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন, তখন তিনি সেখানে মধুর শরবত পান করতেন।[১১৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَ الْقُرْاٰنِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা শিফাদানকারী দু'টি বস্তুকে নিজেদের জন্য অবশ্যই গ্রহণ করবে। একটি মধু এবং অপরটি কুরআন।[১২০]

اِبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَتْ تَخْرُجُ بِهِ قَرْحَةٌ وَ لاَ شَيْءُ اِلاَّ لَطَخَ الْمَوْضِعَ بِالْعَسَلِ وَ يَقْرَأُ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابُ مُخْتَلِفُ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ–

অর্থ: ইবন ওমর (রা.)-এর যখনই কোনো ফোঁড়া, পাঁচড়া বা অন্য কিছু বের হতো তিনি তার উপর মধু লগিয়ে দিয়ে পবিত্র কালামের এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। যার অর্থ: আল্লাহ তা'আলা মধু মক্ষিকার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় এবং মধু বের করে থাকেন, যার মধ্যে মানুষের শিফা ও রোগ মুক্তি রয়েছে।[১২১]

আয়ুর্বেদী ও ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রেও মধুকে বলা হয় মহৌষধ। এটা যেমন বলকারক, সুস্বাদু ও উত্তম উপাদেয় খাদ্য নির্যাস, তেমনি নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্রও। আর এজন্যই খাদ্য ও ঔষধ এ উভয়বিধ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ নির্যাসকে প্রাচীনকাল থেকেই পারিপারিকভাবে 'পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক' পানীয় হিসেবে সব দেশের সব পর্যায়ের মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে আসছে। মধুতে যেসব উপকরণ রয়েছে তন্মধ্যে প্রধান উপকরণ হল সুগার। সুগার বা চিনি আমরা অনেকেই এড়িয়ে চলি। কিন্তু মধুতে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ এ দুটি সরাসরি মেটাবলাইজড হয়ে যায় এবং ফ্যাট হিসেবে জমা হয় না। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছে এতে অ্যালুমিনিয়াম, বোরন, ক্রোমিয়াম, কপার, লেড, টিন, জিংক ও জৈব এসিড (যেমন- ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, টারটারিক এসিড এবং অক্সালিক এসিড), কতিপয় ভিটামিন, প্রোটিন, হরমোনস, এসিটাইল কোলিন, অ্যান্টিবায়োটিকস, ফাইটোনসাইডস, সাইস্টোস্ট্যাটিক্স

---

১১৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধু, খ. ৪, পৃ. ৯৪, হাদীস নং- ৩৪৫০

১১৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: বাযাক তথা আঙ্গুরের সামান্য পাকানো রস ..., খ. ২, পৃ. ১৫৯৫, হাদীসনং- ৫৫৯৯

১১৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মধুর শরবত পান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং- ৩৭১৪

১২০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধু, খ. ৪, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ৩৪৫২

১২১. আল্লামা বাহাউদ্দীন, *তাফসীরুল কাশী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, পৃ. ৩৮৩

এবং পানি (১৯-২১%) ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক এসিড, ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৩, বি-৫, বি-৬, ভিটামিন-ই, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-এ বা ক্যারোটিন ইত্যাদি বিদ্যমান। মধু এমন ধরনের ওষুধ, যার পচন নিবারক (অ্যান্টিসেপটিক), কোলেস্টেরল বিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ধর্ম আছে।

**মধুর উপকারিতা**

নিয়মিত ও পরিমিত মধু সেবন করলে যেসব উপকার পাওয়া যায়-

১. এক চামচ মৌরি গুঁড়োর সাথে এক বা দুই চামচ মধুর মিশ্রণ হৃদরোগের টনিক হিসেবে কাজ করে। এটা রক্তনালি প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে, হৃদপেশিকে সবল করে এবং হৃদপেশির কার্যক্রম বৃদ্ধি করে।

২. মধু খেলে পাকস্থলী থেকে বাড়তি গ্লুকোজ তৈরি হওয়ায় মস্তিষ্কের সুগার লেভেল বেড়ে যায় এবং মেদ কমানোর হরমোন নি:সরণের জন্য রীতিমত চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ওযন কমার সুযোগ তৈরি হয়।

৩. মধু অনিদ্রা দূরীকরণে খুবই ফলদায়ক ঔষধ। রাতে শোয়ার পূর্বে এক গ্লাস পানির সাথে দুই চা চামচ মধু মিশিয়ে খেলে এটি গভীর ঘুম এবং সম্মোহনের কাজ করে।

৪. মধুতে রয়েছে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, যা ডায়রিয়া ও কোষ্ঠি-কাঠিন্য দূর করে। আবার ১চা চামচ খাঁটি মধু ভোরবেলা পান করলে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অম্লত্ব দূর হয়।

৫. মধুর রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা, যা দেহকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে।

৬. মধুতে স্টার্চ ডাইজেস্টি এনজাইমস এবং মিনারেলস থাকায় চুল ও ত্বক ঠিক রাখতে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

৭. যারা রক্ত স্বল্পতায় বেশি ভোগে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য নিয়মিত মধু সেবন অত্যন্ত ফলদায়ক।

৮. মধু পাকস্থলীর কাজকে জোরালো করে এবং হজমে সাহায্য করে। এর ব্যবহার হাইড্রোক্ললিক এসিড ক্ষরণ কমিয়ে দেয় বলে অরুচি, বমিভাব এবং বুক জ্বালা এগুলো দূর করা সম্ভব হয়।

৯. শিশুদের প্রতিদিন অল্প পরিমাণ মধু খাওযার অভ্যাস করলে ঠান্ডা, সর্দি-কাশি ও জ্বর ইত্যাদি সহজে হয় না।

১০. দুর্বল শিশুদের মুখের ভেতর পচনশীল ঘা-এর জন্য মধু খুবই উপকারী।

১১. মধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১২. মধু দাঁত পরিস্কার ও শক্তিশালী করে।

১৩. দৃষ্টিশক্তি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে।

১৪. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সার প্রতিরোধ করে ও কোষকে ফ্রি রেডিকেলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

১৫. বার্ধক্য অনেক দেরিতে আসে।

১৬. মধুর ক্যালরি রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়, ফলে রক্তবর্ধক হয়।

১৭. গ্লাইকোজেনের লেভেল সুনিয়ন্ত্রিত করে।

১৮. মধু আন্ত্রিক রোগে খুবই উপকারী। মধুকে এককভাবে ব্যবহার করলে পাকস্থলীর বিভিন্ন রোগের উপকার পাওযা যায়।

১৯. আলসার ও গ্যাস্ট্রিক রোগের জন্য উপকারী।

২০. শরীরের বিভিন্ন ধরনের নি:সরণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি করে।

২১. ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের কলা সুদৃঢ় করে।

২২. ক্ষুধা, হজমশক্তি ও রুচি বৃদ্ধি করে।

২৩. রক্ত পরিশোধন করে।

২৪. শরীর ও ফুসফুসকে শক্তিশালী করে।

২৫. জিহ্বার জড়তা দূর করে।

২৬. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

২৭. বাতের ব্যথা উপশম করে।

২৮. মাথা ব্যথা দূর করে।

২৯. শিশুদের দৈহিক গড়ন ও ওজন বৃদ্ধি করে।

৩০. গলা ব্যথা, কাশি-হাঁপনি এবং ঠান্ডা জনিত রোগের বিশেষ উপকার হয়।

৩১. শারীরিক দুর্বলতা দূর করে এবং শক্তি-সামর্থ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৩২. ব্যায়মকারীদের শক্তি বাড়ায়।
৩৩. মধু খাওয়ার সাথে সাথে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। ফলে শরীর হয়ে ওঠে সুস্থ, সতেজ এবং কর্মক্ষম।[১২২]

মধু ঔষধ এবং খাদ্য উভয়ই। এ সুস্বাদু খাদ্যটি পৃথিবীর সব দেশের সকল মানুষই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে থাকে। কেননা এটা তিব্বে ইলাহী এবং তিব্বে নববী অর্থাৎ খোদায়ী চিকিৎসা ও নবী কারীম (সা.)-এর চিকিৎসা বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মধু মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং দৈহিক রোগ-ব্যাধিশিফাদানে এক অব্যর্থ মহৌষধ। যা যুগ যুগ ধরে মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়ে আসছে এবং আজও হচ্ছে।[১২৩]

**লবণের ব্যবহার**

সাধারণত আমরা লবণকে মসলা হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। কোনো তরকারিই লবণ ব্যতীত খাওয়ার উপযুক্ত হয় না এবং লবণ ব্যতীত কোনো খাদ্য-দ্রব্য সহজে সিদ্ধও হতে চায় না। সুতরাং লবণ খাদ্যের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। স্থানীয়ভাবে লবণকে নুনও বলে থাকে। আরবীতে-মিলহ, ফারসীতে-নিমক তা'আম, উর্দুতে- নমক এবং ইংরেজিতে- Table Salt, Common Salt, Sodium Chloride বলা হয়। লবণ হজম শক্তি বর্ধক, ক্ষুধা দূরকারী ও মন প্রফুল্লকারী। চকা ঢেকুর এবং পেটের বায়ু পরিশোধিত করা এর বৈশিষ্ট্য। হজম শক্তির দুর্বলতা, রক্ত দোষণ, যকৃৎ ও প্লীহার কমজোরী নিরাময়ে লবণ বিশেষ উপকারী।[১২৪]

হাদীসে এসেছে – عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدُ اِدَامِكُمُ الْمِلْحُ

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের তরকারির শ্রেষ্ঠ উপকরণ হচ্ছে লবণ।[১২৫]

**পরিচিতি ও প্রাপ্তি স্থান**

লবণ সাধারণত সমুদ্রের পানি শুষ্ক করে প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্রের পানিতে প্রায় ২.৫ অংশ লবণ থাকে। এছাড়া খনি ও হ্রদ হতে লবণ পাওয়া যায়। মানুষের রক্তে ও প্রস্রাবে এবং বিভিন্ন উদ্ভিদে লবণ আছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামসহ অন্যান্য সমুদ্র সৈকত থেকে বা লোনা পানি বাহিত নদী নালার পানি থেকে লবণ পাওয়া যায়।

**মিযাজঃ** লবণ ১ম শ্রেণির উষ্ণ ও শুষ্ক।

**বর্ণ:** লবণ সাদা বর্ণের হয়।

**স্বাদ:** লবণ লবণাক্ত স্বাদযুক্ত।

**গন্ধঃ** লবণ গন্ধহীন।

**মাত্রা:** ১ থেকে ৪ গ্রাম অথবা প্রয়োজনমত সেবন করা যায়।

**প্রতিক্রিয়া:** অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ সেবনে বমি, দাস্ত ও অন্ত্রের প্রদাহ হয় এবং রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ ও টাকপড়া সহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়।

**সংশোধনঃ** টক জাতীয় দ্রব্য এর সংশোধক।

**প্রতিনিধি:** খাবার লবনের পরিবর্তে বিট লবণ ব্যবহার করা যায়।

**বিশেষ ক্রিয়া:** খাবার লবণ জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীরের পানির অভাব পূরণ করতে বিশেষ কার্যকরী।

**উপকারিতা:** খাবার লবণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিন অল্প পরিমাণ সেবন করা প্রয়োজন। আমাদের শরীরের উপাদানের মধ্যে লবন একটি প্রধান দ্রব্য। আমাদের রক্তে ও পিত্তে যে সোডা ক্ষার আছে তা লবণ হতে তৈরি হয়। লবণ শরীরের জবিনীশক্তি বাড়ায় এবং মৃগী, মাইগ্রেন ও শ্লেষ্মাজনিত রোগের ওষধ তৈরিতে লবণ ব্যবহার করা হয়। গলা ব্যথা, কান

---

১২২. *কোরআন হতে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩
১২৩. *সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মদ (স)*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২২২
১২৪. *সিহ্হাত ও যিন্দেগী*, পৃ. ১৩৩
১২৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: লবণ, খ. ৪, পৃ. ৩৩, হাদীস নং- ৩৩১৫

ব্যথা, দাঁত ব্যথা ও দুষ্টব্রণে লবণ উপকারী। লবণ রুচি কারক, বমনকারক, ভেদক, পিত্তকারক, লঘুপাক এবং পুরুষত্ব নাশক। কফ ও শূল নাশক এবং অকালে চুল পাকা নিবারক।[১২৬]

সর্দি, কাশি এবং গলার সমস্যায় লবণ পানি গড়গড়া খুবই উপকারী। শরীরের হাড্ডি ভেঙ্গে গেলে বা মচকে গেলে সামান্য উষ্ণ পানিতে লবণ মিশিয়ে আক্রান্ত স্থান ঐ লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে অথবা সেখানে পানি ঢাললে বর্ণনাতীত উপকার পাওয়া যায়। সাপ, বিছা ও কীট-পতঙ্গের বিষ ক্রিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) লবণ ব্যবহার করেছেন। দংশিত ও ক্ষতস্থানে পানি সহযোগে লবণের ব্যবহার অতি উপকারী এবং কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে প্রমাণিত।[১২৭]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত আদায় করছিলেন। সিজদারত অবস্থায় যমীনে হাত রাখলে একটি বিচ্ছু প্রিয় হাবীবকে দংশন করে। নবী কারীম (সা.) বিচ্ছুটিকে তাঁর জুতা দিয়ে মেরে ফেললেন। অত:পর সালাত থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, এ বিচ্ছুটির ওপর আল্লাহর অভিশাপ। কারণ এটা সালাত আদায়কারী ও সালাত আদায়কারী না এমন কাউকেই ছাড়ে না। অথবা তিনি বললেন, এটা নবী এবং সাধারণ মানুষ কাউকেই ছাড়ে না। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে-

ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَ مَاءٍ فَجَعَلَهُ فِيْ اِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلٰى اِصْبَعِيْهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَ يَمْسَحُهَا وَ يُعَوِّذُهَا بِمُعَوِّذَتَيْنِ–

অর্থ: অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লবণ ও পানি চেয়ে তা একটি পাত্রে ঢাললেন। অত:পর ঐ দ্রবণে আঙ্গুল ডুবিয়ে ক্ষত স্থানে মালিশ করলেন। অবশেষে পবিত্র কুরআনের শেষোক্ত দু'টি সূরা তিলাওয়াত করলেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হলো, নবী কারীম (সা.) শুধু ঝাড়-ফুঁক ও দুআ কালামই যথেষ্ট মনে করে ঔষধ ত্যাগ করেননি। অথবা শুধু ঔষধের ওপরও নির্ভর করেননি। বরং বিষক্রিয়া নষ্ট করার জন্য আক্রান্ত আঙ্গুলের উপর লবণ পানি ঢাললেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর কালাম পাঠ করে (বিতারিত শয়তান থেকে) আল্লাহর নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করলেন। মোটকথা নবী কারীম (সা.) দুআ ও দাওয়া দু'টিকেই সমান গুরুত্বের সাথে দেখতেন। কেননা, রোগ আরোগ্যের দু'টি অছিলার একটি হল বস্তুগত এবং অপরটি হল রূহানী। সুতরাং অসুস্থ হয়ে একচ্ছত্র শেফাদানকারী আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শুধু ঔষধের ওপর ভরসা করা যেমন বোকামি? অনুরূপভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে শুধু আল্লাহরওপর ভরসা করে তাঁর সৃষ্ট নিয়ামতকে কাজে না লাগানোও ঠিক না।

**এন্টিসেপটিক হিসেবে লবণ পানির ব্যবহার**

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ জীবাণু প্রতিরোধ ও ক্ষত স্থানের এন্টিসেপটিক হিসেবে লবণ মিশ্রিত পানি ব্যবহারের নিময় দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ক্ষত স্থান লবণ পানি দিয়ে ওয়াশ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাত মুবারকে একটি বিছা দংশন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) একটু লবণ চেয়ে পানিতে মিশালেন। অত:পর ঐ লবণ মিশ্রিত পানি বিছার দংশিত স্থানে ঢালতে লাগলেন।[১২৮]

**ডায়রিয়া নিরাময়ে ওরাল স্যালাইন**

ডায়রিয়া ও পাতলা পায়খানা নিরাময়ে চিনি বা গুড় মিশ্রিত মুখে খাওয়ার স্যালাইন বা ওরাল স্যালাইন প্রয়োগ আধুনিককালে ব্যাপক সমাদৃত একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা। অনেকের ধারণায় এ ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রচলন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত ও তাঁর হাদীস গবেষণায় জানা যায়, ওরাল স্যালাইনের উদ্ভাবন ও এর প্রচলন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর পবিত্র যুগেই হয়েছিল। তাঁর একান্ত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে চিনির স্যালাইন পান করার পরামর্শ দিতেন।[১২৯]

**চোখের দৃষ্টি সুরক্ষায় সুরমা**

---

১২৬. হাকীম আবদুর রব খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২-৪৪৩
১২৭. *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
১২৮. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
১২৯. *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ অন্যতম ও সেরা সম্পদ। কোনো ব্যক্তির অন্যান্য কোনো অঙ্গ না থাকলে তার চলতে ফিরতে ভীষণ কষ্ট হলেও দেখতে পাওয়ার কারণে কোনো মতে জীবণ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে চোখে দেখে না তার মতো অসহায় এবং হতভাগ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে আল্লাহর এতো সুন্দর সৃষ্টি এবং অফুরন্ত নিয়ামতগুলোর কিছুই দেখতে পায় না, এমনকি তার সবচেয়ে প্রিয় বা আপনজনকেও দেখতে পায় না। তাই চোখের দৃষ্টি সমুন্নত রাখতে প্রতিটি মানুষেরই সচেষ্ট থাকা উচিত। তবে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেলে বা চোখে সমস্যা হওয়ার পর ডাক্তারের নিকট গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে ভালো হওয়ার চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো চোখের দৃষ্টি যাতে কোনো কারণে ক্ষীণ না হয়, সেদিকে পূর্ব থেকেই সচেতন থাকা। সুতরাংএক্ষেত্রে সর্তক ও সচেতন থাকার প্রাথমিক একটি ধাপ হলো সুরমা ব্যবহার করা। যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে একটি সুন্নাত আদায়ের মাধ্যমে খুব সহজেই দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ... اِنَّ خَيْرَ اَكْحَالِكُمْ الاِثْمَدُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَ يَنْبُتُ الشَّعْرَ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন- ...তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইছমাদ। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে।[১৩০]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالاِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعَرَ–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইছমাদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা এটা দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং চুল গজাতে সাহায্য করে।[১৩১]

আধুনিক ফ্যাশনের যুগে চোখে সুরমা লাগানো যেন প্রাচীনত্বের নিদর্শন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কাজল, আইভ্রূ, পাউডার, ক্রীম, পালিশ ও অন্যান্য প্রসাধনী এতো অধিক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে যে তাতে মানুষের চেহারা-সুরতই বদলে যাচ্ছে। এগুলোর বেশির ভাগই এমন যা অঙ্গ-প্রতঙ্গ, চামড়া এবং সৃষ্টিগত রঙ, রূপ ও সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে দেয়। সুরমা শুধুমাত্র একটি ফ্যাশন বা সৌন্দর্যের প্রতীকই নয়, বরং এর মধ্যে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। বিভিন্ন কৃত্রিম বস্তু দ্বারা সংমিশ্রিত বাজারের সুরমার কথা হাদীসে বলা হয়নি; বরং ঘুমানোর পূর্বে চোখে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল সুরমা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। সুরমা ব্যবহার করা যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত তথাপি পার্থিব দিক দিয়ে এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। জাতিসংঘের অধীনস্থ ইউনেস্কোর একটি প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, গোটা বিশ্বে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ অন্ধ রয়েছে এবং অগণিত মানুষ চোখের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। দিন দিন চোখের সমস্যা বেড়েই চলছে, কমার কোনো লক্ষণ নেই। আল্লাহ প্রদত্ত চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেলে মানুষ যদিও ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে নব আবিষ্কৃত দামি চশমা, কাঁচ এবং ঔষধ ব্যবহার করে এর ঘাটতি পূরণ করার সচেষ্ট হয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত কল্যাণকর উপায় তথা নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করলে অতি সহজে এবং অল্প খরচে তা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এমন অনেক বয়স্ক লোক দেখা যায়, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত দিক নির্দেশনার ওপর বাস্তবে আমল করে নিজের দৃষ্টিশক্তিকে অটুট রেখেছে। এমনকি ৭০/৮০ বা ততোধিক বয়সের বৃদ্ধও কেরোসিন তেলের বাতির আলোতে ক্ষুদ্রাক্ষরের পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে সক্ষমতা রাখে।

**সুরমা ব্যবহারের উপকারিতা**

(ক) সুরমা একটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক উপাদান। ফলে চোখে কোনো ধরনের ক্ষতিকারক জীবাণু থাকলে তা ধ্বংস করতে সক্ষম।

(খ) আধুনিক গবেষণা মতে, চোখে সুরমা ব্যবহার করলে সূর্যের প্রখর কিরণ চোখের রেটিনার ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে সুরমা ব্যবহার না করলে আল্ট্রা ভাইওলেট রশ্মি রেটিনার যথেষ্ট ক্ষতি করে।

(গ) নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করলে চোখের ওপর কোনো লেড ইনফেকশন হয় না।

---

১৩০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সুরমা ব্যবহার, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং- ৩৮৩৬

১৩১. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ইসমাদ পাহাড়েরর সুরমা, খ. ৪, পৃ. ১১৪-১১৫, হাদীস নং- ৩৪৯৬

(ঘ) চক্ষুরোগীর জন্য সুরমা ব্যবহার খুবই উপকারি। যে বক্তি সর্বদা সুরমা ব্যবহার করে, তার চোখে জ্বালাপোড়া রোগ কম হয়।

(ঙ) চক্ষু বিশেষজ্ঞগণের মতে, সুরমা চোখকে এমন সব রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে, যার চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অসম্ভব।

(চ) চোখের জখম, আঁচড়, জ্বালাপোড়া ইত্যাদির জন্য সুরমা অত্যন্ত উপকারি। এটা সর্বপ্রকার ছোঁয়াচে রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়।

(ছ) রাতে সুরমা ব্যবহার করলে সারাদিন যে সমস্ত ধুলা-বালি চোখে প্রবেশ করে, তা সুরমার সাথে মিশ্রিত হয়ে চোখের কিনারা দিয়ে বের হয়ে যায়। আবার সকালে চোখ ধৌত করলে চেহারার ওপর সুরমার কোনো কালদাগও থাকে না।

(জ) যারা সর্বদা সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ বা লেখাপড়ায় লিপ্ত থাকে, তাদের জন্য নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করলে চোখের দুর্বলতা, প্রতিবন্ধকতা এবং রোগ-ব্যাধি দূর হয়।

(ঝ) নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করলে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে এবং সহজে চোখে ছানি পড়ে না।[১৩২]

**সুরমার উপাদান**

সুরমা একটি খনিজ পদার্থ। মূল উপাদান হলো লিড সালফাইড, যা চূর্ণ করে এটা তৈরি করা হয়। তবে সুরমার ঔষধি গুণ থাকলেও মাত্রাতিরিক্ত সুরমা ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সীসার (লেড সালপাইড ও গ্যালোনা)-এর উপস্থিতি চোখের জন্য বিপদজনক হতে পারে। তাই হাদীসের ভাষ্য মতে, সুন্নাত তরীকায় নির্ভেজাল সুরমা ব্যবহার করা উচিত। কৃত্রিম বস্তুর দ্বারা সংমিশ্রিত নিম্নমানের সুরমা ব্যবহার করা একেবারেই ঠিক নয়। এতে চোখের মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

**সুরমার ব্যবহার পদ্ধতি**

রাত্রে শয়নকালে দু'চোখে সুরমা লাগানো সুন্নাত। পুরুষ ও মহিলা সবাই তা ব্যবহার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতে ঘুমানোর আগে চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি সুরমাদানি ছিল, তা থেকে তিনি প্রতি চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন।[১৩৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন। ইবনে সাদ বলেন, তিন পদ্ধতিতে সুরমা লাগানো যায়-

(ক) প্রত্যেক চোখে আলাদাভাবে তিনবার করে সুরমা দেয়া অর্থাৎ প্রথমে ডান চোখে তিনবার, এরপর বাম চোখে তিনবার।

(খ) দু'চোখে একসাথে সুরমা দেয়া অর্থাৎ প্রথমে ডান চোখের ডান দিক হতে একবার, এরপর বাম চোখের ডান দিক হতে একবার। এভাবে পর্যায়ক্রমে তিনবারে শেষ করা।

(৩) রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে দু'বার সুরমা লাগাতেন। কেউ ইচ্ছা করলে এ পদ্ধতিতেও সুরমা ব্যবহার করতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলেন, ডান চোখে দু'বার এবং বাম চোখে দু'বার সুরমা লাগানো। অত:পর একবার কাঠিতে সুরমা নিয়ে উভয় চোখে লাগানো। এভাবে সংখ্যার মধ্যে বেজোড় হয়ে যায়। আর বেজোড় সংখ্যা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই পছন্দ। হাদীসেও বর্ণিত আছে – إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ অর্থাৎ, আল্লাহ বেজোড় (একক), তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।[১৩৪]

**ইছমাদ সুরমা**

---

১৩২. ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৯খ্রি:, খ. ২, পৃ. ২৮৩-২৮৪

১৩৩. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: বেজোড় সংখ্যায় সুরমা ব্যবহার, খ. ৪, পৃ. ১১৬, হাদীস নং- ৩৪৯৯

১৩৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: বিতিরের সালাত সুন্নাত, খ. ১, পৃ. ২১০, হাদীস নং- ১৪১৬

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইছমাদ নামক সুরমা ব্যবহার করার প্রতি বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন। কেননা ইছমাদ সুরমা চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, চোখের পাতায় চুল গজাতে সাহায্য করে এবং চোখ পরিষ্কার রাখে।[১৩৫]
অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, এটা চোখের ময়লা দূর করে এবং চোখ পরিষ্কার করে।
তাই সুরমা ব্যবহার করে চোখের উপকার পেতে চাইলে, যতদূর সম্ভব ইছমাদ সুরমা ব্যবহার করা উচিত।

**প্রাসঙ্গিক আলোচনা**

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং পরবর্তীতে চার মাযহাবের ইমামগণসহ সকল পীর-দরবেশ সুরমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক পুরুষ শুধু সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করে থাকে, যা ঠিক নয়। কারণ এরূপ অঙ্গসৌন্দর্য মহিলাদের বিশেষত্ব। অনেকে আবার সৌখিনতার জন্যও সুরমা ব্যবহার করে। কিন্তু সুরমা ব্যবহার করা নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নাত এবং তিনি নিজেও তা ব্যবহার করেছেন এই ভেবে যদি কোনো পুরুষ সুরমা ব্যবহার করে, তাহলে সৌন্দর্য ও সৌখিনতার সাথে সাথে সুন্নাতের সওয়াবও মিলবে এবং এটা চোখকে ঔজ্জ্বল্য দান করে।[১৩৬]

সুরমার উৎপত্তি এবং ব্যবহার সম্পর্কে অনেককে বলতে শোনা যায়, হযরত মূসা (আ.) যখন তূর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন মহান আল্লাহর নূরের তাজাল্লীতে পাহাড় ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। সেই ভস্মিভূত পাহাড় থেকেই সুরমার উৎপত্তি ও ব্যবহার। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সুরমার সাথে তূর পাহাড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহকে দেখার ইচ্ছা ও তূর পাহাড়ের মূল ঘটনাটি সত্য।[১৩৭] কিন্তু কোনো মুফাসসির এই ঘটনার সাথে সুরমাকে জড়িয়ে দেয়ার মতো সামান্যতম তথ্য কোথাও উল্লেখ করেননি।

**মায়ের দুধের গুণাবলী**

শিশুরা জাতির অমূল্য সম্পদ এবং আজকের শিশু ভবিষ্যতের কর্ণধার। সুস্থ শিশু মানেই সুস্থ জাতি। তাই শিশুদের সুস্থ, নিরাপদ ও সবলভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। এটি আল্লাহ তাআলার একটি কুদরতী পদার্থ। তাই বলা হয়, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে মায়ের দুধই সর্বোত্তম ও নিরাপদ খাবার। মায়ের দুধ এমনই অকল্পনীয় সম্পদ যে, মায়ের দুধ শিশুদের জীবন রক্ষা করে। সুতরাং মাতৃদুগ্ধ কেবল শিশুদের পুষ্টি বা শারীরিক বৃদ্ধিতে নয়, শিশুর মানসিকতা বিকাশেও ব্যাপক অবদান রাখে। মায়ের বুকের দুধ পান করালে সাধারণত দুই বছর অবধি শিশুর পুষ্টিহীনতার  মতো গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে না। মায়ের দুধে এমন ধরনের ফ্যাটি এসিড থাকে, যা কোনো পশুর দুধে থাকে না। ফলে পরবর্তীতে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও খাদ্যনালীর দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা থেকেও রক্ষা করে। শিশুর দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতেও মায়ের বুকের দুধ ঔষধের মতো কাজ করে। তাই শিশুদের বুকের দুধ পান করানো সামাজিকভাবে আমাদের ওপর যেমন নৈতিক দায়িত্ব, তেমনি আল্লাহ তা'আলারও হুকুম। পবিত্র কুরআনেইরশাদ হচ্ছে – وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

অর্থ: মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো ২ বছর বুকের দুধ পান করাবে।[১৩৮] ...

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন– حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

অর্থ: ... তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস ...।[১৩৯]

ইমাম আবু আবু হানিফা (রহ.) কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসের আলোকে শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করার পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। ফলে শিশুর জন্ম পরবর্তী আড়াই বছর শিশুর প্রথম ও প্রধান খাদ্যই হলো মায়ের দুধ, যা শিশুর জন্য একটি আদর্শ খাদ্য।

---

১৩৫. *সুনান ইবন মাজাহ*,  প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ইসমাদ পাহাড়েরর সুরমা, খ. ৪, পৃ. ১১৪-১১৫, হাদীস নং- ৩৪৯৬
১৩৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম সা.* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
১৩৭. আল-কুরআন, ৭: ১৪৩
১৩৮. আল-কুরআন, ২: ২৩৩
১৩৯. আল-কুরআন, ৪৬: ১৫

এমতাবস্থায় একথা অনস্বীকার্য যে শিশুর প্রতি মায়ের স্তন্য দান রক্ষা ও উৎসাহিত করা শিশুদের সুষমভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম জরুরী অংশ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিশুদের পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য শিশুকে মায়ের দুধ দেয়া অব্যাহত রাখা এবং যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটেছে সেখানে অভ্যাসটি ফিরিয়ে আনার ওপর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) বেশ গুরুত্বারোপ করে আসছে। শিশুদের মায়ের দুধ পান করানোর উৎসাহ যোগানো এবং কোথাও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে এর প্রতিবিধান করা জাতিসংঘের এই দুই অংগ-সংগঠনের নানাবিধ কর্মসূচির অন্যতম অনুষঙ্গ।

শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টিহীনতা দূর করার লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারও মাতৃদুগ্ধের প্রচার অভিযানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্যাকেজ সার্ভিস দিচ্ছে এবং নানাবিধ কর্মসূচি পালন করছে। এসব কর্মসূচিসমূহের মধ্যে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা অন্যতম। প্রতিবছর ১ হতে ৭ আগস্ট বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করার উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

মায়ের বুকের দুধ সম্পর্কে এ যাবৎ উদঘাটিত বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য বুকের দুধের কোনো বিকল্প নেই। শিশু খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব সহজেই বুকের দুধ হজম করতে পারে। সন্তান প্রসবের প্রথম দুই/তিন দিন মায়ের বুকে ঘন ও হলুদ রঙের আঠালো এক প্রকার দুধ আসে যাকে 'শাল দুধ' বলা হয়। শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে অনেক ধরনের কুসংস্কার রয়েছে। অনেক মা একে পঁচা দুধ মনে করে ফেলে দেয়, আবার অনেকে মনে করে শাল দুধ খাওয়ালে শিশুর অমঙ্গল বা নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হয়। অথচ শাল দুধ হচ্ছে নবজাতকের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, জন্মের পর শিশুর পুষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তার সবই রয়েছে শাল দুধে। শাল দুধে রয়েছে পর্যাপ্ত রোগ-প্রতিরোধক উপাদান, যা শিশুকে নানাবিধ রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শাল দুধকে শিশুর জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত প্রথম টিকা বলা হয়। তাই প্রতিটি মায়েরই উচিত জন্মের পর পরই শিশুকে বুকের শাল দুধ খাওয়ানো।

মায়ের দুধে পলি আনস্যাচুরেবেজ চর্বি বেশি থাকে। এ চর্বি শিশু সহজেই হযম করতে পারে। শিশুর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আবরণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল মায়ের দুধে বেশি থাকে। মায়ের দুধে থাকে দুধের চর্বি হযমের জন্য প্রচুর লাইসেস জাতীয় এনজাইম এবং প্রয়োজনীয় ল্যাকটোজি, উপরন্তু বিফিডার্স ফ্যাক্টর নামক এক ধরনের বিশেষ শর্করা থাকে চল্লিশ গুণ বেশি। তাছাড়া মায়ের দুধে থাকে পানি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, ভিটামিন, এ্যামাইনো এসিড, হিস্টিডিন, লিউসিন, থ্রিওনিন প্রভৃতি পদার্থ।[১৪০]

*** মায়ের দুধে যেসকল উপাদান রয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো**

* শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সবচেয়ে উপযোগী আমিষ ও চর্বি।

* অন্যান্য দুধের চেয়ে অধিক পরিমাণে শর্করা, যা শিশুর জন্য অতীব প্রয়োজন।

* প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। যে সকল শিশু বুকের দুধ খায় তাদের আলাদা করে কোনো ভিটামিন খাওয়াতে হয় না।

* বুকের দুধে যথেষ্ট পরিমাণ আয়রন থাকে। এর প্রায় সবটাই শিশু হজম করতে পারে বলে বুকের দুধ খেলে শিশুরা রক্তশূন্যতায় ভোগে না এবং এতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে, যে কারণে গ্রীষ্মকালেও শিশুকে আলাদা করে পানি পান করানোর প্রয়োজন হয় না।

* বুকের দুধে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ ও খনিজ পদার্থ।

* বুকের দুধে থাকে এক ধরনের এনজাইম, যা চর্বি হজম করতে সহায়তা করে।

* বুকের দুধে কোন রোগ-জীবাণু থাকে না বলে এ দুধ খেয়ে শিশু কখনও অসুস্থ হয় না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, যে সকল শিশু বুকের দুধ ছাড়া অন্য দুধ পান করে তারা প্রায়ই পেটের অসুখ, নিউমোনিয়াসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বুকের দুধে রয়েছে প্রতিরোধক বহু উপাদান যা শিশুকে নানাবিদ অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা করে।

---

১৪০. ডা. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, "দুধ : কুরআন ও বিজ্ঞানে", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

**বুকের দুধে যেসকল রোগ প্রতিরোধক উপাদান রয়েছে সেগুলো হলো**

* জীবাণু ধ্বংসকারী শ্বেতকণিকা বা লিউকোসাইটস।

* রোগ প্রতিরোধক ইমিউনো গ্লোবোলিন বা এন্টিবডি। শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এইসব এন্টিবডি শিশুকে রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

* বুকের দুধে থাকে 'বাই ফিডাস ফ্যাক্টর' নামে এক ধরনের পদার্থ, যা শিশুর পেটে বিশেষ এক ধরনের জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়ার বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

* এই জীবাণুর নাম ল্যাক্টোব্যাসিলাস, যা পেটে অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে শিশুর ডায়রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

* বুকের দুধে থাকে ল্যাক্টোফেরিন যা শিশুর পেটে লৌহ আয়রন বেঁধে রাখতে পারে। ফলে যে সকল জীবাণু লৌহ ছাড়া বাঁচতে পারে না, সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

মায়ের বুকের দুধ পান করা যেমন প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার, তেমনি প্রতিটি মায়েরও অধিকার রয়েছে তাদের সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ানো। মায়ের দুধের উপযোগিতা ও ফলপ্রসূতা সর্ম্পকে গোটা বিশ্বে ইতোমধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মায়ের দুধ না খাওয়ানো ধনী, সম্পদশালী কিংবা বিলাসীতা নয়; বরং মায়ের দুধ খাওয়ানো সব মায়েরই ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।[১৪১]

**স্তনের যত্ন**

মনে রাখতে হবে, মায়ের দুধই সন্তানের একমাত্র সম্বল। তাই প্রত্যেকটি গর্ভধারিণী মা খুব যত্ন সহকারে ভবিষ্যতের সন্তানের রিযিকের জন্য সতর্ক থাকা গুরু দায়িত্ব। অনেক সময় দেখা যায় জন্মের কিছুক্ষণ পরই নবজাতক খাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে, তখন তাকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মুখে স্তন তুলে দিলেও স্তনের বোঁটার (Nipple) চামড়া পুরু ও খসখসে হওয়ার কারণে শিশু মায়ের বুকের দুধ টেনে খেতে পারে না। এতে অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন যে স্তনে দুধ নেই। অত:পর সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে তারা বাধ্য হয়ে বাইরের খাবারের দিকে ছুটে এবং নবজাতকও একবার বাইরের খাবারের স্বাদ পেয়ে পরবর্তীতে কষ্ট করে মায়ের বুকের দুধ আর টানতে চায় না। ফলে সন্তান স্তন না টানার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত স্বরূপ প্রদত্ত মায়ের বুকে দুধ আসাও বন্ধ হয়ে যায়। এতে একজন নবজাতক আজীবনের জন্য মায়ের বুকের দুধ পান করা থেকে মাহরূম থাকে, যা খুবই দু:খজনক। তাই গর্ভাবস্থায় প্রত্যেকটি মাকে স্তনের প্রতি অবশ্যই যত্ন নেয়া আবশ্যক। বিশেষ করে গর্ভের শেষ কয়েক মাস। এ সময় স্তনের বোঁটা দিনে ৫/৭ বার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুছে মাখন লাগিয়ে রাখতে হবে। কেননা এ সময় যেহেতু বোঁটার চামড়া পুরু ও খসখসে হয়ে ফেটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাই মাখনই ভালো। তাছাড়া বোঁটা যদি স্তনের ভেতর ঢুকে যায়, তাহলে প্রতিদিন অনেকবার বোঁটা টেনে তুলতে হবে। মাঝেমধ্যে স্তনের নিচ থেকে বোঁটার দিকে আস্তে আস্তে মুছে তুলতে হবে। গমের চোকলের মত স্তনের বোঁটায় যা লেগে থাকে, তা যদি সহজে না ওঠে তবে ফোটানো নারিকেল তেল দিয়ে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে সাবান পানি দিয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। তা না হলে পরবর্তীতে বোঁটা ফেটে রক্ত পড়তে পারে। এরূপ করলে বোঁটা নরম হয় এবং প্রসবের পর স্তনে দুধ আসে, যা নবজাতক সহজে টেনে খেতে পারে।[১৪২]

**প্রাণীর দুধে যত গুণ**

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রথম এবং প্রধান খাদ্যই হচ্ছে দুধ। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। শিশুরা মায়ের দুধ পান করে অনেকদিন পর্যন্ত জীবন ধারণ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষও দুধ পান করে বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ লৌহ উপাদান না থাকায় বাইরে থেকে লৌহ সরবরাহ করলে শুধু দুধ পান করেও বেঁচে থাকা সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, দুধের মতো উপাদেয় খাদ্য আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই দুধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য।

---

১৪১. মোহাম্মদ রফিকউল্লাহ এমরান, "মায়ের দুধের উপকারিতা", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১২৩

১৪২. প্রাগুক্ত

শরীর গঠনের জন্য যত প্রকার উপাদান প্রয়োজন তার সবটাই দুধের মধ্যে বিদ্যমান। এতে আমিষ (Protein), শর্করা (Sugar), স্নেহ জাতীয় পদার্থ (Fat), ভিটামিন (Vitamin), ধাতব লবণ (Mineral salts) ও পানি (Water) ইত্যাদিসহ আরো ছয় ধরনের উপাদান রয়েছে। দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও ফসফরাসও রয়েছে। সুতরাং সুস্থ-অসুস্থ, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ এবং সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সকলের জন্যই দুধ প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা পবিকত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين

অর্থ: তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্তনি:সৃত বিশুদ্ধ দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।[১৪৩]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে উত্তম পানীয় দ্রব্যের বর্ণনায় দুধের কথাও উল্লেখ করে বলেন-

فِيْهَا اَنْهَارُ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِاٰسِنٍ وَ اَنْهَارُمِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ–

অর্থ: তাতে (জান্নাতে) রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি।[১৪৪]

বাস্তবে যে সকল চতুষ্পদ জন্তুর স্তন থেকে আমরা দুধ সংগ্রহ করি এটা আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ কুদরত। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে।
চতুষ্পদ জন্ত ঘাস ও লতা-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ঘাস আর লতা-পাতাকে বেঁটে রস বের করলে তা থেকে এক ফোঁটা দুধ তৈরি করা যাবে না। যেটুকু খাদ্য খেয়ে চতুষ্পদ জন্তু যত পরিমাণ দুধ সরবরাহ করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ঐ বস্তু থেকে এক দশমাংশ দুধ কোন মতেই উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাই শুধু খাদ্য থেকেই দুধ তৈরি হয় এমন নয়, খাদ্য না পেলেও চতুষ্পদ জন্তুর স্তন থেকে দুধ পাওয়া যায়। খাদ্যের প্রাচুর্যের সাথে দুধের পরিমাণের হেরফের হয় মাত্র। এ যেনো আল্লাহর অপূর্ব হিকমতপূর্ণ কৌশল এবং মানুষের চিন্তার বহির্ভূত এ প্রক্রিয়া। পশুর স্তন ও দেহ এক স্বয়ংক্রিয় দুগ্ধ উৎপাদন কারখানা। এ কারখানার সাথে মানুষের তৈরি কোনো কারখানার তুলনাই হয় না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন- জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলিতে একত্রিত হলে পাকস্থলি তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলির এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়। রক্তকে পৃথক করে রগের মধ্যে পরিচালিত করে এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌছে দেয়। অত:পর পাকস্থলিতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়- যা গোবর বা লেদা হয়ে বের হয়ে আসে। জন্তুর স্তন তার পেটের নিচের দিকে অবস্থিত এবং স্তনে রয়েছে পর্যাপ্ত রক্তনালী। এ রক্তনালী পুরো স্তনে রক্ত সরবরাহ করে আবার স্তন থেকে টেনে নিয়ে হৃদয়ে (হার্টে) স্থানান্তর করে। এ সকল রক্তনালির গা ঘেঁষেই অবস্থান করে স্তনের দুগ্ধনালী। এ সকল নালী থেকে বেরিয়ে আসে নির্ভেজাল খাঁটি দুধ। স্তনের উপরিভাগে থাকে জন্তুর বৃহৎ পেট। এর মাঝে থাকে তার পাকস্থলি, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র ও মলভান্ডার প্রভৃতি। এগুলোর কাছাকাছি স্থান থেকে আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে বেরিয়ে আসে দুধ। জন্তুর উদরস্থিত বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় এবং কারিগরি সমন্বয় ও সহযোগিতায় দুধ তৈরি হয়। যে খাদ্য থেকে গোবর ও রক্তে তৈরি হয়, সে খাদ্যই দুধ তৈরিতে সহায়তা করে।

তাই রাসূলুল্লাহও (সা.) দুধ খুব পছন্দ করতেন এবং দুধকে বরকতময় দ্রব্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে এসেছে–عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اُتِىَ بِلَبَنٍ قَالَ بَرَكَةٌ اَوْ بَرَكَتَانِ

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যখন দুধ আনা হতো, তিনি বলতেন: এক অথবা দুই বরকত।[১৪৫]

عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ ... قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْتَلِبُوْا هٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيْبَهُ وَ نَرْفَعُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَصِيْبَهُ ... ثُمَّ يَاْتِىَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّىْ ثُمِّ يَاْتِى شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ–

১৪৩. আল-কুরআন, ১৬: ৬৬
১৪৪. আল-কুরআন, ৪৭: ১৫
১৪৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: দুধ, খ. ৪, পৃ. ৩৫, হাদীস নং- ৩৩২১

অর্থ: মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা ভাগ করে পান করবো। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করতো। আর আমরা নবী কারীম (সা.)-এর জন্য তাঁর অংশ তুলে রাখতাম ... এরপর তিনি মসজিদে এসে (এশার) সালাত আদায় করেতন ও ফিরে এসে দুধ পান করতেন।[১৪৬]অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: উত্তম দান হলো একটি দুধের উটনী বা একটি দুধের বকরী যা সকালে এক পাত্র দুধ দেয় আবার সন্ধ্যায় আরেক পাত্র দুধ দেয়।

বিভিন্ন প্রাণীর দুধে অবস্থিত বিভিন্ন পদার্থে ও রঙে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গরুর দুধ হালকা সাদা, ক্যাঙারুর দুধ লাল এবং মহিষের দুধ গাঢ় সাদা। তবে গুণের দিক দিয়ে দুধে মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য নেই। গরুর দুধ, ছাগলের দুধ ও মহিষের দুধের শতকরা ১০০ ভাগই পানের উপযোগী। তবে গরুর ১০০ গ্রাম দুধে জলীয়াংশ থাকে ৮৭.৫ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৮৬.৮ গ্রাম ও মহিষের দুধে ৮১ গ্রাম। এ কারণেই দুধ তরল ও কমবেশি ঘনত্ব হয়ে থাকে। এছাড়া গরুর দুধে আমিষ থাকে ৩.২ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৩.৩ গ্রাম, মহিষের দুধে ৪.৩ গ্রাম। গরু ও ছাগলের দুধে আমিষের পরিমাণের পার্থক্য নগণ্য হলেও মহিষের দুধের পার্থক্য একটু বেশি। আমিষ মানব দেহের ক্ষয়পূরণ করে, বৃদ্ধি ঘটায়, পুষ্টি সাধন করে, জারক রস, হরমোন, কিছু শক্তি ও তাপ উৎপাদনে সহায়তা করে, রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। মাংসপেশী গঠন করে। আমিষের উদ্বৃত্ত অংশ শর্করা বা চর্বিতে পরিণত হতে পারে।

গরুর দুধে চর্বির পরিমাণ থাকে ৪.১ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৪.৫ গ্রাম এবং মহিষের দুধে ৮.৮ গ্রাম। গরু ও ছাগলের দুধে চর্বির পরিমাণ কাছাকাছি হলেও মহিষের দুধে চর্বিও পরিমাণ বেশি। চর্বি মানব শরীরে শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে, চর্মের কোমলতা ও মাংসের নমনীয়তা রক্ষা করে। চর্মের ও মাংসের মেদ বৃদ্ধি করে সৌন্দর্য ও শরীরের গঠনের সৌকর্য বৃদ্ধি করে। দুধে বিভিন্ন খনিজ পদার্থও বিদ্যমান। এর হার গরু, ছাগল ও মহিষ একই অর্থাৎ ০.৮ গ্রাম। খনিজ পদার্থ দেহ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।

গরুর দুধে শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে ৪.৪ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৪.৬ গ্রাম এবং মহিষের দুধে ৫ গ্রাম। শর্করা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে এবং দেহের ওযন বাড়ায়। গরুর দুধে ক্যালোরীর পরিমাণ ৬৭, ছাগলের দুধে ৭২ এবং মহিষের দুধে ১১৭। মহিষের দুধ এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্যালোরী সরবরাহ করে। ক্যালোরী হচ্ছে শক্তির একক। মানুষ ভিটামিনের অভাবে মারা যায় না, কিন্তু ক্যালোরীর অভাবে মারা যায়। দুধ প্রয়োজনীয় ক্যালরী সরবরাহ করে মানুষকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। এছাড়া দুধে আরো অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থ রয়েছে। গরুর দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১২০ মিলিগ্রাম, ছাগলের দুধ ১৭০ মিলিগ্রাম, মহিষের দুধে ১২০ মিলিগ্রাম। ফসফরাসের পরিমাণ গরুর দুধে ৯০ মিলিগ্রাম, ছাগলের দুধে ১২০ মিলিগ্রাম, মহিষের দুধে ১৩০ মিলিগ্রাম। ক্যারটিন গরুর দুধে ৪৯৭ মাইক্রোগ্রাম, ছাগলের দুধে ১৮২ মাইক্রোগ্রাম আর মহিষের দুধে ১৬০ মাইক্রোগ্রাম।

সকল দুধেরই সাধারণ গুণ হচ্ছে, বলবর্ধক, আয়ুবর্ধক, স্মৃতিশক্তিবর্ধক, নিদ্রাকারক ও ত্রিসোলনাশক। প্রাত:কালে দুধ পান করলে অগ্নিবৃদ্ধি, শারীরিক পুষ্টিবৃদ্ধি ও শুক্রবৃদ্ধি। দুপুরে দুধ পান করলে বল বৃদ্ধি ও কফ নাশ হয়। রাত্রে দুধ পান করলে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি হয়, আরামপ্রদ নিদ্রা হয়। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য সকল বয়সেই দুধ পান করা হিতকর। গরুর দুধ বাত, পিত্ত, রক্তদোষ, হৃদরোগ, বেরিবেরি ও ন্যাফ্রাইটিস রোগে উপকার করে। ছাগলের দুধ মলরোধক এবং তা রক্তাতিসার ও রক্ত আমাশয়ে উপকার করে। মহিষের দুধ রক্তপিত্ত ও দাহ নাশ করে।

দুধ থেকে তৈরি হয় দই, ঘি, মাখন, পনির, ঘোল প্রভৃতি। নানা প্রকার মিষ্টি ও খাদ্য তৈরিতেও দুধ ব্যবহৃত হয়। এগুলো মানব শরীরের জন্য উপাদেয় ও হিতকর। মিষ্টি দই মধুর রস সরবরাহকারক, শুক্রবর্ধকজ, বায়ুনাশক, রক্ত পিত্তের শান্তিদায়ক, পুষ্টিকর ও কফনাশক। তা মেদ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। অম্ল বা টক দই অগ্নিবর্ধক, পিত্ত, রক্ত ও কফ বর্ধক, মলরোধক, শোথজনক, পুষ্টিকর ও অরুচিনাশক।

---

১৪৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্য, অনুচ্ছেদ: মেহমানের সমাদর করা এবং তাকে প্রাধান্য দেয়ার ফযীলত, খ. ৬,পৃ. ১৬৭-১৬৮, হাদীস নং- ৫৩৫৭

ঘি শরীরে চর্বি সরবরাহের এক শ্রেষ্ঠ উৎস। চতুষ্পদ জন্তুর দুধ থেকে তৈরি সকল ঘি-ই আয়ু ও দেহের দৃঢ়তা বাড়ায়, শীত নাশ করে, বল বাড়ায়, কাশি, সৌকুমার্য বৃদ্ধিসহ স্মৃতিশক্তি বর্ধিত করে। রক্তপিত্তে, নেত্ররোগে, শুক্ররোগে ঘি বিশেষ উপকারী। পুরাতন ঘি আক্রান্ত স্থানে মালিশ করলে ব্যথা-বেদনা ও পুরাতন সর্দি উপশম হয়।[১৪৭]

উল্লেখ্য, গরুর দুধের উপকারিতা সকল জাতির মধ্যেই সমভাবে স্বীকৃত। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা তো গরুকে উপাস্যের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। সকল দেশের ডাক্তার শিশুদেরকে মায়ের দুধের পর গরুর দুধ পান করানোকে উত্তম এবং নিরাপদ মনে করেন। কেননা, গরুর দুধ তুলনামূলক হালকা ও দ্রুত পরিপাক হয়ে থাকে। তাছাড়া গরুর দুধ শক্তিবর্ধক এবং আরোগ্যদানকারী। হাদীসে এসেছে, হযরত সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন - عَلَيْكُمْ بِلَبَنِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا شِفَاءٌ وَّ سَمَنُهَا دَوَاءٌ وَ لَحْمُهَا دَاءٌ

অর্থ: তোমরা অবশ্যই গাভীর দুধ পান করবে। কেননা এর মধ্যে শেফা রয়েছে এবং এর ঘির মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। আর এর গোশতের মধ্যে রোগ রয়েছে।[১৪৮] অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ...ثُمَّ اُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ اطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ– وَ اِذَا سَقَى لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে প্রবেশ করেন এবং তাঁর সংগী ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.)। ... অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য দুধ আনলে তিনি তা পান করে ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন কোনো খাদ্য খাবে, তখন সে যেন বলে: ইয়া আল্লাহ! আপনি এ খাদ্যে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম খাদ্য আমাদের প্রদান করুন। আর তোমাদের কেউ যখন দুধ পান করবে, তখন সে যেনো বলে: ইয়া আল্লাহ! আপনি এ দুধের মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং এর চেয়ে অধিক আমাদের প্রদান করুন।[১৪৯]

মুসতাদরাকে হাকীম গ্রন্থের "তিব্ব" অধ্যায়ের প্রথম হাদীস হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ-ব্যাধি পাঠাননি, যার ঔষধ প্রেরণ করেননি। আর গাভীর দুধের মধ্যে প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে এবং হাদীসে শিফার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِلَبَنِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ–

অর্থ: কেননা গাভী সব ধরনের গাছের পাতা খেয়ে থাকে।[১৫১]

বাস্তবতা হলো- উট, মহিষ, ভেড়া, বকরী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর তুলনায় গাভীর দুধ উত্তম। সকল প্রকার ক্ষতি থেকে মুক্ত এবং কতিপয় রোগেরও শেফা। এতদ্ব্যতীত গাভীর ঘি এবং মাখনও বহু রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। চিকিৎসকগণ এটাকে ঔষধ হিসেবেও ব্যবস্থা করে থাকেন।

তবে গরুর গোশত যেহেতু গরম, তাই এর গরম প্রতিক্রিয়া কিছুটা সমস্যাও সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু আমাদের এ কথা সবসময় মনে রাখতে হবে, গরুর গোশত হালাল। আর হালাল কোনো কিছুকেই নিজের জন্য হারাম মনে করার অনুমতি শরীয়ত কখনও দেয়নি। তবে ডাক্তারী মতে কোনো রোগীর জন্য গরুর গোশত খাওয়া না খাওয়া ভিন্ন কথা।

১৪৭. ডা. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৫
১৪৮. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৪
১৪৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: দুধ পান করার পর যা বলতে হবে, খ. ২, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং- ৩৭৩০
১৫০. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩১৭, হাদীস নং- ৭৫০০
১৫১. *যাদুল মাআদ*,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮৬

যাই হোক, দুধ খুবই সুস্বাদু এবং সুস্থ শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি তরল পদার্থ। রাসূলুল্লাহ (সা.) দুধ খুবই পছন্দ করতেন এবং দুধেল প্রাণীকে যবেহ করার ফলে দুধের অভাব হোক এটা তিনি চাইতেন না। তাই গোশত খাওয়ার নিমিত্ত অথবা অন্য কারণে দুধেল পশু যবেহ না করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَتٰى رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَفَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ اِيَّاكَ وَ الْحَلُوْبَ-

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)এক আনসার ব্যক্তির নিকট আগমন করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য পশু যবেহ করতে ছুরি নিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবেহ করবে না।[১৫২] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ وَ لِعُمَرَ انْطَلِقَا بِنَا اِلَى الْوَاقِفِىْ- قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِى الْقَمَرِ حَتّٰى اَتَيْنَا الْحَائِطَ- فَقَالَ مَرْحَبًا وَ اَهْلاً- ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ- ثُمَّ جَالَ فِى الْغَنَمِ- فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِيَّاكَ وَ الْحَلَوْبَ-

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর ইবন আবু কুহাফা (রা.) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে এবং উমার (রা.)-কে বললেন: তোমরা উভয়ে আমাদের সাথে আল-ওয়াকিফীর নিকট চলো। রাবী বলেন, আমরা চাঁদনি রাতে রওয়ানা করে তাঁর বাগানে পৌঁছলাম। আল-ওয়াকিফী আমাদেরকে দেখে স্বাগত জানালেন। অত:পর তিনি একটি ছুরিসহ শেষ পালের মধ্যে চক্কর দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবেহ করো না।[১৫৩]

১৫২. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: যবেহ করা, অনুচ্ছেদ: দুগ্ধবতী পশু যবেহ করা নিষেধ, খ. ৩, পৃ. ৫৫৭, হাদীস নং- ৩১৮০
১৫৩. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫৮, হাদীস নং- ৩১৮১

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ: হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতি

**শিংগা লাগানো**

শিংগা লাগানো বা হিজামা হলো এমন একটি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে মানুষের সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা বিদ্যমান রয়েছে। এতে কোন ধরনের ঔষধের প্রয়োজন হয় না এবং অন্যান্য মেডিক্যাল ড্রাগসের মতো কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

বাংলায় শিংগা, আরবীতে হিজামা (حِجَامَة)এবং ইংরেজিতে Cupping therapy বলা হয়। তবে বর্তমানে Cupping পদ্ধতি বা হিজামা ব্যবস্থা একটি উন্নত সংস্করণ হওয়ায় এতে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, যাতে রক্তজীবাণুর মাধ্যমে রোগ সংক্রমিত হতে না পারে।

শিংগা লাগানো বা হিজামা একটি নববী চিকিৎসা ব্যবস্থা।এটি আরবী শব্দ 'আল-হাজম' থেকে এসেছে। যার অর্থ চোষা বা টেনে নেয়া।কোন কিছুর মাধ্যমে শরীরের দূষিত রক্ত (Toxin) চোষণ করে নেয়া হয়।নির্দিষ্ট স্থান থেকে সূঁচের মাধ্যমে নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে (টেনে/চুষে) নিস্তেজ প্রবাহহীন দূষিত রক্ত বের করে নেয়ার কারণে শরীরের মাংসপেশী সমূহের রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয় এবং পেশী, চামড়া, ত্বক ও শরীরের অরগানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এতে শরীর সতেজ ও শক্তিশালী এবংমনে প্রশান্তি অনুভব হয়।হিজামা অতি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে আরব বিশ্বে জনপ্রিয়। এটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে উৎপত্তি হলেও চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে আফ্রিকা, কোরিয়া, চীন ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশেও প্রচলিত রয়েছে। ১৮ শতক থেকে ইউরোপেও এর প্রচলন রয়েছে এবং বর্তমানেবহু দেশেই এ চিকিৎসাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। হাদীসে এসছে-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَعَا الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى تَحْتَجِمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِ شِفَاءً–

অর্থ: আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন: আমি দূর হবো না, যতক্ষণ না তাকে শিংগা লাগানো হয়। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় এর (শিংগার) মধ্যে নিরাময় রয়েছে।[১৫৪]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ –

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা যে সমস্ত বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো, তার মধ্যে শিংগা লাগানো উত্তম।[১৫৫]

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ–

অর্থ: সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের চিকিৎসাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো শিংগা লাগানো।[১৫৬]

হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু নাঈম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন- আমাকে আবুল কাসিম হযরত মুহাম্মদ (সা.) জানিয়েছেন, হযরত জিবরাইল (আ.) তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন-

اِنَّ الْحَجَمَ اَفْضَلُ مَا تَدَاوٰى بِهِ النَّاسُ–

অর্থ: মানুষ যে সকল জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করে তন্মধ্যে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শিংগা লাগানো।[১৫৭]

---

১৫৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রোগ নিরাময়ের জন্য শিংগা লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৬১৯, হাদীস নং- ৫৬৯৭

১৫৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: শিংগা লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৬১

১৫৬. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিঙ্গা লাগানোর বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৮৪, হাদীস নং- ৩৬০

১৫৭. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং- ৭৫৫০

عَنْ سَلْمٰى خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ اَحَدُ يَّشْتَكِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَجَعًا فِيْ رَأْسِهِ اِلاَّ قَالَ احْتَجِمْ وَ لاَ وَجَعًا فِيْ رِجْلَيْهِ اِلاَّ قَالَ اخْضِبْهُمَا–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিচারিকা সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট মাথা ব্যথার কথা বলতো তখন তিনি তাকে বলতেন: তুমি শিংগা লাগাও। আর যখন কেউ পায়ে ব্যথার কথা বলতো তখন তিনি তাকে বলতেন: তোমার দু'পায়ে মেহেদীর রং লাগাও।[১৫৮]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى اُبَيِّ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা নবী (সা.) উবাই ইবন কাব-এর নিকট এমন একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন, যিনি তার একটি শিরা কেটে শিংগা লাগান।[১৫৯]

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْتَجَمَ عَلٰى وَرْكِهِ مِنْ وَثْئٍ كَانَ بِهِ–

অর্থ: জারিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পায়ের নালিতে আঘাত লাগার কারণে সেখানে শিংগা লাগিয়েছেন।[১৬০]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) পাগল, কুষ্ঠ রোগী এবং মৃগী রোগের জন্য শিংগা লাগানোকে চিকিৎসা হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا نَافِعُ يَنْبَعُ لِيْ الدَّمُ فَاْتِنِيْ بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَ لاَ تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَ لاَ صَبِيًّا قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَ هِيَ تَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَ تَزِيْدُ فِي الْحِفْظِ–

অর্থ: নাফি (রা.) বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) একদা বললেন, হে নাফি! আমার রক্তের মধ্যে বিশেষ চাপ (স্ফুটন) সৃষ্টি হচ্ছে। এমন একজন হাজ্জাম (শিংগা লাগানেওয়ালা) ডাক সে যেন যুবক হয়, বৃদ্ধ অথবা অল্প বয়সী না হয়। অত:পর হযরত ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, খালি পেটে শিংগা লাগানো খুবই উত্তম। এতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং স্মৃতি ও মেধাশক্তি প্রখর হয়।[১৬১]হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: শিংগা লাগানোর ফলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পিঠ হালকা হয়।[১৬২]

**শিংগা লাগানোর স্থান**

عَنْ اَبِيْ كَبْشَتَ الاَنْصَارِيِّ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلٰى هَامَتِهِ وَ بَيْنَ كَتْفَيْهِ وَ هُوَ يَقُوْلُ مَنْ اَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ لاَّ يَتَدَاوٰى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ–

অর্থ: আবু কাবশা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) তাঁর মাথার সিঁথিতে এবং দুই কাঁধের মাঝখানে শিংগা লাগাতেন এবং ইরশাদ করতেন: যে ব্যক্তি এসব স্থান থেকে দূষিত রক্ত বের করে ফেলবে, সে কোনো রোগের জন্য অন্য চিকিৎসা না করলেও তার কোনো ক্ষতি হবে না।[১৬৩]

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْتَجَمَ ثَلٰثًا فِي الْاَخْدَعَيْنِ وَ الْكَاهِلِ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) তাঁর ঘাড়ে ও দুই কাঁধে তিনবার শিংগা লাগান।[১৬৪]

---

১৫৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: শিংগা লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৬২

১৫৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: শিরা কেটে রক্ত-মোক্ষণ করা এবং শিংগা লাগানোর স্থান, খ. ২, পৃ. ১৮৪,হাদীস নং- ৩৮৬৬

১৬০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৪,হাদীস নং- ৩৮৬৮

১৬১. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫, হাদীস নং- ৭৫৬১

১৬২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬, হাদীস নং- ৭৫৬৩

১৬৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: শিংগা লাগানোর স্থান, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৬৩

১৬৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৩-১৮৪, হাদীস নং- ৩৮৬৪

অন্য একটি হাদীসে এসেছে–اِنَّه اِحْتَجَمَ وَ هُوَ مُحْرِمُ فِىْ رَأْسِه لِصِدَاعٍ كَانَ بِه–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) এহরাম অবস্থায় স্বীয় ব্যথার কারণে মাথা মুবারকে শিংগা লাগিয়েছেন।[১৬৫]

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْتَجَمَ فِىْ وَرَكِه مِنْ وَثْىٍ كَانَ بِه–

অর্থ: হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বীয় রান মুবারকে শিংগা লাগিয়েছেন।[১৬৬]

আমাদের দেশের প্রাচীন অভিজ্ঞ ডাক্তারগণও এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, চিবুকের নিচে শিংগা লাগালে চেহারা, গলা এবং দাঁতের ব্যথা উপশম হয়। মাথা এবং হাতলিতে আরাম বোধ হয়। পায়ের গোড়ালীতে শিংগা লাগানোর দ্বারা রান এবং পায়ের গোছার ব্যথা নিরাময় হয় এবং খুজলী-পাচড়া জাতীয় চর্ম রোগ ভাল হয়। সীনার নিচে শিংগা লাগালে ফোঁড়া, পাচড়, খুজলী, দুম্বল, চর্মরোগ, নুকরস, অর্শরোগ ও স্থূল বুদ্ধি দূর হয়।[১৬৭]

**কোন দিন শিংগা লাগানো উত্তম**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعٍ عَشَرَةَ وَ تِسْعَ عَشَرَةَ وَ اِحْدٰى وَ عِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি (চন্দ্র মাসের) **১৭, ১৯** এবং **২১** তারিখে শিংগা লাগাবে, তার জন্য সমস্ত প্রকার রোগ মুক্তির কারণ হবে।[১৬৮]

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ اَبَاهَا كَانَ يَنْتَهٰى اَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلُثَاءِ وَ يَزْعَمُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ يَوْمَ الثُّلُثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَ فِيْهِ سَاعَةً لاَّ يَرْقَا–

অর্থ: আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা তার পরিবার-পরিজনদেরকে মঙ্গলবারে শিংগা লাগাতে নিষেধ করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করতেন, মঙ্গলবার হলো শরীরে রক্তের ধারা পরিবর্তনের দিন এবং এ দিনের মধ্যে এরূপ বিশেষ একটি সময় আছে, যখন রক্ত বন্ধ হয় না।[১৬৯]

হিজামা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামার উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, নিজে ব্যবহার করেছেন এবং হিজামা ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হিজামার ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামা করেছেন তাঁর মাথা ব্যথার জন্য, পায়ে, পিঠে, পিঠের ব্যথার জন্য, দুই কাঁধের মধ্যে এবং ঘাড়ের দু'টি রগের মধ্যে।[১৭০]

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে এসেছে-

০১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কেউ হিজামা করতে চাইলে সে যেন আরবী মাসের **১৭, ১৯** কিংবা **২১**তম দিনকে নির্বাচিত করে। রক্ত চাপের কারণে যেন তোমাদের কারো মৃত্যু না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।[১৭১]

০২. হযরত ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আমি মিরাজের রাতে যাদের মাঝখান দিয়েই গিয়েছি, তাদের সবাই আমাকে বলেছেন- আপনি আপনার উম্মতকে হিজামার আদেশ করবেন।[১৭২]

---

১৬৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রক্তমোক্ষম স্থান, খ. ৪, পৃ. ১০৯, হাদীস নং- ৩৪৮১
১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০, হাদীস নং- ৩৪৮৫
১৬৭. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুযযামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
১৬৮. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কোন দিন শিংগা লাগানো উত্তম, খ. ২, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং- ৩৮৬৫
১৬৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮৬৭
১৭০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রক্তমোক্ষন স্থান, খ. ৪, পৃ. ১০৯, হাদীস নং- ৩৪৮২,৩৪৮৩
১৭১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: কোন কোন দিন রক্ত মোক্ষন করা যাবে, খ. ৪, পৃ. ১১০, হাদীস নং- ৩৪৮৬
১৭২. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রক্ত মোক্ষণ, খ. ২, পৃ. ৭২, হাদীস নং- ২০৫২

০৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: হিজামাকারী কতই না উত্তম লোক। সে দূষিত রক্ত বের করে, মেরুদন্ড শক্ত করে ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে।[১৭৩]

শিংগা বা হিজামা (Cupping)-এর মাধ্যমে যে সব রোগের চিকিৎসা করা হয়েথাকে-

১. মাইগ্রেন জনিত দীর্ঘমেয়াদী মাথাব্যথা (Migraine)
২. দূষিত রক্ত পরিষ্কারকরণ (Purifz Blood)
৩. উচ্চরক্তচাপ (High Blood Pressure)
৪. ঘুমের ব্যাঘাত (Insomnia)
৫. স্মৃতিহীনতা (Parkinson's disease)
৬. অস্থি সন্ধির ব্যাথা/গেটে বাত/বাতের ব্যথা (Arthritis/Rheumatism)
৭. জয়েন্টের ব্যথা (Gout Pain)
৮. পিঠে বা সারা শরীরের (Backache/scabies)
৯. হাঁটু ব্যথা (Knee Pain)
১০. পায়ের তালুর ব্যথা (heel pain)
১১. সায়াটিক ব্যথা (Sciatica)
১২. মাথা ব্যথা (Head-ache)
১৩. ঘাড়ে ব্যাথা ও কাঁধে ব্যথা (Neck & Shoulder Pain)
১৪. কোমর ব্যথা (Waist Pain)
১৫. মাংসপেশীর ব্যথা (Muscles spasm)
১৬. দীর্ঘমেয়াদী পেট ব্যথা (Adbominal Pain)
১৭. হাড়ের স্থানচ্যুতি জনিত ব্যাথা, ফ্র্যাকচার পেইন
১৮. থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা (Thzroid Problem)
১৯. রক্তসংবহন তন্ত্রের ইনফেকশন (Blood circulation szstem)
২০. ত্বকের বর্জ্য নিষ্কাশন (Remove toxin)
২১. বিভিন্নরকম চর্মরোগ (Chronic Skin Diseses)
২২. সাইনুসাইটিস (Sinuses problem)
২৩. এজমা/হাঁপানি (Asthma)
২৪. হৃদরোগ (Cardiac Disease)
২৫. টনসিলের সমস্যা (Tonsillitis)
২৬. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Low Immunitz)
২৭. দাঁত, মুখ, গলা ব্যথা (Larznx, Gums and dental disease)
২৮. গ্যাস্ট্রিক পেইন, গ্যাস্ট্রিক আলসার, এসিডিটি (Gastric/Ulcer)
২৯. মুটিয়ে যাওয়া (Obesity)
৩০. দীর্ঘমেয়াদী চর্মরোগ (Chronic Skin Diseases)
৩১. ফোঁড়া-পাঁচড়া সহ আরো অনেক রোগ,
৩২. ডায়াবেটিস (Diabetes) ও ডায়াবেটিক ফুট,
৩৩. ভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রোল্যাপ্স/ হারনিয়েশান,
৩৪. চুল পড়া (Hair fall),
৩৫. মানসিক সমস্যা (Pszchological disorder),
৩৬. পারকিনসন্স ডিজিজ
৩৭. কিডনির সমস্যা (Kidnez Disease)

---

১৭৩. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রক্ত মোক্ষণ, খ. ২, পৃ. ৭২, হাদীস নং- ২০৫৩

৩৮. স্পোর্টস ইঞ্জুরি (খেলোয়াড়, আর্মি, কনট্যাক্ট স্পোর্টস)
৩৯. কানের সমস্যা
৪০. ক্যান্সারের ব্যাথা নিয়ন্ত্রন,
৪১. লিভার ডিজিজ, পোর্টাল হাইপারটেনশান,
৪২. হরমোনাল সমস্যা,
৪৩. ব্রেইন ডিজিজ ও ডিজঅর্ডার,
৪৪. ক্রনিক কফ/ফুসফুসের রোগ (Chronic Chugh/Lung Disease)
৪৫. Erectile Dzsfunction (ED)
৪৬. ব্রন,
৪৭. সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথেমেটোসাস (SLE)
৪৮. অনিয়মিত মাসিক, মেয়েদের অন্যান্য সমস্যা
৪৯. এডিকশান/ ডিপেন্ডেন্সি (স্লি-পিং পিল, ড্রাগস, কফ সিরাপ, জর্দা, সিগারেট, এলকোহল ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য)
৫০. TMJ Dysfunction Syndrome
৫১. প্যারালাইসিস (স্ট্রোক, মেরুদন্ডে আঘাত, গিয়েন বারে সিন্ড্রোম, ফেসিয়াল প্যারালাইসিস বা বেল'স পলসি প্রভৃতি)
৫২. অস্টিওপোরোসিস (হাড়ের ক্ষয়)
৫৩. Post menopsusal hot flush
৫০.Vaginismus
৫১. মাথা ঘোরা (Vertigo)
৫২. আইবিএস (কোলন ক্যানসার)
৫৪. অর্শ্বরোগ (Piles)
৫৫. ভগন্দর (Fistula, Anal Fissure)
৫৬. দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য (Chroic Constipation)
৫৭. বিষন্নতা ও স্নায়বিক চাপ (Depression & Nervous Stress)
৫৮. শ্বেত রোগ (ধবল, চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া)।

**হিজামা করার ক্ষেত্রে কিছু দিক নির্দেশনা**

১। খালি পেটে হিজামা করা উওম ।
২। গোসল করে হিজামা করা ভালো, তবে তা যেনো গোসলের তিন ঘণ্টা পর হয়।
৩। হিজামার আগের দিন ও পরের দিন সঙ্গম না করা ভালো।
৪। ইহরাম/সাওম অবস্থায় হিজামা করা যায়।
৫। স্বাভাবিক অবস্থায় সপ্তাহের সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতি বার করা ভালো। এছাড়াও আরবি মাসের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখ হিজামা করানো উওম। তবে প্রয়োজনে যেকোনো দিন যেকোনো সময়েও হিজামা করা যায়।

সুতরাং অসংখ্য হাদীসের বর্ণনানুযায়ী বলা যায়,শিংগা লাগানো বা হিজামা পদ্ধতিমানব শরীরের অসংখ্য রোগ নিরাময়, সুস্থতা রক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেঅত্যন্ত উপকারী একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা। যদিও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এটিকে খুব একটা মূল্যায়ন করে না এবং পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু মুসলিম হিসেবে আমাদের বিশ্বাসের স্থান থেকে এতটুকু বলতেই পারি, বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান এ বিষয়ে হয়তো এখনো যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণা করে ঐ জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) ইলমে অহীর মাধ্যমে বলে গেছেন। ভবিষ্যতে কখনো এমন সময় আসবে মানুষ এ বিষয়ে ফলপ্রসু গবেষণা করে এই নববী চিকিৎসা পদ্ধতিকে নিজেদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে গ্রহণ করবে।

**জ্বর নিবারণে পানি ব্যবহার**

জ্বর এমন একটি ব্যাধিজীবনে দু'/চার দশবার আক্রান্ত হয়নি এমন লোক হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই জ্বর আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানে প্রধানত জ্বরের যে কারণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাহলো শরীরে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করায় তার সাথে রক্তের শ্বেত কণিকার সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, ফলে স্নায়ুমণ্ডলীতে বড় ধরনের আঘাত লাগে এবং তা থেকে এক ধরনের উত্তাপের সৃষ্টি হয়। আর এ উত্তাপকেই জ্বর বলা হয়। পানিই হচ্ছে এর প্রধান ঔষধ বা প্রকিষেধক। কেননা কেউ যখন জ্বরের উত্তাপে ছটফট করতে থাকে এবং কোনো ঔষধই কাজে আসে না, তখন পানিই একমাত্র উপাদান যা অসহ্য যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়ে থাকে।[১৭৪]

সুতরাং জ্বর কোনো রোগ নয় তবে বহু রোগের একটা উপসর্গ। এই উপসর্গকে দূর করতেঅনেক সময় চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসক্রিপশনেরকোনো ঔষধ প্রয়োগই ফলদায়ক হয় না। তখন একটি কৌশলী পরিচর্যার (Intelligent nursing) প্রয়োজন হয় অর্থাৎ উচ্চ তাপের শরীরকে নিম্ন তাপের পানি দিয়ে শরীরের অতিরিক্ত তাপ শরীর থেকে বের করা। তাই আধুনিক চিকিৎসকরা জ্বর নিবারণের জন্য শরীরে পানি ঢালা, ভেজানো কাপড় দ্বারা শরীর বার বার মোছা অথবা বরফ ব্যাগ (Ice bag), জলপট্টি ও জলধারা ব্যবহার করে জ্বর কমানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই পানি দিয়ে জ্বর সারানোর তাগিদ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ–

অর্থ: হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়। কাজেই তোমরা পানির দ্বারা তা ঠান্ডা করো।[১৭৫]

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتْ اِذَا اُتِيَتْ بِالْمَرْاَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا اَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جَيْبِهَا قَالَتْ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْمُرُنَا اَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ–

অর্থ: ফাতিমা বিনতে মুনযির (রহ.) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর নিকট যখন কোনো জ্বরাক্রান্ত মহিলাকে দুআর জন্য আনা হতো, তিনি পানি হাতে নিয়ে সেই মহিলার জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন এবং বলতেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন পানি দিয়ে জ্বর ঠান্ডা করে দিই।[১৭৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اَلْحُمَّى كِيْرُ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحَّوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ–

অর্থ: জ্বর জাহান্নামের হাপর বিশেষ, সুতরাং শীতল পানি দ্বারা সেটাকে তোমরা তোমাদের থেকে দূরে রাখো।[১৭৭]

জ্বর একটা প্রসিদ্ধ রোগ। সকল দেশের প্রত্যেক এলাকায় এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই এ রোগের শিকার হয়ে থাকে। এ জ্বর যেমন অনেক প্রকার, তেমনি এর কারণ বা উপসর্গও অসংখ্য। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জ্বরের প্রকোপ খুব বেশি দেখা যায়। এখানকার মানুষ প্রচন্ড গরম ও সূর্যোত্তাপে খুবই অস্থির হয়ে পড়ে। যার ফলে জ্বরের উত্তাপের সীমা চরমে পৌঁছে। বর্তমানে এধরনের রোগীকে বরফের সেল দ্বারা ঠান্ডা করা হয়। বর্তমান চিকিৎসকগণ জ্বর নিবারণের জন্য রোগীর মাথায় পানি ঢালা, ভেজা কাপড় দ্বারা রোগীর শরীর মুছে দেয়া অথবা আইসব্যাগ বা জলপট্টি ব্যবহার দ্বারা জ্বরের উত্তাপ নামিয়ে আনার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) দেড় হাজার বছর পূর্বেই ঠান্ডা পানিকে জ্বরের একটি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম হতেওএকাধিক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। প্রখ্যাত হাকীম জালিনুস স্বীয় 'হীলাতুল বার' নামক কিতাবে জ্বরের জন্য

১৭৪. মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী, "স্বাস্থ্য সংরক্ষণে প্রিয়নবী (সা.)-এর নির্দেশনা", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

১৭৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়, খ. ২, পৃ. ১৬২৫, হাদীস নং- ৫৭২৫

১৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬২৪-১৬২৫, হাদীস নং- ৫৭২৪

১৭৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জ্বর জাহান্নামের তাপ, সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল করো, খ. ৪, পৃ. ১০৭, হাদীস নং- ৩৪৭৫

পানিকেই সর্বোত্তম উপকারী বলে বর্ণনা করেছেন। যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ইমাম রাযী (রহ.) তাঁর 'কাবীর' গ্রন্থে জ্বরের জন্য ঠান্ডা পানি ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।[১৭৮]

**রক্তক্ষরণ বন্ধে ছাই ব্যবহার করা**

রক্ত হলো এক প্রকার তরল পদার্থ। এর রং লাল। শরীরের কোনো স্থানে আঘাতের ফলে বা কেটে গেলে সৃষ্ট ক্ষত হতে যে রক্ত বের হয়, তাকে রক্তক্ষরণ বা রক্তপাত বলে। ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করতে মাদুর বা চাটাই জ্বালিয়ে এর ছাই ব্যবহার অতি পরীক্ষিত একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যবহার করেছেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) আহত হলে এবং অবিরল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলে হযরত ফাতিমা (রা.) ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে চাটাই পুড়িয়ে এর ছাই ক্ষত স্থানে লাগাতেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلٰى رَاسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْبَيْضَةُ وَ اُدْمِىَ وَجْهُهُ كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَ كَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِى الْمِجَنِّ وَ جَائَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمِ، فَلَمَّا رَاَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ الدَّمَ يُرِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَ اَلْصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

অর্থ: সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী কারীম (সা.)-এর মাথায় (অহুদের যুদ্ধে) লৌহ শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) চূর্ণ করে দেয়া হলো, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো এবং তাঁর রুবাঈ দাঁত ভেংগে গেলো, তখন হযরত আলী (রা.) ঢাল ভর্তি করে পানি দিতে থাকলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা.) এসে তাঁর চেহারা মোবারক থেকে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগলেন। ফাতিমা (রা.) যখন দেখলেন পানি ঢালার পরেও অধিক পরিমাণ রক্ত ঝরে চলছে, তখন তিনি একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে নবী কারীম (সা.)-এর যখমের উপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেলো।[১৭৯]

যদিও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও চিকিৎসা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজ লভ্য নয় বা কোনো কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বর্তমান প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য রক্তক্ষরণ বন্ধ করার ক্ষেত্রে ছাই ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া খুবই সহজ এবং কোনো টাকাও ব্যয় হয় না।

**মেহেদী পাতার ঔষধি গুণ**

আদি যুগ থেকে মেহেদির সঙ্গে মানুষের পরিচয়। মেহেদী ছোট ঝোপ জাতীয় গাছ, উচ্চতায় ২-৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। শাখা থেকে কাটাযুক্ত উপশাখা বের হয়। ফুল অসংখ্য, ছোট, সাদা বা গোলাপী বর্ণের হয়। ফল ছোট ক্যাপসূল ও গ্লোবুজ। পাতা ডিম্বাকৃতি, বিপরীত, ছোট ও ২০৩ সেন্টি মিটার লম্বা হয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়ই মেহেদির রং-এ রঙিন হতে ভালবাসে। তবে মেয়েরা অধিক হারে মেহেদি ব্যবহার করে থাকে। মেহেদী পাতা পিষে সাধারণতহাত-পায়ে সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিবাহ-শাদী, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে মেহেদী ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।কিন্তু এর পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা অনেক শিক্ষিত লোকেরও জানা নেই। ইউনানী গবেষণানুযায়ী, মেহেদী রক্ত পরিষ্কারকারী এবং চর্ম রোগের জন্য উপকারী। কুষ্ঠরোগী, আগুনে পোড়া এবং পান্ডব রোগের ক্ষেত্রে মেহেদীর ব্যবহার খুব উপকারী। মেহেদীর প্রলেপ ফোলা, ফোস্কা, আগুনে চামড়া পুড়ে যাওয়া রোগীর জন্য খুবই উত্তম প্রতিষেধক। মেহেদীর বৈশিষ্ট্য ঠান্ডা।[১৮০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মেহেদী পাতাকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতেন: (ক) ফোঁড়া পাকানোর জন্য, (খ) শরীরে কাঁটা ইত্যাদি বিঁধলে এবং (গ) মাথা ব্যথার জন্য। হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَلْمٰى اُمِّ رَافِعٍ مَوْلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ كَانَ لَا يُصِيْبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَرْحَةُ وَّ لَا شَوْكَةُ اِلاَّ وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ–

---

১৭৮. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুযযামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

১৭৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তিব্ব, অনুচ্ছেদ: রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়িয়ে ছাই লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৬২৪,হাদীস নং- ৫৭২২

১৮০. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুযযামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আযাদকৃত দাসী সালমা উম্মে রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর যখনই কোনো জখম হতো বা কাঁটা বিঁধতো, তিনি তখনই তাতে মেহেদী লাগাতেন।[১৮১]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا صَدَعَ غَلَفَ رَأْسَه بِالْحِنَاءِ وَ يَقُوْلُ اِنَّهُ نَافِعٌ بِاِذْنِ اللّٰهِ مِنَ الصَّدَعِ–

অর্থ: যখন নবী কারীম (সা.)-এর মাথা ব্যথা দেখা দিতো তখনই তিনি মাথায় মেহেদী লাগাতেন আর বলতেন, আল্লাহর হুকুমে এটা মাথা ব্যথার শিফাদানকারী।[১৮২]

ডাক্তারী মতেও মেহেদী মানব জীবনে অনেক রোগের ক্ষেত্রে উপকারে আসে। এই পাতার ঔষধি গুণ অসংখ্য। নিম্নে রোগভিত্তিক মেহেদী গুণাবলী সংক্ষেপে উপস্থঅপন করা হলো-

**০১. পায়ের জ্বালাপোড়া কমায়:** মেহেদী পাতা ভিনেগারে ভিজিয়ে এক জোড়া মোজার ভেতরে রেখে অত:পর এই মোজাটি সারা রাত পায়ে পরিধান করলে পায়ের জ্বালাপোড়া অনেকখানি কমে যাবে।

**০২. টাক পড়া কমায়:** কয়েকটি মেহেদী পাতা সরিষার তেলে জ্বাল দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর মাথার তালুতে ব্যবহার করলে টাক পড়া প্রতিরোধ করবে।

**০৩. মাথাব্যথা নিরাময়:** মেহেদী অথবা এ গাছের ফুল মাথাব্যথা দূর করতে সাহায্য করে। মেহেদী বা এর ফুল পেস্ট করে ভিনেগার মিশিয়ে কপালে অথবা ব্যথার স্থানে লাগালে মাথাব্যথা নিরাময় হয়।

**০৪. চুলকানি ও ঘা শুকায়:** মেহেদীর পেস্ট পিঠ, ঘাড় এবং ঘামাচি আক্রান্ত অন্যান্য স্থানে লাগালে ঘামাচির চুলকানি এবং জ্বালাপোড়া হ্রাস করতে সাহায্য করে। মেহেদী দিয়ে মাউথ ওয়াশওতৈরি করা যায়। মেহেদী পাতা গুঁড়ো পানিতে গুলিয়ে কুলকুচি করলে মুখের ঘা দ্রুত ভালো করে এবং মুখ জীবাণুমুক্ত হয়।

**০৫. খুশকি দূর করে:** খুশকি দূর করতে মেহেদী বেশ কার্যকরী। সরিষা তেল, মেথি ও সেদ্ধ মেহেদী পাতা একসঙ্গে যোগ করে এক ঘণ্টা চুলে ব্যবহার করে শ্যাম্পু করে নিলে খুশকি দূর করে চুলকে ঝলমলে সুন্দর করে তোলে।

**০৬. ক্ষত সারায়:** পুরনো ক্ষত যেগুলো বার বার ফিরে আসে, এসব ক্ষত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে মেহেদী। মেহেদীপাতা বেটে এরকম ক্ষতে লাগিয়ে রাখলেব্রু ভালো হয়ে যায়।

**০৭. পানি পচা রোগ নিরাময়:** সাধারণত নোংরা ও জীবাণুযুক্ত পানি লেগে থাকলে এই ধরনের রোগ হয়। আবার দীর্ঘক্ষণ পানিতে কাজ করলেও এ রোগ হতে পারে। এতে দুই আঙ্গুলের মাঝের অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষতে মেহেদীর প্রলেপ লাগিয়ে রাখলে ঘা ভালো হয়ে যায়।

**০৮. বয়সের ছাপ দূরীকরণ:** বয়সের ছাপ (বলিরেখা) দূর করতেও মেহেদীর তুলনা নেই। মুখের ত্বকে মেহেদী ব্যবহারের নিময়টি পুরো আলাদা। প্রতিদিনের ফেসপ্যাকে কয়েক ফোটা মেহেদি পাতার রস ১০ মিনিট সময় মিশিয়ে রেখে নিয়মিত ব্যবহারে বলিরেখা হবে বিলম্বিত।

**০৯. পা ফাটা রোধ:** সাধারণত শীতকালে খুব বেশি পরিমাণেল পা ফাটে। তবে কারো কারো বার মাসই পা ফাটার সমস্যা থাকে। এছাড়া চামড়া ওঠার সমস্যাও থাকে অনেকের।তাই মেহেদি পাতা বেটে ফাটা জায়গায় পুরু প্রলেপ দিয়ে আধা ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে পা ফাটা প্রতিরোধ হবে।

**১০. ঘুমের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ:** যে কোন ধরনের ঘুমের সমস্যা যেমন- ইনসোমনিয়া দূর করতে এই পাতা যথেষ্ট উপকারী। প্রতিদিন নিয়ম করে মেহেদী পাতার রস খেলে ঘুমের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

**১১. নখের যত্ন:** নখ মজবুত ও আকর্ষণীয় করতে মেহেদীর জুড়ি নেই। পানিতে কয়েকটি মেহেদী পাতা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পানি হালকা লাল হয়ে আসলে ওই পানি পান করা। এতে নখ মজবুত ও আকর্ষণীয় হয়।

---

১৮১. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মেহেদী খ. ৪, পৃ. ১১৭, হাদীস নং- ৩৫০২

১৮২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুফলিহ, *আল-আদাবুল শারঈয়্যাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬,খ. ২, পৃ. ২৮২

**১২. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ:** মেহেদী পাতা হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। মেহেদীর রস বা বীজ নিয়মিত খেলে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ও রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। এটি ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে হার্ট অ্যাটাক ও স্টোকের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

**লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেয়া**

প্রাচীন যুগে লোহা গরম করে দাগ দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করা হতো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেও এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হতো। এখনও কোনো কোনো এলাকায় এ প্রথা প্রচলিত আছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) লোহা গরম করেচিকিৎসা করাকে কয়েকটি কল্যাণ্যকর চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একটি বললেও পাশাপশি এই পদ্ধতি যে তাঁর নিকট পছন্দীয় নয় তাও উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ فَفِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، اَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، اَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَ مَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىْ–

অর্থ: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি: তোমাদের ঔষধসমূহের মধ্যে কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে, তাহলে তা রয়েছে শিংগাদানের মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়াকে পছন্দ করি না।[১৮৩]

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِّنْ رَّمْيَتِهِ–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) সাদ ইবন মুআয (রা.)-কে তাঁর কোন জখমের স্থানে লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন।[১৮৪]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবাই ইবন কাব (রা.)-এর নিকট একজন চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার একটি ধমনী কেটে দিল। অত:পর লোহা পুড়িয়ে (রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য) তাতে দাগ দিয়ে দিল।[১৮৫]

অপর এক সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার এক আনসারীর মারাত্মক অসুখ হলে তাকে দাগ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমেত উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় অনুমতি চাওয়া হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে তিন বার অনুমতি চাওার পর বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে পাথর দিয়ে দাগ লাগিয়ে দাও।[১৮৬]

মূলত গরম লোহার দ্বারা দাগ লাগালে একে তো রোগীর চরম কষ্ট ও ব্যথা অনুভব হয়, এছাড়া এভাবে দাগ লাগানোর কারণে অনেক সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতিও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আর এজন্যই হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা.) এটাকে সমর্থন করেননি। তবে এ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা যেহেতু হাদীসে এসেছে, তাই নিশ্চয় কোনো না কোনো সময় গবেষণার মাধ্যমে এভাবেও যুগোযুগী ফলপ্রসু চিকিৎসার দ্বার উন্মোচন হবে বলা যায়। বর্তমানে ল্যাপারোস্কপি বা লেজার পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদান করা অনেকটা ঐ পদ্ধতিরই একটি আধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে।

১৮৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধুর সাহায্যে চিকিৎসা করা, খ. ২, পৃ. ১৬১৬, হাদীস নং- ৫৬৮৩

১৮৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং- ৩৮৭০

১৮৫. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাম, অনুচ্ছেদ: প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫৭৩৯

১৮৬ . মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

**ব্যথা নিরাময়ে দুম্বার নিতম্বের গোশত খাওয়া**

গৃদ্রশী বা সাইটিকা মূলত একটি অতিশয় জটিল রোগ। এটা যে শুধু মহিলাদের হয়ে থাকে এমন নয়; বরং এ কঠিন ব্যথা পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেরই হতে পারে। আরবী ও ইউনানী ভাষায় এ রোগকে 'ইরকুননিসা' (عِرْقُ النِّسَاءِ) বলে এবং ইংরেজিতে এটাকে সিয়াটিক পেইন (sciatic pain) বলে। যা মেরুদণ্ডের হাড্ডি হতে আরম্ভ করে রগের মধ্য দিয়ে পায়ের গিট পর্যন্ত নিম্নভাগে অসহনীয় পর্যায়ে ব্যথা সঞ্চারিত হতে থাকে। যা সাধারণত দুর্বলতা, বার্ধক্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুষ্কতার কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। আর দুম্বার চাক্কি বা নিতম্ব যে এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, তা হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট।[১৮৭] হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِفَاءُ عِرْقِ النِّسَاءِ اَلْيَهُ شَاةٍ عَرَبِيَةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجْزَاُ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَتُشْرَبُ فِىْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ–

অর্থ: হযরত আনাস ইবন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, দুম্বারনিতম্বের গোশতের মধ্যে ব্যথা নাশক ঔষধ রয়েছে। এটাকে দ্রবণ করে তিনভাগ করবে এবং তিন দিন সেবন করবে।[১৮৮]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ شِفَاءُ عِرْقَ النَّسَا اَلْيَةُ شَاةٍ اَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ، ثُمَّ تُجَزَّءُ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيْقِ، فِىْ كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: গেঁটে বাতের চিকিৎসা হলো, দুম্বার নিতম্ব গলিয়ে তিন ভাগ করে নেবে, অত:পর প্রতিদিন বাসি মুখে এক ভাগ পান করবে।[১৮৯]

এ সম্পর্কে মুসতাদরাকে হাকেম নামক কিতাবে ৩টি রেওয়ায়েত উল্লেখ করে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, চাক্কি বা নিতম্ব অতি বড় বা ছোট না হওয়া চাই। এ ঔষধ মুখের লালাসহ সেব্য অর্থাৎ পানি ইত্যাদির সাথে সেবন করবে না।[১৯০]

**জমাট শিশির চোখের জন্য শেফা**

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ–

অর্থ: সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি: ছত্রাক এক জাতীয় শিশির থেকে হয়ে থাকে। আর এর রস চোখের জন্য শেফা।[১৯১]

**চারটি উপকারী রোগ**

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, চারটি বস্তুকে চারটি কারণে ক্ষতিকর মনে করবে না।

(১) চোখ ওঠাকে ক্ষতিকর মনে করো না, কেননা তা অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করে।

(২) কফ-সর্দিকে খারাপ মনে করবে না, কেননা এটা কুষ্ঠরোগের মূলোৎপাটন করে।

(৩) কাশিকে অকল্যাণকর ভেবো না। কেননা তা সর্ব বিকলাঙ্গতার শিকড় কেটে দেয়।

(৪) দম্বল (এক ধরনের ফোঁড়া)-কে খারাপ মনে করো না। কেননা তা শ্বেত ও কুষ্ঠরোগের উৎপত্তিতে বাঁধা দেয়।

ব্যাখ্যা-

(১) চোখ ওঠার কারণে রক্ত বর্ণ ধারণ করে। চোখ থেকে অনবরত কেতর ও পানি ঝরতে থাকে। ফলে খুবই কষ্ট ও যন্ত্রণাবোধ হয়। এতে চোখ থেকে এমন সব ক্ষতিকর দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায় যা চোখের মনি বা পুতলির সিক্ততা ও

---

১৮৭ . হাকীম এম.এ. কামাল পাটোয়ারী, *রোগ ও উদ্ভিদতত্ত্ব*, গাজীপুর: স্টেশনরোড, ক্যামরুজ পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ১৯৯২ (প্রথম প্রকাশ),পৃ. ২৪৭

১৮৮ . *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং- ৭৫৩৬

১৮৯. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: গেঁটে বাতের চিকিৎসা , খ. ৪, পৃ. ১০১-১০২, হাদীস নং- ৩৪৬৩

১৯০. *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, খ. ৪, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং- ৭৫৩৭

১৯১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: জমাট শিশির চোখের জন্য শেফা, খ. ২, পৃ. ১৬২১, হাদীস নং- ৫৭০৮

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক। চোখ ওঠার কারণে চোখের দূষিত পদার্থ নির্গত হওয়ায় চোখ স্থায়ীভাবে বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে মুক্ত থাকে।[১৯২]

(২) চিকিৎসা বিজ্ঞানে কুষ্ঠ ব্যাধিকে এক প্রকার কফ বা শ্লেষ্মাজনিত রোগ মনে করা হয়। শ্লেষ্মা এবং সওদা একত্রে মিলিতভাবে কুষ্ঠরোগের সৃষ্টি করে। সর্দির কারণে কফ বের হয়ে যায়।কারণ সর্দি হলে নাক দিয়ে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা ঝরতে থাকে। এতে নাসিকার ভেতর থেকে সর্বপ্রকার ধূলা-বালি ও জীবাণু বের হয়ে যায় এবং বিভিন্ন প্রকার ধ্বংসাত্মক জীবাণু ও ময়লা যা স্বাভাবিকভাবে নির্গত হয় না, তা নাক ঝাড়ার কারণে বের হয়ে যায়। সুতরাং সর্দি মানুষের জন্য খুবই উপকারী। ড. কিউরের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা মতে, কুষ্ঠ রোগের জীবাণু নাসিকার পথে শরীরে প্রবেশ করে এবং নাসিকাই হলো এই মারাত্মক জীবাণুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এ কারণেই সর্দিকে কুষ্ঠরোগের রক্ষাকবজ মনে করা হয়।

(৩) কাশি হওয়াও কোনো খারাপ লক্ষণ নয়। তা বিকালঙ্গতা থেকে রক্ষা করে। বিকালঙ্গতা মূলত মস্তিষ্ক প্রসূত স্নায়ুবিক রোগ। বর্তমান যুগে এই রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক চাপের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে।উচ্চ রক্তচাপ তথা হাই ব্লাড প্রেসার এই রোগের বিশেষ কারণ। কাশির কারণে ফুসফুসে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করে। ফলে ফুসফুসে আগত রক্ত ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। ঐ রক্তেরই একটা বিশেষ অংশ বা উপাদান (যা কিছুকাল পরে রক্তকে গাঢ় করে বিভিন্ন রোগের উদ্ভব ঘটায় সেটা) পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে মানুষ অঙ্গহীনতা বা বিকলাঙ্গতা থেকে পরিত্রাণ পায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এই রোগের বিভিন্ন কারণ ও বিভিন্ন প্রকার আছে। তন্মধ্যে একটি সামগ্রিক কারণ হলো কফ। যখন মস্তিষ্ক প্রসূত শ্লেষ্মা অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন বস্তুর প্রয়োজন দেখা দেয়, যদ্বারা কফ বের হতে পারে। কফ বের হওয়ার প্রধান মাধ্যম কাশি। এ কাশির ফলে কফ জনিত অতিরিক্ত আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

(৪) দম্বল মূলত কফ জনিত ফোঁড়া। এই ফোঁড়ার মাধ্যমে পুঁজ ও পানি নির্গত হয়। ফলে মস্তিষ্কের কফ জনিত আর্দ্রতা স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর এইকফ জনিত অস্বাভাবিক আর্দ্রতাই শ্বেত-কুষ্ঠের প্রধান কারণ। অনেক ফিজিওলজিষ্ট বলেন, রক্তে মেলানিন এর ঘাটতিই শ্বেত-কুষ্টের প্রধান কারণ। আর মিলানিন ঘাটতির কারণ হল, রক্তে (বি.ডব্লিউ. সি.)-এর আধিক্য এবং বি.ডব্লিউ. সি. মূলত কফ। আলোচ্য ফোঁড়ার কারণে রক্তপুঁজ হিসেবে প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ নির্গত হয়। ফলে দম্বল তথা কফজনিত ফোঁড়ার রোগী শ্বেত-কুষ্ঠ থেকে মুক্ত থাকে।

১৯২. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪

# দশম অধ্যায়

## স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পানাহার সংক্রান্ত হাদীসের দিকনির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ


| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | খাদ্য গ্রহণের দিকনির্দেশনা |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | পানীয় গ্রহণের দিকনির্দেশনা |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় খাদ্য তালিকা ও খাবারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | : | শরীর সুস্থ রাখতে দৈনন্দিন খাবারের খাদ্য ও পুষ্টি তালিকা |

## প্রথম পরিচ্ছেদ: খাদ্য গ্রহণের দিকনির্দেশনা

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের অসংখ্য জাতির খাদ্য সামগ্রী ও খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি ভিন্ন হলেওপ্রত্যেকে তার শরীরের চাহিদানুযায়ী খাবার গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তার এই খাদ্য সামগ্রী ও খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত তা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়।কেউ যদি নিজের ইচ্ছা মতো কোনো নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে আহার কার্যক্রম চালিয়ে যায়, তাহলে এই খাবারই যে একদিন তার জন্য অসুস্থতা এবং এক পর্যায়ে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে তা নিশ্চিত বলা যায়। পক্ষান্তরে মানবতার দিশারী রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত খাদ্য সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহ যথা: মানুষ কখন খাবে, কোন নিয়মে খাবে, কতটুকু খাবে, খাওয়ার পূর্বে ও পরে কী করণীয়, বসার পদ্ধতি কেমন হবে এবং খাওয়ার পূর্বে ও পরে কোন দুআ পাঠ করবেইত্যাদি বিষয় যথাযথ অনুসরণপূর্বক কেউ যদি খাবার গ্রহণ করে তাহলে নি:সন্দেহে তা শরীরের জন্য উপকার বয়ে আনবে। এই পুরো বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস খুব সংক্ষেপে বলেন- খাবারই হওয়া উচিত আমাদের ওষুধ, ওষুধই হওয়া উচিত আমাদের খাবার।[১]

উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত খাদ্য সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে তা অনেক দীর্ঘ হবে বিধায়অত্র অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র সে সকল বিষয় নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কিছুটা হলেও সম্পৃক্ততা রয়েছে।

### খাদ্য গ্রহণের মৌলিক নির্দেশনাবলী

যারা স্বভাবগত কর্মবিমুখ ও আরাম প্রিয় এমন মানুষের জন্য অধিক খাদ্য ভক্ষণ করা খুবই বিপদজনক। তাদেরইচ্ছামতো খাবার গ্রহণ করাএবং সারাদিনে তিনবারের অধিক খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। নানারকম গুরুপাক খাদ্য ভক্ষণ না করেক্ষুধা নিবারনের জন্য যতটুকু খাওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই খেতে হবে। প্রয়োজনের অধিক কোনোক্রমেই খাওয়া যাবে না। কর্মবিমুখ লোক পরিশ্রম না করার কারণে খাদ্যদ্রব্য সহজে হজম না হওয়ায় উদর পূর্ণ থাকে। এতে কাজ-কর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং ভরা পেটে কেউই নিজের পূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে পারে না। তাইএমন লোক প্রত্যহ কিছুটা ব্যায়াম করলে দেহের দুর্বলতা, মন্দাভাব, ক্ষয়, পরিপাক, শারীরিক ও মানসিক সব রকমের জড়তা থেকে পরিত্রাণ পায় এবং মানসিক ও শারীরিকশক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাংযারা সচরাচর কায়িক পরিশ্রম করে না অন্যদের চেয়ে তাদের তুলনামূলককম খাওয়া এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত।

পক্ষান্তরে যেসব লোক দৈনন্দিন কাজে সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে ততটা সচেতন হওয়া জরুরী নয়। বরং কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলেই তারা সুস্থ ও সবল থাকতে পারবে। তবে উত্তেজনা মুহূর্তে, কর্ম ব্যস্ততায় এবং কঠোর পরিশ্রম ওব্যায়াম করার পর পরই খাদ্য গ্রহণ করা ঠিক নয়, এতে দেহের অনেক ক্ষতি হয়। কেননা শরীরের উত্তাপ এবং ক্লান্তিময় অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পরিপাকযন্ত্র ও মস্তিষ্ক ইত্যাদির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং পরিপাকের দুর্বলতা দেখা দেয়। ঐ মুহূর্তে শরীরের আকর্ষণ ভিন্ন দিকে থাকায় অস্থি ও জোড়াসমূহ ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। তদ্রূপ খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথেই শরীর চর্চা বা কঠিন কাজ করাও নিষেধ। কেননা এতে শরীরের কর্ম তৎপরতা ও শক্তিসমূহ দু'দিকে ব্যস্ত হয়ে যায়। ফলে পাকস্থলী পরিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। অতএব স্বাস্থ্যসম্মত বিধান হলো, শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতাঅবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করা। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেন, ধীরস্থিরভাবে ও প্রশান্তিতে খাদ্য গ্রহণকরলে পরিপাক ও দেহ গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হয়। আর ক্লান্ত-শ্রান্ত ও শোক তাপের মধ্যে খাদ্য ভক্ষণ করলে দেহের বৃদ্ধি সাধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বসম্মত বিধান হলো, আমরা যে জিনিসই খাই না কেন বেশি গরম বা ঠান্ডা না হয়ে দেহের তাপমাত্রা অনুযায়ী অর্থাৎ মাঝামাঝি ধরনের হওয়া উচিত।তাই ধোঁয়া উঠা গরম বা বরফ জাতীয় কোন ঠান্ডা বস্তু যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কারণ এগুলো জিহ্বা, ঠোঁট, দাঁত, মাড়ি এবং পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর। হিমায়িত পানি, বরফ এবং অধিক ঠান্ডা জাতীয় জিনিস পাকস্থলীকে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া খাদ্য গ্রহণের সময় পানি বা অন্য কোন

---

১. ডা. সজল আশফাক, *https://www.bd-pratidin.com/health.* "খাবার রোজা, অটোফেজি এবং শরীরের প্রাকৃতিক শুদ্ধতা",২৮.০৫.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

তরল দ্রব্য গ্রহণ করলেও পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয় এবং পাকস্থলীতে অধিক সিক্ততার কারণে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না। সুতরাং খাদ্য গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে পিপাসা না লাগলে এমন জিনিস ভক্ষণ না করাই শ্রেয়।

অনেক সময় ভাত, তরকারী ও শাক-সবজি সাধারণভাবে রান্না না করে ঘি ও অধিক মসলা দিয়ে ভুনা করার কারণে তা কঠিন ও ভারী পাচ্য হিসেবে গণ্য হয়। কড়া মিষ্টি, জর্দা, পোলাও, ঘিয়ে ভাজা যাবতীয় দ্রব্য, তৈল জাতীয় দ্রব্য সবই হজমশক্তিকে ক্ষীণ ও দুর্বল করে দেয়। এমনিভাবে কেক, পেষ্ট্রি, চকলেট ইত্যাদিও ক্ষতিকারক। অধিক লবণ, চিনি, মসলা, আচার, চাটনি, মোরব্বা ইত্যাদি পরিপাক ক্রিয়াকে সহায়ক করার পরিবর্তে এর ক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়। তাই খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শারীরিক চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে খাদ্য গ্রহণের সময় ও নিয়মের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। এসব নির্দেশনা পুরোপুরি মেনে চললে সহজেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি নিরোগ থাকা সম্ভব, যা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

**সহজ ও সাধারণ খাবার গ্রহণ করা**

বর্তমানে সারাবিশ্বে rich food বা অধিক ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের প্রতিযোগিতা চলছে। নানা ধরনের পোলাও, কোর্মা, বিরিয়ানি, হালুয়া, গ্রিল, ফ্রাই, বার্গার, কাবাব ইত্যাদি ছাড়া যেন কোনো পার্টি জমেই না। প্রচুর তেল, ঘি, মশলা, শর্করা এবং আমিষযুক্ত এই ধরনের খাবার খেতে সুস্বাদু হলেও মোটেই তা স্বাস্থ্যকর নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি সবসময় তুলনামূলক সহজ ও সাধারণ খাবার গ্রহণ করতেন। তিনি যে দু'জাহানের বাদশা হয়েও খুব সাধারণ জীবন-যাপন করতেন, তা সকলেই অবগত। হযরত আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে দু'দিন কখনো যবের রুটি দ্বারা পেট ভরে আহার করেননি।[২]এমতাবস্থায়ও তাঁরদস্তরখানায় কোনো সময় একাধিক খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি তুলনামূলক সহজ খাবারই গ্রহণ করেছেন। এতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিরাট দর্শন নিহিত রয়েছে। কারণ সহজ ও সাধারণ খাবার যেমন হজমযোগ্য তেমনি তা সহজপাচ্যও। এতে করে পেটসহ পুরো শরীর হাজারো রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে উপস্থাপিত খাবারের মধ্যে তিনি সহজ ও সাধারণখাবারই অধিক তিনি পছন্দ করতেন। হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَاَلَ اَهْلَهُ الْاُدْمَ فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا اِلاَّ خَلٌّ فَدعَا بِه فَجَعَلَ يَاْكُلُ بِهِ وَ يَقُوْلُ نِعْمَ الْاُدْمُ الْخَلُّ نِعْمَ الْاُدْمُ الْخَلُّ–

অর্থ: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী কারীম (সা.) আহলে বাইত তথা ঘরওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কি কোনো সালুন বা তরকারী আছে? ঘরের লোকেরা বললেন, ঘরে সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নেই। তিনি তা চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে খাওয়া শুরু করলেন এবং খেতে খেতে বললেন: সিরকা কতই না ভালো তরকারী, সিরকা কতই না উত্তম তরকারী।[৩]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তিনি সর্বোত্তম মানুষ হয়েও কেমন সহজ সরল ছিলেন, ঘরে যা কিছু উপস্থিত থাকতো কোনো লৌকিকতা না করে তা দিয়েই আহার করে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের মধ্যে কতই না অল্পে তুষ্টি, ধৈর্য ও শুকরিয়া ছিলো যে খাওয়ার সময় ভালো-মন্দ যা কিছু মিলত তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। পক্ষান্তরে আমাদের খাবার টেবিলে কোনো কারণে একদিন বা এক বেলা মনের মতো খাবার পরিবেশন করা না হলে হৈচৈ শুরু করে দেই। অথচ আমরা সহজ ও সাধারণ খাবার বাদ দিয়ে দিনের পর দিনrich food বা অধিক ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার কারণে মোটিয়ে যাওয়াসহ শরীরে কোলেস্টোরাল জমা হয়ে বিভিন্ন অসুখে ভুগছি।

২.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রুটির বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৪২, হাদীস নং- ১৪৩

৩. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*,পাকিস্তান: করাচি, বুশরা পাবলিশার্স: ২০০৯, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: সিরকার ফযীলত এবং তা সালুন হিসেবে ব্যবহার করা, খ. ৬, পৃ. ১৬১, হাদীস নং- ৫৩৪৭

**নির্ধারিত সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা**

একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত সময়সূচি থাকা উচিত। কেননা স্বাস্থ্য রক্ষায় সময় অনুযায়ীখাদ্য গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।অধিকাংশ মানুষ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখে না। অথচ প্রকৃত ক্ষুধার সময় রুটিনমাফিক খাদ্য গ্রহণ করলে উক্ত খাদ্যদ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক হয়ে শরীরের ক্ষয় পূরণ, রক্ত ও গোশতের বৃদ্ধি সাধন করে সুঠাম দেহ গঠন করে। পক্ষান্তরে অনিয়মিত ও অনির্ধারিত সময়ে খাদ্য গ্রহণ করলে তা পুরোপুরি পরিপাক ও শরীর গঠনে সহায়ক না হয়ে ভালো খাবারও উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, হজমশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে স্বাস্থ্যহানি ঘটায় এবং শরীরে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে দেহকে বিষিয়ে তুলে। তাই অনির্ধারিত সময়ে খাদ্য গ্রহণ সুস্বাস্থ্যের মাধ্যম না হয়ে অবনতির কারণ হয়। সুতরাংসুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও রোগ-শোক থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে খাদ্যগ্রহণের অন্যান্য নিয়মাবলীর পাশাপাশি সময়সূচির প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত এবংনির্ধারিত সময়ে খাদ্য গ্রহণ করার পর যতই সুস্বাদু, রুচিশীল ও শক্তিবর্ধক খাবার সামনে আসুক না কেন তা পরিত্যাগ করা উচিত।

সকালের নাশতা দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার। কেননা সকাল বেলাতেই আমাদের বিপাকক্রিয়া শুরু হয় এবং হরমোনের মাত্রাও এ সময় বেশি থাকে। তাই সকালের নাশতার আদর্শ সময় শুরু হয় ৭টা থেকে এবং ভালো হয় যদি ৯টার মধ্যে সেরে ফেলা যায়,তবে ১০টার বেশি যেন কখনোই না হয়। দুপুরে খাওয়ার সঠিক সময় হলো সাড়ে ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত, তবে বিকেল ৪টার মধ্যে অবশ্যই দুপুরের খাবার শেষ করা উচিত। এমনিভাবে রাতের খাবার ৭টার মধ্যে সেড়ে ফেলা উচিত এবং রাত ১০টার আগেই রাতের খাবার শেষ করা চাই। দেরি করে রাতের খাবার গ্রহণের সঙ্গে শরীরের ওযন বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। কোনো কারণে এই সময়ের মধ্যে সম্ভব না হলে অন্তত ঘুমানোর তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার গ্রহণ করা উচিত। খাওয়ার সময়সূচির ব্যাপারে হাদীসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসবই বর্ণনা রয়েছে।[৪]

**রাতের খাবার এশার পূর্বে খাওয়া**

রাতে সমস্ত শরীরের সাথে পাকস্থলীও বিশ্রাম গ্রহণ করতে চায়। তাই রাতে শয়ন করার পূর্ব মুহূর্তে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঘুমানোর পূর্ব মুহূর্তে খাবার খেলে পাকস্থলী বিশ্রামের কোনো সুযোগ না পেয়ে বিরামহীন কর্মরত থাকায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, যেকোনো মূল্যে পাকস্থলীকে রাতে কমপক্ষে ৫/৬ ঘন্টা পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। তাই শারীরিক সুস্থতা লাভে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে রাতের খাবার এশার পূর্বেই খাওয়া হতো। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ فِىْ زَمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ اِلٰى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ يَبْدَاُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ–

অর্থ: উবায়দ ইবন উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.)-এর সময় আমার পিতার সাথে আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আব্বাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) বলেন: আমরা শুনেছি রাতের খাবার এশার সালাতের পূর্বেই খাওয়া হতো।[৫]

বর্তমানে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে রাত্রের খাবার দেরি করে খাওয়াটা যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে এবং এশার পূর্বেই রাত্রের খাবার গ্রহণ করা তা অনেকটাই কল্পনার বাইরে। তাইযারা সন্ধ্যার পরপরই এবং এশার পূর্বে রাতের খাবার সেরে নেয় তাদেরকে আমরা গ্রাম্য বা সেকেলে মনে করি এবং যারা যত বেশি দেরি করে রাতের খাবার গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা এ্যালিট শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করি। অথচ রাত্রের খাবার দেরি করে খাওয়াকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিন্দুমাত্র সমর্থন করে না। কারণ রাতের খাবার দেরি করে খেলে খাদ্যদ্রব্য পূর্ণরূপে পরিপাক হয় না,আরামে নিদ্রা আসে না, অনিচ্ছায় অদ্ভূত স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা থাকে এবং সকালে শরীর সতেজ ও সবল হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল ও ক্লান্ত অনুভূত হয়। এক পর্যায়ে শরীর বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ ঘুমানোর পূর্বে সামান্য দুধ পান করতেও

৪. শাশ্বতী মাথিন, *https://www.ntvbd.com/health.*"খাবার খাওয়ার সঠিক সময় কোনটি"? ০৫.১১.২০১৫ (থেকে উদ্ধৃত)

৫. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ, ২০০৪, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: ঈশার সালাত ও রাতের খাবার একত্রিত হলে, খ. ২, পৃ. ১৭২, হাদীস নং- ৩৭৫৯

নিষেধ করে থাকেন। বিশেষ করে যেসব আরাম প্রিয় লোক বেশি পরিশ্রম করে না তাদের রাতের খাবার বিলম্বে খাওয়া অথবা শয়নের পূর্বে খাওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিম্নে রাতে দেরি করে খাওয়ার কয়েকটি ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হলো:

**(ক) ওযন বৃদ্ধি:** রাতে শরীরের বিপাক দিনের তুলনায় ধীর ও দুর্বল থাকে, ফলে দেরি করে খেলে রাতের খাবার হজম হতে অসুবিধা হয় এবং অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালোরি বার্ন না হওয়ায় ওযন বেড়ে যায়।

**(খ) রক্তচাপ বৃদ্ধি:** বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতে দেরি করে খাওয়ার অভ্যাস রক্তচাপের পাশাপাশি রক্তে সুগারের মাত্রাও বাড়ায়, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ।

**(গ) খিটখিটে স্বভাব:** দেরি করে খাবার খাওয়া মানে রাতে ঘুমের রুটিন সঠিকভাবে না মেনে দেরিতে ঘুমানো। হাদীস ও বিজ্ঞানের ভাষ্য মতে, পর্যাপ্ত মাত্রায় না ঘুমালে মানসিক ও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে এবং মস্তিষ্ক পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পওয়ায় খিটখিটে স্বভাব দেখা দিতে পারে।

**(ঘ) স্ট্রোকের ঝুঁকি:** রাতে দেরিতে খেলে মানসিক চাপের কারণে হরমোন বাড়ে। এতে রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। এটি হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন রোগ তৈরি করে ও পাশাপাশি স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

**(ঙ) ক্ষতিকর চর্বি বৃদ্ধি:** যারা রাতে দেরি করে খায় তাদের শরীরে ইনসুলিন ও লেপটিনের কার্যক্ষমতা কমে গিয়ে ক্ষতিকর চর্বি বাড়ে। এতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়।

**(চ) শরীরের লাবণ্য নষ্ট:** রাতে দেরি করে খেলে বৃদ্ধিজনিত হরমোনের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এতে বিপাকের বিঘ্ন ঘটে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয়।

**(ছ) ক্যানসারের ঝুঁকি:** রাতে দেরি করে খেলে ফ্রি রেডিক্যাল বেড়ে গিয়ে কোষের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়। এছাড়া এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

**(জ) ক্লান্ত অনুভব:** রাতে দেরি করে খেলে শরীরের মাইট্রোকন্ড্রিয়ায় এটিপি (ATP) তৈরির ক্ষমতা কমে যায়। এতে শরীর সবসময় ক্লান্তি অনুভব হয়।

**(ঞ) ডায়াবেটিসের ঝুঁকি:** রাতে দেরি করে খেলে রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।[৬]

**অল্প হলেও রাত্রে খাবার গ্রহণ করা**

আমাদের শরীরের হজম বিপাকক্রিয়া, রুচি ও খিদে ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের কাজে নানা রকমের হরমোন ও রাসায়নিক উপাদান ব্যস্ত থাকে। এসব রাসায়নিক নি:সরণের একটা ছন্দ আছে, যা দিন-রাতের সময়সূচি মেনে চলে। একই নিয়ম মেনে চলে পরিপাকতন্ত্রের নানা অম্ল বা অ্যাসিড, রাসায়নিক উপাদান এবং এনজাইম। বিশৃঙ্খল খাদ্যাভ্যাস এই সুসংহত ও সুশৃঙ্খল ছন্দকে ব্যাহত করে। অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস ওযন বৃদ্ধি, টাইপ-টু ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। আবার সময়মতো না খেলেও নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকই পাচক রস ও অম্ল ইত্যাদি নি:সৃত হয়। এতে বদহজম ও অ্যাসিডিটি হয়। কিন্তু আজকাল অনেকেই ডায়েট কন্ট্রোল বা ওযন কমানোর জন্য কিংবা সারাদিনের ক্লান্তি থেকে ক্ষুধামন্দার কারণে রাতের খাবার গ্রহণ করে না। অনেকে আবার বদ হজম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যও রাত্রে খায় না। বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে বা অন্য কোনো কারণে এমনটা যদি কালেভদ্রে হয় সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু এটা নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত করা কখনই ঠিক নয়। তাই রাত্রের খাবার যৎসামন্য হলেও খাওয়া উচিত। হাদীসে এসেছে – وَ كَانَ يَاْمُرُ بِالْعَشَاءِ وَ لَوْ بِكَفٍّ مِّنْ تَمْرَةٍ وَ يَقُوْلُ تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) রাত্রে খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিতেন, যদিও তা এক মুষ্টি খেজুর দিয়ে হোক না কেন এবং তিনি বলতেন রাত্রের খানা ত্যাগ করা তড়িৎ বার্ধক্য আনে।[৭] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَدْعُوا الْعِشَاءَ وَ لَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمرٍ فَاِنَّ تَرَكَهُ يُهْرِمُ–

৬. ডা. শাকিল মাহমুদ, *https://www.ntvbd.com/health.*“রাতের খাবার দেরিতে খেলে কী হয়”? ২১.০২.২০১৭ (থেকে উদ্ধৃত)

৭. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, লেবানন: বৈরুত,মাকতাবাতু আল-মানারুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ.২২৩; *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্য, অনুচ্ছেদ: রাত্রের আহারের ফযীলত, খ. ২, পৃ. ২১, হাদীস নং- ১৮৫৬

অর্থ: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: রাতের আহার পরিত্যাগ করবে না, যদিও তা এক মুঠ খেজুরও হয় (সামান্য আহারই হোক না কেন)। কারণ রাতের আহার ত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।[৮]

রাত্রে না খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুললে মানব দেহে যে সকলসমস্যা দেখা দিতে পারে-

**(ক) পুষ্টির অভাব:** রাতের খাবার বাদ দিলে শরীরে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। বিশেষত, 'মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট'-এর অভাব হয়। শরীরের প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোর মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং ভিটামিন ডি থ্রি অন্যতম, যার সবগুলোই শরীরের স্বাভাবিক কার্যাবলী বজায় রাখার জন্য জরুরি। সুতরাং কেউ রাতে না খেয়ে থাকার অভ্যাস গড়ে তুললে সে এসকল পুষ্টিগুলোর অভাবে ভুগবে।

**(খ) বিপাকক্রিয়ার ক্ষতি:** নিয়মিত রাতের খাবার বাদ দিয়ে কিংবা বেখেয়ালী খাদ্যাভ্যাস গড়লে বিপাকীয় প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শরীরের ইনসুলিনের মাত্রায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে, যা শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। এছাড়াও কোলেস্টোরাল ও থাইরয়েডের মাত্রাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঠিক সময়ে সঠিক খাবার না খেলে হরমোনের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শরীরে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হয়।

**(গ) ঘুমের সমস্যা:** পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে গেল শুধু এপাশ-ওপাশ করাই হবে, ঘুর আর হবে না। কারণ ক্ষুধা ভাব গভীরভাবে ঘুমানোর সুযোগ দেবে না। আমাদের শরীর দু'ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়- স্নায়ুবিকভাবে এবং হরমোনের প্রভাবে। আর পর্যাপ্ত খাবার না পেলে দুটোই ক্ষতির শিকার হয়।

**(ঘ) বদমেজাজ:** মানুষ অধিক সময় খালি পেটে থাকলে বদমেজাজি হয়ে যায়। তাই রাতে অধিক সময় না খেয়ে থাকার কারণে সকালে ওঠে কোনো কাজে মনোযোগী হতে পারবে না, বরং সকল কাজেই বদমেজাজি স্বভাব চলে আসে। কারণ খাবার না খেলে আচরণ/মেজাজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন সেরোটোনিনের মাত্রায় হ্রাসবৃদ্ধি চলতে থাকে- এটি মস্তিষ্কের ঐ অংশকে প্রভাবিত করে যা মানুষকে রাগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

**(ঘ) ওযন বৃদ্ধি:** ওযন কমাতে অনেকেই রাতের খাবার বাদ দেয়, কিন্তু ফলাফল হয় উল্টো। রাতে কম খাওয়া উচিত একথা সত্য, তবে একেবারে না খেয়ে থাকা ভালো নয়। কারণ রাতের খাবার থেকে শরীর কর্মশক্তি সংরক্ষণ করতে শুরু করে। ওযন কমানোর অন্যতম উপায় হলো সময়মতো পরিমাণমতো খাওয়া।

এছাড়া আলসারে আক্রান্ত রোগীদের রাত্রে খালি পেটে শয়ন করা মারাত্মক ক্ষতি। রাতে না খেয়ে ঘুমালে শারীরিক ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তির প্রবণতা, অতি দ্রুত চামড়ায় বার্ধক্যের ছাপ পড়া এবং চামড়ার রং বিকৃত হয়ে যাওয়া, প্রজনন ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। যক্ষা আক্রান্ত রোগীদের বিশেষভাবে সতর্ক করা হয় তারা যেন খালি পেটে না থাকে, বিশেষ করে রাত্রে যেন খালি পেটে শয়ন না করে।হৃদ রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষ করে নিম্ন রক্তচাপ রোগীদের খালি পেটে শয়ন করা মারাত্মক ক্ষতিকর। ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজির একটি গবেষণা অনুসারে, দীর্ঘদিন রাতে খালিপেটে ঘুমালে শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশি বা হার্টের পেশিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।[৯]

উল্লেখ্য, রাতের খাবার যে পরিমাণে কম খেতে হবে তা হাদীসেই ইঙ্গিত রয়েছে।

### আহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা

বস্তুবাদী এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা যুক্তি ব্যতীত ধর্মীয় বিশ্বাসকে অহেতুক মনে করে থাকে। তারা রুটির পরিবর্তে কয়েকটি কালিমা ও শব্দের দ্বারা পেট ভরাকে এবং অল্প খাদ্য 'বিসমিল্লাহ' পড়ার কারণে বাড়তে বা বরকতপূর্ণ হওয়াকে অসম্ভব মনে করে থাকে। বাস্তবে এসকল লোক এ হাকীকত ভুলে যায়, ক্ষুধা এবং পরিতৃপ্তির সম্পর্ক শুধু বস্তুর সাথেই সম্পৃক্ত নয়; বরং তদাপেক্ষা অধিক সম্পর্ক হলো অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে। এ কথা সবাই স্বীকার করে যে, চিন্তা ও পেরেশানীর সময় ক্ষুধা থাকে না এবং দু:খ-কষ্টে ক্ষুধা পিপাসার প্রতিও লক্ষ্য থাকে না। পক্ষান্তরে বিপদে পড়লে পিপাসার সীমা থাকে না। তাই যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির চিন্তা চেতনা মহান আল্লাহ কেন্দ্রিক হয়ে যায় এবং যার ঈমান

---

৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: রাতের আহার পরিত্যাগ, খ. ৪, পৃ. ৫১, হাদীস নং- ৩৩৫৫

৯. *https://www.risingbd.com.*"রাতে না খেয়ে ঘুমানোর পাঁচ পরিণতি", আপডেট: ৩১.০৮.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)

সকল গুণের আঁধার মহান সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, সে অবশ্যই সামান্য নিয়ামতকে অনেক বেশি মনে করে। বস্তুর কম-বেশির প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ থাকে না। ফলে তার জন্য স্বীয় প্রভুর নামই সবকিছু। সুতরাং নিজ প্রভুর স্মরণ তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই সুখী যে তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক-এর নামেই সকল কাজ আরম্ভ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে।

তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মুসলমানের প্রতিটি ভালো কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশনা রয়েছে। বলা যায়, বিসমিল্লাহ শব্দটি মুসলমানের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। যেখানে সাধারণ কাজেও বিসমিল্লাহ বলতে হয়, সেক্ষেত্রে খাবারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার পেছনে নিশ্চয় কোনো বড় ধরনের হিকমত লুকিয়ে আছে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলা যায়, খাবার যেহেতু মানব জীবনের সকল কাজকর্ম সম্পাদন করার মূল চালিকাশক্তি এবং সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার একমাত্র মাধ্যম, তাই এই খাবার যাতে হালাল ও পবিত্র হয় এবং হারাম ও অখাদ্য খেয়ে নিজের জীবনকে বিষিয়ে না তুলে, সেজন্য খাবারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশনা দিয়ে মানব শরীর সুস্থ থাকার একটি মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক থিওরী প্রদান করা হয়েছে। কারণ খাবারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে কোনো মুসলামানের পক্ষে শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও ইসলামে নিষিদ্ধ মদ, শুকরের গোশত বা হারাম ও ঘৃণ্য কোনো খাবার ভক্ষণ করা সম্ভব নয়। এ যেন মুসলামনদেরকে হারাম ও ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার অন্যতম ব্যবস্থাপত্র। তাই মুসলামনের খাবার বরকতময় হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে হালাল খাবার গ্রহণের নিশ্চয়তার নিমিত্ত খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশনা রয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِیْ سَلَمَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ غُلَامًا فِیْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَتْ يَدِیْ تَطِيْشُ فِیْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِیْ بَعْدُ–

অর্থ: উমর ইবন আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ছোট ছেলে হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবারের প্লেটে আমার হাত ছুটাছুটি করতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন: হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করো এবং তোমার পার্শ্ব থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সবসময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।[১০]

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَ لاَ عِشَاءَ وَ اِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ فَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَ الْعَشَاءَ–

অর্থ: জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা তিনি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শোনেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং ভেতরে প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে, তখন শয়তান বলে: এখানে তোমাদের জন্য রাতে থাকার কোনো স্থান নেই এবং খাবারও নেই।পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলে না তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান পেয়েছো। এরপর সে ব্যক্তি খাবার সময় যখন বিসমিল্লাহ বলে না, তখন শয়তান (তার সাথীদের) বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান এবং খাবার পেয়ে গেছো।[১১]

عَنْ اَبِیْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَعَامًا لَّمْ يَضَعْ اَحَدُنَا يَدَهُ حَتّٰى يَبْدَاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ اَعْرَابِیٌّ كَاَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِیْ الطَّعَامِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ

১০.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, ধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: আহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা এবং ডান হাত দিয়ে আহার করা, খ. ২, পৃ. ১৫৩৯, হাদীস নং- ৫৩৭৬

১১. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ: ২004, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা, খ. ২, পৃ. ১৭২, হাদীস নং- ৩৭৬৫

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ جَائَتْ جَارِيَةٌ كَاَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِى الطَّعَامِ قَالَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيَدِهَا– وَ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِىْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ وَ اِنَّهُ جَاءَ بِهٰذَا الاَعْرَابِىِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَاَخَذَتُ بِيَدِهِ وَ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَ الَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّ يَدَهُ لَفِىْ يَدِىْ مَعَ اَيْدِيْهِمَا–

অর্থ: আবু হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংগে খাবার খেতাম, তখন যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবার শুরু করতেন, ততক্ষণ আমাদের কেউই খাদ্য স্পর্শ করতো না। একদা আমরা তাঁর (সা.) সাথে খাবার খেতে বসি, তখন সেখানে দৌঁড়ে একজন বেদুইন লোক আসে। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। সে এসেই খাবারে হাত দেয়ার ইচ্ছা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার হাত ধরে ফেলেন। এরপর একটি মেয়ে দৌঁড়ে আসে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে এবং সে এসেই খাবারে হাত দেয়ার ইচ্ছা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার হাতও ধরে ফেলেন এবং ইরশাদ করেন: যে খাবারের ওপর বিসমিল্লাহ বলা হয় না, তার উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। আর শয়তান এ বেদুঈন লোকটির ওপর ভর করে এসেছিল, যাতে সে এ খাবারের ওপর আধিপত্য পায়। আমি যখন তার হাত ধরে ফেলি, তখন সে এ মেয়েটির ওপর ভর করে আসে। যাতে শয়তান তার মাধ্যমে এ খাবারে আধিপত্য পায়। কিন্তু আমি তার হাতও ধরে ফেলি। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন, শয়তানের হাত এ দু'জনের হাতের সাথে এখনও আমার হাতের মধ্যে আছে।[১২]

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِىْ اَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। যদি সে খাবার গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে সে যেন বলে بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ– অর্থ: আমি আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করছি- প্রথমে এবং শেষে।[১৩]

عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُزَاعِىُّ عَنْ عَمِّهِ اُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِىٍّ وَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَالِسًا وَّ رَجُلٌ يَّاْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ اِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِىْ بَطْنِهِ–

অর্থ: মুছান্না ইবন আবদির রহমান খুযামী (রহ.) তাঁর চাচা উমাইয়্যা ইবন মাখশী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) বসা ছিলেন এবং এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল, কিন্তু সে বিস্‌মিল্লাহ বলেনি। অবশেষে খাবারের এক লোকমা যখন অবশিষ্ট ছিল, তখন তা খাওয়ার সময় বলে بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ– অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নামে খাচ্ছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এ সময় নবী কারীম (সা.) হেসে ওঠে ইরশাদ করেন: শয়তান তার সাথে খাবার খাচ্ছিল; কিন্তু সে যখন আল্লাহর নাম নিল, তখন শয়তানের পেটে যে খাবার গিয়েছিল, তা সে বমি করে ফেলে দিল।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে সকল কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা হয়, তার মধ্যে বরকত হয়। খাওয়া শুরু করার পূর্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত দুআ হলো– بِسْمِ اللهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ

১২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা, খ. ২, পৃ. ১৭২-১৭৩, হাদীস নং- ৩৭৬৬
১৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং- ৩৭৬৭
১৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং- ৩৭৬৮

অর্থ: আল্লাহর নাম ও তাঁর বরকতে শুরু করছি।

এতে বোঝা যায়, খাওয়ার পূর্বে তাছমিয়াহ অর্থাৎ পূর্ণ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়া জরুরী নয়। জীব-জন্তু ইত্যাদি যবেহ করার পূর্বে যেমন তাছমিয়ার পরিবর্তে بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলা হয়।

**আহারের আগে ও পরে হাত ধৌত করা**

পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি জীব-জন্তুই খাবার গ্রহণ করে থাকে। মানুষের দৈনন্দিন কার্যসমূহের মধ্যে খাবার গ্রহণ করা একটি অন্যতম কাজ। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুস্থ-অসুস্থ, রোজগারকারী অথবা নিষ্কর্মা সবাই প্রতিদিন দু'/তিনবার খাবার খায়। আর শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য এ খাবারের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। বানর ও অন্যান্য দু'/একটি প্রাণী ব্যতীত অন্য সকল প্রাণীই সরাসরি মুখ দিয়ে ভক্ষণ করে। কিন্তু একমাত্র মানব জাতিই নিজের হাত দিয়ে সুন্দর পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ করে থাকে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর আহারের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-শৃংখলা বা নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি নেই। যেভাবে ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা খাবার গ্রহণ করে চলছে। কিন্তু মানুষ যেহেতু আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাই সে অন্য যেকোনো বন-জঙ্গলের প্রাণীর ন্যায় খাদ্য ভক্ষণ করতে পারে না বা গায়ের জোরে ভক্ষণ করলেও তার জন্য এই খাবার যথাযথ সুফল বয়ে আনবে না। সুতরাং খাবার যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত স্বাস্থ্য রক্ষার মূলনীতি অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা সুস্থ্যতার কারণ হবে। নতুবা যে খাদ্য উপকারের জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে, তা যদি নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করেই নিজের মনের মতো গ্রহণ করা হয়, তা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ খাদ্য বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে একমত যে অধিকাংশ রোগব্যাধি খাবারের কারণেই হয়ে থাকে। তাই খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামী জীবনের দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের নির্দেশনা হলো, আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা। কারণ মানুষ অন্য যেকোনো প্রাণীর চেয়ে কর্মঠ। কাজ করতে গিয়ে মানুষের হাত কোথায় লাগে এর কোনো ইয়ত্তা নেই। হাতের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যেহেতু অসংখ্য জীবাণু লেগে থাকে, এজন্যই হাদীসে খাবার গ্রহণের পূর্বে হাতকে পানি দ্বারা ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাত ধোয়ার কারণে হাতের মধ্যে যে ময়লা-আবর্জনা ও জীবাণু লেগে থাকে, তা সহজেই দূর হয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া বর্তমান যুগ হলো ক্যামিকেলের যুগ। প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্যামিকেল ও রাসায়নিক দ্রব্যের ছড়াছড়ি। কোনো কোনো ক্যামিকেল ও রাসায়নিক দ্রব্য এতো বিষাক্ত যে এর সামন্যতম অংশও যদি কোনো মতে খাবারের সাথে মিশে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহলে নির্ঘাত মারা যাবে। আবার  অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে যেকোনো বিষাক্ত প্রাণীর লালা বা বিষ হাতে লেগে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় হাত ধৌত না করে খাবার খেলে নি:সন্দেহে মারা যাবে অথবা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই শারীরিক সুস্থতার স্বার্থেই খাবারের পূর্বে হাত ধৌত করে নেয়া উচিত। এবিষয়ে হাদীসের গ্রন্থসমূহে অনেক রেওয়ায়েত এসেছে-

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَاْتُ فِى التَوْرٰةِ اَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَ الوُضُوْءُ بَعْدَهُ وَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ –

অর্থ: সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাওয়ার আগে অযু করলে খাদ্যের মধ্যে বরকত হয়। আমি একথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললে তিনি ইরশাদ করেন: খাওয়ার মধ্যে বরকত হলো খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে অযু (হাত-মুখ ধৌত) করা। সুফিয়ান সাওরী (র.) খাওয়ার পূর্বে সালাতের অযুর ন্যায় অযু করাকে অপছন্দ করতেন।[১৫]

اَلْوَضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِى الْفَقْرَ وَبَعْدَهُ يَنْفِى اللَّحْمَ–

অর্থ: খাওয়ার পূর্বের অযু (হাত মুখ ধৌত করা) দরিদ্রতা দূর করে এবং খাওয়ার পর (হাত মুখ) ধৌত করায় স্থূলতা দূর হয়।[১৬]

---

১৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাওয়ার আগে দুই হাত ধৌত করা, খ. ২, পৃ. ১৭২, হাদীস নং- ৩৭৬১; *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অযুর  বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৪৯, হাদীস নং- ১৮৭

১৬. প্রিন্সিপ্যাল হাফেয নযর আহমদ, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্‌যমান), *তিব্বে নববী*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, মার্চ ২০০৪ (চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ১৩৮

অযুর আভিধানিক অর্থ ধৌত করা ও পবিত্র করা। উলামাগণ তিন প্রকার অযুর কথা উল্লেখ করে থাকেন।

(১) অযুয়ে সালাত বা নামাযের অযু। এতে হাত মুখ ধৌত করা ব্যতীত মাথা মাসেহ করা ও পা ধৌত করা ফরয। কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া সুন্নত।

(২) অযুয়ে নাউম বা ঘুমের অযু। এ অযুতে হাত মুখ ধৌত করতে হয় এবং ইস্তেঞ্জা করতে হয়।

(৩) অযুয়ে ত্বাআম বা খাওয়ার অযু। এ অযুতে হাত ধৌত করা ও কুলি করা সুন্নাত।[১৭]

উল্লেখ্য, খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করার পর টিস্যু, রুমাল অথবা তোয়ালে ইত্যাদি দ্বারা হাত মোছা বা না মোছার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী সুন্নাত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের অস্পষ্টতা রয়েছে। এ বিষয়ে মূলত সুন্নাত হলো, খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করার পর কোনো কাপড়, টিস্যু বা তোয়ালে দ্বারা হাত না মোছা। নবী কারীম (সা.)-এর প্রদর্শিত এসকল পদ্ধতি কতই না হিকমতপূর্ণ। কারণ রুমাল বা তোয়ালে যাই হোক কেন, তাতে জীবাণু ও ময়লা ইত্যাদি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই খাওয়ার জন্য হাত ধৌত করার পর রুমাল, টিস্যু বা তোয়ালে দ্বারা হাত মুছলে হাত ধোয়ার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তবে খাওয়ার পর হাত ধৌত করে কোনো কাপড়, টিস্যু অথবা তোয়ালে দ্বারা হাত পরিষ্কার করা যাবে।[১৮]

তবে সুন্নাত হলো, খাওয়ার পর হাত ধৌত করা এবং কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা। কারণ হাত দিয়ে খাওয়ার সময় এতে তৈলাক্ত জিনিসসহ খাবারের অন্যান্য অংশ লেগে থাকতে পারে। হাত না ধুয়ে শুধু কোনো কাপড় বা টিস্যু দিয়ে যতই ঘষা মাজা করা হোক তা পানি দিয়ে ধোয়ার মতোপরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন কার সম্ভব নয়। তাছাড়া পানি দিয়ে হাত ধৌত না করলে কাপড় বা শরীরের যেকোনো অংশে হাতের ঝুটা লেগে কাপড়-চোপড় ও শরীর ময়লাযুক্ত হয়ে যাবে। অনেক সময় হাতে খাবারের অংশ বিশেষ তরকারী বা মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য লেগে থাকলে মশা-মাছি, ইঁদুর, ছুঁছা ও অন্যান্য পোকা-মাকড় বা বিষাক্ত কোনো কীট পতঙ্গও হাতে বসে কামড়ে দিতে পারে। এতে জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্টের স্বীকার হবে। হাদীসে আছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ نَّامَ وَ فِیْ يَدِهِ غَمْرُ وَّ لَمْ يَغْسِلْهُ فَاَصَابَهُ شَیْءُ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় শয়ন করে যে তার হাতে তরকারি বা গোশতের ঝোল লেগে থাকে এবং সে তা ধোয় না, এর ফলে যদি তার কোন ক্ষতি হয়, তবে নিজেকেই দোষারোপ করা উচিত।[১৯]

খাওয়ার পর হাত ধুয়ে পরিষ্কার না করলে চুলকানিসহ অনেক ধরণের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে খাদ্য গ্রহণের পর যেহেতু হাতে খাদ্যের কিছু অংশ লেগে থাকে, তাই তা ধৌত না করলে যেখানেসেখানে ঐ খাদ্যবস্তু মিশে পঁচা-গলা এবং অসংখ্য রোগব্যাধি বিস্তার লাভ করবে।আর পানি দিয়ে হাত ধোয়ার পর কাপড় দিয়ে মুছতে বলার কারণ হলো, হাতের মধ্যে অনেক সময় মসলা ও তৈল জাতীয় দ্রব্য লেগে থাকে, যা শুধু পানি দিয়ে ধোয়ার কারণে পরিষ্কার হয় না। কিন্তু কাপড় দ্বারা মুছলে তা পরিপূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) পানি দিয়ে হাত ধোয়ার পর তিনি হাতের আর্দ্রতা হাতে, মুখমন্ডলে ও মাথায় মুছে শুকিয়ে নিতেন। এক রেওয়ায়েতে অযুর অঙ্গসমূহে হাত মালিশ করার বর্ণনাও পাওয়া যায়।[২০]

---

১৭. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যমান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাওয়ার পর হাত ধোয়া, খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস নং- ৩৮৫২; *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্য, অনুচ্ছেদ: খাওয়ার পর হাত না ধুয়ে রাত্র অতিবাহিত করা মাকরূহ,খ. ২, পৃ. ২২, হাদীস নং- ১৮৬০

২০. ডা. মো: আব্দুল হাই, (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম সা.* ঢাকা: বাংলাবাজার, মদীনা পাবলিকেশান্স, সেপ্টেম্বর ২০০৮ (ষোলতম সংস্করণ), পৃ. ৮৭

**ডান হাতে খাওয়া**

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দু'টি হাত দিয়েছেন, একটি ডান হাত অপরটি বাম হাত। স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি উভয় হাতের কাজের ধরণও ভিন্ন। এ ভিন্নতা কোন বিজ্ঞানী নির্ধারণ করেনি; বরং প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ এর অভ্যস্ত হয়েছে। সবধরণের ভালো কাজ সাধারণত ডান হাত দিয়েই সম্পাদন করা হয়, যেমন- খাওয়া, লেখালেখি করা ইত্যাদি। তেমনিভাবে সব ধরণের মন্দ কাজও বাম হাত দিয়ে সম্পাদন করা হয়, যেমন- শৌচকর্ম ইত্যাদি। যদিও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, এটা ভিন্ন বিষয়। মানুষ যেহেতু ডান হাত দিয়েই খাবার খায়, এরপরও এটাকে সুন্নাত বলার কারণ হল, মানুষ যাতে এই স্বভাবজাত কর্মটিকে ছেড়ে না দেয়, এজন্য তাগিদ দেয়া। কারণ পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ জাতি। এ স্বভাবজাত কর্মটিতেও দেখা যাবে মানুষ একসময় এর বিপরীত করতে শুরু করে দেবে। এমনকি বর্তমান যুগে দেখাও যায়তথাকথিত কিছু সভ্যলোক বাম হাতে খাওয়া-দাওয়ার রেওয়াজ চালু করে দিয়েছে এবং এটাকে আভিজাত্যের অংশ হিসেবে মনে করছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখেছে, মানুষের ডান এবং বাম হাতের তালু থেকে সর্বদা কিছু অদৃশ্য আলোক রশ্মি (Invisible Rays) বিচ্ছুরিত হয়। ডান হাতের রশ্মি পজিটিভ বা ইতিবাচক, আর বাম হাতের রশ্মিগুলো নেগেটিভ বা নেতিবাচক এবং ডান হাতের রশ্মিগুলোতে রয়েছে শিফা বা রোগমুক্তি আর বাম হাতের রশ্মিতে রয়েছে রোগ ব্যাধি। সুতরাং ডান হাতে খাবার খাওয়া দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে, আর বাম হাতে খাওয়ার দ্বারা দেহে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি জন্মায়। তাছাড়া বাম হাত সবার নিকটই ডান হাতের তুলনায় ঘৃণিত। যেহেতু এ হাত দিয়ে শৌচকর্ম সম্পাদন করা হয়। তাই ডান হাত বাদ দিয়ে বাম হাতে খাবার খেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাবারের মাঝখানে কোনো সময় মনের মধ্যে এই খেয়াল হয় যে এবাম হাত দিয়েই তো মল-মূত্র পরিষ্কার করা হয়েছে, তাহলে ঘৃণা ও অনীহাভাব চলে আসতে পারে। আর ঘৃণার সাথে যত উত্তম খাবারই খাওয়া হোক না কেন, এতে পেটে অসুখ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিষয়টি পরীক্ষিতও। তাছাড়া পায়খানা করার পর বাম হাত দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করার পরও যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে রোগ-জীবাণু রয়ে যায়, তবে ঐ বাম হাত দিয়ে খাবার খেলে তা সরাসরি পেটে চলে যাবে এবং ডায়রিয়াসহ নানা ধরণের অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে ডান হাত দিয়ে খাবার খেলে এ ধরণের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর খাবার গ্রহণ করা যেহেতু শরীর জন্য খুবই জরুরী একটি বিষয় এবং নিয়মিতভাবেই তা গ্রহণ করতে হয়, সুতরাং এমন নিয়মতান্ত্রিক একটি বিষয় যতটুকু সম্ভব আরামের সাথে হওয়াই উচিত। ডান হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ করলে যতটুকু আরাম অর্জন করা সম্ভব হয়, বাম হাত দিয়ে তা সম্ভব নয়। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَ اِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ–

অর্থ: ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে খায় এবং যখন পানি পান করে, তখন যেন ডান হাতে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় এবং পানি পান করে।[২১]

عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُدْنُ بُنَىَّ فَسَمِّ وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ–

অর্থ: উমার ইবন আবী সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি আমার নিকটবর্তী হও, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের কাছের খাদ্য গ্রহণ করো।[২২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لاَ يَاْكُلُ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَ لاَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ বাম হাতে আহার করবে না এবং বাম হাতে পান করবে না। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।[২৩]

---

২১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: ডান হাতে খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং- ৩৭৭৭

২২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং- ৩৭৭৮

**খাওয়ার পূর্বে কুলি করা**

আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি, তার চারপাশে বাতাসের সাথে অসংখ্য ধুলা-বালি এবং জীবাণু রয়েছে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। তাই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার সময় নাকের মাধ্যমে এবং কথা বলার সময় মুখে এসকল ধুলা-বালি ও জীবাণু শরীরের ভেতর প্রবেশ করে। এ অবস্থায় কুলি না করে খাবারগ্রহণ করলে খাবারের সাথে অনায়েসেই সেসব ধুলা-বালি ও জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়। তাই খাবারের পূর্বে নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নাত হিসেবে কুলি করে নিলে ঐ সকল ধুলা-বালি ও জীবাণু খাবারের সাথে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না এবং কোনো ধরণের অসুখেরও সম্ভাবনা থাকে না। কারণ কুলি করার সাথে সাথেই মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় এবংইতিপূর্বে যেসব খাবার ভক্ষণ করা হয়েছে, কোনো কারণে এর অংশ বিশেষ দাঁতের ফাঁকে থেকে দুর্গন্ধ, ক্ষত বা অন্য কোনো রোগ সৃষ্টি করার অবস্থায় থাকলেও কুলি করার কারণে তাও নি:ঃশেষ হয়ে যায়। তাছাড়া কুলি করে খাবার খেলে খাবারের আসল স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব।কেননা কুলি করে খাবার না খেলে পূর্বে যে খাবার গ্রহণ করা হয়েছে উক্ত খাবারের রেশ একটু না একটু থেকেই যায়। বিশেষ করে পান, সিগারেট এবং এ জাতীয় দ্রব্য সেবনের পর যদি ভালভাবে কুলি করা না হয়, তাহলে পরবর্তী খাবারের প্রকৃত মজা অনুভব করা যায় না। হাদীসে এসেছে- হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: খাওয়ার পূর্বে এবং পরে অযু (অর্থাৎ হাত-মুখ ধোয়া) বরকতের কারণ।[২৪]

**খাওয়ার সময় বসার পদ্ধতি**

বর্তমান যুগে মানুষের মোটা হয়ে যাওয়া একটি জীবননাশক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে এবং এ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেই প্রথম যে ব্যবস্থাপত্র দেয় তাহলো কম খাওয়া। কিন্তু অধিকাংশ রোগীই কম খাওয়ার নিয়ম মানতে না পারায় ডাক্তারগণের আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঔষধপত্র ও পরামর্শ কোনো কাজে আসে না। অথচ যারা অভাবী এবং সারাদিনে এক/দুই বেলা কোনো মতে খেতে পারে তাদেরকে খুব কমই মোটা হতে দেখা যায় না। সুতরাং বলা যায়, যারা পরিমাণের চেয়ে বেশি খেয়ে থাকে তারাই সাধারণত মোটা হয়। এমতাবস্থায়মোটা হয়ে যাওয়ার মতো ধ্বংসাত্মক রোগ ও বেশি খাওয়ার বদ অভ্যাস থেকে খুব সহজেই পরিত্রাণের অন্যতম ব্যবস্থাপত্র হলো হাদীসে বর্ণিত খাওয়ার সময় বসার পদ্ধতি অনুসরণ করা। হাদীসে বর্ণিত আছে-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ... عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ جَلَسَ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ رُبَّمَا نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَ جَلَسَ عَلَى الْيُسْرٰى–

অর্থ: খাবার খাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই হাঁটু গেড়ে স্বীয় কদম যুগলের পিঠের উপর বসতেন। অধিকাংশ সময় ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসতেন।[২৫]

উল্লিখিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিসগণ খাওয়ার সময় বসার তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যথা-

**(১) উভয় হাঁটু উঠিয়ে বসা:** খাওয়ার সময় কম খাওয়ার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামনে যখন হরেক রকম খাবার উপস্থিত থাকে, তখন আমাদের কম খাওয়ার হুঁশ থাকে না; বরং ইচ্ছামতো পেট ভরে খাবার খাই। কিন্তু খাবার সময়ই যদি এমন পদ্ধতিতে বসা হয় যাতে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এবং অনেক খাবার সামনে থাকলেও পেট ভরে খাওয়া সম্ভব নয়, তাহলেই কেবল একজন মানুষ পরিমিত খাবার খেতে পারবে এবং অধিক খাবার থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, নতুবা অধিক খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা খুবই দুষ্কর ব্যাপার। তাই খাবারের সময় উভয় হাঁটু উঠিয়ে খাবার খেতে বসলে অতিরিক্ত খাবার পেটে প্রবেশ করার সুযোগই থাকে না। এটি একটি পরীক্ষিত আমল। এভাবে বসে দীর্ঘদিন খাওয়ার আমল চালিয়ে গেলে কম খাওয়া হবে এবং মোটা হওয়াসহ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করবে।

হাদীসে এসেছে–عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُقْعِيًا يَاْكُلُ طَعَامًا

---

২৩. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্য,অনুচ্ছেদ: বাম হাতে পানাহার করা নিষেধ,খ. ২, পৃ. ৭, হাদীস নং- ১৭৯৯
২৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে দুই পা খাড়া করে উপরি বসে খেজুর খেতে দেখেছি।[২৬] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُسْرٍ قَالَ اَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَاةً فَجَثٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ يَاْكُلُ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ اِنَّ اللهَ جَعَلَنِىْ عَبْدًا كَرِيْمًا، وَ لَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا–

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবন বুশর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.)- কে একটি বকরী হাদিয়া দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উভয় হাঁটু উঁচু করে বসে খাচ্ছিলেন। এক বেদুঈন বললো, এটা কী ধরনের বসা? তিনি ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহপরায়ণ বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী করেননি।[২৭]

**(২) এক হাঁটু উঠিয়ে বসা:** কোন কারণে খুব বেশি ক্ষিদে অনুভূত হলে এবং খাবারও যথেষ্ট পরিমাণ থাকলে খাবার গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে এক হাঁটু উঠিয়ে বসার অনুমতি রয়েছে। এ পদ্ধতিতে বসে খাবার খেলে প্রথম পর্যায়ের চেয়ে একটু বেশি খাবার গ্রহণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে বসে আহারকারী ব্যক্তি প্লীহা রোগ থেকে মুক্ত থাকে এবং উরুর মাংস পেশী মজুবত ও দৃঢ় হয়।

**(৩) উভয় হাঁটু গেড়ে বসা:** এ পদ্ধতিতে খাবার একটু বেশিই খাওয়া যায়। এভাবে বসে খাওয়ার অনুমতি শুধু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা কঠোর পরিশ্রমী, পায়ে হেঁটে চলে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে। যারা আরাম প্রিয় এবং মোটেও কায়িক পরিশ্রম করে না তাদের জন্য এ পদ্ধতিতে বসে খাবার গ্রহণ করা একেবারেই অনুচিত। কারণ এভাবে বসে বেশি খাওয়ার ফলে নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি দেখা দেবে।

**দস্তরখানা বিছিয়ে আহার করা**

দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া মানে বসে খাওয়া, দাঁড়িয়ে খাওয়ার সুযোগ নেই। সুন্নাত তরীকায় বসে খাবার খাওয়া যে আরামদায়ক, স্বস্তি ও শরীরের জন্য খুবই উপকারী ব্যবস্থাপত্র তা সবাই স্বীকার করে থাকে। তাছাড়া এভাবে বসে দীর্ঘসময় আহার করলেও শরীর ক্লান্তি অনুভব হয় না। কিন্তু বর্তমানে অনেক রেস্টুরেন্টে দাঁড়িয়ে তথা BUFFET খাওয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে। এতে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। দস্তরখানাবিহীন এভাবে দাঁড়িয়ে খাওয়াকে অনেকে আভিজাত্য ও গৌরবের বিষয় মনে করলেও একটু চিন্তা করা উচিত, তারা শুধু নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নাতেরই বিরোধিতা করে না; বরং খাবারকে অসম্মান করার পাশাপাশি অযথা কষ্টও করে। পক্ষান্তরে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া স্বীয় রিযিকদাতার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং খানার প্রতি আদব ও সম্মানের বহি:প্রকাশ ঘটে। এছাড়া দস্তরখানা বিছিয়ে বসে খাবার খেলে খুবই অল্প জায়গার প্রয়োজন হয় এবং অনেক তৃপ্তিসহকারে সময় নিয়ে ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া যায়। এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَكَلَ عَلٰى سُكُرُجَّةٍ قَطُّ، وَ لاَ خُبِزَ لَه مُرَقَّقُ قَطُّ، وَ لاَ اَكَلَ عَلٰى خِوَانٍ، قِيْلَ لِقَتَادَةَ فَعَلٰى مَا كَانُوْا يَاْكُلُوْنَ؟ قَالَ عَلٰى السُّفَرِ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো 'সুকুরুজ্জাহ' অর্থাৎ ছোট ছোট পাত্রে আহার করেছেন, তার জন্য কোনো সময় নরম রুটি তৈরি করা হয়েছে কিংবা তিনি কখনো টেবিলের উপর খাবার খেয়েছেন বলে আমি জানি না। কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তাহলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন? তিনি বললেন: দস্তরখানের উপর।[২৮]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الاَذٰى وَ لْيَاْكُلْهَا وَ لاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ–

২৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: আহারকারীর বিনয়-নম্রতা মুস্তাহাব এবং তার উপবেশনের পদ্ধতি, খ. ৬, পৃ. ১৫২, হাদীস নং- ৫৩২৬

২৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ, খ. ৪, পৃ. ১১, হাদীস নং- ৩২৬৩

২৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: নবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন, খ. ২, পৃ. ১৫৪৯, হাদীস নং- ৫৪১৫

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কারো খাবার হতে কিছু পড়ে যায়, তখন তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেবে এবং তা শয়তানের জন্য পরিত্যাগ করবে না।[২৯]

সুতরাং উক্ত হাদীসের ওপর তখনই আমল করা সম্ভব, যখন দস্তরাখানা বিছিয়ে খাওয়া হবে। নতুবা দাঁড়িয়ে বা দস্তরখানা বিছিয়ে না খেলে পতিত খাবার তুলে খাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

**পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাওয়া**

রিযিকের গুরুত্ব এবং নিয়ামতের মূল্য সম্পর্কিত অনুভূতি অন্তর থেকে মুছে যাওয়ার কারণে হাত বা প্লেট থেকে কোনো খাদ্যদ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়াকে অনেকে বক্র দৃষ্টিতে দেখে, চাই সেটা শুকনা বা অন্য যেকোনো খাবারই হোক না কেন। মনে করা হয়, এমনটা করা দারিদ্র্যতার লক্ষণ। অথচ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ খাদ্যের একটি কণা বা লবণের দানাও পরম যত্ন ও ভক্তি সহকাওে তুলে খেতেন। নিজেদের মনগড়া ও তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতানুযায়ী বর্তমানে পতিত খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে খাওয়াকে শিষ্ঠাচার ও ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করা হয়। এ বিষয়ে নবী কারীম (সা.)-এর সুস্পষ্ট বাণী হাদীসে বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও মুসলিম হিসেবে আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা করার কোনো সুযোগ থাকতে পারে না। পতিত খাবার খাওয়ার বরকত ও উপকারিতা সম্পর্কে নবী কারীম (সা.)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশনা আমাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস করা উচিত। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ...اِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَاْكُلْهَا وَ لاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তোমাদের কারো যদি লুকমা পড়ে যায়, সে যেনো লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে তা খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেনো তা রেখে না দেয়।[৩০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন– مَنْ اَكَلَ مَا سَقَطَ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ فِى سَعَةٍ وَ عُوْفِى فِىْ وَلَدِهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খেয়ে নিলো, তার দস্তরখানা প্রশস্ত হয়ে গেলো অর্থাৎ তার রিযিকের মধ্যে বরকত এসে গেলো এবং তার সন্তানাদি সুস্থতা ও নিরাপত্তা পেয়ে গেলো।[৩১]

এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসে এসেছে– اٰمَنَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْبَرْصِ وَ الْجُذَامِ وَ صَرَفَ عَنْ وَّلَدِهِ الْحُمُقِ

অর্থ: সে দারিদ্র এবং মুখাপেক্ষিতা হতে নিরাপদ হয়ে গেলো। ধবল ও কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা পেল এবং তার সন্তানাদি থেকে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি দূর হয়ে গেল।[৩২]

সুতরাং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী পতিত খাবার উঠিয়ে খাওয়ার ফায়দাসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায়-

(১) খাবার ও রিযিকের মধ্যে বরকত ও প্রশস্তা আনে।
(২) সন্তানাদির সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
(৩) অভাব-অনটন ও ভিক্ষাবৃত্তি এবং অনাহার থেকে নিরাপদ রাখে।
(৪) কুষ্ঠ রোগের মতো ব্যাধি থেকে রক্ষা করে।
(৫) সন্তান সন্ততি নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী হতে মুক্তি পায়।
(৬) স্বীয় খানা শয়তানের খাদ্য হয় না।

উল্লেখ্য, খাবার যদি এমন ময়লাযুক্ত স্থানে পতিত হয়, যেখান থেকে উঠিয়ে খেলে রোগ-ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সেখান থেকে উক্ত খাবার উঠিয়ে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

---

২৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু পড়ে গেলে, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং- ৩৮৪৫
৩০.*আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পড়ে যাওয়া খাদ্য মুছে খাওয়া, খ. ৬, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং- ৫২৯৮
৩১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

**খাবারে দোষ-ত্রুটি না ধরা**

সবাই যেমন সব খাবার পছন্দ করে না, তেমনি অপছন্দও করে না। এটা মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাই আমাদের সমাজে দেখা যায়, কেউ হয়তো কোনো একটি খাবার খুবই পছন্দ করে, ঠিক ঐ খাবারটিই অন্যজনকে হাজারো অনুরোধ করেও খাওয়ানো সম্ভব না। এরপরও অনেকে খাবারের মধ্যে নানারূপ দোষ-ত্রুটি ধরাকে কৃতিত্ব মনে করে। ফলে এনিয়ে অনেক পরিবারে ঝগড়াঝাটির শেষ নেই। এই সামান্য বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের মতো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। সবার সামনে খাবারের দোষ-ত্রুটি বললে যে রান্না করে তার লজ্জিত হতে হয়। অথচ প্রত্যেক রাধুনীই রান্না ভালো হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَ اِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) কখনো কোনো খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেননি। ভালো লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তা রেখে দিয়েছেন।[৩৩]

নিজের অপছন্দের কারণে পরিবেশিত খাবারে দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করলে অন্যান্য লোকদের খাবারের প্রতি অনীহা দেখা দিতে পারে। যদ্দরুণ তারা উক্ত খাবার নাও খেতে পারে। এতে ক্ষুধার্ত থাকার কারণে তাদের গ্যাস্ট্রিকসহ নানা রকমের রোগ-ব্যাধি দেখা দিতে পারে। তাছাড়া কখনো ভদ্রতা রক্ষার্থে বা অন্যকোনো কারণে সন্দেহ নিয়ে এ খাবার খেলেও বদ হজমসহ নানাবিধ অসুখ হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতিই হলো সবচেয়ে উত্তম, গ্রহণযোগ্য, বৈজ্ঞানিক ও হিকমতপূর্ণ নির্দেশনা অর্থাৎ কোনো খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ না করা। ভালো লাগলে খাবার খাওয়া এবং খারাপ লাগলে তা রেখে দেয়া।

**খাওয়ার আগে ও পরে একটু লবণ খাওয়া**

খাওয়ার পূর্বে সামান্য একটু লবণ মুখে দেয়া খাওয়ার একটি আদব। ইমাম গাযযালী (রহ.) লবণ দ্বারা আহার আরম্ভ করা এবং লবণ দ্বারা আহার শেষ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৪]বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা অহেতুক মনে হলেও নবী কারীম (সা.)-এর কোনো কাজই যে হিকমতের বাইরে নয়, তা নি:সন্দেহে বলা যায়। এ বিষয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, এই ছোট একটি আমলেও রয়েছে মানব জাতির সুস্থ থাকার একটি বিশাল ব্যবস্থাপত্র। কেননা লবণের মধ্যে রয়েছে খাওয়ার চাহিদা বৃদ্ধি করার অনেক উপকরণ। আর লবণ এমনি একটি পদার্থ মুখে দেয়ার সাথে সাথেই প্রচুর লালা সৃষ্টি করে। মুখে যদি কোনো লালা না থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে খাবার খাওয়া সম্ভব নয়। তাই লবণ চাটার সময় মুখ গহবরের মাংসপেশী হজমকারী অম্লকে বের করতে থাকে, যার কারণে খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, খাবার সুস্বাদু মনে হয় এবং অল্প আহার করলেই ক্ষুধা মিটে তৃপ্তি আসে। খাওয়ার শেষেও জিহ্বা, গলা ও খাদ্য নালীতে ক্ষুদ্র খাদ্য কণা, ঘৃত ও অন্যান্য তৈলাক্ত খাবার লেগে থাকে, যথেষ্ট পরিমাণ পানি করার পরও তা যায় না,ইহাও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এমতাবস্থায় একটু লবণ মুখে দিলে অতি সহজেই লালার সাথে মিশে এগুলো পাকস্থলীতে চলে যায়। ফলে স্বাস্থ্য ক্ষতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া খাবার হজম হওয়ার জন্য মুখের সৃষ্ট লালা খুবই জরুরী। এক কথায় বলা যায়, খাদ্যের সাথে যদি মুখের লালার মিশ্রণ না ঘটে, তাহলে ভক্ষিত খাবার কোন মতেই হজম হবে না। আর খাবার যদি হজম না হয়, তাহলে ঐ খাবারই অসংখ্য রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করবে। সুতরাং খাবারের পূর্বে ও পরে একটু লবণ খেলেএ সকল সমস্যাথেকে অতি সহজেই পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব।[৩৫]

**কয়েকজন মিলে একই প্লেটে খাবার খাওয়া**

নতুন নতুন আবিষ্কার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরকে কাছে এবং সমগ্র দুনিয়াকে একাকার করে দিলেওবাস্তবে মানুষকে পরস্পর কাছে থাকার পরিবর্তে একজন থেকে অপরজনকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। কারণ আধুনিক সভ্যতা

৩৩.*সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: নবী সা. কখনো কোনো খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরতেন না, খ. ২, পৃ. ১৫৪৭, হাদীস নং -৫৪০৯

৩৪. আবু হামিদ মোহাম্মাদ ইবন মোহাম্মদ আল-গাযযালী, (অনুবাদ: আবদুল খালেক), *সৌভাগ্যের পরশমনি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১৫ (অষ্টম সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ১৩

৩৫. শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, *কোরআন হতে বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, হাছানিয়া লাইব্রেরী, আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ১৬২

আমাদেরকে অনেক কিছুই দিয়েছে, কিন্তু অতি আধুনিক করতে গিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকেই বিলীন করে দিয়েছে। তাই ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় বর্তমানে একই প্লেটে কয়েকজন মিলে একত্রে খাওয়ার কথা কল্পনাও করা দুষ্কর। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে এখন প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত প্লেট ও গ্লাস ব্যবহার করছে। এতে কয়েকজন মিলে একত্রে খাওয়ার ফলে হৃদ্যতা ও ভালবাসার সৃষ্টি এবং রোগ থেকেমুক্তি লাভের যে সুযোগ ছিল তা নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং নবী কারীম (সা.)-এর উক্ত সুন্নাত তথা একত্রে খাওয়ার মাধ্যমে আবারো একে অপরের পরস্পর কাছে আসা ও রোগ মুক্তির কার্যকরী ব্যবস্থাপত্র হিসেবে এটি আবারো চালু করা প্রয়োজন। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَار وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلاَ يَقُوْمُ رَجُلُ حَتّٰى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَ لاَ يَرْفَعُ يَدَهُ وَ اِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَ لْيُعْذِرْ فَاِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَده وَ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةُ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ(সা.) ইরশাদ করেন: দস্তরখানা বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে না নেয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যেন ওঠে না যায় এবং সে আহারে পরিতৃপ্ত হলেও হাত গুঠিয়ে নেবে না, যতক্ষণ না অন্য সকলের আহার শেষ হয়। (একান্তই যদি ওঠার প্রয়োজন হয়) তবে সে যেন ওযর পেশ করে। কারণ সে হাত গুটিয়ে নিলে তার সাথের লোক লজ্জিত হবে, অথচ তখনও হয়তো তার আরো খাদ্যের প্রয়োজন আছে।[৩৬]

উক্ত হাদীস দ্বারাএকত্রে খাওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মূলনীতির নির্দেশনা পাওয়া যায়-
(১) দস্তরখানায় খাওয়ার সময় খাবার রেখে দস্তরখানা থেকে না ওঠা।
(২) সকলে খানা থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত খানা খাওয়া বন্ধ না করা। কারণ হতে পারে অন্যের পেটে এখনও ক্ষুধারয়েছে। তাই খাওয়া বন্ধ করে দিলে অন্যরাও খানা থেকে হাত তুলে নিয়ে ক্ষুধার্ত থেকে যাবে।
(৩) খাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের কোন অসুবিধা থাকলে অপারগতা প্রকাশ করা।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ وَحْشِىِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنَّا نَأْكُلُ وَ لاَ تَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ– قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ–

অর্থ: ওয়াহশী ইবন হারব (র.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। একদা নবী কারীম (সা.)-এর নিকট সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না। তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খাও? তাঁরা বললেন, জ্বি হ্যাঁ। অত:পর তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তোমরা একত্রিত হয়ে খানা খাবে এবং বিসমিল্লাহ বলবে, এতে তোমাদের খাবারে বরকত হবে।[৩৭]

এ বরকতের বাস্তবতা হলো, সর্বদা দু'জন পৃথক পৃথক ব্যক্তির খাবার একত্রে তিনজনের এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং কেউই ক্ষুধার্ত থাকে না। উক্ত খাবার যদি পৃথক পৃথকভাবে খায় তবে কারো কারো হয়তো পেট ভরবে; বরং এমনও হতে পারে কিছু খাবার অবশিষ্টও থেকে যাবে, যা কারো উপকারে আসবে না। আবার কেউ ক্ষুধার্তও থেকে যেতে পারে। কারণ খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অবস্থা এক রকম নয়।তাছাড়া কয়েকজন মিলে একত্রে খেলে খাবার গ্রহণকারী সকলের হাতের আঙ্গুল থেকেপিটুইটারি গ্লান্ড (pituitary gland) থেকে স্নায়ুবিক প্রভাব সমৃদ্ধ হজমকারী আদ্র পদার্থ আঙ্গুলের মাধ্যমে বের হয়ে সকল খাবারের সাথে মিশে যায়, যা অন্য সকল রোগ-জীবাণুকে নি:শেষ করে দেয়। এভাবে ঐ খাবার দূষণমুক্ত হয়ে যায়। আবার কখনো রোগ আরোগ্যের জীবাণু মিলিত হয়ে সমগ্র খাবারকে প্রতিষেধক বানিয়ে দেয়, যা পাকস্থলীর রোগের জন্য খুবই উপকারী। তাই নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন–خَيْرُ الطَّعَامِ مَا كَثُرَتِ الاَيْدِىْ

৩৬. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: খাবার তুলে না নেয় পর্যন্ত ওঠা এবং সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ, খ. ৪, পৃ. ২৪-২৫, হাদীস নং- ৩২৯৫
৩৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: একত্রিত হয়ে খানা খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৭২, হাদীস নং- ৩৭৬৪

অর্থ: খাওয়ার মধ্যে যত বেশি হাত একত্রিত হয়, ততই উত্তম বা বরকত বেশি হয়।[৩৮]

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ يَأْكُلُ وَحْدَه–

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো একাকী খানা খেতেন না।[৩৯]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَلَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءُ وَ لاَ عَشَاءُ مِنْ خُبْزٍ وَ لَحْمٍ اِلاَّ عَلَى ضَفَفٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ بَعْضُ هُوَ كَثْرَةُ الْاَيْدِىْ–

অর্থ: মালিক ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। দিনের খাবারই হোক কিংবা রাতের খাবার কোনো সময়ই নবী কারীম (সা.) 'যফাফ' ব্যতীত রুটি এবং গোশ তৃপ্তি সহকারে একত্রে খাননি। আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, 'যফাফ'-এর অর্থ হলো অনেক হাত একত্রিত হওয়া।[৪০]

উক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী নবী কারীম (সা.) কখনো তৃপ্তি সহকারে গোশত ও রুটি একাকী খাননি; বরং তা সাহাবীদেরকে নিয়ে একত্রে খেয়েছেন।এর দু'টি কারণ হতে পারে। প্রথমত তিনি তাঁর পবিত্র জীবনের অধিকাংশ সময় নেহায়েত দারিদ্র্য ও দু:খ-কষ্টের সাথে কাটিয়েছেন, অনাহারে দিনাতিপাত করেছেন। আল্লাহ যখনই তাঁকে অতিরিক্ত কিছু দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষের মধ্যে তা বন্টন করে দিয়েছেন। নিজের জন্য পছন্দ করে কিছুই রাখেননি। দ্বিতীয়ত তিনি কখনই একাকী খাওয়া পছন্দ করতেন না, সর্বদাই অন্যকে খাবারে শামিল করতেন এবং সাহাবীদেরকে সর্বদাই এই ত্যাগ ও কুরবানী শিক্ষা দিতেন।

এটা শুধু একজন সাহাবীর (রা.) বর্ণনা নয়, বহু সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা এবং তাদের নিজেদের সম্মিলিত খাওয়ার আমলই এ বিষয় স্বাক্ষ্য বহন করে যে নবী কারীম (সা.) পৃথকভাবে খাবার খেতেন না; বরং মজলিসে উপস্থিত ছোট বড় সকল পর্যায়ের লোকেদের নিয়ে খানা খেতেন।তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) মজলিসের সকল ব্যক্তিদেকে কেবল খাবারে শরীক করতেন না; বরং ধনী-গরীব, ছোট-বড় কোনো পার্থক্য না করে সকল সাথীকে নিজের খাবারে শরীক করতেন। উপস্থিত সকলকে একই দস্তরখানায়, একই বর্তন এবং একই স্থানে বসিয়ে খাওয়াতেন। বলা হয়–سُوْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءُঅ র্থ: মুমিনের উচ্ছিষ্ট অন্যের জন্য শিফা রয়েছে। হযরত সাহাবায়ে কিরামগণ বলতেন, একত্রে খাবার খাওয়া মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক।

كَانَ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَلاِجْتِمَاعُ عَلَى الطَّعَامِ مِنْ مَّكَارِمِ الْاَخْلاَقِ–

ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন: একত্রে খানা খেলে পাগল, জটিল হৃদরোগ, টিবি ও পেটের অন্যান্য রোগ ভাল হয়।[৪১]

**খাবারে ফুঁ না দেয়া**

সকল কাজে তাড়াহুড়া করা মানুষের স্বভাব।[৪২] যে বিষয়টি একটু ধৈর্য ধারণ করলে খুব সহজেই আঞ্জাম দেয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করার কারণে সময় বাঁচিয়ে যতটুকু উপকার হয়, দেখা যায় অন্যদিকে এর চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে যায়।তাড়াহুড়া করার এমনি একটি অবস্থা দেখা যায়, কোনো গরম খাবার বা পানীয় যখন আমাদের সামনে আনা হয়, তখন ফুঁ দিয়ে তা ঠান্ডা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। অথচ আমরা এতটুকু খেয়াল করি না সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাবারে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

---

৩৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৩৯. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩

৪০. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, (অনুবাদ: শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী), *শামায়েলে তিরমিযী*, ঢাকা: উত্তরা, ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৪২, হাদীস নং- ২৮৯

৪১. ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, আল-কাউসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ (সংশোধিত সংস্করণ),খ. ১, পৃ. ৯১-৯২

৪২.–خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া: ৩৮

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْفُخُ فِيْ طَعَامٍ وَ لاَ شَرَابٍ، وَ لاَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ-

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খাদ্যে ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং তিনি পাত্রের মধ্যে নি:শ্বাস ফেলতেন না।[৪৩]

হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম (সা.)-এর কাছে গরম খাদ্য আনা হলে তিনি তা ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত ঢেকে রাখতেন। তিনি আরো বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে শুনেছি, ঠাণ্ডা খাদে বিশেষ বরকত রয়েছে।[৪৪]

মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রয়েছে অসংখ্য জীবাণু। সুতরাং খাবারে যদি ফুঁ দেয়া হয়, তাহলে অনেক রোগ-জীবাণু খাবারের সাথে মিশে যায়। অত:পর উক্ত খাবার খেলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হবে অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া সম্মিলিত খাবারে ফুঁ দিলে পূর্ণ খাবারের সাথেরোগ-জীবাণু মিশ্রিত হয়েসকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেক সময় ফুঁ প্রদানকারীর মুখ দুর্গন্ধময় ও ইনফেকশনযুক্ত হওয়ার কারণেও খাবার বিষাক্ত হতে পারে। অথচ একটু ধৈর্য ধরে ঠান্ডা করে খাবার বা পানীয় গ্রহণ করলে ক্ষতি থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। মূলত মানুষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্যই খাবারে ফুঁ দিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

**খাওয়ার সময় তাড়াহুড়া না করা এবং ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া**

কোনো কাজেই তাড়াহুড়া করতে নেই। কথায় বলে তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ। তাড়হুড়া করে কাজ করলে কাজটি সুন্দর হয় না। তাই খাবার খাওয়ার সময়ও তাড়াহুড়া করতে নেই। তাড়াহুড়া করে খাবার খেলে খাবারের স্বাদ বোঝা যায় না এবং তৃপ্তিও আসে না। এভাবে দীর্ঘদিন খাবার খেলে খাদ্য নালী ফোলে গিয়ে গলায় নানা ধরণের অসুখ হতে পারে। তাছাড়া তাড়াহুড়া করে খাওয়ার কারণে অনেক সময় খাবার গলায় আটকে গিয়ে মৃত্যুর কারণও হতে পারে। খাবারের মধ্যে যদি হাড্ডি বা মাছের কোনো শক্ত কাঁটা থাকে দ্রুত খাওয়ার কারণে তা মুখে বা গলায় আটকে গেলে বিড়ম্বনার শেষ নেই। তাড়াহুড়া করে খাওয়ার কারণে খাদ্যনালীতে যেমন চাপ পড়ে, তেমনি পাকস্থলীতেও চাপ পড়ে। যে খাবার তাড়াহুড়া করে খাওয়া হয়, তা ভালভাবে না চিবানোর কারণে হজমের সমস্যা হয়ে পেট খারাপসহ নানা ধরণের অসুখের সম্ভাবনা রয়েছে। খুব বেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি খাবার উপস্থিত হয়, আর এমতাবস্থায় খাবার খেলে মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবুও তাড়াহুড়া করে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এমনটা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয় যে ঠিক সালাতের সময় খাবার উপস্থাপন করা হবে, আর সালাত বাদ দিয়েই খাবার খাবে। এমন ঘটনা কদাচিত ঘটতে পারে, সব সমবয় নয়। হাদীসের মাধ্যমে এমন পরিস্থিতিতেও যেন খাবারে তাড়াহুড়া না করা হয় একথাই বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা তাড়াহুড়া করে খাওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا قُدِمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهٖ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَ لاَ تُعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ-

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বিকালের খাবার পরিবেশন করা হলে মাগরিবের সালাতের পূর্বেই তা খেয়ে নেবে এবং খাওয়ার মধ্যে তোমরা তাড়াহুড়া করো না।[৪৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ يَقُوْمُ حَتّٰى يَفْرُغَ زَادَ مُسَدَّدُ وَّ كَانَ عَبْدُ اللهِ اِذَا وُضِعَ عِشَاءُهُ اَوْ حَضَرَتْ عَشَاءُهُ لَمْ يَقُمْ حَتّٰى يَفْرُغَ وَ اِنْ سَمِعَ الاِقَامَةَ وَ اِنْ سَمِعَ الاِقَامَةَ وَ اِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ-

৪৩.*সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: খাদ্য দ্রব্যে ফুঁক দেয়া, খ. ৪, পৃ. ২২, হাদীস নং- ৩২৮৮

৪৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪৫.*সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আযান, অনুচেছদ: খাবার উপস্থিত হওয়া অবস্থায় সালাতের ইকামত হলে ..., খ. ১, পৃ. ১৫৪৪, হাদীস নং- ৫৩৯৮,

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন: যখন তোমাদের কারো রাতের খাবার তৈরি থাকে এবং এশার সালাতেরতাকবীরও হতে থাকে, তখন তোমরা খাবার না খেয়ে ওঠবে না।

রাবী মুহাদ্দিস (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-এর নিয়ম ছিল যখন খাবার সামনে আসত, তখন তিনি খানা শেষ করার আগে উঠতেন না, যদিও তিনি ইকামত ও ইমামের কিরাআত শুনতেন।[৪৬]

তাছাড়া খাবার পরিপূর্ণভাবে চিবিয়ে খাওয়া সুস্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ বিষয়ে আমরা অনেকটা উদাসীন। অথচ খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া না হলে খাদ্য উপাদান থেকে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া সম্ভব নয়। খাদ্য উপাদান সঠিকভাবে পরিপাক হওয়ার জন্যও ভালো ও ধীরতার সাথে সর্বদা উত্তমরূপে চিবিয়ে খাওয়া প্রয়োজন। থুথুতে সালিভারি অ্যামায়লেস নামক একটি এনজাইম থাকে, যেটা খাবারে স্টার্চ এবং মালটোডেক্সট্রিন্স নামক একটি কার্বোহাইড্রেট হজম করতে সাহায্য করে। খাবার যদি থুথুর সাথেমেশার সময় না পায় তবে হজমের সমস্যা হয়। খাবার না চিবিয়ে তাড়াহুড়ো করে খেলে শরীরে অপ্রয়োজনীয় বায়ু প্রবেশ করে গ্যাস-অম্বল-ঢেঁকুর ওঠার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। ভালোভাবে চিবিয়ে খেলে অন্ত্রে যে হরমোনগুলো আছে সেগুলো ভাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পেট ভরে যাওয়ার বার্তা পাঠায়, আর এ বার্তা পৌঁছাতে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে না খেলে এই বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারে না।এছাড়া ভালোভাবে চিবিয়ে খেলে প্রতিটি লোকমায় মুখের লালা মিশ্রিণ ঘটে পিচ্ছিল হয়ে খাদ্য অতি সহজে পরিপাক হয়। কারণ মুখের লালা খাদ্য দ্রুত হজমে খুবই সহায়ক। অনেক সময় তাড়াহুড়া করে খাওয়ার কারণে শ্বাসনালীতে খাবার আটকে হঠাৎ শ্বাসরোধ হয়ে মারাত্মক বিপদ ঘটে থাকে। তাই যতই তাড়া থাকুক না কেন ধীরে সুস্থে এবং ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া এবং প্রতিটি লোকমা অন্তত ৩০ থেকে ৫০ বার চিবানো উচিত।[৪৭]

খাদ্য চিবিয়ে খেলে পরিমাণে কম লাগে এবং যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে চিবিয়ে খেলে তা পরিপাক হয়ে সুঠাম দেহ গঠনেও সহায়তা হয়। এছাড়া আমাদের প্রতিটি খাবারেই নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে। খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়ার ফলেস্যালাইভা নি:সৃত হয়ে বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে কাজ করে। সুতরাং খাবার যত ধীরে ও ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া হবে, ততই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।[৪৮]

অনেক লোক আছে, যারা বড় বড় লোকমা দিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে। মূলত খাদ্যের এভাবে খাওয়ার দ্বারা উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশি হয়।খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়ার ফলে দাঁত ও দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়। খাবার সঠিকভাবে চিবানোর ফলে নি:সৃত স্যালাইভা দাঁতের ভেতর আটকে থাকা খাদ্যাংশ পরিষ্কার করে। এতে দাঁতের সমস্যা দেখা দেয়ার হার কমে যায়।আর এক পাশ দিয়ে চিবালে অন্য দিকের দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। নিয়ম হলো, উভয় পাশের দাঁত দিয়ে খাবার চিবিয়ে খাওয়া। খাবার না চিবিয়ে খাওয়ার কারণে তা সরাসরি পাকস্থলীতে পৌঁছলে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তাই খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে চিবিয়ে খেতে হবে যেন অতি সহজে এবং স্বেচ্ছায় গলায় প্রবেশ করে। হাদীসে এসেছে-হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ছয়জন সাহাবী (রা.)-এর সাথে খানা খাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক এসে তাদের সাথে খেতে বসে দুই লোকমাতেই সব খানা খেয়ে ফেললো। অত:পর নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহর নামে শুরু করতো, তবে তোমাদের সকলের জন্যেই এই খাদ্য যথেষ্ট হতো।[৪৯]

খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে না খেলে পরিপাকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ এনজাইম নি:সৃত হতে পারে না। এতেপরিপাকজনিত শারীরিক সমস্যা যেমন: পেটফোলাভাব, পেটব্যথা, হজমজনিত সমস্যা, গ্যাসভাব ও কোষ্ঠ্যকাঠিন্যসহ নানাবিধ রোগ দেখা দিতে পারে। তবে তাড়াহুড়া করে খাওয়ার দীর্ঘ অভ্যাস থেকে সবচেয়ে

---

৪৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: এশার সালাত এবং রাতের খাবার একত্রিত হলে, খ. ২, পৃ. ১৭১, হাদীস নং- ৩৭৫৭

৪৭.শাশ্বতী মাথিন, *https://www.ntvbd.com/health.*“ভালোভাবে কেন খাবেন”? আপডেট: ২৯.০৯.২০১৬ (থেকে উদ্ধৃত)

৪৮. ফাওজিয়া ফারহাত অনীকা,*https://barta24.com/details.*“খাবার সঠিকভাবে চিবিয়ে খাওয়া হয় কি”? ০১.০৪.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

৪৯. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: আহারের পূর্বে ও পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুআ, খ. ২, পৃ. ৬৫০, হাদীস নং- ১৯৩

উদ্বেগজনক যে রোগ শরীরে বাসা বাঁধে তা হলো মেটাবলিক সিনড্রোম। মেটাবলিক সিনড্রোম এমন একটি শারীরিক সমস্যা যার মধ্যে উচ্চরক্তচাপ, স্থুলতা ও উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত। সবকিছু মিলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। ২০১৭ সালে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞান সমাবেশে স্পষ্ট জানানো হয়, ৫ বছর ধরে একটি গবেষণা এটা প্রমাণ করেছে যে, খাবার যদি না চিবিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া হয় তাহলে মেটাবলিক সিনড্রোম এবং স্থুলতার মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এই গবেষণায় দেখা গেছে, এই মেটাবলিক সিনড্রোমের প্রবণতা যারা তাড়াতাড়িখায় তাদের ক্ষেত্রে ১১.৬ শতাংশ। আর যারা স্বাভাবিকভাবে চিবিয়ে খায়, তাদের ক্ষেত্রে ৬.৫ শতাংশ।[৫০]

**হাত দিয়ে খাওয়া এবং আঙ্গুল ও প্লেট ভালোভাবে মুছে খাওয়া**

অনেকে হাতের বদলে চামচ দিয়ে খাওয়াকে স্মার্টনেসের অংশ মনে করে এবং বর্তমানে তথাকথিত কিছু ভদ্র সমাজে হাত দিয়ে খাওয়াটাকে পশ্চাৎপদআর চামুচ বা কাঠি দিয়ে খাওয়াকে আভিজাত্যের অংশ ভাবে। অথচ চামুচ দিয়ে খাওয়ার মধ্যে স্বার্থকতা ও আভিজাত্যের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে হাত দিয়েছেন সেই হাত ব্যবহার করে খাওয়ার মাঝেই প্রকৃত আভিজাত্য। হাদীসেও হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাত দিয়ে খাবারের মজাই অন্যরকম, যা চামুচ বা কাঠি দিয়ে খাওয়ার মধ্যে কোনভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।
হাদীসে এসেছে-

عَنْ كَعَبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَاكُلُ بِثَلْثٍ اَصَابِعَ وَ لاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقُهَا–

অর্থ: কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) তিন আংগুল দিয়ে খাবার খেতেন এবং আংগুল চাটার আগে রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করতেন না।[৫১]

হযরত আনাস (রা.) এ বিষয়ে নবী করীম (সা.) থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেন-

لاَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ الْبَرْكَةُ–

অর্থ: কোনো ব্যক্তি তার আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত রুমাল দ্বারা স্বীয় হাত পরিষ্কার করবে না। কারণ সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে।[৫২]

গবেষণায় জানা যায়, মানুষ খাওয়ার ইচ্ছা করার সাথে সাথে পিটুইটারি গ্লান্ড (pituitary gland) থেকে স্নায়ুবিক প্রভাব সমৃদ্ধ হজমকারী আদ্র পদার্থ আঙ্গুলের মাধ্যমে বের হয়ে সকল খাবারের সাথে মিশে যায়, যা অন্য সকল রোগ-জীবাণুকে নি:শেষ করে দেয়। আশ্চর্যজনক সাইকোলজি হলো, খাবারের স্বাদ যতই অনুভূত হয়, ক্ষুধা ততই বৃদ্ধি পেয়ে সমান গতিতে সেই আদ্র পদার্থ অধিক পরিমাণে বের হয়ে খাদ্যের সাথে সংযুক্ত হতে থাকে। আর হযমকারী সেই আদ্র পদার্থের প্রভাব আঠাযুক্ত পদার্থের উপর পড়ে। তাই হাত দিয়ে খাওয়ার ফলে আঙ্গুল থেকে নির্গত হযমকারী পদার্থ থালার মধ্যে খাবারের সাথে মিশে যায়, আর কিছু অংশ আঙ্গুলের সাথে মিশে থাকে। খাবার এবং আঙ্গুলের সাথে মিশ্রিত হযমকারী পদার্থ পাকস্থলীতে গিয়ে খাবারসমূহ অতি সহজে হযম হওয়ার কাজ করে। এতে শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বদ হযমের কারণে যেসব রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা থেকে খুব সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এছাড়াও উক্ত হযমকারী আদ্র পদার্থের কারণে ডায়াবেটিস রোগীর উপকার সাধিত হয় এবং দেহের ইনসুলিন হ্রাস পায় না। খাবারের পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া হলে চক্ষু, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীতে এর গভীর সুফল পাওয়া যায় এবং ইহা হৃদরোগ, পেটের পীড়া ও মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য খুবই উপকারী। আর এ সকল উপকার কেবল হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব, চামুচ বা কাঠি দিয়ে খাওয়ায় নয়। বাস্তবেও দেখা যায় খিচুরী, পায়েশ, ক্ষীর অথবা ভাত ইত্যাদিতে হাত বা আঙ্গুল লাগানো হলে অতি দ্রুত এতেপানি জমে যায় এবং অন্য যে সকল খাবারে হাত লাগানো হয়নি বা চামুচ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর চেয়ে তুলনামূলক এগুলোতেআগে পঁচন ধরে। এর একমাত্র কারণ হলো, খাবারে হাত বা আঙ্গুল লাগার কারণে উক্ত খাবারে হযমকারী আদ্র পদার্থ নির্গত হয়ে হযমের কাজ শুরু হয়ে যায়।

---

৫০. *http://www.bd-journal.com/health.*"খাবার চিবিয়ে না খেলে কি বিপদ হয়"? আপডেট: ০৯.০২.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)
৫১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: রুমাল দিয়ে হাত পরিষ্কার করা, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং- ৩৮৪৮
৫২. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খাওয়া, খ. ৬, পৃ. ১৩২, হাদীস নং- ৫২৯৬

আর আঙ্গুল চাটা মানুষের জন্মগত স্বভাব। প্রত্যেক শিশুই প্রকৃতিগতভাবে তাদের আঙ্গুল চেটে থাকে। তাই এমন স্বভাবজাত সুন্দর ও উত্তম অভ্যাসটি তথা সুন্নাতকে ভদ্রাতার দোহাই দিয়ে পরিত্যাগ করা মোটেই সমীচীন নয়। হাদীসে এসেছে– عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন ততক্ষণ তার হাত না মোছে, যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়।[৫৩]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلٰثَ وَ اَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَ قَالَ اَحَدُكُمْ لاَ يُدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খাওয়ার পর তাঁর হাতের তিনটি আংগুল চাটতেন এবং তিনি আমাদেরকে খাওয়ার পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ অবহিত নয় যে তার জন্য কোন খাদ্যবস্তুতে বরকত রাখা হয়েছে।[৫৪]

হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা.)-এর ছেলে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) তাঁর তিন আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন এবং হাত মুছে ফেলার পূর্বে তা চেটে খেতেন।[৫৫]

সাহাবায়ে কিরামগণ বলেন, নবী কারীম (সা.)-এর খাওয়ার পর প্লেটকে আঙ্গুল দিয়ে চেটে এতো বেশি পরিষ্কার করে খেতেন যে, অনেক প্লেটের মধ্যে তাঁর প্লেট কোনটি তা সহজেই সনাক্ত করা যেতো।[৫৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন খাদ্যে হাত রাখতেন, তখন আঙ্গুলের গোড়া পর্যন্ত খাদ্যের সাথে জড়িয়ে দিতেন না; বরং আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা ধরতেন।[৫৭]এতেঅন্যতম হিকমত হলো- সম্পূর্ণ আঙ্গুল খাবারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে আঙ্গুলের গোঁড়ায় ও দুই আঙ্গুলের মাঝখানে লেগে থাকা জীবাণু খাবারে মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।এছাড়া খাবারে সম্পূর্ণ আঙ্গুল ডুবিয়ে দিলে গোড়া পর্যন্ত তা চেটে খাওয়াও সম্ভব নয়। বস্তুত খাওয়ার সময় আঙ্গুল চাটাএবং খাওয়ার পর প্লেট চেটেখাওয়া শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে খাদ্যের এমন সব উপাদান থাকে, যা পূর্ণ খাবারেও থাকে না। খাবার প্লেটের তলানীতে ভিটামিন এবং প্লেটে লেগে থাকা খাবারের অংশে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে। আর খাবারের মধ্যে বিদ্যমান খনিজ লবণ তো শুধু সে অংশেই থাকে।সুতরাং হাত দিয়ে না খেলে, খাওয়াতে আঙ্গুল এবং খাওয়ার পর প্লেট না চাটলে অনেক উপকার থেকেই বঞ্চিত হতে হয়।[৫৮]

হাতে খাওয়ার বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কয়েকটি উপকারিতা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

**(ক) বদ হজম বা গ্যাস্ট্রিক থেকে মুক্তি:** আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বক একটি ইন্দ্রিয়। হাতের আঙ্গুলের ডগায় অনেক বেশি স্নায়ু থাকায় যে কোনো বস্তু স্পর্শের সাথে সাথে বুঝতে সাহায্য করে। তাই আমরা হাত দিয়ে খাবার স্পর্শকরার সাথে সাথে পাকস্থলি কাজ করার জন্য মস্তিষ্ক বার্তা পাঠায়। ফলে খাবার পাকস্থলিতে যাওয়ার আগেই পাকস্থলির কাজ শুরু হয়ে যায়। এতে খাবার তাড়াতাড়ি হজমে সাহায্য করে। ফলে বদ হজম বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সহজেই দূর হয়।

---

৫৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৫৫৯, হাদীস নং -৫৪৫৬

৫৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু পড়ে গেলে, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং- ৩৮৪৫

৫৫. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়,অনুচ্ছেদ: আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খাওয়া, খ. ৬, পৃ. ১৩২, হাদীস নং- ৫২৯২

৫৬. ডা. মোহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই, (অনূদিত ও সম্পাদিত: খাদিজা আখতার রেজায়ী), *সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান* আল কোরআন একাডেমী লন্ডন: এপ্রিল ২০০৬, খ. ১, পৃ. ৬৭,

৫৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬

**(খ) অধিক স্বাস্থ্যকর:** হাত দিয়ে খাওয়াকে অনেকেই অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস মনে করে। কিন্তু আসল ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। হাত দিয়ে খাবার ভক্ষণকারী তার প্রতিবেলায় খাওয়ার সময় হাত ধুয়ে নেয়। তাই চামচ ও চপস্টিকের তুলনায় হাত দিয়ে খাওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

**(গ) উপকারী ব্যাকটিরিয়া:** মানুষের হাতে বেশকিছু উপকারী ব্যাকটিরিয়া রয়েছে। পরিবেশের বেশকিছু ক্ষতিকারক অনুজীবীদের থেকে আমাদের রক্ষা করে এই হাতেরই উপকারী ব্যাকটিরিয়া। হাতে করে খাবার সময় এই ধরনের উপকারী ব্যাকটিরিয়াও খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে হজমে উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি মুখ, গলা এবং ইন্টেস্টাইনকে সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে হাত না ধুয়ে খাওয়া কিন্তু খুবই অস্বাস্থ্যকর।

**(ঘ) ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়:** চামচ দিয়ে সহজে ও দ্রুত খাওয়ারফলে রক্তের চিনির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি ও বৃদ্ধি পায়। ২০১২ সালে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব এন্ডোক্রাইনোলজিতে প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, যারা দ্রুত খাবার খায় তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি যারা আস্তে খায় তাদের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি। সুতরাং হাতে খেলে যেহেতু সময় বেশি লাগে, ইচ্ছা করলেও তাড়াহুড়া করে খাওয়া সম্ভব নয় এবং অল্প খাবার মুখে পোরা যায়। এতে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি কমায়। এছাড়া হাতে অল্প খেলেই পেট ভরার অনুভূতি হওয়ায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেশি খাওয়া সম্ভব হয় না।

**(ঙ) জিহবা রক্ষা:** হাত দিয়ে খেলে খাবার অত্যধিক গরম কিনা তা সহজে বোঝা যায়। এতে গরম খাবার না খাওয়ায় আমাদের জিহবা পুড়া যাওয়া থেকে অনেক সময় রক্ষা পায়। যা চামচের ক্ষেত্রে জানা সম্ভব নয়।

**(চ)** রক্ত চলাচল বৃদ্ধি: হাত দিয়ে খাবার খেলে অজান্তেই শরীর চর্চার কাজটিও হয়ে যায়। হাতের পাশাপাশি একাধিক পেশির সঞ্চালন হওয়ায় সারা শরীরে রক্তের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। এতে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে গিয়েপ্রতিটি অংশ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।[৫৯]

**হেলান বা টেক লাগিয়ে না খাওয়া**

আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে, খাওয়ার সময় যারা কারণে অকারণে কোনোকিছুতেহেলান দিয়ে থাকে। এভাবে খেতে হাদীসে নিষেধ এসেছে। হেলান দিয়ে খাবার খেলে পেট বড় হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। হাদীসে এসেছে – عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ اَكُلُ مُتَّكِئًا–

অর্থ: আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।[৬০] অন্য একটি বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا رُئِىَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কোনো সময় হেলান দিয়ে খাবার খেতে দেখা যায়নি।[৬১]

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন-

اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَ اٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ–

অর্থ: আমি আল্লাহর একজন গোলাম মাত্র। তাই এভাবে বসা আমার শোভা পায় যেভাবে একজন গোলাম (মনিবের সামনে) বসে। আর এমনভাবেই আমার খাবার খাওয়া উচিত যেমনভাবে একজন গোলামের তার মনিবের সামনে নত হয়ে খাবার খায়।[৬২]

---

৫৯. *https://m.daily-bangladesh.com/lifestyle.com.*"হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার উপকারিতা", আপডেট: ০৬.০৫.২০২১ (থেকে উদ্ধৃত)

৬০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: হেলান দিয়ে আহার করা, খ. ২, পৃ. ১৫৪৪, হাদীস নং -৫৩৯৮,

৬১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: হেলান দিয়ে খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং- ৩৭৭১

৬২. আল্লামা মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-হুসাইনী আয-যুবাইদী, *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন*, লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১৯৭১, খ. ৮, পৃ. ২৩২

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই বিনয় ও দাসত্ব এমন ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে যিনি বিশ্ব জাহানের সর্দার, সৃষ্টির মূল, যার কারণে বিশ্ব জাহান অস্তিত্ব লাভ করেছে, যার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা হলো, আমরা সবসময় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে লিপ্ত থাকি। অসুস্থতা বা কোনো অপারগতার কারণে কখনো টেক লাগিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে কোনো নিষেধ নেই। কিন্তু একজন সুস্থ, সবল ও সামর্থ্যবান লোকের জন্য কখনই এভাবে খাওয়া উচিত নয়। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ভোগ করার সময় বান্দা টেক লাগিয়ে বসবে, এটা তার দাসত্বের পরিপন্থী। তাছাড়া হেলান বা ঠেস দিয়ে খাদ্য গ্রহণের মধ্যে তিনটি অপকারিতা রয়েছে-

**(ক)** হেলান দিয়ে খেলে খাবার সঠিকভাবে চিবানো যায় না। এতেযে পরিমাণ লালা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কথা তা মিশ্রণ না হওয়ায় হজম প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**(খ)** হেলান দিয়ে খেতে বসলে পাকস্থলী প্রশস্ত হয়ে যাওয়া। ফলে পেট ভরতে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি খাবার খেতে হয়। আর এই অপ্রয়োজনীয় খাবারহজম প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

**(গ)** হেলান দিয়ে খাওয়ার ফলে অন্ত্র ও যকৃতের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

**উপুড় হয়ে না খাওয়া**

ক্ষুধা নিবারণেমানব জীবনে খাওয়া হলো একটি আনন্দ ও আরামের বিষয়। তাই খাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। পশুর মতো যেভাবে ইচ্ছা খাবার গ্রহণ করা ইসলাম সমর্থন করে না। খাওয়া যেন তৃপ্তির সাথে হয় এবং উক্ত খাবার যাতে শরীরের উপকার বয়ে আনে রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর দিয়েচেন। ফলে খাবার গ্রহণের প্রতিটি ধাপেই তাঁর বাণী রয়েছে। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত অনুসরণীয় নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ না করে কেউ যদি স্বেচ্ছাচারিতার সাথে খাবার গ্রহণ করে তাহলে তা কখনো ফলদায়ক হবে না; বরং উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই সাধন হবে বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এমনি একটি নির্দেশনা হলো উপুর হয়ে খাদ্য গ্রহণ না করা। হাদীসে এসেছে عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلَ وَ هُوَ مُنْبَطِحٌ عَلٰى بَطْنِهِ–

অর্থ: সালিম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।...রাসূলুল্লাহ (সা.) উপুড় হয়ে শুয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন।[৬৩]

বাহ্যত, নবী কারীম (সা.)-এর উক্ত বাণীর সাথে দ্বীনী আকীদা, ইসলামী নীতিমালা এবং ধর্মীয় বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা একটা নি:সন্দেহে চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপার এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য উক্ত নির্দেশনা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী। কেননা উপুর হয়ে শুয়ে খাওয়া শুধু স্বাস্থ্যগত ও ভদ্রতার পরিপন্থী নয়; বরং এটা পশুর স্বভাবও বটে। উপুর হয়ে কেউই তৃপ্তিসহকারে এবং চাহিদা মতো খেতে পারবে না। উপুর হয়ে শোয়ার কারণে পাকস্থলীতে চাপ পড়ায় খাবার ভেতরে প্রবেশ করবে না; বরং খাবার বের হয়ে আসবে। আর অস্বাভাবিক অবস্থায় যত ভালো ও উন্নত মানের খাবারই গ্রহণ করা হোক না কেন তা যে হজমশক্তি ও পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর, তা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত।

**খাওয়ার সময় মাঝেমধ্যে আনন্দদায়ক কথাবার্তা বলা**

অনেকে মনে করে খাওয়ার সময় কোনো কথা বলা জায়েই নেই; বরং কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে ওঠাই খাওয়ার আদব। এটি একটি ভুল ধারণা। শরীআতে এর কোনো প্রমাণ নেই। আহারের সময় কথা বলা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন, আহারের মাঝে কোনো গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা না হওয়া চাই। সাধারণ কথা হলে ক্ষতি নেই। কেননা খাবারেরও হক আছে। কারণ গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ কথা শুরু হলে খাবারের পরিবর্তে কথার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হতে পারে। কিছুটা আনন্দদায়ক ও সামান্য বিনোদনমূলক কিছু বলা যেতে পারে।[৬৪]

---

৬৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: ঐ দস্তরখানে বসা, যাতে কোনো নিষিদ্ধ বস্তু থাকে, খ. ২, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং- ৩৭৭৫

৬৪. মুফতী তাকী উসমানী, (অনুবাদ: মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন বক্সী), *খাওয়ার আদব*, ঢাকা: বাংলাবাজার, এদারায়ে কুরআন, তা.বি. অনুচ্ছেদ: খাওয়ার সময় কথা বলা, পৃ. ৫৭

আমাদের পাকস্থলীর যত সমস্যা যেমন জ্বালা-পোড়া, মোচড়ানো, আমাশয়, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি সাধারণত খাদ্য স্বল্পতা, অতিভোজন, অসতর্কভাবে খাদ্য গ্রহণ ও সমতা না রেখে খাওয়ার কারণেই হয়ে থাকে। কিন্তু আহার গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু লোককে প্রায়ই পেটের পীড়ায় ভুগতে দেখা যায়। পাকস্থলী সঠিকভাবে কাজ না করার ক্ষেত্রে যদি মৌলিক কোনো কারণ না পাওয়া যায়, তাহলে মনে করতে হবে, এর পেছনে নিশ্চয় মানসিক কিছু বিষয় কাজ করছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসা প্রদান ও খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করার পরিবর্তে মানসিক তৎপরতা ও মস্তিষ্কের উত্তেজনাকে সমান্তরাল পর্যায়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় তেমন কোনো উপকার আসবে না।

আমাদের সমাজে সাধারণত দুই শ্রেণির লোক পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক হলো কঠোর মনের অধিকারী। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলোদুর্বল চিত্তের অধিকারী।প্রখ্যাত ইউরোপিয়ান ডাক্তার কি ফন একজন এক্সরে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন- এক্সেরের মাধ্যমে আমি পাকস্থলী, কিডনী এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, দু:খ-কষ্ট ও ক্রোধের অবস্থায় হজম শক্তির ওপর এমন কিছু স্নায়ুবিক প্রভাব পড়ে যদ্বারা তা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। আর আনন্দ, উৎফুল্লতা ও খুশীর প্রভাবে পাকস্থলীর মাংসপেশী ও স্নায়ুসমূহ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান অনুযায়ী যারা খাবার গ্রহণের সময় দ:খিত ও বিষণ্নতার কথাবার্তা বলে এবং ক্রোধের শিকার হয়, এমন লোক শীঘ্রই পাকস্থলীর আলসার এবং অন্ত্র শীর্ণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে। তাই খাবার গ্রহণের উপযুক্ততা বর্ণনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিমত হলো, মন চাইলেই যেমন খাবার গ্রহণ ঠিক না, তেমনি ক্ষুধা লাগলেই খাবার গ্রহণ করলে ঐ খাবার যথাযথ উপকারিতা বয়ে নাও আনতে পারে। সুতরাং মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে যখন খাবার গ্রহণের যোগ্যতা থাকে, তখনই খাবার খাওয়া উচিত। হেকীম জালিনুস বলেন, আনন্দ ও খুশি খাদ্যকে হজম এবং শরীরের অঙ্গ গঠনে সহায়তা করে। আর দু:খ-দুর্দশা খাবারকে শরীরের অঙ্গ গঠনে অসহযোগিতা করে।

ডা. কিনান ইউরোপের একজন এক্সরে বিশেষজ্ঞ। এক্সরে মেশিনের সাহয্যে তিনি পাকস্থলী, যকৃৎ, নাড়িভুঁড়ী ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন, রোগ ও শোক-দু:খের সময় পাকস্থলী ও অবশিষ্ট যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরে চাপ পড়ে। ফলে মানুষ অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত একটি পাকস্থলীতে ক্লান্তির সময় খাদ্য গ্রহণ করলে, তা জীবননাশক বিষের ন্যায় ক্রিয়া করবে। তাই খাদ্য গ্রহণ করার সময় হাসি-খুশি ও উৎফল্ল থাকা উচিত।

নিউইয়র্কের ডা. জি. বি. রাইস তার এক গ্রন্থে একজন রোগীর আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন- তার রোগ হলোপাকস্থলীতে সর্বদা একটা না একটা অসুবিধা লেগেই থাকে। তাই তিনি অত্যাধুনিক এক্সরে এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা তাকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো রোগ বা কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। রোগী খাদ্য বন্ধ করে দিল, তাতেও কোন কাজ হলো না। সর্বদা বমি করতে লাগল এবং দুর্বল হতে থাকল। রোগের কোন উপশম হলোনা। তবে সৌভাগ্যক্রমে ডা. সাহেব শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না; তিনি একজন মনোবিজ্ঞানীও ছিলেন। তাই রোগীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কয়েক মিনিট প্রশ্ন করে তিনি রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করে ফেললেন। তার স্বামী ছিল একজন পেশাদার জল্লাদ। সে গুরুতর অপরাধীদের জবাই করে হত্যা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এসব তার একটুও পছন্দ হতো না। এভাবে লোকদের জবাই করার কারণে মহিলার মনে খুবই আঘাত লাগত। ইতোমধ্যে সে তার স্বামীকে কয়েকজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করতে দেখে অন্তরে আরও বেশি আঘাত পেল। এতে তার মন আরো খারাপ হয়ে গেল। অবশেষে সমস্ত মানসিক চাপ তার পাকস্থলীর ওপর পড়ায় সে পাকস্থলীর দুর্বলতাজনিত রোগে ভুগতে থাকল। অবশেষে ডা. সাহেবের পরামর্শে যখন তার স্বামীকে জল্লাদির কাজ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো, তখন সে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠল।

দেহ বিশেষজ্ঞ বলেন, খাদ্য পাকস্থলীতে জমা হওয়ার সাথে সাথে এর বিপাক কর্মে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত সেখানে জমা হয়। রক্ত সেখানে এক প্রকার আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। সে আর্দ্রতাই খাদ্য থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে রক্ত তৈরী করার উপযোগী করেঅপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নাড়ীভুঁড়ির দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং পাকস্থলীতে খাদ্য জমা হওয়ার পর পর্যাপ্ত রক্ত জমা হওয়ার সময় কেউ যদি বিষন্ন ব্যথিত হয়, দু:খ-কষ্ট ও আঘাত পায়, তখন রক্তের স্বাভাবিত গতি

পাকস্থলীর দিকে ধাবিত না হয়ে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়। কারণ, উক্ত অবস্থানগুলো মস্তিষ্কের কাজ এবং তা সংগঠিত হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তের প্রয়োজন হয়। এমন দোটানা অবস্থায়সেখানে পর্যাপ্ত রক্ত আসে না এবং সামান্য রক্ত আসলেও পর্যাপ্ত আর্দ্রতা সৃষ্টি না হওয়ায় পাকস্থলী সঠিকভাবে পরিপাকের সাথে খাদ্য হজমে সক্ষম হয় না।

আমরা জানি, চিকিৎকগণ খাওয়ার পর গোসল করার অনুমতি দেয়না। কারণ, গোসলের সময় চামড়া শীতল হওয়ায় তা গরম করার জন্য রক্ত সেদিকে চলে যায়। তদ্রূপ খাওয়ার পর পরই কোন চিন্তামূলক কাজ করতেও নিষেধ করা হয়। কারণ, রক্ত তখন পাকস্থলীতে যাওয়ার পরিবর্তে মস্তিষ্কে যায়। অনুরূপভাবে খাদ্যের পর ব্যায়াম করাকেও ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, এ ক্ষেত্রেও রক্ত মূল কাজ বাদ দিয়ে অন্য দিকে ধাবিত হয়। তাই খাদ্য গ্রহণের সময় দৈহিক ও মানসিক স্থিরতা খুবই জরুরী, পাকস্থলী যেন উত্তম পন্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে তার কাজ সূচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। দৈহিক ও বাহ্যিক কারণে যেমন পাকস্থলী নষ্ট হয়, ঠিক তেমনি মানসিক বিড়ম্বনা এবং জটিলতাও এর ওপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করে থাকে।এমনকি খাদ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর অন্তত আধঘন্টা কোন চিন্তামূলক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

তাই খাওয়ার সময় অনর্থক তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া এবং ঘৃণার উদ্রেক হয় এমন কথা না বলা। কাউকে তিরষ্কার বা লজ্জা না দেয়া। মর্মান্তিক ও বিব্রতকর ঘটনা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা। খাওয়ার সময় প্রথমত কথা খুব কম বলা, যদি বলতেই হয় তবে এমনভাবে বলা যেন তা সকলের সন্তুষ্টিমূলক হয়। যথাসম্ভব নি:সঙ্গ ও নিরানন্দ হতে বিরত থেকে হাসি-খুশি থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা।[৬৫]

মনে রাখতে হবে, মানসিক রোগের চিকিৎসা মানসিকভাবেই করতে হয়। এসব রোগের চিকিৎসা ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে করার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করা মোটেও সম্ভব নয়।

**খাদ্যদ্রব্যও পানীয় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা**

বর্তমানে খোলা খাবারকেঅস্বাস্থ্যকর এবং অনিরাপদ খাবার বলা হয়। এটা যেমন সুস্বাস্থ্য রক্ষার বিপরীত তেমনি হুমকি স্বরূপ।তাই স্বাস্থ্য সচেতন একজন মানুষ কখনই খোলা খাবার খেতে আগ্রহী হবে না, তা যতই সুস্বাদু ও দামী খাবার হোক না কেন। কারণ খাদ্যদ্রব্যের পাত্র ঢেকে না রাখলে তাতে যে শুধু ধুলা-বালি পড়ে তা নয়, এতে খুব সহজেইরাত্রে ইঁদুর, সাপ, পোকা-মাকড় ও বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ পড়তে পারে এবং কুকুর ও বিড়াল মুখ লাগাতে পারে।ফলে অজান্তেই এদের লালা খাবারকে বিষাক্ত করে তুলে। যা খেলে অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি জীবন নাশেরও সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে খোলা খাবারে মাছি বসার দৃশ্যটি আমরা সকলেই দেখতে পাই। আর মাছি এমন সব নোংরা জায়গায় চলাচল করে, যেখান থেকে খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু বয়ে নিয়ে এসে আমাদের খাবারে ছড়িয়ে দেয়। তাইরাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। হাদীসে এসেছে, হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন-

اَطْفِؤُا الْمَصَابِيْحَ اِذَا رَقَدْتُمْ وَ غَلِّقُوا الْاَبْوَابَ وَ اَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ، وَ خَمِّرُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ– وَ اَحْسِبُهُ قَالَ وَ لَوْ بِعُوْدٍ تَعْرُضُه عَلَيْهِ–

অর্থ: তোমরা যখন ঘুমাবে তখন চেরাগ নিভিয়ে দেবে, দরজা বন্ধ করে ফেলবে, মশকের মুখ বন্ধ করে দেবে, খাবার ও পানীয় দ্রব্যাদি ঢেকে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন, অন্তত একটি কাঠ আড়াআড়িভাবে পাত্রের উপর স্থাপন করে হলেও।[৬৬]

সাধারণত বাজারের খাবার খোলামেলা থাকে। তাই বলা হয় –اَلْاَكْلُ فِى السُّوْقِ دَنَاءَةُ

অর্থ: বাজারে কোনো কিছু খাওয়া নিকৃষ্ট কাজ।

তাছাড়া বাজারে চলাফেরা অবস্থায় খাওয়া ভদ্রতা ও সভ্যতার খেলাপ এবং স্বাস্থ্য রক্ষা বিধানের পরিপন্থী।

---

৬৫. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২

৬৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: পাত্রসমূহকে ঢেকে রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬০১, হাদীস নং -৫৬২৪

**দুপুরে খাওয়ার পর কায়লুলা বা অল্প বিশ্রাম করা**

বহু গ্রন্থের লেখক ও বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ড. জিয়ালক আর্স্টন লেখেন- যদি রাষ্ট্র আমার নিয়ন্ত্রাধীন থাকতো, তবে আমি সমস্ত কারখানা, ফ্যাক্টরী, বাজার ও দপ্তর বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে কায়লুলা (দুপুরের খাওয়ার পর অল্প সময় বিশ্রাম) করতে নির্দেশ দিতাম। কারণ এমন অভ্যাসে আমাদের রোগীদের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেত। সমস্ত প্রাণী মানসিক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচতে পারতো।

উল্লেখ্য, অনেকে কায়লুলার নামে দুপুরে খাওয়ার পর লম্বা সময় নিয়ে ঘুমিয়ে যায়। এমনটা করা ঠিক নয়। কারণ কায়লুলা হতে হবে স্বল্প সময়ের জন্য। এটা যদি দীর্ঘ সময় হয়, তবে তাউপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশি হবে এবং অতিরিক্ত রোগ-ব্যাধির কারণ হবে। নিয়ম মেনে কায়লুলা করা শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী নয়; বরং রাতের বেলা আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত থাকার ঘুমের ঘাটতি পূরণ করতেও সহায়ক হয়।

হাদীসে এসেছে– عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ نَوْمُ اَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقٌ وَ اَوْسَطِهِ خُلُقٌ وَ اٰخِرُهُ حُمُقٌ

অর্থ: খাওয়াত ইবন যুবায়র বলেন, দিনে প্রথমভাগে শয়ন করা নির্বুদ্ধিতা, মধ্যভাগে শয়ন করা স্বভাবজাত এবং শেষভাগে শয়ন করা অর্বাচীনতা।[৬৭]

অন্য হাদীসে এসেছে- সায়িব ইবন ইয়াযীদ বলেন, হযরত উমর (রা.) দ্বিপ্রহরে বা দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে আমাদের প্বার্শ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন: ওঠ এবং কিছু সময় আরাম করো।[৬৮]
আরেকটি হাদীসে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِسْتَعِيْنُوْا عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ–

অর্থ: রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের সুবিধার্থে দিনের বেলা কিছু সময় কায়লুলা (আরাম) করবে।[৬৯]

**রাত্রে খাওয়ার পর সামান্য হাঁটা**

মানুষ সারাদিনের কাজ শেষ করে রাত্রে যখন ঘরে প্রত্যাবর্তন করে, তখন খাওয়ার পরপরই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যেতে চায়।কিন্তু শরীর শয়ন করার সাথে সাথে পাকস্থলীও শয়ন তথা বিশ্রাম চায় এবং রাত্রে দিনের ন্যায় কাজ-কর্মে তৎপর থাকে না। অথচ রাতে খাওয়ার পর সঠিক গতিতে হজমের জন্যপাকস্থলীর কর্ম-তৎপরতা খুবই প্রয়োজন।জীব ও দেহ বিজ্ঞানীগণবলেন, রাতে খাওয়ার পর শরীরের কর্ম তৎপরতা অত্যন্ত জরুরী। কারণ রাতে খাওয়ার পর সামান্য না হেঁটে সাথে সাথেই ঘুমিয়ে গেলে খাবার হজম হওয়ার পরিবর্তে তা পাকাশয়ে জমাটবদ্ধ থেকে পঁচে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে পরিণত হয়। যে খাবার নিয়মতান্ত্রিকভাবে হজম হয়ে শরীর সুস্থ রাখার কাজে সহায়ক হওয়ার কথা ছিল, সে খাবারই অনিয়ম ও অসাবধানতার জন্য সুগার, হার্টের রোগ, পাকস্থলীর রোগ ও প্যারালাইসিসের মতো কঠিন রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) খাওয়ার পরপরই শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন – ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أ أن يمشي بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوة

অর্থ: আর এজন্যই চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আগ্রহী সে যেন রাত্রে আহারের পর অন্তত একশত কদম হাঁটে।[৭০]

৬৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, (অনুবাদ: আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৮ (চতুর্থ সংস্করণ), অনুচ্ছেদ: শেষ প্রহরে নিদ্রা, পৃ. ৫৪৮, হাদীস নং- ১২৫৯
৬৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: কায়লুলা বা দুপুরে আহারোত্তর বিশ্রাম, পৃ. ৫৪৭, হাদীস নং- ১২৫৬
৬৯. আবু মুহাম্মদ আবদুল হক ইবন আবদুর রহমান, *কিতাবুত তাহজ্জুদ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ১৯১, হাদীস নং- ৯৬৫
৭০. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *আত-তিব্বুন নববী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কলম, তা.বি. পৃ. ১৫২

**খাওয়ার পর খিলাল করা**

আধুনিক সভ্য সমাজ, হোটেল, ঘর ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাওয়ার পর অতি যত্ন সহকারে খিলাল সরবরাহ করা হয়। মূলত এটা খাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি সুন্নাত বা তরীকা। খাওয়ার পর দাঁত ও মাড়ীর ফাঁকে সূক্ষ্ম খাদ্য কণা আটকে থাকে। যত্ন সহকারে খিলাল না করলে তা আঁটকে থেকে প্রথমে পঁচন শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়েপ্লাজমা দেখা দেয়। এভাবে মাড়ী ফোলে দাঁত গোশত থেকে ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে পরিশেষে অকালে দাঁত পড়ে যায়। সুতরাং খাওয়ার পর খাদ্যকণা খিলাল করে পরিষ্কার না করলে পাইওরিয়া বা মাসখেরিয়ার ন্যায় কঠিন রোগ দেখা দেয়। অসাবধানতা বশত মাড়ীর পুঁজ যখন লালার সাথে পাকস্থলীতে চলে যায়, তখন কঠিন রোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে আলসার ও পাকস্থলীতে এসিড সৃষ্টি হওয়ায় মারাত্মক বিপদ দেখা দেয়।

ফিকাহ বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- যেসব খাদ্যকণা খিলাল ব্যতীত বের হয়,তা গিলে ফেলা শ্রেয়। আর যা খিলাল করে বের করা হয় তা ফেলে দেয়া উচিত। কারণ খিলাল ব্যতীত যে খাদ্য কণা বের হয়, তা অন্যান্য খাদ্য বস্তুর ন্যায়। সুতরাং তা খাওয়া প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিকারক নয়। তবে খিলাল দ্বারা যা বের করা হয়, তা গিলে ফেলা ঠিক নয়। কারণ সতর্কের বিষয় হচ্ছে অনেক সময় দাঁত ও মাড়ীর ফাঁকে পুঁজ বা জীবাণু থাকে।সুতরাং এসব কণার সাথে পুঁজ বা জীবাণু মিশে যদি পেটের ভেতরে চলে যায়, তবে তা মারাত্মক ক্ষতিসাধন করবে।[৭১]

**প্লেটের মাঝখান থেকে না খাওয়া**

মুসলমানের প্রতিটি কাজ যেন সুচারু ও সুপিনুনভাবে সম্পন্ন হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মতদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। তাই খাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা সম্বলিত সৌন্দর্যের ছোঁয়া। মানুষ যেন পশুর মতো উপস্থাপিত খাবার যত্রতত্র না খায়, বরং প্লেটে খাবার নিজের পাশ থেকে খায় এ বিষয়েও হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কারণ নিজের পাশ থেকে না নিয়ে যদি খাবার মাঝখান থেকে নেয়, তাহলে খাদ্যের সৌন্দর্যতা হারিয়ে যাওয়ায় এক পর্যায়ে খাবারের প্রতি অনীহা এসে যেতে পারে। বিশেষ করে একই প্লেটে যখনএক সাথে কয়েকজন খেতে বসে এ বিষয়টির প্রতি আরো বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। কেননা, কয়েকজন এক সাথে খাওয়ার সময় যদি সবাই প্লেটের মাঝখান থেকে খাওয়া শুরু করে, তাহলে নি:সন্দেহে এটা দৃষ্টিকটু এবং খাবারের প্রতি ঘৃণা চলে আসবে। এমনও হতে পারে, মাঝখান থেকে খাওয়া আরম্ভ করলে একপর্যায়ে দেখা যাবে তাড়াহুড়া করে খাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং একসাথে খাওয়ার কারণে পরস্পর ভালোবাসা তৈরি হওয়ার যে উদ্দেশ্য ছিল এর উল্টো বৈরিতা সৃষ্টি হবে। হাদীসে এসেছে-

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَاْكُلُ مِنْ اَعْلَى الصَّحْفَةِ وَ لٰكِنْ يَّاْكُلُ مِنْ اَسْفَلِهَا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ اَعْلَاهَا–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খাবার খায়, তখন সে যেন পাত্রের মাঝখান থেকে খাবার না নেয়; বরং সে যেন পাত্রের এক পাশ হতে (যা তার দিকে থাকে) নিয়ে খায়। কেননা, খাদ্যের বরকত উপর থেকে নিচের দিকে এসে থাকে।[৭২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَصْعَةٌ يَّحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُّقَالُ لَهَا الْغَرَّدُ– فَلَمَّا اَضْحَوْا وَ سَجَدُوا الضُّحٰى اُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِىْ وَ قَدْ ثُرِدَ فِيْهَا فَالْتَقَوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى جَعَلَنِىْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَ لَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُوْا مِنْ حَوَالِيْهَا وَ دَعُوْا ذِرْوَتِهَا يُبَارَكُ فِيْهَا–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন বুশর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.)-এর নিকট একটি কড়াই ছিল, যা চার ব্যক্তি ধরে ওঠাতো এবং এর নাম ছিল 'গাররা'। একদা সাহাবীগণ যখন ইশরাকের সালাত আদায় শেষ করেন, তখন ঐ

৭১. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৪, ১১৫

৭২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্য খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং- ৩৭৭২

কড়াই আনা হয়, যাতে ছারীদ ছিল। সাহাবীগণ উক্ত পাত্রের নিকট জমায়েত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দুই হাঁটুর ওপরে বসেন। তখন জনৈক বেদুইন প্রশ্ন করে, এ কোন ধরনের বসা? তখন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: মহান আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহশীল বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে দর্পী-অহঙ্কারী করেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা এর পাশ থেকে খাও এবং এর মাঝখান ছেড়ে রাখো, তাহলে এতে বরকত হবে।[৭৩]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوْا مِنْ حَافَتِهِ وَ ذَرُوْا وَسَطَهُ فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِىْ وَسَطِهِ–

অর্থ: যখন খাদ্যদ্রব্য রাখা হয়, তখন তার চারপাশ থেকে খাও এবং মধ্যভাগ রেখে দাও। কারণ এর মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়।[৭৪]

**পরিমিত বা অল্প খাবার গ্রহণ করা**

সুস্থ সবল শরীরে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ও অপচয় করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের ৮০ শতাংশ রোগব্যাধি খাবারের কারণেই হয়ে থাকে। অপরিমিত খাবারই মানুষকে দিন দিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

খাদ্য মানব দেহের জন্য এমন এক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, যা ব্যতীত মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা যা কিছু আহার করি তা এমনিতেই হজম হয়ে যায় না, বরং এটাকে হজম করে শরীরের উপযোগী করতে যথেষ্ট পরিমাণ দৈহিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। তাই খাদ্য দেহের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের বেশি গ্রহণ করলে বা খাদ্য নির্বাচন ও বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি না দিলে উক্ত খাবারই দেহকে দুর্বল করে তুলে এবং দেহের শত্রুতে পরিণত হয়। মানুষ যত রোগে আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে অধিকাংশই খাবারের আধিক্য, বিশৃঙ্খলা, বার বার খাওয়া এবং হজম হওয়ার পূর্বেই পুনরায় খাওয়া এই সব কিছুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই একজন মানুষ সুস্থ থাকার জন্য কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে তা হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلَاثَةِ، وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِى الاَرْبَعَةِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।[৭৫]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَاْكُلُ حَتّٰى يُؤْتٰى بِمِسْكِيْنٍ يَاْكُلُ مَعَهُ فَاَدْخَلْتُ رَجُلاً يَاْكُلُ مَعَهُ فَاَكَلَ كَثِيْرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلُ هٰذَا عَلَىَّ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ، وَ الْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ–

অর্থ: নাফি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন মিসকীনকে ডেকে না আনা হতো। একদা আমি তাঁর সঙ্গে বসে আহার করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে নিয়ে আসলাম। লোকটি খুব বেশি আহার করলো। তিনি বললেন: হে নাফি! তুমি এ ধরনের (অধিক আহারকারী) লোককে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, মুমিন ব্যক্তি এক পেটে খায়। আর কাফের ব্যক্তি সাত পেটে খায়।[৭৬]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَاْكُلُ اَكْلاً كَثِيْرًا فَاَسْلَمَ فَكَانَ يَاْكُلُ اَكْلاً قَلِيْلاً، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ، وَ الْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ–

---

৭৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্য খাওয়া, হাদীস নং- ৩৭৭৩
৭৪. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: সারীদ-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষেধ, খ. ৪, পৃ. ১৭, হাদীস নং- ৩২৭৭
৭৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, খ. ২, পৃ. ১৫৪৩, হাদীস নং- ৫৩৯২
৭৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে খায়, খ. ২, পৃ. ১৫৪৩-১৫৪৪, হাদীস নং- ৫৩৯৩

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে আহার করতো। লোকটি মুসলমান হলে স্বল্পাহার করতে লাগল। বিষয়টি নবী কারীম (সা.)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি ইরশাদ করেন: মুমিন এক পেটে আহার করে, আর কাফের আহার করে সাত পেটে।[৭৭]

মূল ঘটনাটি হলো-একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এক কাফের মেহমান হলো। তাকে একটি বকরীর দুধ দেয়া হলে সে তা পান করে নেয়। অত:পর আরেকটি বকরীর দুধ দেয়া হলে তাও সে পান করে ফেললো। এভাবে তিন, চার এমনকি সাতটি বকরীর দুধ শেষ করে ফেললো। পরের দিন সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে এক বকরীর পর দ্বিতীয় বকরীর দুধ দেয়া হলে সবটুকু পান করতে পারল না। এসময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এ উক্তিটি করেছেন।[৭৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) অল্প খাওয়াকে মুমিন ও মুসলমানের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে পেটুক ও বেশি খাওয়াকে কাফেরের লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। জন্মগতভাবে কারো খাদ্য কম-বেশি লাগতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের খাওয়া কম হওয়া চাই। এতে শারীরিক সুস্থতা, অন্তরের পবিত্রতা এবং ঈমানী দৃঢ়তা হাসিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও সবসময় অল্প আহার করতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعُوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّكُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَ لَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক দল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে ছিল একটি ভুনা বকরী। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকলো। তিনি খেতে অস্বীকার করে বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোনদিন যবের রুটিও পেট ভরে খাননি।[৭৯]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) মদীনায় আসার পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা একাধারে তিন রাত গমের রুটি পেট ভরে খাননি।[৮০]

হযরত মাসরুক (রা.) বর্ণনা করেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট গমন করলে তিনি আমার জন্য খাবার এনে বলতে লাগলেন, আমি যখনই তৃপ্তি সহকারে খাবার খাই তখনই আমার কান্না এসে যায় এবং আমি কাঁদতে থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরয করলাম কেন?তিনি বললেন, আমার ঐ সময়ের কথা মনে পড়ে যায়– وَ اللّٰهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَ لَا لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ

অর্থ: কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো দিনই দুই বেলা রুটি এবং গোশত তৃপ্তি সহকারে খাননি।[৮১]

হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে বৎস! যখন পেট ভরা থাকে তখন খেয়ো না। পেট ভরা অবস্থায় খাওয়ার চেয়ে কুকুরকে দিয়ে দেয়া উত্তম। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের সর্বপ্রথম যে বিদআতের প্রচলন হয়েছে, তাহলো উদরপূর্তি করে খানা খাওয়া।[৮২]

---

৭৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে খায়, খ. ২, পৃ. ১৫৪৪, হাদীস নং- ৫৩৯৭

৭৮. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্য, অনুচ্ছেদ: মুমিন খায় এক আতে,খ. ২, পৃ. ১১, হাদীস নং- ১৮১৯

৭৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: নবী কারীম (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন, খ. ২, পৃ. ১৫৪৮,হাদীস নং- ৫৪১৪

৮০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: নবী কারীম (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন, খ. ২, পৃ. ১৫৪৯, হাদীস নং- ৫৪১৬

৮১. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রুটির বর্ণনা, খ. ২, পৃ. ৬৪৩, হাদীস নং- ১৪৮

৮২. মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী, (অনুবাদ: মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ), *ফাযায়েলে সাদাকাত*, ঢাকা: বাংলাবাজার, দারুল কিতাব, সেপ্টেম্বর ২০০৩, খ. ২, পৃ. ১৬৩, ২৩০

আর হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন- মুসলমানের দৃষ্টান্ত হলো বকরির বাচ্চার মতো, যার জন্য এক মুষ্ঠি পুরাতন খেজুর, এক মুষ্ঠি ছাতু এবং এক ঢোক পানিই যথেষ্ট।আর মুনাফিকের উদাহরণ হলো হিংস্র জন্তুর মতো, সামনে যা পেল গপাগপ ও গটগট করে সবই খেয়ে ও পান করে ফেলল। না নিজের প্রতিবেশির প্রতি খেয়াল করলো, আর না অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিল।[৮৩] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِنَّ اَطْوَلَكُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِىْ دَارِ الدُّنْيَا–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত।... রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: নিশ্চয় পার্থিব জীবনে ভুড়িভোজকারীগণ কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত হবে।[৮৪]

হাদীসে এসেছে- মিকদাম ইবন মাদী কারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে ততটুকু খাদ্য কোনো ব্যক্তির জন্য দূষনীয় নয়। যতটুকু আহার করলে মেরুদন্ড সোজা রাখা যায়, ততটুকু খাদ্যই কোনো ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তির ওপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তারপেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[৮৫]

পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা হলো, কোন বেলাই সাধারণ খাবার খেতে রাজি নই। বরং সকাল, দুপুর ও রাত্র তথা সব সময়ইমাছ, গোশত বা উন্নত মানের খাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকি। আর দু' জাহানের বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন জীবন-যাপন করেছেন যে কোনোদিনও দুই বেলা তৃপ্তি সহকারে গোশত ও রুটি আহার করেননি।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) দুআ করতেন–اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮৬]

বাদশাহ হারুনুর রশীদ একবার চারজন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে একত্রিত করলেন। তন্মধ্যে একজন ভারতীয়, দ্বিতীয়জন রোমীয় (ইংরেজ), তৃতীয়জন ইরাকী এবং চতুর্থজন সওয়াদী। তারপর চারজনকেই সম্বোধন করে বলেন, আপনারা এমন একটি ঔষধের নাম বলুন, যা কোনোকিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়। ভারতীয় ডাক্তার বললো, আমার মতে সেই জিনিস হলো: হালীলাহ সিয়াহ বা কাল হালীলাহ। ইরাকী ডাক্তার বললো, আমার মতে সেই জিনিস হলো: হুববুর রালাদ। রোমীয় ডযাক্তার বলল, এমন ঔষধ যা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয় তা হলো গরম পানি। সবশেষে সওয়াদী ডাক্তার বললো, উপরিউক্ত সকল মন্তব্যই ভুল। কেননা কাল হালীলাহ পাকস্থলীতে ক্ষতি করে, আর গরম পানি পাকস্থলীকে শিথিল করে দেয়। তারপর সকল হাকীম মিলে বললো, এবার তাহলে আপনিই বলুন সেই ঔষুধটা কী, যা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়? তখন সওয়াদী হাকীম বললো: তাহলো অধিক আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আহার না করা এবং কিছু চাহিদা থাকা অবস্থায় খাওয়া ত্যাগ করা। তার একথা সকল ডাক্তারই একমত পোষণ করে।[৮৭]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

অর্থ: তোমরা খাও এবং পান করো, তবে অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।[৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে –عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ مِنَ السَّرَفِ اَنْ تَاْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যখনই যা তোমার খেতে ইচ্ছা হয়, তখনই তা খাওয়াই অপচয়।[৮৯]

---

৮৩. মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৩, ২৩৬

৮৪. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৮, হাদীস নং- ৩৩৫০ এবং *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিয়ামত, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই),খ. ২, পৃ. ২০৪, হাদীস নং- ২৪৭৮

৮৫. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: কম খাওয়া ও পেট ভরে না খাওয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৮, হাদীস নং- ৩৩৪৯

৮৬. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাওয়া, খ. ৪, পৃ. ৫০, হাদীস নং- ৩৩৫৪

৮৭. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪-৯৫

৮৮. আল-কুরআন, ৭: ৩১

৮৯. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: তোমার যা খেতে ইচ্ছা হয়, তাই খাওয়া অপচয় খ. ৪, পৃ. ৪৯,

এছাড়া পবিত্র কুরআনে যে মূলনীতি বলা হয়েছে, তা অনুসরণ করলে পানাহারের কারণে শারীরিক কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ ইসরাফ শব্দটি সাধারণত অপব্যয় ও অতিরিক্ত খরচ অর্থে ব্যবহার করা হলেও পানাহারের ক্ষেত্রে এর দ্বারা দুই প্রকার ইসরাফ বোঝানো হয়েছে, যা থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী। যথা:

(এক) কামমিয়াত বা পরিমাণের মধ্যে ইসরাফ তথা অপব্যয় করা।

(দুই) কাইফিয়াত বা গুণের মধ্যে ইসরাফ করা।

সুতরাং পানাহারের প্রথম প্রকার কামমিয়াত (Quantity) তথা পরিমাণের মধ্যে ইসরাফ হলো, বেশি পরিমাণে আহার না করা যাতে সহজে হজম না হয় এবং মারাত্মক অসুখে পতিত হতে হয়। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্যা ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়ে অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়,পাকস্থলী নিজ কর্মে অক্ষম হয়ে পড়ে, ঘুম বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং দু:স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। পানাহারের দ্বিতীয় প্রকার কাইফিয়াত (Quality) তথা গুণ বা অবস্থার মধ্যে ইসরাফ হলো, ঐ সকল জিনিস পানাহার করা যা তার দৈহিক চাহিদা স্বভাব ও মেজাজের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় অথবা মওসুম বা ঋতু হিসেবে উপযোগী নয়। যেমন শীতকালে ঠান্ডা জাতীয় খাবার বা জ্বরের অবস্থায় জ্বরের অনুপযোগী বা প্রতিকূল গরম কিছু গ্রহণ করা ইত্যাদি।

**অতিরিক্ত খাওয়ার কুফল**

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ সবসময় কম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং অতিরিক্ত খাওয়াকে অকাল মৃত্যুর কারণ বলেছেন। বাস্তবে অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে শারীরিক অসংখ্য রোগ-ব্যাধি দেখা দেয় এবং জীবনকে বিষিয়ে তুলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–البطنة اصل الداء و الحمية رأس الدواء

অর্থ: উদরপূর্তি করে আহারই রোগের উৎসমূল, আর সর্তকতা অবলম্বনই রোগের চিকিৎসা।[৯০]

সুতরাং অধিক খাওয়ার ফলে যেসকল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো:

**(১) ডায়েবেটিস:** অধিক ভোজনের প্রাথমিক কূফল হল ডায়াবেটিস। কেননা বেশি খাওয়ার কারণে লালাগ্রন্থীকে বেশি কাজ করতে হয়। এ কারণে অভ্যন্তরীণ আদ্রতা (বহুমূত্র রোগের প্রতিষেধক তথা রস বা ইনসুলিন) কমে যায় এবং রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায়।

**(২) ব্লাড প্রেসার:** অধিক ভোজনের ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। আর ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

**(৩) ফালেজ বা প্যারালাইসিস:** অধিক ভোজনের কারণে রক্তবাহী শিরাগুলি ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে যায়, ফলে রক্ত চলাচল বাঁধা প্রাপ্ত হয়। এভাবে যখন শিরাগুলি একবারেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায়। আর এ অবস্থাটি মস্তিষ্কের কোন অংশে হঠাৎ প্রকাশ পেলে মানুষ প্যারালইসিসে আক্রান্ত হয়।

**(৪) হৃদ রোগ:** শিরার সংকীর্ণতা হৃদ রোগের অন্যতম কারণ। মানুষের শরীরের শিরাগুলো হৃৎপিন্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিক ভক্ষণের কারণে মানুষের শিরাগুলোতে চর্বি জমে গিয়ে আস্তে আস্তে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন হার্টের চাহিদা অনুযায়ী রক্ত সরবরাহ করতে না পারায় হৃদ রোগের সৃষ্টি হয়।

**(৫) অসময়ে বার্ধক্যে পতিত হওয়া:** বেশি খাওয়ার কারণে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গকে বেশি কাজ করতে হয়। আর এভাবে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করতে করতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক সময় যথাযথ কাজ করতে অপারগ হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দুর্বল বা শক্তিহীন হয়ে যায় এবং তাকে বৃদ্ধ মনে হতে থাকে।

**(৬) শরীর মোটা বা স্থুল হওয়া:** পরিমাণের চেয়ে অধিক খাবার গ্রহণের কারণে শরীর স্থুল হয়ে যায়। আর শরীর স্থুলতা থেকে হাজারো রকমের অসুখ দেখা দেয়।

---

হাদীস নং- ৩৩৫২

৯০. প্রফেসর ডা. শারীফুল ইসলাম, "ইসলামের দৃষ্টিতে রোগীর সেবা ও তার প্রতি কর্তব্য", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল-জুন ২০১৮, ৫৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১১

**(৭) অর্জীণ গ্যাষ্টিক ও অতিসার:** অর্জীণ গ্যাষ্টিক ও অতিসার তথা ধ্বংসাত্মক ব্যথাও অধিক ভোজনের ফল। এতে মানুষ পায়খানা ও প্রশ্রাবের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এভাবে ভালো মানুষও অনেক সময় পাগল-উম্মাদ হয়ে পড়ে।[৯১]

এছাড়া অতিরিক্ত খাওয়ার কুফল হিসেবে যেসকল রোগ দেখা দিতে পারে প্রফেসর রিচার্ডএ বিষয়ে একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-
(১) মস্তিষ্কের ব্যাধি, (২) চক্ষু রোগ, (৩) জিহবা ও গলার রোগ, (৪) বক্ষ ও ফুসফুসের ব্যাধি, (৫) হৃদ রোগ, (৬) যকৃত ও পিত্তের রোগ, (৭) ডায়াবেটিস, (৮) উচ্চ রক্তচাপ, (৯) মস্তিষ্কের রক্তকরণ, (১০) দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, (১১) অর্ধাঙ্গ রোগ, (১২) মনস্তাত্ত্বিক রোগ, (১৩) দেহের নিম্নাংশ অবশ হয়ে যাওয়া।[৯২]

মোটকথা অধিক ভোজনের সমস্যার শেষ নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি নবী কারীম (সা.)-এর হাদীসের ওপর আমল করে সময় এবং প্রয়োজন মতো খাবার খায়, তবে সর্বদাই সুস্থ শরীর ও সুখী জীবন লাভ করা সম্ভব।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে কেউ বললো, দুনিয়ার কোষাগার তো আপনার নিয়ন্ত্রণে তথাপি আপনি অনাহারে থাকেন কেন? তিনি বললেন, নিজের উদরপূর্তি করে ক্ষুধার্তদের কথা যেন ভুলে না যাই, এজন্য ক্ষুধার্ত থাকি। তাছাড়া ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকলে কিয়ামতের দিনের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার স্মরণও জাগরিত হয় এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ও সৃষ্টি হয়।

মুজাহাদা, সাধনা, আত্মত্যাগ এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতাই হল নৈকট্যশীলদের আসনে উন্নীত হওয়ার প্রধান সোপান। আর সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা হলো, ভোগবিলাসিতা পরিত্যাগ করা। এ কারণেই আউলিয়াগণ দারিদ্রতার জীবন অবলম্বন করেছেন। ইহা নবী কারীম (সা.)-এর মহান সুন্নতও বটে।

**ইমাম গাযালী (রহ.)-এর স্লিমিং সেন্টার**
অধিক আহারের ক্ষতিকর দিক জ্ঞাত হওয়ার পর অনেকেই না বুঝে হঠাৎ করে খাওয়ার পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি কমিয়ে ফেলে। এতে হিতে-বিপরীত হতে দেখা যায়। তাই প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, ধীরে ধীরে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অধিক খাওয়ায় অভ্যস্থ,সে যদি হঠাৎ করে খাবার কমিয়ে দেয়, তাহলে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না এবং দুর্বল হয়ে পড়বে।[৯৩]

তাই অধিক খাওয়ার অভ্যাস কমাতে চাইলে খাবার গ্রহণের সিডিউলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো খাবার ধীরে ধীরে কমাতে হবে। তাৎক্ষণিক কমালে শরীর নিয়ন্ত্রণহীন, দুর্বল এবং অসুস্থ হয়ে পড়বে। সেজন্য প্রতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে নিয়ে আসলে শরীরের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

ইমাম গাযালী (রহ.) ক্ষুধার্ত থাকার ১০টি আধ্যাত্মিক উপকার বর্ণনা করেছেন। যথা:
**(১)**ক্ষুধার মাধ্যমে অন্তরের স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান বাড়ে। কারণ পেট ভরে খাওয়া দ্বারা স্বভাবের স্থুলতা এসে যায়, অন্তরের নূর চলে যায় এবং পাকস্থলীতে গ্যাস তৈরি হয়ে মস্তিষ্ক ঘিরে ফেলে। ফলে অন্তরে এর প্রভাব পড়ে। যে কারণে মস্তিষ্ক চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়ে। কম বয়সের বাচ্চাও যদি বেশি খেতে শুরু করে, তবে তার মেধা ও স্মরণশক্তি দুর্বল ও নষ্ট হয়ে যায়।
**(২)**কম খাওয়ার দ্বারা মন নরম হয়। এতে যিকির ও অন্যান্য আমলের প্রভাব অন্তরের ওপর পড়ে। অনেক সময় মানুষ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে যিকির করে, কিন্তু এতে অন্তরে স্বাদ পায় না এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সুতরাং অন্তর নরম হলেই কেবল যিকিরের স্বাদ হাসিল হয়। দুআ ও মোনাজাতেও স্বাদ পাওয়া যায়।

---

৯১. মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা, *https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/* "অতিরিক্ত আহার নিষিদ্ধ কেন"? ০৫.১২.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)

৯২. *মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান*, প্রাগুক্ত,খ. ১, পৃ. ৬৯

৯৩. আবু হামিদ মোহাম্মাদ ইবন মোহাম্মদ আল-গাযযালী, (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *এহইয়াউ উলুমুদ্দীন*, ঢাকা: বাংলাবাজার, মদীনা পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৩ (পঞ্চম সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ২৮৭

(৩)কম খাওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা আসে এবং অহঙ্কার ও দম্ভ দূর হয়। যা অবাধ্যতা ও গাফলতির মূল উৎস। নফস অন্য কোন জিনিস দ্বারা এতো পরাভূত হয় না যতটা ক্ষুধার্ত থাকার দ্বারাপরাভূত হয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নফসের অপমান ও বিনয় না দেখে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপন মাওলার ইজ্জত ও বড়ত্ব দেখতে পায় না।

(৪) পেট ভরা মানুষ কখনো বিপদগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত লোকদের কষ্ট অনুভব করতে পারে না।

(৫) মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। পেট ভরা থাকাই সমস্ত খাহেশাতের মূল। আর ক্ষুধার্ত থাকা সব ধরনের খাহেশাতকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের জন্য বড় সৌভাগ্য হলো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো, নফস যাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৬) কম খেলে ঘুম কম আসে। ফলে বেশি বেশি রাত জাগার দৌলত নসীব হয়। কেননা পেট ভরে খাওয়ার কারণে পিপাসা বেশি লাগে, আর পানি পান করলে ঘুম বেশি আসে।

(৭) কম খেলে সহজেই ইবাদত-বন্দেগী করা যায়। কেননা পেট ভরে খাওয়ার কারণে সাধারণত অলসতা সৃষ্টি হয়, যা ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করে। আর শুধু খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

(৮)কম খেলে শরীর সুস্থ থাকে। কারণ অতিরিক্ত খাওয়ার কারণেই অনেক আত্মিক রোগের উৎপত্তি হয়।

(৯) কম খেলে খরচ কমে যায়। যে ব্যক্তি কম খাওয়ায় অভ্যস্ত, তার খরচও কম হয়। আর বেশি খাওয়া মধ্যে খরচও বেশি হয় এবং উপার্জন করার জন্য না জায়েয পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় অথবা মানুষের কাছে সওয়াল করার অপমান সহ্য করতে হয়।

(১০) কম খাওয়ার কারণে অন্যের উপর সহানুভূতি ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়া এবং অধিক দান খয়রাত করা নসিব হয়।[৯৪]

**খাওয়ার শেষে দুআ পড়া**

রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত। অনেকেই মনে রিযিক যেহেতু এমনি এমনি ঘরে চলে আসে না, এজন্য নিজের শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধি-প্রচেষ্টা এবং শ্রম ইত্যাদি ব্যয় করতে হয়, তাই নিজের উপার্জিত রিযিক ভক্ষণের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশংসা করার কী আছে। এ ধারণাটি একেবারেই মূর্খতাজনিত। কারণ যে কেউ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, পৃথিবীর বুকে মানুষসহ যত জীব-জন্তু রয়েছে সকলের প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। রিযিক প্রদানের এই মহান দায়িত্বটি আল্লাহ তাআলা নিজ থেকেই গ্রহণ করেছেন, অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেননি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الاَرْضِالاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

অর্থ: পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলাগ্রহণ করেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।[৯৫]

আয়াতে 'দাব্বাতুন' শব্দ উল্লেখ করে এমন সব প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে, যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। তাই পক্ষীকুল যেমন এর অন্তর্ভূক্ত, কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। তেমনি সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীলের অন্তর্ভূক্ত, কেননা সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। আয়াতে বর্ণিত 'তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত' দ্বারা একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার উপর সমূদয় প্রাণীর রিযিক প্রদানের এহেন গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই; বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এটা এমন এক পরম সত্যবাদী ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে কোনো নড়চড় হওয়া অবকাশ নেই। সৃষ্টির সেরা মানুষই যেখানে নিজের রিযিকের নিশ্চয়তার ক্ষমতা রাখে না, সেক্ষেত্রে অন্য প্রাণীদের নিজেই রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করা তো অনেক দূরের বিষয়। তাই আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সকল সৃষ্টিকে রিযিক প্রদানের এ গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করা সামান্যতমও সম্ভব নয়।

অনেকে মনে করে নিজ ঘরে বা অমুক জায়গায় ইচ্ছেমত খুব মজা করে খাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা না চাইলে সে সুযোগটুকুও হয়ে ওঠে না। অনেক সময় দেখা যায়, নিজের সামনে উপস্থাপিত খাবার রেখেই মানুষ মৃত্যুরকোলে ঢলে

---

৯৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *এহইয়াউ উলুমুদ্দীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮২-২৮৭

৯৫. আল-কুরআন, ১১: ৬

পড়ে। আবার এমনও হয় খাবার যতই সুস্বাদু হোক কোনো দুঃসংবাদ শুনলে, খাবারে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পেলে, অসুস্থ হয়ে পড়লে বা অন্য কোন কারণে এক লোকমা খাবারও সে খেতে পারে না। আবার অনেক সময় এমনও হয়, খাওয়ার পরেও বমি হয়ে ভক্ষিত খাবার পেট থেকে বের হয়ে আসে। তাই আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র ও ব্যবস্থাপনাকে রিযিকের জন্য যথেষ্ট মনে করে আল্লাহকে রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়া চরম বোকামী। পৃথিবীতে এমন অনেক লোকের সন্ধান পাওয়া যাবে, যার টাকা-পয়সা ও খাবার আয়োজনের কোন অভাব নেই, কিন্তু সে নিজে মনের মত খেতে পারে না। অথচ তারই কষ্টে উপার্জিত রিযিক অন্যান্য চাকর-চাকরাণী ইচ্ছামত খাচ্ছে। তাই আমরা যে রিযিক ভক্ষণ করি প্রকৃতপক্ষে পুরোটাই আল্লাহ তাআলার দান, এর কোনো মূল্য হতে পারে না। সুতরাং খাওয়ার পর দুআ করা বা আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَّ لَا مَوَدَّعٍ وَّ لَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا–

অর্থ: আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দস্তরখান উঠিয়ে নেয়ার পর এরূপ দুআ পড়তেন: আল্লাহর জন্যঅসংখ্য প্রশংসা, বরকতময় শুকরিয়া এ খাদ্যের মধ্যে, যা একবার যথেষ্ট নয় এবং পরিত্যাগযোগ্যও নয়, আর না এ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায়। হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা তোমারই।[৯৬]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবার খাওয়ার পর এরূপ দুআ পড়তেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার করালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে তাঁর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[৯৭]

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَ سَقٰى وَ سَوَّغَهُ وَ جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا–

অর্থ: আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবার খাওয়া ও পানি পান করার পর এরূপ দুআ পাঠ করতেন: সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন এবং খাদ্য বস্তুকে হযম করিয়ে তা বের হওয়ার জন্য রাস্তা তৈরি করেছেন (মল-মূত্রের মাধ্যমে)।[৯৮]

**মেজবানের জন্য দুআ করা**

হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَنَعَ اَبُوْ الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِىِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَى النَّبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ اَثِيْبُوْا اَخَاكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا اَثَابَتُهُ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَاَكَلَ طَعَامَهُ وَ شَرِبَ شَرَابَهُ فَدَعَا لَهُ فَذٰلِكَ اِثَابَتُهُ–

অর্থ: জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু হায়ছাম ইবন তায়হান (রা.) নবী করীম (সা.)-এর জন্য খানা পাক করেন। তখন নবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের দাওয়াত দেন। সকলের খাওয়া শেষ হলে তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিনিময় প্রদান কর। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার জন্য বিনিময় কী? তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: যখন কোনো ব্যক্তি কারো বাড়িতে গিয়ে তার খাবার খায় এবং পানি পান করে, তখন তার জন্য দুআ করা উচিত। এ হলো তার বিনিময়।[৯৯]

---

৯৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খাবার খেয়ে কী দু'আ পাঠ করবে? খ. ২, পৃ. ১৮১-১৮২, হাদীস নং- ৩৮৪৯
৯৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস নং- ৩৮৫০
৯৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস নং- ৩৮৫১
৯৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খানা খাওয়ার পর মেজবানের জন্য দু'আ করা খ. ২, পৃ. ১৮২,

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَاءَ اِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَّ زَيْتٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ اَكَلَ طَعَامَكُمُ الاَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সা.) সাদ ইবন উবাদা (রা.)-এর নিকট যান। তিনি রুটি এবং যয়তুনের তেল তাঁর সামনে পেশ করেন। নবী করীম (সা.) তা খেয়ে এরূপ বলেন: রোযাদার ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে ইফতার করুক, নেককার লোক তোমাদের খাবার আহার করুক, আর ফেরেশতারা তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করুক।[১০০]

এসকল দুআর মাধ্যম্যে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হলো, একজন মানুষ খাওয়ার পর তখনই এসকল দুআ তার মুখ থেকে প্রকাশ পাবে, যখন সে হালাল খাদ্য ভক্ষণ করবে এবং পুরোপুরি সুন্নাত তরীকায় খাওয়ার কার্যাবলী শেষ করবে। কেউ হারাম দ্রব্য খেয়ে বা খাওয়ার সময় অন্যান্য সুন্নাত পালন না করে খাওয়ার শেষ পর্যায়ে এসে এত উত্তম ভাষায় কখনো আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করতে পারবে না।

সুতরাং বলা যায়, খাওয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সুন্নাত ও আদব সংক্রান্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রেসক্রিপশন প্রদান করা হয়েছে, তা কেবল একজন মুমিনকে পুর্ণ মনোযোগ ও সর্তকতার সাথে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করতে উৎসাহই দেয়া হয়নি; বরং শারীরিক সুস্থতা ও রোগ মুক্ত জীবন লাভেরও নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

---

হাদীস নং-৩৮৫৩

১০০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: খানা খাওয়ার পর মেজবানের জন্য দু'আ করা খ. ২, পৃ. ১৮২, হাদীস নং- ৩৮৫৪

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পানীয় গ্রহণের দিকনির্দেশনা

### মানব জীবনে পানির গুরুত্ব

মানব শরীরের জন্য পানি অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। জীবনের জন্য অক্সিজেনের পরেই পানির স্থান। পৃথিবীর মতো প্রতিটি মানুষের শরীরেও ৭২% হলো পানি। এমনকি হাড়ের এক-চতুর্থাংশ, পেশির তিন-চতুর্থাংশ ও মস্তিষ্কের ৮৫% পানি দিয়ে গঠিত। আমাদের রক্ত ও ফুসফুসের ৮০% পানির তৈরি। সুতরাং সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পানি পানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, পানিই হলো রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে ভালো ওষুধ। শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখা, জৈবিক উপায়ে কর্মশক্তি উৎপাদন, শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান অপসারণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখা এবং শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সবকিছুতেই প্রয়োজন পানি। পর্যাপ্ত পানি পানে শরীরের ত্বক উজ্জ্বল ও সুন্দর থাকে। রক্ত থেকে 'টক্সিন' বা বিষাক্ত নানা উপাদান দূর করে পানি। পানি নতুন রক্ত কোষ এবং পেশি কোষ জন্মানোর প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। শরীরের ওযন কমানোর ক্ষেত্রেও পানি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সঠিক পরিমাণ পানি পান করলেশরীরের কোষগুলোকে শক্তিশালী করতেও সহায়তা করে। পর্যাপ্ত পানি পান করার দ্বারা পাকস্থলি পরিষ্কার হয় এবং পরিপাকক্রিয়া থেকে সঠিকভাবে নানা পুষ্টি উপাদান গ্রহণে শরীরকে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত পানি পান করলে মলাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪৫%, স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ৭৯% এবং ব্লাড ক্যান্সারের ঝুঁকি ৫০% কমে যায়। নিয়মিত পানি পান করলে লালাগ্রন্থি শুকিয়ে যায় না বলে খাবার সহজে হজম হয়। তাই পানি হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। আর ভালো হজমশক্তি মানেই আমাদের শরীর বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকে।

নিয়মিত পানি পান করার কারণে আমরা যেমন হাজারো রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে থাকি, তেমনি নিয়মিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি পান না করলে আমাদের শরীরে অসংখ্য রোগব্যাধিও জন্ম নেয়। কারণ আমাদের শরীরের সংযুক্ত অঙ্গগুলোতেকার্টিলেজের যে উপস্থিতি রয়েছে, তাসঠিকভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য এই কার্টিলেজে ৮০ শতাংশ পানির উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন। দীর্ঘ সময় পানি পান না করলে এই স্থানগুলো শুকিয়ে গিয়ে ব্যথা হতে পারে। এছাড়া রক্তে পানির পরিমাণ বেশি হওয়ায় শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। সুতরাং নিয়মিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি পান না করলে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয় পানির কারণেই চোখ, নাক, মুখ তথা শরীরের সকল অঙ্গ ভেজা থাকে এবং পানির অভাবে এসকল অঙ্গসমূহ ওত্বক রুক্ষ হয়ে শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাঁজ দেখা দিতে পারে। মস্তিষ্কের গঠন এবং কার্যকারিতায়ও পানির গুরুত্ব অনেক বেশি। দীর্ঘ সময় পানি পান না করলে স্পাইনাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিয়মিত পানি পান না করলে হজমে সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও এসিডিটি দেখা দেয় এবং ডিহাইড্রেশনের কারণে আলসার ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শরীরে পানি কম প্রবেশ করলে রক্ত পাতলা হয়ে দেখা দিতে পারে ব্লাড প্রেশার এবংকিডনী শরীরের তরল পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করায় অপর্যাপ্ত পানির কারণে কিডনিতে পাথর ছাড়াও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য রক্ষায় মানব জীবনে পানি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

هَوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ–

অর্থ: তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাকো।[১০১]

পবিত্র কুরআনে পানিকে শুধু উপকারী বস্তু হিসেবেই বর্ণনা করা হয়নি; বরং প্রাণবন্ত সবকিছুর অস্তিত্ব লাভের মাধ্যমও বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে একত্রে ছিলো। অত:পর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?[১০২]

---

১০১. আল-কুরআন, ১৬: ১০
১০২. আল-কুরআন, ২১: ৩০

জীব বিজ্ঞানীদের মতে, প্রোটোপ্লাজম-protoplasm (জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান) হতেই জীবের সৃষ্টি, আর প্রতিটি দেহকোষের অন্যতম মূল উপাদান হচ্ছে পানি। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَ اللهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا– اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ–

অর্থ: আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে যে সম্প্রদায় কথা শুনে তাদের জন্য।[১০৩]

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও পানি বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبَّ الشَّرْبِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحُلُوُّ الْبَارِدُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় পানীয় ছিল ঠান্ডা মিষ্টি পানি।[১০৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা পানির গুরুত্ব আরো বেশি উপলব্ধি করা যায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ اَلَمْ اَصِحُّ لَكَ جِسْمَكَ وَ اَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: কিয়ামত দিবসে বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম যে হিসাব গ্রহণ করা হবে তা হলো- তাকে বলা হবে আমি কি তোমাকে সুস্থতা দান করিনি এবং তোমাকে কি ঠান্ডা পানি প্রদান করা হয়নি?[১০৫]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উল্লিখিত ইরশাদসমূহ হতে আমরা তিনটি বিষয় অবগত হই-

**(ক)** রাসূলুল্লাহ (সা.) পানীয় জিনিসের মধ্যে ঠান্ডা এবং মিষ্টি পানীয় পছন্দ করতেন। বাস্তবেও ঠান্ডা পানি পান করায় অন্তরে আনন্দ আসে এবং স্বত:স্ফূর্তভাবেই মুখে আলহামদুলিল্লাহ তথা আল্লাহর শুকরিয়া এসে যায়।

**(খ)** রাসূলুল্লাহ (সা.) ঠান্ডা পানিকে আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত মনে করতেন এবং ঠান্ডা পানি পছন্দ করতেন।

**(গ)** পানি যেহেতু ইহকাল ও পরকালের পানীয় জিনিসের সর্দার এবংমানব জীবনে উল্লেখযোগ্য দু'টি নিয়ামতের মধ্যে একটিতথা পানি সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং আমাদেরকে পানির প্রতিটি ফোঁটার যত্ন নেয়া ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

**পানি পানের নির্দেশনাও নিয়মাবলী**

আমাদের শরীরযেহেতু ৭২% পানি দিয়ে তৈরি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সুস্থ ও সুঠাম দেহ গঠনে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই পানি পান করার বেশকিছু নির্দেশনা ও নিয়মাবলী রয়েছে। এসকল নির্দেশনা ও নিয়মাবলীর ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে খুব সহজেই অনাক্ষিত অনেক রোগব্যাধি থেকে আমাদের পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। এসকল নিয়মাবলী ও নির্দেশনা অনুসরণ না করে নিজের ইচ্ছেমতো যদি পানি পান করা হয়, তাহলে উপকারের পরিবর্তেক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।বিশেষ করে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা যেন বিশুদ্ধ হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আমরা সবাই জানি পানির অপর নাম জীবন; আবার জীবনের অপর নামও পানি। পুষ্টিবিদরা এর সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' শব্দটি যোগ করে বলেন- বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। কথাটি শতভাগ ঠিক। কারণ পানি যদি বিশুদ্ধ না হয়, সেটি শরীরের জন্য চরম ক্ষতি বয়ে আনবে। দুষিত পানি পান ও ব্যবহার করার কারণে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তাই পানি যাতে দুষিত না হয় সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১০৬]

১০৩. আল-কুরআন, ১৬: ৬৫

১০৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, (অনুবাদ: শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী), *শামায়েলে তিরমিযী* ঢাকা: উত্তরা, ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৭০, হাদীস নং- ১৫০

১০৫. আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, মিশর, কায়রো, দারুল হারামাইন, ১৯৯৭ (প্রথম প্রকাশ), অধ্যায়: পানীয়, খ. ৪, পৃ. ২৪৫, হাদীস নং- ৭২৮৩

১০৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *তাজরীদুস সিহাহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ) খ. ১,

পানির বিশুদ্ধতা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন, তা বর্তমান বিজ্ঞানীদেরকেও বিস্মিত করে দিয়েছে। কেননা আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেতাঁর এই বাণীর সাথে দেহ বিজ্ঞানীরা একই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বিশুদ্ধ পানির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে- স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন এমন পানি যার মাঝে কোনো ভাসমান জৈব অথবা অজৈব পদার্থ থাকে না এবং যাতে কোনো রোগ-জীবাণু নেই এরূপ প্রকৃতির পানিকেই স্বাস্থ্যসম্মত বিশুদ্ধ পানি (Hyginically Pure Water) বলা হয়। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন রেওয়াতের আলোকে বিশুদ্ধ পানি বলতে তাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১০৭]

শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার স্বার্থে সারাদিনে প্রতিটি মানুষেরই পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত। যতবেশি পরিমাণে পানি পান করা হবে, কিডনিদ্বয় তত বেশি সক্রিয় থেকে রক্তকে পরিশোধন করে শরীরের সকল দুষিত পদার্থ বের করে আনবে। রোগ জীবাণু শরীরের ভেতর বেশিক্ষণ অবস্থানের সুযোগ না পেলে রোগব্যাধি বাসা বাঁধারও সুযোগ পাবে না। পানি পানের মাত্রা সঠিক আছে কি-না তা বোঝার সাধারণ উপায় হলো প্রস্রাবের রং খেয়াল রাখা। প্রস্রাবের রং যত গাঢ় বা লালচে হবে বা প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া করবে, বুঝতে হবে শরীরে পানির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এসময় প্রচুর পানি পান করা উচিত। এছাড়া কিছু ওষুধ রয়েছে বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ার পর বেশি করে পানি পান করতে বলা হয়, যাতে তা দ্রুত নিষ্কাশিত হয়ে শরীর স্বাভাবিক থাকে।

একজন মানুষের প্রতিদিন পানির চাহিদা কতটুটু তা নির্ভর করে আবহাওয়া, পরিশ্রম ও শরীরের অবস্থা ইত্যাদির ওপর। আমাদের মতো উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের দিনে ২-৩ লিটারকোনো কোনো ডাক্তার বলেন, ৩-৪ লিটার পানি পান করলেই চলে। পানি পান নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশে রয়েছে থার্স্ট সেন্টার বা পিপাসা কেন্দ্র। এই কেন্দ্র জানিয়ে দেয় যে কখন পানি পান করা দরকার। একজন মানুষের এই অংশটি কার্যকরী থাকলে পানির অভাব বা বাড়তি কখনোই হবে না। কোনো কারণে পানি পানের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলেও কিডনি কার্যকরভাবে অতিরিক্ত পানি প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। তবে ইচ্ছা করে নিয়মিত প্রয়োজনের চেয়ে খুব বেশি পানি পান করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ বেশি পানি খেলে তা রক্তকে পাতলা করে পরিমাণে বাড়িয়ে একদিকে যেমন ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের সূত্রপাত করে,পাশাপশি চাপ বাড়ে শিরা-ধমনি ও হৃদযন্ত্রে। খাটনি বাড়ে কিডনির। ১-২ ঘণ্টার মধ্যে ৭-৮ লিটার পানি পান করলে সমস্যার জের মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় কখনও। হালকা মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে শ্বাসকষ্ট বা মৃত্যুও হতে পারে।

এছাড়া খাবারের অন্তত আধঘণ্টা আগে এবং খাবার খাওয়ার আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পরে পানি পান করা উচিত। এমনটা না করলে হজমে সহায়ক পাচক রসের কর্মক্ষমতা কমতে শুরু করে। ফলে হজম ঠিক মতো না হওয়ার কারণে বদ হজম এবং গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে খাওয়ার সময় বেশি পানি পান না করাই ভালো।

ঘুম থেকে ওঠে শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চালু করার জন্য পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তাই চিকিৎসকেরা সকালে খালি পেটে কয়েক গ্লাস পানি পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। এতে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানসমূহ বেরিয়ে যায় এবং সারা রাত মুখ-গহ্বরে জমে থাকা ক্ষার (alkalinity) পানির সাথে পাকস্থলিতে গিয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিশয় সহায়ক হয়। তাছাড়া সকাল সকাল পানি পানের অভ্যাস করলে কিডনি এবং ইনটেস্টাইনের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

ঘুমানোর ঠিক আগ মুহূর্তে বেশি পরিমাণ পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এতে বারবার টয়লেটে যাওয়ার কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। আর অপর্যাপ্ত ঘুম অসংখ্য রোগব্যাধির ঝুঁকি বাড়ায়। তবে রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস পরিমাণ হালকা কুসুম গরম পানি পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এতে পাচনতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে এবং শরীরে উপস্থিত টক্সিন বাইরে বেরিয়ে আসে। আর ঘুমানোর আগে পানি পান করার অভ্যাস থাকলে ঘুমানোর অন্তত আধা ঘণ্টা আগেই পান করে নেয়া শ্রেয়।

---

পৃ. ১৬৪, হাদীস নং- ১৮৯,১৯০

১০৭. মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান, *আহকামুল হাদীস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, আগষ্ট ২০১৯ (৭ম মুদ্রণ), পৃ. ৪১; বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা.), পৃ. ২০৬

উপরোল্লিখিত নির্দেশনা ও নিয়মাবলীসমূহ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) পানি পান করার বিষয়ে এমন কিছু মৌলিক নির্দেশনা ও নিয়মাবলী ইরশাদ করেছেন, যা শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

### পানি দেখে পান করা

মানুষ সাধারণত তৃষ্ণা লাগলে পানি পান করে এবং তৃষ্ণা লাগার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব পান করে থাকে। তাই তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা পানি দেখে পান করি না। অথচ পানি একটি তরল পদার্থ হওয়ায় তা চিবিয়ে খেতে হয় না এবং মুখে দেয়ার সাথে সাথেই খুব সহজে গলা দিয়ে পাকস্থলিতে চলে যায়। কিন্তু পানিতে সচরাচর এমন সব ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ, ক্ষুদে পোকা (প্যারা সাইটস), ময়লা ও ধুলাবালি থাকে, যা না দেখে পান করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যথা: যকৃত, পাকস্থলি, প্লীহা ইত্যাদিকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর সকল দেশ ও সমাজেই পানি পানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ গ্লাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ হলো, যেন অতি সহজ ও স্পষ্টভাবে পানির স্বচ্ছতা ও নির্মলতা নির্ণনয় করা যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরও একটি স্বচ্ছ গ্লাস ছিলো, যেনতিনি পানি দেখে পান করতে পারেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدَحُ قَوَارِيْرَ يَشْرَبُ فِيْهِ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তিনি তাতে পানীয় পান করতেন।[১০৮]

### দাঁড়িয়ে পানি পান না করা

বসে পানি পান করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে এ ধরনের ফ্যাশন মনে করে। অথচ দাঁড়িয়ে পান করার মধ্যে কোনো ফ্যাশন বা কৃতিত্ব নেই; বরং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ভাষায় এতে অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে কোনোকিছু পান করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[১০৯]অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا– قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْاَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ اَشَرُّ اَوْ اَخْبَثُ–

অর্থ: আনাস (রা.) সূত্রে নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি (সা.) কোনো ব্যক্তির দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা (রা.) বলেন, আমরা বললাম, তবে খাওয়ার হুকুম কী? তিনি বললেন: সেটা তো আরো খারাপ।[১১০]

আরেকটি হাদীসে এসেছে – عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) দাঁড়িয়ে পান করতে কঠোরভাবে হুমকী প্রদান করেছেন।[১১১]

দাঁড়িয়ে পানি পান করলে তা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে সরাসরি পাকস্থলিতে চলে যায়, এতে পাকস্থলি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি প্রস্রাবের মাধ্যমে তা খুব দ্রুত শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়ায় কিডনিরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়।আয়ুর্বেদিক মতে, দাঁড়িয়ে পানি পান করলে বিভিন্ন হাড়ের সংযোগস্থলকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ব্যথাসহ আর্থ্রাইটিস রোগের অন্যতম কারণ হতে পারে। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে শরীরের অক্সিজেনের সরবরাহকে বাধাগ্রস্থ করে, এতে ফুসফুসের ক্ষতি হয় এবং নার্ভে প্রদাহ বেড়ে গিয়ে কোনো কারণ ছাড়াই দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেয়ে বদহজমের সমস্যা হয়। শুধু তাই নয়,

---

১০৮. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানি ও পান পাত্র, অনুচ্ছেদ: গ্লাসে পান করা, খ. ৪, পৃ. ৮৫, হাদীস নং- ৩৪৩৫
১০৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং- ৩৭১৭
১১০. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: দাঁড়িয়ে পানি পান করা, খ. ৬, পৃ. ১২৪, হাদীস নং- ৫২৭০
১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪, হাদীস নং- ৫২৭২

দাঁড়িয়ে পানি পান করার কারণে শরীরের এসিড লেভেলে তারতম্য ঘটায় শরীরে ক্ষরণ হতে থাকা এসিডকে তরল করতে পারে না। এতে স্বাভাবিকভাবেই নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

বাস্তবেও দেখা যায়, বসে পানি পান করলে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় দাঁড়িয়ে পান করলে তা পাওয়া যায় না এবংদেহের ভেতর পানির ভারসাম্যও ঠিক থাকে না। এছাড়া বসা অবস্থায় পান করলে শরীরের চাহিদানুযায়ী পানি সর্বত্র পৌঁছে যায়। যা শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ يَشْرَبَنَّ اَحَدُ مِّنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِئْ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- তোমাদের কেউ যেনো কখনো দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গেলে সে যেনো পরে বমি করে ফেলে।[১১২]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করাকেকঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করার কারণে পাকস্থলী ও যকৃতসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে, যা চিকিৎকরাওঅনেক সময় নিরাময় করতে অপারগ হয়ে পড়ে। তাই যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন শারীরিক সুস্থতা অর্জন ও বজায় রাখতে বসে পানি পান করা উচিত। তবে যমযম কূপের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে কোনো নিষেধ নেই। হাদীসে এসেছে – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) দন্ডায়মান অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন।[১১৩]

**তিন শ্বাসে পানি পান করা**

অধিক তৃষ্ণার্থ অবস্থায় নিজের কাছে মুজুদকৃত সমস্ত পানিই যেন এক শ্বাসে পান করে ফেলতে মনে চায়। কিন্তু হাদীসে এভাবে পানি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এভাবে পান করলে খাদ্যনালী থেকে পানি শ্বাসনালীতে ঢুকে শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটিয়ে ভীষণ বিপদ ডেকে আনতে পারে। এমনকি তাড়াহুড়ো করে পানি পান করার কারণে অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত তরীকা অনুসরণ করে যদি তিন শ্বাসে অল্প অল্প করে পানি পান করা হয়, তাহলে এমন বিপদের যেমন সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি ধীর-স্থিরভাবে পানি পান করার কারণে পরিপূর্ণ তৃপ্তিও লাভ করা যায়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلْثًا وَ قَالَ هُوَ اَهْنَاءُ وَ اَمْرَأُ وَ اَبرَأُ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন: এভাবে পানি পান করলে তৃষ্ণা উত্তমরূপে নিবারিত হয়, খাদ্য অধিক হজম হয় এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে।[১১৪]

এছাড়া একটু একটু করে পানি পান করলে মুখের মধ্যে যেসব খাদ্য কণা আটকে থাকে, তা সহজে বের হয়ে যায় এবং দাঁতের গোড়া পরিষ্কার হয়। পক্ষান্তরে ঘট ঘট করে এক শ্বাসে পান করলে পানি মুখের মধ্যে বেশিক্ষণ না থেকে সরাসরি কণ্ঠণালীতে গিয়ে মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে।

عَنْ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ اَنَسُ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، وَ زعَمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا–

অর্থ: সুমামা ইবন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আনাস (রা.)-এর নিময় ছিল, তিনি দুই কিংবা তিন নি:শ্বাসে পাত্রের পানি পান করতেন। তিনি ধারণা করতেন নবী কারীম (সা.) তিন নি:শ্বাসে পানি পান করতেন।[১১৫]

---

১১২. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়,অনুচ্ছেদ: দাঁড়িয়ে পানি পান করা, খ. ৬, পৃ. ১২৬, হাদীস নং- ৫২৭৪

১১৩. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা, খ. ২, পৃ. ১৫৯৯, হাদীস নং - ৫৬১৭

১১৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: সাকী (যে অন্যকে পানি পান করায়) নিজে কখন পানি পান করবে, খ. ২, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং- ৩৭২৭ এবং *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পান করার পদ্ধতি, খ. ২, পৃ. ৬৫৩, হাদীস নং- ২১০

১১৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: দুই কিংবা তিন শ্বাসে পানি পান করা, খ. ২, পৃ. ১৬০২,

عَنْابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَلاَ تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ، وَ لٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَ ثُلاَثَ– وَ سَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ احْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা কেউ উটের মতো পান করবে না। বরং দুইবারে বা তিনবারে পান করবে। যখন পান করবে বিসমিল্লাহ বলবে আর যখন পান করে উঠবে তখন আলহামদুলিল্লাহ বলবে।[১১৬]

বিশ্রাম না নিয়ে এক শ্বাসে পানি পান করলে শরীরের ভেতর হঠাৎ করে চাপ বেড়ে যাওয়ায়বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এক সাথে গলধ:করণ না করেপ্রতিবার মুখে পানি নিয়ে অল্প সময় অপেক্ষা করা, যাতে মুখের লালা পানির সঙ্গে মিশে যায়, যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

তিন শ্বাসে পানি পান না করলে যেসকল সমস্যা দেখা দিতে পারে, তা নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো-
**(ক)** শ্বাসনালীতে পানি ঢুকে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।
**(খ)** এমন বিঘ্নতা অধিক হলে মস্তিষ্কে চাপ পড়ে। কারণ পানির শিরাসমূহ মাথার পর্দার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আবার মাথার ভেতর যে ফ্লয়েড বা তরল পদার্থ রয়েছে এর সম্পর্কও পানির সাথে। যদি ধীরে ধীরে পানি পান করা হয়, তাহলেমস্তিষ্কে কখনো ক্ষতির প্রভাব পড়ে না।
**(গ)** পাকস্থলিতে অতিরিক্ত পানি জমা হলে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়। যথা, পানি যখন ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন উপর থেকে চাপ পড়লে হার্ট ও লাঙ্গের ক্ষতি হয়। ডান দিক থেকে চাপ হলে যকৃত এবং বাম দিক থেকে চাপ পড়লে নাড়ীভুড়ি উলট-পালট হয়ে যায়। এভাবে নানাবিধ ক্ষতি হয়।

তাই বলা যায়, অল্প অল্প করে পানি পান করার উপকারিতা অনেক। এ সকল উপকারিতা মানুষের শারীরিক সুস্থতার সাথে সম্পৃক্ত, আধ্যাত্মিকতার সাথে নয়। ইসলাম ধর্ম মানুষকে শুধু আধ্যাত্মিকতা ও চারিত্রিক উন্নয়নের শিক্ষাই দেয়নি; বরং পার্থিব জগতে মানুষের সার্বিক উন্নতি, সুস্থতা ও কল্যাণ সাধনেরওপরিপূর্ণ জিম্মাদার।

**পানপাত্রে নি:শ্বাস না ফেলা এবং অধিক গরম পানি পান না করা**

প্রাণীর নি:শ্বাস ও ফুঁকের সাথে কার্বনডাই অক্সাইড বের হয়। এ কার্বনডাই অক্সাইড পানির সাথে মিশ্রিত হলে কার্বলিক এসিড তৈরি হয়, যা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ জাতীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বর্তমান যুগের রসায়নবিদগণও হতভম্ব হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ–

অর্থ: আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন পানি পান করে সে যেন তখন পানপাত্রে নি:শ্বাস না ফেলে।[১১৭]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيُنَحِّ الْاِنَاءَ ثُمَّ لْيَعُدْ اِنْ كَانَ يُرِيْدُ–

অর্থ: শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে শ্বাস নেবে। অত:পর আরও পান করতে চাইলে পাত্র থেকে পান করবে।[১১৮]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِى الشُّرْبِ فَقَالَ رَجُلُ اَلْقَذَاةُ اَرَاهَا فِى الْاِنَاءِ، فَقَالَ اهْرِقْهَا– فَقَالَ فَاِنِّىْ لاَ اَرْوٰى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ– قَالَ فَاَبِنِ الْقَدَحَ اِذًا عَنْ فِيْكَ –

---

হাদীস নং-৫৬৩১
১১৬. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পান করার সময় পাত্রে শ্বাস ফেলা,খ. ২, পৃ. ৩১, হাদীস নং- ১৮৮৫
১১৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: পান পাত্রে নি:শ্বাস ফেলা নিষেধ, খ. ২, পৃ. ১৬০২, হাদীস নং-৫৬৩০
১১৮. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানি ও পান পাত্র, অনুচ্ছেদ: পানির পাত্রে শ্বাস ফেলা নিষেধ, খ. ৪, পৃ. ৮২, হাদীস নং- ৩৪২৭

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) পানিতে ফুঁক দিতে নিষেধ করলে এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পাত্রে আবর্জনার মতো পরিলক্ষিত হলে? তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন: তা ঢেলে ফেলে দাও। লোকটি বললো, আমি তো এক শ্বাসে পান করে তৃপ্তি পাই না। তিনি ইরশাদ করলেন: তাহলে তোমার মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নেবে (এবং শ্বাস ফেলবে)।[১১৯]

গরম পানি পান করা বা ব্যবহার যে শারীরিক সুস্থতার জন্য হাজারো উপকারিতা তা আমরা অনেকে জানি। কিন্তু তা হতে হবে কুসুম গরম পানি। নির্ধারিত কিছু কিছু সময়ে কুসুম গরম পানি পান করা শরীরের জন্য উপকার হলেও সব সময় গরম পানি পান করা বা অতিরিক্ত গরম পানি খাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ অতিরিক্ত গরম পানি পান করলে মস্তিষ্কে প্রদাহজনক কোষ সৃষ্টি করতে পারে, জিহ্বা ও গলা পুড়ে যেতে পারে এবং মুখের ভেতর ঘা সৃষ্টি হয়ে খাবার খেতে ও পান করতে অসুবিধা হতে পারে। এছাড়া সব সময় গরম পানি পান করলে পান করার চাহিদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং অধিক গরম করার কারণে পানির নিজস্ব গুণ ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সার্বিক দিকে বিবেচনা করে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। সাধারণত অধিক গরম পানীয় বা খাবার খাওয়ার সময় আমরা ইচ্ছা করেই তাতে ফুঁক দিই। এটা অবশ্যই ক্ষতিকারক। পাত্রে যেন শ্বাস না ফেলি বা ইচ্ছা করেই ফুঁক না দিই হাদীসে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।[১২০]

**ভাঙ্গা পাত্রে পানি পান না করা**

মানব শরীরের সবচেয়ে নরম ও পাতলা চামড়ার অঙ্গ হল ঠোঁট। তাই পান পাত্র ভাঙ্গা হলে এতে ঠোঁট লাগার সাথে সাথে কেটে যাবে এবং ঠোঁট কেটে গেলে অন্য যেকোন অঙ্গ থেকে অধিক পরিমাণ রক্ত বের হয়, যার প্রবাহ সহজে বন্ধ হয় না। এছাড়া ভাঙ্গা পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না বিধায় এতে ময়লা-আবর্জনা, ক্ষতিকর লালা ও থুথু ইত্যাদি পাত্রে লেগে থাকে। অত:পর ঐ দিক দিয়ে যখন পানি পান করা হয়, তখন উক্ত ক্ষতিকর পদার্থ পেটের মধ্যে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাঙ্গা পাত্র দিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।
হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ وَ اَنْ يُّنْفَخَ فِى الشَّرَابِ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।[১২১]

**পানপাত্র ঢেকে রাখা**

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশুদ্ধ পানি শরীরের জন্য যেমন খুবই গুরুত্ব, তেমনি জীবাণুযুক্ত পানি স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই পানি যাতে কোনো কারণে নষ্ট না হয় সেদিকে খুবই খেয়াল রাখা উচিত। বিশেষ করে মশা, মাছি, তেলাপোকা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ অসংখ্য রোগ জীবাণু শরীরে বহন করে থাকে। আর এসব কীট-পতঙ্গ খোলা পানপাত্রে অনবরত বসতে থাকে। এদের আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হল পানাপাত্র ঢেকে রাখা।

খোলা পানপাত্রের অন্যতম ক্ষতিকর দিক হলো, অসংখ্য রোগ জীবাণু সারাক্ষণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, যা আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখতে পাই না। পানপাত্র খোলা থাকলে খুব সহজেই এসব ক্ষতিকর জীবাণু পাত্রে পতিত হয়ে শরীরে রোগ ছড়াতে সক্ষম হয়। এছাড়া প্রতিটি ঘরেই টিকটিকি বাস করে। এগুলো দেখতে বিশ্রী এবং শরীরও বিষাক্ত। তাই পানাহার বিষাক্ত হওয়ার জন্য এর মধ্যে একটি টিকটিকি পতিত হওয়াই যথেষ্ট। তাই সার্বিক

১১৯. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেয়া মাকরূহ,খ. ২, পৃ. ৩২, হাদীস নং- ১৮৮৭
১২০. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং- ৩৭২৮
১২১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ভাঙ্গা পাত্রের ছিদ্র পথে পানি পান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং- ৩৭২২

দিকে বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) পানপাত্র ঢেকে রাখারজন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। জারিব (রা.) সূত্রে হাদীসে এসেছে –غَطُّوا الْاِنَاءَ وَ اَوْكُوا السِّقَاءَ অর্থ: তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে এবং মশকের মুখ বন্ধ করে রাখবে।[১২২]

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ رَجُلُ مِّنَ الْقَوْمِ اَلَا نُسْقِيْكَ نَبِيْذًا قَالَ بَلٰى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ فَجَاءَ بِقَدْحٍ فِيْهِ نَبِيْذُ– فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَ لَوْ اَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। সে সময় তিনি (সা.) পানি পান করার ইচ্ছাপোষণ করলে কওমের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমরা কি আপনাকে নাবীয পান করাবো না? তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: অবশ্যই। তখন এক ব্যক্তি দ্রুত গিয়ে একটি পেয়ালায় নাবীয নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি পেয়ালাটি ঢেকে আনলে না কেন? তুমি যদি এর উপর এক খণ্ড কাঠও রাখতে, তবে ভালো হতো।[১২৩]

**বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করতে নিষেধ করেছেন,এই নিষেধাজ্ঞা খুবই হিকমতপূর্ণ। প্রথমত বড় পাত্র বা মশক যেখান থেকে পরিবার ও গোত্রের অন্যান্য সকল সদস্য পানি করে থাকে, সেখানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলে স্বাভাবিকভাবেই পানির মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়বে। যা অন্যান্য সদস্যদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়া পানকারীর দাঁত ও মুখে যদি কোনো অসুখ থাকে, তাহলে তবে এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়বে, যা স্বাস্থ্য রক্ষা নীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত মানব জীবনে পানি আল্লাহ আলার পক্ষ থেকে অন্যতম একটি নিয়ামত। আর বড় পাত্র বা মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলে কিছু পানি নষ্ট হবেই। যাশরীয়তে বৈধ নয়।

এতদ্ব্যতীত বড় পাত্র ও মশক থেকে নিশ্চিন্ত মনে পানি পান করতে না পারার কারণে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না এবং তৃষ্ণাও মিটে না। অনেক সময় এভাবে পান করলে পান পাত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে পুরো শরীর ও কাপড় পানিতে ভিজে যেতে পারে, যা পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতারও পরিপন্থী। তাই পানি পান করার সময় যথাসম্ভব নবী কারীম (সা.)-এর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। যা স্বাস্থ্য বিধিতে একটি জরুরী বিষয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِىْ اَنْ تُكْسَرَ اَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) মশকের মুখ খুলে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[১২৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ–

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) মশকের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[১২৫]

অন্য হাদীসে এসেছে- আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) মশকের থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[১২৬]

১২২. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পাত্র আচ্ছাদিত করে রাখা, খ. ৬, পৃ. ১১৩, হাদীস নং- ৫২৪১
১২৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পাত্র ঢেকে রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং- ৩৭৩৪
১২৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: মশকে মুখ লাগিয়ে পান করা, খ. ২, পৃ. ১৬০১, হাদীস নং- ৫৬২৫
১২৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬০১-১৬০২, হাদীস নং- ৫৬২৯
১২৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬০১, হাদীস নং-৫৬২৮

**পশুর মতো চুমুক দিয়ে পানি পান না করা**

প্রচন্ড গরমে পিপাসায় অস্থির হয়ে পাত্রে মুখ এক নি:শ্বাসেই সমস্ত পানি শেষ করে ফেলতে মন চায়। বাস্তবতা হলো, এভাবে পানি পান করলে পিপাসা পুরোপুরি নিবারণ তো হয়ই না; বরং গলায় পানি আটকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পক্ষান্তরে অল্প অল্প করে পানি পান করলে সামান্য পানিতেই পিপাসা মিটে যায় এবং কোন সমস্যায়ও হয় না। তাছাড়া পাত্রে মুখ ডুবিয়ে পানি পান করা পশুর স্বভাব। এতে নাক মুখের দুষিত নি:শ্বাস বিশুদ্ধ পানিকে নষ্ট করে ফেলে। এভাবে পান করলে পাত্রে দাড়ি, মোচ এবং চুল পড়ে পরিষ্কার পানিও নোংরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন-

اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَمَصَّ الْمَاءَ مَصًّا وَ لاَ يَعُبَّ عَبًّا فَاِنَّه مِنَ الْكِبَادِ–

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পানি পান করতে চায়, সে যেন পানিতে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে পশুর মতো পান না করে, কারণ এতে কলিজায় ব্যথা হয়।[১২৭]অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ، وَ لٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَ ثُلاَثَ– وَ سَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ احْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ–

অর্থ: তোমরা উটের মতো এক দমে ঘটঘট করে পান করো না; বরং দু'/তিন দমে পান করো। পান করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম লও অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলো এবং পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করো তথা আলহামদুলিল্লাহ বলো।[১২৮]

উপরোল্লিখিত হাদীসে তিনটি উপদেশ পাওয়া যায়-

(১) প্রথমত পানি এক দমে ঘটঘট করে উটের মতো পান না করে অল্প অল্প করে পান করা উচিত। অধৈর্য হয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে পানি পান করা উটের স্বভাব, এতে অনেক অসুবিধাও রয়েছে। এভাবে পানি পান করলে গলায় আটকে যাওয়ার সম্ভবাবনা রয়েছে।

(২) দ্বিতীয়তপানি পান করার শুরুতে আল্লাহর নাম নিয়ে পান করা উচিত। এতে হাজারও বরকত রয়েছে। মানুষ স্বভাবতই বিসমিল্লাহ বলে কোনো হারাম জিনিস মুখে নিতে পারে না বা কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করলে যে প্রশান্তি হাসিল হয় অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়।

(৩) তৃতীয়ত আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ার পর তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

**খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি পান না করা**

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযমের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে আহারের পরেই পানি পান করতেন না। খাদ্য হযমের হওয়ার নিকটবর্তী হলে পানি পান করতেন।[১২৯]

খাওয়ার পর পরই পানি পান করলে পাচক রসের সাথে তা মিশে গিয়ে হজমে ধীর গতি চলে আসে, যাহজম প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে তুলে। খাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পানি পান করলেও এমন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই খাওয়ার পূর্বে ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হলে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা আগেই তা খেয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকগণ। মূলত খাওয়ার পর পরই পানি পান করলে খাবারের গুণগত মানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবংভারী খাবার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পানি পান করলে বিভিন্ন এনজাইমগুলো সঠিক মাত্রায় খাবারের সাথে মিশতে না পারায় হজম প্রক্রিয়ায় বিঘ্নিত ঘটে। যা সকল রোগের উৎস। তাই খাওয়ার অন্তত ৩০ মিনিট পর পানি পান করা উচিত। কেননা এ সময়ের মধ্যে হজম প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। তবে পিপাসা খুব বেশি হলে বা কোনো কারণে খাওয়ার পর পরই পানি পান করা প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে অল্প পরিমাণ পান করা যেতে পারে।

---

১২৭. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৩১

১২৮. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: পান করার সময় পাত্রে শ্বাস ফেলা,খ. ২, পৃ. ৩১, হাদীস নং- ১৮৮৫

১২৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

ডা. কর্ণেল চোপড়া বলেন, গবেষণার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খাওয়ার পরপরই পানি পান করলে পাকস্থলীর রগগুলো ঢিলা হয়ে যায়, ভেতরের ঝিল্লী ফুলে যায়, হজমশক্তি হ্রাস পায় এবং এক পর্যায়ে অধিকাংশ সময় পাকস্থলী অসুস্থ থাকার কারণেহার্টেও রোগ দেখা দেয়।[১৩০]

**দুধ পান করার পর কুলি করা**

আল্লাহ তাআলার অনন্য নিয়ামতের মধ্যে দুধ একটি এটি সব গুণসমৃদ্ধ খাবার তথা সুপারফুড। চিকিৎসা বিজ্ঞানে দুধকে সুস্বাস্থ্যের জন্য অতুলনীয় পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গৃহপালিত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও উট থেকে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এসব দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু দুধে এক ধরনের তৈলাক্ততা থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুধ পানের পর কুলি করতে বলেছেন। কারণ দুধ পান করার পর যদি ভালোভাবে কুলি করা না হয়, তাহলে দীর্ঘ সময় ঐ তৈলাক্ত পদার্থ মুখের মধ্যে লেগে থেকে দাঁত ও মুখের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَ قَالَ اِنَّ لَه دَسَمًا–

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) দুধপান করার পর কুলি করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন: এর মধ্যে তৈলাক্ততা রয়েছে।[১৩১]

**পানি পান করার পর দুআ**

রাসূলুল্লাহ (সা.) পানি পান করার পর আল্লাহর দরবারে অতি সুন্দর ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। মূলত পানি মিষ্টি ও সুস্বাদু হওয়া একমাত্র মহান সত্তা আল্লাহ তাআলারই রহমত। আল্লাহর এমন কোনো বান্দা নেই যে এ নিয়ামতকে তার নেক কাজের প্রতিফল হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে। পাশাপাশি নিম্নের দুআর দ্বিতীয় অংশে রহমতের আধার বিশ্বনবী (সা.) আমাদের মতো গোনাহগার উম্মতদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক না কেন তা বান্দার নিজের কর্মেরই প্রতিফল। নতুবা পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা তো তাঁর বান্দাদের ওপর পিতা-মাতার চেয়েও বহুগুণে স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র।

عَنْ اَبِىْ جَعْفَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ اِذَا شَرِبَ الْمَاءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْمَاءَ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا–

অর্থ: আবু জাফর (রা.) হতে বর্ণিত। কোনো কিছু পান করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় রহমতে পানিকে মিষ্টি ও সুস্বাদু বানিয়েছেন এবং আমাদের অপরাধ সত্ত্বেও এটাকে লবণাক্ত ও খারযুক্ত করেন নি।[১৩২]

পূর্বে বর্ণিত খাওয়ার পর দুআ করার বিষয়ের ন্যায় এখানেও বলা যায়, পানি পান করার পর এসকল দুআর মাধ্যম্যে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হলো, একজন মানুষ পানি পান করার পর তখনই এসকল দুআ তার মুখ থেকে প্রকাশ পাবে, যখন সে হালাল পানীয় এবং পুরোপুরি সুন্নাত তরীকায় পানি পান করবে। কেউ হারাম তথা শরাব পান করে বা পান করার সময় অন্যান্য সুন্নাত পালন না করে এত উত্তম ভাষায় কখনো আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না। সুতরাং পানীয় যদি হালাল এবং হাদীসে বর্ণিত সুন্নাত তরীকায় হয়, তাহলে নিশ্চয় এ পানীয় তার শারীরিক সুস্থতা ও সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনবে তা নিসন্দেহে বলা যায়।

---

১৩০. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৬

১৩১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: দুধ পান করা, খ. ২, পৃ. ১৫৯৭, হাদীস নং- ৫৬০৯

১৩২. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর, (অনুবাদ: অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক), *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ঢাকা: ইফা, মার্চ ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ১০, পৃ. ৬৬২

## তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় খাদ্য তালিকা ও খাবারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেসব খাবার গ্রহণ করেছেন, এগুলো সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। বর্তমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণও বলেন, তাঁর পছন্দনীয় বিভিন্ন খাবারগুলো ছিলোসত্যিই যথাযথ গুণাগুণ ও মান সম্মত। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় ও পছন্দনীয় খাদ্য তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ

### গোশত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্যে গোশত সর্বদা তালিকার শীর্ষে থাকতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) গোশত খাওয়াকে খুবই পছন্দ করতেন এবং প্রশংসা করতেন। বাস্তবে গোশত এমন একটি লোভনীয় খাদ্য দ্রব্য যা সহজে সবাইকে আকৃষ্ট করে এবং গোশত খাওয়াকে পছন্দ করে না এমন লোকের সংখ্যা বিরল। তাই দেখা যায়, বিশ্বের যেকোনো দেশ বা সমাজে মেহমানদারী করানোর ক্ষেত্রে অন্য কোনো তরকারি রান্না না করলেও গোশতের আইটেম অবশ্যই থাকে। পবিত্র কুরআনেও গোশতের কথা উল্লেখ রয়েছে-তারা (জান্নাতীরা) উড়ন্ত পাখির গোশত ভক্ষণ করবে, যে পাখির গোশত তাদের অন্তরে চায়।[১৩৩] হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدُ طَعَامِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَ اَهْلِ الجَنَّةِ اَللَّحْمُ–

অর্থঃ আবু দারদা (রা.) নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ দুনিয়াবাসী এবং জান্নাতীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো গোশত।[১৩৪]হযরত বুরাইদা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন-

خَيْرَ الْاِدَامِ فِى الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةِ اَللَّحْمُ–

অর্থঃ দুনিয়া এবং আখিরাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম সালুন হলো গোশত।[১৩৫]

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ مَا دُعِىَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى لَحْمٍ قَطُّ اِلاَّ اَجَابَ، وَ لاَ اُهْدِىَ لَهُ لَحْمُ قَطُّ اِلاَّ قَبِلَهُ–

অর্থঃ আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যখনই গোশত খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন। আর যখনই তাঁকে গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছে, তিনি তা কবুল করেছেন।[১৩৬]

এ সকল বর্ণনাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয়, ব্যক্তিগতভাবেই নবী কারীম (সা.)-এর নিকট গোশত পছন্দনীয় খাদ্য ছিলো। আর নবী কারীম (সা.)-এর পছন্দনীয় খাদ্যের উপকারিতা সূর্যের মত স্পষ্ট। পৃথিবীর সকল হেকিম ও চিকিৎসকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গোশতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জীবনীশক্তি রয়েছে। গোশতের মতো এত উপকারিতা, শক্তিবর্ধক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মজবুতকারী শক্তি সম্ভবত অন্য কোনো খাদ্যের মধ্যে নেই।

#### গরুর গোশত

গোশতপ্রেমী লোকদের জন্য সর্বপ্রথম গরুর গোশতের কথা বলা যায়। আমরা জানি, গরুর গোশত খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি এর পুষ্টিগুণও ব্যাপক। গরুর গোশতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়৯টি পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এগুলো হল প্রোটিন, জিঙ্ক, ভিটামিন বি টুয়েলভ, সেলেনিয়াম, ফসফরাস, নায়াসিন, ভিটামিন বি৬, আয়রন এবং রিবোফ্লাভিন। প্রোটিন শরীরের পেশি গঠনে ভূমিকা রাখে। জিঙ্ক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ফসফরাস দাঁত ও হাড়ের শক্তি বাড়ায়। আয়রন শরীরের পেশিতে অক্সিজেন প্রবাহে সহায়তা করে। 'ভিটামিন বি টুয়েলভ' খাদ্য থেকে শক্তি যোগান দেয়। ৩আউন্স গরুর মাংস থেকে যে পরিমাণ জিংক আসে সেই পরিমাণ জিংক পেতে ৩ আউন্স ওজনের ১১ টুকরা টুনা মাছ খেতে হবে। ঠিক সেই পরিমাণ আয়রনের জন্য খেতে হবে ৩ আউন্স ওজনের ৭ টুকরা মুরগির বুকের মাংস বা ৩ কাপ পালংশাক। এই পরিমাণ 'রিবোফ্লাভিন'য়ের জন্য খেতে হবে ৩ আউন্স ওজনের আড়াই টুকরা মুরগির বুকের মাংস এবং এই পরিমাণ 'থায়ামিন' এর জন্য খেতে হবে ৩ আউন্স ওজনের ২ টুকরা মুরগির বুকের মাংস।

---

১৩৩. আল-কুরআন, ৫৬: ২১

১৩৪. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭১

১৩৫. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭১

১৩৬. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: গোশত, খ. ৪, পৃ. ২৯, হাদীস নং- ৩৩০৬

এছাড়া এক টুকরো গরুর গোশতে বিভিন্ন ধরনের মিনারেল পাওয়া যায়। বিশেষ করে ম্যাগনেশিয়াম, জিংক, সেলেনিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও কপার। এই মিনারেলগুলো আমাদের শরীরের অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে।মাত্র তিন আউন্স পরিমাণ গরুর মাংস দৈনিক জিংকের ৩৯% চাহিদা পূরণ করে থাকে। এতে বোঝা যায় গরুর মাংসের পুষ্টি উপাদান কত বেশি।

বাড়ন্ত বা টিনএইজারদের সুঠাম ও শক্তিশালী করে গড়েতুলতে গরুর গোশতের তুলনা নেই। শুধু শারীরিক বর্ধন নয়, বুদ্ধি-বৃত্তিক গঠন এবং রক্ত বর্ধনেও এটি ভূমিকা রাখে। ৩ আউন্স গরুর গোশতে আছে ৯-১৩ বছর বয়সি শিশুর দৈনিক চাহিদার ১২৫% ভিটামিন বি১২, ৯০% প্রোটিন, ৭৪% জিংক, ৪২% সেলেনিয়াম, ৩২% ভিটামিন বি৬, ৩২% আয়রন, ২৯% নায়াসিন, ২৩% রিবোফ্লাভিন এবং ১৬% ফসফরাস।[১৩৭]

তবে খেয়াল রাখতে হবে লাল গোশত যেমন- গরু ও খাসিসহ ইত্যাদি মাংসে ‘স্যাচুরেইটেড ফ্যাট’ বা সম্পৃক্ত চর্বি থাকার কারণে এটি অতিরিক্ত খেলে ওযন বাড়ার পাশাপাশি রক্তনালিতে চর্বি বৃদ্ধি, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে। পাশপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ডায়রিয়া, গ্যাস্টিক আলসারসহ অন্যান্য রোগও দেখা দিতে পারে। যারা স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, কিডনির সমস্যা, গেঁটেবাত, হৃদরোগ ইত্যাদিতে ভুগছে তাদের অবশ্যই পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমাণ মতো গরুর গোশত খাওয়া প্রয়োজন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ وَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.)-এর খিদমতে গরুর গোশত পেশ করা হলো। তখন তাঁকে বলা হয়, এগুলো বারীরা (রা.)-কে সাদাকহা দেয়া হয়েছে। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: এটা বারীরার জন্য সাদাকাহ, আর আমার জন্য হাদিয়া।[১৩৮]

অন্য হাদীসে এসেছে- আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: ... আর আমি (স্বপ্নে) সেখানে একটি গরু দেখলাম। আল্লাহর কসম! এটা কল্যাণকরই।[১৩৯]

সুতরাং গরুর গোশত খাওয়া হালাল এবং সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বড় সূরার নাম হচ্ছে বাকারা, যার বাংলা অর্থ গরু।তাই মুসলামান হিসেবে গরুর গোশত খাওয়াকে কোনোক্রমই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা ঠিক হবে না। অনেক সম্প্রদায় মুসলমানদের জন্য জায়েয ও উপকারী খাদ্যসমূহকে অপকারী বা ক্ষতিকর বলে মিথ্যা প্রচারণা চালায় এবং কল্যাণকর বিষয়বস্তুকে অকল্যাণকরআবার অকল্যাণকরকে কল্যাণকর বলে প্রচারণা চালিয়ে মুসলমানগণকে ক্ষতিসাধন করতে চায়। এদের ঘৃণ্য ও হীন ষড়যন্ত্রের কবল থেকে সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থ: তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১৪০] আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ–

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তোমরা সেসকল সুস্বাদু বস্তুগুলোকে হারাম করো না। আর তোমরা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করো না।কেননাতিনিসীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালবাসেন না।

১৩৭.মামুনুর রশীদ, *https://bangla.bdnews24.com* “মাংসের পুষ্টিগুণ ও খাওয়ায় সর্তকতা”, ০২.০৮.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)

১৩৮. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: নবী (সা.), বনী হাশিম ... তার মালিক হয়েছে সাদাকাহ হিসেবে, খ. ৩, পৃ. ৪৬৯, হাদীস নং- ২৪৮৪; মুহাম্মদ ইবনে আসীর, *জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, মাকতাবাতু দারুল বায়ান, ১৯৭০, খ. ৪, পৃ. ৬৬৬

১৩৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান, অনুচ্ছেদ: স্বপ্নে গরু যবেহ করতে দেখা, খ. ২, পৃ. ১৯৬৭, হাদীস নং-৭০৩৫

১৪০. আল-কুরআন, ৩০: ৩১

তিনি তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তুরিযিকস্বরূপ দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো।[১৪১]

**ছাগলের গোশত**

ছাগলের গোশত হলো একটি অন্যন্য বৈশিষ্ট্যসম্পূর্ণ খাদ্য উপাদান, যা সারাবিশ্বে অভিজাত রেস্তোরাঁতে পরিবেশন করা হয় এবং খুব কম মানুষেই আছে যারা ছাগলের গোশতকে পছন্দ করে না। যেকোনো প্রাণীর চেয়ে ছাগলের গোশতের মূল্যও বেশি। অনেকে ছাগল ও খাসির গোশত দু'টোকে একই মনে করে থাকে। ফলে খাসির গোশতের ক্ষতিকর দিকগুলো ছাগলের গোশতের সাথে সম্পৃক্ত করে তা খাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। কখনো দু'/এক টুকরার বেশ খায় না। বাস্তবতা হলো, ছাগলের চেয়ে খাসির গোশতে সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ বেশি থাকে। তাই একই গুন সম্পন্ন ছাগলের গোশতে তুলনামূলক সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ অনেকটাই কম হওয়ায় তেমন কোনো স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই। সম্পৃক্ত চর্বি কম বলে রক্তে কোলেস্টেরল-এর মাত্রা বৃদ্ধি করে শরীরকে বিপদে ফেলবে না। সেক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো রোগ না থাকলে ইচ্ছে মতো ছাগলের গোশত খাওয়া যায়। ছাগলের গোশতে সোডিয়ামের পরিমাণ কম ও পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে খাদ্য হিসেবে এ গোশতের স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক বেশিএবংশিশুদের খাদ্য হিসেবেও নিরাপদ। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় খাবারের মধ্যে ছাগলের গোশত ছিলো অন্যতম। হাদীসে এসেছে

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الْاَضَاحِيِّ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাগলের পায়া তুলে রাখতাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তা কুরবানীর পনেরো দিন পরও খেতেন।[১৪২]

প্রতি ১০০ গ্রাম ছাগলের গোশতে রয়েছে ১২২ ক্যালরি শক্তি, ২৩ গ্রাম প্রোটিন ও ২.৫৮ গ্রাম চর্বি। এছাড়াও বেশি মাত্রায় লৌহ থাকায় শরীরের রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করে। ছাগলের গোশত মানবদেহের জন্য খুবই কার্যকর- এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ এবং ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। গরুর গোশতের বিপরীতে ছাগলের গোশতে চর্বিযুক্ত শিরাগুলি কম থাকায় এটি অধিক পাতলা। শরীরের বিপাক উন্নত করে। গরুর গোশতের বিপরীতে ছাগলের গোশত স্বল্প পরিমাণে কোলেস্টেরল থাকে।সহজে হজমযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। ছাগলের গোশতে আলঝাইমারজনিত ঝুঁকি হ্রাস করে।শরীর থেকে অতিরিক্ত তরল সরিয়ে দেয় এবং কিডনির কাজকে সহজতর করে। ছাগলের গোশত মেরুদণ্ড রোগের জন্য খুব উপকারী, এটি কারটিলেজের অবস্থার উন্নতি করে, স্প্রেন এবং ক্ষতেরটিস্যু পুনর্জন্ম দেয়।ছাগলের গোশত লিভারে উপকারী প্রভাব ফেলে। এটি অ্যালকোহল, নিকোটিন এবং ড্রাগের বিষাক্ততাকেও পরিষ্কার করে।

বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি অব ডায়াটিকস অ্যান্ড নিউট্রিশন (বিএডিএন)-এর নির্বাহী পরিচালক ডা. সাজেদা কাশেম জ্যোতী বলেন- গরু ও খাসির মাংসের অনেক উপকারী দিকও আছে। পরিমিত পরিমাণে সঠিকভাবে খেলে এ থেকে যে পরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যায়তা সমপরিমাণ অন্য কিছু থেকে পাওয়া কঠিন।[১৪৩]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাগলের কাঁধের গোশত খুবই পছন্দ করতেন।হযরত যুবায়াহ বিনতে যুবাইর (রা.) বলেন- আমরা একবার আমাদের বাড়িতে বকরী যবেহ করলাম। নবী কারীম (সা.) খবর পাঠালেন, আমার অংশ পাঠিয়ে দিন। আমি বললাম, শুধু কাঁধের অংশ অবশিষ্ট আছে এবং এটা পাঠাতে আমার লজ্জা হচ্ছে। তা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: এটাই পাঠিয়ে দিন। কাঁধের গোশত বকরীর উত্তম অংশ। কাঁধের গোশত অনেক ভালো এবং কোনো ধরনের ক্ষতিকর নয়।[১৪৪]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ–

অর্থ: ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী করীম (সা.) কাঁধের গোশত পছন্দ করতেন।[১৪৫]

---

১৪১. আল-কুরআন, ৫: ৮৭-৮৮

১৪২. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: গোশতের শুটকি, খ. ৪, পৃ. ৩২, হাদীস নং- ৩৩১৩

১৪৩. মামুনুর রশীদ, *https://bangla.bdnews24.com* "মাংসের পুষ্টিগুণ ও খাওয়ায় সর্তকতা", ০২.০৮.২০২০, (থেকে উদ্ধৃত)

১৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ الذِّرَاعُ اَحَبَّ اللَّحْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) কাঁধের গোশত সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করতেন।[১৪৬]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) রান, বাহু এবং পিঠের গোশতও পছন্দ করতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ اُتِیَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ فَهَنَشَ مِنْهَا-

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গোশত আনা হলো। তাঁকে রানের গোশত দেয়া হলো এবং এটাই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তা চুষে খেলেন।[১৪৭]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَرَّبَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَنْبًا مَّشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ-

অর্থ: উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি (হযরত উম্মে সালামা রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ভুনা রান নিয়ে গেলে তিনি তা খেলেন।[১৪৮]

কিয়ামতের শাফায়াতের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্যে এ শব্দসমূহ এসেছে-

اُتِیَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَاَكَلَهُ، وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ-

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে গোশত আনা হলো। তাঁর (সা.) নিকট একটি সামনের রান তুলে ধরা হলো। তিনি তা খেতে লাগলেন এবং সামনের রানের গোশত তাঁর পছন্দনীয় ছিল।[১৪৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ-

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, নি:সন্দেহে সবচেয়ে সুস্বাদু গোশত হচ্ছে পিঠের গোশত।[১৫০]

হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) ভুনা গোশত পছন্দ করতেন। তাই শুধু রুটি খাওয়াই সুন্নাত নয়; বরং স্বচ্ছলতা থাকলে সুস্বাদু এবং উত্তম খাবার খাওয়াও সুন্নাতের খেলাফ নয়। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় উভয় অবস্থার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াপ্রয়োজন এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনোকিছু ছুরি দিয়ে কর্তন করা এবং টুকরা করা সুন্নাত পরিপন্থী নয়। অবশ্য সবক্ষেত্রে কাটা চামচের ব্যবহার একেবারেই পাশ্চাত্য ফ্যাশন। সুতরাং অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আমাদের মহব্বতই প্রমাণ করবে আমরা কোন পদ্ধতি ও সভ্যতা গ্রহণ করছি।

**মুরগির গোশত**

মুরগির গোশত খেতে আমরা সবাই পছন্দ করি। দামে সস্তা হওয়ায় মুরগির চাহিদা বাজারে সবচেয়ে বেশি।মুরগিতে কোলেস্ট্রেরাল এর পরিমান গরু ও খাসির গোশতের চেয়ে কম থাকায় সকলে খেতে পারে। এর পুষ্টি উপাদান অন্য গোশতের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। এটি খেতেও খুব সুস্বাদু এবং বিভিন্ন ভাবে খাওয়া যায়। চিকেন কবাব,চিকেন রোল, চিকেন গ্রীল, ভুনা এবং আরো অনেক পদ্ধতিতে রান্না করে খাওয়া যায়।গরু বা ছাগলের গোশতের চেয়ে সস্তা এ গোশতশরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর উপাদানে ভরপুর। মুরগির গোশতকম চর্বিযুক্ত প্রোটিন হওয়ায়হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে।তাই দীর্ঘদিন ওজন কমিয়ে রাখতে চাইলে মুরগির গোশথ নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৪৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: কোন অংগের গোশত অপেক্ষাকৃত উত্তম, খ. ৪, পৃ. ২৯, হাদীস নং- ৩৩০৭
১৪৮. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুযযামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৪৯. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিয়ামত, অনুচ্ছেদ: শাফাআত, খ. ২, পৃ. ১৯০, হাদীস নং- ২৪৩৪
১৫০. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সালুন-তরকারীর বর্ণনা, খ. ২, পৃ. ৬৪৬, হাদীস নং- ১৭১

খাবার।এ গোশতে গরু ও ছাগলের চেয়ে চর্বির পরিমান কম থাকায় এটি খাওয়া নিরাপদ এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম।মুরগির গোশতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকায় আমাদের পেশীকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।এছাড়া এতে উচ্চ মাত্রায় ট্রাইফটোফ্যান নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকায় এক বাটি চিকেন স্যুপ স্বস্তি এনে দিতে পারে। বিষণ্নবোধ হলে কয়েকটি চিকেন উইংস খাওয়া যেতে পারে। যা মস্তিষ্কে সেরেটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে চাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করে।সবসময় বয়স্কদের আর্থ্রাইটিস ও হাড় সংক্রান্ত অন্য রোগের আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই প্রতিদিন মুরগির গোশত খাবার তালিকায় রাখলে এর প্রোটিন হাড়ের ক্ষয় প্রতিরোধ করবে। মুরগির গোশত হোমোকিস্টাইনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে হার্টের বিভিন্ন ধরনের কার্ডিওভাস্কুলার রোগের বিরুদ্ধেও কাজ করে থাকে। আর হোমোকিস্টাইন একটি অ্যামিনো অ্যাসিড হওয়ায় উচ্চমাত্রায় এটি হার্টের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মুরগির গোশত ফসফরাস সমৃদ্ধ হওয়ায় দাঁত ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।তাছাড়া ফসফরাস আমাদের কিডনি, লিভার ও স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এই গোশতে ভিটামিন বি-৬ শরীরে বিপাকের মাত্রা উন্নত করে। শরীরে চর্বি না বাড়িয়েই খাবার হজম করতে সাহায্য করে।রক্তনালী ঠিক রাখতেও এটি কাজ করে থাকে।আমাদের শরীরকে ক্যান্সারমুক্ত রাখতে নিয়াসিন একটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন। মুরগির গোশতে প্রচুর পরিমাণে নিয়াসিন থাকে, যা বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার ও ক্রটিপূর্ণ ডিএনএ দ্বারা যেসব জিনগত সমস্যা তৈরি হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে সাহায্য করে। অন্য খাবারগুলোর মতো মুরগির গোশতও চোখের সুরক্ষায় কাজ করে থাকে। মুরগির গোশতে রেটিনল,লাইকোপেন আলফা ও বিটা ক্যারোটিন থাকে যার সবগুলোই ভিটামিন 'এ' তে পাওয়া যায়। চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এগুলো জরুরি উপাদান।সুতরাং আমাদের শরীর সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষারজন্য মুরগির গোশতের প্রয়োজনীয়তা কত বেশি তা সহজেই বোঝা যায়।

হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) মোরগের গোশতকে পছন্দ করতেন এবং খেতেন।
হযরত যাদহাম জারমী (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত আবু মূসা (রা.) বলেন-

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْكُلُ لَحْمَ دُجَاجٍ–

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।[১৫১]

عَنْ سُفَيْنَةَ قَالَ اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَحْمَ حَبَارٰى–

অর্থ: সুফায়না (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হুবারা (বন মোরগ বা এ জাতীয় এক প্রকার পাখি)-এর গোশত খেয়েছি।[১৫২] মুরগির গোশতের পুষ্টি উপাদান-
প্রতি ১০০ গ্রাম মুরগিতে উপাদান পরিমাণ- পানি ৭৪ শতাংশ, শক্তি ১২১ ক্যালরি, প্রোটিন ২০ গ্রাম, চর্বি ৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৪ মি.গ্রা, লৌহ ০.৭ মি.গ্রা, ভিটামিন বি ০.১ মি.গ্রা, ভিটামিন বি-২ ০.১৬ মি.গ্রা, নায়াসিন ১১.৬ মি.গ্রা, ম্যাগনেশিয়াম: ২০ মি.গ্রা, পটাশিয়াম: ১৮৯ মি.গ্রা.

উল্লেখ্য, খাদ্য তালিকায় শুধু গোশত রাখা ঠিক নয়, এর পাশাপাশি বিভিন্ন সবজি, অন্যান্য তরকারি ও সালাদ থাকা ভালো। এতে খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও সহজপাচ্য হওয়ার পাশাপাশি যেমন রুচি বদলানো যায়, তেমনি পরিবারের কেউ অসুস্থ থাকলে সেও স্বচ্ছন্দ্যে খেয়ে সুস্থ থাকতে পারবে।

**মাখন**

মাখন হলো এক ধরনের দুগ্ধজাত পণ্য, দেখতে ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধ থেকে ঘন অংশটা তুলে নিয়েমাখন তৈরি করা হয়। মাখনের সাথে কখনো কখনো লবণ এবং খাবারের রঙ যুক্ত করা হয়। বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকলেরই প্রিয়খাদ্য তালিকার মধ্যে অন্যতম হলো মাখন এবংপ্রাচীন যুগ থেকেই মাখনের কদর সর্বোচ্চ। এটি খুবই সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর এবং সহজলভ্য একটি খাবার। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন স্বাদের মাখন পাওয়া যায়। এটি পুষ্টি উপাদানের ঠাসা একটি খাদ্য উপাদান। এর মধ্যে প্রচুর স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রয়েছে, যা শরীরের পক্ষে খুব ভালো প্রভাব ফেলে। হাদীসে এসেছে-

---

১৫১. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাবার, অনুচ্ছেদ: মোরগ খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ১৮২৭
১৫২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: হুবারা খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ১৮২৮

عَنِ ابْنَىْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيْفَةً صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا– فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَانْزَلَ اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ الْوَحْىَ فِىْ بَيْتِنَا، وَ قَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَ تَمْرًا وَ كَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

অর্থ: সুলাইম গোত্রের বুসর-এর দুই পুত্রের সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁর বসার জন্য নরম করে দিলাম। তিনি এর উপর বসলেন। এ সময় আমাদের ঘরে মহামহিম আল্লাহ তাঁর ওপর অহী নাযিল করলেন। আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম এবং তিনি মাখন পছন্দ করতেন।[১৫৩]

**মাখনের উপকারিতা**

**(১) হার্টের স্বাস্থ্য রক্ষা:** অনেকের ধারণা মাখনের মধ্যে যেহেতু ফ্যাট জাতীয়খাদ্য উপাদান বেশি রয়েছে, তাই যারা হার্টের সমস্যায়ভুগছে তাদের জন্য এটি ভালো নাও হতে পারে। তাই অত্যধিক মাখন খাওয়ার ফলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েহার্টের সমস্যা এবং টাইপ টু ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অতিরিক্ত মাখন গ্রহণের ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। তবে মাখনেরমধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকলেও পাশাপাশি এর মধ্যে এমন কিছু খাদ্য উপাদান রয়েছে যেগুলো স্বল্প পরিমাণে গ্রহণ করলে হৃদরোগীদের শরীরে ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। দৈনিক এক টেবিল চামচ করে মাখন খাদ্য তালিকায়রাখলেসেক্ষেত্রে টাইপ টু ডায়াবেটিসের সমস্যা এবং হৃদরোগের সমস্যা অনেকটা কমে যেতে পারে। কেননা কোলেস্টেরল এর পাশাপাশি মাখন এর মধ্যে বেশকিছু ভালো ফ্যাট রয়েছে যেগুলো শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়।

**(২)ওযন নিয়ন্ত্রণ:** অত্যধিক তেল-মশলাযুক্ত কিংবা ফ্যাট জাতীয়খাবার খাওয়ার ফলে অনেকেই ওজন বৃদ্ধির সমস্যায় ভুগেছ। ওজন বৃদ্ধি শুধু দেখতেই খারাপ লাগে না, এটি আরো অনেক রোগকে ডেকে আনে।কিন্তু অন্যান্য ফ্যাট জাতীয়খাবার কমিয়েডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মাখন খাওয়া শুরু করলে শরীর তার প্রয়োজনীয় পরিমাণক্যালোরি গ্রহণ করবে এবং যথাযথ ক্যালোরি ক্ষয় করবে।অনেক পুষ্টিবিদ শরীরের প্রয়োজনীয়ক্যালরি পূরণের জন্য খাদ্যতালিকায়মাখন রাখতে বলেন। এর মধ্যে বেশকিছু খাদ্য উপাদান ছাড়াও উচ্চস্তরের মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে, যা ওজন কমাতে এবং হৃদরোগ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। দৈনিক এক টেবিল চামচ পিনাট বাটার গ্রহণ করলে ১০০ ক্যালোরি গ্রহণ করা হয় তাহলে শরীরে ওজন ও পেটের মেদ কম হতে থাকে।

**(৩) লিভার ক্যান্সার প্রতিরোধ:** যেকোনো ধরনের দুগ্ধজাত পণ্য লিভার ক্যান্সারের সমস্যা কম করে। সবধরনের দুগ্ধজাত পণ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকার কারণে শরীরে কোলেস্টেরল এর সম্ভাবনা বাড়িয়েতুললেও বেশ কিছু গবেষণায়দেখা গেছে যারা দৈনিক খাদ্যতালিকায়দুগ্ধজাতীয়খাদ্য যেমন- দুধ মাখন গ্রহণ করে তাদের লিভার ক্যান্সারের সমস্যা অনেকটা কম হয়। এছাড়াও যারা লিভারের সমস্যায়ভুগে তাদের জন্য অন্যতম একটি খাদ্য হলো বাদাম। এক্ষেত্রে বাদাম থেকে তৈরি মাখন খাদ্য তালিকায়রাখা যেতে পারে। কেননা বাদামে সাধারণত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন এ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যেগুলো শরীরের প্রদাহ করতে এবং অক্সিডেটিভ চাপ কমাতে সহায়তা করে।

**(৪) স্তনের বৃদ্ধি কমায়:** সন্তান জন্মের পরেই প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে অনেকেরইহঠাৎ স্তনের আকার সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেখতে খারাপ লাগে। এক্ষেত্রে স্তনের বৃদ্ধি কমাতে মাখন ব্যবহার করা যেতে পারে। দৈনিক কাঁচা মাখন স্তনের ওপর লাগিয়েদু-তিন মিনিট ম্যাসাজ করলে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাখন থেকে তৈরি যেকোনো ধরনের ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে।

**(৫) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অন্যতম একটি খাদ্য হলো মাখন। মূলত পিনাট বাটার আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। মাখনে ভিটামিন ই এবং অন্যান্য অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় ঋতুকালীন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের শরীরে গড়ে তুলতে এটি সহায়ক। নাস্তার সময় পিনাট বাটার দিয়ে পাউরুটিখাওয়া যেতে পারে। এতে শরীর তার প্রয়োজনীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়েওঠবে।

১৫৩. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: মাখন দিয়ে খেজুর খাওয়া, খ. ৪, পৃ. ৪১, হাদীস নং- ৩৩৩৪

**(৬) অন্ত্রের সমস্যা কমায়:** মাখন এর মধ্যে রয়েছে এমন এক ধরনের ফ্যাটি এসিড যেগুলি আমাদের হজম শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। এছাড়াও এটি পেটের ভেতরের মধ্যে যে কোনো প্রদাহ কম করতে, শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে এবং কোলন স্বাস্থ্য উন্নতিতে সহায়তা করে। মাখন এর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে এর মত চর্বিযুক্ত দ্রবণীয়ভিটামিন গুলো। এগুলি শরীর শোষণ করার ফলে পেটের সমস্যা অনেকটা কম হয়। এছাড়াও রয়েছে এক ধরনের পিনাট বাটার, যা পেটের সমস্যা, যেমন- পেট ফাঁপা ও গ্যাস ইত্যাদি দূর করতে সহায়ক।[১৫৪]

১০০ গ্রাম মাখনে যেসকল উপাদান রয়েছে- ক্যালোরি- ৭১৭ কেসিএল, স্যাচুরেটেড ফ্যাট-৫১ গ্রাম, পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট- ৩ গ্রাম, মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট- ২১ গ্রাম, ট্রান্স ফ্যাট- ৩.৩ গ্রাম, কালেস্টেরল- ২১৫ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম- ১১ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম- ২৪ মিলিগ্রাম, প্রোটিন- ০.৯ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট- ০.১ গ্রাম, ভিটামিন এ- ৪৯%, ক্যালসিয়াম- ২% এবং ভিটামিন-ডি- ১৫%।

**মধু**

মধু ঔষধ এবং খাদ্য উভয়ই। এ সুস্বাদু খাদ্যটি ছোট-বড় প্রত্যেক দেশের এবং সকল পর্যায়ের মানুষই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে থাকে। এটি তিব্বে ইলাহী এবং তিব্বে নববী অর্থাৎ খোদায়ী চিকিৎসা ও নবী কারীম (সা.)-এর চিকিৎসা বিধানের অন্তর্ভুক্ত। মধু মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং দৈহিক রোগ-ব্যাধি শিফাদানে এক অব্যর্থ মহৌষধ।যুগ যুগ ধরে মানুষ এটি পান করে উপকৃত হয়ে আসছে এবং আজো হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মধু পান করতে খুবই পছন্দ করতেন। হাদীসে এসেছে– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَ الْعَسَلُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) মিষ্টিজাত দ্রব্য ও মধু বেশি পছন্দ করতেন।[১৫৫]অন্য একটি হাদীসে এসেছে– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ عَسَلَ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।[১৫৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ الْعَسَلَ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।[১৫৭]

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ اَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ، فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ اَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً،ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ، وَ كَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ اسْقِهِ عَسَلاً، فَسَقَاهُ فَبَرَا–

অর্থ: আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল: আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী (সা.) বললেন: তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি (একই বিষয়ে) দ্বিতীয়বার আসলে তিনি ইরশাদ করলেন: তাকে মধু পান করাও। অত:পর লোকটি (একই বিষয়ে) তৃতীয়বার আসলে তিনি ইরশাদ করলেন: তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল: আমি অনুরূপই করেছি। তখন নবী (সা.) ইরশাদ করলেন: আল্লাহ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে আবার মধু পান করালো। এবার সে আরোগ্য লাভ করলো।[১৫৮]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً–

---

১৫৪. *https://www.stylecraze.com/bengali/makhoner-upokarita-in-bengali* / "মাখনের উপকারিতা এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া", (থেকে উদ্ধৃত)

১৫৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধুর সাহায্যে চিকিৎসা করা, খ. ২, পৃ. ১৬১৫, হাদীস নং - ৫৬৮২

১৫৬. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্যসমূহ, অনুচ্ছেদ: বাযাক তথা আঙ্গুরের সামান্য পাকানো রস..., খ. ২, পৃ. ১৫৯৫, হাদীস নং- ৫৫৯৯

১৫৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: মিষ্টি দ্রব্য, খ. ৪, পৃ. ৩৬, হাদীস নং- ৩৩২৩

১৫৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধুর সাহায্যে চিকিৎসা করা, খ. ২, পৃ. ১৬১৬, হাদীস নং- ৫৬৮৪

অর্থ: নবী (সা.)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (সা.) যখন যয়নব বিনত জাহাশ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন, তখন তিনি সেখানে মধুর শরবত পান করতেন।[১৫৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَ الْقُرْاٰنِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা শিফাদানকারী দু'টি বস্তুকে নিজেদের জন্য অবশ্যই গ্রহণ করবে। একটি মধু এবং অপরটি কুরআন।[১৬০]

اِبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَتْ تَخْرُجُ بِهِ قَرْحَةٌ وَ لاَ شَىْءٌ اِلاَّ لَطخَ الْمَوْضعَ بِالْعَسَلِ وَ يَقْرأُ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ–

অর্থ: ইবন ওমর (রা.)-এর যখনই কোন ফোঁড়া, পাঁচড়া বা অন্য কিছু বের হত, তিনি তার উপর মধু লগিয়ে দিয়ে পবিত্র কালামের এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। যার অর্থ: আল্লাহ তাআলা মধু মক্ষিকার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় এবং মধু বের করে থাকেন, যার মধ্যে মানুষের শিফা ও রোগ মুক্তি রয়েছে।

আরবী পরিভাষায় মধু পোকাকে 'নাহল' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এ নামে একটি স্বতন্ত্র সূরাই বিদ্যমানরয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

অর্থ: মধুর মধ্যে মানুষের শিফা রয়েছে।[১৬১]

উল্লেখ্য, মধুর উপকারিতার বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**লাউ**

লাউ মূলত শীতের সবজি হলেও এখন কম-বেশি সারা বছরই এটি বাজারে পাওয়া যায়। এই সবজি পুষ্টিগুণে ভরপুর। চিংড়ি দিয়ে লাউ বেশ সুস্বাধু। ডাল দিয়েও খাওয়া যায় এই সবজি। আবার অনেকে টাকি মাছ দিয়ে খায়। লাউয়ের ছিলাও শুঁটকি দিয়ে খাওয়া যায়। শুধু সবজি হিসেবে বা অন্য যে কোনোভাবেই খাওয়া হোক না কেন, লাউ শরীরের জন্য বেশ উপকারী। লাউকে একটি আদর্শ সবজি বলা হয় এবং তা পরিমাণে বেশি খেলেও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। লাউয়ে আছে ভিটামিন-এ ও বি কমপ্লেক্স, সি-সহ আছে ফলিক অ্যাসিড, ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড। এ ছাড়া ১০০ গ্রাম লাউয়ে জলীয় অংশের পরিমাণ ৯৬ দশমিক ১০ গ্রাম, আঁশ শূন্য দশমিক ৬ গ্রাম, আমিষ শূন্য দশমিক ২ গ্রাম, চর্বি শূন্য দশমিক ১ গ্রাম, শর্করা ২ দশমিক ৫ গ্রাম এবং খাদ্যশক্তি ১২ কিলোক্যালরি। লাউ খেলে মোটা হওয়ার আশঙ্কা নেই।তাছাড়া শীতে শরীর থেকে পানি দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ায় ত্বক রুক্ষ হয়ে ওঠে। নিয়মিত লাউ খেলে ত্বকের আর্দ্রতা ঠিক থাকে। নবী কারীম (সা.) লাউ বা কদু খেতে পছন্দ করতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيْرٍ وَ مَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَ قَدِيْدٌ قَالَ اَنَسُ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِى الصَّفْحَةِ قَالَفَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য কিছু খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলো। সেই দাওয়াতে আমিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরসঙ্গে গেলাম। অত:পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে যবের রুটিঝুল ও শুকনা গোশত উপস্থিত করলো। আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখলাম, তিনি পাত্রের কিনার থেকে চতুর্দিক থেকে লাউয়ের টুকরা খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমিও লাউ পছন্দ করতে লাগলাম।[১৬২]

১৫৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: মধুর শরবত পান করা, খ. ২, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং- ৩৭১৪
১৬০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: মধু, খ. ৪, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ৩৪৫২
১৬১. আল-কুরআন, ১৬: ৪৯
১৬২. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: লাউ খাওয়া মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ১৪৭, হাদীস নং ৫৩২০

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন- লাউয়ে প্রচুর পানি থাকায় দেহের পানির পরিমাণেও ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে। ডায়রিয়াজনিত পানিশূন্যতা রোধেও এটি কার্যকর। কিডনির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে লাউ। প্রস্রাবের সংক্রমণ রোধেও এটি অনন্য। যেসব রোগীউচ্চ রক্তচাপজনিত রোগে ভুগছে, ডাক্তারগণ তাদেরকে লাউ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ভালো ঘুমের জন্যও লাউ  সহায়ক। তাই যাদের ভালো ঘুম হয় না, তারা নিয়মিত লাউ খেলে বেশ উপকৃত হবে। লাউ রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য কওে এবং এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে রয়েছে, যা হার্টের জন্য উপকারী।জন্ডিস ও কিডনির সমস্যায়ও লাউ খাওয়া যায়। লাউয়ে খুব কম পরিমাণে ক্যালরি ও প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার রয়েছে। এটি ওজন কমাতেও সাহায্য করে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী সবজি লাউ।লাউ রয়েছে দ্রবণীয়, অদ্রবণীয় ফাইবার ও পানি। দ্রবণীয় ফাইবার খাবার সহজে হজম করতে সাহায্য করে। লাউ খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা ও অ্যাসিডিটির সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। লাউ পাতার তরকারি মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে এবং ইউরিন ইনফেকশনে খুব উপকারী লাউ।[১৬৩]

তবে লাউ কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। আমাদের দেশে লাউক, ঘিয়া, গোল বা পিলু কদু এবং লাল ফুল কদু সচরাচর পাওয়া যায়। প্রথম দুই প্রকার কম-বেশি প্রায় একই বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু তৃতীয় প্রকার একেবারেই ভিন্ন ধরনের, শুধু নামে মিল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) লাউকি পছন্দ করতেন। যাকে সাদা ফুলের কদু এবং ঘিয়া কদুও বলা হয়। এটি একটি উত্তম তরকারী। খেতে খুবই সুস্বাদু, কার্যকারিতাও স্বাস্থ্য সম্মত, স্বভাব খুবই ঠান্ডা, খুবই দ্রুত হজমকারী এবং পাকাতেও সুবিধা।

অবশেষে বলা যায়, লাউকে আমরা একটি সাধারণ সবজি হিসেবে দেখলেও বাস্তবে শরীরকে নানা রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে লাউয়ের কোনো বিকল্প নেই। আর এজন্যই হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা.) লাউকে এত পছন্দ করতেন যে পাত্রের কিনার থেকে লাউয়ের টুকরা খুঁজে খুঁজে তিনি খেতেন। গবেষণা বলছে, লাউয়ের মধ্যে প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন সি, বি এবং ডি, সেই সঙ্গে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ফোলেট, আয়রন এবং পটাশিয়াম রয়েছে, যা নানাবিধ রোগের হাত থেকে শরীরকে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরের আরো নানা উপকারের পাওয়া যায়। যেমন-

**(ক) ওযন কমেঃ** বেশ কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে, যে কোনো ভাবেই হোক, তা তরকারি বানিয়ে অথবা রস হিসেবেলাউ খাওয়া শুরু করলে শরীরে ফাইবারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং খিদে কমে যায়। সেই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কমে যায় খাওয়ার পরিমাণও। আর কম খেলে যে ওযন দ্রুত কমে, তা সবাই স্বীকার করে।

**(খ) স্ট্রেস লেভেল কমেঃ** লাউয়ে রয়েছে কোলন নামক এক ধরনের নিউরো ট্রান্সমিটার, যা শরীরে প্রবেশ করা মাত্র মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। এতে স্বাভাবিকভাবেই স্ট্রেস লেভেল কমে। সেই সঙ্গে ডিপ্রেশনসহ একাধিক মেন্টাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমে যায় ।

**(গ) কনস্টিপেশন এবং নানাবিধ পেটের রোগের প্রকোপ কমেঃ** অনিয়ন্ত্রিত খাওয়া-দাওয়ার কারণে বদ হজম এবং গ্যাস-অম্বল বাঙালির প্রতিদিনের সঙ্গী। তার ওপর কনস্টিপেশনের মতো সমস্যা তো আছেই। এমন পরিস্থিতিতে পেটকে চাঙ্গা করে তুলতে লাউয়ের কোনো বিকল্প হয় না। কারণ এ সবজিটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় পানি এবং ফাইবার, যা হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটায় এবং কনস্টিপেশনের মতো রোগের প্রকোপ কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**(ঘ) শরীরে পানির অভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা কমেঃ** শরীরকে চাঙ্গা রাখতে পানির কোনো বিকল্প নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে শরীর তার প্রয়োজনীয় পানি না পেলে দেখা দেয় নানা রকমের রোগ। তাই দেহে যাতে পানির ঘাটতি দেখা না দেয়, সেদিকে খেয়াল রাখাটা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং খাবারের তালিকায় লাউ থাকা জরুরী।কারণ এই সবজিটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় পানি, যা দেহের পানির অভাব মেটাতে যেমন বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, তেমনি ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও যায় কমে।

১৬৩. *https://www.jugantor.com/lifestyle.*“লাউ খেলে যত উপকার”, ১৩.১২.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)

**(ঙ) ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে:** যাদের উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা রয়েছে, তাদের ডায়েটে লাউ দিয়ে তৈরি কোনো না কোনো পদ থাকা জরুরি! কারণ এতে রয়েছে এমন কিছু পুষ্টিকর উপাদান, যা রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে হার্টও ভালো থাকে।

**(চ) ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায়:** নিয়মিতলাউ খেলে শরীরের ত্বক ভেতর থেকে স্বাস্থ্যকর হয়ে সৌন্দর্য বাড়ে। একই সাথে তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ব্রণের মতো ত্বকের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও আর থাকে না।

**(ছ) শরীর ঠাণ্ডা করে:** অনেক সময়ই শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা বেশ বেড়ে যায়। তাই সপ্তাহে ২-৩ দিন লাউ খেলে তা নিয়ন্ত্রণে থাকে। কারণ সবজিটিতে যেমন রয়েছে প্রচুর মাত্রায় পানি, তেমনি রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ, যা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি দেহ থেকে ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানও বের করে দেয়।

**(জ) ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশনের মতো রোগের প্রকোপ কমে:** এই সবজিতে প্রচুর মাত্রায় পানি থাকার কারণে এটি খেলে প্রস্রাব খুব ভালো হয়, ফলে 'ইউ টি আই' এর মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এমনিতেই অনেকটা কমে যায়।

**(ঝ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটায়:** প্রতিদিন লাউয়ের রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে। এতে ছোট-বড়নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমেযায়।[১৬৪]

হাদীসে এসেছে– عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُحِبُّ الْقَرْعَ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) লাউয়ের তরকারী পছন্দ করতেন।[১৬৫]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ بَيْتِهِ وَ عِنْدَهُ هٰذِهِ الدُّبَّاءُ، فَقُلْتُ اَىُّ شَيْءٍ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا الْقَرْعُ، هُوَ الدُّبَّاءُ، نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا–

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাড়িতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে লাউ ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা কী? তিনি ইরশাদ করলেন: এটা লাউয়ের তরকারী, আমরা তা প্রচুর খাই।[১৬৬]

**সারীদ**

আমরা অনেক সুন্নাতি জিনিস খেয়েথাকি যা নিজেরাই জানি না যে জিনিসটি আসলে সুন্নাতি। ফলে কাঙ্ক্ষিত নিয়ামত লাভ করতে পারি না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রুটি ও গোশত আমরা সবাই খাই, কিন্তু এটিই যে সারীদ একথা আমরা অনেকে জানি না। সারীদ হলো গোশতের ঝোলে ভেজানো টুকরো টুকরো রুটি দিয়ে তৈরি বিশেষ খাদ্য। যা রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই পছন্দ করতেন।রমযান মাসে মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে বিশেষ করে আরব দেশগুলিতে সারীদ খাওয়ার প্রচলন অনেক বেশি। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: নারী সমাজের ওপর আয়িশার মর্যাদা এমন, যেমন অন্যান্য সকল প্রকারের খাদ্যের ওপর সারীদের মর্যাদা।[১৬৭]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে সহজেই বোঝা যায়, সারীদ কত বরকতময় একটি খাবার।

উক্ত রেওয়ায়েতে সারীদের দু'টি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে-

(১) রুটি থেকে তৈরি সারীদ। রুটির টুকরা  গোশতের ঝোল, তরকারীর ঝোল বা পাতলা ডালের মধ্যে এমনভাবে ভিজিয়ে রাখা যেন রুটি খুব ভালোভাবে ভিজে যায় এবং তা চর্বনের প্রয়োজন না হয়। এ খাবার খুবই নরম এবং দ্রুত হজ যোগ্য।

---

১৬৪. *https://www.ekushey-tv.com.*"লাউ খেলে ১০টি উপকার মিলবে", আপডেপ: ১৬.০৯.২০১৮ (থেকে উদ্ধৃত)

১৬৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: লাউ, খ. ৪, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ৩৩০২

১৬৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: লাউ, খ. ৪, পৃ. ২৮, হাদীস নং- ৩৩০৪

১৬৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: অন্যান্য খাদ্যের ওপর সারীদের মর্যাদা, খ. ৪, পৃ. ১৯, হাদীস নং- ৩২৮১

(২) হায়েস থেকে তৈরি সারীদ। অর্থাৎ ছাতুর মধ্যে খেজুর, পনির, ঘি মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। এ প্রকারের খাদ্য তৈরির উদ্দেশ্য হলো খাবার নরম হওয়া এবং চিবানো প্রয়োজন না হওয়া। এটাও দ্রুত হজম হয় এবং খেতে সুস্বাদু।

**দুধ**

দুধ মহান আল্লাহর বড় একটি নিয়ামত। এ নিয়ামতের কথা পবিত্র কুরআনেও এসেছে এবং নবী কারীম (সা.) দুধ খবই পছন্দ করতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِقَدَحِيْ هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَ النَّبِيْذَ وَ الْمَاءَ وَ اللَّبَنَ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালাটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সব ধরনের পানীয় (দ্রব্য) মধু, নাবীয, পানি, দুধ ইত্যাদি পান করিয়েছি।[১৬৮]

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَرْنَا بِعَرَابِيٍّ وَ قَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ–

অর্থ: বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা.) বলেছেন, নবী কারীম (সা.)-এর সঙ্গে আমরা যখন মক্কা থেকে (হিজরত করে) মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলাম, এক পর্যায়ে আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) তৃষ্ণার্ত হলে আমি তাঁর জন্য কিছু দুধ দোহন করে নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। আমার সন্তুষ্টি পরিমাণে তিনি পান করলেন।[১৬৯]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اِنَّ النَّبِيَّ اُتِيَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَ لَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।মিরাজের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট মদ ও দুধের দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলে তিনি সে দু'টির প্রতি তাকালেন, তারপর তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। জিবরাইল (আ.) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আপনাকে স্বভাবজাত (সঠিক) পথ গ্রহণের হিদায়াত দিয়েছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মাত বিভ্রান্ত হয়ে যেতো।[১৭০]

হাদীসে এসেছে – عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اُتِيَ بِلَبَنٍ قَالَ بَرَكَةٌ اَوْ بَرَكَتَانِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যখন দুধ আনা হতো, তিনি বলতেন: এক অথবা দুই বরকত।[১৭১]

উল্লেখ্য, দুধের উপকারিতার বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**খেজুর ও শসা এক সাথে খাওয়া**

খেজুর কাঁচা বা শুকনা হোক তার নিজস্ব সর্বপ্রকার উপকারের সাথে গরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কাঁকরি বা শসাকে আরবীতে কিস্সা এবং ইংরেজিতে cucumis utilissimus বলা হয়। মূলত শসা ভিজা পানসা হয়ে থাকে। এর স্বভাব প্রতিক্রিয়া ঠান্ডা। এটা পিপাসা, গরম, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং রক্তের চাপ ইত্যাদি কমিয়ে দেয়। এটা অতি দ্রুত হজম হয়। কসা অন্তরে শান্তি আনে ও প্রস্রাব সৃষ্টি করে। প্রস্রাবের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করে। মূত্রদ্বার দিয়ে পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি নির্গত হওয়া বন্ধ করে। মূত্রাশয়ের পাথর দূরীকরণ এবং মূত্রথলীর জন্য বিশেষ উপকারী।শসার মধ্যে শতকরা ৭৫.৬ ভাগ প্রাকৃতিক পানি এবং ১/২ ভাগ মাংস, ২/৩ ভাগ শ্বেসার বা মাড় রয়েছে। তাছাড়া এতে তৈলাক্ত পদার্থ, খনিজ লবণ, পটাশিয়াম, লাইম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদিও বিদ্যমানরয়েছে। হাদীসে এসেছে-

---

১৬৮. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: যে নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) গাঢ় হয়নি এবং নেশা সৃষ্টিকারী হয়নি, তা মুবাহ, খ. ৬, পৃ. ১০৮, হাদীস নং- ৫২৩২

১৬৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: দুধ পান জায়েয, খ. ৬, পৃ. ১০৯, হাদীস নং- ৫২৩৩

১৭০. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: দুধ পান জায়েয, খ. ৬, পৃ. ১১০, হাদীস নং- ৫২৩৫

১৭১. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: দুধ, খ. ৪, পৃ. ৩৫, হাদীস নং- ৩৩২১

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ-

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.)-তাজা খেজুরের সাথে কাঁকরি (শসা) খেতেন।[১৭২]

এছাড়া হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) খরবুজা বা বাঙ্গি খেতেও পছন্দ করতেন। আসলে খবরুজাও অনেক উপকারী একটি ফল। নিম্নে সংক্ষেপে এর উপকারিতা উপস্থাপন করা হলো-
গ্রীষ্মকালে শরীর ঠান্ডা রাখতে অনেকেরই প্রথম পছন্দ হলো তরমুজ। কিন্তু খুবরুজা বা খরমুজও অনেকটা তরমুজের মতোই। বাংলায় এটা বাঙ্গি বা ফুটি, ইংরেজি নাম melon এবং বৈজ্ঞানিক নাম Cucumis melo, অবশ্য কাছাকাছি ধরনের অনেক মেলন জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতি ও প্রকরণের ফল আছে যেগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা রয়েছে। বাঙ্গিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আঁশ থাকায় হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এটা সাধারণত বেলে মাটিতে জন্মায়,এই ফলের গাছ অনেকটা শসা গাছের মতো লতানো।

বাঙ্গিআকারে বেশ বড় এবং পাকলে হলুদ রঙের হয়। বাইরের মিষ্টি কুমড়োর মতো হালকা খাঁজযুক্ত। খেতে খুব বেশি মিষ্টি হয় এবং ভেতরটা ফাঁপা। এতে চিনির পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও এটি খুব উপকারী। এতে ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং ফাইবার বেশি হওয়ায় ওজন কমাতে সাহায্য করে। বাঙ্গিতে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন সি এবং বিটা ক্যারোটিন রয়েছে, যা ফ্রি রেডিকেলগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং নির্মূল করতে পারে। যা ক্যানসার প্রতিরোধেসহায়কএবং দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখতে সাহায্য করে। শরীরে পৌঁছানোর পর এই বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিক হয় যা ছানি প্রতিরোধ করে এবং দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের জন্য বাঙ্গি একটি উপকারী ফল। চিকিৎসকেরা সাধারণত গর্ভবতী মহিলাদের ফলিক অ্যাসিড খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, আর বাঙ্গিতে উপস্থিত উচ্চ পরিমাণে পোলেট উপাদান গর্ভবতীর জন্য উপকারী এবং ভ্রূণের সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলে এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে।

নিয়মিত বাঙ্গি খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় যেকোনো রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শরীরে শক্তি জোগায়। বাঙ্গিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে করে হার্টকে সুরক্ষিত রাখেএবং এই খনিজ উচ্চ রক্তচাপ এবং দেহের ক্ষয় প্রতিরোধ করে। এটি এডিনোসিন নামক যৌগ সমৃদ্ধ যা হার্টের জন্য উপকারী এবং কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। বাঙ্গিতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকায় হার্টবিটকে স্বাভাবিক রাখে এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহকে উদ্দীপীত করায় অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ লাগে। এতে আরও সুপার অক্সাইড রয়েছে যা রক্তচাপ কম করে এবং স্নায়ু শিথিল করে স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে সেলুলার মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে। ঠান্ডা বাঙ্গি পাকস্থলির জন্য উপকারী। এটি পাচনতন্ত্রকে স্বাস্থ্যকর করে তোলে এবং অন্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি পাচনতন্ত্রে খাবারের ভালো এবং মসৃণ প্রবাহকে নিশ্চিত করার কারণে কলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এটি অনিদ্রাকে দূর করে। কারণ এতে রয়েছে শক্তিশালী রেচক বৈশিষ্ট্য ইউনিককমপাউন্ড যা স্নায়ুশিথিল করে এবং উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠতে সাহায্য করে। যাদের অনিদ্রার সমস্যা রয়েছে তাদের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রশমিত করে এবং পর্যাপ্ত ঘুমাতে সাহায্য করে। সঠিক মাত্রায় বাঙ্গি খেলে বাতের ব্যথা, গাঁটের ব্যথা এবং অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। কারণ এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান যা হাড়ের জয়েন্টে ব্যথা কমায়। কিডনির জন্যও বাঙ্গি উপকারী। কারণ এতে রয়েছে পটাসিয়াম, যা কিডনিতে পাথর তৈরি হতে বাধা প্রদান করে।
শরীরের পাশাপাশি বাঙ্গি ত্বকের জন্যও খুব উপকারী। এতে উপস্থিত ভিটামিন কে এবং ই ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর উচ্চ পানীয় উপাদান ত্বককে ভেতর থেকে হাইড্রেট করে। বাঙ্গি ভিটামিন বি, কোলাইন এবং বিটাইনের অন্যতম উৎস যা ত্বককে পুনঃরুজ্জীবিত এবং হাইড্রেট করে। ত্বক হয়ে ওঠে তুলতুলে নরম। এর অ্যান্টি এজিং উপাদান ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া রোধ করে এবং এর মধ্যে উপস্থিত ভিটামিন সি ফ্রি রেডিকেল দ্বারা ত্বকের ক্ষয় প্রতিরোধ করে। ত্বক কুঁচকাতে দেয় না এবং বলিরেখা রোধ করে।

---

১৭২. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাবার, অনুচ্ছেদ: তাজা খেজুরের সাথে কাঁকরি খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৮, হাদীস নং- ১৮৪৪

**তরমুজ এবং খেজুর একত্রে খাওয়া**

গ্রীষ্মকালে যেসব ফল আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে তরমুজ একটি উল্লেখযোগ্য ফল। এ ফলটি একটি মৌসুমী ফল। ফলটির বাইরে সবুজ মোটা খোসাযুক্ত, গোল বৃত্তে আবৃত, ভেতরে লাল রসালো এবং বীজগুলি কালো চ্যাপ্টা।মিষ্টি রসালো এবং সুস্বাদু এ ফলের আদি নিবাস আফ্রিকাতে। পরে পৃথিবীজুড়ে তরমুজের চাষাবাদ শুরু হয়। আমাদের দেশে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে খুব বেশি পাওয়া যায়।তরমুজ কেবল খেতেই সুস্বাদু নয়। এতে আছে নানা গুণাবলি।তরমুজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। যা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই উপকারী তরমুজ এবং খেজুর এক সাথে খাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ فَقُوْلُ نُكْسِرُ حَرَ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا– وَ بَرْدَ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) তরমুজ ফল তাজা খেজুরের সাথে খেতেন এবং বলতেন: খেজুরের গরমকে তরমুজের ঠান্ডার দ্বারা এবং তরমুজের ঠান্ডাকে খেজুরের গরমের দ্বারা বিদূরিত করি।[১৭৩]

উপকারিতা: তরমুজ পুষ্টি গুণে ভরা একটি ফল। ভিটামিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস তরমুজ। তরমুজের প্রায় ৯৬ শতাংশই পানি। তাই প্রচন্ড গরমে শরীরে পানির চাহিদা পূরণে এবং শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে তরমুজ। যারা গরমে কাজ করে বা বেশি ঘাম হয় তাদের নিয়মিত তরমুজ খাওয়া দরকার। এতে শরীর তাড়াতাড়ি দুর্বল হয় না। তরমুজে যে পটাশিয়াম থাকে তা মানব দেহে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। হৃদপিন্ডের সুস্থতা রক্ষা করে। পুষ্টিবিদদের মতে তরমুজ মানব দেহের হৃদরোগ, হাঁপানী, মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ (স্ট্রোক) রোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোকে সঠিক এবং সুস্থ রাখে। তাজা তরমুজে লাইকোপিন, বিটা-ক্যারোটিন, লুটেইন, জিয়াজেন্থিন, ক্রিপ্টোজেন্থিন উপাদান থাকে। এসব ফ্লেভনয়েডস অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে দেহের ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। ফলে পাকস্থলি, ফুসফুস, স্তন, প্রোস্টেট, জরায়ু ইত্যাদির ক্যান্সারের প্রবণতা কমে যায়। তরমুজে লাইকোপেন উপাদানটি সূর্যের আলোর বেগুনি রশ্মির হাত থেকে আমাদের চামড়াকে রক্ষা করে। তরমুজ দেহে চর্বি জমা হওয়ার ব্যবস্থা কমিয়ে দেয়। ফলে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তরমুজে বিটা ক্যারোটিন ও ম্যাগানিজ থাকে। যা চামড়ার রোগ প্রতিরোধ ও মসৃণ করে। তরমুজে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ভিটামিন সি মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সুষ্ঠু রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, দাঁতের সমস্যা, চামড়ার সৌন্দর্য, মুখের ঘাঁ, সর্দি, গরম ও ঠান্ডা জ্বর প্রতিরোধে বেশ উপকার করে। তরমুজ অত্যন্ত রসালো ফল বলে মানব দেহের বৃক্ক বা কিডনীর জন্য খুবই উপকারী। তরমুজে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, রক্তের ইনসুলিনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদদের মতে ডায়াবেটিস রোগীরা তরমুজ খেতে পারবেন। তবে নিজ নিজ চিকিৎসকের পরামর্শ মতে। তরমুজের আঁশ ও পানি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। তরমুজের পটাশিয়াম মানব দেহের হাঁড়ের গঠন শক্ত ও মজবুত করে। তাছাড়া দেহের ক্যালসিয়াম ধরে রাখতে সাহায্য করে। হাঁড়ের জোড়াগুলোকে মজবুত করে। তরমুজে থাকে বিটা ক্যারোটিন। যে কারণে তরমুজের শাঁস লাল হয়। এ উপাদানটি চোখের নানা সমস্যা দূর করে। চোখকে সুস্থ সবল রাখে। চোখের দৃষ্টি শক্তি প্রখর রাখে। তরমুজে প্রাকৃতিকভাবে অতি অল্প পরিমাণে চর্বি থাকে। তাই পেট ভরে তরমুজ খেলেও ওজন বাড়ে না। তরমুজ খেলে অ্যাক্সিডেটিভ স্টেসজনিত অসুস্থতা কমে যায়। তরমুজে সিট্রোলিন নামক বিশেষ অ্যামাইনো এসিডের উপাদান রয়েছে। যা মানব দেহের পুরুষের শুক্রাণু ও মহিলাদের ডিম্বানুকে পরিপুষ্ট করে। যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে। তাই যাদের যৌন ক্ষমতা কম তারা নিয়মিত তরমুজ খেলে বেশ উপকার পাবে। এটি প্রাকৃতিক ঔষধ হিসাবে কাজ করে। তার এই উপাদান কিডনীর জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং কিডনীতে পাথর জমতে দেয় না ফলে কিডনী সুস্থ এবং সবল থাকে। তরমুজে সিলিকা উপাদান থাকে যা নখের সমস্যা ও ভঙ্গুরতা কমায় এবং সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করে। তরমুজে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বা প্রদাহ নিরোধী হিসেবে ভালো কাজ করে তাই শরীরে প্রদাহ জনিত ব্যথা কমতে সাহায্য করে যেমন বাতের ব্যথা। তরমুজের স্বভাব প্রতিক্রিয়া ঠান্ডা, পিপাসা নিবারণকারী, অধিক প্রস্রাব সৃষ্টিকারী ও

---

১৭৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৮০, হাদীস নং- ৩৮৩৬; *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাবার, অনুচ্ছেদ: তাজা খেজুরের সাথে খবরুজা খাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদীস নং- ১৮৪৩

কুষ্ঠ-কাঠিণ্য দূরকারী। পিত্তজ্বর, দাহজ্বর, মূত্র জ্বালা, মূত্রাশয়ের পাথর, ক্ষত, ক্ষয়রোগ, বিরক্তি, শীর্ণতা এবং শুষ্ক কাশির জন্যও এর ব্যবহার বিশেষ ফলদায়ক।খেজুরের উপকারিতা সর্ম্পকে ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পুষ্টিবিদদের মতে প্রতি ১০০ গ্রাম তরতাজা তরমুজে খাদ্য উপাদান হলো-
জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, আমিষ ০.৫ গ্রাম, আঁশ ০.২ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শ্বেসার ৬.৫ গ্রাম, ভিটামিন এ ৫৬৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৬ মিলিগ্রাম, খাদ্যশক্তি ১৬ মিলিগ্রাম, শর্করা ৩.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১২ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.১৫ গ্রাম, লৌহ ৭.৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৩ মিলিগ্রাম, বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম।

**খেজুর ও মাখন এক সাথে খাওয়া**

রাসূলুল্লাহ (সা.) শুকনা খেজুরকে ঘি এবং মাখনের সাথে মিশিয়ে খেতেন। যাতে ঘিয়ের মাধ্যমে এর শুষ্কতা দূর হয়ে যায়। এমনিভাবে তিনি কাঁকরির সাথে তাজা খেজুর খেতেন। এগুলো একটা অন্যটার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দূর করে থাকে।

عَنْ اِبْنَىْ بُسْرِ السُّلَمِيِّيْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَدمْنَا لَهُ زُبْدًا وَ تَمرًا وَ كَانَ يُحِبُّ الزُّبَدَ وَ التَّمرَ–

অর্থ: বুসর সুলামী (রা.)-এর দুই পুত্র (আতিয়া এবং আবদুল্লাহ রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.) তাশরীফ আনলে আমরা তাঁর সামনে তাজা খেজুর এবং মাখন রাখলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) মাখন এবং তাজা খেজুর পছন্দ করতেন।[১৭৪]

**যব খাওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য**

হযরত ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন-

رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَخذَ كَسْرَةَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ تَمرَةً فَقَالَ هٰذِه اِدَامُ هٰذِه–

অর্থ: আমি নবী কারীম (সা.)-কে দেখলাম, তিনি যবের তৈরি একটি রুটি নিলেন এবং এর উপর খেজুর রেখে বললেন: এটা হলো তরকারী, এটা হলো তরকারী।

হযরত সাহল ইবন সাআদ (রা.) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর নিকট কেউ প্রশ্ন করলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আপনাদের নিকট কি চালনি ছিল? তিনি জবাবে বললেন, আমাদের নিকট কোনো চালনি ছিল না। অত:পর প্রশ্ন করা হলো, তাহলে আপনারা যবের রুটি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তিনি জবাবে বললেন-

كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ–

অর্থ: আমরা তাতে ফুঁক দিতাম, যাতে অখাদ্য কিছু থাকলে উড়ে যায়। এরপর আমরা খামির করে নিতাম।[১৭৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৈনন্দিন খাদ্য সম্পর্কে একটু চিন্তা করা উচিত। যিনি উভয় জাহানের বাদশাহ, বিশ্বে শান্তির অগ্রদূত এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন তাঁর খাদ্য কী ছিল? মোটা রুটি, সাদাসিধা তরকারী, যবের আটার রুটি, আর সাথে যদি দু'চারটি শুকনা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সিরকা মিলত তবে খুবই আনন্দ চিত্তে খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাধারণ যবের রুটি খাওয়া হতো, আর সেই রুটির শক্তি দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেছেন।

আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী যব এক প্রকার বলবর্ধক খাদ্য। ইহা পুরাতন আমাশয় রোগ ও কোষ্ট কাঠিন্য নি:শেষ করে। শরীরে প্রশান্তি দান করে। দুধের সাথে পাকালে উন্নত মানের বলবর্ধক খাবারে পরিণত হয়। আমেরিকাতে হৃদ রোগীদেরকে শুধু যবের খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

---

১৭৪. *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৭
১৭৫. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: শামায়েল, অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রুটির বিবরণ, খ. ২, পৃ. ৬৪২, হাদীস নং- ১৪৬

শিশু রোগ বিশেষ করে শিশুদের লিভার আক্রান্ত হলে যবের খাদ্য খুবই উপকারী। ইফনানে যখন অলিম্পিক খেলা আরম্ভ হতো, তখন খেলোয়াড়দের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ খাবার হিসাবে যবকে নির্বাচন করা হত।

আধুনিক গবেষণা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী যবের উপকারিতা অপরিসীম। পাকস্থলী এবং অন্ত্রেতে আলসারের রোগীদেরকে সকালের নাস্তায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যমানায় উন্নত মানের ব্যবস্থা স্বরূপ তালবীনা প্রদান করা হত। (যব পিষিয়ে দুধে পাকিয়ে তাতে মধু মিশ্রিত করলে একে তালবীনা বলা হয়।) এতে আলসারের প্রতিটি রোগী ২/৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করতো।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا... قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُوَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। ... তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: তালবীনা রুগ্ন ব্যক্তির চিত্তে প্রশান্তি এনে দেয় এবং শোক-দু:খ কিছুটা লাঘব করে।[১৭৬]

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করত তিনি তাকে যবের তালবীনা খাওয়ার নির্দেশ দিতেন।

### রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাবারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় সহজপাচ্য, দ্রুত হজমযোগ্য, স্বাস্থ্যকর এবং সাধারণ খাবার খেতে পছন্দ করতেন।পাশাপাশি শরীরের জন্য ক্ষতিকর, অহজমযোগ্য, পরিপাকতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর কোনো খাবার তিনি গ্রহণ করতেন না। এছাড়া যেসকল খাবার দুর্গন্ধ বা স্বাস্থ্যহানিকর তাও তিনি খেতেন না। পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে বা ফুসফুসের কার্যকারীতা হ্রাস পায় এমন খাবার ও পানীয় তিনি গ্রহণ করতেন না। অতিরিক্ত স্বাদ ও রুচির জন্য বেশি মসলাযুক্ত খাবার খাওয়া থেকেও তিনি বিরত থাকতেন এবং অন্যকেও বিরত থাকতে উপদেশ দিতেন। যা বর্তমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদগণও স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসকল খাবারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন বা খেতে অনীহা প্রকাশ করেছেন, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ ও হিকমত নিহিত আছে, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষার সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। নিম্নে এধরনের কিছু খাবারের বিষয় উপস্থাপন করা হলো, যা খাবারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

### কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন পরিহার

তরকারি স্বাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পেঁয়াজ ও রসুনের তুলনা হয় না। বিশেষ করেআমাদের দেশে তরকারি পাকানোর সময় পেঁয়াজ ও রসুন আবশ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রান্না করা পেঁয়াজ ও রসুন তরকারির স্বাদ বৃদ্ধি করলেও কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ খুবই তীব্র হয়ে থাকে, যা অনেকেই সহ্য করতে পারে না। বাস্তবেও দেখা যায়, কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া ব্যক্তির নিকট কেউ সহজে ভিড়ে না; বরং এড়িয়ে চলে। কোনো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খেয়ে কোনো অনুষ্ঠান বা অন্যের নিকট যাওয়াকে মোটেও পছন্দ করবে না। কারণ এটা অন্য মানুষের জন্য যেমন কষ্টের কারণ তেমনি ফিরিশতাগণেরও কষ্টের কারণ। তাই শিষ্টাচার বহির্ভূত এমন কাজটি যেনো কোনো মুসলাম না করে তা রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيْبًا– فَحَمِدَ اللهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّكُمْ تَاْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ اُرٰهُمَا اِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ– هٰذَا الثُّوْمُ وَ هٰذَا الْبَصَلُ، وَ لَقَدْ كُنْتُ اَرَى الرَّجُلَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُوْجَدُ رِيْحُهُ مِنْهُ– فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتّٰى يُخْرَجَ بِهِ اِلَى الْبَقِيْعِ– فَمَنْ كَانَ اٰكِلَهُمَا لاَ بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا–

---

১৭৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: তালবীনা, খ. ২, পৃ. ১৫৪৯, হাদীস নং- ৫৪১৭

অর্থ: মাদান ইবন আবু তালহা ইয়ামুরী (রহ.) থেকে বর্ণিত। উমার ইবন খাত্তাব (রা.) জুমআর দিন খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর হামদ-সানা-সিফাত বর্ণনা করেন। এরপর বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দুই প্রকারের গাছ খাও, আমি তাকে খারাপ মনে করি, আর তাহলো রসুন এবং পেঁয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে দেখেছি, এক ব্যক্তির মুখ থেকে এর দুর্গন্ধ নির্গত হলে তার হাত ধরে বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হয়। এখন তোমাদের কেউ যদি খেতেই চায়, তবে জরুরী হলো সে যেনো তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে দেয়।[১৭৭]

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ لاَ تَاْكُلُوا الْبَصَلَ- قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً (النِّيءَ)

অর্থ: উকবা আবন আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে বলেন: তোমরা পেঁয়াজ খেয়ো না। এরপর তিনি নিম্নস্বরে বলেন: কাঁচা পেঁয়াজ।[১৭৮]

হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা.) যখনই খাবার খেতেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য খাদ্যের কিছু অংশ পাঠিয়ে দিতেন। এ নিয়মে একদিন তিনি কিছু খাবার পাঠালে রাসূলুল্লাহ (সা.) সে খাবার খেলেন না। তখন আবু আইয়ুব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে খাবার না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন- এর মধ্যে পেঁয়াজ মিশ্রিত রয়েছে। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পেঁয়াজ কি হারাম? রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি উত্তরে বললেন – وَ لٰكِنِّىْ اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهِ-

অর্থ: হারাম নয় বটে, তবে দুর্গন্ধের কারণে আমি এটা পছন্দ করি না।[১৭৯]

তিনি যে শুধু পেঁয়াজ খাওয়া থেকেই বিরত থাকতেন তা নয়; বরং দুর্গন্ধযুক্ত এমন কোনো জিনিসই তিনি খেতেন না যদ্দারা অন্যের কষ্ট হয়। নিম্নবর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ اَكَلَ الثُّوْمَ وَ الْبَصَلَ وَ الْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِىْ مَسْجِدِنَا-

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি রসুন, পেঁয়াজ ও কুর্রাছ (দুর্গন্ধযুক্ত পেঁয়াজ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ) আহার করেছে, সে যেনো আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।[১৮০]

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ نُهِىَ عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا- وَ فِىْ رِوَايَةٍ لاَ يَصْلُحُ اَكْلُ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا-

অর্থ: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রান্না করা ছাড়া রসুন খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁর থেকেই অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) রান্না করা ব্যতিরেকে রসুন খাওয়া অপছন্দ করতেন।[১৮১]

উম্ম আইয়ুব (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) রসুন জাতীয় খাবার খেতে অপছন্দ করেসাহাবীগণকে বললেন, তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মতো নই। আমার ভয় হয় যে (এই খাবার) আমার সাথীদের তথা ফেরেশতাদের কষ্ট হবে।[১৮২]

**ক্ষতিকর খাদ্যের প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ**

ইচ্ছা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো ক্ষতিকর খাবার খেতেন না। কিন্তু কোনো কারণে যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষতিকর খাদ্য খেতেই হতো তখন তিনি অন্য কোনো ভালো খাদ্যের দ্বারা উক্ত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দূর করে দিতেন। অর্থাৎ ঐ জিনিসের গরম প্রতিক্রিয়াকে অন্য ঠান্ডা জিনিস দ্বারা এবং শুকনা জিনিসের প্রতিক্রিয়াকে আদ্র কোনো জিনিস দ্বারা দূর করে নিতেন। যাদুল মাআদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

---

১৭৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: রসুন, পেঁয়াজ এবং এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত তরকারি খাওয়া, খ. ৪, পৃ. ৫৪, হাদীস নং- ৩৩৬৩

১৭৮. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: রসুন, পেঁয়াজ এবং এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত তরকারি খাওয়া, খ. ৪, পৃ. ৫৫, হাদীস নং- ৩৩৬৬

১৭৯. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাবার, অনুচ্ছেদ: রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি, খ. ২, পৃ. ৯, হাদীস নং- ১৮০৭

১৮০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রসুন ও পেঁয়াজ খাওয়া মাকরূহ, খ. ২, পৃ. ৮, হাদীস নং- ১৮০৬

১৮১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি, খ. ২, পৃ. ৯, হাদীস নং- ১৮০৮, ১৮০৯

১৮২. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাবার, খ. ২, পৃ. ৯, হাদীস নং- ১৮১০

كَانَ يَصْلِحُ ضَرَرَ بَعْضِ الاَغْذِيَةِ بِبَعْضٍ اِذَا وَجَدَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً فَيَكْسِرُ حَرَارَةَ هٰذَا بِبَرْدَةِ هٰذَا وَ يَبُوْسَةِ هٰذَا بِرَطُوْبَةِ هٰذَا–

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'টি গরম খাদ্য, দু'টি ঠান্ডা খাদ্য, দু'টি চর্বিযুক্ত খাদ্য, দু'টি আঠালো খাদ্য, দু'টি নরম খাদ্য, দু'টি শক্ত খাদ্য একত্রে খেতেন না এবং এমন দু'টি জিনিস একত্রে খেতেন না, যা একই স্বভাবের হয়। কারণ বর্তমানের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, এমন খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

وَلاَ بَيْنَ غِذَائَيْنِ حَارَّيْنِ وَ لاَ بَارِدَيْنِ وَ لاَ لُزْجَيْنِ وَ لاَ قَابِضَيْنِ وَ لاَ مُسْهِلَيْنِ وَلاَ غَلِيْظَيْنِ وَ لاَ مُرْخَيْنِ وَ لاَ سُتَحِيْلَيْنِ اِلٰى خِلْطٍ وَّاحِدٍ–

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী কোনো জিনিসও একত্রে খেতেন না। যেমন, একটা আঠাল খাদ্য এবং একটা নরম খাদ্য, একটা দ্রুত হজম সম্পন্ন এবং অপরটা বিলম্বে হজম হওয়া খাদ্য একত্রে খেতেন না। তিনি ভুনা এবং রান্না খাদ্য, টাটকা এবং বাসী খাদ্য একত্রে খেতেন না।

وَلاَ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ كَقَابِضٍ وَّ مُسْهِلٍ وَّ سَرِيْعُ الْهَضْمِ وَ بَطِيْئِهِ–وَلاَ بَيْنَ شَوِى وَّ هَبِيْخٍ وَّ لاَ بَيْنَ طَرِى وَّ تَدِيْدٍ–

হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুধ ও মাছ কখনও এক সঙ্গে খেতেন না। কেননা এর দ্বারা ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে–لَمْ يَجْمَعْ قَطُّ بَيْنَ لَبَنٍ وَ سَمَكٍ

**দুই গরম খাবার একত্রে না খাওয়া**

এক গরম খাবারের সাথে যদি আরেক গরম খাবার মিলিত হয়, তাহলে তা অতি গরমে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক খাবারের যদি ক্যালোরীবেশি হয়, তার সাথে যদি এমন আরেকটি খাবার যুক্ত করা হয় যার মধ্যেও বেশি ক্যালোরী থাকে, তাহলে রক্ত ও চর্বিতে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এমনকি কখনো ব্লাড প্রেসার আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই বিভিন্ন গরম জাতীয় খাবার একাধারে এবং একই সময় না খাওয়া উচিত।

**দুই ঠান্ডা জাতীয় খাবার একত্রে না খাওয়া**

এমন ধরনের খাবার যা ঠান্ডা প্রকৃতির এবং যাতে ক্যালোরীর পরিমাণ কম থাকে, তা অনবরত ও অধিক পরিমাণে খাওয়াও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দুই ঠান্ডা জাতীয় খাবার একত্রে ভক্ষণ করলে ক্ষতির আশঙ্কা অনস্বীকার্য। এ ধরনের খাবার লো প্রেসার বা নিম্ন রক্তচাপ, অর্ধাঙ্গ রোগ, মুখের উপর সংঘটিত অর্ধাঙ্গ রোগ, হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া এবং স্নায়ুবিক খিঁচুনি ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে।

**দুই আঠাযুক্ত খাবার একত্র না করা**

এমন খাবার যার মধ্যে আঠা জাতীয় পদার্থ থাকে, তা পাকস্থলীর দেয়াল ও ঝিল্লির সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। ফলে ঐ সমস্ত ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়, যা থেকে পাকস্থলীর গ্রাস ও হজমকারী আর্দ্র পদার্থ বের হয়ে খাদ্যের সাথে সংযুক্ত হয় এবং খাদ্য হজম হয়। যেমন কচুর মুখী ও ঢেড়শ ইত্যাদি।

**দুই কঠিন খাদ্য একত্র না করা**

পায়খানা কষাকারী খাবার ও ধমনীসমূহের মধ্যে রক্ত চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি করে। একই সাথে যদি দুই কাঠিন্যকারী খাবার খাওয়া হয়, তাহলে উভয়ের কাঠিন্য ক্ষমতা একত্র হয়ে অন্ত্র ও ধমনীর কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির কারণে শরীরে জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। যেমন, কাঁচা পেয়ারা ও ঢেড়শ।

**দুই জোলাপ সৃষ্টিকারী খাবার একত্রে না খাওয়া**

অন্ত্র ও নাড়ীর গতি যদি সর্বদা দ্রুত থাকে, তাহলে অন্ত্রে ক্ষত, আলসার ও জ্বালা পোড়া শুরু হয়। পায়খানা তারল্যকরণ খাবার অন্ত্রের সেই গতি দ্রুত করে যদ্বারা অন্ত্র ও পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ স্তর দুর্বল হয়ে জ্বালা সৃষ্টি করে। যেমন পালং ও করলা (উষ্ণ প্রকৃতির লোকদের জন্য)।

### দুই স্থুল জাতীয় খাবার একত্র না খাওয়া

পাকস্থলীতে স্থুলতার কারণে হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, যার কারণে পাকস্থলীর গ্রাস নি:শেষ হয়ে এর ক্যালকারী বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ স্থায়ী গ্যাস্ট্রিক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন- পালং, কচুর মুখী, ঢেড়শ, মাশকালাই, ছোলা ইত্যাদি।

### দুই তরল খাবার একত্রে না খাওয়া

এমন খাবার যার দ্বারা পাকস্থলীতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তা নিম্ন লিখিত রোগসমূহ সৃষ্টি করে। অতিসার, বমি, বমি বমি ভাব, অবসন্নতা, বিষণ্নতা ইত্যাদি।

### পায়খানা কঠিন ও তরলকারী খাবার একত্রে না খাওয়া

যে খাদ্য দ্বারা কাঠিন্য সৃষ্টি হয়, তা ভক্ষণ করার পরপরই যদি আবার জোলাব জাতীয় খাবার খাওয়া হয়, তাহলে দুই বিপরীত স্বভাবের খাবার ব্যবহারের ফলে পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ ঝিল্লিসমূহের মধ্যে ফোলা সৃষ্টি হয়। তাই এ ধরণের বিপরীত স্বভাবের খাবার একত্রে না খাওয়া উচিৎ।

### দ্রুত হজমকারী ও বিলম্বে হজমশীল খাবার একত্রে না খাওয়া

সহজ পাচ্য খাবার দ্রুত হজম হয়ে যায়। আর বিলম্বে হজমশীল খাবার দীর্ঘক্ষণ যাবৎ পাকশয়ে পড়ে থাকার কারণে পাকস্থলীর কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। যেমন, উট ও বকরীর গোশত একত্রে পাকানো হলে উভয়টা একত্রে সিদ্ধ হয় না, উটের গোশতের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। ঠিক তদ্রুপ খাবারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। যেমন- আপেল ও মূলা।

### ভুনা করা ও পানি দিয়ে রান্না করা খাবার একত্রে না খাওয়া

ভুনা করা গোশত খাওয়ার পর যদি পানিতে পাকানো খাবার খাওয়া হয়, তাহলে পানি পাকস্থলীতে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করবে। আর ভুনা গোশতা শুষ্ক বিধায় শুষ্কতা সৃষ্টি করবে।

### তাজা ও বাসী খাদ্য একত্র না করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) রাত্রের রান্না (বাসী) খাদ্য পরের দিন খেতেন না।[১৮৩]–وَلاَ طَبِيْخًا بَائِتًا يَسْخِنُ لَهُ لِغَدٍ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাজা খাদ্য পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরকেও তাজা খাদ্য ভক্ষণের নির্দেশ দিতেন। তিনি দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য আদৌ পছন্দ করতেন না।

কানাডার খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বাজিষ্ট বোর্ণ বলেন, তাজা খাদ্যই ভক্ষণ করা উচিৎ, যদিও তা বিলের ঘাস হয়। বাসী গোশত অপেক্ষা বিলের তাজা ঘাস পাকিয়ে খাওয়া শ্রেয়। আমি বাসী খাদ্য ভক্ষণের কারণে অনেককেই রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। আমার জীবন নিত্যনৈমিত্ত বিষয়াদি, ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে আমি একজন বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের মর্যাদায় উপনীত হয়েছি। সুতরাং আমার পরামর্শ হলো, আপনি যদি খাদ্য গ্রহণ করতে চান, তাহলে প্রথমে লক্ষ্য করুন, উক্ত খাদ্য তাজা না বাসী? কেননা সজীবতার মাঝেই প্রকৃত স্বাদ নিহিত আছে, মসলার মাঝে নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যে কোনো প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য পছন্দ করতেন না এবং চটপটি জাতীয় খাদ্য যেমন, চাটনি ইত্যাদিও পছন্দ করতেন না।–وَ لاَ شَيْئًا مِّنَ الاَطْعَمَةِ الْعَفِنَةِ وَالْمَالِحَةِ كَالْكَوَامِخِ

### দুধ ও টক একত্রে না খাওয়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) দুধ ও টক জিনিস কখনও একত্রে খেতেন না। –وَلاَ بَيْنَ لَبَنٍ وَ حَامِضٍ

---

১৮৩. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

**অধিক গরম ও ঠান্ডা খাবার না খাওয়া**

রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যধিক গরম জিনিস খেতেন না।–وَ لَمْ يَكُنْ يَأْكُلْ طَعَامًا فِىْ وَقْتِ شِدَّةِ حَرَارَتِهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তীব্র গরম খাবারে বরকতহীনতার কথা বলেছেন। তীব্র গরম খাবারে মুখের ভিতরে ঘা, পেট ফোলা ও জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তীব্র গরম খাবার কখনো গলা নষ্ট করে ফেলে। আর গরম খাবারের সাথে ঠান্ডা পানি পান করলে দাঁত ও পাকস্থলীতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তীব্র গরম খাবারে বরকতহীনতার প্রমাণ হল, চুলা বা তন্দুর থেকে নামিয়ে গরম গরম রুটি খেলে তা অধিক পরিমাণে খাওয়া যায়। কিন্তু একটু ঠান্ডা করে খেলে অনেক কম খাওয়া যায়। আর নবী করীম (সা.)-এর কথা অনুযায়ী আমল করলে খাবারে বরকত পাওয়া যাবে। এখানে এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে, একেবারে জমাট বাঁধা খাবার খেতে হবে; বরং একটু ঠান্ডা করে খেলেই চলবে।

ডা. আলবার্ট 'ফীড এন্ড কেয়ার' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, যাতে যাবতীয় খাদ্য ব্যবহারের পদ্ধতি উপকারিতা ও তার সতর্কতাসমূহ উত্তমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

খাওয়ার দ্রব্য অধিক গরম বা ঠান্ডা হওয়া ঠিক নয়। বেশি গরম জাতীয় কিছু গ্রহণ করলে পাকস্থলী ঢিলা হয়ে যায় এবং শক্তি হ্রাস পায়। আবার খাদ্য অধিক ঠান্ডা হলে একে পরিপাক করার জন্য পাকস্থলীকে অধিক শক্তি ও তাপ প্রয়োগ করতে হয়। সে জন্য খাওয়ার সাথে সাথে অধিক ঠান্ডা পানি পান করাও বেশ ক্ষতিকারক। কেননা, পানির শৈথিল্য ও তীব্রতা উভয়ই পাকস্থলীকে বিকৃত করে এবং হজমে বিঘ্নতা ঘটায়।

**অধিক মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য খাওয়ার ক্ষতিকর দিক**

সাদাসিধা বিশুদ্ধ খাদ্যই সুস্থতা ও সজীবতার নিয়ামক। কেননা তা মানুষের শারীরিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য উপকারী। আর যে খাদ্য মরিচ ও বিভিন্ন প্রকার মসলাযোগে পাকিয়ে সুস্বাদু করা হয়, তা নিশ্চিতরূপে সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর। আধুনিককালে ইউরোপীয় জগতের উপহার যেমন রোস্ট, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি নিশ্চিতরূপে শারীরিক সুস্থতার পরিপন্থী। এসব খাদ্যের কারণে আলসার, পাকস্থলীতে গ্যাস এবং বদ হজমী ইত্যাদি জটিল রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলাম সাদাসিধে খাদ্য ভক্ষণের পরামর্শ দিয়েছে, যার মাঝে রয়েছে স্বাদ ও সুস্থতার অপূর্ব সমন্বয়। উপরে যা আলোচনা করা হয়েছে, এসব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা যাদুল মাআদ কিতাবে রয়েছে-

ومن تدبَّر أغذيته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما كان يأكلهُ، وجَده لم يجمع قط بين لبن وسمك، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارَّين، ولا باردين، ولا لَزِجَين، ولا قابضين، ولا مُسهلين، ولا غليظين، ولا مُرخيين، ولا مستحيلين إلى خلط واحد، ولا بين مختلفَين كقابض ومسهل، وسريع الهضم وبطيئه، ولا بين شَوِيٍّ وطبيخ، ولا بين طَرِيٍّ وقَديد،ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن، ولم يكن يأكل طعاماً فى وقت شدة حرارته، ولا طبيخاً بائتاً يُسخَّن له بالغد، ولا شيئاً من الأطعمة العَفِنَةِ والمالحة، كالكَوامخ والمخلَّلات، والملوحات. وكل هذه الأنواع ضار مولِّدٌ لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال.وكان يُصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وَجد إليه سبيلاً، فيكسرُ حرارةَ هذا ببرودة هذا، ويُبوسةَ هذا برطُوبة هذا، كما فعل فى القِثَّاء والرُّطَب، وكما كان يأكل التمر بالسَّمن، وهو الحَيْسُ، ويشربُ نقيع التمر يُلطِّف به كَيْمُوساتِ الأغذية الشديدة-[184]

১৮৪.*যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ২২৩

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ: শরীর সুস্থ রাখতে দৈনন্দিন খাবারের খাদ্য ও পুষ্টি তালিকা

মানব দেহের বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেহ সুন্দর ও সুস্থ রাখতে দৈনন্দিন খাদ্য-দ্রব্যের খাদ্যমান ও পুষ্টিমান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। খাদ্য ও পুষ্টিমান জেনে পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর তার প্রয়োজনীয় শক্তি বা ক্যালোরি তৈরি ও পুষ্টি ব্যবহার করে সমস্ত শরীর কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখে।

খাদ্য-দ্রব্যের মাধ্যমে শরীর শক্তি ও পুষ্টি পায়। কোন মানুষের জন্য কতটুকু শক্তি ও পুষ্টি প্রয়োজন তা জেনে খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরকে রোগমুক্ত রাখা সম্ভব। প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য কম গ্রহণ করলে যেমন ক্ষতি, তেমনি চাহিদার তুলনায় বেশি খাদ্য গ্রহণ করলেও ক্ষতি অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং বয়স ভেদে চার্ট অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে আমাদের শরীরকে খুব সহজেই রোগমুক্ত ও সুস্থ রাখার সম্ভব।

**খাদ্যের পুষ্টিমান ও কার্যকরিতা**

নিম্নে খাদ্য ও পুষ্টিমান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

| ক্রম | পুষ্টির নাম | কার্যকরিতা |
|---|---|---|
| ০১. | প্রোটিন বা আমিষ | দেহ বৃদ্ধি, মাংসপেশী ও টিসু রক্ষণাবেক্ষণ। |
| ০২. | কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা | শক্তি বা ক্যালোরির প্রধান উৎস। |
| ০৩. | আঁশযুক্ত কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা | হজমশক্তি উন্নয়নে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দূরীকারক। |
| ০৪. | ফ্যাট বা চর্বি | শক্তি বা ক্যালোরির দ্বিতীয় উৎস ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনদাতা ও রোগ প্রতিরোধক। |
| ০৫. | ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ | পানি ও চর্বিতে দ্রবণীয় এবং রাসায়নিক ক্রিয়া সংগঠক। |
| ০৬. | মিনোরেল বা খনিজ | অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, শরীরের বিভিন্ন অংশে ও কাজে প্রয়োজন এবং রোগ প্রতিরোধক। |
| ০৭. | পানি | শরীরের বাহাত্তর ভাগহলো পানি, শরীরের সব কাজেই পানির প্রয়োজন। রক্ত পরিশুদ্ধ করার জন্য পানি বিশেষ সহায়ক। |

**বয়স ও লিঙ্গভেদে ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তা**

বয়স ভেদে দৈনিক কতটুকু শক্তি বা ক্যালোরির প্রয়োজন তার সাধারণ তালিকা নিম্নরূপ:

ব্যক্তি, কর্ম ও পেশা ভেদে ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তা কম বা বেশি হবে, তা বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্ধারণ করে নিতে হবে। নিম্নে সাধারণ তালিকা প্রদান করা হলো:

| গ্রুপ | বয়স | প্রয়োজনীয় শক্তি বা ক্যালোরি (কিলো ক্যালোরি) | প্রতি দশ বছরে ক্যালোরি হ্রাসের হার |
|---|---|---|---|
| পুরুষ | ২৫-৩৫ | ২৭৬০ | --- |
| মহিলা | ২৫-৩৫ | ২০০০ | --- |
| পুরুষ | ৩৫-৫৫ | ২৬২০ | ৫% |
| মহিলা | ৩৫-৫৫ | ১৯০০ | ৫% |
| পুরুষ | ৫৫-৭৫ | ২৪০০ | ৮% |
| মহিলা | ৫৫-৭৫ | ১৮০০ | ৮% |
| পুরুষ | ৭৫-এর উপরে | ২১৬০ | ১০% |
| মহিলা | ৭৫-এর উপরে | ১৭১০ | ১০% |

**ক্যালোরির মিশ্রিত অবস্থা**

শর্করা, আমিষ ও চর্বির মিশ্রিত উৎস হতে ক্যালোরি বা শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। ক্যালোরি প্রাপ্তির মিশ্রিত অবস্থা নিম্নরূপ:

৫৭% কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা হতে- চাল, গম, চিনি, মিষ্টি কেক ইত্যাদি।

৩০% ফ্যাট বা চর্বি হতে- তেল, দুধ বা দুধ জাতীয় দ্রব্য।

১৩% প্রোটিন বা আমিষ হতে- মাছ, মাংস, মুরগী, দুধ, ডিম, ডাল, বাদাম ইত্যাদি।

১০০% পূর্ণ ক্যালোরি প্রাপ্তি- শর্করা, চর্বি ও আমিষ জাতীয় খাদ্যে থাকে।

১ গ্রাম খাদ্য খেলে সাধরণত শক্তি বা ক্যালোরি পাওয়া যায় নিম্নরূপ:

* কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয়- ৪ কিলো ক্যালারি।

* প্রোটিন বা আমিষ জাতীয়- ৪ কিলো ক্যালোরি।

* ফ্যাট বা চর্বি জাতীয়- ৯ কিলো ক্যালোরি।

তাই ৫৫ বছর বয়সের পুরুষের ২৪০০ কিলো ক্যালোরি শক্তি বা ক্যালোরি পেতে দৈনিক-

*কার্বোহাইড্রেট লাগবে ৫৭%x২৪০০ =১৩৬৮ কিলো ক্যালোরি, ১৩৬৮/৪ = ৩৪৮ গ্রাম।

*ফ্যাট বা চর্বি লাগবে ৩০%x২৪০০ =৭২০ কিলো ক্যালোরি, ৭২০/০ = ৮০ গ্রাম।

* প্রোটিন বা আমিষ লাগবে- ১৩%x২৪০০ =৩১২ কিলো ক্যালোরি, ৩১২/৪ = ৭৮ গ্রাম।

**কার্বোহাইড্রেট**

অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট এর সাথে আঁশ যুক্ত কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা যেমন- ঢেড়শ, সবুজ পাতাযুক্ত পুঁইশাক, পালং, কলমি ইত্যাদি প্রতিদিন অন্তত এক বেলা অবশ্যই খেতে হবে। দিনে একবার যে কোন একটি ফল খেতে হবে। ফলের পলিফিলন খারাপ কোলেস্টোরেল তৈরি হতে দেয় না।

**ফ্যাট বা চর্বি**

শরীরের জন্য প্রাণীজ ও উদ্ভিদ দুটো ফ্যাট বা চর্বি খাওয়া দরকার। মাখন ও ঘিতে প্রচুর শক্তি বা ক্যালোরির সাথে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। কিছু উদ্ভিজ তেলের মধ্যে সঠিক পরিমাণ প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড আছে। যেমন- কালোজিরা তেল। এ জাতীয় তেলে বহু রকমের পুষ্টিও আছে। এগুলো খাদ্যে ও রান্নায় ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। মাছের তেলেও প্রচুর পরিমাণ প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড অর্থাৎ পলি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড আছে। ভার্জিন নারিকেল তেলে ৫০% লরিক এসিড আছে। ইহা অতি উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত তেল।

কয়েকটি উদ্ভিজ তেলের পলি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ নিম্নরূপ:

(১) সানপ্লাওয়ার তেল .................................................... ৭০

(২) সয়াবিন তেল ........................................................ ৫৫

(৩) তিল তেল ............................................................ ৫৫

(৪) তুলা বীজ তেল ....................................................... ৫০

(৫) সরিষার তেল .......................................................... ২৫

(৬) পাম অয়েল ............................................................ ১৫

(৭) ভার্জিন নারিকেল তেল ................................... সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যকর।

**প্রোটিন**

বয়স্ক লোকের জন্য তার নিজের ওযনের প্রতি কেজির জন্য এক গ্রাম প্রোটিন দৈনিক গ্রহণ করা দরকার। প্রতিদিন মাছ বা মাংস বা মুরগী বা ডিম বা দুধ যে কোন একটি প্রোটিন খেতে হবে। ডালেও প্রোটিন আছে। তাই নিরামিষ-ভোজীদের জন্য ভাতের সাথে ডাল ও শাকসবজি খেতে হবে। এর সাথে দৈনিক দুধ খেতে হবে। সব প্রোটিন জাত খাদ্যের মধ্যে

একুশটি অ্যামিনো এসিড থাকে না। তাই পর্যায়ক্রমে সব রকম আমিষ জাতীয় খাদ্য খেতে হয়। যেন প্রতিদিন একুশটি অ্যামিনো এসিডই শরীরে বিদ্যমান থাকে। অবশ্য কিছু অ্যামিনো এসিড শরীর নিজেই তৈরি করে। ছায়ায় শুকানো সাজনা পাতার গুড়া বা পাতার শাকে প্রচুর আমিষ আছে। এই সাজনা পাতায় আটটি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিডসহ মোট আঠারোটি অ্যামিনো এসিড আছে। তাছাড়া সাজনা পাতায় ভিটামিন ও মিনারেল প্রচুর আছে। প্রসূতি মা ও শিশুর জন্য সাজনা পাতা এক মহৌষধ।

**ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ**

ভিটামিন ও খনিজ জাতীয় খাদ্য দৈনিক খেতে হবে। তাই বিশেষজ্ঞদের কাছে বিস্তারিত জেনে খাওয়া ভাল। সাজনা পাতার গুড়া বা তরকারি নিয়মিত খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এতে অনেক ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আছে। এটা পুষ্টিহীনের পুষ্টিদাতা।

**ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যের আকৃতি ও প্রকৃতিগত গুণাগুণ**

পদার্থ বিজ্ঞানের একীভূত থিওরীর ধারণা চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রযোজ্য। যে ফলমূল বা খাদ্যদ্রব্যের আকৃতি প্রকৃতি মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে সব ফলমূলের গুণাগুণ সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য বিশেষভাবেউপকারী ও কার্যকর। যেমন-

**(১) চোখ : গাজর-** এক স্লাইজ গাজর ঠিক মানুষের চোখ সদৃশ। গাজর চোখে রক্ত চলাচল ও এর ক্রিয়াকর্মে সহায়তা করে চোখ ভাল রাখে।

**(২) ব্রেণ : আখরোট-** আখরোট দেখতে মগজের মত। উত্তর-দক্ষিণ দুই গোলার্ধ আছে, উপর নিচে দুই সেরিব্রাম, ভাজগুলোও ঠিক নিওকরটেক্সের মত। ব্রেণের সঠিক ক্রিয়াকর্মের জন্য আখরোট বাদাম তিন ডজনেরও বেশি স্নায়ুকোষ প্রেরণ যন্ত্র তৈরি করে। তাই নিয়মিত আখরোট খাওয়া ভাল।

**(৩) হৃৎপিণ্ড: টমেটো-** হৃৎপিণ্ডের ন্যায় টমেটোও লাল এবং চার কক্ষ বিশিষ্ট। গবেষণায় দেখা গেছে,এতে টমাটোলাইকোপাইনে ঠাসা এবং রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের অন্যতম প্রকৃত খাদ্য।

**(৪) হৃৎপিণ্ড : রসুন-** রসুন খারাপ কোলেস্টোরেল কমিয়ে হৃৎপিণ্ডকে সাহায্য করে।

**(৫) হৃৎপিণ্ড : আঙ্গুর-** হৃৎপিণ্ডের আকৃতির ন্যায় আঙ্গুরও থোকায় ঝুলে থাকে এবং প্রত্যেকটি আঙ্গুর রক্তের কোষের ন্যায় দেখতে। গবেষণায় প্রমাণিত, আঙ্গুর রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের উত্তম সতেজকারী।

**(৬) কিডনি : কিডনি বিনস-** কিডনি বিন বা লাল শিম ঠিক মানুষের কিডনির ন্যায় এটা কিডনি সারিয়ে তোলে এবং লাল শিম কিডনির ক্রিয়াকর্ম সঠিক রাখতে অবদান রাখে।

**(৭) অগ্নাশয় : মিষ্টি আলু-** মিষ্টি আলু দেখতে অগ্নাশয়ের ন্যায়। মিষ্টি আলু রক্তে চিনির মাত্রা সঠিক রাখতে সাহায্য করে। এটা ডায়াবেটিসের জন্য অতি উপকারী।

**(৮) দেহকোষ : পিয়াজ/রসুন-** পিয়াজ দেহ কোষের ন্যায়। এটা দেহ কোষে সৃষ্ট দূষিত পদার্থ দূর করে। সহযোগী হিসেবে রসুন খেলে কোষের দূষিত পদার্থসহ অতিমাত্রায় ক্ষতিকর ফ্রি-রেডিক্যাল দূর করে। কোলেস্টোরেল নিয়ন্ত্রণ করে হার্টের উপকার করে।

**(৯) হাড় : ডাঁটা/সেলারী-** ডাঁটা/সেলারী এগুলো দেখতে হাড়ের মত। আমাদের হাড়ে ২৩% সোডিয়াম থাকে। খাদ্যে সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকলে শরীর হাড় থেকে এই সোডিয়াম গ্রহণ করার ফলে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। এগুলো দেহের হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে।

**(১০) জরায়ু : বেগুন/নাশপাতি-** বেগুন ও নাশপাতি দেখতে অনেকটা মেয়েদের জরায়ু ও সারভিক্সের মত। এগুলো নিয়মিত খেলে জরায়ু ও সারভিক্সেকে সতেজ এবং ক্রিয়াকর্ম স্বাভাবিক রাখে।

**(১১) ডিম্বাশয় : জলপাই-**জলপাই ডিম্বাশয়ের ন্যায়। ইহা ডিম্বকোষের স্বাস্থ্যও ক্রিয়াকর্ম সঠিক রাখে।

**(১২) দুগ্ধগ্রন্থি : কমলা-** কমলা মেয়েদের দুগ্ধগ্রন্থির মত। স্তনের স্বাস্থ্য, দুগ্ধগ্রন্থি ও লিম্ফরস মাল্টা, লেবু সরবরাহে সাহায্য করে।

**(১৩) অণ্ডকোষ : ডুমুর-** পুরুষের অণ্ডকোষের ন্যায় ডুমুর দু'টি করে তৈরি হয়ে ঝুলে থাকে এবং বীজে ঠাসা থাকে। ডুমুর পুরুষের শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, গতিময়তা বৃদ্ধি করে এবং পুরুষ বন্ধ্যাত্ব দূর করে।

**বয়সভেদে প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

* ৬-১২ মাসের শিশুর প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা (মায়ের দুধের পাশাপাশি)

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | চালের নরম ভাত | ৫০ গ্রাম | শক্তি কিলো ক্যালোরী | ৬০০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | রুটি দুধে ভিজিয়ে | ৩ চা চামচ | আমিষ | ২৫ গ্রাম |
| ৩. | ডাল : নরম খিচুড়ি | ২ চা চামচ | ভিটামিন এ | ৩০০ আই ইউ |
| ৪. | আলু চটকিয়ে ছোট ১টা | ৩০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ১৬৮০ মি. গ্রাম |
| ৫. | শাক পাতা | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন বি-২ | ০.৮ মি. গ্রাম |
| ৬. | পাকা কলা ছোট | ১ টা | ভিটামিন সি | ১৫ মি. গ্রাম |
| ৭. | ডিম | ১ টা | লৌহ | ৭ মি. গ্রাম |

*** ১-৩ বছরের শিশুর প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ভাত/পিঠা/মুড়ি/চালের চিড়া | ১০০ গ্রাম | শক্তি | ১৩১০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | ডাল | ৫০ গ্রাম | প্রোটিন বা আমিষ | ৩৭ গ্রাম |
| ৩. | রুটি/বিস্কুট | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন এ | ৩৫০ আই ইউ |
| ৪. | শাকের নিরামিষ | ৬০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ৪০০০ মি. গ্রাম |
| ৫. | সবজি নিরামিষ | ৩০ গ্রাম | ভিটামিন বি-২ | ০.৫৭ মি. গ্রাম |
| ৬. | মিষ্টি আলু | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন সি | ১৫ মি. গ্রাম |
| ৭. | তেল | ১০ মি. লি. | ক্যালসিয়াম | ৫৭০ মি. গ্রাম |
| ৮. | মাছ/মাংসের তরকারিতে সবজি | ৩০ গ্রাম | লৌহ | ১৫ মি. গ্রাম |
| ৯. | আলু | ৫০ গ্রাম | মাঝে মাঝে চাল-ডালের খিচুড়ি দিলে ভাল। | |
| ১০. | মাছ বা মাংস | ৩০ গ্রাম | | |
| ১১. | দুধ ভাত/পায়েস | ২৩০ গ্রাম | | |
| ১২. | চিনি বা গুড় | ৬০ গ্রাম (রুটি বা সুজি রান্নায়) | | |
| ১৩. | ফল | ১ টা | | |

*** ৪-৬ বছরের শিশুর প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ভাত/রুটি/মুড়ি/চিড়া | ২০০ গ্রাম | শক্তি | ১৭৫০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | রুটি/বিস্কুট | ৬০ গ্রাম | প্রোটিন বা আমিষ | ৪৯ গ্রাম |
| ৩. | ডাল | ৫০ গ্রাম | ভিটামিন এ | ৩৫০ আই ইউ |
| ৪. | শাকের নিরামিষ | ৬০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ৩৬০০ মি. গ্রাম |
| ৫. | সবজি নিরামিষ | ৫০ গ্রাম | ভিটামিন বি-২ | ১.০মি. গ্রাম |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬. | মিষ্টি আলু | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন সি | ১৭ মি. গ্রাম |
| ৭. | তেল (মাছ/মাংস/তরকারি) | ২০ মি. লি. | ক্যালসিয়াম | ৪৯৩ মি. গ্রাম |
| ৮. | মাছ বা মাংস | ৩০ গ্রাম | লৌহ | ২১ মি. গ্রাম |
| ৯. | সবজি | ৩০ গ্রাম | --- | --- |
| ১০. | গোল আলু | ৬০ গ্রাম | --- | --- |
| ১১. | পায়েস | ২৪০ গ্রাম | --- | --- |
| ১২. | চিনি বা গুড় | ৬০ গ্রাম | --- | --- |
| ১৩. | ফল | ১ টা | --- | --- |

*** ৭-৯ বছরের ছেলে-মেয়েদের প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | চাল/আটা | ২৯০ গ্রাম | শক্তি | ২২০০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | ডাল | ৬০ গ্রাম | প্রোটিন বা আমিষ | ৫০ গ্রাম |
| ৩. | মাছ/মাংস/ডিম | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন এ | ৩৪৫ আই ইউ |
| ৪. | মিষ্টি আলু | ৯০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ৪৮৩০ মি. গ্রাম |
| ৫. | সবুজ শাক | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন বি-২ | ১.১মি. গ্রাম |
| ৬. | সবজি | ৩০ গ্রাম | ভিটামিন সি | ৩০ মি. গ্রাম |
| ৭. | তেল | ৩০ মি. লি. | ক্যালসিয়াম | ৫৩৪ মি. গ্রাম |
| ৮. | চিনি বা গুড় | ৩০ গ্রাম | লৌহ | ২৩ মি. গ্রাম |
| ৯. | দুধ | ২৪০ মি. লি. | --- | --- |
| ১০. | ফল | ১ টা | --- | --- |

*** ১০-১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | চাল/আটা | ৪০০ গ্রাম | শক্তি | ২৬৫০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | ডাল | ১০০ গ্রাম | প্রোটিন বা আমিষ | ৫৫ গ্রাম |
| ৩. | মাছ/মাংস/ডিম | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন এ | ৩৪৫ আই ইউ |
| ৪. | মিষ্টি আলু | ১২০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ৬৮০০ মি. গ্রাম |
| ৫. | সবুজ শাক | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন বি-২ | ১.১ মি. গ্রাম |
| ৬. | সবজি | ১২০ গ্রাম | ভিটামিন সি | ৭০ মি. গ্রাম |
| ৭. | তেল | ৩০ মি. লি. | ক্যালসিয়াম | ৫৩৪ মি. গ্রাম |
| ৮. | চিনি বা গুড় | ৬০ গ্রাম | লৌহ | ৩২ মি. গ্রাম |
| ৯. | দুধ | ২৪০ মি. লি. | --- | --- |
| ১০. | ফল | ১ টা | --- | --- |

*** ১৫-১৮ বছরের ছেলে-মেয়েদের প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | চাল/আটা | ৪০০ গ্রাম | শক্তি | ২৬৫০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | ডাল | ১৩০ গ্রাম | প্রোটিন বা আমিষ | ৫৮ গ্রাম |
| ৩. | মাছ/মাংস/ডিম | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন এ | ৩৪৫ আই ইউ |
| ৪. | মিষ্টি আলু | ১২০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ৬৮০০ মি. গ্রাম |
| ৫. | সবুজ শাক | ৯০ গ্রাম | ভিটামিন বি-২ | ১.৩ মি. গ্রাম |
| ৬. | সবজি | ৯০ গ্রাম | ভিটামিন সি | ৬০ মি. গ্রাম |
| ৭. | তেল | ৫০ মি. লি. | ক্যালসিয়াম | ৬৩৪ মি. গ্রাম |
| ৮. | চিনি বা গুড় | ৬০ গ্রাম | লৌহ | ৩২ মি. গ্রাম |
| ৯. | দুধ | ২৪০ মি. লি. | --- | --- |
| ১০. | ফল | ১ টা | --- | --- |

*** প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছর উর্ধ্বে) পুরুষের প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | চাল/আটা | ৪৮০ গ্রাম | শক্তি | ২৮২০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | ডাল | ৯০ গ্রাম | প্রোটিন বা আমিষ | ৬৯ গ্রাম |
| ৩. | মাংস | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন এ | ৪৫৫ আই ইউ |
| ৪. | মাছ | ৬০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ৫৪৩৪ মি. গ্রাম |
| ৫. | ডিম | ১ টি | ভিটামিন বি-২ | ১.২০ মি. গ্রাম |
| ৬. | শাক | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন সি | ১০০ মি. গ্রাম |
| ৭. | সবজি | ১২০ গ্রাম | ক্যালসিয়াম | ৮৬৮ মি. গ্রাম |
| ৮. | তেল/ঘি | ৬০ মি. লি. | লৌহ | ১৬ মি. গ্রাম |
| ৯. | চিনি বা গুড় | ৩০ গ্রাম | --- | --- |
| ১০. | মাখন | ৩০ গ্রাম | --- | --- |
| ১১. | দুধ | ২৪০ মি. লি. | --- | --- |
| ১২. | ফল | ১ টা | --- | --- |

*** প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ উর্ধ্বে) মহিলার প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | চাল/আটা | ৪০০ গ্রাম | শক্তি | ২৬৫০ কিলো ক্যালোরী |
| ২. | ডাল | ৪০ গ্রাম | প্রোটিন বা আমিষ | ৪৬ গ্রাম |
| ৩. | মাছ/মাংস/ ডিম | ৬০ গ্রাম | ভিটামিন এ | ৩০৪আই ইউ |
| ৪. | মিষ্টি আলু/আলু | ৬০ গ্রাম | ক্যারোটিন | ৩৬০০ মি. গ্রাম |
| ৫. | সবুজ শাক | ১৫০ টি | ভিটামিন বি-২ | ১.০ মি. গ্রাম |
| ৬. | সবজি | ৯০ গ্রাম | ভিটামিন সি | ৬০ মি. গ্রাম |
| ৭. | তেল | ৫০ মি. লি. | ক্যালসিয়াম | ৬৪৮ মি. গ্রাম |
| ৮. | দুধ | ২৪০ মি. লি. | লৌহ | ২৯ মি. গ্রাম |
| ৯. | ফল | ১ টা | --- | --- |

*** প্রতি ১০০ গ্রাম ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত দেশীয় খাদ্যের রূপান্তরিত ক্যারোটিন**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | আই ইউ |
|---|---|---|
| ১. | পুঁই শাক | ২১২৫০ |
| ২. | মিষ্টি কুমড়া | ২০০০০ |
| ৩. | লাল শাক | ১৯৯০০ |
| ৪. | কলমি শাক | ১৭৯০০ |
| ৫. | ডাঁটা শাক | ১৬৮৩৩ |
| ৬. | পালং শাক | ১৪১১৬ |
| ৭. | পাকা আম | ১৩৮৩৩ |
| ৮. | পাকা পেঁপে | ১৩৫০০ |
| ৯. | মিষ্টি আলু শাক | ১৩০০০ |
| ১০. | ধনে শাক | ১১৫৩০ |
| ১১. | গাজর | ৯৫০০ |
| ১২. | পাকা কাঁঠাল | ৭৮৩৩ |

১ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন = ১.৬৬ আই ইউ ভিটামিন ‘এ’

১ আই ইউ ভিটামিন ‘এ’ = ০.৬০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন।

*** প্রতি ১০০ গ্রাম লৌহ (আয়রন) সমৃদ্ধ দেশীয় খাদ্য**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | মিলি গ্রাম |
|---|---|---|
| ১. | চিংড়ি মাছ | ৪৯.৬ |
| ২. | আমচুর | ৪৫.২ |
| ৩. | কালো কচুশাক | ৩৮.৭ |
| ৪. | চালের কুড়া | ৩৫.০ |
| ৫. | ডাঁটা শাক | ২৫.৫ |
| ৬. | ছোলা শাক | ২৩.৮ |
| ৭. | চিড়া | ২০.০ |
| ৮. | ধনে শাক | ১৮.৫ |

*** প্রতি ১০০ গ্রাম আমিষ সমৃদ্ধ দেশীয় খাদ্য**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | গ্রাম |
|---|---|---|
| ১. | গুঁড়া শুটকি (কাচকি) | ৮৮.৪ |
| ২. | চিংড়ি শুটকি | ৬০.০ |
| ৩. | সয়াবিন বীচি | ৪৩.২ |
| ৪. | মুরগীরমাংস | ২৫.৯ |
| ৫. | মসুরডাল | ২৫.১ |
| ৬. | সিমের বীচি | ২৪.৯ |
| ৭. | মুগ ডাল | ২৪.৫ |
| ৮ | মাষকলাই ডাল | ২৪.০ |
| ৯ | গরুর মাংস | ২২.৬ |
| ১০ | ইলিশ মাছ | ২১.৮ |
| ১১. | খাসির মাংস | ২১.৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ১২. | খাসির কলিজা | ২০.৯ |
| ১৩. | ছোলার ডাল | ২০.৪ |
| ১৪. | পাবদা মাছ | ১৯.২ |
| ১৫. | রুই মাছ | ১৬.৬ |

*** প্রতি ১০০ গ্রাম ভিটামিন-সি যুক্ত দেশীয় খাদ্য**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | মিলি গ্রাম |
|---|---|---|
| ১. | আমলকি | ৪৬৩ |
| ২. | সাজনা পাতা | ২২০ |
| ৩. | পেয়ারা | ২১০ |
| ৪. | মুলা শাক | ১৪৮ |
| ৫. | জাম্বুরা | ১০৫ |
| ৬. | পালং শাক | ৯৭ |
| ৭. | আমড়া | ৯২ |
| ৮. | ডাঁটা শাক | ৭৮ |
| ৯. | পুঁই শাক | ৬৪ |
| ১০. | কালো কচু শাক | ৬৩ |
| ১১. | কামরাঙ্গা | ৬১ |
| ১২. | লেবু | ৪৭ |
| ১৩. | লাল শাক | ৪৩ |
| ১৪. | পাকা আম | ৪১ |

*** প্রতি ১০০ গ্রাম ভিটামিন বি-২ যুক্ত দেশীয় খাদ্য**

| ক্রম | খাদ্যের নাম | গ্রাম |
|---|---|---|
| ১. | শালগম শাক | ০.৫৭ |
| ২. | বাদাম | ০.৫৭ |
| ৩. | বিট শাক | ০.৫৬ |
| ৪. | কালো কচু শাক | ০.৪৫ |
| ৫. | মুরগির ডিম | ০.৪০ |
| ৬. | মাষকলাই ডাল | ০.৩৭ |
| ৭. | পুঁই শাক | ০.৩৬ |
| ৮. | আটা | ০.২৯ |
| ৯. | হাঁসের ডিম | ০.২৬ |
| ১০. | মসুর ডাল | ০.২০ |
| ১১. | ছোলার ডাল | ০.১৮ |
| ১২. | সিম | ০.১৬ |
| ১৩. | আতপ চাল | ০.১৬ |
| ১৪. | মুগ ডাল | ০.১৫ |
| ১৫. | সিদ্ধ চাল | ০.১২ |

*** নিয়মিত যে পাঁচ রং-এর খাদ্য অবশ্যই খাওয়া উচিত**

| ক্রম | রং | উদাহরণ |
|---|---|---|
| ১. | সবুজ | সব রকম সবুজ শাক ও সবজি, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি |
| ২. | লাল | শাল শাক, টমেটো, অন্যান্য লাল রং-এর শাক, সবজি ও ফল |
| ৩. | হলুদ | মিষ্টি কুমড়া, গাজর, অন্যান্য হলুদ রং এর শাক, সবজি ও ফল। |
| ৪. | কালো | কালোজিরা, কালো জাম, কালো আঙ্গুর, অন্যান্য কালো রং-এর ফল। |
| ৫. | সাদা | লাউ, আমড়া, পেঁপে, ফুলকপি, নারিকেল শাঁস, দুধ ও সাদা রং-এর অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি।[১৮৫] |

*

* ১৮৫. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার, "দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য ও পুষ্টি", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২৩০

# একাদশ অধ্যায়

## পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভে বিভিন্ন আমল ও দু'আ

**প্রথম পরিচ্ছেদ** : রোগ নিরাময়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের আমল

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : আল্লাহ এবং তাঁর সিফাতি নামের আমল

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর আমল

## প্রথম পরিচ্ছেদ : রোগ নিরাময়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের আমল

পবিত্র কুরআন হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ, যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার বাণী। ইহা মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং চিরন্তন পথ নির্দেশনা। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ গ্রন্থ। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় তা বিদ্যমান থাকবে। এই কিতাবে রয়েছে সর্বকালের মানুষের যুগ-জিজ্ঞাসার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম সমাধান। মানব জাতির প্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয় নেই যা এ মহাগ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আল-কুরআনকে ৫৫টি[১] নামে পরিচিহ্নিতকরেছেন। প্রত্যেকটি নামের মধ্যেই এই কিতাবের গুণাবলী, অন্যনতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। উল্লিখিত এসব নামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে 'হাকিম'[২] (বিজ্ঞানময়) এবং 'শিফা'[৩] (আরোগ্যদান) ইত্যাদি নামেও সম্বোধন করেছেন। সুতরাং আল-কুরআন হচ্ছে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের এক অব্যর্থ এবং স্বর্গীয় মহৌষধ।

মনে রাখতে হবে Word is power তথা প্রতিটি শব্দই একটি শক্তি। কোনো একটি কটু কথা ও গালি দেয়ার কারণে যদি কেউ এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় চরম রাগান্বিত হতে পারে, তাহলে পবিত্র কুরআনের আয়াত, মহান আল্লাহর নামের গুণাবলী এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহেরও নিসন্দেহে কার্যকারিতা রয়েছে। প্রখ্যাত আধ্যাত্মবিশারদ লিড বিটার বলেন, প্রতিটি শব্দ হচ্ছে একটিUnit. এ ইউনিট থেকে একটি তীব্র আলো বের হয়। শব্দের ভালো-মন্দের ওপর ভিত্তি করে সেই আলো পজিটিভ ও নেগেটিভ হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআনের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই পজিটিভ হওয়ায় তা থেকে ইতিবাচক রশ্মি বের হয়ে অসংখ্যক রোগ মুক্তির কারণ হয়ে থাকে।[৪] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ–

অর্থ: তিনি মুমিনদের অন্তরের রোগ নিরাময়কারী।[৫] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে – قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ–

অর্থ: আপনি (তাদেরকে) বলুন, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত (পথ-নির্দেশ) ও রোগমুক্তি (ব্যাধির প্রতিকার)।[৬] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ– وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

অর্থ: হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উপদেশ এসেছে এবং এটা (কুরআন) তোমাদের অন্তরে যে রোগ আছে তার নিরামক এবং মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।[৭]
পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও আল-কুরআনকে আরোগ্যদানকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ–

অর্থ: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: উত্তম দাওয়া হলো কুরআন।[৮]

অন্য এক হাদীসে এসেছে– عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَ الْقُرْاٰنِ–

অর্থ: আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা শিফাদানকারী দু'টি বস্তুকে নিজেদের জন্য অবশ্যই গ্রহণ করবে। একটি মধু এবং অপরটি কুরআন।[৯]

---

১. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক লিখিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৮৪, পৃ. ৫
২. আল-কুরআন, ৩৬: ০২
৩. আল-কুরআন, ৪১: ৪৪
৪. ডা. মোহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই, সুন্নতে নববী আওর জাদীদ সাইনস, (অনূদিত ও সম্পাদিত: খাদিজা আখতার রেজায়ী), *সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন: এপ্রিল ২০০৬, খ. ১, পৃ. ৪৬
৫. আল-কুরআন, ৯: ১৪
৬. আল-কুরআন, ৪১: ৪৪
৭. আল-কুরআন, ১০: ৫৭
৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কুরআন দ্বারা শিফা গ্রহণ, খ. ৪, পৃ. ১১৭, হাদীস নং- ৩৫০১
৯. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অনুচ্ছেদ: মধু, খ. ৪, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ৩৪৫২

সুতরাং আমরা রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থতা লাভ করলেও মূলত আল্লাহ তাআলাই হলেন আমাদের একমাত্র রোগ নিরাময়কারী। কুরআন হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এই নিরাময়ের বিধান তিনি যেমন পার্থিব বিভিন্ন উপকরণ তথা সরাসরি ওষুধের মাধ্যমে রেখেছেন, তেমনি তিনিপবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের মাধ্যমেও রেখেছেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কিরাম এবং যুগে যুগে বুযুর্গগণের মাধ্যমে প্রমাণিত। এবিষয়ে বাজারে অসংখ্য গ্রন্থ থাকলেও উল্লিখিত অধ্যায়ে '*তিব্বে রূহানী*' নামক গ্রন্থটিকে সামনে রেখে নিম্নে কোন সূরা ও আয়াত কোন রোগের জন্য শিফা হিসেবে কার্যকর ও উপকারী তা অতিসংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো-

### বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর আমল

মু'মিন জীবনে বিসমিল্লাহ হলো এক বরকতময় বিষয়, যা প্রতিটি কাজের পূর্বে বলার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। এমনকি পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবা[১০] ব্যতীত অবশিষ্ট **১১৩**টি সূরার শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উল্লেখ রয়েছে। তাই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এমন একটি বরকতময় আমল, যা প্রতিটি রোগেরই প্রতিষেধক হিসেবে কার্যকর যোগ্যতা রাখে। *তিব্বে রূহানী* নামক কিতাবে উল্লেখ আছে- মাটির নতুন বর্তনে ৭বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) লেখে পানি দ্বারা ধৌত করত ঐ পানি সকালবেলা খালি পেটে রুগ্ন ব্যক্তিকে পান করাবে। এরূপ **২১**দিন আমল করলে আল্লাহর ফযলে যে কোনো রোগ ব্যাধি দূরীভূত হবে।[১১]

### সূরা ফাতিহার আমল

পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা ফাতিহাকে আলেমগণ সবচেয়ে মর্যাদাবান সূরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) এই সূরা ফাতিহাকে 'আযমে সূআর' বা সূরাসমূহের মর্যাদাবান সূরা এবং 'কুরআনুল আযীম' নামে উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ

অর্থ: সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শিফা।[১২]

*** মৃগী, গিঁটবাত, মাথা ব্যথা, পুরাতন ক্ষত, চুলকানী হতে মুক্তি লাভের আমল**

মৃগী, গিঁটবাত, মাথা ব্যথা, পুরাতন ক্ষত, চুলকানী ইত্যাদি যে কোনো কঠিন রোগের জন্য ফজরের সুনাত ও ফরয সালাতের মর্ধবর্তী সময়ে ৪১বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)-এর শেষ অক্ষর م (মীম) কে اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর লাম (ل) অক্ষরের সাথে মিলিয়ে (যেমনঃ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) পাঠকরত পানির উপর দম করে রোগীকে পান করালে আল্লাহর ফযলে রোগ নিরাময় হবে। ইহা খুবই পরীক্ষিত একটি আমল।[১৩]

*** রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবত হতে মুক্তির আমল**

যে কোনো কঠিন বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত ও রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি লাভের জন্য একাধারে ৭দিন প্রত্যহ **১১**হাজার বার করে শুধুমাত্র–اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ (ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন)[১৪] পাঠ করলে বিস্ময়কর উপকার পাওয়া যায়।

---

১০. সূরা নং- ৯

১১. মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম দেহলভী, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান), *তিব্বে রূহানী*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, নভেম্বর ২০০০ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ১৪৮

১২. আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, লেবাননঃ বৈরুত, আল-রেসালাহ পাবলিশার্স, ২০০৬, খ. ১, পৃ. ১৬৬

১৩. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে রূহানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

১৪. আল-কুরআন, ১: ৫

*** যেকোনো ব্যথা থেকে মুক্তি লাভ**

আল্লামা আহমদ দায়রবী (রহ.) বলেন, শরীরের যে কোনো জায়গায় ব্যথা হলে ব্যথার স্থানে হাত রেখে ৭ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে আল্লাহর নিকট দুআ করলে, ইনশাআল্লাহ রোগী আরাম পাবে।হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, সূরা ফাতিহা সকল বিষের ঔষধ।[১৫]

বাস্তবে সূরা ফাতিহা হলো মুসলিম জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাণ্ডার। এতে অসংখ্য রোগের চিকিৎসা ও নিরাময় রয়েছে। পূর্বের মুমিনগণ যেভাবে সূরা ফাতিহার আমল করে হাজরো রোগ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছেন, আজও সূরা ফাতিহায় সেই প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় মুসলমানের যবান ও এখলাসের সেই প্রতিক্রিয়া না থাকায় সূরা ফাতিহার আমল করে সাথে সাথে ফায়দা পাওয়া অনেকটা দুষ্কর হওয়ায় আমাদের প্রতিটি আমল একাধিক বার করতে হয়। নতুবা একবার আমলই যথেষ্ট ছিল। তাই বর্তমানে সূরা ফাতিহার যাকাত একাধারে ১১টি রোযা রাখবে। সেহরী ও ইফতারের সময় আটার রুটি খাবে এবং মদীনা তাইয়্যেবার খেজুর বা যমযমের পানি দ্বারা ইফতার করবে। এই ১১দিনের মধ্যে অযুর সাথে কেবলামুখী বসে বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ১লক্ষ ২৫হাজার বার পাঠ করবে। প্রতিদিন ১১হাজার বার পাঠ করলে এবং ১১তম দিনে একটু বেশি পাঠ করলে সোয়া লক্ষ বার পুরা হয়ে যাবে। অত:পর এগারতম দিনে খতম পুরা হওয়ার সাথে সাথে মৃগী রোগী বা পাগলের ওপর দম করবে। রোগী উপস্থিত না থাকলে পানির ওপর দম করে রোগীকে পান করাবে। মৃগী, পাগল এবং অন্যান্য দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য এই আমল খুবই পরীক্ষিত।

**সাপের দংশন নিরাময়ে সূরা ফাতিহা**

গ্রাম-অঞ্চলে সাপের দংশন একটি মামুলী ব্যাপার। প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ সাপের দংশনে মৃত্যুবরণ করে থাকে। সাপের দংশনের বিষ নির্মূলে সূরা ফাতিহার আমল হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَهْطًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْطَلَقُوْا فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى نَزَلُوْا بِحَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَىُّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ قَدْ نَزَلُوْا بِكُمْ، لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَىْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالَ يَا اَيُّهَا الرَّهْطُ الَّذِيْنَ قَدْ نَزَلُوْا بِكُمْ، لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَىْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا اَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا له بِكُلِّ شَىْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ شَىْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ، وَاللهِ اِنِّىْ لَرَاقٍ، وَ لٰكِنْ وَ اللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَا كُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا اَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِّنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَ يَقْرَاُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَتّٰى لَكَاَنَّهَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ مَا بِهِ قَلْبُهُ، قَالَ فَاَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِىْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِىْ رَقٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاْتِىَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَذْكُرُ لَهُ الَّذِىْ كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَاْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَصَبْتُمْ اَقْسِمُوْا وَ اضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ–

অর্থ: আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একদল সাহাবী একবার এক সফরে গমন করেন। অবশেষে তাঁরা আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে এক গোত্রের নিকট এসে মেহমান হতে চান। কিন্তু সে গোত্র তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে। ঘটনাক্রমে সে গোত্রের সর্দারকে সাপে দংশন করে। তারা তাকে সুস্থ করতে সবরকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তখন তাদের কেউ বলল: তোমরা যদি ঐ দলের কাছে যেতে যারা তোমাদের মাঝে এসেছিল। হয়তো তাদের কারও কাছে কোন তদবীর থাকতে পারে। তখন তারা সে দলের কাছে এসে বলল: হে দলের লোকেরা! আমাদের সর্দারকে সাপে দংশন করেছে। আমরা তার জন্য সবরকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তোমাদের কারও

১৫. আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৪

নিকট কি কোন তদবীর আছে? একজন বললেন: হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, আমি ঝাড়-ফুঁক জানি। তবে আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের নিকট মেহমান হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁক করবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্যে মজুরী নির্ধারণ করবে। তখন তারা তাদের একপাল বকরী দিতে সম্মত হল। তারপর সে সাহাবী সেখানে গেলেন এবং আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে ফুঁক দিতে থাকলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন সুস্থ হল, যেন বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। সে চলাফেরা করতে লাগলো, যেন তার কোনো রোগই নেই। রাবী বলেন: তখন তারা যে মজুরীর চুক্তি করেছিল, তা পরিশোধ করল। এরপর সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে যতক্ষণ না এসব ঘটনা ব্যক্ত করব এবং তিনি কী নির্দেশ দেন তা প্রত্যক্ষ করবো, ততক্ষণ তোমরা তা বন্টন করো না। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন: তুমি কি করে জানলে যে এর দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়? তোমরা সঠিকই করেছ। তোমরা এগুলো বন্টন করে নাও এবং সে সঙ্গে আমার জন্যে এক ভাগ নির্ধারণ করো।[১৬]

**পাগল নিরাময়ে সূরা ফাতিহার আমল**

আমাদের সমাজে অনেক মানুষকে পাগল হতে দেখা যায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও পাগল নিরাময়ের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো ওষুধ নেই। কিন্তু পূর্ণ একীন ও এখলাসের সাথে নিয়ম মোতাবেক সূরা ফাতিহার আমল করলে পাগল রোগীকেও সুস্থ করা সম্ভব। এমনি একটি ঘটনা হাদীসে পাওয়া যায়-

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ رَاجِعًا مِّنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلُ مَّجْنُوْنُ مُّوْثَقُ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ اَهْلُهُ اِنَّا حُدِّثْنَا اَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءُ نُدَاوِيْهِ- فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَا فَاَعْطُوْنِيْ مِائَةَ شَاةٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ اِلاَّ هٰذَا- وَ قَالَ مُسَدَّدُ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا قُلْتُ لاَ قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِيْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ-

অর্থ: খারজা ইবন সালত তামীমী (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট হতে ফেরার সময় পথিমধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যান, যাদের মধ্যে শিকল পরা একজন পাগল লোক ছিল। তখন পাগলের অভিভাবকরা বললো, আমরা শুনেছি, তোমাদের সাথী (নবী সা.) উত্তম ও কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তোমার কাছে এমন কোনো জিনিস আছে কি, যা দিয়ে তুমি এ পাগলের চিকিৎসা করতে পারো?

(রাবী বলেন) তখন আমি সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিই, যার ফলে সে ভালো হয়ে যায়। তখন তারা আমাকে একশত বকরী প্রদান করে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: তুমি সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পাঠ করনি তো? রাবী মুসাদ্দাদ অন্য বর্ণনায় বলেছেন: তুমি এছাড়া আর কিছু পড়েছিলে নাকি? আমি বলি, না। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি এগুলো নিয়ে নাও। আমার জীবনের শপথ! লোকেরা তো যাদু-টোনা করে খায়, যা বাতিল। তুমি তো একটি হক তথা সত্য জিনিস পড়ে ফুঁক দিয়েছো।[১৭]

## সূরা বাকারার আমল

সূরা বাকার পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় এবং সর্ববৃহৎ সূরা। হাদীসে এ সূরার অনেক তাৎপর্য বর্ণনা এসেছে। তাই সুস্থতা লাভে এ সূরার বিভিন্ন আয়াতকে একটি অব্যর্থ মহৌষধ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

---

১৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সূরা ফাতিহার দ্বারা ফুঁক দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬৩০-১৬৩১, হাদীস নং-৫৭৪৯

১৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ: ২০০৪, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য, অনুচ্ছেদ: যে সব জন্তু হারাম হওয়ার কথা কুরআন-হাদীসে নেই, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৫৭

*** বদনযর হতে হিফাযতের আমল:** কোনো শিশু, বাড়ি-ঘর বা ফলদার গাছে নযর লাগার আশংকা হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি ৭বার লেখে শিশুর গলায়, বাড়ি-ঘর ও গাছে বেঁধে দেবে বা পড়ে দম করবে। এটা খুবই উপকারী ও পরীক্ষিত আমল। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াত বদনযর হতে পরিত্রাণের জন্য একটি মজবুত দূর্গস্বরূপ। আয়াতটি হলো[১৮]-

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ– وَ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ–

*** ক্ষত, পোড়া ঘা ও ফোড়া নিরাময়ের আমল**

পুরাতন ক্ষত, পোড়া ঘা ও ফোঁড়া ইত্যাদি মারাত্মক জখমের জন্য বিসমিল্লাহসহ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَفِيْهَا আয়াতটি[১৯] ১,০১১বার পাঠ করত মলম বা অন্য কোনো ঔষধের উপর দম করে ক্ষতবা জখমের উপর লাগাবে। ইনশাল্লাহ ১০দিনের মধ্যে ক্ষত ভাল হয়ে যাবে এবং দাগও মিরিয়ে যাবে।

*** কলেরা, বসন্ত হতে হিফাযতের আমল**

নিম্নোক্ত আয়াতটি লেখে দরজার বাইরে ও ঘরের ভেতর দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখলে আল্লাহর ফযলে সেই ঘর কলেরা, প্লেগ, জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি হতে নিরাপদ থাকবে। আয়াতটি হলো[২০]-

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ–

*** পালাজ্বর নিরাময়ের আমল**

পালাজ্বরের জন্য ২টি পানের উপর –ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আয়াতটি[২১] লেখে উক্ত পান পালাজ্বরের রোগীর যেদিন জ্বর থাকবে না সে দিন সকাল ও সন্ধ্যায় খাওয়াবে। অত:পর যে দিন পুনরায় জ্বর আসার পালা আসবে, সেদিন একটি পানের উপর –يَا حَفِيْظُ يَا سَلَامُ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আয়াতটি লেখে খাওয়াবে। আল্লাহর ফযলে পালাজ্বর নিরাময় হবে। জ্বর ব্যতীত অন্যান্য যে সকল রোগ এইরূপ ঘুরে ঘুরে পালাক্রমে আসে, সেসব রোগের জন্যও এ আমল খুবই উপকারী ও পরীক্ষিত।

**আয়াতুল কুরসীর উপকারিতা**

আয়াতুল কুরসী পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত। এই আয়াত অত্যন্ত বরকতময় ও মর্যাদাবান। হযরত উবাই ইবন কাব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এই আয়াতকে 'আ'যম আয়াতুল্লাহ' বা আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[২২] হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এটাকে 'আশরাফু আয়াতুল কুরআন' বা কুরআনের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল আয়াত বলা হয়েছে।[২৩] এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীরে আয়াতুল কুরসীর অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতটি হলো-

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَه مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَه اِلَّا بِاِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلَّا بِمَا شَاۤءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَا يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ–

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব এবং সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান সীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই

---

১৮. আল-কুরআন, ২: ০৭
১৯. আল-কুরআন, ২: ৭১
২০. আল-কুরআন, ২: ১১৫
২১. আল-কুরআন, ২: ১৭৮
২২. আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৪
২৩. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৭

পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধরণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।

আয়াত কুরসীর উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য অনেক। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পেশ করা হচ্ছে-

* রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে ৩বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে শয়তান ও জ্বীনদের অনিষ্টতা হতে নিরাপদ থাকা যায়।

* আয়াতুল কুরসী পাঠ করে কোনো শিশুর উপর দম করলে সারাদিন তার ওপর বদনযর লাগবে না।

* মদীনা মুনাওয়ারার ৭টি খেজুরের উপর ৭দিন পর্যন্ত ৭বার করে আয়াতুল কুরসী পাঠ করত দম করে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রত্যহ একটি করে খাওয়ালে যে কোন কঠিন যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

* কারো শরীরে যাদুর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ভোরবেলা সূর্য উদয়ের পূর্বে গোসল করবে। অত:পর এহরাম বেঁধে কেবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহসহ ১,০০০বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। ২১দিন পর্যন্ত এরূপ আমল করবে। ইনশাআল্লাহ যাদুর প্রতিক্রিয়া বাতিল হয়ে যাবে।

* বমির উদ্রেকের জন্য লবণের ছোট ছোট ৭টি পুটলি বানিয়ে ৭বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে দম দেয়ার পর রোগী ৭দিন সকালে তা খাবে। ইনশাআল্লাহ বমির উদ্রেক থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

* আয়াতুল কুরসী ১১বার পাঠ করে মৃগী রোগীর উপর দম করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। কলিজা ব্যথা এবং হার্টের কম্পন দূর করার জন্য পবিত্র থালায় ৩বার আয়াতুল কুরসী লেখে ধুয়ে রোগীকে পান করালে আল্লাহ চাহেতো যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।[২৪]

* রোগ-ব্যাধি থেকে হেফাযত এবং যুগের ফেৎনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য যে ব্যক্তি মুহাররম মাসের প্রথম রাতে বিসমিল্লাহসহ আয়াতুল কুরসী ৩৬০ বার পাঠ করে দুআ করবে এবং নিজের যাবতীয় দু:খ-কষ্ট, বালা-মুসীবত এবং রোগ-শোকের জন্য আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করবে। ইনশাআল্লাহ সকল দু:খ-কষ্ট, বালা-মসীবত এবং রোগ-শোক দূর হয়ে যাবে।

উলামাগণ আয়াতুল কুরসীর অসংখ্য ফায়য়েল লেখেছেন। বিশেষত রাতে ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে বুকে ফুঁ দিলে মানুষ দু:স্বপ্ন, পেরেশানী এবং চুরি-ডাকাতি থেকে নিরাপদ থাকে। করুণাময় আল্লাহ তার জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ির হেফাযত করেন। কেননা, তিনিই সবোর্ত্তম হেফাযতকারী। আর এ আয়াতে এই শিক্ষারই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

* আল্লামা মুহাম্মদ আল জাযরী (রহ.) বলেন, যে মাল বা সন্তানকে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে দম দেয়া হবে অথবা লেখে সম্পদের ভেতর ও সন্তানের গলায় রেখে দেয়া হবে, শয়তান সেই সম্পদ বা সন্তানের কাছেও পৌঁছতে পারবে না।[২৫]

## সূরা আল ইমরান-এর আমল

*** পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা ও বদনযরের আমল**

(ক) পেট ব্যথার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত ৭বার পাঠকরত: শরবত বা পানির উপর দম করে পান করালে পেট ব্যথা আরোগ্য হবে। এই আয়াত ইসমে আযম। আয়াতটি হলো[২৬]–اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

(খ) মাথা ব্যথার জন্য অবব্যহৃত মাটির পাত্রে এ আয়াত লেখে ধুয়ে পানি পান করালে বিশেষ উপকার হয়।

(গ) জাদুটোনা, জ্বিন-ভূত, বদনযর ও শিশুরোগ হতে হিফাযতের নিমিত্ত ছেলেদের জন্য তামার পাতে আর মেয়েদের জন রূপার পাতে উক্ত আয়াত খোদাই করে গলায় লটকিয়ে দেবে। ইনশাআল্লাহ সকল অনিষ্টতা হতে নিরাপদ থাকবে।

*** গর্ভধারণের আমল**

---

২৪. প্রিন্সিপাল হাফেজ নযর আহমদ, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান), *তিব্বে নববী*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, মার্চ ২০০২ (চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ১১৯

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২৬. আল-কুরআন, ৩: ২

যে মহিলার গর্ভ টিকে না তাকে ৭দিন পর্যন্ত রুটির টুকরার উপর নিম্নোক্ত আয়াত লেখে খালি পেটে খেতে দেবে। আল্লাহ চাহেতু গর্ভধারণ করবে এবং গর্ভ টিকে যাবে। এ আমল চাঁদের প্রথম তারিখ হতে অথবা মাসিক ঋতু হতে পবিত্র হওয়ার দিন হতে আরম্ভ করবে। ইনশাআল্লাহ অবম্যই সফল হবে। এটা যে খুবই উপকারি আমল তা প্রমাণিত হয়েছে। আয়াতটি[২৭] হলো- هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ– لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

**সূরা নিসা-এর আমল**

* চিকিৎসকের ফেরত দেয়া যে কোনো কঠিন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর জন্য নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ রাত্রে এশার সালাতেরর পর বাতি নিভিয়ে খালি মাথায় ৩০০বার দাঁড়িয়ে, ৩০০বার বসে, ১০০বার উত্তর দিকে, ১০০বার দক্ষিণ দিকে ফিরে, ১০০বার আকাশের দিকে মুখ উঠিয়ে এবং ১০০বার সিজদায় গিয়ে সর্বমোট ১,০০০বার পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে রোগী আরোগ্য লাভ করবে। এটি একটি অব্যর্ত আমল। সম্ভব হলে রোগী নিজে আমল করবে। রোগী নিজে না পারলে অন্য কেউ আমল করলেও চলবে। একাধারে ৭দিন এ আমল করবে। শুক্রবার হতে আরম্ভ করবে এবং প্রতিদিন আমল শেষ করে রোগীর আরোগ্যের জন্য দু'আ করবে।[২৮] আয়াতটি[২৯] হলো-

وَسْئَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا–

**সূরা আন'আম-এর আমল**

**কিছুদিন পর পর অসুস্থ হয়ে পড়া লোকের সুস্থতার আমল**

যে ব্যক্তি কিছুদিন পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে প্রত্যহ ৩বার নিম্নোক্ত আয়াত নতুন বরতনে লেখে ধুয়ে পানি পান করালে বা লেখে গলায় তাবীয ব্যবহার করলে ইনশাআল্লাহ সুস্থতা লাভ করবে। আয়াতগুলো[৩০] হলো-

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ، كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... وَ لَه مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

**সূরা আরাফ-এর আমল**

**মনের অশান্তি ও অস্থিরতা দূর হওয়ার আমল**

দু:খ-বেদনা, চিন্তা-পেরেশানী, মনের অশান্তি ও অস্থিরতার জন্য ফজরের নামাযের পর বুকের উপর হাত রেখে নিম্নের আয়াতটি ১০১বার পাঠ করলে খুবই উপকার পাওয়া যাবে। লেখক বলেন, ইহা আমাদের পরীক্ষিত আমল।

আয়াতটি[৩১] হলো المّص– كِتَابُ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ–

**সূরা আনফাল-এর আমল**

**ভয় ও হৃদকম্প নিরাময়ের আমল**

ভয়, হৃদকম্প ইত্যাদি রোগের জন্য ৭দিন ৭বার নিম্নের আয়াতটি বৃষ্টির পানি দ্বারা লেখে পান করালে বারবৃষ্টির পানির মধ্যে জাফরান মিশিয়ে এর দ্বারা আয়াতটি ৭বার লেখে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে আল্লাহর ফযলে রোগ আরোগ্য লাভ করবে। আয়াতটি[৩২] হলো-

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَ لِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الاَقْدَامَ–

২৭. আল-কুরআন, ৩: ৬
২৮. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে রূহানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩
২৯. আল-কুরআন, ৪: ৩২
৩০. আল-কুরআন, ৬: ১১-১৩
৩১. আল-কুরআন, ৭: ১-২
৩২. আল-কুরআন, ৮: ১১

## সূরা তাওবা-এর আমল

**মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা ও নেশা মুক্তির আমল**

কারো মাথা ব্যথা হলে তার মাথা ধরে এ আয়াত শরীফ ৭বার পাঠ করত দম করলে মাথা ব্যথা সেরে যাবে। আয়াতগুলো[৩৩] নিম্নরূপ-

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ– فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ– لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ– عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ–

পেট ব্যথা হলে উপরোক্ত আয়াতটি ১১বার পাঠকরতপানির উপর দম করে পান করালে ব্যথা নিরাময় হবে।

ফাসেক-পাপিষ্ট, শরাবখোর, আফিমখোর ইত্যাদি নেশাগ্রস্ত লোক ২১দিন পর্যন্ত প্রত্যহ ১০০বার করে অযুসহ উপরোক্ত আয়ত পাঠ করলে যাবতীয় বদ অভ্যাস দূর হবে। যে কোনো বিপদ-আপদ ও মুসীবতের জন্য ৭দিন পর্যন্ত প্রত্যহ ৩,০০০ বার উপরোক্ত আয়াত শরীপ পাঠ করলে ইসমে আযমের মত তাসীর হয়।[৩৪]

## সূরা ইউনুস-এর আমল

**রোগ মুক্তির আমল**

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ কোনো বর্তনে লেখে ধুয়ে পানি পান করালে ইনশাআল্লাহ যে কোনো রোগ ৭দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করবে। আয়াতগুলো[৩৫] হলো-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ– وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ– قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ–

## সূরা ইউসুফ-এর আমল

**মানসিক যাতনা ও চিন্তা দূর হওয়ার আমল**

যে কোনো দু:খ-কষ্ট, চিন্তা-পেরেশানী ও মানসিক যাতনায় সূরা ইউসুফ ৩বার পাঠ করলে মনে প্রশান্তি আসে ও যাবতীয় চিন্তা-পেরেশানী দূরীভূত হয়ে যায়। ইহা পরীক্ষিত আমল।[৩৬]

## সূরা বনী ইসরাঈল-এর আমল

**রোগ নিরাময়ের আমল**

নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ ৭বার পাঠ করে রোগীর উপর দম করলে আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করবে। আয়তটি[৩৭] হলো– وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ– وَ لاَ يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا–

## সূরা মারয়াম-এর আমল

**শিশুর যবান খুলার আমল**

কোনো শিশুর বয়স তিন বা চারবছর হয়ে গেলেও যদি কথা বলতে শুরু না করে, তবে ২১দিন পর্যন্ত প্রত্যহ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ লেখে ধুয়ে পানি পান করাবে। ইনশাআল্লাহ ২১ দিনের মধ্যেই কথা বলতে আরম্ভ করবে। ইহা খুবই উপকারী ও পরীক্ষিত আমল। আয়াতগুলো[৩৮] হলো-

اِنِّىْ عَبْدُ اللهِ– اٰتٰنِىَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِىْ نَبِيًّا– وَ جَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَ اَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا– وَ بَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا– وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا–

---

৩৩. আল-কুরআন, ৯: ১২৮-১২৯
৩৪. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে রূহানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৩৫. আল-কুরআন, ১০: ৫৭-৫৮
৩৬. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে রূহানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৩৭. আল-কুরআন, ১৭: ৮২
৩৮. আল-কুরআন, ১৯: ৩০-৩৩

## সূরা ত্বাহা-এর আমল

### * রোগীর আরোগ্য লাভের আমল

সূর্য ওঠার পূর্বে একাধারে ৭দিন প্রত্যহ طٰهٰ– مَآ اَنْزَلْنَا হতে لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى (আয়াত[৩৯]) পর্যন্ত ৭বার পড়ে রুগ্ন ব্যক্তির উপর দম করলে আল্লাহর ফযলে ৭দিনেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। এ আমল খুবই উপকারী।

### * ভয়-ভীতি ও বুক কাঁপা দূর হওয়ার আমল

যে ব্যক্তির কথা বললে বা হাঁটলে বুক কাঁপে বা শ্বাস নিতে কষ্ট হং বা মনে সব সময় ভয়-ভীতি বিরাজ করে বা বেশি মানুষের সমাবেশে গেলে পেরেশানী আসে। সে ব্যক্তি সর্বদা ফজরের সালাতের পর নিম্নোক্ত আয়াতটি ২১বার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ উল্লিখিত অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যাবে। আয়াতগুলো[৪০] হলো-

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ– وَ يَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ– وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ– يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ–

### * যাদুর আছর নষ্ট করার আমল

নিম্নোক্ত আয়াতটি ৭দিন প্রত্যহ ২১বার পাঠ করে পানির উপর দম করত কোন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে পার করালে ইনশাআল্লাহ যাদর আছর নষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতগুলো[৪১] হলো-

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَّ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى– فَاُلْقِىَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰى–

## সূরা আম্বিয়া-এর আমল

### * জ্বর উপশমের আমল

কারো জ্বরের তাপ বেশি রকম বেড়ে গেলে, তার শিয়রে দাঁড়িয়ে নিম্নের আয়াতটি ১,০০০ বার পাঠ করলে আল্লাহর ফযলে জ্বর থেমে যাবে। আয়াতটি[৪২] হলো–يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ

### * রোগ-ব্যাধি ও মুশকিল আসানের আমল

যে কোনো রোগ-ব্যাধির উপশম ও সব মুশকিল আসানের নিমিত্ত আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এই পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতটি[৪৩] শরীফ নাযিল করেছেন–لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

এটি একটি অব্যর্থ আয়াতে শিফা ও ইসমে আযম। এই মোবারক আয়াত পাঠের অসংখ্য তারতীব ও নিয়ম আল্লাহওয়ালাদের হতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করা হলো-

**প্রথম নিয়ম** এক বৈঠকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বার এই আয়াতের খতম পাঠ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তবে এ খতমের নিয়ম হলো- ৭, ১১ অথবা ২১ জন লোক গোসল করে সাদা পোশাক পরিধান করবে। প্রত্যেকেই সালাতুত তাওবার ২ রাকাআত করে নফল নামায আদায় করবে। যথাসম্ভব সকলে কেবলামূখী হয়ে বসবে। এ সময় দুনিয়াবী কোনো কথাই বলবে না। এখলাস, আন্তরিক নিষ্ঠা ও গভীর বিশ্বাসের সাথে খতম পুরা করবে। এ নিয়মে একাধারে ৩দিন প্রত্যহ একবার করে খতম পুরা করবে। ইনশাআল্লাহ এই আমল যাবতীয় বালা-মুসীবত দূর করবে। খুবই পরীক্ষিত আমল।

**দ্বিতীয় নিয়ম** আমলকারী ৭দিন রোযা রাখবে। পানাহার অবশ্যই হালাল হতে হবে। প্রত্যহ এশার সালাতের পর অন্ধকার কুঠরীতে বসে প্রথমে নিম্নোক্ত দরূদ ২১বার পাঠ করবে – اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

৩৯. আল-কুরআন, ২০: ১-২
৪০. আল-কুরআন, ২০: ২৫-২৮
৪১. আল-কুরআন, ২০: ৬৯-৭০
৪২. আল-কুরআন, ২১: ৬৯
৪৩. আল-কুরআন, ২০: ৮৭

অত:পর –لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ১০০ বার পাঠ করবে। সামনে একটি বর্তন ভরে পানি রাখবে এবং প্রত্যেকবার আয়াত পাঠ করার পর ডান হাত উক্ত পানিতে ভিজিয়ে মুখ মুছবে এবং ৩বার اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى وَ النُّوْنِ পড়বে। অত:পর ৩বার –فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ পড়বে। এরূপে ৭দিন আমল করলে ইনশাআল্লাহ যে কোনো মাকসূদ হাসিল হবে।

**তৃতীয় নিয়ম** এ নিয়ম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী (রহ.)-কে স্বপ্নযোগে শিক্ষা দিয়েছিলেন। একবার হযরত আবূ আবদুল্লাহ (রহ.) একটি কঠিন মুসীবতে পড়ে গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় একরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যিয়ারত নসীব হয়। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি কঠিন মুসীবতে পড়ে গেয়েছি। এমতাবস্থায় আমি কী দুআ পাঠ করবো?রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন:

তুমি দুই রাকাআত সালাত আদায় করো এবং প্রত্যেক সিজদায় ৪০বার করে لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْكُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ– পাঠ কর। ইনশাআল্লাহ তোমার মুসীবত দূর হয়ে যাবে।

লেখকের অভিমত হলো এই আমল খুবই পরীক্ষিত। তাই প্রত্যেক মুসলমানকেই এই আমল অবশ্যই করা উচিত। এই আমল সর্বাধিক ৭দিন করবে। ইনশাআল্লাহ এই সময়ের মধ্যেই সফলকাম হবে।

**চতুর্থ নিময়** একাধারে ৭দিন প্রত্যহ যে কোনো এক সময় দাঁড়িয়ে এই আয়াত শরীফ ১হাজার ৩বার পাঠ করা যাবতীয় হাজত ও মাকসূদ হাসিলের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

**পঞ্চম নিয়ম** একাধারে ৪০দিন প্রত্যহ ১১হাজার বার করে এই আয়াত পাঠ করবে। আমল করার দিনগুলোতে যে কোন জীব-জন্তুর গোশত ও গুরুপাক বর্জন করবে। প্রত্যহ যবের একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানি ব্যতীত অন্য কোন পানাহার করা যাবে না। এই আমল আমলকারীকে পবিত্র এবং সাহেবে তাসীর বানায়। তার দুআ করবুল হয়। ৪০দিন পর এমন এমন গায়েবী রহস্য প্রত্যক্ষ করবে, যা দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাবে।[৪৪]

*** বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তান লাভের আমল**

বন্ধ্যা স্ত্রীলোক ও সন্তানহীন পুরুষ একাধারে ৪০দিন পর্যন্ত বিসমিল্লাহসহ প্রত্যহ ৩,০০০ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সন্তান লাভ করবে। আয়াতটি[৪৫] হলো –رَبِّ لاَ تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

## সূরা মুমিনুন-এর আমল

*** গর্ভ নষ্ট না হওয়ার আমল**

যদি কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী না হয় বা স্বল্প দিনের গর্ভ পড়ে যায়, তবে নিম্নোক্ত আাত শরীফ একাধারে ৭দিন প্রত্যহ ৭হাজার বার করে অযুসহ খালি মাথায় কিবলামুখী বসে পাঠ করবে। ৭ম দিনের পাঠ শেষ করত মিশ্‌ক ও জাফরান কালি দ্বারা এ আয়াত সাদা কাগজের উপর লেখে তাবীজ বানিয়ে উক্ত স্ত্রীলোকের গলায় বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ অল্প দিনের মধ্যেই মহিলা গর্ভবতী হবে এবং সুস্থ ও পূর্ণ সন্তান প্রসব করবে। গর্ভ নষ্ট হবে না। আয়াতগুলো[৪৬] হলো-

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ– ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا– ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ– فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ–

৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান, *তিব্বে রূহানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৯১

৪৫.আল-কুরআন, ২১: ৮৯

৪৬. আল-কুরআন, ২৩ : ১২-১৪

## সূরা ফুরকান-এর আমল

### * কান ব্যথা উপশমের আমল

যদি কারো কানে ব্যথা হয় এবং চিকিৎসায় কোন বিশেষ ফায়দা না হয়, তবে সে ব্যক্তি নিজে অথবা অন্য কেউ নিম্নোক্ত আয়াত অযুসহ ২১বার পাঠ করে পানিতে দম করবে। অত:পর তা হতে ৩ ফোটা পানি তার কানের মধ্যে টপকিয়ে দেবে। ইনশাআল্লাহ ব্যথা তৎক্ষণা দূরীভূত হয়ে যাবে। আয়াতগুলো[৪৭] হলো-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا– اَلَّذِىْ لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكُ فِى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَه تَقْدِيْرًا–

### * রুগ্ন ব্যক্তির ঘুমের আমল

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তির রাত্রে ঘুম না আসে একাধারে ৭দিন প্রত্যহ নিম্নোক্ত আয়াত ৫০০বার পাঠ করত পানির উপর দম করে রোগীকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ রোগীর ঘুম আসবে। আয়াতটি[৪৮] হলো-

وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا–

### * শরীরের ব্যথা দূর করার আমল

শরীরের কোনো স্থানের ব্যথা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের আমল খুবই উপকারী ও পরীক্ষিত।

আমলের নিয়ম: প্রথমে ৩বার, দ্বিতীয়বারে ৫বার, তৃতীয়বারে ৭বার, চতুর্থবারে ১১বার এবং পঞ্চমবারে ২১বার এই আয়াত পাঠ করত ব্যথার স্থানে দম দেবে। রোগী প্রত্যেক বার ব্যথার স্থান নিজ হাতে শক্ত করে চেপে ধরবে এবং দম করার সাত্রে সাতে হাত ছেড়ে দেবে। এ আমল সর্বদা সূর্যোদয়ের পর পর করবে। ইনশাআল্লাহ ব্যথা অবশ্যই দূরীভূত হবে। আয়াতগুলো[৪৯] হলো-

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شَآءَ لَجَعَلَه سَاكِنًا– ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً– ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا–

## সূরা শুআরা-এর আমল

### * বিচ্ছু, ভিমরুল ইত্যাদির ব্যথা উপশমের আমল

বিচ্ছু, ভিমরুল বা বোলতা কারো শরীরে হুল ঢুকিয়ে দিলে হুল ফোটানোর জায়গায় কোন কাঠির দ্বারা তুড়ি দিতে দিতে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পর্যায়ক্রমে ৩, ৫, ৭ ও ২১ বার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করবে। ইহা বহু পরিক্ষীত আমল। আয়াতটি[৫০] হলো – وَ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ–

### * তীব্র জ্বর ও মাথা ব্যথার আমল

তীব্র জ্বর ও মাথা ব্যথায় রোগীর মাথার উপর শাহাদত আঙ্গুল রেখে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ ২১বার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই জ্বর ও মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। আয়াতগুলো[৫১] হলো-

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ– وَ اِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ– نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنَ– عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ–

## সূরা নমল-এর আমল

### * বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের আমল

বন্ধ্যা নারী খালেস নিয়তে একাধারে ৪০দিন প্রত্যহ ১,০০০বার করে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্র উত্তম ফল পাবে। আয়াতটি[৫২] হলো–اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

### * দূরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্যের আমল

---

৪৭. আল-কুরআন, ২৫ : ১-২
৪৮. আল-কুরআন, ২৫ : ৪৭
৪৯. আল-কুরআন, ২৫: ৪৪-৪৬
৫০. আল-কুরআন, ২৬: ১৩০
৫১. আল-কুরআন, ২৬: ১৯১-১৯৪
৫২. আল-কুরআন, ২৭: ২৬

যে কোন দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য–اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ আয়াতটি একাধারে ২১দিন প্রত্যহ ৭,০০০ বার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই রোগী আরোগ্য লাভ করবে। ইহা খুবই পরীক্ষিত আমল।

*** জ্বীন-ভূত তাড়ানোর আমল**

যদি কোন ঘরে জ্বীন-ভূত অত্যাচার করে বা কারো উপর জ্বীন আছর করে, তবে গোসল করে ২রাকাআত নামায আদায় করত নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ একটি কাগজে ৭বার লেখে গলায় দিলে বা ঘরে লটকিয়ে রাখলে ইনশাআল্লাহ সে দিন হতেই জ্বীন-ভূত চলে যাবে। অত:পর সেখানে আর কখনো জ্বীন-ভূত আসবে নাা। আয়াতটি[৫৩] হলো-

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ–

*** বালা-মুসীবত ও রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তির আমল**

যে কোন বালা-মুসীবত ও রোগ-ব্যাধির জন্য নিম্নোক্ত আয়াত ১লক্ষ ২৫হাজার বার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ শ্রীঘ্র বালা-মুসীবত দূর হয়ে যাবে এবং রোগী সুস্থতা লাভ করবে। যদি তকদীরে হায়ত শেষ হয়ে থাকে, তবে আসানীর সাথে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ইহা পরীক্ষিত আমল। আয়াতটি[৫৪] হলো – اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ–

## সূরা রোম-এর আমল

*** বার্ধক্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মজবুত থাকার আমল**

যে সর্বদা প্রত্যেক দিন রাত্রে এশার সালাতের পর বা দিনের বেলা যোহরের সালাতের পর প্রথমে ১১বার সালাতে পঠিত দরূদ শরীফ পাঠ করত ১,০০১বার নিম্নে উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছার পরও তার দৃষ্টিশক্তি, দাঁত ও অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অটুট ও মজবুত থাকবে। লেখক বলেন, ইহা আমার খান্দানের বুযুর্গদের খুবই পরীক্ষিত আমল। আয়াতগুলো[৫৫] হলো-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا– فِطْرَتَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا– لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ– ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ– وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

*** শুকিয়ে যাওয়ার আমল**

যদি কোন শিশু বা বয়স্ক লোক শুকিয়ে যেতে থাকে এবং বাহ্যিকভাবে কোন অসুখ-বিসুখও বোঝা না যায়, তবে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ এশার নামাযের পর ১,০১৩ পাঠ করত এক পোয়া চামেলী বা সরিষার তেলের উপর দম করবে। উক্ত তেল প্রত্যহ অল্প অল্প করে রোগীর শরীরে মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ ১১দিনের মধ্যেই রোগী সুস্থ-সবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আয়াতটি[৫৬] হলো:

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْىِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا– اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى– وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ–

## সূরা লুকমান-এর আমল

**মৃগী রোগের আমল**

নিম্নোক্ত আয়াত মোবারক কাগজে লেখে পানিতে ধুয়ে মৃগী রোগীকে পান করালে বা তাবীজ বানিয়ে গলায় দিলে বিশেষ উপকার হবে। আয়াতটি[৫৭] হলো–مَا خَلْقُكُمْ وَ لاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ– اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ–

---

৫৩. আল-কুরআন, ২৭: ৩০-৩১
৫৪. আল-কুরআন, ২৭: ৬২
৫৫. আল-কুরআন, ৩০: ৩০
৫৬. আল-কুরআন, ৩০: ৫০
৫৭. আল-কুরআন, ৩১: ২৮

## সূরা ফাতির-এর আমল

**রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্য লাভের আমল**

একাধারে ৭দিন প্রত্যহ ১১বার করে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করত কোন রুগ্ন ব্যক্তির উপর দম করলে ইনশাআল্লাহ ৭দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠবে। আর আয়ু না থাকলে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে। আয়াতটি[৫৮] হলো-

وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى– فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًا–

## সূরা ইয়াসীন-এর আমল

*** মুমূর্ষু রোগীর আরোগ্য লাভের আমল**

নিম্নোক্ত আয়াতটি মিশক আম্বর দ্বারা লেখে মুমূর্ষু রোগীর বালিশের নিচে রাখলে ইনশাআল্লাহ শীঘ্র আরোগ্য লাভ করবে। আয়াতটি[৫৯] হলো اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَرَهُمْ– وَ كُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ–

*** জটিল রোগাক্রান্ত রোগীর রোগ মুক্তির আমল**

যে কোনো কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতের ১লক্ষ ২৫হাজার বার খতম পাঠ করলে আশ্চর্য রকম ফল পাওয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত আমল।

খতম পাঠের নিয়ম: খতম পাঠকারী ১১জনের কম এবং ২১জনের বেশি হতে পারবে না। প্রত্যেকেই অযু করত সালাতুত তাওবা হিসেবে ৪ রাকাআত নফল নামায আদায় করবে। অত:পর ১১বার করে صَلَاةُ اللهِ وَ سَلَامُهُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ– এই দরূদ পাঠ করবে। অত:পর–سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِএই মোবারক আয়াতটি সোয়া লক্ষ বার পাঠ করবে।

**সূরা ইয়াসীন-এর বিবিধ আমল ও ফযীলত**

(ক) প্রত্যহ একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করে রুগ্ন ব্যক্তির উপর দম করলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

(খ) মুমূর্ষু অবস্থায় এই মোবারক সূরা তিলাওয়াত করে শুনালে দ্রুত মুশকিল আসান হয়।

(গ) রিযিক বৃদ্ধি এবং নি:সন্তানের সন্তান হওয়ার জন্য এই মোবারক সূরা প্রত্যহ ৩বার পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী এবং পরীক্ষিত আমল।

(ঘ) প্রসূতিকে সন্তান প্রসবের পর ৪০দিন পর্যন্ত এই সূরা পাঠ করত দম করে পানি পান করানো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

(ঙ) গর্ভবতী মহিলাকে প্রত্যহ সূরা ইয়াসীন পাঠ করত বাতাসার উপর দম করে খাওয়ালে অতি সহজ ও নিরাপদে সন্তান প্রসব হয়।

মোটকথা, সূরা ইয়াসীন পবিত্র কুরাান মাজীদের কলব। ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় সমস্যা ও বালা-মুসীবতের জন্য অব্যর্থ ও বিস্ময়কর প্রতিষেধক।[৬০]

## সূরা যুমার-এর আমল

**চিকিৎসার প্রতি নিরাশ রোগীর আরোগ্য লাভের আমল**

শুক্রবার সুবহে সাদিকের সময় বৃষ্টির পানির সাথে মেশক গুলে এই কালি দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ লেখে চিকিৎসার প্রতি নিরাশ হয়ে যাওয়া রোগীর গলায় বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠবে এবং হায়াত না থাকলে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করবে। এই আমল বহু পরীক্ষিত। বড় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর এই পবিত্র আয়াত। এই আয়াতে কারীমাই সকল নিরাশার আশা, সকল অসহায়ের একমাত্র ভরসা। আয়াতটি[৬১] হলো-

---

৫৮. আল-কুরআন, ৩৫: ৪৫

৫৯. আল-কুরআন, ৩৬: ১২

৬০. আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৪০৪-৪০৬

৬১. আল-কুরআন, ৩৯: ৫৩

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ- اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا- اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

### সূরা যুখরুফ-এর আমল

**শিশুর দুধ পান করার আমল:** কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশু দুধপান না করলে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ লেখে গলায় বেঁধে দেবে। অথবা কোনো নতুন বর্তনে লেখে তা দ্বারা পানি পান করাবে। ইনশাআল্লাহ শিশু স্বাভাবিকভাবে দুধ পান করবে। আয়াতটি[৬২] হলো–سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ-

### সূরা জাসিয়া-এর আমল

**ক্ষত ও ঘা নিরাময়ের আমল**

শরীরে ক্ষত ও ঘা হলে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ১৭দিন প্রত্যহ ১০০বার পাঠ করে পানির উপর দম করত রোগীকে পান করালে ইনশাআল্লাহ শরীরের ক্ষত ও ঘা অতি দ্রুত শুকিয়ে যাবে। আয়াতগুলো[৬৩] হলো-

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبُّ الاَرْضِ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ- وَ لَهُ الْكِبْرِيَآءِ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

### সূরা আহকাফ-এর আমল

*** শিশুর কান্না বন্ধ ও দুধপান করার আমল**

কোনো শিশু অতিরিক্ত কান্নাকাটি করলে বা মায়ের বুকের দুধ পান না করলে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লেখে শিশুর গলায় গলায় বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ কান্না বন্ধ হয়ে যাবে এবং স্তন পান করতে আরম্ভ করবে। আয়াতগুলো[৬৪] হলো-

وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا- وَ بُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ- اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ- اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا- جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-

*** শুকিয়ে যাওয়া রোগের আমল**

কোনো শিশু দিন দিন শুকিয়ে যেতে থাকলে নিম্নোক্ত মোবারক আয়াতটি ১,০০০ বার পাঠ করত একপোয়া সরিষার তেলের উপর দম করবে। অত:পর ঐ তেল সকাল বিকাল শিশুর শরীরেমালিশ করবে। আল্লাহর ফযলে একুশ দিনের মধ্যে শিশু সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে। আয়াতটি[৬৫] হলো-

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ وَ لَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى- بَلٰى اِنَّه عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

### সূরা মুহাম্মদ-এর আমল

*** উদগার ও বমিভাব দূর হওয়ার আমল**

কারো বমিভাব ও উদগার দেখা দিলে একটি মাটির পেয়ালা গোলাপ পানি দ্বারা ধুয়ে শুকাবে। অত:পর নিম্নোক্ত মোবারক আয়াতগুলো এতে লেখে রোগীকে দৈনিক ৩বার এই পেয়ালা দ্বারা পানি পান করাবে। ইনশাআল্লাহ উদগার ও বমিভাব দূর হয়ে যাবে। আয়াতগুলো[৬৬] হলো-

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَآ نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ- ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ اَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ-

---

৬২. আল-কুরআন, ৪৩: ৮২
৬৩. আল-কুরআন, ৪৫: ৩৬-৩৭
৬৪. আল-কুরআন, ৪৬: ১২-১৪
৬৫. আল-কুরআন, ৪৬: ৩৩
৬৬. আল-কুরআন, ৪৭: ২-৩

*** স্ত্রীলোকের বুকে দুধ আসার আমল**

কোন স্ত্রীলোকের দুধ শুকিয়ে গেলে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ লেখে তার গলায় তাবীয দেবে এবং পাঠ করত পানিতে দম দিয়ে ঐ পানির দ্বারা বুক ধুয়ে দেবে। অত:পর ঐ পানি কোন নিরাপদ দেয়ালে ছিটিয়ে দেবে। আল্লাহর ফযলে বুকে দুধ আসবে। আয়াতটি[৬৭] হলো-

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ– وَ اَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُه وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ– وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى–

**সূরা ক্বাফ-এর আমল**

*** দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার আমল**

নিম্নোক্ত আয়াত ১৪১বার পাঠ করত কালো সুরমার উপর দম করে উক্ত সুরমা চোখে ব্যবহার করলে ইনশাআল্লাহ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। আয়াতটি[৬৮] হলো – لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدُ–

খাজা ফরীদুদ্দীন (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নের আয়াতটি ৭বার এবং এর সাথে ৭বার দরূদ শরীফ পাঠ করে নখের উপর ফুঁক দিয়ে চোখের উপর মাসেহ করবে,তার চোখের দৃষ্টি কখনো নষ্ট হবে না। আয়াতটি হলো-

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدُ–

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীও (রহ.) স্বীয় 'কাওলুল জামীল' কিতাবে এই তদবীরের উল্লেখ করেছেন।[৬৯]

*** মৃগী রোগীর আমল**

মৃগী রোগীকে ৪০দিন পর্যন্ত প্রত্যহ নিম্নোক্ত আয়াতটি আম্বর দ্বারা লেখে ধুয়ে পানি পান করালে বিশেষ উপকার হয়। আয়াতগুলো[৭০] হলো-

اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ– يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا– ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ– نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ– فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدُ–

**সূরা যারিয়াত-এর আমল**

**বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের আমল**

বন্ধ্যা স্ত্রীলোক হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার দিন ২টি সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে একটির উপর وَ الْاَرْضَفَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ– আয়াতটি[৭১] লেখে স্ত্রীকে খাওয়াবে এবং অপর ডিমের উপর وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّالَمُوْسِعُوْنَ– আয়াতটি[৭২] লেখে স্বামীকে খাওয়াবে। রাত্রে সহবাস করবে। এভাবে ৩দিন আমল করবে। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সন্তান লাভের আশা পূর্ণ হবে।

**সূরা তূর-এর আমল**

*** ঘুমের মধ্যে দাঁত কটমট বন্ধ করার আমল**

ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁত কটমট করলে বা চাবালে নিম্নোক্ত মোবারক আয়াতসমূহ লেখে তাবীযরূপে গলায় ব্যবহার করলে উপরোক্ত দোষ দূরীভূত হবে। আয়াতগুলো[৭৩] হলো-

---

৬৭. আল-কুরআন, ৪৭: ১৫
৬৮. আল-কুরআন, ৫০: ২২
৬৯. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৭০. আল-কুরআন, ৫০: ৪৩-৪৫
৭১. আল-কুরআন, ৫১: ৪৮
৭২. আল-কুরআন, ৫১: ৪৭
৭৩. আল-কুরআন, ৫২: ৯-১৫

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا– وَ تَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا– فَوَيْلُ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ– اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ– يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا– هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ– اَفَسِحْرُ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُوْنَ–

*** চোখ উঠা রোগের আমল**

কারো চোখ উঠা রোগ হলে নিম্নোক্ত মোবারক আয়াতসমূহ পাঠ করত পানির উপর দম করে উক্ত পানি কাঠির দ্বারা চোখে দেবে। ইনশাআল্লাহ ৭দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে। আয়াতগুলো[৭৪] হলো-

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّ لاَ مَجْنُوْنٍ– اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِه رَيْبَ الْمَنُوْنَ– قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِّيْنَ–

**সূরা নজম-এর অমল**

*** পাগল ভালো হওয়ার আমল**

পাগলের তদবীর করার জন্য প্রথমে আমলকারীকেই পরিশুদ্ধ হতে হবে। যাবতীয় গুরুপাক, দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বর্জন করত **১১**টি রোযা রাখবে। **১১**দিন রোযা রাখা অবস্থায় **১**লক্ষ **২৫**হাজার বার يا نور-এর খতম পড়বে। অত:পর **১২**তম দিন হতে ৭দিন পর্যন্ত প্রত্যহ সূরা নজম-এর প্রথম **১২**টি আয়াত ৭,০০০বার পা করত পানির উপর দম করবে এবং ঐ পানি পাগল ব্যক্তির মাথায় ঢালবে। অত:পর দম করা ব্যবহৃত পানি কোনো পাক জায়গায় দাফন করে রাখবে অথবা কোনো নদী, পুকুর বা কূপে ফেলে দেবে। ইনশাআল্লাহ পাগল শ্রীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। এটা খুবই পরীক্ষিত আমল। এখলাসের সাথে আমল করলে আল্লাহর ফযলে অবশ্যই ফায়দা হবে।[৭৫]

*** দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার আমল**

নিম্নোক্ত মোবারক আয়াত প্রত্যহ **৩১৩**বার পাঠ করলে আল্লাহর রফযলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। আয়াতটি[৭৬] হলো-

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى– لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى–

*** বেহুঁশ লোকের হুঁশ ফিরে আসার আমল**

বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করত পানির উপর দম করে উক্ত পানি বেহুঁশ হয়ে যাওয়া লোকের মুখের উপর আস্তে আস্তে ছিটাতে থাকবে। আল্লাহর রহমতে খুব শীঘ্রই তার হুঁশ ফিরে আসবে। এটা খুবই পরীক্ষিত আমল। আয়াতগুলো[৭৭] হলো-

فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى– فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى– هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى– اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ– لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ– اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ– وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لاَ تَبْكُوْنَ– وَ اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ–

*** জরায়ুর রোগের আমল**

মহিলাদের জরায়ুর যে কোন রোগে এই মোবারক সূরা জাফরান দ্বারা লেখে ধুয়ে পান করালে খুবই উপকার হবে।

**সূরা মুদ্দাসসির-এর আমল**

**কানের ব্যথার আমল**

কানের ব্যথার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করত কানে দম করলে ইনশাআল্লাহ কান ব্যথা উপশম হবে। আয়াতসমূহ[৭৮] হলো-

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ– اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ– فِىْ جَنّٰتٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ– عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ– مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ– قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ– وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ– وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَالْخَآئِضِيْنَ– وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنَ– حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنَ–

---

৭৪. আল-কুরআন, ৫২: ২৯-৩১
৭৫. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে রূহানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৭৬. আল-কুরআন, ৫৩: ১৭-১৮
৭৭. আল-কুরআন, ৫৩: ৫৪-৬১
৭৮. আল-কুরআন, ৭৪: ৩৮-৪৭

## সূরা দাহর-এর আমল

*** হেঁচকি রোগ উপশমের আমল**

কারো হেঁচকি রোগ হলে মাটির একটি নতুন পাত্র গোলাপ পানি দ্বারা ভিজিয়ে আগুনে পড়াবে। আগুনে পুড়ে লাল হয়ে যাওয়ার পর পাত্রটি উঠিয়ে পুনরায় গোলাপ পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করবে। ঠাণ্ডা হওয়ার পর নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পাত্রের উপর লেখে সামান্য গোলাপ পানি দ্বারা ধৌত করত রোগীকে পান করাবে এবং এক-দুই ফোটা করে চোখে ও কানে টপকিয়ে দেবে। ইনশাল্লাহ তৎক্ষণাৎ হেঁচকি রোগ উপশম হবে। আয়াতগুলো[৭৯] হলো-

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا– وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا– اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لاَ شُكُوْرًا– اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا– فَوَقٰهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا–

*** অর্শ্বরোগ নিরাময়ের আমল**

যেকোনো প্রকার অর্শ্বরোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ প্রত্যহ ১৭বার পাঠ করা বিশেষ উপকারী ও পরীক্ষিত আমল। আয়াতগুলো[৮০] হলো-

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً– وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَآءَ اللهُ– اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا– يُدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ–

## সূরা মুরসালাত-এর আমল

**কান ব্যথা উপশমের আমল**

নিম্ন বর্ণিত মোবারক আয়াতসমূহ ৭বার পাঠ করে বাদাম তেলের উপর দম করত সামান্য গরম করে দুই তিন ফোটা করে ব্যথাযুক্ত কানে ঢাললে আল্লাহর রহমতে কান ব্যথা উপশম হবে। আয়াতগুলো[৮১] হলো-

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا– فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا– وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا– فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا– فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا– عُذْرًا اَوْ نُذْرًا– اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ–

## সূরা নাবা-এর আমল

**আরামদায়ক ঘুম হওয়ার আমল**

যদি কারো ঘুম না হয় তবে নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতসমূহ রূপার পাতে খোদাই করে বালিশের মধ্যে রেখে দেবে। ইনশাআল্লাহ যত দিন এ বালিশে মাথা রেখে শুবে তত দিন আরামদায়ক ঘুম হবে। আয়াতগুলো[৮২] হলো-

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا– وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا– وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا– وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا– وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا–

## সূরা আবাসা-এর আমল

**চিন্তা দূর করার আমল**

চিন্তাযুক্ত ব্যক্তির মাথায় ও বুকের উপর নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ লেখলে ইনশাআল্লাহ তার চিন্তা ও পেরেশানী দূর হবে। আয়াতগুলো[৮৩] হলো–وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ– ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ–

৭৯. আল-কুরআন, ৭৬: ৭-১১
৮০. আল-কুরআন, ৭৬: ২৯-৩১
৮১. আল-কুরআন, ৭৭: ১-৭
৮২. আল-কুরআন, ৭৮: ৬-১০
৮৩. আল-কুরআন, ৮০: ৩৮-৩৯

## সূরা মুতাফ্‌ফিফীন-এর আমল

**পায়ের কাঁপুনি ও ব্যথা নিরাময়ের আমল**

যদি কোন ব্যক্তি পায়ে কাঁপুনি রোগ বা অন্য কোন ব্যথার কারণে অচল হয়ে পড়ে, তবে এক পোয়া যায়তুনের তেলের উপর নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ ৩,৩১৩ বার পাঠ করত দম করে ঐ তেল দিনে ৩বার এবং রাত্রে ১বার পায়ে মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ পায়ের কাঁপুনি ও ব্যথা সেরে যাবে। আয়াতগুলো[৮৪] হলো-

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ– لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ– يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

**সূরা ইনশিকাক-এর আমল**

**সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার আমল**

কোন মহিলার প্রসব ব্যথা উঠলে কাগজের টুকরায় নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি লেখে এটাকে পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে মহিলার বাম রানে বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ দ্রুত সন্তান প্রসব হবে। আয়াতটি[৮৫] হলো-

وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ–

**চোখের পাতা লাফানোর আমল**

কারো চোখের পাতা লাফালে নিম্নোক্ত মোবারক আয়াত প্রথমে ৭বার পাঠ করে রোগীর মুখে দম করবে। অত:পর পুনরায় ৭বার পাঠ করত পানিতে দম করে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ তৎক্ষণাৎ রোগ ও কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আয়াতগুলো[৮৬] হলো–فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ– وَالَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ– وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ– لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ– فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ–

## সূরা বালাদ-এর আমল

**মৃত্যু পর্যন্ত নাক, কান ও চোখ সুস্থ-সবল থাকার আমল**

আকীক পাথরের আংটির নাগিনার উপর বিসমিল্লাহ শরীফের সংখ্যা মান সহ নিম্নোক্ত আয়াত খোদাই করে সাথে রাখলে ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত নাক, কান ও চোখ সুস্থ-সবল থাকবে। আয়াতগুলো[৮৭] হলো-

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّه عَيْنَيْنِ– وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ– وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ–

## সূরা শামস-এর আমল

*** অর্ধাঙ্গ ও পা কম্পন রোগ হতে নিরাপদ থাকার আমল**

নিয়মিতভাবে প্রত্যহ এশরাক নামাযের পর একবার সূরা শামস পাঠ করলে আল্লাহর ফযলে অর্ধাঙ্গ, পা কাঁপুনি ইত্যাদি রোগ হতে নিরাপদ থাকা যায়।হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) বলেন, আমাকে একজন অতি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন, যদি কোনো মহিলার সন্তান প্রসবের পর জীবিত না থাকে তাহলে আজওয়াইন (উগ্রগন্ধ লতাবিশেষের বীজ) ও গোল মরিচ নিয়ে সোমবার দুপুর সময় ৪০বার সূরা শামস পড়বে। প্রত্যেকবার আগে ও পরে দরূদ পাঠ করবে। অত:পর আমলের দিন থেকে শিশুর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত প্রতিদিন খাবে। ইনশাআল্লাহ এই মহিলার সন্তান স্বাভাবিক জীবন লাভ করবে।[৮৮]

## সূরা ইকরা-এর আমল

**শরীরের জোড়া ব্যথা দূর হওয়ার আমল**

যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পর সূর্য ওঠার আগে এই মোবারক সূরা ৭বার পাঠ করবে। অত:পর সিজদায়ে তিলাওয়াত করবে এবং উক্ত সিজদায় ৭বার حَسْبِىَ اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ– আয়াতগুলো পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ তার কখনো শরীরের জোড়া ব্যথা হবে না। পূর্বে থাকলে তা দূর হয়ে যাবে।

---

৮৪. আল-কুরআন, ৮৩: ৪-৬

৮৫. আল-কুরআন, ৮৪: ৪-৫

৮৬. আল-কুরআন, ৮৪: ১৬-২০

৮৭. আল-কুরআন, ৯০: ৮-১০

৮৮. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

### সূরা আসর-এর আমল

**চিন্তা ও পেরেশানী দূর হওয়ার আমল**

* কোন মুসীবতগ্রস্ত লোকের ওপর সূরা আসর পাঠ করে দম করলে তার চিন্তা ও পেরেশানী দূর হবে।

*** চক্ষু রোগের আমল**

এই মোবারক সূরা ৩বার পাঠ করে সুরমা দেয়ার কাঠির ওপর দম করত চোখে সুরমা লাগালে যাবতীয় চক্ষু রোগ দূর হয়।

**সূরা ইখলাস-এর আমল**

সূরা ইখলাস পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা। এর ছোট ছোট ৫টি আয়াত রয়েছে। শব্দ সংখ্যা মাত্র ১৫টি। অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই সূরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই এই সূরাকে সুলুসে কুরআন বা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।[৮৯]অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত হলো- যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সূরা তিলাওয়াত করবে সে সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের প্রত্যেক অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আল্লামা বোনী (রহ.) নিজের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া ও রোগ মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত তরীকা উল্লেখ করেছেন।[৯০]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ اَحَدُ لَاَ تُسَلِّطُ عَلَىَّ اَحَدًا وَ لَاَ تُحَوِّجْنِىْ اِلٰى اَحَدٍ وَ اَغْنِنِىْ يَا رَبُّ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ بِفَضْلِ–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ– لَمْ يَلِدْ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يمُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدُ– يَا مَنْ هُوَ قَدِيْمُ وَ دَائِمُ وَ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ اِقْضِ حَاجَتِىْ يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ–

### সূরা ফালাক ও নাস

সূরা ফালাক ও নাস এ দু'টি সূরার উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বিশেষ করে বদনযর এবং দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করার ক্ষেত্রে এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা সীমাহীন। বলতে গেলে মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।[৯১] হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهِ فِى الْمَرَضِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَ اَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا، فَسَاَلْتُ الزُّهْرِىِّ كَيْفَ يَنْفُثُ؟ قَالَ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهُهُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময়ে তিনি নিজ দেহে 'মুআব্বিযাত' তথা সূরা নাস ও ফালাক পড়ে ফুঁক দিতেন। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গলো, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম। আর আমি তাঁর নিজের হাত তঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম। কেননা, তাঁর হাতে বরকত ছিল। রাবী বলেন: আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন: তিনি তাঁর দুই হাতের উপর ফুঁক দিতেন, এরপর সেই হাতদ্বয় দ্বারা আপন মুখমণ্ডল বুলিয়ে নিতেন।[৯২] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى يَقْرَاُ فِىْ نَفْسِهِ بَالْمُعَوِّذَاتِ وَ يَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلَيْهِ وَ اَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا–

---

৮৯. আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭১

৯০. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৯১. মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২ (নবম সংস্করণ), খ. ৮, পৃ. ৮৯৬

৯২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সূরা ফাতিহার দ্বারা ফুঁক দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৬২৭, হাদীস নং ৫৭৩৫

অর্থ: নবী করীম (সা.)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখনই তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে স্বীয় শরীর মোবারককে দম করতেন। এরপর যখন তাঁর অসুখ খুবই বৃদ্ধি পায়, তখন আমি তা পাঠ করে বরকতের উদ্দেশ্যে তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীরে মাসেহ করে দিতাম।[৯৩]

উল্লেখ্য, পবিত্র মানুষের দ্বারাই পবিত্র কুরআন থেকে উপকার পাওয়া সম্ভব, অপবিত্র লোকের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য দেখা যায়, কুরআনের একই আয়াত দিয়ে একই ধরনের রোগীর চিকিৎসা করা হলেও ব্যক্তি ভিন্ন হওয়ার কারণে বা এক্বীনের তারতম্যের কারণে এর ফলাফলও ভিন্ন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু অসাধু মানুষ পার্থিব লোভ লালসায় পড়ে কুরআনের মাধ্যমে সঠিক নিয়মে চিকিৎসা না করে উল্টা-পাল্টা চিকিৎসা করার কারণে এর যথাযথ ফায়দা পাওয়া যায় না। ফলে চিকিৎসা পদ্ধতি ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এসব চিকিৎসকদেরও সংশোধন হওয়া উচিত।

৯৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাড়-ফুঁকের দু'আ সম্পর্কে, খ. ২, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং- ৩৯০৫

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লাহ এবং তাঁর সিফাতি নামের আমল

অতিআধুনিকতা এবং বস্তুবাদের এই যুগে আমাদের মস্তিষ্ক বস্তু কেন্দ্রিক এতোটাইপ্রভাবিত যে কোনো রোগ হলে তা ওষুধ ছাড়াও যে আরোগ্য লাভ হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলার কালাম, তাঁর গুণবাচক নাম এবং হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আও যে রোগ মুক্তির মাধ্যম হতে পারে, তা বিশ্বাস হয় না। ফলে রোগ মুক্তির ক্ষেত্রেঅনেক নামধারি মুসলমানও দু'আ-কালাম,ঝাড়-ফুঁক বা আল্লাহর নামের বরকতের তাসীরকে নি:স্প্রয়োজন ও অনর্থক মনে করে থাকে। আর অমুসলিমরা তো এটা নিয়ে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, ঔষধ সুস্থতার মাধ্যম মাত্র, সুস্থতা দানকারী নয়। সুস্থতা তো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাতে। ঔষধ ব্যবহারের দ্বারাই যদি সুস্থতা লাভ করা সম্ভব হতো তাহলে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিই ওষুধ সেবনের পর আর অসুস্থ থাকতো না। তাই আমাদের কখনোই ভুলে গেলে চলবে না যে শিফা দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতেই। ডাক্তার দেখানো বা ওষুধ সেবন করাকে সুন্নাত মনে করে তা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিপূর্ণ ও প্রকৃত সুস্থতা লাভের নিমিত্ত একজন মু'মিন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুখাপেক্ষী হবে এটাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ তা'আলার নিরান্নব্বইটি পবিত্র নাম রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

অর্থ: আল্লাহর অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে, তোমরা তাঁকে এ সকল সুন্দর নামে ডাকো।[৯৪]

এ সকল নামগুলোর মধ্যে একমাত্র আল্লাহ নামটি ইসমে জাত বা সত্তাগত নাম। আর অন্যান্যগুলো তাঁর ইসমে সিফাত বা গুণবাচক নাম। তাঁর প্রতিটি নামেরই পৃথক পৃথক রহস্য, কর্তৃত্ব ও ভেদ রয়েছে। প্রতিটি নামেরই রয়েছে আলাদা আলাদা তাসীর, প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আল্লাহর নিরান্নব্বইটি নাম থেকে অতি সংক্ষেপে শুধু ঐ সকল নামই নিম্নে উল্লেখ করা হলো, যা নিয়মানুসারে আমল করার দ্বারা সুস্থতা ও রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে উপকার পাওয়ার বিষয়ে *'তিব্বে রূহানী'* নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

### আল্লাহ (اَللّٰهُ) নামের আমল

*** হৃদকম্প, ভয়-ভীতি হৃদরোগ হতে নিরাপদ থাকা**

যে কোন মুসলমান اَللّٰهُ (আল্লাহ) নামটি মোটা কলমে অত্যন্ত সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখে নিজের সামনে রাখে এবং দিনে ও রাতে অন্তত ৩বার খুবই আদব ও সম্মানের সাথে অযুসহ নির্জনে কেবলামুখী বসে এই মোবারক নামের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিপাত করবে এবং মনে মনে এরূপ ধারণা ও খেয়াল করবে যে এ পবিত্র নাম এখানে যেভাবে লেখা আছে, তেমনি উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে আমার অন্তরের উপরও তা লিখিত রয়েছে। অত:পর অন্তত ১০মিনিট চোখ বন্ধ করে এ কল্পনা নিজের মধ্যে দৃঢ় করবে এবং এই ধ্যান ও খেয়ালে বিভোর হয়ে থাকবে। এভাবে প্রতিদিন ৩বার এই আমল করলে সারা জীবন ঐ ব্যক্তি কখনও হৃদকম্পন, ভয়-ভীতি, আতংকগ্রস্ত ও হৃদরোগ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হবে না। পৃথিবীর কোন অত্যাচারী জালেম ব্যক্তির সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না।

*** স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি**

সকালবেলা নতুন রুটি বানিয়ে এর উপর ৭বার يَا اَللّٰهُ লেখে স্মৃতিশক্তি কম সন্তানদেরকে প্রয়োজনানুসারে ৭দিন, ১১দিন অথবা ২১দিন খাওয়ালে আল্লাহর মেহেরবানীতে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

*** বুক, পিঠ, কোমর ও মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি লাভ**

যদি কারও বুক, পিঠ, কোমর ও মাথা ব্যথা হয়, তবে অন্য এক ব্যক্তি অযু সহকারে শুধু আঙ্গুলের দ্বারা ব্যথার জায়গায় ৭বার يَا اَللّٰهُ লেখবে। দিনে ৭বার এই আমল করবে। আল্লাহ চাহে তো ব্যথা চলে যাবে।

৯৪. আল-কুরআন, ৭: ১৮০

*** সহজে সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া**

যদি কোন গর্ভবতী মহিলার প্রচণ্ড প্রসব ব্যথা থাকার পরও সন্তান ভুমিষ্ঠ হতে বিলম্ব হয়, তবে ১২১বার يَااَللهُ পড়ে গুড়ের উপর দম করবে এবং গুড় তিন ভাগ করে খায়িয়ে দেবে। আল্লাহর রহমত তাৎক্ষণিক এর ফল পাওয়া যাবে। এটা খুবই পরীক্ষিত আমল।[৯৫]

## ইয়া রাহমানু (يَا رَحْمٰنُ) নামের আমল

*** চোখ ওঠা রোগ নিরাময়**

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময় অযু সহকারে ৪১বার يَا رَحْمٰنُ পড়ে পানিতে ফুঁক দেবে। অত:পর দম দেয়া পানিতে একটি পরিস্কার কাঠি ভিজিয়ে প্রতি চোখে ৭বার করে লাগাবে। ৩দিনের মধ্যে পীড়িত চোখ ভাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এরপর পরবর্তী ১বছর পর্যন্ত চোখ ওঠার রোগ হবে না।

## ইয়া আলীমু (يَا عَلِيْمُ) নামের আমল

*** সন্তানের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া**

যে ব্যক্তি ৪০দিন পর্যন্ত প্রত্যহ২১বার يَا عَلِيْمُ (ইয়া আলীমু) পাঠ করে পানিতে দম করে সকালে খালি পেটে নিজের সন্তানকে পানি পান করাবে, সে সন্তান জ্ঞানী হবে এবং তার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে।[৯৬]

## ইয়া শাকুরু (يَا شَكُوْرُ) নামের আমল

*** চক্ষু পীড়া নিরাময়**

চোখের পীড়ায় يَا شَكُوْرُ মোবারক নাম ৪১বার পড়ে পানিতে ফুঁক দেবে। অতঃপর কিছু পানি দ্বারা চোখ ধৌত করবে এবং অবশিষ্ট পানি পান করবে। এভাবে ৭দিন আমল করবে। আল্লাহর ফযলে ৭দিনেই চোখ আরোগ্য লাভ করবে।

## ইয়া বাসীরু (يَا بَصِيْرُ) নামের আমল

*** চোখের পানি পড়া বন্ধ হওয়া**

যদি কারো চোখ দিয়ে পানি পড়া আরম্ভ হয় এবং ভবিষ্যতে বিপজ্জনক হওয়া সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রত্যেক দিন ১,১০০বার يَا بَصِيْرُ (ইয়া বাসীরু) পড়বে। ফলে আল্লাহ তাআলার রহমতে অতি অল্প সময়েই চোখের পানি পড়াব বন্ধ হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে। তবে এই অযীফা পাঠ করার পূর্বে ও পরে ৩বার করে নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِيْنَ سَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ سَيِّدِ الْكَامِلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ–

## ইয়া মুকীতু (يَا مُقِيْتُ) নামের আমল

*** চক্ষু পীড়ানিরাময়**

কারো চোখ পীড়িত হলে ৭বার يَا مُقِيْتُ (ইয়া মুকীতু) পড়ে সুরমার উপর দম করবে এবং চোখে লাগাবে। ৩দিন এরূপ আমল করলে আল্লাহ চাহে তো চোখ ভাল হয়ে যাবে।

৯৫. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে রূহানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

## ইয়া আল্লাহ ইয়া রাহমানু (يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ) নামের আমল

*** কঠিন রোগ থেকে মুক্তি**

ফজরের সুন্নত ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন রোগ্ন ব্যক্তির শিয়রে দাঁড়িয়ে ১২১বার يَارَحْمٰنُ يَااَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু) পাঠ করবে। ৭দিন এরূপ করলে রোগ যত কঠিনই হোক, রোগী সুস্থ হয়ে ওঠবে। আর যদি মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসে থাকে, তবে ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে। এ আমলের দ্বারা দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়। লেখক বলেন: এটা আমার বংশের বুযুর্গদের খুবই পরীক্ষিত আমল।

## ইয়া মালিকু ইয়া কুদ্দুছু (يَا قُدُّوْسُيَا مَالِكُ) নামের আমল

*** ঘৃণিত রোগ হতে হিফাযত**

যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর ১১বার করে يَا قُدُّوْسُ يَا مَالِكُ (ইয়া মালিকু ইয়া কুদ্দুছু)পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ সে ব্যক্তি কখনও কোন ঘৃণিত রোগ যেমন অর্শ্ব ইত্যাদিতে আক্রান্ত হবে না। তার পর্দা ও শরমের জায়গায় কখনো কোন যখম বা রোগ-ব্যাধি হবে না। তার লজ্জাস্থান কখনও অপর কাউকে দেখানোর প্রয়োজন হবে না। লেখক বলেন: এটা আমার বংশের বুযুর্গদের অত্যন্ত পরীক্ষিত আমল।[৯৭]

## ইয়া সালামু (يَا سَلاَمُ) নামের আমল

*** মৃত্যু পর্যন্ত অন্ধ, খোড়া ও পরনির্ভরশীল না হওয়া**

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ১,০০০বার يَا سَلاَمُ (ইয়া সালামু) পাঠ করবে, মৃত্যু পর্যন্ত সে কখনও অন্ধ, লেংড়া, লোলা, দুর্বল ও অক্ষম হবে না। চলাফেরা অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যু দান করবেন।

## ইয়া রাহমানু, ইয়া সালামু (يَا سَلاَمُيَا رَحْمٰنُ) নামের আমল

*** বেহুঁশ রোগীর হুঁশ ফিরে আসা**

কোন বেহুঁশ রোগীর শিয়রে বসে ৩০০বার يَا رَحْمٰنُيَا سَلاَمُ (ইয়া রাহমানু, ইয়া সালামু) পাঠ করলে খুব অল্প সময়েই রোগীর হুঁশ ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

## ইয়া শাহীদু (يَا شَهِيْدُ) নামের আমল

***রোগীর হুঁশ ফিরে আসা**

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি রোগের প্রচণ্ডতায় বেহুঁশ হয়ে যায়, তবে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে يَا شَهِيْدُ (ইয়া শাহীদু) মোবারক নাম ১০০বার এরূপ খেয়াল করে পড়বে যে এই রোগীর চিকিৎসা করার জন্য স্বয়ং রাব্বুল ইযযত এখানে বিদ্যমান রয়েছেন। ইনশাআল্লাহ তৎক্ষনাৎ রোগীর হুঁশ ফিরে আসবে। লেখক বলেন, এ আমলের প্রতি আমার অনেক বেশি ভরসা রয়েছে।

## ইয়া জাব্বারু (يَا جَبَّارُ) নামের আমল

*** রুগ্ন ও দুর্বল শিশু সুস্থ ও সবল হওয়া**

রুগ্ন, দুর্বল ও কমজোর শিশুর জন্য সরিষার তেলের উপর ৭দিন প্রত্যহ ১,১০৯বার يَا جَبَّارُ (ইয়া জাব্বারু) পড়ে দম করবে। অত:পর প্রতিদিন ঐ তেল শিশুর সমস্ত শরীওে মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ কয়েক দিনের মধ্যে শিশু সুস্থ, সবল ও নিরোগ্ন হবে।

---

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

*** মাথা ব্যথা ও অর্ধ মাথা ব্যথা নিরাময়**

কারো মাথা ব্যথা হলে প্রথমে মাথার উপর ৭বার আঙ্গুল দ্বারা يَا جَبَّارُ (ইয়া জাব্বারু) লিখবে। অত:পর মাথা ধরে ৭বার يَا سَلاَمُيَا جَبَّارُ (ইয়া জাব্বারু, ইয়া সালামু) পড়ে মাথায় দম করবে। এভাবে ৩বার দম করবে। যত কঠিন ব্যথাই থাকুক, আরাম পাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি ব্যথা আধকপালী অর্থাৎ অর্দেক মাথা ব্যথা করে, তবে এ আমল সূর্য উদয়ের পূর্বে করতে হবে। ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করবে।[৯৮]

## ইয়া মুজীবু (يَا مُجِيْبُ) নামের আমল

*** মাথা ব্যথা নিরাময়**

কারো মাথা ব্যথা হলে ডান হাতে মাথা ধরে প্রথমে ৩বার, দ্বিতীয়বারে ৫বার, তৃতীয়বারে ৭বার, চতুর্থবারে ৯বার এবং পঞ্চমবারে ১১বার يَا مُجِيْبُ (ইয়া মুজীবু) মোবারক নাম পাঠ করে ফুঁক দেবে। ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যথা সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে যাবে।

## ইয়া মুতাকাব্বিরু (يَا مُتَكَبِّرُ) নামের আমল

*** দু:স্বপ্ন হতে মুক্তি লাভ**

যে ব্যক্তি ঘুমে দু:স্বপ্ন দেখে বা ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, সে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে ২১বার يَا مُتَكَبِّرُ (ইয়া মুতাকাব্বিরু) পড়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ কখনো দু:স্বপ্ন দেখবে না এবং ভয় পাবে না।

## ইয়া কাহ্হারু (يَا قَهَّارُ) নামের আমল

*** দুগ্ধপোষ্য শিশু সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হওয়া**

যে দুগ্ধপোষ্য মিশু শুকাইয়া কংখালসার হয়ে গেছে। এরূপ শিশুর জন্য অযুসহ কিবলামুখী বসে ১,০০০বার يَا قَهَّارُ (ইয়া কাহ্হারু) পড়ে আধার সের সরিষা তেলের উপর দম করবে। অত:পর ২১দিন প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় এই তেল শিশুর শরীরে মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ শিশু অতি দ্রুত সুস্থ ও সবল হবে।

## ইয়া কাবিযু (يَا قَابِضُ) নামের আমল

*** জাদু-টোনার প্রতিক্রিয়া না হওয়া**

যে ব্যক্তি সর্বদা ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর একুশবার يَا قَابِضُ (ইয়া কাবিযু) পাঠ করবে, তার ওপর কোন জাদু-টোনার প্রতিক্রিয়ার হবে না। তার উপর করো বদদুআ কার্যকরী হবে না। তার উপর কোন জ্বিন-ভূতের আসর হবে না। সকল প্রকার আসমানী বালা-মুসীবত দূর করার জন্য এই মোবারক নাম ইসমে আযমস্বরূপ। এর তাছীর খুবই বিস্ময়কর।

## ইয়া সামীউ (يَا سَمِيْعُ) নামের আমল

*** কান ব্যথা থেকে আরোগ্য**

যদি কারো কানে ব্যথা হয় বা কানের ভেতরে কোন ফোঁড়া ওঠে, যদ্দরুণ খুবই কষ্ট হয়, তবে ১,০০০বার يَا سَمِيْعُ (ইয়া সামীউ') পাঠ করত: তুলার উপর দম করে কানে দিয়ে রাখবে। ৭দিন এরূপ আমল করবে। ইনশাআল্লাহ কানের ব্যথা ও কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ আমলের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যে কোন সময় ইচ্ছা করতে পারবে।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

***বধির হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া**

সর্বদা প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১১বার يَا سَمِيْعُ (ইয়া সামীউ) পাঠ করলে আল্লাহর হুকুমে সারা জীবন বধির হওয়া থেকে রক্ষা পাইবে।

## ইয়া আযীমু (يَا عَظِيْمُ) নামের আমল

*** পেট ব্যথা না হওয়া**

৭বার يَا عَظِيْمُ (ইয়া আযীমু) পড়ে পানিতে দম করে পান করলে, আল্লাহর রহমতে কখনও পেট ব্যথা হবে না।

*** পেট ব্যথা হতে আরোগ্য লাভ**

কারো পেটে ব্যথা হলে কাগজের উপর ৭বার يَا عَظِيْمُ (ইয়া আযীমু) লেখে পানিতে ধুয়ে পান করালে আল্লাহর ফযলে খুবই আরাম হবে।

## ইয়া গাফুর (يَا غَفُوْرُ) নামের আমল

*** দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হতে মুক্তি লাভ**

যদি কারো অন্তরে চিন্তা ও পেরেশানী এমনভাবে বসে যায় যে কোনভাবেই তা দূর হচ্ছে না, তবে রুটির টুকরার উপর প্রথমে ৩বার يَا غَفُوْرُ লিখবে। অত:পর يَا غَفُوْرُ নামের অক্ষরগুলো ৩বার এভাবে ي ا غ ف و ر লেখবে এবং রুটির টুকরা খেয়ে ফেলবে। ইনশাআল্লাহ সকল চিন্তা ও পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। এমনিতেই মন খুশিতে ভরে উঠবে। এ আমল একাধারে ৩দিন করতে হবে।

*** জ্বর ও মাথা ব্যথা**

জ্বর বা মাথা ব্যথা হলে একটি কাগজের উপর ৩বার يَا غَفُوْرُ (ইয়া গাফুরু) লেখে কাগজটিকে রুটির টুকরার উপর চেপে রাখবে। এভাবে কাগজের লেখাটি রুটির টুকরার উপর অংকিত হয়ে গেলে রুটির টুকরা খেয়ে ফেলবে। এভাবে ৩দিন আমল করলে ইনশাল্লাহ জ্বর সেরে যাবে এবং মাথা ব্যথাও তাৎক্ষনিক নিরাময় লাভ করবে।

## ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম (يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الاِكْرَامِ) নামের আমল

*** চিন্তা দূর করার আমল**

يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الاِكْرَامِ (ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম) মোবারক নাম ৫০০বার পাঠ করত পানির মধ্যে দম করে কোন চিন্তাযুক্ত ব্যক্তিকে পান করালে আল্লাহর ফযলে তার চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

## ইয়া বাদীউ (يَا بَدِيْعُ) নামের আমল

*** দুশ্চিন্তা দূর হওয়া**

প্রত্যহ ১,০০০ বার শুধুমাত্র يَا بَدِيْعُ (ইয়া বাদীউ) পাঠ করলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়।

## ইয়া আলিয়্যু (يَا عَلِيُّ) নামের আমল

*** চোখের পীড়া ও লালবর্ণ দূর হওয়া**

যার চোখে পীড়া হয় এবং চোখের লালবর্ণ কোনভাবেই না সারে, ঐ ব্যক্তি ৭০০বার يَا عَلِيُّ (ইয়া আলিয়্যু) পড়ে পানিতে দম করবে। অত:পর উক্ত পানি কোন পরিষ্কার কাঠির দ্বারা চোখে লাগাবে। বহু দিনের লালবর্ণ ৩দিনেই ভাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

*** ব্যথা ও চুলকানী দূর হওয়া**

শরীরের কোন জায়গায় ব্যথা এবং চুলকানী হলে ৩০০বার يَا عَلِيُّ (ইয়া আলিয়্যু) মোবারক নাম পাঠ করে ব্যথার স্থানে দম করবে। ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে ব্যথা ও চুলকানী দূর হয়ে যাবে।

*** অর্শ্বরোগ নিরাময়**

অর্শ্বরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ১,০০০ বার يَا عَلِيُّ (ইয়া আলিয়্যু) পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করবে। এরূপ ৭দিন আমল করলে রক্ত পড়াব বন্ধ হবে এবং অর্শ্ব নিরাময় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

## ইয়া হাফীযু (يَا حَفِيْظُ) নামের আমল

*** বদনযর হতে হিফাযত**

যদি কারো নিজের উপর বা সন্তানের উপর বদনযর লাগার আশংকা হয়, তবে يَا حَفِيْظُ (ইয়া হাফীযু) মোবারক নাম ১১বার লিখে গলায় তাবীজ ব্যবহার করবে। আল্লাহর রহমতে কখনও বদনযর লাগবে না।

## ইয়া মুকীতু (يَا مُقِيْتُ) নামের আমল

*** শিশুর জিদ ও কান্নাকাটি বন্ধ করা**

যদি কোন শিশু বেশি বেশি কান্নাকাটি করে এবং সব বিষয়ে জিদ করে, তবে يَا مُقِيْتُ (ইয়া মুকীতু) মোবারক নাম ৭বার পড়ে কোন খালি গ্লাসে ফুঁক দেবে। অত:পর ঐ গ্লাসে পারি ভরে শিশুকে পান করাবে। ৭দিন এরূপ আমল করলে আল্লাহর রহমতে শিশুর জিদ ও কান্নাকাটি মঙ্গলজনকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

## ইয়া রাকীবু (يَا رَقِيْبُ) নামের আমল

*** ফোঁড়া ও জখম ভাল হওয়া**

কারো শরীরে ফোঁড়া বা কোন প্রকার জখম হলে ৭দিন পর্যন্ত প্রত্যহ ৩০০বার يَا رَقِيْبُ (ইয়া রাকীবু) পাঠ করে ফোঁড়া বা জখমের উপর দম করলে আল্লাহর ফযলে এ সময়ের মধ্যেই ফোঁড়া-জখম ভাল হয়ে যাবে।

## ইয়া ওয়াসিউ (يَا وَاسِعُ) নামের আমল

*** বিচ্ছুর দংশন হতে নিরাময় লাভ**

কাউকে বিচ্ছু কামড় দিলে পানির সাথে সামাণ্য লবণ মিশিয়ে এর উপর ৭০বার يَا وَاسِعُ (ইয়া ওয়াসিউ) পড়ে ফুঁক দেবে। অত:পর এই পানি কিছুক্ষণ পর পর বিচ্ছুর কাটা স্থানে লাগাবে। ইনশাআল্লাহ তৎক্ষনাৎ কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

## ইয়া আহাদু (يَا اَحَدُ) নামের আমল

*** সাপে কাটা রোগীর সুস্থ করার আমল**

যদি কেউ يَا اَحَدُ এর সাথে يَا وَاحِدُ মিলিয়ে يَا اَحَدُيَا وَاحِدُ এইভাবে ১০০বার পাঠ করত কোন সাপে কাটা রোগীর ওপর দম করে, তবে সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যাবে এবং রোগী সুস্থতা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। এ আমল পরীক্ষিত।

## ইয়া মাতীনু (يَا مَتِيْنُ)নামের আমল

*** স্ত্রীলোকের বুকের দুধ বৃদ্ধি হওয়া**

কোন স্ত্রীলোকের বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে يَا مَتِيْنُ (ইয়া মাতীনু) মোবারক নাম ৯বার কাগজে লেখে পানিতে গুলিয়ে পান করবে। আল্লাহর ফযলে দুধ বৃদ্ধি পাবে। এই আমল একাধারে ১১দিন করতে হবে।

## ইয়া মুবদিউ (يَا مُبْدِئُ) নামের আমল

***বন্ধ্যা নারীর গর্ভধারণ**

কোন বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে একাধারে ৩দিন প্রত্যহ ১টি ছেব ফলের ছাল ফেলে দিয়ে এর উপর ৭বার يَا مُبْدِئُ (ইয়া মুবদিউ) লেখে সকাল বেলা খালি পেটে খাওয়াবে। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রথম মাসেই গর্ভধারণ করবে। যদি প্রথম মাসে গর্ভ না টিকে তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসেও এরূপ আমল করবে। ইনশাআল্লাহ তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই গর্ভধারণ করবে। যদি ছেব ফল পাওয়া না যায়, তবে মুরগীর ডিম সিদ্ধ করে উপরের খোসা ছাড়িয়ে লেখবে এবং উপরোক্ত নিয়মে খাওয়াবে।

## ইয়া মুমীতু (يَا مُمِيْتُ) নামের আমল

*** বদনযর হতে মুক্তি লাভ**

কারো সন্তানের উপর বদনযর লাগলে ৫বার يَا مُمِيْتُ (ইয়া মুমীতু) মোবারক নামের নিম্নের নকশাটি কাগজে লেখে গলায় বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ বদনযরের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। সন্তানের কোন অনিষ্ট হবে না। নকশাটি এই-

| | |
|---|---|
| | يَا مُمِيْتُ |
| يَا مُمِيْتُ | يَا مُمِيْتُ |
| يَا مُمِيْتُ | يَا مُمِيْتُ |

## ইয়া কাদিরু (يَا قَادِرُ) নামের আমল

*** রোগীর স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পাওয়া**

কোন ব্যক্তি রোগের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে প্রতিদিন يَا قَادِرُ (ইয়া কাদিরু) মোবারক নাম ১০০বার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ রোগীর স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে আসবে। ক্রমে ক্রমে রোগ কমতে থাকবে।

## ইয়া যাহিরু (يَا ظَاهِرُ) নামের আমল

*** দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি**

কারো দৃষ্টি কমে গেলে ৪০দিন পর্যন্ত এশরাকের নামাযের পর يَا ظَاهِرُ (ইয়া যাহিরু) মোবারক নাম ৫০০বার পাঠ করবে। আল্লাহর রহমতে তার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।[৯৯]

---

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর আমল

মানব জীবনের সার্বিক বিষয়ে এমন কোনো দিক নেই যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। তাই তিনি দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি রূহানী রোগেরও সমাধান দিয়েছেন। কারণ এটা কিভাবে সম্ভব যে তিনি ব্যথাতুর পৃথিবীবাসীর শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহ থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবেন। যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.) চিকিৎসক ছিলেন না এবং নবুওয়তের পদমর্যাদার জন্য এটা জরুরীও নয়। তবু মানব জাতির কাণ্ডারী হিসেবে তিনি এসব নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাই যারা শুধু দৈহিক সুস্থতার অন্বেষী, তারা প্রকৃত আরোগ্য ও সুস্থতা হতে বঞ্চিত থাকে। দেহ ও মনের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ সুস্থতার উপায় হলো উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করার সাথে সাথে মহান আল্লাহর নিকট রোগ মুক্তির জন্য দুআ করা, ওহী নির্ভর বিভিন্ন দুআ ও কালামের আমল করা এবং ইহার ব্যবহার করা। মুহাদ্দিসগণ তাঁদের প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থেই 'কিতাবুর রুকয়া' শিরোনামের অধীনে ঐ সকল দুআ ও কালাম সংকলিত করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বিভিন্ন ব্যাধির প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য উসীলা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সত্য কথা হলো, যে মালিকের সাথে তার গোলামের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, তার আর অন্য কারো প্রতি ভরসা করার প্রয়োজন থাকে না। এ সম্পর্ক স্থাপনের সবচেয়ে কার্যকর, প্রভাবশালী ও নিশ্চিত পন্থা হলো দু'আ। তাই হাদীসে দেখা যায়, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহিয়সী স্ত্রীদের মধ্য হতে কোনো এক স্ত্রীর আঙ্গুলে ফোঁড়া বের হয়। ঐ স্ত্রীবর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

هَلْ عِنْدَكِ ذَرِيْرَةُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ شَعْهَا عَلَيْهَا– وَقَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَ مُكَبِّرَ الصَّغِيْرِصَغِّرْ مَابِىْ–

অর্থ: তোমার নিকট কি 'যারিরাহ' (চিরতা) আছে? আমি বললাম: জী, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: তুমি ফোঁড়ার উপর 'যারিরাহ' লাগিয়ে দাও এবং এই দুআ[১০০] পাঠ করো- اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَ مُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ صَغِّرْ مَابِىْ–

রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত আদায়কালে (অন্ধকারে) তাঁর হাত মুবারক মাটিতে রাখলে এক বিচ্ছু এসে তাঁর পবিত্র হাতে দংশন করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) একটু লবণ চেয়ে নিয়ে পানিতে মিশালেন। অত:পর ঐ লবণ মিশ্রিত পানি বিচ্ছুর দংশিত স্থানে ঢালতে লাগলেন। তিনি এক হাতে পানি ঢালছিলেন এবং অন্য হাত দ্বারা ক্ষত স্থান মালিশরত অবস্থায় পবিত্র কুরআনের শেষ দুই সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করছিলেনে।[১০১]

মুহাম্মদ ইবন সালিম (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ছাবিত বুনানী (রহ.) বললেন: হে মুহাম্মদ! তোমার যদি কোথাও ব্যথা হয়, তবে শরীরের ব্যথার জায়গায় হাত রেখে বলবে (অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে প্রথমে ৩বার বিসমিল্লাহ পড়ে অত:পর ৭বার এই দুআটি পড়তে হবে): اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَ قُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ مِنْ وَجْعِىْ هٰذَا–

অর্থ: আমি পানাহ চাই আল্লাহ ইযযত ও কুদরতের অসীলায় আমার এই ব্যথার যে অকল্যাণ ও কষ্টকর তা থেকে।[১০২]অন্য এক রেওয়ায়েতে দুআটি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ রয়েছে – اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَ اُحَاذِرُ–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন অসুস্থ সাহাবীর নিকট গমন করে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিখিয়ে দেবো যার দ্বারা যে কোনো রোগ ও কষ্ট দূর হয়ে যায়? সাহাবী বললেন, অবশ্যই বলে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তুমি এই দু'আটি পড়ো-

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكُ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّه وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرَهُ تَكْبِيْرًا–

অর্থ: "আমি সেই মহান সত্তার ওপর ভরসা রাখি, যিনি জীবিত, যার মৃত্যু নেই এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি না কোনো সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো শরীক আছে এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোনো

১০০. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১০১. প্রাগুক্ত

১০২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: দু'আ, অনুচ্ছেদ: ব্যথার উপশম, খ. ২, পৃ. ৫১৮, হাদীস নং- ৩৫৮৮

সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।" কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ঐ সাহাবীর আবার সাক্ষাৎ ঘটল। তখন তিনি পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে যে কালিমাগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি সর্বদা সেগুলো পাঠ করি।[১০৩]এছাড়া রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই এই দু'আ পড়তেন-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللهُ اَلاَ اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ بَلٰى– قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مَذْهَبَ الْبَاْسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىُ لاَ شَافِىَ اِلاَّ اَنْتَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا–

অর্থ: আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি সাবিত (রহ.)-কে বলেছেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দম দরূদ অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁকের নিয়ম শিখিয়ে দেবো না? সাবিত বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই শিখিয়ে দেন। হযরত আনাস (রা.) বললেন, রোগ-ব্যাধির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দুআ পাঠ করতেন। "হে আল্লাহ! হে সকল মানুষের রব! কষ্ট দূর করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী, আপনি ব্যতীত কোনো আরোগ্য দানকারী নেই। আপনি আরোগ্য দান করুন, যারপর আর কোনো কষ্ট থাকবে না।"

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিও হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত বয়ান ও আমলের সমর্থন করে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ اَهْلِه يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَ يَقُوْلُاَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَاْسَ اشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের কারো অসুখ হলে ডান হাত দিয়ে তার শরীর মালিশ করতেন এবং মুখে এই দু'আ পাঠ করতেন- "হে আল্লাহ! হে সকল মানুষের রব! কষ্ট দূর করে দিন। আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দান করুন, যার পর আর কোনো কষ্ট না থাকে।"[১০৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখতে এসে বললেন, জিবরাইল (আ.) যে ঝাড়-ফুঁক নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, সে ঝাড়-ফুঁক কি আমি তোমাকে করবো না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। অবশ্যই আপনি তা দিয়ে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করুন। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দু'আ তিনি তিনবার পাঠ করে আমাকে দম করলেন-

بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَ اللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ–

অর্থ: আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি। আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করবেন তোমার বিদ্যমান যাবতীয় রোগ থেকে এবং গিঁটসমূহে ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্টতা থেকে এবং হিংসুকের হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে।[১০৫]

**চিন্তা ও পেরেশানীর প্রতিকার**

মানুষ স্বভাবগতভাবেই অত্যন্ত দুর্বল ও স্পর্শকাতর। তার সকল প্রকার শক্তি সামর্থ্যের পরও সে এতো দুর্বলচিত্ত যে সামান্য বিষয়ই তাকে বেদনাকিষ্ট ও ব্যাকুল করে তোলে। তবে আল্লাহ তাআলার খাস বান্দাগণ বড় বড় অঘটন দুর্ঘটনার পরও ভগ্নহৃদয় ও ব্যাকুল হয়ে যান না। আমাদের সম্মানিত বুযুর্গগণ এই মনোবেদনা ও চিত্তের অস্থিরতা দূর করার বিভিন্ন দু'আর তালীম দিয়েছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত আছে, এরূপ মনোবেদনার কোনো কারণ ঘটলে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। দু'আটি[১০৬] হলো-

---

১০৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৮, খ. ১৪, পৃ. ২৩০

১০৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: নবী সা.-এর ঝাড়-ফুঁক, খ. ২, পৃ. ১৬২৯, হাদীস নং ৫৭৪৩

১০৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: নবী কারীম সা.-এর ঝাড়-ফুঁকের বিবরণ, খ. ৪, পৃ. ১২৫, হাদীস নং- ৩৫২৪

১০৬. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ–

**যেকোন কঠিন ও জটিল অবস্থায় দু'আ ইউনুস পাঠ করা**

হযরত সাআদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে এই দু'আ পাঠ করেছিলেন– لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ–

অর্থ: আপনি ছাড়াকোন মাবূদ নেই। আপনি পাক ও পবিত্র। নিশ্চয় আমি যুলুমকারীদের মধ্যে একজন।[১০৭]

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুআ কি হযরত ইউনুস (আ.)-এর জন্যই খাছ ছিল, নাকি সাধারণ মুমিনদের জন্যও এই দুআ প্রযোজ্য? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি কি আল্লাহ তাআলার এই আয়াত শুননি–فَنَجَّيْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ–

অর্থ: আমি তাঁর (হযরত ইউনুস আ.-এর) দুআ কবুল করেছি ও তাঁকে এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং আমি এভাবেই মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।[১০৮]

**বদ নযর থেকে পরিত্রাণের দু'আ**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوْ اَمَرَ اَنْ يَسْتَرْقَىْ مِنَ الْعَيْنِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা বলেছেন, বদ নযরের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের।[১০৯] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاٰى فِىْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سُفْعَةٌ، فَقَالَ اَسْتَرْقُوْا لَهَا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةُ–

অর্থ: উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে মলিন চেহারাবস্থায় দেখে বললেন: তাকে ঝাড়-ফুঁক করাও, কেননা তার ওপর (বদ) নযর লেগেছে।[১১০] আরেকটি হাদীসেএসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرَ الْعَائِنَ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِيْنُ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির বদ-নযর অন্যের ওপর লাগতো, তাকে অযু করার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো। এরপর ঐ পানি দিয়ে তাকে গোসল করানো হতো, যার ওপর বদ-নযর লাগতো।[১১১] কথিত আছে, হযরত আবদুল আযীয (রহ.) এবং হযরত ইসহাক (রহ.) শিশুদের হিফাযতের জন্য শুধু এই নিম্নোক্ত দু'আটি লেখে দিতেন। এই দুআটি যদি কাগজে লেখে শিশুর গলায় বেঁধে দেয়া হয় তাহলে আল্লাহ চাহে তো শিশু সর্বদিক থেকে নিরাপদ থাকবে। দু'আটি হলো-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ–

উল্লেখ্য,বদ নযরের জন্য শুরু ও শেষে দরূদ শরীফসহ নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে শিশুর উপর দম করলেও উপকৃত হওয়া যায়। আরেকটি হাদীসে এসেছে-

---

১০৭. আল-কুরআন, ২১: ৮৭
১০৮. আল-কুরআন, ২১: ৮৮
১০৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: বদ নযরের জন্য ঝাড়-ফুঁক করা, খ. ২, পৃ. ১৬২৮, হাদীস নং ৫৭৩৮
১১০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬২৮, হাদীস নং ৫৭৩৯
১১১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: বদ নজর, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং- ৩৮৮৪

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَ ثَابِتُ عَلٰى اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ اَشْتَكَيْتُ، فَقَالَ اَنَسُ اَلاَ اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ بَلٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شَفِىْ اِلاَّ اَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

অর্থ: আবদুল আযীয (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও সাবিত একবার আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর নিকট যাই। সাবিত বললেন: হে আবু হামযা! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস (রা.) বললেন: আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) যা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করেছিল তা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে দেবো? তিনি বললেন: হাঁ। তখন আনাস (রা.) পড়লেন اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شَفِىْ اِلاَّ اَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মানুষের রব, ব্যাধি নিবারণকারী, শিফা দান কর, তুমিই শিফা দানকারী। তুমি ব্যতীত আর কেউ শিফা দানকারী নেই। এমন শিফা দাও, যাতে কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে।[১১২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ اَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ اَشْفِهِ وَ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَالاَّشِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

অর্থ: আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন- হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর করো এবং শিফা দান করো, তুমিই শিফা দানকারী, তোমার শিফা ভিন্ন অন্য কোন শিফা নেই। এমন শিফা দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না।[১১৩] আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَرْقِىْ يَقُوْلُ اِمْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ اَنْتَ–

অর্থ: আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঝাড়-ফুঁক করতেন। আর এ দুআ পাঠ করতেন: ব্যথা দূর করে দাও, হে মানুষের পালনকর্তা। শিফাদানের এখতিয়ার কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যথা তুমি ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারে না।[১১৪] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لِلاِنْسَانِ اِذَا اشْتَكٰى يَقُوْلُ بِرِيْقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِى التُّرَابِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقِهِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি নবী কারীম (সা.)-এর নিকট হাযির হয়ে কোন অসুখের কথা বলতো, তখন তিনি নিজের থুথু নিয়ে তাতে মাটি লাগিয়ে পাঠ করতেন-

تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقِهِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا–

তথা আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারো থুথুতে আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।[১১৫] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ دَرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَن اشْتَكٰى مِنْكُمْ شَيْئًا اَو اشْتَكَاهُ اَخُ لَّهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَ الاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الاَرْضِ اغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَ خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَ شِفَاءً مِّنْ شِفَاءِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأُ–

১১২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: নবী কারীম (সা.)- এর ঝাড়-ফুঁক, খ. ২, পৃ. ১৬২৯, হাদীস নং ৫৭৪২
১১৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬২৯, হাদীস নং- ৫৭৪৩
১১৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬২৯, হাদীস নং- ৫৭৪৪
১১৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাড়-ফুঁকের দুআ, খ. ২, পৃ. ১৮৭-১৮৮, হাদীস নং- ৩৮৯৯

অর্থ: আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা তোমাদের কোনো ভাই অসুখের কথা বলে, তবে বলবে-

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ اغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَ خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ–

তবে সে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে।[১১৬]

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِّنْ اَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ اَنَمْ حَتّٰى اَصْبَحْتُ قَالَ مَاذَا قَالَ عَقْرَبُ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ قَلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ–

অর্থ: সুহায়ল ইবন আবু সালিহ (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতে আমাকে কোনো কিছু দংশন করেছিল, ফলে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন: উহা কী ছিল? সাহাবী বলেন, বিচ্ছু। তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি যদি সন্ধ্যায় এটি পাঠ করতে, তবে আল্লাহ চাহেতো কোনোকিছু তোমাকে ক্ষতিকরতে পারতো না। দুআটি[১১৭] হলো

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ–

**ঝাড়-ফুঁকে ডান হাত ব্যবহার করা**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعَوِّذُ بَعْضُهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِيْنِهِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (সা.) তাদের কাউকে ঝাড়ার সময় ডান হাত দিয়ে মালিশ করতেন।[১১৮]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَ بِىْ وَجَعُ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ امْسَحْهُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّ قُلْ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ– قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِىْ فَلَمْ اَزَلْ اٰمُرُ بِهِ اَهْلِىْ وَ غَيْرَهُمْ–

অর্থ: উছমান ইবন আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলেন, পেট ব্যথা আমাকে অস্থির করে তুলছে। তখন নবী (সা.) ইরশাদ করেন: তুমি তোমার ব্যথার স্থানকে ডান হাত দিয়ে সাতবার মাসেহ করে বলো– اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ–

রাবী উছমান (রা.) বলেন: আমি এরূপ করার সাথে সাথেই আল্লাহ আমার কষ্ট দূর করে দেন। এরপর থেকে আমি আমার পরিবার-পরিজন ও অন্যান্যদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিই।[১১৯]

আবু উমামা ইবন সাহল ইবন হুনায়ফ (র.) বলেন, (জুহফার নিকটবর্তী) হেরার নামক স্থানে আমার পিতা আবু সহল (ইবন হানীফ) গোসল করার মনস্থ করে জুব্বা খুলে ফেললেন। আমির ইবন রবীআ তা দেখতেছিলেন। আমার পিতা সাহল সুন্দর ও সুদর্শন লোক ছিলেন। আমির বললো, আজকের মতো এতো সুন্দর মানুষ আমি আর কোনো দিন দেখিনি। এমনকি এতো সুন্দর দেহবিশিষ্ট কোনো যুবতীও দেখিনি। আমিরের একথা বলার সাথে সাথেই সহলের গায়ে জ্বর আসল এবং এর প্রকোপ তীব্র হলো। অত:পর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললো, সহলের জ্বর

১১৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাড়-ফুঁকের দু'আ, খ. ২, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ৩৮৯৬
১১৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং- ৩৯০১
১১৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাড়-ফুঁককারীর ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থান মাসাহ করা, খ. ২, পৃ. ১৬৩১,হাদীস নং ৫৭৫০
১১৯. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: ঝাড়-ফুঁকের দুআ, খ. ২, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ৩৮৯৫

এসেছে এবং সে আপনার সাথে যেতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার নিকট আসলে সহল-আমিরের সেই ঘটনা বললেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন: কোনো মুসলমান নিজের ভাইকে কেন হত্যা করে? অত:পর আমিরকে বললেন, তুমি بارك الله (বারাকাল্লাহ)[120] কেনো বললে না? বদ নযর (কুদৃষ্টি) সত্য, সহলের জন্য অযু করো। আমির সহলের জন্য অযু করলে সহল আরোগ্য লাভ করেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংগে সুস্থ অবস্থায় তিনি গমন করলেন, কোনো অসুবিধা হয়নি।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমিরকে ডেকে গোসল করতে বললেন। অত:পর আমির হাত, মুখ, হাতের কনুই, হাঁটু, পায়ের পাশ এবং লুঙ্গি ও নিচের মসৃণ দেহাংশ ধৌত করে ঐ পানি একটি পাত্রে জমা করে সহলের দেহে ঢেলে দেয়া হলো এবং সহল সুস্থ হয়ে লোকদের সাথে রওয়ানা হলো।[121]

**আয়াতে শিফা**

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত ৬টি আয়াতে কারীমাকে আয়াতে শিফা বা রোগ মুক্তির আয়াত বলা হয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) স্বীয় "শিফাউল আলীল" নামক কিতাবে এই আয়াতগুলোর খুবই প্রশংসা করেছেন। এগুলো পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহাসহ এই আয়াতগুলো পাঠ করে রুগ্ন ব্যক্তির উপর দম দেবে অথবা চীনা মাটির বাসনে লেখে পানির দ্বারা ধৌত করে রোগীকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ যে কোন রোগ আরোগ্য হবে। ছয়টি আয়াত[122] হলো-

وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ–

وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ–

يَخْرُجُ مِنْ م بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُه فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ–

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ–

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَاءٌ–

## আয়াতে কেফায়াতে মুহিম্মাত

**সকল প্রকার বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের দু'আ**

কুরআনুল হাকীমের নিম্নোক্ত সাতটি আয়াতে কারীমকে আয়াতে কেফায়াতে মুহিম্মাত বা সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের আয়াত ও দু'আ বলা হয়। এই মহান আয়াতগুলো দ্বারা যাবতীয় বালা-মুসীবত ও রোগ-শোক থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এই আয়াতে কারীমাগুলো পাঠ করার মানে নিজের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা হাসিল করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, দীনি ও দুনিয়াবী ব্যাপারে এই ৭টি আয়াতের দু'আর চেয়ে উত্তম আর কোনো বিষয়ই হতে পারে না। এই ৭টি আয়াতে কারীমা প্রত্যেক দিন ৭বার পড়া উচিত। তবে আল্লাহ ওয়ালাগণ শুরু ও শেষে দরুদ শরীফও পাঠ করতেন। ০৭টি আয়াতে কারীমা[123] হলো

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْماً– وَ لاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَ اسْئَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا– اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا–

---

১২০. 'বারাকাল্লাহ' বলাও এক ধরনের দু'আ

১২১. মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, পাকিস্তান: করাচি, মাকতাবাতুল বুশরা: ২০১১, অধ্যায়: কিতাবুল জামি, অনুচ্ছেদ: বদ নজরের প্রভাব হতে মুক্তির জন্য অযু করা, খ. ৩, পৃ. ৫৮০-৫৮২, হাদীসনং- ১৬৯৭, ১৬৯৮

১২২. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুযযামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا–

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا–

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا–

فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ صَعْبٍ + بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ–

**সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন এবং বরকতের জন্য দশটি 'ক্বাফ' অক্ষর বিশিষ্ট পাঁচটি আয়াতে দু'আ**

পবিত্র কুরআনে এমন ৫টি আয়াত রয়েছে যার প্রত্যেকটি আয়াতে ১০টি করে 'ক্বাফ' অক্ষর আছে, এগুলোর রহস্য ও উপকারিতা অসংখ্য। হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি জুমুআর দিন এই ৫টি আয়াত লেখবে এবং ধুয়ে পানি পান করবে তার হাজারো শিফা, স্বাস্থ্য ও রহমত নাযিল হবে। হাজারো নম্রতা, ইয়াক্বীন ও নূর তার ভেতরে প্রবেশ করবে। যাবতীয় রোগ-ব্যাধির দু:খ, কষ্ট ও চিন্তা পেরেশানী তার থেকে বের হয়ে যাবে। হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাঠ করবে তার হায়াত দীর্ঘ হবে, তার গুনাহ মাফ হবে এবং তার উদ্দেশ্য সফল হবে।মর্যাদাপূর্ণ ৫টি আয়াত বা দু'আ[১২৪] হলো-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ م بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْم بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّلَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلاَّ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَ مَا لَنَا اَنْ لاَّ نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ–

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَ قَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لاَ اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَ لاَ تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ–

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ لاَ يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لاَ ضَرًّا– قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ–

অবশেষে বলা যায়, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আরোগ্যদানকারী আয়াতসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিখানো দু'আসমূহের ওপর আমল করার পরও যদি কারো অসুখ আরোগ্য হাসিল না হয়, তবে মনে করতে হবে কুরআন, হাদীস এবং আল্লাহর নামের গুণাবলী স্বস্থানে শতভাগ ঠিক আছে, নিজের গোনাহ ও বদ আমলের কারণেই তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। এজন্য প্রথমবারে ফায়েদা না পেলে নিরাশ হওয়া যাবে না; বরং এসব তদবীরের ক্ষেত্রে যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে বার বার আমল করতে হবে এবং স্বীয় গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে পবিত্র

১২৪. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪

হতে হবে। এরপরও যদি কাঙ্ক্ষিত রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া না যায় তাহলে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে- বাহ্যিক রোগ থেকে মুক্তি দেয়া সকল রোগের আরোগ্যদাতার অভিপ্রেত না হওয়ার সৌভাগ্যই বা কম কিসে যে এ রোগের অসিলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় নৈকট্য দান করবেন এবং রোগের বদৌলতে তাঁর মহান দরবারে অহনির্শ দু'আ ও কাকুতি মিনতির মাধ্যমে পরকালে মর্যাদা উঁচু হবে।

# দ্বাদশ অধ্যায়

## বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ইসলামী বিধান


| | | |
|---|---|---|
| **প্রথম পরিচ্ছেদ** | : | আধুনিক অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের বিধান |
| **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** | : | টেস্ট টিউব, ক্লোনিং, জন্মনিয়ন্ত্রণ,গর্ভপাত ও এইডস-এর বিধি-বিধান |
| **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | : | অন্যান্য রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান ও মাসআলা |

## প্রথম পরিচ্ছেদ : আধুনিক অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের বিধান

### অপারেশন বা অস্ত্রোপচার

অপারেশন বা অস্ত্রোপচারকে একটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি মনে করা হলেও বাস্তবে এটি একটি প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে সুনির্ধারিত কার্যনির্দেশিকা এবং শল্য প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীর শারীরিক অসুস্থতা সারিয়ে তোলা হয়। এটি শল্য চিকিৎসা নামেও পরিচিত। সাধারণত যেসব ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো- রোগ বা আঘাতের চিকিৎসা, শারীরিক সচলতা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি অথবা অবাঞ্ছিত শারীরিক ক্ষত সারিয়ে তোলা। অস্ত্রোপচারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Surgery, Operation.[১] বাংলাতে অস্ত্রোপচার শব্দটি মূলত 'অস্ত্র+উপাচার, বা অস্ত্রের মাধ্যমে উপাচার এভাবে গঠিত হয়েছে। উপাচার মানে হলো সেবা। তাই অস্ত্রোপচার মানে হলো অস্ত্রের মাধ্যমে সেবা।[২]

সুতরাং অস্ত্রোপচার এমন একটি প্রযুক্তি, যা সংঘঠিত হয় শরীরের গঠন কলার মধ্যে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। তাই যে অস্ত্রোপচার কার্যপ্রণালিতে রোগীর শরীরের টিস্যু কাটা জড়িত থাকে অথবা রোগীর পূর্বের বহন করা ক্ষত বন্ধ করার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা হয় তাই অস্ত্রোপচার।

### ইসলামী শরী'আতে অপারেশনের বিধান

বর্তমানে পৃথিবীতে অসংখ্য ধরণের এবং এমন সব উদ্ভট অপারেশন করা হয়ে থাকে, যা অনেকে কল্পনাও করতে পারে না। তাছাড়া বর্তমান অপারেশন ব্যবস্থাপনায় যেহেতু মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে হয় এবং অপারেশনের কারণে মানুষকে ভীষণ কষ্টে নিপতিত হতে হয়, তাই ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে মত পার্থক্য ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে কেউ একে জায়েয বলেছেন, আবার অনেকে না জায়েয বলেছেন। যারা না জায়েয বলেন, তারা বেশকিছু দলীল ও যুক্তি পেশ করেছেন। যেমন-

**০১.** মানুষ তার দেহের মালিক নয়, এর প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা। তাই আল্লাহ তাআলার মালিকাধীন বস্তুতে অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আর এজন্যই আত্মহত্যা হারাম ও মহাপাপ। মানুষ যদি তার দেহের মালিক হতো, তাহলে আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের জীবনের অবসান ঘটানো অবৈধ হতো না। সুতরাং এর ওপর অস্ত্রোপচারও বৈধ হবে না।

**০২.** অপারেশনে রোগীর কঠিন ও ভীষণভাবে কষ্ট স্বীকার করা নিশ্চিত, আর এর বিপরীতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত নয়; বরং সম্ভাব্য। আর সম্ভাব্য আরোগ্যের লক্ষে নিশ্চিত কষ্ট স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নয়।

**০৩.** বর্তমান যুগের ন্যায় এমন অপারেশন পদ্ধতির অস্তিত্ব অতীতে যদিও ছিল না, কিন্তু 'দাগ' লাগানোর মাধ্যমে আদি যুগে যে চিকিৎসার প্রচলন ছিল, তা অপারেশনের দৃষ্টান্ত হতে পারে। আর দাগের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যাপারে অনুমতি ও নিষেধ উভয় ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। তাই আদেশ ও নিষেধের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে হাদীস শাস্ত্রের বিধানানুসারে নিষেধাজ্ঞার হাদীসকে প্রাধান্য দিতে হয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا فَمَا اَفْلَحْنَا وَ لاَ انجَحْنَا–

অর্থ: ইমরান ইবন হুছাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেঁক ও দাগ দেয়াকে নিষেধ করেছেন। অত:পর আমরা দাগ দিয়েছি কিন্তু এতে আমরা সফলতা ও আরোগ্য লাভ করতে পারিনি।[৩]

পক্ষান্তরে যারা অপারেশন জায়েয মনে করেন, তারাও তাদের পক্ষে বেশকিছু দলীল ও যুক্তি পেশ করেন। যথা-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَرَ طَبِيْبًا اَنْ يَّبُطَّ بَطَنَ رَجُلٍ اَجْوَى الْبَطَنِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইসতেসকা বা সৌথ রোগগ্রস্থ এক রোগীর চিকিৎসককে তার পেটে সেগাফ (অপারেশন) করতেহুকুম করেছেন।[৪] অন্য হাদীসে এসেছে-

---

১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০২ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৭৫

২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশেনারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ২০০৫ (২১তম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৪২

৩. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান, লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ: ২০০৪, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেয়া, খ. ২, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং- ৩৮৬৯

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ يَعُوْدُه بِظَهْرِه وَرَمُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بِهٰذِهِ مِدَّةٌ- قَالَ بُطُّوْا عَنْهُ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى بَطَتُّ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَاهِدُ-

অর্থ: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে আমি উপস্থিত ছিলাম। সে ব্যক্তির কোমর ফোঁড়ার কারণে ফোলা ছিল। লোকেরা বলতে লাগল এতে পুঁজ হয়েছে। নবী কারীম (সা.) উক্ত ফোঁড়া সেগাফ (অপারেশন) করার নির্দেশ দিলেন। আলী (রা.) বলেন, আমি তৎক্ষণাত সেগাফ (অপারেশন) করে ফেললাম এবং নবী করীম (সা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[৫]

হযরত আলী (রা.)-এর উক্ত বর্ণনায় বোঝা যায়, তিনি অপারেশন করে ছিলেন এবং নি:সন্দেহে তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। অন্যথায় নবী করীম (সা.) এমন একটি জটিল কাজ সমাধা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিতেন না। অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِه خَيْرُ فَالْحِجَامَةُ-

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- তোমরা যে সমস্ত বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো তার মধ্যে শিংগা লাগানো উত্তম।[৬]

শিঙা লাগানো একটি ছোট-খাটো অস্ত্রোপচার। সুতরাং এর দ্বারাও অপারেশন প্রমাণিত হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে বর্তমান অপারেশনে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে আর শিঙা লাগানোর অস্ত্রোপচার ছোট ধরনের হয়ে থাকে। আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعَبٍ طَبِيْباً، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ-

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) উবাই বিন কাবের নিকট একজন ডাক্তার প্রেরণ করলেন। অত:পর ডাক্তার তার একটি রগ কেটে এর উপর দাগ লাগিয়ে দেন।[৭]
উক্ত হাদীসে রগ কাটার কথা অপারেশন জায়েয হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا-

অর্থ: আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.)-কে যখনই (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে) দু'টি কাজের মধ্যে যেকোনো একটির অবকাশ দেয়া হতো, তিনি তন্মধ্যে তুলনামূলক সহজ কাজটিকে বেছে নিতেন।[৮]

যেহেতু অপারেশন অসুস্থ থাকার তুলনায় সহজ তাই সহজ পন্থা অবলম্বন করার লক্ষে অপারেশন করাই উত্তম। তাছাড়া যৌক্তিকতার আলোকেও অপারেশন জায়েয হওয়ার দাবি রাখে। কারণ-

(ক) অসুখ যেমন কষ্টকর ও ক্ষতিকর তেমনিভাবে অপরেশনও কষ্টকর ও ক্ষতিকর। আর অপারেশনের কষ্ট ও ক্ষতি অসুখের কষ্ট ও ক্ষতি থেকে সহজ। কারণ অসুখের কষ্ট মৃত্যুমুখী। পক্ষান্তরে, অপারেশনের কষ্ট জীবনমুখী। অন্য ভাষায় অসুখের কষ্ট মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়। আর অপারেশনের কষ্ট জীবনের দিকে টেনে নেয়।

---

৪. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, লেবাবনন: বৈরুত: মাকতাবাতু আল-মানারুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ১১৪

৫. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ১১৪

৬. *সুনান আবু দাউদ*, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: শিংগা লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৬১

৭. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তান: করাচি, বুশরা পাবলিশার্স: ২০০৯, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্রতিটি রোগের চিকিৎসা রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৫৭৩৯

৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, অধ্যায়: শরী'আতের শাস্তি, অনুচ্ছেদ: শরী'আতের হদ তথা শাস্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া,খ. ২, পৃ. ১৮৯০, হাদীস নং- ৬৭৮৬

(খ) অসুখের কষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী হলেও অপারেশনের কষ্ট সাময়িক। যেমন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির খাৎনা করানোকে না করানোর তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অথচ খাৎনা করতে গেলে ডাক্তার তার সতর দেখবে যা হারাম। কিন্তু হারাম অর্থাৎ সতর দেখবে অল্প সময়ের জন্য আর এর দ্বারা সুন্নাতের ওপর আমল হবে স্থায়ীভাবে।

(গ) অসুখ স্বাস্থ্যহানী করে আরঅপারেশন অসুস্থ দেহকে সুস্থ করে। তাই দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষে ছোট ও সাময়িক ক্ষতি মেনে নেয়া ইসলামের অনুমোদন রয়েছে। যেমন, ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো-

لَوْ كَانَ اَحَدُهُمَا اَعْظَمُ ضَرَرًا مِّنَ الْاٰخَرِ فَاِنَّ الْاَشَدَّ يَزَالُ بِالْاَخَفِّ–

অর্থ: যদি দুই ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক একটি অপরটির চেয়ে বড় হয়, তাহলে তুলনামূলক ছোট ক্ষতি বরদাশত করার মাধ্যমে বড় ক্ষতিকে প্রতিহত করতে হয়।[৯]

অতএব, তুলনামূলক অপারেশনের মতো ছোট বহনের মাধ্যমে অসুস্থ থাকার মত বড় ক্ষতি প্রতিরোধ করাই শ্রেয়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاٰى اَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ دَعُوْهُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ–

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) এক বেদুঈনকে মসজিদে প্রশ্রাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন: ওকে ছেড়ে দাও। সে প্রশ্রাব শেষ করলে পানি আনিয়ে সেখানে ঢেলে দিলেন।[১০]

উক্ত হাদীসে মসজিদে মূত্র ত্যাগ করতে দেয়া নি:সন্দেহে ঠিক ছিল না। কেননা এতে মসজিদের অসম্মানের পাশাপাশি মসজিদ অপবিত্রও হয়। তথাপি তাকে প্রশ্রাব থেকে বারণ না করার ফলে মসজিদের কিছু জায়গা অপবিত্র হওয়ার তুলনায় তাকে প্রশ্রাব থেকে বারণ করতে গেলে তার শারীরিক ক্ষতি ও মসজিদের অনেক জায়গা নষ্ট হওয়ার মতো বড় ক্ষতি থেকে বাঁচানোই উদ্দেশ্য ছিল। তাই অপারেশনে ক্ষতি ও কষ্টের দিক থাকা সত্ত্বেও অপারেশন না করে রোগের অধিক কষ্ট ও ক্ষতির থেকে বাঁচার লক্ষে তা মেনে নেয়াই শ্রেয়।

ফিকাহ শাস্ত্রের আরেকটি মূলনীতি হল–اِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا

অর্থ: বিরোধপূর্ণ দু'টি ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক ছোট ক্ষতি গ্রহণ করে বড় ক্ষতিকে প্রতিরোধ করতে হয়।[১১]

এ হিসেবে তুলনামূলক সহজ ক্ষতি অপারেশনকে মেনে নিয়ে বড় ক্ষতি অসুস্থতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করাই অধিক যুক্তি সঙ্গত।

اِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّقْطَعَ اِصْبَعًا زَائِدَةً اَوْ شَيْئًا اٰخَرِ، قَالَ نَصِيْرِ اِنْ كَانَ الغَالِبُ عَلٰى مِنْ قَطْعِ مِثْلَ ذٰلِكَ الْهَلَاكَ، فَاِنَّه لاَ يَفْعَلُ، وَ اِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ النَّجَاةَ، فَهُوَ فِىْ سَعَةٍ مِنْ ذٰلِكَ–

অর্থ: কোন ব্যক্তি যখন তার অতিরিক্ত আঙ্গুল অথবা অন্যকোনো অঙ্গ কেটে ফেলতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে কিনা এ ব্যাপারে নাছির (রহ.) বলেন, এতে যদি মারা যাওয়ার আশংকা বেশি থাকে তাহলে তা করা যাবে না। পক্ষান্তরে, সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলে তা করার অবকাশ রয়েছে।[১২]

এ ধরণের বহু মাসআলা বিভিন্ন কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, প্রয়োজনের তাগিদে ও মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে অপারেশন করা অবৈধ নয়।

---

৯. মাওলানা যায়নুল আবেদীন, *গামাযু উয়ুনিল বাসায়ির*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ (প্রথম প্রকাশ), খ. ১, পৃ. ২৮৩

১০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অযু, অনুচ্ছেদ: এক বেদুঈনকে মসজিদে প্রশ্রাব শেষ করা পর্যন্ত নবী কারীম (সা.) এবং অন্যান্য লোকের পক্ষ থেকে অবকাশ দেয়া, খ. ১, পৃ. ৭১, হাদীস নং- ২১৯

১১. মুহাম্মদ সিদক্বী ইবন আহমাদ, *মাওসুআতু আল-কাওয়া'ইদুল ফিকহিয়্যাহ*, লেবানন: বৈরুত, রেসালাহ পাবলিশার্স, ২০০৩ (প্রথম প্রকাশ), খ. ১, পৃ. ২২৯

১২. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, *আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ৫, পৃ. ৪৪০

সুতরাং যারা অপারেশন বা কাটা-ছেঁড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করাকে অবৈধ মনে করেন, তাদের এ মতটি সঠিক নয়। কেননা এর স্বপক্ষে প্রথম যে দলীলটি উল্লেখ করা হয়েছে "আমরা আমাদের দেহের মালিক নই, তাই অস্ত্রোপচার জায়েয নয়" এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা যেমনআমাদের দেহের মালিক, তেমনি তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিরই মালিক, তা সত্ত্বেও তার সৃষ্টিকে নানা উপায়ে ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই। আর ব্যবহারের নির্দেশ তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থ: তিনি যমীনের সবকিছু তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।[১৩]

আমাদের দেহ ও শরীরও এ আয়াতের আওতাভূক্ত। অতএব, অপারেশন করে যদি দৈহিকভাবে উপকৃত হওয়া যায় তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের পরিপন্থী হবে না।

দ্বিতীয় দলীল হিসেবে তারা যে বলেছেন, অপারেশনে ভীষণ কষ্ট ভোগান্তি নিশ্চিত, এর বিপরীতে আরোগ্য লাভ সম্ভাব্য। আর সম্ভাব্য আরোগ্যের জন্য নিশ্চিতভাবে মারাত্মক কষ্ট স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ কথাটিও সঠিক নয়। কারণ, যদি বাস্তবে এমনই হয় তাহলে অপারেশনকে কেউই জায়েয মনে করতো না। কিন্তু এ কথাটি সকল রোগীর ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়। যেখানে মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার অপারেশনকে প্রাধান্য দেবে সেখানে অপারেশনের অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, যেখানে অপারেশনকে প্রাধান্য দেবে না সেখানে অপারেশন করা কোনভাবে যুক্তিযুক্ত হবে না।

তৃতীয় দলীলে "দাগ লাগানো নিষেধের হাদীস" পেশ করার মাধ্যমে যে দলীল দেয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেন-দাগ লাগানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো রহিত হয়ে গেছে। কেননা ইসলামের প্রথম দিকে মানুষের যখন আকীদা ছিল যে দাগ লাগানোর মধ্যেই চিকিৎসা সীমাবদ্ধ এবং দাগ লাগানোকে সরাসরি রোগ মুক্তিদাতা মনে করা হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের আকীদা সংশোধন করার লক্ষে দাগ লাগানোকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মানুষের অন্তরে যখন ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হলো যে রোগ থেকে মুক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা দাগ লাগানো বা ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি দাতা নয়, বরং রোগ মুক্তির একটি 'সবব' বা উপকরণ মাত্র। আল্লাহ তাআলা এতে ক্রিয়া ক্ষমতা দিলে সে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, আর ক্রিয়া ক্ষমতা না দিলে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, এর দ্বারা অপারেশন না জায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করা যাবে না।

**ইসলামী শরী'আর আলোকে মৃতদেহে অস্ত্রোপচার বা ময়না তদন্ত করার বিধান**

মৃত্যুর কারণ জানার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করাকে পোস্ট মোর্টেম (post mortem) বা ময়না তদন্ত বলে। আর মৃতদেহে সাধারণত তিন কারণে অস্ত্রোপচার করা হয়। যথা-

১. মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য।

২. জীবিত মানুষের আর্থিক উপকারার্থে।

৩. জীবিত মানুষের দৈহিক উপকারার্থে।

বর্তমান বিশ্বে পোস্ট মোর্টেমের যে প্রথা চালু রয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুর কারণ জানার লক্ষে মৃত দেহ কাটা-ছেঁড়া করা; এমন কি কখনো এজন্য কবর থেকেও লাশ উত্তেলন করে দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, শরী'আতের দৃষ্টিতে এ পোস্ট মোর্টেম বা ময়না তদন্ত বৈধ নয়। কারণ-

**প্রথমত** ময়না তদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা নিশ্চিত নয়। আর এর দ্বারা মৃত্যুর কারণ জানা গেলেও তার ওপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম প্রদান করা যাবে না। সুতরাং যে পর্যন্ত সাক্ষী অথবা সুনিশ্চিত লক্ষণ দ্বারা ঘটনা উদ্ঘাটন না হবে, সে পর্যন্ত কাউকে দোষারোপ করা যাবে না। তাই ইসলামী বিধান অনুযায়ী যেহেতু ময়না তদন্তের ওপর নির্ভর করে কাউকে দোষারোপ করা যায় না তাই এ অনর্থক কাজের কোনো বৈধতা হতে পারে না।

বর্তমানে এ অনর্থক কাজের জন্য দাফন করার এক-দু'বছর পরেও কবর থেকে লাশ উত্তোলন করতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় লাশের কঙ্কাল বা কিছু হাড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। আর সাধারণত এমন পোস্ট মোর্টেম দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্যই উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় পুলিশ বাহিনী তদন্তের নামে লাশের আত্মীয়-

---

১৩. আল-কুরআন, ২: ২৯

স্বজনকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেয়, কখনো তারা যে কর্তব্য পালনে তৎপর তা জনগণকে বোঝানোর জন্য বিনা প্রয়োজনে শুধু প্রথা হিসেবে ময়না তদন্ত করে থাকে। কখনো আবার রাজনৈতিক চাপের কারণে এমন বেহুদা কাজ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এ ধরণের অনর্থক কাজ কখনো ব্যাপকভাবে বৈধ হতে পারে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ বর্জন করাই মুসলমানের সৌন্দর্যের পরিচায়ক।[১৪]

**দ্বিতীয়ত:** ময়না তদন্তের মাধ্যমে লাশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। আর শরী'আত অসমর্থিত বিনাপ্রয়োজনে লাশের অসম্মান করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ

অর্থ: আমি বনী আদমকে সম্মানীত করেছি।[১৫]হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَلٰى عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতোই অপরাধ।[১৬]

অতএব, মৃতের গোশত কাটাও জীবিত ব্যক্তির গোশত কাটার সমপরিমাণ অপরাধ বলে গণ্য হবে। ফাতওয়ার কিতাবে এসেছে–و لا يخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمى، كأن تكون الأرض كغصوبة، أو أخذت بشفعة–

অর্থ: দাফন করার পর পুনরায় কবর থেকে লাশ উত্তোলন করা জায়েয নেই। তবে কোনো মানুষের হক সম্পৃক্ত থাকলে লাশ উত্তোলন জায়েয আছে। যেমন অন্যের যমীনে কবর দেয়া অথবা শোফার মাধ্যমে অন্য কেউ উক্ত যমীনের মালিক হলে।[১৭]

**ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে লাশের অস্ত্রোপচার করার ইসলামী বিধান**

ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের শারীরিক গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বোঝা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত লাশের অস্ত্রোপচার জায়েয কিনা এ ব্যাপারে দুই ধরনের অভিমত পাওয়া যায়।

**প্রথম অভিমত:** একদল আলেম এ কাজকে না জায়েয মনে করেন। তাঁরা এ দাবির স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীল পেশ করেন। **দলীল-১:** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ

অর্থ: নিশ্চয় আমি আদম জাতিকে সম্মানীত করেছি।[১৮]

আর লাশের অস্ত্রোপচার মানব সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। সুতরাং তা জায়েয হতে পারে না।

**দলীল-২:** হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতোই অপরাধ।[১৯]

---

১৪ . আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই), খ. ২, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং- ২৩১৭

১৫. আল-কুরআন, ১৭: ৭০

১৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: কবর খননকারী মৃত ব্যক্তির হাড় পেলে সেখানে কবর খুঁড়বে না, খ. ২, পৃ. ১০৪, হাদীস নং- ৩২০৭

১৭. মুহাম্মদ আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, সৌদি আরব: রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৩, পৃ, ১৪৫

১৮. আল-কুরআন, ১৭: ৭০

১৯.*সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: কবর খননকারী মৃত ব্যক্তির হাড় পেলে সেখানে কবর খুঁড়বে না, খ. ২, পৃ. ১০৪, হাদীস নং- ৩২০৭

অতএব, শরী'আতের দৃষ্টিতে চিকিৎসা হচ্ছে সর্বোচ্চ সুন্নাতে জায়েদা বা মুস্তাহাব এর পর্যায়ভুক্ত। আর মুস্তাহাবের জন্য হাদীসে বর্ণিত সুনিশ্চিত অপরাধ বৈধ হতে পারে না।

**দলীল ৩:** লাশের অস্ত্রোপচার করা অঙ্গ-বিকৃতির অন্তর্ভূক্ত। আর শরী'আতের দৃষ্টিতে অঙ্গ-বিকৃতি করা মাকরূহ তাহরীমী বা হারাম। হাদীসে এসেছে-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَمَرَ اَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ اَوْ سَرِيَّةٍ، اَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ ... ثُمَّ قَالَ... وَ لَا تَمَثَّلُوْا وَلِيْدًا–

অর্থ: সুলায়মান ইবন বুরাইদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)কাউকে মুসলিম বাহিনীর আমীর বা কমাণ্ডার নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন তাকে আল্লাহর ভয়ভীতি সম্পর্কে অসিয়াত (বিশেষ উপদেশ) করতেন এবং বলতেন: কারো অঙ্গ-বিকৃত করো না এবং কোনো ছোট বাচ্চাকে হত্যা করো না।[২০]সুতরাং শুধুমাত্র মুস্তাহাব কাজের জন্য এমন হাদীসের বিরোধিতা করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

**দলীল ৪:** চিকিৎসা করা ফরয বা ওয়াজিব নয়। তাই চিকিৎসা ছাড়া কেউ মারা গেলে গুনাহগার হবে না। সুতরাং চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও ফরয বা ওয়াজিব নয়। কেননা-

ان مقدم الواجب واجب، و مفهومه ان مقدم غير الواجب ليس بواجب–

অর্থ: ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব। তেমনিভাবে যা ওয়াজিবের ভূমিকা নয়, তা ওয়াজিবও নয়।
সুতরাং ডাক্তারি বিদ্যা যা ওয়াজিব নয়, তা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

**দলীল (৫):** চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত্ব করার জন্য যদি মেডিকেল কলেজগুলোতে লাশ কাটা-ছেঁড়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে অনেক অসাধু ও অর্থ লিপ্সু ব্যবসায়ী লাশ বেচা-কেনার ব্যবসায় মেতে ওঠবে। এমনকি লাশের জন্য জীবিত মানুষ হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করবে না। উপরন্তু কিছু অসাধু ডাক্তার লা-ওয়ারিশ রোগীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবসায় মেতে ওঠতে পারে। ফলে মানুষের লাশের অবমাননা ও অপদস্থতার পাশাপাশি তা খেলার বস্তুতেও পরিণত হবে। তাই লাশের অস্ত্রোপচার অবৈধ হওয়া সাধারণ বিবেকেরই দাবি।

**দলীল- ৬:** চিকিৎসার জন্য মৃত ব্যক্তির অস্ত্রেপচারের মাধ্যমে ডাক্তারী বিদ্যা অর্জন করা যদি প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত হয়, তাহলে ঐ সময় লা-ওয়ারিশ লাশের অপ্রতুলতা দেখা দিলে লাশের ওয়ারিশ ও আত্মীয়-স্বজনদের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়বে যে লাশ দাফন না করে মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয়া। কেউ এমন করতে অস্বীকার করলে সরকার জোরপূর্বক লাশগুলো মেডিকেল কলেজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে, যা মানব সম্মান-মর্যাদা ও ইসলামী দাফন-কাফন নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[২১]

**দলীল- ৭:** জরুরত বা প্রয়োজনের তাগিদে কোনো না জায়েয কাজ বৈধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অবৈধ কাজ বৈধ হয় না। আর ঐ তিনটি শর্তই লাশে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। শর্ত তিনটি নিম্নরূপ-

**(ক)** প্রয়োজনটি ضرورة قائمة তথা বর্তমানে বিদ্যমান থাকাএবং ضرورة منتظرة তথা সম্ভাব্য প্রয়োজন না হওয়া।

**(খ)** প্রয়োজন দূর করার অন্য আর কোনো বৈধ পদ্ধতি না থাকা।

**(গ)** এ না জায়েয কাজ দ্বারা প্রয়োজনটি পূরণ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা।

সুতরাং লাশে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে সব ক'টি শর্তই অনুপস্থিত রয়েছে। কেননা প্রথম শর্তের ক্ষেত্রে ডাক্তারি বিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে লাশের ওপর অস্ত্রোপচার করা বর্তমান প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত নয়, ভবিষ্যত প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত। কারণ এখানের

---

২০. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জিহাদ ও এর নীতিমালা, অনুচ্ছেদ: খলীফা কর্তৃক সেনাদলের জন্য আমীর নির্বাচন ও যুদ্ধের আচরণ ও পদ্ধতির উপদেশ, খ.৫, পৃ. ৩৭৪,হাদীস নং- ৪৫১৯

২১. মুফতী রশীদ আহমাদ, *আহসানুল ফাতওয়া*, পাকিস্তান, করাচি, এইচ.এম. সাঈদ কোম্পানী, ১৪২৫ হি. (চতুর্থ প্রকাশ), খ. ৮, পৃ. ৩৩৯

অবস্থা এমন নয় যে, অস্ত্রোপচার না করলে এখনই কোনো রোগী মারা যাবে, বরং অস্ত্রেপচারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে রাখবে এবং পরবর্তীতে কোনো রোগী আসলে ঐ অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তার চিকিৎসা করবে। আর ভবিষ্যত প্রয়োজনের লক্ষে এমন করা কখনো বৈধ হতে পারে না।

এখানে দ্বিতীয় শর্তটি এভাবে অনুপস্থিত, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী বোঝা লাশের ওপর অস্ত্রোপচার করার মধ্যে সীমিত নয়। কেননা এর জন্য অন্যান্য বৈধ পদ্ধতিও রয়েছে। যেমন- বানর, শিম্পাঞ্জি এবং ব্যাঙ ইত্যাদির ওপর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেও বিদ্যা অর্জন করা যায়। কেননা এ প্রাণীগুলোর ভেতর ও বাইরের অঙ্গেও গঠন প্রণালী অনেকটা মানুষের ন্যায়। সুতরাং এ ধরণের বৈধ উপায় থাকতে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

তৃতীয় শর্তটিও এখানে অনুপস্থিত। কারণ লাশে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া নিশ্চিত নয়। অনেক সময় অস্ত্রেপচার করার পর রোগী মারা যায়, অনেক সময় রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় পূর্বের চেয়ে রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, অপারেশন ছাড়া বাঁচবে না এমন রোগী পরবর্তীতে চিকিৎসা ছাড়াই ভাল হয়ে যায়। এতে বোঝা যায়, অপারেশন দ্বারা চিকিৎসা হওয়া সুনিশ্চিত কোনো বিষয় নয়। সুতরাং চিকিৎসার দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হওয়া অনিশ্চিয়তার কারণে না জায়েয পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।[২২]

**দ্বিতীয় অভিমত:** অধিকাংশ আলেম ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা লাভের জন্য লাশের অস্ত্রোপচারকে জায়েয মনে করেন। তারাও তাদের দাবির স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীরসমূহ পেশ করেন-

**দলীল- ১:** আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন–وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَّا أُوْلِى الْاَلْبَابِ

অর্থ: হে জ্ঞানী সকল! কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।[২৩]

কিসাস নেয়ার ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে বধ করা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি। কেননা এতে একটি লোক (ঘাতক) নিহত হয়ে গেল। আর তাকে বধ না করলে ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু তার হাতে বহু লোকের জীবন নাশের আশংকা রয়েছে অর্থাৎ সে জীবিত থাকলে আরো বহু লোককে হত্যা করবে যা বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষতি। তাই উক্ত আয়াতে এমন ব্যাপক ও বৃহৎ ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষে ব্যক্তি বিশেষের ছোট ক্ষতিকে মেনে নিয়ে তাকে বধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

তাই উসুল বা বিধান হলো-يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام

অর্থ: বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিকে বরণ করা যায়।[২৪]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, লাশের অস্ত্রোপচার ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি আর হাজারো রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা ও ধুঁকে ধুঁকে মারা যাওয়া ব্যাপক ক্ষতি। সুতরাং বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষে লাশের অস্ত্রোপচারের মতো সামান্য ক্ষতি মেনে নেয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং আয়াতে কিসাসের ওপর আমলের নামান্তর।

**দলীল-২:** বিভিন্ন ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে–احياء النفس أولى من صيانة ميت

অর্থ: জীবিত প্রাণ রক্ষা করা মৃতের সংরক্ষণ থেকে অধিক শ্রেয়।[২৫]

তাই অসংখ্য রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক লাশের সংরক্ষণের পরিপন্থী কাজ তথা অস্ত্রোপচার অযৌক্তিক নয়।**দলীল-৩:**–إن حرمة الحى أعطم من حرمة الميت

অর্থ: নি:সন্দেহে মৃত ব্যক্তির সম্মানের তুলনায় জীবিত ব্যক্তির সম্মান অনেক বেশি।[২৬]

---

২২. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪০
২৩. আল-কুরআন, ২: ১৭৯
২৪. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-বালীছানী, *আল-কাওয়াইদুল ইলমিয়্যাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি. পৃ. ৭৭; *আহকামুল জারাহাতিত তিব্বিয়্যাহ*, মাকতাবাতুস সাহাবা, ১৯৯৪ (দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ৫৪০
২৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান, *মাওয়াহিবুল জালীল*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ৭৭
২৬. আবদুল কাদির আওদাহ, *আত-আশরীউল জানায়িল ইসলামী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কাতিব আল-গাযালী, তা.বি. খ. ১, পৃ. ৫৭৮

অতএব, অধিক সম্মানী তথা জীবিত ব্যক্তির উপকারার্থে কম সম্মানী তথা মৃত ব্যক্তির ওপর অস্ত্রোপচার যুক্তি পরিপন্থী নয়। **দলীল-৪:** –إن الضرورات تبيح المحظورات

অর্থ: শরী'আত স্বীকৃত প্রয়োজনসমূহ নিষিদ্ধ কাজকে সিদ্ধ করে দেয়।[২৭]

লাশের অস্ত্রোপচার তার মানহানির কারণে মূলত অবৈধ হলেও হাজারো রোগীর প্রাণ রক্ষার তাগিদে বৈধ।

**দলীল- ৫:** কেউ কারো মাল ভক্ষণ করে মারা গেলে শর্ত-সাপেক্ষে তার পেট কেটে মাল বের করার অনুমতি শরী'আতে অনুমোদন রয়েছে। সুতরাং যেখানে সম্পদ উদ্ধারের লক্ষে লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হয়, সেখানে হাজারো রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক লাশের অস্ত্রোপচার অবৈধ হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

**দলীল-৬:** তাজনীস নামক কিতাবে উল্লেখ আছে-

امرأة حامل ماتت، و اضطرب فى بطنها شيء، و كان رأيهم أنه ولد حى، شق بطنها–

অর্থ: গর্ভবতী মহিলা মারা গেছে এবং তার পেটে কী যেন নড়াচড়া করছে। সকলের ধারণা এটা জীবিত শিশু, তাহলে তার পেট কেটে বাচ্চা বের করতে হবে।[২৮]

কেননা এ কাজটি যদিও মৃতের সম্মানের পরিপন্থী, কিন্তু এটা একটি সম্মানিত জীবন রক্ষার মাধ্যম হবে। অতএব জীবন বাঁচানোই উত্তম হবে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিসয় হলো, মাত্র একটি জীবন রক্ষার্থে যদি লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হয়, তাহলে হাজারো রোগীর জীবন রক্ষার্থে অল্প কয়েকটি লাশের অস্ত্রোপচার জায়েয না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

**দলীল- ৭:** –و لو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا، فالصحيح حل **أكله**

অর্থ: (ক্ষুধার্ত ব্যক্তি) মৃত মানুষ ব্যতীত অন্যকিছু না পেলে এমতাবস্থায় তার জন্য ঐ মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়া বৈধ।[২৯]

সুতরাং–يباح للمضطر أكل لحم الإنسان الميت ... و هو أولى، لأن حرمة الحى أعظم

অর্থ: ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করা জায়েয আছে ... আর এ মতটিই প্রণিধানযোগ্য। কেননা, জীবিতের মর্যাদা ও সম্মান মৃতের তুলনায় অধিক।[৩০]

ক্ষুধার তাড়নায় মারা যাওয়ার উপক্রম হলে মাযহাব চতুষ্টয়ের সকলের মতানুযায়ী মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করে হলেও প্রাণ রক্ষা করা জায়েয আছে। অথচ এখানে মৃতের কোনো অপরাধ নেই। তথাপি প্রাণ রক্ষা করা লাশ রক্ষার তুলনায় অধিক আবশ্যক হওয়ায় প্রাণ রক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অতএব, হাজার হাজার রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হওয়াই যুক্তির দাবি।

ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে লাশের অস্ত্রোপচার করাকে যারা না জায়েয মনে করে, তাঁদের উপস্থাপিত দলীলের জবাব-

**১ম দলীলের জবাব:** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ

অর্থ: নিশ্চয় আমি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছি।[৩১]

উল্লিখিত আয়াতটি قطعى الثبوت তথা প্রমাণের দিক থেকে অকাট্য, কিন্তু قطعى الدلالة তথা ধ্রুব অভিব্যক্তি নয়। কারণ লাশের ওপর অস্ত্রোপচার যে মানব সম্মানের পরিপন্থী, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

**২য় দলীলের জবাব:** হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا–

---

২৭. মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আল-বানী, *আল-মাসায়িলুল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ফাতওয়াল শারঈয়্যাহ*, সৌদি আরব, মদীনা, দারুদ-দিয়া, ২০০৬ (দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ২৬১

২৮. আব্দুল গাণী ইবন ইসমাঈল, *আত-ত্বরীকাতুন নাদিয়্যাহ*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৪, পৃ. ৪৬২

২৯. আবু যাকারিয়া ইবন শরফ আন-নববী, *রাওজাতুত তালিবীন*, লেবানন, বৈরুত, দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ২, পৃ. ৫৫১,

৩০. মুহাম্মদ ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, সৌদি আরব, রিয়াদ, দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৯৭ (তৃতীয় প্রকাশ), খ. ১৩, পৃ. ৩৩৯

৩১. আল-কুরআন, ১৭: ৭০

অর্থ: আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতোই অপরাধ।[৩২]

উল্লিখিত হাদীসে قطعى الدلالة তথা ধ্রুব অভিব্যক্তি ও قطعى الثبوت তথা প্রমাণের দিক থেকে অকাট্য, কোনটিই নয়। বরং উভয় দলীলই دليل ظنى তথা অনুমানভিত্তিক দলীল, قطعى বা অকাট্য নয়। আর دليل ظنى তথা অনুমানভিত্তিক দলীল-এর ওপর ভিত্তি করেই লাশের অস্ত্রোপচার করাকে না জায়েয বলা হয়েছে। অথচ حاجة তথা প্রয়োজনের সময় دليل ظنى তথা অনুমানভিত্তিক দলীলেরপরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও অস্ত্রোপচার বৈধ হওয়ার হুকুম দেয়া যায়।

সুতরাং মেডিকেল কলেজে লাশের অস্ত্রোপচারকে জরুরতের পর্যায়ে মেনে না নিলেও অন্ততপক্ষে হাজত (حاجة)-এর অন্তর্ভূক্ত হওয়াকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর লাশের অস্ত্রোপচার জায়েয হওয়ার জন্য প্রয়োজনের (حاجة) পর্যায়ে উন্নীত হওয়াই যথেষ্ট, জরুরতের পর্যায়ে পৌছা আবশ্যক নয়। আর হাজতের সংজ্ঞা ও হুকুমের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী বলেন-

و اما الحاجة فهى الداعية التى يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق و حرج و عسر و صعوبة، و ان لم يكن ذلك الحرج يؤدى الى تلف النفس او المال– و قال بعد اسطر إن الحاجة إنما تعتبر مؤثرة فى تغيير بعض الأحكام الشرعية فى حالتين– إلى أن قال– الحالة الثانية أن يكون أصل الحكم محتملا غير صريح فى الكتاب و السنة أو مجتهدًا فيه، فحينئذٍ ترجح الاباحة فى مواضع الحاجة–

অর্থ: হাজত বলা হয়, ঐ প্রয়োজনকে যা সময় মতো মেটানো না হলে সংকীর্ণতা, ক্ষতি, কষ্ট ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এ কষ্ট ও ক্ষতির কারণে জান-মাল বিনষ্ট হয় না ... হাজতকে শরী'আতের কোনো হুকুম পরিবর্তনের ব্যাপারে দুই অবস্থায় কার্যকর মানা হয়। ... দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো, হুকুমটি এমন হওয়া যা কুরআন ও হাদীসে অস্পষ্টভাবে বর্ণিত, হুকুমটি স্পষ্ট নয় অর্থাৎ, দৃঢ়তার সাথে একথা বলা যাবে না যে, এর উদ্দেশ্য এটিই অথবা হুকুমটি কুরআন ও হাদীস থেকে ইজতিহাদ দ্বারা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন দেখা দিলে নিষেধাজ্ঞার তুলনায় বৈধতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।[৩৩]

সুতরাং হযরত আয়িশা (রা.)-এর হাদীসে যে "মৃতের হাড় ভাঙ্গাকে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমপরিমান অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে" এ হুকুম তখনই দেয়া হয় যখন কোনো প্রয়োজন ছাড়াই এমন করা হয়। প্রয়োজনে এমন করলে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমপরিমান অপরাধ হবে না।

আর এজন্যই মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরাম হযরত আয়িশা (রা.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-

و يحتمل قول عائشة كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا– إذا فعل ذلك عبثًا، و أما أمر هو واجب فلا، ألا ترى الحى لو أصاب أمر فى جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه، لبقر عليه، و لم يكن إثما فى فعل ذلك بنفسه، أو بولده، أو عبده مع أن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت ...، و إحياء نفس أولى من صيانة ميت–

অর্থ: আয়িশা (রা.)-এর হাদীসের অর্থ হলো, বিনা প্রয়োজনে মৃতের হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমপরিমাণ অপরাধ। প্রয়োজনে এমন করলে অপরাধ হবে না। উল্লেখ্য, কোনো জীবিত ব্যক্তির পেটে এমন কিছু পৌছলে যার ফলে সে মৃত্যুমুখী হয়ে পড়ে, তবে যদি ঐ বস্তু তার পেট থেকে বের করা হয় তাহলে তার প্রাণ রক্ষার আশা করা যায়।

৩২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: কবর খননকারী মৃত ব্যক্তির হাড় পেলে সেখানে কবর খুঁড়বে না, খ. ২,পৃ.১০৪, হাদীস নং- ৩২০৭

৩৩. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা*, ঢাকা: সা'দ প্রকাশনী, মিরপুর, জুলাই ২০০৯, পৃ. ১৪০

এমতাবস্থায় তার দেহে অস্ত্রোপচার করা সম্পূর্ণ জায়েয, এতে কোনো গোনাহ হবে না। চাই সে অস্ত্রোপচার নিজ পেটে কিংবা শিশু বা গোলামের পেটে হোক। অথচ জীবিত ব্যক্তির সম্মান মৃতের সম্মান থেকে অধিক ... এবং মৃতের সংরক্ষণের তুলনায় জীবিত ব্যক্তির সংরক্ষণ অধিক শ্রেয়।[৩৪]

যেহেতু মেডিকেল কলেজগুলোতে লাশের অস্ত্রোপচার অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজনে করা হয় না; বরং বাস্তব ও অনিবার্য কারণে হাজারো রোগীর প্রাণ বাঁচানোর লক্ষে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাই উপরোক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হয়ে লাশের অস্ত্রোপচার নিষেধের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

**৩য় দলীলের জবাব:** "লাশের অস্ত্রোপচার করা অঙ্গ-বিকৃতির অন্তর্ভূক্ত। আর শরী'আতের দৃষ্টিতে অঙ্গ-বিকৃতি করা মাকরূহ তাহরীমী বা হারাম।" লাশে অস্ত্রোপচার না করা প্রবক্তাগণের উক্ত অভিমতটি এ মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

কারণ অঙ্গবিকৃতি (مثله) তখনই হারাম ও নিষিদ্ধ, যখন তা বিনা প্রয়োজনে করা হয়। প্রয়োজনে করলে তা নিষেধ বা হারাম নয়। কেননা প্রয়োজনের তাগিদে জীবিত মানুষেরও অঙ্গবিকৃতি করা জায়েয আছে।

যেমন কারোর হাত, পা ও কান ইত্যাদি কোনো অঙ্গে যদি মারাত্মক রোগ দেখা দেয়, যদ্দরুণ তার মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমতাবস্থায় মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলে রোগাক্রান্ত অঙ্গটি কেটে ফেলে দিলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে, তাহলে তার ঐ অঙ্গটি কেটে ফেলে দেয়াকে কেউই না জায়েয বলবে না। যদিও এতে অঙ্গ বিকৃতি করা হয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ উরাঈনের হাদীসেও অঙ্গবিকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম রাখাল হত্যা করে কাফেররা সাদকা ও যাকাতের উট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করে তাদেরকে ধরে আনার পর অঙ্গ বিকৃতি করা হয়েছিল। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে লাশের অস্ত্রোপচার করা না জায়েয নয়।

**৪র্থ দলীলের জবাব:** শরী'আতের দৃষ্টিতে চিকিৎসা করা যদিও ফরয বা ওয়াজিব নয়। তথাপি চিকিৎসার খাতিরে অনেক হারাম বস্তুর ব্যবহার বৈধ হয়ে যায়। যেমন: হারাম খাওয়া, ডাক্তারের সামনে সতর খোলা ও ডাক্তারের জন্য বেগানা রোগীর সতর দেখার অনুমতি থাকা ইত্যাদি। অথচ এগুলো স্পষ্ট হারাম এবং অকাট্য দলীলের (قطعی دلیل) পরিপন্থী।

সুতরাং ফরয-ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যখন চিকিৎসার জন্য সতর খোলা, সতর দেখা ও হারাম খাওয়া জায়েয হয়ে যায়, তখন চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের জন্যও লাশের অস্ত্রোপচার করা বৈধ হয়ে যাবে। এটাই বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত।

**৫ম ও ৬ষ্ঠ দলীলের জবাব:** "চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত্ব করার প্রয়োজনীয়তা মনে করে যদি মেডিকেল কলেজগুলোতে লাশ কাটা-ছেঁড়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে অনেক অসাধু ও অর্থ লিপ্সু ব্যবসায়ী লাশ বেচা-কেনার ব্যবসায় মেতে ওঠবে, লাশের জন্য জীবিত মানুষ হত্যা করবে এবং জোরপূর্বক সরকার লাশগুলো মেডিকেল কলেজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে ইত্যাদি" এসবই অস্ত্রোপচার বিরোধীবাদীগণের কল্পনাপ্রসূত শিশুসুলভ চিন্তা-ভাবনা, যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে অসংখ্য মেডিকেল কলেজ ও ডাক্তার রয়েছে এবং প্রত্যেক দিন হাজার হাজার অপারেশন হচ্ছে। কিন্তু কোনো দিন শোনা যায়নি- অমুক দেশের অসাধু ও অর্থ লিপ্সু ব্যবসায়ীরা লাশ বেচা-কেনার ব্যবসায় মেতে ওঠেছে বা কিছু অসাধু ডাক্তার লা-ওয়ারিশ লাশ বিক্রি করে দিয়েছে। মিডিয়াতেও এমন কোনো খবর প্রচার হয়নি- অমুক সরকার লাশের জন্য জীবিত মানুষ হত্যা করছে বা আত্মীয়-স্বজনদেরকে লাশ না দিয়ে সরকার জোরপূর্বক কোনো লাশ মেডিকেল কলেজে রেখে দিয়েছে।[৩৫]

**৭ম দলীলের জবাব:** (ক) ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে লাশে অস্ত্রোপচার করার এই প্রয়োজনটিকে না জায়েয প্রবক্তাগণ যে ভবিষ্যতের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন, তা ঠিক নয়; বরং এ প্রয়োজনটি বর্তমানেরই অন্তর্ভূক্ত। কেননা বর্তমান প্রয়োজন দু'প্রকার। যথা-

**(১)** প্রকৃত বর্তমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حقيقية)

**(২)** বর্তমানের অন্তর্ভূক্ত বা কার্যত বর্তমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حكمية)

---

৩৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৭
৩৫. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৫

মেডিকেল কলেজগুলোতে লাশের অস্ত্রোপচার কার্যত বর্তমান প্রয়োজন-এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা রোগী আসার পর লাশ কাটা-ছেঁড়া করে ডাক্তারি বিদ্যা শিখে চিকিৎসা করা অসম্ভব। কারণ রোগী আসার পর এ পরিমাণ কালক্ষেপন করলে রোগীর জীবন রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং রোগী আসার পূর্বে লাশ কাটা-ছেঁড়ারমাধ্যমে ডাক্তারি বিদ্যা অর্জন করা কার্যত বর্তমান প্রয়োজন-এর অন্তর্ভূক্ত ( ضرورة قائمة حكمية )। তাই এ ক্ষেত্রে প্রকৃত বর্তমান প্রয়োজনকে (ضرورة قائمة حقيقية) অনুপস্থিত বলা যুক্তি সঙ্গত নয়।

**(২)** প্রয়োজনের ২য় শর্তটি তথা প্রয়োজন দূর করার অন্য আর কোনো বৈধ পদ্ধতি না থাকা। এ বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগযোগ্য নয়। কেননা বানর, শিমপাঞ্জি বা ব্যাঙ কাটার মাধ্যমে মানবদেহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেলেও এ জ্ঞান আর সরাসরি মানুষের লাশ কাটার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা কখনো এক হতে পারে না। উভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অপারেশনের মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা করা খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হয়। আর তা একমাত্র মানব দেহে অপারেশনের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। ব্যাঙ আর বানর কেটে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে আদৌ সম্ভব নয়।

**(৩)**আর ৩য় শর্ত অর্থাৎ না জায়েয কাজ দ্বারা প্রয়োজনটি পূরণ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকাকে এ বলে অনুপস্থিত বলা হয়েছে যে "অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া নিশ্চিত নয়" এ কথাটিও মেনে নেয়া যায় না। কারণ এখানে দৃঢ় বিশ্বাস বা ইয়াক্বীন (يقين) শব্দটি একটি আরবী পরিভাষা, এর অর্থ দলীলের ওপর ভিত্তি করে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসকে স্থাপন করা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইয়াক্বীনের উপস্থিতি কঠিন বিধায় যান্নে গালেব (ظن غالب) তথা ইয়াক্বীনের কাছাকাছি অবস্থাকেই শরী'আত ইয়াক্বীনের স্থলাভিষিক্ত করে "ইয়াক্বীন ও যান্নে গালেব"-কে একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত করেছে। আল্লামা হামভী (রহ.) বলেন-

اليقين طمانينة القلب على حقيقة الشئ، يقال الماء فى الحوض، اذا استقر فيه– و الشك لغة مطلق التردد، و فى اصطلاح الاصول استواء طرفى الشئ، و هو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب الى احدهما، فان ترجح احدهما و لم يطرح الاخر فهو ظن، فان طرحه فهو غالب الظن، و هو بمنزلة اليقين–

**ইয়াক্বীন** (يقين) **বা দৃঢ় বিশ্বাস:** কোনো বস্তুর বাস্তবতার ওপর অন্তরের আস্থা ও নিশ্চয়তাকে ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস বলে। যখন পানি হাউজে স্থির হয়ে যায়, তখন الماء فى الحوض বলা হয়।

**যান্ন (ظن):** কোনো বস্তুর হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে অন্তর যদি কোনো একদিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ ঐ দিককে প্রাধান্য দেয় এবং অন্য দিকটি প্রত্যাখ্যাত না হয়। তাহলে অন্তরে যে দিকে ধাবিত হয়েছে সে প্রাধান্য দিককে "যান্ন" বলে।

**গালিবে যান্ন (غالب ظن):** যদি দ্বিতীয় দিকটি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে প্রাধান্য প্রাপ্ত দিকটিকে "গালিবে যান্ন" বলে এবং গালিবে যান্ন ইয়াক্বীনের স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্থাৎ উভয়টির হুকুম এক ও অভিন্ন।[৩৬]

সুতরাং অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা হওয়ার ইয়াক্বীন তথা নিশ্চিত না হওয়া গেলেও যান্নে গালিব তথা প্রবল ধারণা করা যায়। আর বাস্তবতাও তাই। অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করলে প্রায় রোগীই আরোগ্য লাভ করে, দু'চার জনের ক্ষেত্রে এর বিপরীত হলে তা ধর্তব্য নয়।
তাই চিকিৎসা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের লক্ষে লাশের অস্ত্রোপচার জায়েয হওয়ার জন্য ইয়াক্বীন পর্যন্ত পৌঁছা লাগবে না, যান্নে গালেবই যথেষ্ট।

৩৬. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

মোটকথা, প্রয়োজন দেখা দিলে না জায়েয কাজ জায়েয হওয়ার জন্য যে তিনটি শর্ত রয়েছে, তার সবক'টিই এখানে বিদ্যমান। এগুলোকে অনুপস্থিত বলা সঠিক হবে না। অতএব, চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের লক্ষে প্রয়োজনের কারণে লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ প্রমাণিত হলো।

**ইসলামী শরী'আতে প্লাস্টিক সার্জারি বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অপারেশন করার বিধান**

চিকিৎসাশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষের এই যুগে মানুষ এমন অনেক কিছু করছে যা আগে কেউ কল্পনাও করেনি। সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষে অপারেশন করে মানুষ নিজের চেহারা পর্যন্ত পরিবর্তন করছে। সুতরাং চেহারায় এ ধরনের পরিবর্তন ইসলাম কতটুকু সমর্তন করে তা আলোচনা করা হলো।

বর্তমানে সৌন্দর্যবর্ধন ও ফ্যাশনের নামে অনেকে প্লাস্টিক সার্জারি করে নিজের মুখমণ্ডল ও শরীরের গঠন পাল্টে নেয় আবার অনেকে শারীরিক ত্রুটি নিরাময়েও প্লাস্টি সার্জারি করে থাকে। সহজ ভাষায় শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে শরীরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনাই হচ্ছে প্লাস্টি সার্জারি। এর সাহায্যে দুর্ঘটনায় বা জন্মগত কোনো বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাইরের চেহারা বদলানো যায় এবং শারীরিক কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসা যায়। ইসলামে প্লাস্টিক সার্জারির ব্যাপারে কিছু দিকনির্দেশনা রয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ ধরনের সার্জারিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. প্লাস্টিক সার্জারি (plastic surgery)। দুই. কসমেটিক সার্জারি (cosmetic surgery)। তবে এ দু'টিকে মৌলিকভাবে প্লাস্টিক সার্জারি অপারেশন বলা হয়। প্রয়োজনীয় শারীরিক ত্রুটি সারাতে যে সার্জারি করা হয় একে প্লাস্টিক সার্জারি বলা হয়। ইসলাম এটাকে অনুমোদন দিয়েছে। যেমন, পোড়া বা আঘাতজনিত ক্ষত সারিয়ে তোলা, ক্যান্সারাক্রান্ত অঙ্গ বা টিউমার অপসারণের পর ক্ষতস্থানকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা অথবা ঠোঁটকাটা, তালুকাটা, অতিরিক্ত আঙ্গুল বা অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি দূর করা। একাধিক হাদীস থেকে এ ধরনের অপারেশন বা সার্জারির অনুমতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَفْرَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ اَنَّهُ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ–

অর্থ: আরফাজাহ ইবন আসআদ (রা.) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুলাবের যুদ্ধে তাঁর নাক যখম হয়ে যায়। ফলে তিনি রূপার একটি নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু তাতে নাকে পচন ধরে। তখন রাসূলূল্লাহ (সা.) তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দেন।[৩৭]

এসব হাদীস পর্যালোচনা করলে প্রয়োজনীয় শারীরিক ত্রুটি সারাতে সার্জারি করার বৈধতা বোঝা যায়।

এছাড়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য যে সার্জারি করা হয় তাকে কসমেটিক সার্জারি বলা হয়। যেমন- নাক, চিবুক, ঠোঁট, চোখের পাতা, কান, স্তন ইত্যাদি অঙ্গের সার্জারি করে আকর্ষণীয় করে তোলা। ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উত্তম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি।[৩৮] তাই নিজেকে অসুন্দর মনে করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করা হারাম। পবিত্র কুরআনে এটাকে শয়তানের কর্ম বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ، وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا–

অর্থ: শয়তান বলল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব, তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন

---

৩৭. আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৯, অধ্যায়: সাজসজ্জা, অনুচ্ছেদ: যার নাক যখম হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি না, পৃ. ৫২৭, হাদীস নং- ৫১৬১

৩৮. আল-কুরআন, ৯৫: ৪

করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[৩৯] হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَ الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالِىْ لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ فِىْ كِتَابِ اللهِ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে যে নারী উল্‌কি উৎকীর্ণ করে ও করায়, যে নারী ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং যে নারী দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক বানায়, যদ্দরুণ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন। আমি কেন তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবো না, যাদের ওপর আল্লাহর রাসূল অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং মহান আল্লাহর কিতাবেই তা বিদ্যমান আছে।[৪০] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ–

অর্থ: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: আল্লাহ ঐ নারীর ওপর লানত ও অভিশাপ দিয়েছেন যে অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোজন করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোজন করায় এবং যে নিজের শরীরে উল্কি আঁকে কিংবা অন্যকে আঁকিয়ে দিতে বলে।[৪১]

উল্লেখ্য, واشمة বলা হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষে মহিলাদের হাত, ঠোঁট ও মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন স্থানে সুঁই বা ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে ছিদ্র করে সেখান থেকে রক্ত বের করে সুরমা ও চুনা জাতীয় বস্তু দ্বারা ভরাট করাকে। এতে ঐ স্থানটি সবুজ হয়ে যায়। এতে অনেক কিছুই চিত্রায়ন করা হয়।

এ সমস্ত আয়াত ও হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে আল্লামা তাকী উসমানি বলেন-

اِنَّ كُلَّمَا يَفْعَلُ فِى الْجِسْمِ مِنْ زِيَادَةٍ اَوْ نَقْصٍ مِّنْ اَجْلِ الزِّيْنَةِ بِمَا يَجْعَلُ الزِّيَادَةُ اَوِ النُّقْصَانُ مُسْتَمِرًّا مَعَ الْجِسْمِ وَ بِمَا يَبْدُوْ مِنْهُ اَنَّهُ كَانَ فِىْ اَصْلِ الْخِلْقَةِ هٰكَذَا، فَاِنَّهُ تَلْبِيْسٌ وَ تَغْيِيْرٌ مَنْهِى عَنْهُ، وَ اَمَّا مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ الْمَرْاَةُ لِزَوْجِهَا مِنْ تَحْمِيْرِ الاَيْدِىِّ اَوِ الشِّفَاهِ اَوِ الْعَارِضِيْنَ بِمَا لَا يَلْتَبِسُ بِاَصْلِ الْخِلْقَةِ، فَاِنَّهُ لَيْسَ دَاخِلاً فِى النَّهْىِ عِنْدَ جَمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ– وَ اَمَّا قَطْعُ الاِصْبَعِ الزَّائِدَةِ وَ نَحْوِهَا، فَاِنَّهُ لَيْسَ تَغْيِيْرًا لِخَلْقِ اللهِ– وَ اِنَّهُ مِنْ قَبِيْلِ اِزَالَةِ عَيْبٍ اَوْ مَرْضٍ فَاَجَازَهُ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ–

অর্থ: দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও তা স্থায়ী করার লক্ষে এমনভাবে অপারেশনের মাধ্যমে সংযোজন ও বিয়োজন করা যা দেখলে মনে হয় এটা সৃষ্টিগতভাবেই এমন ছিল।এটা কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের মাঝে সংমিশ্রণ ও সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন বোঝায় বিধায় ইসলামী শরীয়াতে তা সম্পূর্ণ নিষেধ। পক্ষান্তরে, মহিলারা স্বামীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের হাত, ঠোঁট ও গণ্ডদেশ লাল করে যে সাজ-সজ্জা করে তা মূল সৃষ্টির সাথে কৃত্রিম সৃষ্টির সংমিশ্রণ হয় না। তাই এগুলো অধিকাংশ আলেমের নিকট নিষেধাজ্ঞার আওতাভূক্ত নয়। যেমনিভাবে অতিরিক্ত আঙ্গুল ইত্যাদি কেটে ফেলাও আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন করার নামান্তর নয়, বরং এতে রোগ ও ত্রুটি দূর করা হয় বিধায় অধিকাংশ আলেম এর অনুমিত দিয়ে থাকেন। তবে কিছু সংখ্যক আলেম এর নিষেধও করেন।[৪২]

---

৩৯. আল-কুরআন, ৪: ১১৮-১১৯

৪০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক, অনুচ্ছেদ: যে নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করায়, খ. ২, পৃ. ১৬৭৭, হাদীস নং- ৫৯৪৮

৪১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পোশাক, অনুচ্ছেদ: পরচুলা লাগানো, খ. ২, পৃ. ১৬৭৫, হাদীস নং- ৫৯৩৭

৪২. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*, লেবানন: বৈরুত, দারু ইহয়াহ আত্-তুরাস আল-'আরাবি, ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ), খ. ৪, পৃ. ১৬৯

**ইসলামী শরী'আর দৃষ্টিতে সিজার করার বিধান**

মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করার ডাক্তারি পদ্ধতিকে সিজার বলা হয়। বর্তমানে সিজারিয়ান ডেলিভারির হার দিন দিন বেড়েই চলছে। তবে আমাদের দেশে সিজারিয়ান ডেলিভারির সংখ্যা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি। শুধু ডাক্তার নয়বর্তমানে রোগীরাও সিজার করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। বিশেষ করে উচ্চ বিত্ত শ্রেণির মহিলারা। নরমাল ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও শুধুমাত্র ব্যথা সহ্য করার ভয়ে অজস্র টাকা খরচ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অথচ উন্নত দেশে প্রেগনেন্সি-এর প্রথম থেকেই কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে গর্ভবতীদের নরমাল ডেলিভারির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। একজন গর্ভবতী মায়ের নরমাল ডেলিভারির সম্ভাবনা থাকলে তাকে নরমাল ডেলিভারির জন্য চেষ্টা করাই উচিত। সিজারের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার ও অজ্ঞানজনিতসহ আরো অনেক জটিলতার সম্ভাবনা থাকায় এটা মায়ের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সিজার করার কারণে মহিলারদের ফার্টিলিটি (বাচ্চা ধারনের ক্ষমতা) অনেকাংশে কমে যায়। সিজারে জন্ম নেয়া বাচ্চাদের তুলনায় নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেয়া বাচ্চারা কষ্ট সহিষ্ণু হয় এবং তাদের শ্বাসকষ্ট ও অ্যাজমাজনিত সমস্যা কম হয়।[৪৩]

ইউরোপ আমেরিকার শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ ডেলিভারি সিজারের মাধ্যমে হয়। এখানকার ডাক্তাররা যেকোনো অস্ত্রোপচার বা অপারেশন যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন। কারণ যেকোনো অপারেশনেই অনেক বেশি রিস্ক নিতে হয়। এরপরও অনেক ক্ষেত্রে মা ও বাচ্চার স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে ডাক্তাররা সিজার করা নিরাপদ মনে করে থাকে। তাই যেসব ক্ষেত্রে সিজার ব্যতীত আর কোনো উপায় থাকে না, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

০১. বাচ্চা প্রসবের রাস্তা আনুপাতিক হারে ছোট হলে।

০২. মায়ের প্রেসার তথা রক্তচাপ অনেক বেশি হলে, যা কোনো ঔষধেও কমে না এবং সাথে খিঁচুনী বা একলামশিয়া থাকে।

০৩. পেটের ভেতর বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হলে।

০৪. গর্ভফুল জরায়ুর মুখে থাকলে।

০৫. বাচ্চা ডেলিভারির পূর্বেই গর্ভফুল জরায়ুর গা থেকে ছুটে রক্তক্ষরণ শুরু হলে।

০৬. বাচ্চা জরায়ুতে আড়াআড়িভাবে বা উল্টে থাকলে।

০৭. ডেলিভারির সময় জরায়ু ফেটে গেলে।

০৮. বাচ্চা প্রস্রবের রাস্তায় বড় কোন টিউমার কিংবা মাংসের টুকরা থাকলে।

০৯. পূর্বে VVF (vesico-vaginal fistula)-এর অপারেশন হলে।

*** যেসব ক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনা করে সিজার করলে সবচেয়ে ভালো-**

০১. জরায়ুতে একসাথে একাধিক বাচ্চা থাকলে।

০২. বাচ্চার মাথা বড় হলে।

০৩. আগের বাচ্চা সিজারে হলে।

০৪. ডেলিভারির ব্যথা শুরু হওয়ার আগে যেকোন পরিমাণ রক্তক্ষরণ শুরু হলে।

০৫. মা নিজ থেকে সিজার করতে চাইলে।

০৬. সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ঔষধেও ডেলিভারির ব্যথা না ওঠলে।

০৭. বেশি বয়সে প্রথম গর্ভবতী হলে।

০৮. বাচ্চা জরায়ুতে যে পানিতে থাকে তা কমে গেলে।

০৯. ডেলিভারির সম্ভাব্য তারিখ থেকে বেশি দেরি করে ডাক্তারের কাছে গেলে।[৪৪]

*** সিজারের হার বাড়ার কারণ-**

০১. আলট্রাসনোগ্রাফীর প্রচলনের ফলে অনেক জটিলতাই এখন ধরা পড়ে, যা আগে জানার কোনো উপায় ছিল না। যেমন- জরায়ুতে কয়টা বাচ্চা, গর্ভফুল কোথায় আছে, বাচ্চার মাথা বড় কিনা, বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে কিনা,

---

৪৩. *https://www.rtvonline.com/lifestyle.*"সিজার করলে মা ও সন্তানের ক্ষতি কখনোই পূরণ হবার নয়", আপডেট: ১৭.০২.২০২০(থেকে উদ্ধৃত)

৪৪. সোনালী সাহা, *https://www.platform-med.org.*"সিজার: কেন করবো, কখন করবো" (থেকে উদ্ধৃত)

পেটের মধ্যে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা, বাচ্চা যে পানিতে আছে তার পরিমাণ ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি। এসবের কোনটায় হেরফের দেখলে ডাক্তারগণ নীতিগতভাবেই সিজার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

০২. বর্তমানে হাইপারটেনশন নির্ণয় করা খুবই সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু আগের মানুষেরা এবিষয়ে জানতো না এবং আমলেও নিত না। এমন ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের অবশ্যই সিজারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

০৩. বর্তমান যুগে পড়াশুনা আর ক্যারিয়ার গড়তে অনেক মেয়েরই বাচ্চা নিতে দেরি হয়ে যায়। সিজারের হার বৃদ্ধি পাওয়ার এটাও একটা কারণ।

০৪. কিছু কিছু অসাবধান রোগী ডেলিভারির সম্ভাব্য তারিখের অনেক পরে আসে, যাদের জন্য মেডিকেল ট্রায়াল তথা ঔষধ দিয়ে প্রস্রব ব্যথা ওঠানোর জন্য অপেক্ষা করা যায় না। আর সময় পার করে আসার কারণে বাচ্চা যে পানিতে থাকে, তাও কমে যায়। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই ডাক্তারকে সিজারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

০৫. বন্ধ্যাত্বের সংখ্যা বাড়ার কারণে চিকিৎসায় ovulation inducing drug বেশি ব্যবহার করায় অনেক মায়েরই এখন একসাথে একাধিক সন্তান গর্ভে আসছে। ফলশ্রুতিতে সিজারের হার বাড়ছে।

০৬. আগের মায়েদের মাঝে সচেতনতা কম ছিল বিধায় ঘন ঘন গর্ভধারণ করতো আর প্রসবের সময় সন্তানের ঝুঁকি নিতে এতো মাথা ঘামাতো না। কিন্তু বর্তমানের মায়েরা অনেক সচেতন। প্রস্রবকালীন জটিলতা এড়াতে অনেকে স্বেচ্ছায়ই সিজার করতে ডাক্তারকে অনুরোধ করে থাকে।

০৭. ডেলিভারির বেশির ভাগ রোগী এমন শেষসময়ে ডাক্তারের নিকট আসে যে সময়ে ডাক্তারের হাতে সিজার ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

০৮. একটি বাচ্চা সিজারে হওয়ার পর পরবর্তী বাচ্চার ক্ষেত্রে সিজার করাই যেহেতু বেশি নিরাপদ, সেহেতু সিজার নিজেই সিজারের হার বৃদ্ধির একটি কারণ।[৪৫]

মায়ের পেটেবাচ্চা থাকাকালীন মা ও বাচ্চার ৪টি অবস্থা হতে পারে। প্রত্যেক অবস্থায় ইসলামেরভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন অবস্থাসমূহ ও এর বিধান উল্লেখ করা হলো-

**০১. মা এবং পেটের বাচ্চা উভয়ে মৃত:** এ অবস্থায় মায়ের পেট কেটে তথা সিজার করে বাচ্চা বের করা জায়েয নেই। পেট না কেটেই বাচ্চাসহ মাকে দাফন করতে হবে।

**০২. মা মৃত এবং পেটের বাচ্চা জীবিত:** এমতাবস্থায়সর্বসম্মতিক্রমে হুকুম হলো, মৃত মায়ের পেটের বাম পার্শ্ব কেটে বাচ্চা বের করবে। এমন করা যদিও মায়ের সম্মানের পরিপন্থী, কিন্তু মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিত বাচ্চার হক অনেক বেশি। তাই বাচ্চার জীবন রক্ষার্থে মৃত মায়ের ওপর অস্ত্রোপচারই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

উল্লেখ্য, মৃত মায়ের পেটে বাচ্চা জীবিত কি না তা বোঝার ০৩টি উপায় রয়েছে। যথা-

(ক) বাচ্চা নড়াচড়ার মাধ্যমে।

(খ) আল্ট্রসনোগ্রাফ-এর মাধ্যমে।

(গ) ভেজা কাপড়ের মাধ্যমে অর্থাৎ লাশের পেটের উপর একটি ভেজা কাপড় রেখে দিলে কাপড়টি যদি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে বাচ্চা জীবিত আছে। আর কাপড় না শুকিয়ে ভেজা থাকলে বুঝতে হবে পেটের বাচ্চা মৃত।

**০৩. বাচ্চা মৃত এবং মা জীবিত:** এ অবস্থায় পূর্ণ বাচ্চাকে যদি মায়ের পেট না কেটে কোনোভাবে বের করা সম্ভব হয়, তাহেল সে পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে, অন্যাথায় যোনিদ্বার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে বের করবে।[৪৬]

উল্লেখ্য, এমতাবস্থায় বের করার তুলনায় যদি সিজারের মাধ্যমে বের করা সহজ হয়, তাহলে তুলনামূলক সহজ পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

**০৪. মা ও বাচ্চা উভয়ই জীবিত:** এমতাবস্থায় অতীত ও বর্তমান ফকীহগণের মধ্যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যথা-

---

৪৫. ডা. সায়েদা ইসলাম, *https://www.platform-med.org.*"সিজারের হার বাড়ার কারণ", (থেকে উদ্ধৃত)

৪৬. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, *আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ৫, পৃ. ৪৪০

**(ক) অতীত ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গি:** এমতাবস্থায় মা ও বাচ্চা উভয়কে আপন অবস্থায় রেখে দেবে, এতে উভয়ই মৃত্যু মুখে পতিত হোক কিংবা জীবিত থাকুক অথবা দু'জনের কোনো একজন মারা যাক, আর অন্যজন জীবিত থাকুক অর্থাৎ এ অবস্থায় অপারেশন করা যাবে না। কারণ, অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা বের হলে বাচ্চা জীবিত থাকা অনিশ্চিত। আর পেট কাটার কারণে (ঐ যুগ হিসেবে) মায়ের মৃত্যু অবধারিত। অতএব, সম্ভাব্য জীবনের জন্য অপারেশনের মাধ্যমে মায়ের নিশ্চিত মৃত্যুর পথ অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তেমনিভাবে মাকে বাঁচানোর লক্ষে যোনিদ্বারে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চাকে কেটে বের করারও অনুমতি নেই। কেননা একটি প্রাণকে বাঁচানোর জন্য আরেকটি প্রাণ হত্যার অনুমতি শরীআতে নেই। জীবিত থাকার দিক দিয়ে মা ও বাচ্চা উভয়ই সমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উভয়কে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেবে।এতে উভয়জন অথবা যে কোন একজন মারা গেলে কেউ অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে না।[৪৭]

**(খ) বর্তমান ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গি:** বর্তমানের ন্যায় অতীতকালে আধুনিক চিকিৎসা তথা যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও ব্যান্ডেজের তেমন কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। তাই কারো পেট কাটা হলে তার বেঁচে থাকা অকল্পনীয় ছিল বিধায় অতীতকালে মা ও বাচ্চাকে স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিল। উক্ত হুকুম বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, বর্তমানে এমন উন্নতমানের সিজারের সিস্টেম রয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে বাচ্চা হওয়ার তুলনায় সিজারে বাচ্চা হওয়া সহজ। তাই এ অবস্থায় মা ও বাচ্চাকে নিজ অবস্থায় না রেখে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা বের করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ এতে মা ও বাচ্চা উভয়ই সুস্থ থাকা অনেকটা নিশ্চিত।[৪৮]

**মাকে বাঁচানোর লক্ষে গর্ভস্থ সন্তান মেরে ফেলার বিধান**

পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে মা এবং সন্তান উভয়ই জীবিত, কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের মতে গর্ভস্থ সন্তানকে মেরে বের না করা হলে মা ও সন্তান উভয়ই মারা যাবে, আর সন্তান মেরে ফেললে মায়ের জীবিত থাকা অনেকটা নিশ্চিত। এমতাবস্থায় শরী'আর দু'টি বিধান রয়েছে-

**(এক)** গর্ভস্থ সন্তানের বয়স যদি ছয় মাস বা ততোধিক হয়, তাহলে জীবিত থাকার ক্ষেত্রে মা ও সন্তান উভয়ই এক সমান বিধায় একজনের জীবনকে আরেক জনের ওপর প্রাধান্য দেয়া অযৌক্তিক। এতে উভয়জন কিংবা যে কোনো একজন মারা গেলে যেহেতু এর দায়ভার কারো ওপর বর্তাবে না, তাই একজনকে মেরে অপরজনকে বাঁচানোর পদক্ষেপ নেয়া বৈধ হবে না।

و اذا اعترض الولد فى بطن الحامل و لم يجدوا سبيلا لاسخراج الولد الا بقطع الولد إربا إربا، و لو لم يفعلوا ذلك يخاف هلاك الأم، قالوا إن كان الولد ميتا فى البطن لا بأس به، و إن كان حيا لم يجز أن يقطع الولد إربا إربا، لأنه قتل النفس المحترمة لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه، و ذلك باطل-

অর্থ: গর্ভবতী মহিলার পেটে বাচ্চা যদি প্রস্থিত অবস্থায় থাকে এবং খণ্ড করে বের করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় না থাকে, আর এমন না করলে মায়ের মারা যাওয়ারও আশঙ্কা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেন, পেটের বাচ্চা যদি মৃত হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। আর বাচ্চা যদি জীবিত হয়, তাহলে বাচ্চাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে বের করা জায়েয নেই। কেননা এটা একটি সম্মানিত জীবনকে তার পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের অপরাধ ব্যতীত আরেকটি জীবন বাঁচানোর লক্ষে হত্যা করা হচ্ছে, যা একেবারেই অবৈধ।[৪৯]

উল্লিখিত বর্ণনায়, যদিও ছয় মাসের কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু উদ্দেশ্য তাই। তবে বর্তমানে সাধারণত এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয় না। কারণ সিজারের মাধ্যমে সন্তান বের করে আনলে মা ও সন্তান উভয়ই বেঁচে যায়। তারপরও সন্তান মারা গেলে, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলা হবে না; বরং সে মারা গেছে বলতে হবে। তাই এর দায়ভার কারো ওপর বর্তাবে না।

**(দুই)** গর্ভস্থ সন্তানের বয়স যদি ছয় মাসের কম হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে মাকে জীবিত রাখার স্বার্থে সন্তানকে মেরে ফেলার অবকাশ রয়েছে। কেননা ছয় মাসের পূর্বে বাচ্চা জন্ম নিলে অথবা সিজারের মাধ্যমে বের করে আনলে বাচ্চার জীবিত

---

৪৭. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪০
৪৮. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৪৯. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪০

থাকাটা প্রায় অনিশ্চিত। সুতরাং এখানে যদিও বাচ্চা জীবিত কিন্তু ছয় মাসের কম হওয়ার কারণে সে কোন অবস্থাতেই বাঁচবে না। তাকে নিজ অবস্থায় রেখে দিলে মা এবং সন্তান উভয়ই নিশ্চিত মারা যাবে । পক্ষান্তরে, তাকে মেরে মাকে জীবিত রাখলে মা বাঁচবে। তাই উভয়জন মারা যাওয়ার পরিবর্তে মাকে জীবিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং সন্তানকে পেটে রেখে যদি জীবিত রাখার সব ধরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বিজ্ঞ ডাক্তারগণ এ কথা বলেন যে বাচ্চাকে পেটে রাখা মায়ের মৃত্যুর কারণ হবে, তাহলে শুধু এ ক্ষেত্রে বড় ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের লক্ষে বাচ্চাকে মেরে ফেলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তাই ফাতওয়ার কিতাবে বলা হয়েছে-

و بعد إكمال أربعة اشهر للحمل لا يحل إسقاطة حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها، و ذلك بعد إستفادة كافة الوسائل لإنقاذ حياته، و إنما رخص الاقدام على إسقاطه بهذه الشروط، دفعا لأعظم الضررين، و جلبا لعظمى المصلحتين–

অর্থ: বাচ্চার বয়স চার মাস হয়ে গেলে এ বাচ্চা গর্ভপাত করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি বাচ্চাকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টার পর একাধিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলেন যে, বাচ্চাকে তার মায়ের পেটে রেখে দিলে এ বাচ্চা তার মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে দুই ক্ষতির মধ্য হতে মারাত্মক ক্ষতিকে প্রতিহত করার ও বড় উপকারকে অর্জনের লক্ষে বাচ্চা গর্ভপাত করা বৈধ হবে।[৫০]

এটি নিম্নের উদাহরণের মতো–جواز الرمى إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين

অর্থ: মুসলিম ও অমুসলিমদের যুদ্ধের সময় যদি কাফেররা মুসলমান বাচ্চাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে তাদের দিকে তীর, গুলি ইত্যাদি নিক্ষেপ করা বৈধ। যদিও এতে মুসলমান বাচ্চারা মারা যায়।[৫১]

কেননা তীর বা গুলি নিক্ষেপ না করলেও ঐ বাচ্চাগুলোর জীবন কাফেরদের হাতে নিশ্চিত নয়। আর তীর বা গুলি নিক্ষেপ করলে কাফেররা পরাজিত হবে, এতে বহু মুসলমানের জীবন নিশ্চিত।কারণ তীর বা গুলি নিক্ষেপ না করার ক্ষেত্রে কাফেররা বিজয়ী হলে তারা হাজারো মুসলমানের জীবন নাশ করে দেবে। আর মুসলমান বাচ্চাদের (যাদেরকে কাফেরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে) দিকে তীর বা গুলি নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে মুসলমানরা বিজয়ী হলে কিছু মুসলিম বাচ্চাদের অনিশ্চিত জীবন নাশ হবে। কিন্তু হাজারো মুসলমানের জীবন রক্ষা হবে। তাই অনিশ্চিত জীবন নাশ করে নিশ্চিত জীবন রক্ষা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পূর্বোক্ত অবস্থায়ও ছয় মাসের কম বয়সের বাচ্চার অনিশ্চিত জীবনকে হত্যা করে মায়ের নিশ্চিত জীবনকে রক্ষা করা হবে মাত্র। তাই একে অযৌক্তিক বলা যাবে না।[৫২]

৫০. ড. কাহতান আবদুর রহমান আদ-দাররিয়্যি, *হুকমুল ইজহাদে ফিল ফিকহিল ইসলামিয়্যি*, লেবাবন: বৈরুত, বুকস পাবলিশার্স, ২০১৮,পৃ. ১৮৯,

৫১. মুহাম্মদ খালিদ আল-তালাছি, *শারহুল মাজিল্লাতি*, লেবানন, বৈরুত, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৬৩

৫২. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: টেস্টটিউব, ক্লোনিং, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত ও এইডস-এর বিধি-বিধান

### ইসলামী শরী'আর আলোকে টেস্টটিউব (Test Tube) সন্তানের বিধান

একজন স্বাভাবিক শিশুর জন্ম প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৮০ শতাংশ দম্পতির চেষ্টার প্রথম বছরের মধ্যেই সন্তান হয়ে থাকে। ১০ শতাংশ দম্পতির দ্বিতীয় বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। বাকি ১০ শতাংশের কোনো না কোনো কারণে সন্তান ধারণে অসুবিধা হয়ে থাকে এবং তাদের জন্যই টেস্টটিউব পদ্ধতি চিকিৎসা দরকার হয়। আর টেস্টটিউব হচ্ছে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় একটি আধুনিক পদ্ধতি। এ নিয়ে অনেকের মনেই রয়েছে নানা প্রশ্ন ও ভুল ধারণা। অনেকেই মনে করে টেস্টটিউব বেবির জন্ম হয় টিউবের মধ্যে। আসলে তা নয় কারণ একটা টেস্টটিউব বেবির জন্ম টিউবের ভেতর হয় না। যদিও টেস্টটিউব বেবির জন্য সংগ্রহ করা ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর নিষেক ঘটে ল্যাবরেটরিতে। একজন স্বাভাবিক গর্ভধারিণী নারীর জরায়ুতে বেড়ে ওঠা শিশুর জীবন প্রণালীর সঙ্গে টেস্টটিউব বেবির জীবন প্রণালীর কোনো পার্থক্য নেই। তাছাড়া টেস্টটিউব বেবি জন্মদানের প্রক্রিয়াটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নির্দিষ্ট কিছু কারণে বন্ধ্যাত্ব হলে সেক্ষেত্রে টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। নি:সন্তান দম্পতি এই চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

পৃথিবীর প্রথম টেস্টটিউব বেবির নাম লুইস ব্রাউন । সে একজন মেয়ে । ১৯৭৮ সালে ২৫ জুলাই ব্রিটেনে লুইসের জন্ম ছিল বিংশ শতাব্দীর মেডিকেল ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক।[৫৩] বাংলাদেশে স্কয়ার হাসপাতালে প্রথম টেস্টটিউব বেবির জন্ম হয় ২০০১ সালে।

কেউ কেউ মনে করে, টেস্টটিউব বেবি কৃত্রিম উপায়ে জন্ম দেয়া কোনো শিশু। কাজেই কৃত্রিম উপায়ে এভাবে সন্তান লাভে ধর্মীয় বাধা থাকতে পারে। কিন্তু টেস্টটিউব বেবির বিষয়টি মোটেই তা নয়। বিভিন্ন রোগের যেমন বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি বন্ধ্যাত্ব রোগের অনেক চিকিৎসার মধ্যে এটিও একটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিরও বিভিন্ন কৌশল রয়েছে।

টেস্টটিউব পদ্ধতি বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার প্রথম বা একমাত্র পদ্ধতি নয়। এই পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেওয়ার চেষ্টা তখনই করা হয়, যখন বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার অন্য সব পদ্ধতি ব্যর্থ হয়।সন্তান না হওয়ার পেছনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের বা যেকোন একজনের সমস্যা থাকতে পারে।সন্তান জন্ম দানের ক্ষেত্রে যখন কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে না পাওয়া যায়, তখন তাকে ব্যাখ্যাহীন বন্ধ্যাত্ব বলে।

**টেস্টটিউব চিকিৎসা পদ্ধতির ধরণ:** বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় টেস্টটিউব পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয় ফলিকুলার পরিপক্বতার এবং ডিম্বাশয়ে ডিম্বস্থলন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। গর্ভধারণের জন্য মেডিকেল টেস্ট করার জন্য স্ত্রীকে কমপক্ষে দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। রজঃস্রাবের ৩ দিন পর থেকেই শুরু হয় টেস্টটিউব চিকিৎসার প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট। এ সময় জরায়ুর আবরণকে ঘন রাখার প্রয়োজন হলে স্ত্রীকে বিশেষ হরমোন গ্রহণ করতে হয়। টেস্টটিউব প্রক্রিয়াকে সফল করতে উন্নত বিশ্বের অনেক ক্লিনিকে এখন স্বাভাবিক চিকিৎসার সঙ্গে আকুপাংচার ও হিপনোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। অন্যসব ঠিক থাকলে এ দুটো চিকিৎসা জাইগোট গ্রহীতার গর্ভধারণের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ডিম্বাশয়ে একাধিক রজঃস্রাবের গ্রন্থি তৈরি হলেই ডিম্বাণু পৃথক করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের করতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ আলট্রাসাউন্ড সূঁচের সাহায্য। ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে রজঃস্রাবী গ্রন্থি থেকেই ল্যাবরেটরিতে ডিম্বাণু পৃথক করা হয়। এই পৃথকীকরণে সময় লাগে মাত্র ২০ মিনিট। তারপর সেটিকে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর ল্যাবে সংরক্ষণ করা হয়।একই সময়ে স্বামীর অসংখ্য শুক্রাণু সংগ্রহ করে তা থেকে ল্যাবে বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয় সবচেয়ে ভালো জাতের একঝাঁক শুক্রাণু। তারপর অসংখ্য সজীব ও অতি ক্রিয়াশীল শুক্রাণুকে নিষিক্তকরণের লক্ষে ছেড়ে দেয়া হয় ডিম্বাণুর পেট্রিডিশে।

সংগৃহীত শুক্রাণুগুলোর সঙ্গে সেই ডিম্বাণুকে একসঙ্গে রাখা হয়। এ মিশ্রণে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর অনুপাত থাকে ৭৫০০০:১। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর এই পেট্রিডিশটিকে সংরক্ষণ করা হয় মাতৃগর্ভের অনুরূপ পরিবেশের একটি ইনকিউবিটরে। ইনকিউবিটরের মধ্যে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের পরই বোঝা যায় নিষিক্তকরণের পর ভ্রূণ সৃষ্টির সফলতা সম্পর্কে।

---

৫৩. মনিরুল হক ফিরোজ, *http://www.risingbd.com/sciencead-technology/necienciws.* "বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি", ২৫.০৭.২০১৮ (থেকে উদ্ধৃত)

অত:পর ডিম্বাণুটি একটি বিশেষ গ্রোথ মিডিয়ামে রাখা হয়। যাতে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে পূর্ণাঙ্গ জাইগোট তথা ভ্রূণ তৈরি হতে পারে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণূটি ৬-৮টি কোষের একটি গুচ্ছে পরিণত হয়। এ অবস্থাতেই কোষগুলো নারীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়।

স্ত্রীর পরিণত ডিম্বাণু অত্যন্ত সন্তর্পণে বের করে আনা ভ্রূণ সৃষ্টির পর সেটিকে একটি বিশেষ নলের মাধ্যমে জরায়ুতে সংস্থাপনের জন্য পাঠানো হয়। এখান থেকে সর্বোচ্চ তিনটি ভ্রূণকে নারীর গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করা হয়। জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পরই তা চূড়ান্তভাবে বিকাশ লাভের জন্য এগিয়ে যেতে থাকে। যার ফলে জন্ম নেয় টেস্টটিউব বেবি। সতরাং টেস্টটিউব বেবি মাতৃগর্ভেই বেড়ে ওঠে এবং সেখান থেকেই জন্ম নেয়। কোনো টেস্টটিউবের নলে এই শিশু বেড়ে ওঠে না। স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়া শিশুর সঙ্গে টেস্টটিউব বেবির জন্মদানের প্রক্রিয়ায় পার্থক্য এটুকুই যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয়া শিশুর পুরোটাই সম্পন্ন হয় মায়ের ডিম্বনালি এবং জরায়ুতে। আর টেস্টটিউব বেবির ক্ষেত্রে স্ত্রীর ডিম্বাণু এবং স্বামীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে সেটিকে একটি বিশেষ পাত্রে রেখে বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয় নিষিক্তকরণের জন্য। নিষিক্তকরণের পর সৃষ্ট ভ্রূণকে স্ত্রীর জরায়ুতে সংস্থাপন করা হয়। সূচনার এই সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টাতে শিশু একদম স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার মতোই মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠে।

এতোকিছুর পরও টেস্টটিউব চিকিৎসার এ সফল গর্ভধারণের সম্ভাবনা মাত্র ২০-৩০%। নির্দিষ্ট কয়েকটি মার্কিন ক্লিনিক ৫০% পর্যন্ত নিশ্চয়তা দিতে পারে। তবে এ সফলতার সম্ভাবনা স্ত্রীর বয়স, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গুণগত মান, প্রজননে অক্ষমতার মেয়াদ, জরায়ুর স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল।[৫৪]

**টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান জন্মদানে ইসলামের বিধান**

মৌলিকভাবে টেস্ট টিউবের মাধ্যমে সন্তানজন্মদানের পদ্ধতি দু'ধরণের হয়ে থাকে। যথা:

(১) স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণে সন্তান জন্ম দেয়া।

(২) পর পুরুষ ও পর স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণে সন্তান জন্ম দেয়া।

কিছু আলেমের মতে, উক্ত দু'টি পদ্ধতিই নিম্নবর্ণিত কারণে না জায়েয। যথা:

**প্রথমত** এ ক্ষেত্রে পুরুষকে মৈথুনের মাধ্যমে বীর্য বের করতে হবে। আর শরী'আতের দৃষ্টিতে মৈথুন জায়েয নয়। **দ্বিতীয়ত** পুরুষ এবং নারী অথবা কমপক্ষে নারীকে সতর খুলতে হবে। অথচ ভীষণ অপারগতা ছাড়া ডাক্তারদের সামনেও সতর খোলা জায়েয নেই। **তৃতীয়ত** পদ্ধতিগুলো অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। আর শরী'আতের স্বভাব হলো অস্বাভিক কাজসমূহ হতে বিরত রাখা। **চতুর্থত** শরী'আত যে সমস্ত অপারগতার কারণে বেপর্দা হওয়া ও সতর খোলার অনুমতি দিয়েছে, সে অপারগতাগুলো دفع مضرت তথা ক্ষতি দূর করার আওতাভূক্ত। পক্ষান্তরে উপরোক্ত সন্তান জন্মদানের জন্য পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা جلب منفعت তথা উপকার অর্জনের আওতাভূক্ত। আর শরীআতের দৃষ্টিতেই مضرتدفع তথা ক্ষতি দূরীকরণ ও جلب منفعت তথা উপকার অর্জন এক নয়। সুতরাং ক্ষতি দূর করার সাথে তুলনা করে উপকার অর্জনের হুকুম দেয়া বৈধ হবে না বিধায় টেস্টটিউব জায়েয নয়।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেমের মতে, টেস্ট টিউবের মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করা জায়েয এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি না জায়েয। তাঁদের স্বপক্ষে যুক্তি ও দলীলগুলো নিম্নরূপ-

**(এক):**–الاصل فى الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية، و منهم الكرخى و المرغينانى صاحب الهداية

কুরআন ও হাদীসে কোনো বস্তু সম্পর্কে জায়েয এবং না জায়েয কোনোকিছু বর্ণিত না থাকলে কোনো কোনো হানাফী আলেম যেমন ইমাম কারখী ও হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম মারাগনানীর মতে তা মৌলিকভাবে জায়েয স্বীকৃত হয়। একে না জায়েয বলা যাবে না।[৫৫]

---

৫৪. ডা. নুসরাত জাহান, *www.jugantor.com/lifestyle.* "টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে যত ভুল ধারণা", ১৬.০১.২০১৯ (থেকে উদ্ধৃত)
৫৫. মাওলানা যায়নুল আবেদীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৫

সুতরাং টেস্ট টিউবের উল্লিখিত পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে যেহেতু স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি, তাই উক্ত পদ্ধতিগুলোকে না জায়েয বলা যাবে না।

**(দুই):** عَنْ مَعْقَلَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ– فَاِنِّىْ مَكَاثِرُ الْاُمَمِ–

অর্থ: মাকাল বিন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- তোমরা এমন মহিলা বিবাহ করো, যে খুব ভালবাসে ও অধিক সন্তান জন্ম দেয়। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) অধিক উম্মত নিয়ে গর্ব করবো।[৫৬]

উল্লিখিত হাদীসে অধিক সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই টেস্ট টিউবের মাধ্যমে জন্ম দিলেও যেহেতু সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এ পদ্ধতিতেও সন্তান জন্ম দেয়া উক্ত হাদীসের আওতাভূক্ত হয়ে বৈধ হওয়া উচিত।

**(তিন):** ফাতাওয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে-

رجل وطی جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه فی شئ، فاستدخلته فی فرجها فعلقت عند ابی حنيفة ان الولد ولده و تصير الجارية ام ولد له–

অর্থ: যদি কোনো ব্যক্তি তার দাসীর সাথে লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে সঙ্গম করে বীর্যপাত ঘটায় এবং দাসী সেই বীর্য কোনো পাত্রে সংরক্ষণ করে পরবর্তিতে তার যৌনদ্বারে প্রবেশ করানোর ফলে গর্ভবতী হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, সন্তান ঐ পুরুষেরই হবে এবং উক্ত দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।[৫৭]

**টেস্টটিউব না জায়েয প্রবক্তাগণের বর্ণিত কারণসমূহের জবাব**

**১ম কারণের জবাব:** টেস্ট টিউবের জন্য সাধারণত পুরুষের বীর্য মৈথুন বা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বের করতে হয়। যদিও তা মাকরূহ তাহরীমী, কিন্তু সর্বাবস্থায় তা না জায়েয নয়। প্রয়োজন দেখা দিলে এর অনুমতিও দেয়া হয়েছে।ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে-

و كذا الاستمناء بالكف، و إن كره تحريما، بل لو تعين الخلاص من الزنا به وجب لأنه أخف–

অর্থ: যদিও হস্তমৈথুন মাকরূহে তাহরীমী, তবে যিনা থেকে যদি পরিত্রাণ পাওয়ার এটাই একমাত্র পন্থা হয়ে থাকে, তাহলে এ পন্থা অবলম্বন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা এটা যিনা থেকে অনেক লঘু।[৫৮]

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে- فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به، فالرجاء أن لا يعاقب

অর্থ: যৌন উত্তেজনা অনেক বেড়ে গেলে তা শান্ত করার লক্ষে হস্তমৈথুন করলে আশা করা যায় এতে কোনো শাস্তি হবে না।[৫৯] সিরাজুল ওয়াহ্হাজ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

إن أراد بذٰلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب و كان عزبا لا زوجة له و لا أمة، أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر– قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه، أما إذا فعله لاستجلاب الشهوة، فهو آثم–

অর্থ:যদি খুব বেশি যৌন নিপীড়নের কারণে হস্তমৈথুন করে থাকে, যে নিপীড়ন অন্তরকে ব্যস্ত করে রাখে এবং সে অবিবাহিত হয়, তার স্ত্রী বা দাসী কেউ না থাকে অথবা তার স্ত্রী কিংবা দাসী আছে কিন্তু অনেক দূরত্বের কারণে তাদের কাছে পৌঁছা সম্ভব না হয়; ফকীহ আবুল লাইছ বলেন- আশা করি তার কোন গুনাহ হবে না। হাঁ, যৌন সম্ভোগের স্বাদ উপভোগ করার লক্ষে করলে গুনাহগার হবে।[৬০]

---

৫৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: কুমারী নারীকে বিবাহ করা, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং- ২০৫০

৫৭. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৪

৫৮. মুহাম্মদ আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭১

৫৯. আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবন আবদুল্লাহ আল-আলুসী, *রূহুল মা'আনী*, লেবানন: বৈরুত, ইহয়াউ আত-তুরাস-আল-আরাবি, তা.বি. খ. ১৮, পৃ. ১০

৬০. আহমাদ ইবন দিয়া আল-কুরায়শী, *আদ-দিয়াউল মা'নাবী*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ১৯৭

সন্তান লাভ করার আগ্রহ অনেক সময় এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, সতীত্ব ও পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে ضرورت ও حاجت-এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অতএব এ জরুরত পূরণ করার লক্ষ্যে হস্তমৈথুন জায়েযের আওতাভূক্ত হয়ে যায়।

**দ্বিতীয়ত:** হস্তমৈথুন না জায়েয হওয়ার একমাত্র রহস্য এই যে, এর মাধ্যমে বীর্যকে মানব বংশ বৃদ্ধির পরিবর্তে অনর্থক নষ্ট করা হয়। পক্ষান্তরে, টেস্টটিউব বেবির জন্য হস্তমৈথুনের মাধ্যমে যে সিমেন্ট কালেকশন করা হয় তা বীর্যকে নষ্ট করার জন্য নয়; বরং এর কার্যকরী ফল পাওয়ার জন্য। এতে হস্তমৈথুনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাল্টে যাওয়ায় এর হুকুমও পাল্টে যাবে।

**দ্বিতীয় কারণের জবাব:** টেস্টটিউব বিরোধীগণ অন্যের সামনে সতর খোলাকে সামনে রেখে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোকে যে না জায়েয বলেছেন, তা ঠিক নয়। কারণ স্বাভাবিকভাবে সতর খোলা হারাম হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তা খোলা জায়েয বলা হয়েছে। যেমন ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে-

يحل للرجل أن ينظر من الرجل الأجنبى الى سائر جسده إلا ما بين السرة و الركبة إلا عند الضرورة، فلا بأس أن ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الختان ليختنه و يداويه بعد الختن–

অর্থ: একজন পুরুষের জন্য অপর পুরুষের নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান ব্যতীত পূর্ণ শরীর দেখা জায়েয আছে। তবে খাৎনা করানো ও পরবর্তীতে ওষুধ লাগানোর লক্ষে খাৎনার স্থান (যা সতরের অন্তর্ভূক্ত) দেখা জায়েয আছে।[৬১]আল্লামা সারাখসী (রহ.) বলেন-

و قد روى عن أبى يوسف– أنه إذا كان به هزال فاحش و قيل له إن الحقنة تزيل مابك من الهزال– و لا بأس بأن يبدئ ذلك الموضع للمحتقن، و هذا صحيح فإن الهزال الفاحش نوع مرض يكون أخره الدق والسل–

অর্থ: ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত। যার খুব বেশি দুর্বলতা দেখা যায় এবং তাকে এ ধারণা দেয়া হয় যে ঢুস ব্যবহার করলে তার দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে ঢুস প্রদানকারীর সামনে তার জন্য সতর (পায়ুপথ) খোলা না জায়েয নয়। আর এটিই বিশুদ্ধতম মত। কারণ অধিক দুর্বলতা একটি রোগ, যার পরিণতি ক্ষয়রোগ ও ক্ষত।[৬২]

তেমনিভাবে কেউ মোটা হতে চাইলে যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, তার জন্যও ডুসের অনুমতি রয়েছে। যেমন ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে–لا بأس بالحقنة لأجل السمن، هكذا روي عن أبى يوسف

অর্থ: মোটা হওয়ার জন্য ঢুস দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৬৩]

তেমনিভাবে অনেক মুবাহ ও শুধু বৈধ কাজের জন্য ইসলামী শরীআতে বেপর্দা হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন মহিলাদের খাৎনা করা মুবাহ ও বৈধমাত্র। এতদসত্ত্বেও এর জন্য সতর খোলা ও বেপর্দা হওয়া জায়েয আছে। আল্লামা আলাউদ্দীন সমরকন্দী (রহ.) লেখেন-

و لايباح النظر و المس إلى ما بين السرة والركبة إلا فى حالة الضرورة بان كانت المرأة ختانة تختن النساء–

অর্থ: নাভি এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী জায়গা দেখা ও স্পর্শ করা বৈধ নয়, তবে প্রয়োজনবোধে এর ব্যতিক্রম করা যাবে। যেমন, খাৎনাকারিনী, যে খাৎনা করায়।[৬৪]

৬১. আল্লামা আলাউদ্দীন আবু বকর ইবন মাসউদ, *বাদায়িউস সানা'য়ী*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৬, পৃ. ৪৯৭
৬২. আল্লামা শামসুদ্দীন আস-সারখসী, *কিতাবুল মাবসূত*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তা. বি. খ. ১০, পৃ. ১৫৬
৬৩. মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, *জাদীদ ফিকহী মাসায়েল*, পাকিস্তান, করাচী, যমযম পাবলিশার্স, জুন ২০১০, পৃ. ১০৩
৬৪. মুহাম্মদ আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ, ৪৮১

সন্তানের অধিকারী হওয়া একটি অদম্য ইচ্ছা। বিশেষ করে সন্তান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে মহিলারা বিভিন্ন রকমের মেয়েলি স্নায়ুগত, হৃদগত এবং আরও বিভিন্ন রকমের দৈহিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়ন, ঘৃণা ও মনোমালিন্যের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কোনো কোনো সময় সতীত্ব ও পবিত্রতার জন্যও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মলিহার জন্য সন্তান লাভ জরুরতের পর্যায় না পৌঁছলেও অনেকের ক্ষেত্রে হাজতের স্তরে তো পৌঁছবেই।

যখন সুন্নাতে যায়েদাহ এমনকি শুধুমাত্র মুবাহ ও বৈধ কাজকে সামনে রেখে সতর খোলার অনুমতি রয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে সতর খুলতে আপত্তি থাকার কথা থাকে না।

**তৃতীয় কারণের জবাব:**টেস্টটিউবকে একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতি বলে না জায়েয বলা কোনো শক্তিশালী দলীল বা প্রমাণ নয়। কেননা টেস্টটিউব মূলত নি:সন্তান দম্পত্তিদের জন্য একটি চিকিৎসা মাত্র। আর চিকিৎসা জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক দেখা হয় না। বরং যেভাবে চিকিৎসা করলে অধিক ফলপ্রসূ হওয়া যায় শরী'আত সে পদ্ধতিই গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে থাকে। যেমন, ঔষধ পৌঁছানোর মূলপথ হল মুখ এবং গলা। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা হিসেবে ঢুস প্রদানের অনুমতি রয়েছে। তেমনিভাবে বাচ্চা জন্মের মূলপথ হল যোনিদ্বার, কিন্তু প্রয়োজনে সিজারের অনুমতি রয়েছে। যা একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতি। অতএব, নি:সন্তান দম্পত্তির জন্য টেস্টটিউব পদ্ধতি অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম হলেও তাকে না জায়েয বলা যাবে না।

**চতুর্থ কারণের জবাব:**উক্ত কারণটিও সঠিক নয়। কারণ جلب منفعت তথা উপকার অর্জনের জন্য শরী'আত সতর খোলার স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছে। যেমন, খাৎনার জন্য সতর খোলা। যার বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় কারণের জবাবে করা হয়েছে। এছাড়া এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ ফিকহশাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ বিধান হলো-

قد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، منه الكذب مفسدة محرمة، و هى متى تضمن جلب المصلحة تربو عليه جاز، كالكذب للإصلاح بين الناس، و على الزوجة لإصلاحها–

অর্থ: কখনো কখনো ক্ষতির তুলনায় লাভ অনেক বেশি দেখা দিলে লাভকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। আর এজন্যই মিথ্যা বলা ক্ষতিকর এবং হারাম হওয়া সত্ত্বেও যখন তা উক্ত ক্ষতি থেকে বড় উপকার বয়ে আনে তখন মিথ্যা বলা না জায়েয থাকেনা। যেমন দু'জনের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার স্বার্থে ও স্বীয় স্ত্রীর সংশোধনের জন্য মিথ্যা বলা।[৬৫] সুতরাং উল্লিখিত دفع مضرت তথা ক্ষতি দূরীকরণের তুলনায় টেস্ট টিউবের মাধ্যমে সন্তান লাভ جلب منفعت তথা উপকার অর্জন অনেক বেশি হওয়ায় তা জায়েয হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

**দ্বিতীয় প্রকার: পর পুরুষ ও পর স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণে সন্তান জন্ম দেয়া**

পর পুরুষের শুক্রাণু ও পর নারীর ডিম্বানো সংমিশ্রণ করে এভাবে ৩টি পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেয়া যায়। যথা:

**(ক)** পর পুরুষ ও নারীর বীর্য কোনো টিউবে একত্রিত করে সন্তান জন্ম দেয়া।

**(খ)** নারীর ডিম্বানো নিয়ে পর পুরুষের বীর্যের সাথে মিশিয়ে তারই জুরায়ুতে স্থাপন করা।

**(গ)** পর পুরুষের শুক্রাণু ও পর নারীর ডিম্বানো সংগ্রহ করে তৃতীয় কোন মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করানো। যাকে সারোগেট মাদার (Surrogate Mother) বা ক্ষণস্থায়ী মা বলা হয়।

উল্লিখিত সব ক'টি পদ্ধতিই সর্বসম্মতিক্রমে না জায়েয ও হারাম। কারণ- **(এক)**

عَنْ رُوَيْفَعَ بْنِ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ– لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ–

৬৫. আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আবু বকর আস-সুয়ূতী, *আল-আশবাহু ওয়ান নাযাইরু*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুবআল- ইলমিয়্যাহ, তা. বি. পৃ, ১৩৯

অর্থ: রুয়াইফ ইবন সাবিত আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য নিজের পানি অন্যের জমিতে প্রবাহিত করা বৈধ নয়।[৬৬]
অর্থাৎ, নিজের বীর্য পর নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো জায়েয নয়।

**(দুই)** এতে বংশ পরিক্রমার বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। আর ব্যভিচার হারাম হওয়ার এটি একটি অন্যতম কারণ। এ বংশ পরিক্রমা বিশৃংখলার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যই কোনো স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হলে বা তার স্বামী মারা গেলে পুনরায় অপরজনের পানি গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন-

منها معرفة برائة رحمها من مائه، لأن لا تختلط الأنساب، فإن النسب أحد ما يتشاح به و يطلبه العقلاء، و هو من خواص نوع الإنسان، و مما امتاز به من سائر الحيوان، و هو المصلحة المرعية فى باب الإستبراء–

অর্থ: ইদ্দতের উপকারিতাসমূহের মধ্যে একটি এই যে, এর মাধ্যমে পূর্বেকার স্বামীর বীর্য থেকে মহিলার জরায়ু পবিত্র হওয়া সম্পর্কে জানা যায়। যাতে বংশ পরিক্রমায় কোনো ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। কারণ বংশ একটি আকর্ষণীয় ও মর্যাদার বিষয়, জ্ঞানী-গুণীদের চাহিদাও তাই। এটা মানব জাতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য জীব-জানোয়ার থেকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রমণ্ডিত। আর 'ইদ্দতের মাধ্যমে জরায়ুর পবিত্রতা' অধ্যায়ে লক্ষ্যণীয় উপকারিতা এটাই।[৬৭]

**(তিন)** পর পুরুষের বীর্য পর নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো যিনার সাদৃশ্য হওয়ায় না জায়েয বলা হয়েছে। তেমনিভাবে এক মহিলার বীর্য অপর মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করানোও দুই মহিলা একে অপরের মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা মিটানোর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে না জায়েয। হাদীসে এসেছে-

عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَا–

অর্থ: ওয়াসেলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, দুই মহিলা একে অপরের সাথে মেলা মেশার মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা মেটানো যিনা।[৬৮]

সুতরাং পর নারী-পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণের সকল পদ্ধতি অবৈধ এবং হুকুম হিসেবে 'যিনা'। তবে হদ (শরী'আতের নির্ধারিত দণ্ডবিধি) যেহেতু সাধারণ সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়, তাই এখানেও দুই কারণে তাকে হদ লাগানো হবে না। যথা:

**(১)** যিনা হলো স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পর নারী-পুরুষের এক শারীরিক কাজ বা মেলামেশার নাম। আর টেস্টটিউব পদ্ধতির মধ্যে এই কাজ বাহ্যিকভাবে বিদ্যমান নেই।

**(২)**যিনার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েই একে অন্যের শরীর থেকে স্বাদ অনুভব করে। কিন্তু টেস্টটিউব পদ্ধতিতে এ ধরনের স্বাদ গ্রহণ করা হয় না। এজন্য এ কাজের দ্বারা যিনার নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। তবে ফলশ্রুতিতে এই কাজ যেহেতু ঐ পরিমাণই ক্ষতিকর যেই পরিমাণ ক্ষতিকর যিনায়, তাই শরী'আত বিরোধী এমন কাজ করার কারণে বিচারক তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। আর কেনো মহিলা যদি কোনো পুরুষের স্ত্রী থাকাকালীন সত্ত্বেও পর পুরুষের বীর্য দ্বারা গর্ভবতী হয়ে যায়, তাহলে সন্তানের বংশ তার আসল স্বামীর পক্ষে সাব্যস্ত হবে। কেননা বংশ প্রমাণের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান হলো, নবজাতকের বংশ ঐপুরুষের সঙ্গে হবে, নবজাতকের মা যে পুরুষের শয্যা। কেননা- الولد للفراش অর্থ: আর স্ত্রীকে তার স্বামীর শয্যা গণ্য করা হয়েছে।[৬৯]

আর কোনো কুমারী মেয়ে যদি এ ধরনের মা হয়, তাহলে সন্তানের বংশ শুধু কুমারী মেয়ে থেকেই সাব্যস্ত হবে। ঐ পুরুষ থেকে হবে না যার বীর্য থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। যেমন ধর্ষণ বা যিনার মাধ্যমে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানের বিধান।

৬৬. *সুনান আবু দাউদ*, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: বন্ধী স্ত্রীলোকদের সাথে হবাস করা, খ. ১, পৃ. ৩১০, হাদীস নং- ২১৫৮
৬৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-জিল, ২০০5 (প্রথম প্রকাশ), খ. ২, পৃ. ২১৯-২২০
৬৮. মুহাম্মদ ইবন আলী যাগলুল ইবয়ানী, *আল-মাওসূ'আতুল কুবরা*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০২১,খ. ২৪, পৃ. ৪৬
৬৯. প্রাগুক্ত, খ. ৪৫, পৃ. ৬৯১

হ্যাঁ, নাজায়েয সত্ত্বেও যদি কোনো পর-নারীর ডিম্বকে নেয়া হয় এবং কোনো পুরুষের বীর্যের সঙ্গে টেস্টটিউবের মাধ্যমে সংমিশ্রণ করা হয়, তারপর নির্দিষ্ট বীর্য এই পুরুষের বৈধ স্ত্রীর জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয় এবং তার স্ত্রী বাচ্চা জন্ম দেয়, তবে তার স্ত্রী ঐ সন্তানের মা হবে। কেননা কুরআনে ঐ মহিলাকেই 'মা' বলা হয়েছে যে সন্তান জন্ম দেয়। ইরশাদ হচ্ছে হচ্ছে اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِ وَلَدْنَهُمْ–

অর্থ: তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে।[৭০]

আর যখন এই পুরুষের স্ত্রী মা হবে, তখন সেও ঐ সন্তানের পিতা হবে। কেননা মহিলা তারই স্ত্রী এবং জন্মদায়িনী মায়ের স্বামী থেকে তার বংশ প্রমাণিত হবে। কিন্তু যে মহিলার ডিম্বকোষ তার সৃষ্টির জন্য নেয়া হয়েছিলো তার মর্যাদা মায়ের মর্যাদা হবে না। কেননা শরীয়তে বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শুধু একথা যথেষ্ট না যে, সন্তান কারো অংশ হয়ে যাবে। বরং আবশ্যক হলো, সে নিজ সৃষ্টিতে যে নারী-পুরুষের অংশ হয়েছে তা বৈধ ও হালাল পদ্ধতিতে হতে হবে। এ কারণেই যিনার দ্বারা ভূমিষ্ট সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হয় না। অথচ নবজাতক ধর্ষক বা যিনাকারীর ঔরস হয় এবং দুধপানের সময় দু'বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর মহিলার দুধ পান করার দ্বারা দুগ্ধ সম্পর্কিত হারাম সাব্যস্ত হয় না। কেননা এই দুধপান শরী'আতসম্মত ও বৈধ পদ্ধতিতে হয়নি।

তবে যেহেতু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে 'বিবাহ সংক্রান্ত হারাম'-এর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, সেহেতু যিনার দ্বারাও বিবাহ সংক্রান্ত হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাই এসব অবস্থায় এই নবজাতকের জন্য ঐ পুরুষের বংশের সঙ্গেও হারাম সাব্যস্ত হবে যার বীর্য তার জন্মের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ মহিলার বংশের সঙ্গে যে তাকে জন্ম দিয়েছে এবং তার জন্য জন্মের কষ্ট স্বীকার করেছে এবং ঐ মহিলার বংশের সাথেও যার জরায়ু থেকে তার অস্তিত্বের জন্য ডিম্বকোষ গ্রহণ করা হয়েছে। হিদায়ার লেখক বলেন-

ان الوطى سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف الى كل واحد منهما كملا–

অর্থ: সঙ্গম সন্তানের মাধ্যমে অংশিদারিত্বের কারণ হয়। এ কারণেই সন্তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে প্রত্যেকের দিকে পূর্ণভাবে সম্বোধন হয়।[৭১] এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

و اذا كانت جارية بين اثنين جاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما–

অর্থ: যদি একজন বাদীর দু'জন মালিক হয় এবং এই বাদীর সন্তান হয় এবং উভয়ই এর দাবিদার হয়, তবে সন্তানের বংশ উভয় থেকেই সাব্যস্ত হবে।[৭২]

যাহোক, স্টেটটিউবের মাধ্যমে সন্তান লাভের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের আলোকে কোনো কোনো পদ্ধতি জায়েয থাকলেও নৈতিকতার দিকে থেকে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন-

১. টেস্ট টিউব পদ্ধতির সবচে বড় জটিলতা হলো একাধিক ভ্রূণ তৈরি। একাধিক ডিম্বাণু পৃথক করে তা প্রতিস্থাপন এ পদ্ধতির একটি স্বাভাবিক বিষয়। কেননা, ব্যয় বহুল পদ্ধতি হওয়ায় একটি মাত্র নিষিক্ত ডিম্বাণুর ওপর ডাক্তাররা আস্থা রাখতে পারে না। একাধিক ভ্রূণ বেড়ে উঠলে নারীর প্রজননতন্ত্রে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।

২. যদি একাধিক নিষিক্ত ডিম্বাণু থাকে, তবে দম্পতি চাইলে একটি কাজে লাগিয়ে বাকিগুলো ফ্রিজ করে রাখতে পারবে। নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলো তখন তরল নাইট্রোজেনে রাখা হবে। সেগুলো থেকেও ভ্রূণের বিকাশ সম্ভব। পরবর্তীতে বাড়তি করে আর সংগ্রহ ও নিষেক ঘটাতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে এখনো প্রায় ১৫ লাখ হিমায়িত জাইগোট আছে।

---

৭০. আল-কুরআন, ৫৮: ২

৭১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ, *আল-ইনায়াহ*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ২, পৃ. ২২৮,

৭২. আল্লামা আলী ইবন সুলতান মুহাম্মদ, *মিরকাতুল মাসাবীহ*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০01 (প্রথম প্রকাশ) খ. ৬, পৃ. ৪৩৩; ইবনে নুজাইম 'জহিরিয়্যার'-এর বরাত দিয়ে অল্প পার্থক্যের সাথে লেখেন-

و الجارية بين اثنين اذا جاءت بولد فادعياه يثبت النسب من كل واحد منهما ينفرد كل واحد منهما بالتزويج–

অর্থ: দু'ব্যক্তির মধ্যে মালিকানাধীন বাদীর যদি সন্তান হয় এবং উভয়জন তার থেকে বংশ প্রমাণের দাবী করে, তবে নবজাতকের বংশ উভয়জন থেকেই প্রমাণিত হবে এবং উভয়জন থেকে প্রত্যেকেরই তাকে বিবাহ করানোর অধিকার থাকবে।

আল-বাহরুর রায়েক্ব, খ. ৩, পৃ. ১১৯

৩. গর্ভধারণের প্রাকৃতিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করা।
৪. গবেষণাগারে মানব জীবনের বিকাশ।
৫. প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জাইগোট তৈরি করা। যার প্রতিটিতেই প্রাণ বিকাশের সম্ভাবনা থাকে।
৬. অপ্রয়োজনীয় অপরিপক্ব ভ্রূণ নষ্ট করা।
৫. অপ্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রূণ সংরক্ষণ।
৭. অনেকের পক্ষে এর ব্যয়ভার বহন অসম্ভব। তাই শারীরিক অক্ষমতাকে মেনে নিলেও অনেকে আর্থিক অক্ষমতাকে মানসিকভাবে মেনে নিতে পারে না।
৮. ভ্রূণের সঙ্গে অপ্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ।
৯. গবেষণার উদ্দেশে ভ্রূণের অপব্যবহারের শঙ্কা।
১০. ভ্রূণের জিনগত পরিবর্তনের শঙ্কা।
১১. ভ্রূণকে পণ্যের কাতারে নিয়ে আসার শঙ্কা।
১২. সর্বোপরি প্রজননে অক্ষমতা এক ধরনের রোগ। তবে টেস্টটিউব চিকিৎসা সেই রোগের চিকিৎসার পথ না দেখিয়ে ব্যয়বহুল বিকল্প পথই বাতলে দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, টেষ্টটিউব বেবীর ক্ষেত্রে কখনোই পছন্দমতো ছেলে বা মেয়ে সন্তান নেওয়া সম্ভব নয়।শুক্রাণু, ডিম্বাণু ও একটি জরায়ু হলেই এক্ষেত্রে গর্ভধারণ সম্ভব। আজকাল অনেক নারী নিজেদের ডিম্বাণু বিক্রি কিংবা দান করছে। আবার জরায়ুতে সমস্যা থাকায় স্বামী-স্ত্রী নিজেদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুতে তৈরি ভ্রূণ প্রতিস্থাপন অন্য কারো জরায়ুতে করছে, যদিও এ অনৈতিক কালচার আমদের দেশে এখনো আসেনি।

## ক্লোনিং পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে মানব শিশু জন্ম দেয়ার ইসলামী বিধান

### ক্লোনিং (cloning)-এর পরিচয়

ইংরেজি ভাষায় ক্লোনিং (cloning) শব্দটি ইউনানী শব্দ klon থেকে গঠিত হয়েছে। আর klon শব্দের অর্থ স্ফুটিত ডাল। ইংরেজিতে এর অর্থ হচ্ছে-সাদৃশ্য, অনুরূপ সৃষ্টি বা নকল। আরবী ভাষায় একে ইস্তিনছাখ (استنساخ) বলা হয়, যার অর্থ ফটোকপি করা।[৭৩]
পরিভাষাঃ ক্লোনিং হলো- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনো প্রাণীর দেহকোষ থেকে একটিমাত্র কোষ গ্রহণ করে অন্য প্রাণীর জরায়ুতে সংযোজনের মাধ্যমে প্রথম প্রাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ প্রাণী সৃজন।[৭৪]
অন্যভাবে বলা যায়- পুরুষের শুক্রান্ত ও নারীর ডিম্বাণুর সংমিশ্রণ ব্যতীত যেকোন একজনের cell তথা প্রাণীকোষ থেকে মূল অংশ (Nucleus) সংগ্রহ করত তা নারীর ডিম্বাণু সাথে মিশিয়ে ইলেকট্রিক শর্টের মাধ্যমে বিশেষ নিয়মে পরিচর্যা করে শিশু জন্ম দেয়াকে ক্লোনিং বলে।
এ পদ্ধতিতে যার কোষের পরিচর্যা করা হয়। শিশু অবিকল তার আকৃতি ধারণ করে। এ কারণেই এ পদ্ধতিকে cloning বা সাদৃশ্য বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়- ক্লোনিং হলো- অযৌন প্রক্রিয়ার উদ্ভূত অনুজীব।

উল্লেখ্য, মানব দেহ অসংখ্য cell তথা প্রাণীকোষ দ্বারা গঠিত। এ সকল প্রাণীকোষ এতো ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তা দেখা সম্ভব নয়। এগুলোর দুই পার্শ্ব মোটা এবং মাঝখানের অংশ চিকন। কোষগুলো মাঝখানে ভেঙ্গে প্রত্যেকটি অংশ একটি পূর্ণ কোষে রূপান্তর হয়। এভাবে এ ২টি কোষ ভেঙ্গে ৪টি কোষে পরিণত হয়। অত:পর ৪টি ৮টিতে, ৮টি ১৬টিতে, ১৬টি ৩২টিতে এমনি ধারাবাহিকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার কোষের জন্ম হয়। আবার খুব দ্রুত গতিতে অনেক কোষ মারাও যায়। প্রত্যেকটি কোষেই Nucleus বা প্রাণকেন্দ্র থাকে। আর প্রতিটি Nucleus-এ রয়েছে ৪৬টি Chromosome, যা Nucleus-এর মধ্যে লম্বা সুতার মতো দেখা যায়। এর দ্বারাই জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও বংশ পরম্পরা সঞ্চারিত হয়। ৪৬টি Chromosome-এর মধ্যে পুরুষের শুক্রাণুতে ২৩টি এবং নারীর

৭৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী: ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৭৫
৭৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

ডিম্বাণুতে থাকে ২৩টি। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর বীর্য মিলে ৪৬-এর সংখ্যা পূর্ণ হয়। আর এজন্যই মাতা-পিতার উভয়ের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য মিলে একটি শিশু জন্ম গ্রহণ করে।

ক্লোনিং-এর কাজ হলো নারীর ডিম্বের কোনো কোষ থেকে নিউক্লিয়াস ও শরীরের অন্য কোনো অংশের সেল থেকে নিউক্লিয়াস বের করে সংমিশ্রণ করা। এ নিউক্লিয়াস পুরুষের শরীর থেকে অথবা নারীর শরীর থেকেও নেয়া যায়। শরীরের অন্যান্য অংশেও একেকটি নিউক্লিয়াসে ৪৬টি ক্রোমোসোম বহন করে। এভাবে নর-নারীর মিলনে ক্রোমোসোমের যে সংখ্যা পূর্ণ হয়, ক্লোনিং-এর দ্বারাও শুধু পুরুষ অথবা নারীর ক্রোমোসোমের এ সংখ্যা পরিপূর্ণ হয়। এ কারণে গর্ভে একটি সন্তানের অস্তিত্ব লাভের জন্য তাই যথেষ্ট।

যখন কোন নারীর ডিম্বাণুর সাথে তারই শরীর থেকে সংগৃহীত নিউক্লিয়াস সংমিশ্রণ করে পরিচর্যা করা হয়, তখন পুরুষের সংস্পর্শ বা মিলন ছাড়াও একটি শিশু জন্ম লাভ করতে পারে। এতে যেহেতু শুধু নারীর ক্রোমোসোমই ব্যবহৃত হয়, তাই সন্তানও অবিকল মহিলার মত হয়। এমনিভাবে পুরুষের ক্ষেত্রেও তাই।[৭৫]

সর্বপ্রথম ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভেড়া ডলির জন্ম হয় ৫জুলাই১৯৯৬ সালে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে। স্কটল্যান্ডে ডা. আয়ান অলম্যান্ড 'রুজলীন ইন্সটিটিউট'-এর অধীনে এমন একটি ভেড়া জন্মদানে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যার মধ্যে পুরুষ প্রাণির কোনো সহযোগিতা নেয়া হয়নি। শুধু মহিলা প্রাণির বীর্যের মাধ্যমে ডলি ভেড়া অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এর সাঙ্কেতিক নাম (CODE NAME) রাখা হয় 6LL3।[৭৬]

ইসলামিক পণ্ডিতগণ বলেন, ক্লোনিং পদ্ধতি জায়েয বা না জায়েয হওয়ার বিধান অনেকাংশে টেস্টটিউব বেবীর মতই। টেস্টটিউব বেবীর ক্ষেত্রে শরী'আতের হুকুম হলো- এক মহিলার বীর্য সংগ্রহ করে তার স্বামীর বীর্যের সাথে মিশিয়ে অন্য নারীর জরায়ুতে রাখা জায়েয নেই। তেমনিভাবে ক্লোনিং-এর ক্ষেত্রেও কোনো পুরুষ কিংবা নারীর কোষ থেকে নিউক্লিয়াস গ্রহণ করে অপর নারীর জরায়ুতে রাখা জায়েয নেই। তবে, যে পুরুষের শরীরের কোষ থেকে নিউক্লিয়াস গ্রহণ করা হয়েছে, তা যদি তারই স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয় কিংবা যে নারীর কোষ থেকে নিউক্লিয়াস গ্রহণ করা হয়েছে, তা যদি তারই জরায়ুতে স্থাপন করা হয়, তাহলে তা জায়েযের আওতাভুক্ত হবে। এর স্বপক্ষে তাঁরা বেশকিছু দলীল ও কিয়াস উপস্থাপন করেন। যেমন-**(এক).**

اذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل، فأخذت الجارية ماءه فى شئ، فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك، فعلقت الجارية، و ولدت، فالولد ولده، والجارية أم ولد له–

অর্থ: যদি কোনো ব্যক্তি তার দাসীর সাথে লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যত্র সহবাস করে বীর্যপাত ঘটায় এবং দাসী সেই বীর্য কোনো পাত্রে সংরক্ষণ করে রেখে পরবর্তিতে তার যৌনদ্বারে প্রবেশ করানোর ফলে গর্ভবতী হয় এবং সন্তান প্রসব করে, তাহলে শিশুটি ঐ পুরুষেরই হবে এবং উক্ত দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।[৭৭]

**(দুই).** ক্লোনিং পদ্ধতি এটি চিকিৎসারই একটি অংশ। সুতরাং নি:সন্তান দম্পত্তির সন্তান লাভের জন্য এটি অত্যাধুনিক চিকিৎসার অন্তর্ভূক্ত। এদ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিরন্তন বাণীর সত্যায়ন ঘটেছে। কেননারাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ– অর্থ: প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে।[৭৮]

সুতরাং কোনো দম্পত্তির সন্তান না হওয়া একটি রোগ, আর ক্লোনিং পদ্ধতি হলো এর চিকিৎসা।

**(তিন):** পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম পিতা ছাড়া শুধু মাতা হযরত মারয়াম (আ.) থেকে হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ক্লোনিং পদ্ধতিতে শুধু মহিলা দ্বারা যদি কোনো সন্তান জন্ম দেয়া হয়, তাহলে এটা কুরআনেরই সত্যায়ন হবে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতেরই বহি:প্রকাশ ঘটবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

---

৭৫. *https://bn.wikipedia.org/wiki/* "দেহকোষ ও ক্লোনিং", (থেকে উদ্ধৃত)

৭৬. *https://bigganblog.org* . "ক্লোনিং- জৈবপ্রযুক্তির এক অভিনব শিল্প", ১৬.০৪.২০১৪ (থেকে উদ্ধৃত)

৭৭. আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মাহমুদ, *আল-বাহরুর রায়েক*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৪, পৃ. ৪৫২

৭৮. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব, খ. ৬, পৃ. ৩৪২, হাদীস নং- ৫৭৩৫

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدُ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرُ، قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ–

অর্থ: তিনি (মারয়াম আ.) বললেন, রব কেমন করে আমার সন্তান হবে, আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি। (আল্লাহ) বললেন: এভাবেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন বলেন- হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।[৭৯]

তাই ক্লোনিং পদ্ধতি ইসলামে সৃষ্টি ধারণার পরিপন্থী নয় এবং ক্লোনিংকারীকে সৃষ্টিকর্তাও বলা যাবে না।কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ

অর্থ: সমগ্র সৃষ্টি জগত মিলে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না।[৮০]

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে –اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ অর্থ: আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।[৮১]

অন্যত্র বলা হয়েছে –اَلَا لَهُ الْخَلْقُ অর্থ: জেনে রেখো! সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই।[৮২]

বাস্তবে মানুষ নিজে ডিম্বাণু, নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোসোম কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং আল্লাহরই সৃষ্ট এসব ডিম্বাণু, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোসোম এবং জরায়ু ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লোনিং পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেয়া হয়। এজন্য কোনো বিজ্ঞানীকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাবে না এবং বলাও হয় না। মানুষ শুধু আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক বিষয়ে রূপান্তর করে নতুন কোনো কিছু করার যোগ্যতা রাখে, মৌলিক কোনো কিছুই সৃষ্টি করার যোগ্যতা সে রাখে না। যেমন, তুলা থেকে সুতা তৈরি করে মানুষ সুন্দর কাপড় বুনন করতে পারে। কিন্তু মানুষ তুলা সৃষ্টি করতে পারে না। তুলা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

আমরা জানি, ক্লোনিং-এর মাধ্যমে ভেড়া ডলি জন্ম দিতে গিয়েইয়ান উইলমুট ও কেইট ক্যাম্পবেল ২৭৭বার ব্যর্থ হয়েছিলেন।[৮৩] এতে প্রমাণিত হয়, সৃষ্টির প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর হুকুম না হলে মানুষের প্রচেষ্টাও সফল হয় না। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে –اِنَّمَآ اَمْرُهُ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

অর্থ: আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছাপোষণ করেন, তখন কেবল বলেন- হও, তখনই তা হয়ে যায়।[৮৪]

**সতর্কতা:** তবে ইসলামিক বিশেষজ্ঞগণ চিকিৎসা হিসেবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ক্লোনিংকে বৈধ হওয়ার হুকুম দিলেও এক্ষেত্রে তারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শও দিয়েছেন। কারণ এর যথাযথ ব্যবহারে মানব কল্যাণ লাভ করা যেমন সম্ভব, তেমনিভাবে হীন উদ্দেশ্য তা ব্যবহারের মাধ্যমে মানব জাতির সীমাহীন ক্ষতিও অনিবার্য হয়ে ওঠতে পারে। তাই বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতা ছাড়া ঢালাওভাবে ক্লোনিং পদ্ধতি ব্যবহার করলে মানব জাতি নিম্নবর্ণিত আত্মঘাতী ও ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে-

(১) বৈবাহিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া।
(২) অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া।
(৩) সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে যাওয়া।
(৪) ব্যভিচারের পথ প্রশস্থ হওয়া।

**১. বৈবাহিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া:** ইসলাম বিবাহকে অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেছে। কারণ বিবাহের মাধ্যমে একটি সন্তানের বংশ পরিচয় এবং পারিবারিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত হয়। একটি বৈধ সন্তান লাভের একমাত্র পন্থা হলো বিবাহ।

---

৭৯. আল-কুরআন, ৩: ৪৭
৮০. আল-কুরআন, ২২: ৭৩
৮১. আল-কুরআন, ৩৯: ৬২
৮২. আল-কুরআন, ৭: ৫৪
৮৩. নাজিফা ইয়াসমিন, *https://roar.media/bangla/main/science/cloning.* "ক্লোনিং আধুনিক বিজ্ঞানের এক অপার সম্ভাবনা", ২০.০৩.২০২০ (থেকে উদ্ধৃত)
৮৪. আল-কুরআন, ৩৬: ৮২

তাই ব্যাপকহারে ক্লোনিং পদ্ধতি চালু হলে বৈবাহিক নিয়ম-নীতিতে ধস নেমে আসবে এবং সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে সারাবিশ্বে বিবাহের যে গুরুত্ব রয়েছে তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

**২. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া:** পেশাদার অপরাধীরা সবসময়ই সুযোগের সন্ধানে থাকে। তাই ক্লোনিং পদ্ধতি ব্যাপকহারে চালু হলে অপরাধ প্রবণ লোকেরা তাদের মতো মানুষ তৈরি করে অতিসহজে তাদেরকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করে নিজেরা আড়ালে থেকে যাবে। এতে মূল অপরাধীকে শাস্তির মুখোমুখি করার সুযোগ না থাকায় বিশ্বময় অপরাধ প্রবণতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে।

**৩. সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে যাওয়া:** ক্লোনিং-এর মাধ্যমে যার ক্রোমোসোম ব্যবহার হয়ে থাকে, তার সাথে শিশুর দৈহিক সামঞ্জস্য থাকলেও চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, সবলতা ও যোগ্যতা এক রকম হয় না। কারণ মানব সৃষ্টির যে সাধারণ পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা রেখেছেন, তা পাশ কাটিয়ে যখন কৃত্রিম পথ তথা ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেয়া হয়, তখন সেসব শিশু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অনেক যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে অধিক হারে অপ্রাকৃতিক শিশু জন্ম নিলে অযোগ্য মানুষের কারণে এক সময় সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

**৪. ব্যভিচারের পথ প্রশস্থ হওয়া:** অনেক মানুষ আত্মসম্মান ও সমাজের ভয়ে পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কিন্তু ব্যাপকহারে ক্লোনিং পদ্ধতি চালু হলে, সমাজে ব্যভিচারের পথ প্রশস্থ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কারণ কোনো বিবাহিত বা অবিবাহিত নারীর ব্যভিচারের মাধ্যমে পেটে বাচ্চা আসলে একে ক্লোনিং-এর দোহাই দিয়ে বৈধ সন্তান বলে চালিয়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

তাই ক্লোনিং-এর ক্ষেত্রে অনেকের অভিমত হলো- ফাতওয়ার দৃষ্টিতে ক্লোনিংকে জায়েয বলা হলেও গুনাহ এবং বাহানার পথ বন্ধ করার লক্ষে ব্যাপকহারে এ পদ্ধতিকে জায়েয হওয়ার ফাতওয়া না দেয়াই উচিত।

## ইসলামী শরী'আর আলোকে গর্ভপাত

গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়সের ভিন্নতা হিসেবে গর্ভপাতের হুকুমেও ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। বয়সের ভিন্নতা হিসেবে ভ্রূণকে ৪ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

### ১. ভ্রূণের বয়স ৬মাসের উর্ধ্বে হওয়া

এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা ও বাচ্চাকে মেরে ফেলা জায়েয নেই; বরং হারাম। কারণ বাচ্চার বয়স ৬ মাস হয়ে গেলে তাকে সিজারের মাধ্যমে বের করে আনলে সে জীবিত থাকে। অতএব এক্ষেত্রে তাকে মেরে ফেলার কোনো যুক্তিকতা নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ

অর্থ: আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৮৫]

### ২. ভ্রূণের বয়স ৬মাসের কম ও ৪মাসের উর্ধ্বে হওয়া

এমতাবস্থায়ও গর্ভপাত জায়েয নেই, হারাম।

فالتسبب فى إسقاطة بعد نفخ الروح فيه محرم إجماعاً، و هو من قتل النفس–

অর্থ: ভ্রূণে রূহ আসার পর গর্ভপাত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এ অবস্থায় গর্ভপাত হত্যা তুল্য।[৮৬]

তবে অবস্থা যদি এমন হয়, বাচ্চাকে বাঁচানোর যথাযথ চেষ্টা করার পর অভিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলে যে বাচ্চাকে পেটে রাখাটা মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে মাকে বাঁচানোর লক্ষে বাচ্চাকে মেরে ফেলার অবকাশ রয়েছে। কেননা ৬মাসের কম বয়সের বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে বের করলেও জীবিত থাকে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাচ্চার জীবন অনিশ্চিত আর মায়ের জীবন নিশ্চিত। তাই নিশ্চিত জীবন রক্ষার্থে অনিশ্চিত জীবনকে হত্যা করা যুক্তিসঙ্গত।

---

৮৫. আল-কুরআন, ১৭: ৩২

৮৬. আবু ঈসা সাইদী মুহাম্মদ আল মাহদী, *আন-নাওয়াযিলুস সুগরা*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.খ. ২, পৃ. ১৯২

**৩. ভ্রূণের বয়স ৪মাস বা ১২০দিনের কম এবং কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়া**

এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা মাকরূহ তাহরীমী। কারণ ৪২দিন মতান্তরে ৫২দিনের মধ্যে বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা হাত, পা, আঙ্গুল ও চুল ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ ... قَالَ فَجَائَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنِّىْ قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِىْ، وَ اِنَّه رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدَ– قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَ تَرُدُّنِىْ؟ لَعَلَّكَ اَنْ تَرُدَّنِىْ كَمَا رَدتَّ مَاعِزًا– فَوَاللهِ اِنِّىْ لَحَبْلَىْ، قَالَ اِمَّا لاَ، فَاذْهَبِىْ حَتّٰى تَلِدَى، قَالَ فَلَمَّا وَلَدتْ اَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فِىْ خِرْقَةٍ– قَالَتْ هٰذَا قَدْ وَلَدْتُّهُ، قَالَ اِذْهَبِىْ، فَارْضِعِيْهِ حَتّٰى تَفْطَمِيْهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ اَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فِىْ يَدِهِ كِسْرَةِ خُبْزٍ– فَقَالَتْ هٰذَا يَا نَبِىَ اللهِ! قَدْ فَطَمْتُهُ، وَ قَدْ اَكَلَ الطَّعَامَ–

অর্থ: বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, গামেদিয়্যা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! 'আমি যিনা করেছি' অতএব আমাকে পবিত্র করুন। তিনি তাকে ফেরত দিলেন। মহিলাটি পরদিন এসে বললো, আমাকে কেন ফেরত দিলেন?মনে হয় 'মায়েয'-এর ন্যায় আমাকে ফেরত দিচ্ছেন। আল্লাহর শপথ, আমি অন্তঃসত্ত্বা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তুমি যখন অপরাধ লুকাচ্ছ না এবং নিজের কথা থেকে ফিরছ না এখন যাও, বাচ্চা প্রসব করার পর এসো। বাচ্চা জন্মের পর মহিলাটি একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে নবজাতককে নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললো- এই দেখুন, আমি বাচ্চা প্রসব করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: এখন যাও, বাচ্চার দুধ পান শেষ হলে এসো। বাচ্চার দুধ পান শেষ হলে মহিলাটি বাচ্চার হাতে রুটির টুকরা দিয়ে তাকে নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হয়ে বলে- দেখুন, হে আল্লাহর নবী! আমি তার দুধ ছাড়িয়ে ফেলেছি। সে এখন খাবার খেতে পারে।[৮৭]

উক্ত হাদীসে যদিও একথার উল্লেখ নেই যে মহিলাটি যিনা করার কতদিন পর পবিত্র হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। তথাপি মহিলার পবিত্র হওয়ার লক্ষে বার বার নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়া একথার প্রমাণ বহন করে, ১২০দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়েছিল। কেননা যিনা এমন চারিত্রিক ও ধর্মীয় মহাপাপ, যা সংগঠিত হওয়ার পর লজ্জাবোধ ও অপরাধের অনুভূতি যিনাকারীকে অতি তাড়াতাড়ি এ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বাধ্য করে। আর সাহাবায়ে কিরাম তো এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সুতরাং একথা বলা সঠিক হবে না, উক্ত মহিলাটি একশত বিশ দিন পর তার অপরাধ অনুভব করেছিল।

তাছাড় অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, গামেদিয়্যা মহিলাটি একাধিকবার যিনা স্বীকার করার পরও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে পাথর মেরে তাৎক্ষণিক হত্যার আদেশ না দিয়ে বিলম্ব করার একমাত্র কারণ ছিল, গর্ভকে নষ্ট না করা। তাই বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় ১২০দিনের পূর্বেও গর্ভপাত বৈধ নয়। ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে-

و ما إستبان بعض خلقه كظفر و ضعر، كتمام فيما ذكر من الأحكام و عدة و نفاس–

অর্থ: নখ, চুল ইত্যাদি কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পাওয়া, বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, ইদ্দত, নেফাস ইত্যাদির ব্যাপারে সকল অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার ন্যায়।[৮৮]

এ অবস্থাটি যেহেতু রূহ আসার সূরত ও কোনো অঙ্গ প্রকাশ না পাওয়ার অবস্থার মধ্যবর্তী সূরত, তাই এর হুকুমও উক্ত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী হুকুম হবে। রূহ আসার পর গর্ভপাত হারাম আর অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে মাকরূহে তানযিহী। অতএব, অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পর এবং রূহ আসার পূর্বে গর্ভপাতের হুকুম উল্লিখিত দুই হুকুমের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মাকরূহে তাহরীমী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে কোনো শরঈ ওযর হলে তা মাকরূহ হবে না।

**৪. ভ্রূণের বয়স ৪মাস বা ১২০দিনের কম তবে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি না হওয়া**

এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা মাকরূহ তানযিহী। তবে শরঈ ওযরের কারণে মাকরূহ নয়।

ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে– و يكره أن تسقى لإسقاط حملها، و جاز لعذر حيث لايتصور

৮৭. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: দণ্ডবিধি, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার স্বীকার করে, খ. ৫, পৃ. ৩১১,হাদীস নং- ৪৪২৯
৮৮. জাফর আহমাদ উসমানী, *ই'লাউস সুনান*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ১৭, পৃ. ৯৩

অর্থ: গর্ভপাতের জন্য কোনোকিছু পান করা মাকরূহ, তবে কোনো অঙ্গ প্রকাশ না পেলে ওযর বশত মাকরূহ নয়।[৮৯]
অন্যত্র বলা হয়েছে-

المرضعة إذا ظهر بها الحبل و انقطع لبنها، و ليس لأبى الصغير ما يستأجربه الظئر، و يخاف هلاك الولد، قالوا يباح لها أن تعالج فى استترال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو–

অর্থ: স্তন্যদানকারী গর্ভবতী হওয়ার কারণে যদি তার দুধ বন্ধ হয়ে যায় ও শিশুর পিতার অন্যকোনো স্তন্যদানকারী ভাড়া নেয়ার সামর্থ না থাকে এবং বাচ্চা মারা যাওয়ার আশংকা থাকে, ফকীহগণ বলেন- গর্ভবীর্য জমাট রক্ত ও গোস্তের টুকরাকারে থাকলে বা কোনো অঙ্গ প্রকাশ না পেলে তখন চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভপাত করানো জায়েয আছে।[৯০]

**আলোচনার সার সংক্ষেপ**

**০১.**ভ্রূণের বয়স ৬মাসের অধিক হলে কোনো অবস্থাতেই গর্ভের বাচ্চা নষ্ট করা বৈধ নয়, হারাম।
**০২.**ভ্রূণের বয়স ৬ মাসের কম কিন্তু ৪মাসের অধিক। এ অবস্থায়ও বাচ্চা নষ্ট করা হারাম। তবে কোনো কারণে মাকে বাঁচানোর জন্য যদি বাচ্চার গর্ভপাত করতে হয়, শর্ত সাপেক্ষে বাচ্চা নষ্ট করা জায়েয আছে।
**০৩.**ভ্রূণের বয়স ৪ মাসের কম কিন্তু বাচ্চার কোনো অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেছে। এমতাবস্থায় বিনা কারণে গর্ভপাত করা মাকরূহ তাহরীমী। তবে কোনো ওযর বশত হলে মাকরূহ নয়।
**০৪.**ভ্রূণের বয়স এ পরিমান যে এখনও তার কোনো অঙ্গ প্রকাশ হওয়ার সময় হয়নি, এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা মাকরূহে তানযীহী। তবে শরঈ ওযর ব্যতীত হলে মাকরূহ নয়।[৯১]

## ইসলামী শরী'আর দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিধান

ধর্মীয় দৃষ্টিতে 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ'(Birth control) একটি স্পর্শকাতর আলোচ্য বিষয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ জায়েয এবং না জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর বিতর্ক। পুরো কুরআন-হাদীস চষে কোথাও এর পক্ষে বা বিপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলীল পাওয়া মুশকিল। তাই এ বিষয়ে রচিত হয়েছে অনেক বড় বড় গ্রন্থ এবং আজো লেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক সভা, সমাবেশ, সেমিনার ও কনফারেন্স। কিন্তু এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেন নি ফকীহগণ। ফলে মুসলিম উম্মাহর অনেকেরই এ বিষয়ে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তারা প্রতিনিয়ত বিভ্রান্তিতে নিপতিত হচ্ছে। কেননা, চিকিৎসা শাস্ত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণের এমন কিছু দিক রয়েছে, যেগুলো ইসলামী শরী'আ মোতাবেক জায়েয। কিন্তু এব্যাপারে জ্ঞান না থাকায় অনেকে গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে, আবার অনেকে পতিত হচ্ছে সীমাহীন কষ্টে। তাই এবিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

অধিকাংশ হক্কানী আলিম মনে করেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' (Birth control) শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানুষের কাজ নয়। এটা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ঘোষিত হয়েছে-

هُوَ يُحْيِى وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ–

অর্থ: একমাত্র আল্লাহই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৯২]
সুতরাং এ শব্দটি বর্জনীয়। কেননা, এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, তথাকথিত জন্ম নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি গ্রহণ করার পরেও সন্তান জন্ম লাভ করেছে। এমন একটি উদাহরণ হাদীসেও পাওয়া যায়।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُل مِّنَ الاَنْصَارِ اِلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لِيْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اَعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّه سَيَاتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّه سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا–

৮৯. আল্লামা হাসান ইবন আলী, *হাসিয়াতুল ইসবাহ 'আলা নূরিল ইযাহ*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.পৃ. ৬৭
৯০. আল্লামা ফখরুদ্দীন আবী তৃহান, *ফাতওয়ায়ে কাযীখান*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা .বি. খ. ৩, পৃ: ৩১২,৩১৩
৯১. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮৩
৯২. আল-কুরআন, ১২: ৫৬

অর্থা: জাবির (রা.) হ-ত বর্ণিত। তিনি ব-লন, আনসার-দর মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদম-ত উপস্থিত হ-য় আরয ক-র, আমার একটি দাসী আ-ছ, যার সা-থ আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক আমি তা পছন্দ করি না। তিনি ব-লন: তুমি ইচ্ছা কর-ল তার সা-থ আযল কর-ত পার। ত-ব জে-ন রাখ! তার ভা-গ্য যা নির্ধারিত আ-ছ, তা হবেই। রাবী বলেন, উক্ত ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি ব-লন, আমি তো এ ব্যাপা-র তোমা-ক পূ-র্বই ব-লছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারিত ক-র-ছন, তা অবশ্যই প্রকাশ পা-ব।[৯৩]

তবে মানুষ তার যৌনকার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বটে, কিন্তু একে কোনক্রমেই সরাসরি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না। তাই তাঁরা ম-ন ক-রন, ইহার নাম সরাসরি জন্ম নিয়ন্ত্রণ না রে-খ ‘‘গর্ভনি-রাধ’’বা “পরিবার পরিকল্পনা” রাখা যে-ত পা-র।

তবে আল্লামা তকী উসমানী ব-লন, আমা-দর সমাজে বর্তমানে গর্ভনিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ না-ম যেসকল কর্মকাণ্ড চলছে, এর অবৈধতার ব্যাপারে কোনো স-ন্দহ নেই। প্রথমতঃ পরিবার পরিকল্পনার অনুমতি যেসব স্থানে প্রমাণিত সেগুলোর সারকথা হলো, ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা করা। কিন্তু এটিকে একটি সার্বজনীন কর্মসূচী-ত পরিণত করা এবং এ কা-জর জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও উৎসাহ প্রদান মো-টই জা-য়য নয়। দ্বিতীয়তঃ এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্যও হারাম। কারণ, এর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রতার ভয়। আর এটি কুরআ-নর সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারাও ফাসিদ। মুবাহ (জায়িয) কাজও খারাপ নিয়-তর কার-ণ হারাম হ-য় যায়। ইরশাদ হ-চ্ছ

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ–

অর্থ: তোমরা তোমা-দর সন্তান-দর-ক দারি-দ্র্যর ভ-য় হত্যা ক-রা না। কারণ তা-দর-ক এবং তোমা-দর-ক আমিই তোমা-দর রিযি-কর ব্যবস্থা করি।[৯৪]

অতএব, এই কর্মকাণ্ড সৃষ্টিকর্তার রবূবীয়ত ও রায্যাকীয়ত ব্যবস্থাকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার নামান্তর। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ক-রন–وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِيْ الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

অর্থ: আর পৃথিবী-ত এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি।[৯৫]

আর কুদর-তর বিধান হলো, সর্বযু-গ উৎপাদ-নর পরিমাণ সে যু-গর চাহিদা অনুযায়ীই হ-য় থা-ক। যেমন, অতী-ত সমস্ত সফর হতো ঘোড়া ইত্যাদির উপর চ-ড়। সে যু-গ এ ধর-নর সফ-র কা-জ আসার মতো জন্তুর সংখ্যাও হতো বহুল পরিমা-ণ। এখন যে-হতু সফর অন্যান্য গাড়ি-তও হয়, ফ-ল ঘোড়া ইত্যাদির বংশও ক-ম গে-ছ। পক্ষান্ত-র বর্তমা-ন গোটা জীবনই পে-ট্রাল ও তে-লর সা-থ ঘূর্ণায়মান। অতএব, ভূমিও তার ভাণ্ডারগুলো অকৃপণভাবে খুলে দিচ্ছে। এই বাস্তব সত্যটিকেই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন-

وَاِنْ مِّنْ شَّيْئٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُه وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ–

অর্থ: আমার কা-ছ প্র-ত্যক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে, আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি।[৯৬]

এছাড়া দরিদ্রতার ভয় দেখি-য় মুসলমান-দর মা-ঝ পরিবার পরিকল্পনার ম-নাভাব গ-ড় তোলা, এটি ইসলাম ধর্মেরদুশমনদের একটি রাজনৈতিক প্রতারণামাত্র। এর দ্বারা তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, মুসলমান-দর সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ক রোধ করা। মুসলমান-দর বিচার-বি-শ্লষণ না ক-রই এর ফাঁ-দ পড়া উচিত নয়। কেননা, নবী করীম (সা.) ইরশাদ ক-রন–تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّيْ مُكَاثِرٍ بِكُمْ

অর্থ: তোমরা এমন স্ত্রী-লাক-দর বিবাহ করো, যারা স্বামী-দর অধিক মহব্বত ক-র এবং অধিক সন্তান প্রসব ক-র। কেননা, আমি (কিয়াম-তর দিন) তোমা-দর সংখ্যাধি-ক্যর কার-ণ (পূর্ববর্তী উম্মত-দর উপর) গর্ব প্রকাশ করব।[৯৭]

---

৯৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: আযল, খ. ১, পৃ. ৩১২-৩১৩, হাদীস নং- ২১৭৩

৯৪. আল-কুরআন, ১৭: ৩১

৯৫. আল-কুরআন, ১১: ৬

৯৬. আল-কুরআন, ১৫: ২১

অধুনা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণও বলেন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার এই কর্মকাণ্ড নেহা-য়ত ক্ষতিকর। প্র-য়াজন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও ইনসাফভিত্তিক সুষ্ঠু বন্টন এবং মানব সম্পদ-ক কা-জ লাগা-না। অতএব, মাথায় টুপি না লাগ-ল মাথা কে-ট ছোট কর-ব নাকি টুপি বড় কর-ত হ-ব? এর জবা-ব সবাই বল-ব টুপি বড় কর-ত হ-ব। ঠিক তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনগণকে মারার ব্যবস্থা না করে; বরং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনশক্তিকে কাজে লাগা-ত হ-ব। আর এটাই হ-ব বুদ্ধিমা-নর কাজ। অথচ সে কাজটিই আজ ব্যাহত হ-চ্ছ।

**জন্ম নিয়ন্ত্রণবাপরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি এবং এর হুকুম**

আমাদের সমাজে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার জন্য যেসকল প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে, এর মধ্যে কিছু পদ্ধতি আছে স্থায়ী এবং বেশকিছু পদ্ধতি রয়েছে অস্থায়ী বা সাময়িক।

**জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিসমূহ**

জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি হলো, এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা যা স্থায়ীভাবে পুরুষ বা নারীর প্রজনন ক্ষমতা তথা সন্তান দেয় বা নেয়ার শক্তি চিরতরে নষ্ট করে দেয়া।

**১. পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (ভ্যাসেক্টমি):**পুরুষের বন্ধ্যাকরণের জন্য সহজ অস্ত্রপচার বিশেষ। এতে অণ্ডকোষ থেকে বের হয়ে আসা দুটি শুক্রকীটবাহী নালিকা অংশত বা সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয় অথবা বেঁধে দেয়া হয়, ফলে বীর্যের কার্যক্ষমতা থাকে না। তবে ভ্যাসেক্টমীর ফলে স্বাভাবিক যৌন প্রক্রিয়া এবং সঙ্গমের আনন্দ হ্রাস পায় না।

**২. নারী বন্ধ্যাকরণ (টিউ-বক্টমি):** নারীর পেট অপা-রশন ক-র ডিম্বা-কা-ষর সা-থ জরায়ুর সং-যা-গর যে দুটি ফেলোপিয়ান টিউব রয়েছে, তা কেটে প্রান্তে বেঁধে দেয়া। ফলে ডিম্বের সঙ্গে শুক্রকীটের মিলন হতে পারে না বলে সন্তান ধার-ণর কোনো সম্ভাবনাও থা-ক না। এ-ক লাই-গশনও বলা হয়। এই প্রক্রিয়াতেও সহবাসের আনন্দানুভূতি ব্যাহত হয় না।

**বন্ধ্যাকর-ণর হুকুম:** শায়খ ড. সাঈদ রামাদান আল বুত্তীসহ হক্কানী ফকীহগণ বলেন, ইসলামে বন্ধ্যাকরণ হারাম। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহর প্রদত্ত আমান-তর খিয়ানত করা হয় এবং আল্লাহর কুদরতে সরাসরি আঘাত হানা হয়। এটা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্ত-নর সমতুল্য কারণ, এ-ত পুরু-ষর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা এবং নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতার উপর হস্ত-ক্ষপ করা হয়, যা ইসলাম কখ-না অনু-মাদন ক-র না।[৯৮]

উল্লেখ্য, কোনো ঔষধ সেবন, ইঞ্জেকশন বা অন্য যে কোনো পন্থায় প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হারাম।

**দলীল- ১.**

عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لَيْسَ لَنَا شَيْءُ، قُلْنَا اَلاَ نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ– ... ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتَ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُّوْا– اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ–

অর্থ: কায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধাভিযানে যেতাম, আর আমাদের কাছে জৈবিক চাহিদা পূরণের কিছু ছিল না (এতে আমরা যৌন পীড়নে ভুগতাম)। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যৌনশক্তি চিরতরে নি:শেষ করে দেয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি আমাদের জন্য তা নিষেধ করে দেন[৯৯] এবং এটি খারাপ হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি পাঠ করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা লংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[১০০]

**দলীল-২.** সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর বর্ণনায় আরেকটি হাদীসে এসেছে-

---

৯৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: কুমারী নারীকে বিবাহ করা, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং- ২০৫০

৯৮. *বার্থকন্ট্রোল: প্রিভেন্টিভ এন্ড কিওরেটিভ আসপেক্ট- প্রকাশকাল ১৯৭৬ইং*

৯৯. আল্লামা আবু আওয়ানা ই'য়াকুব ইবন ইসহাক, *মুসনাদ আবী আওয়ানা*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-মা'রিফাহ, ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ), খ. ৩, পৃ. ১০, হাদীস নং- ৪০০৫

১০০. আল-কুরআন, ৫: ৮৭

اَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ اَنْ يَّتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ –

অর্থ: উসমান ইবন মাযয়ূন (রা.) নপুংসক হয়ে যৌনশক্তি নি:শেষ করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে একাজ করতে নিষেধ করলেন।[১০১]

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতা নি:শেষ করা শরী'আত কর্তৃক সম্পূর্ণ হারাম এবং এ কাজ সীমা লংঘনের নামান্তর।

**জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিসমূহ**

**১.আই.ইউ.সি.ডি:**বীর্য যা-ত ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারে অথবা পারলেও নিষিক্ত ডিম্বাণু (জাই-গাট) যা-ত জরায়ুর ম-ধ্য প্রতিস্থাপিত হ-ত না পা-র এজন্য নারীর জরায়ুর ম-ধ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিক-ল্প একটি প্লাষ্টিক ক-য়ল (কপার-টি) সং-যাজন ক-র দেয়া হয়।

**হুকুম:** জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য জরায়ু-ত প্লাস্টিক ক-য়ল স্থাপন করা জায়েয নয়। কেননা, প্লাস্টিক ক-য়ল যে-হতু অ-ন্যর সাহায্য ছাড়া সং-যাজন করা যায় না। আর স্ত্রী-লাক-দর অ-ন্যর সম্মু-খ সতর খোলা হারাম। তাছাড়া কোনো সময় তা সম্পূর্ণ ভেত-র ঢু-ক গে-ল ছতর খোলা ছাড়া অপা-রশন করাও সম্ভব নয়।

**২. নিরাপদ সম-য় স্ত্রী স-ম্ভাগ:** গ-বষণা ক-র দেখা গে-ছ, ঋতু আরম্ভ হওয়ার দিন হ-ত হিসাব ক-র পবিত্র হওয়ার প্রথম তিন দিন এবং ঋতু আরম্ভ হ-ত হিসাব ক-র বিশ দিন প-র আট দিন অর্থাৎ বিশতম দিবস হ-ত আটাশতম দিবস পর্যন্ত আট দিন। প্রতি মা-স এই এগারো দিন স্ত্রী সহবা-স সাধারণত সন্তান ধারণ হয় না। এটা-কই নিরাপদ সময় বলা হয়।

উল্লেখ্য, সকল মহিলাদের নিরাপদ সম-য়র হিসাব এক ধরনের না হওয়ায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে সঠিক হিসাব জে-ন নেয়া যে-ত পা-র।

**হুকুম:** পরিবার পরিকল্পনার যতো পদ্ধতি রয়েছে এগুলোর মধ্যে উত্তম পদ্ধতি হলো ‘‘নিরাপদ সম-য় স্ত্রী সহবাস’’। এ পদ্ধতি নি:সন্দেহে জায়েয। কারণ প্রত্যেক স্বামীর এ অধিকার রয়েছে যে স্ত্রীর ঋতুহীন অবস্থায় যখন ইচ্ছা সহবাস করবে এবং যখন ইচ্ছা স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। একটু সংযমী হ-য় এই পদ্ধতি গ্রহণ কর-ল কৃত্রিম পন্থা অবলম্ব-নর কোনো প্রয়োজন হয় না। ফলে পাপবোধ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবংআত্মিক প্রশান্তিও অর্জিত হয়।

**৩. ডা-য়ফ্রাম বা পেশরী:** বীর্য জরায়ু-ত না পৌঁছার ল-ক্ষ স্ত্রীর জন-নন্দ্রি-য় ব্যবহার করার জন্য এক ধর-নর খাপবি-শষ, যা ক্ষণস্থায়ী।

**৪. কনডম:** এটাও বীর্য জরায়ু-ত না পৌঁছার ল-ক্ষ পুংজন-নন্দ্রিয়ে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের খাপ। অভিজ্ঞদের থেকে জানা গে-ছ, এ পদ্ধতি-ত যৌন কা-র্য পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ হতে বঞ্চিত হতে হয়।

**৫. গর্ভনি-রাধক ইন-জকশন, বটিকা, নরপ্ল্যান্ট বা পিল সেবন:** এগুলোর দ্বারাও সাময়িকভাবে গর্ভনিরোধ করা সম্ভব। তবে অনেক চিকিৎসক মনে করেন, এগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। অধিক সেবনের ফলে মহিলাদের সৌন্দর্য নষ্ট, হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, পিত্তথলিতে পাথর এবং শরীরে মারাত্মক জ্বালা-পোড়া শুরু হ-ত পা-র।

**হুকুম:** ৩নং, ৪নং এবং ৫নং পদ্ধতি ‘‘আযল’’-এর হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ, এসব পদ্ধতি আযল কার্যের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা যে-ত পা-র।

নিম্নে আযল সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আ-লাচনা করা হ-লা-

**৬.আযল:** পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভনি-রা-ধর আ-রকটি পদ্ধতি হলো আযল। ইসলা-মর প্রথম দি-ক গর্ভনিরোধের ক্ষেত্রে আযলই ছিল একমাত্র পদ্ধতি।

১০১. আল্লামা আবু আওয়ানা ই'য়াকুব ইবন ইসহাক, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮, হাদীস নং- ৩৩৯৮

**আযল(عزل)-এর আভিধানিক অর্থ:** عزل শব্দটি بَاب ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল- (১) আলাদা করা, (২) অপসারণ করা, (৩) বরখাস্ত করা, (৪) দূর করা, (৫) বের করা, (৬) প্রত্যাহার করা, (৭) বিচ্ছিন্ন করা, (৮) পৃথক করা, (৯) সরি-য় ফেলা, (১০) বিরত রাখা ইত্যাদি।[১০২]

**عَزْل (আযল)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা**

ইমাম নববী (রহ.) ব-লন–هُوَ اَنْ يُّسْقِطَ الْمَنِيَّ بِاَنْ يُّخْرِجَ الذَّكَرَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ حِيْنَ قُرْبِ الاِنْزَالِ وَقْتَ الْجِمَاعِ

অর্থ: সহবাসের সময় চরম উত্তেজনার মুহূর্তে স্ত্রী যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে বীর্যপাত করা-ক আযল ব-ল।
ত-ব, আযল জা-য়য কিনা, এ ব্যাপা-র বিতর্ক র-য়-ছ। যথা-

**ক. আযল বি-রাধীগ-ণর অভিমত:** ইবন হাজম, শায়খ মোহাম্মদ আবু জাহরা ও শায়খ আহ-মদ শাহনুভ প্রমুখ আযল অথবা গর্ভনি-রাধক যে কোনো প্রক্রিয়াকে শিশুহত্যা বলে অভিহিত করেন।তাই এসকল কোনোকিছুই জায়েয নয়।

**দলীল-১.** আল্লাহ তাআলার বাণীوَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ

**দলীল-২.** আল্লাহ তাআলার বাণী-وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থ: যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।[১০৩]
উল্লিখিত আয়াতদ্ব-য় সন্তান-ক হত্যা কর-ত নি-ষধ করা হ-য়-ছ এবং হত্যার প্রতি নিন্দা জানা-না হ-য়-ছ। আর আযল অথবা গর্ভ নি-রাধক যে কোনো পদ্ধতিই হলো শিশুহত্যা।

**দলীল -৩:**হাদীসে এসেছে-

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ اُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اُنَاسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِيْ الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَاِذَا هُمْ يُغَيِّلُوْنَ اَوْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ اَوْلاَدَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّسَاَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ–

অর্থ: জুদামা বিনত ওহাব আল আসাদিয়া (উক্কাছ-এর ভগ্নী) বর্ণনা ক-র-ছন, আমি অন্য-দর সহ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেছেন, ''আমি আল ঘায়লা (দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার মায়ের সাথে সহবাস করা) প্রায় নিষিদ্ধ ক-র দি-য়ছিলাম। অধ:পর আমি রোমান ও পারস্যবাসী-দর সম্ব-ন্ধ চিন্তা করলাম এবং জানলাম যে, তা-দর গর্ভবতী মা-য়রাও সন্তান-দর স্তন্যদান করা-তা এবং তা-ত তা-দর ক্ষতি হ-তা না।'' অত:প সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এটা ''আল ওয়াদ আল খাফী'' অর্থাৎ গুপ্ত শিশুহত্যা।[১০৪]

উক্ত হাদীসটি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আযল জা-য়য নয়। কেননা, নবী করীম (সা.) এটাকে ''গুপ্ত শিশুহত্যা'' ব-ল আখ্যা দি-য়-ছন।

**খ. আযল সমর্থক-দর অভিমত:** চার ইমামসহ জমহুর উলামা-য় কিরা-মর অভিমত হলো, গর্ভ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া হিসেবে আযল বৈধ। তবে তা স্ত্রীর সম্মতিক্রমে হওয়া চাই। কেননা, যোনীতে বীর্যপাতের দ্বারা স্ত্রীর আনন্দ লাভ করা, এটা তার ন্যায্য অধিকার। অধিকাংশ ফকীহ ম-ন ক-রন, স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল কর-ল তা মাকরূহ তানযীহী হ-ব। আর এর ওপর কিয়াস ক-রই পরবর্তী ফকীহগণ ব-লন যে, আয-লর ন্যায় ডা-য়ফ্রাম, কনডম, গর্ভনি-রাধক ইন-জকশন, বটিকা বা পিল সেবনও জায়েয আছে। তবে উদ্দেশ্য যেন খারাপ না হয়।

**দলীল- ১.**হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ–

---

১০২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫

১০৩. আল-কুরআন, ৮১: ৮-৯

১০৪. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: গীলা তথা স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগমের বৈধতা এবং আযল মাকরূহ হওয়া, খ. ৪, পৃ. ৪১৮, হাদীস নং- ৩৫৬৩

অর্থ: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.) হ-ত বর্ণিত। তিনি ব-লন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম-য় আমরা (সাহাবীগণ) আযল করতাম। অথচ ঐ সম-য় কুরআন নাযিল হচ্ছিল।[১০৫]

**দলীল- ২.** হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) হ-ত আ-রা একটি হাদীস বর্ণিত আ-ছ। তিনি ব-লন-

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا–

অর্থ: আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় আযল করতাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পৌঁ-ছ-ছ, কিন্তু তিনি আমা-দর-ক নি-ষধ ক-রননি।[১০৬]

এই হাদী-সর বর্ণনাকারী-দর একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান এ হাদী-সর সা-থ আ-রা যোগ ক-র-ছন, ‘‘এটা যদি নিষিদ্ধ হ-তা, তাহ-ল কুরআ-ন তা নি-ষধ করা হ-তা।’’

**দলীল-৩.** আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِيْ جَارِيَةً وَّاَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ وَاَنَا اُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ وَاِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ اِنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُوْدَةُ الصُّغْرٰى قَالَ كَذَبَتْ يَهُوْدُ لَوْ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَّخْلُقَه مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تَصْرِفَه–

অর্থ: আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) হ-ত বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদম-ত উপস্থিত হ-য় আরয ক-রন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি দাসী আ-ছ। আর আমি তার সা-থ সহবা-সর সময় ‘আযল’ করি। আর আমি এটা অপছন্দ করি যে, সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাই চাই যা অন্য লো-করা চায়। আর ইয়াহুদীরা ব-ল যে, আযল হলো ছোট শিশুহত্যা। এতদশ্রব-ণ তিনি ব-লন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা ব-ল-ছ, বরং আল্লাহ তাআলা যা-ক সৃষ্টি কর-ত চান, কেউই তার আগম-ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর-ত পা-র না।[১০৭]উক্ত হাদীসেও নবী করীম (সা.) প-রাক্ষভা-ব আয-লর অনুমতি প্রদান ক-র-ছন।

**দলীল-৫.**আযলকারী বা আযল অনু-মাদনকারী সাহাবী-দর নাম-

ক. হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা.)

খ. হযরত সা’দ ইবন আবী ওয়াক্কাছ (রা.)

গ. হযরত আবু আইউব আল আনছারী (রা.)

ঘ. হযরত যা-য়দ ইবন সাবিত (রা.)

ঙ. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.)

চ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)

ছ. হযরত আল হাসান ইবন আলী (রা.)

জ. হযরত খাব্বাব (রা.)

ঝ. হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)

ঞ. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ (রা.)।[১০৮]

**জবাব:**আযল না জায়েয প্রবক্তাগণের প্রথম দুই আয়া-তর জবাবে জায়েয প্রবক্তা ফকীহগণ ব-লন, যদি দারিদ্র্য ভ-য় আযল বা গর্ভনি-রাধক যে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ ক-র তাহ-ল তা ভিন্ন কথা। নতুবা, এ দুটি আয়াত দ্বারা আযল নাজা-য়য সাব্যস্ত করা কোনোক্রমেই সঠিক নয়। কারণ আল-কুরআ-নর হত্যা সংক্রান্ত দু’টি আয়া-তর ম-ধ্য আযল ও গর্ভপাত-ক অন্তর্ভুক্ত করা ভুল। কেননা, আয়াত দু’টি-ত ‘ওয়াদ’ শব্দ নয়, বরং ‘কাতাল’ (হত্যা) শব্দটি ব্যবহৃত হ-য়-ছ। আর হত্যা

১০৫. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: আযলের হুকুম, খ. ৪, পৃ. ৪১৩, হাদীস নং-৩৫৫৭

১০৬. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৪, হাদীস নং-৩৫৫৯

১০৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: আযল করা, খ. ১, পৃ. ৩১২, হাদীস নং- ২১৭১

১০৮. *ইসলামী ঐতি-হ্য পরিবার পরিকল্পনা,* পৃ. ১৬১; আল্লামা তাকী উসমানী, (অনুবাদ: মুফতী মোস্তাফিজুর রহমান কালাম), *ইসলাম ও যুক্তির নিরিখে জন্ম নিয়ন্ত্রণ*, ঢাকা: তেজগাঁও, ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স, ২০০৯, পৃ. ২১

তখনি সম্ভব যখন তা-ত জীবন বিদ্যমান থা-ক। কিন্তু এ বি-শ্ব এমন কোনোডাক্তার বা জ্ঞানী পাওয়া যাবে না, যিনি বীর্যে রূহ আ-ছ ব-ল মন্তব্য কর-বন।

অতএব, إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ অর্থাৎ, শর্ত পাওয়া না গে-ল শ-র্তর ফলাফল বাতিল হ-ব।

তাছাড়া আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, জাহেলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর ম-ন করতো এবং তা-দর-ক জীবন্তই মাটি-ত প্রোথিত ক-র দিতো। আর এমন জীবন্ত হত্যা তো সবার নিকটই হারাম।

**জুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদী-সর জবাব**

**১.**কোনো কোনোআলিম এ হাদীসটি-ক যঈফ ম-ন ক-র-ছন।

**২.**কোনোবিষয়-ক নিষিদ্ধ কর-ত হ-ল 'নস' (কুরআন ও হাদীস) দ্বারা বা তার ওপর কিয়াস ক-র নিষিদ্ধ কর-ত হয়। এছাড়া কোনোবিষয়-ক নিষিদ্ধ করা যায় না। অথচ আযল সম্প-র্ক কোনোনস বা কিয়া-সর কোনোবিধান নেই।

**৩.** ইমাম তাহাবী (রহ.)-এর ম-ত, সূরা মুমিনুন-এর ১২-১৪ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আযলকে গুপ্ত শিশু হত্যা ম-ন করা হতো কিন্তু উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আয়াতগুলো হলো-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ– ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ– فَتَبٰرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ–

অর্থ: আমি মানুষ-ক মাটির সারাংশ থে-ক সৃষ্টি ক-রছি। অত:পর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্ত (আলাক) রূপে সৃষ্টি করেছি। অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে (মুদগাহ) পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি (ইযাম) সৃষ্টি করেছি। অত:পর অস্থি-ক ঢে-ক দেই গোশত (লাহম) দ্বারা। অত:পর উহা-ক গ-ড় তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূ-প। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।[১০৯]

**৪.** হযরত ইবন আব্বাস ও আলী (রা.) আযল-ক শিশুহত্যা ম-ন ক-রননি। হযরত আলী (রা.) ব-লন, শিশুহত্যা তখনই হ-ত পা-র, যখন ৭ম স্ত-র উন্নীত হয়। কোনো কোনো সাহাবা-য় কিরাম আযল কর-তন। এটা যদি শিশুহত্যা বা কবীরা গুনাহ হতো, পবিত্র কুরআনে তা নিষিদ্ধ হতো অথবা নবী কারীম (সা.) তা সরাসরি নি-ষধ কর-তন।

**৫.** যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে থাকেন তাঁরাও বলে থাকেন যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আযল করা যে-ত পা-র। কিন্তু জাতীয় নীতি হি-স-ব তা প্রচলন করা যায় না। এ-তও বোঝা যায়, আযল বা গর্ভনি-রাধ শিশুহত্যা নয়।

**৬.** জুদামা বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আযলকে সর্বোচ্চ মাকরূহ তানযীহী বলা যায়। যেমন ম-ন ক-র-ছন ইমাম নববী ও ইমাম তাহাবী।

**প্রসঙ্গত:** উ-ল্লখ্য, কোনো কোনো ফিক-হর গ্র-ন্থ উ-ল্লখ আ-ছ নিম্নবর্ণিত কারণে গর্ভধারণের ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতগর্ভনি-রাধ জা-য়যআছে। যথা-

**ক.** মহিলা যদি গর্ভধার-ণর বোঝা বহন কর-ত অপারগ হয়।

**খ.** মহিলা যদি নিজ বাসস্থান থে-ক এত দূ-র থা-ক যেখা-ন তার স্থায়ীভা-ব অবস্থা-নর ই-চ্ছ নেই। আর এমন বাহ-ন সফর কর-ত হ-ব যার দ্বারা গন্ত-ব্য পৌঁছ-ত ক-য়ক মাস লে-গ যে-ত পা-র।

**গ.** স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক না থাকায় সম্পর্ক বি-চ্ছদ হওয়ার সম্ভাবনা থাক-ল।

**ঘ.** পূ-র্বর যে সন্তান মা-য়র কো-ল র-য়-ছ, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা থাক-ল।

**ঙ.** যু-গর প্রতিকূল অবস্থার কারণে সন্তান অসচ্চরিত্র এবং পিতা-মাতার অপমা-নর কারণ হওয়ার আশংকা থাক-ল।

**চ.** গর্ভধার-ণর কার-ণ মহিলার দুধ শুকি-য় যাওয়া এবং কো-লর সন্তান-ক লালন-পালন করার ম-তা অন্য ব্যবস্থা না থাকা বা কঠিন হওয়া।

**ছ.** কোনো দীনদার ডাক্তার যদি বলে গর্ভধারণ কর-ল মহিলার প্রাণহানি কিংবা কোনো অঙ্গহানি হওয়ার প্রবল আশংকা র-য়-ছ।

---

১০৯. আল-কুরআন, ২৩: ১২-১৪

**জ.** মহিলা যদি অসচ্চরিত্র হয় এবং স্বামী তার সাথে বিচ্ছেদের ইচ্ছাও রাখে।[১১০]
উপ-রাল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও ইমাম গাযযালী (রহ.) থে-ক আ-রা দু'টি অভিমত পাওয়া যায়-
**(ক)**সুখতর দাম্পত্য জীবন এবং স্বামীর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্য স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষণের উদ্দেশ্যে।
**(খ)**বৃহৎ পরিবার প্রতিপাল-নর কার-ণ সৃষ্ট অর্থনৈতিক দৈন্যতা-ক্লেশ পরিহার করার উদ্দেশ্যে। বহুসংখ্যক সন্তা-নর কার-ণ পিতা-মাতা অসৎ জীবন-যাপনে বাধ্য হতে পারে এবং জীবিকা সংগ্রহে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হ-য় যে-ত পা-র।
***** হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, শত্রু এলাকায় জন্ম হলে সন্তানের ইসলাম বিচ্যুত হতে বাধ্য হবার সম্ভাবনা থাকলে। সমকালীন ফকীহগণ সন্তান-দর পৃথক শয্যা ব্যবস্থা সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, প্রত্যেক পুত্র-কন্যার জন্যপৃথক ক-ক্ষর ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত যেকোনোদম্পতি সন্তান জন্মদান সাময়িকভা-ব বন্ধ রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত পা-র।[১১১] হাদীসটি হলো-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ–

অর্থ: আমর ইবন শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) ব-লন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ব-ল-ছন, যখন তোমা-দর সন্তানরা সাত বছ-র উপনীত হয়, তখন তা-দর-ক সালাত পড়ার নি-র্দশ দাও এবং তা-দর বয়স যখন দশ বছর হ-ব তখন (সালাতনা পড়-ল) এজন্য তা-দর-ক মারপিট করো এবং তা-দর (ছে-ল-মে-য়-দর) বিছানা পৃথক ক-র দাও।[১১২]

এক্ষেত্রে সমকালীন ফকীহগণের বিরোধিতা করে যারা নবী কারীম (সা.)-এর বাণীবর্ণনা করেন-

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ–

অর্থ:তোমরা এমন স্ত্রী-লাক-দর বিবাহ করো, যারা অধিক সন্তান প্রসব ক-র ।[১১৩]
তাঁদের উত্তরে বলেন, পূর্ণ হাদীসটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা.)-এর খিদম-ত উপস্থিত হ-য় ব-ল, আমি এক সুন্দরী ও সদ্বংশীয়া রমণীর সন্ধান পে-য়ছি, কিন্তু সে কোনো সন্তান প্রসব ক-র না (বন্ধ্যা)। আমি কি তা-ক বিবাহ করবো? তিনি ব-লন, না। অত:পর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। অত:পর তৃতীয়বার সে ব্যক্তি একই কথা বললে, নবী কারীম (সা.) উক্ত উক্তিটি ক-রন।
অতএব, এ উক্তিটির সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভ নিরোধ বা পরিবার পরিকল্পনার কোনো বিরোধ নেই। উক্ত হাদীসটির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বন্ধ্যা নারী-দর বি-য় না করা; বরং প্রজনন সক্ষম নারী-কই বি-য় করা। সুতরাং সন্তান জন্ম দেয়া যদি নিজ ও জাতির জন্য আপদ না হ-য় সম্প-দ পরিণত হয়, এ-দর ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে হারাম ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে যথাযথ দায়িত্বের সাথে উপযুক্ত শিক্ষা, চরিত্র গঠন, আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করা তথা প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে তা হবে অবশ্যই প্রশংসনীয়। কেননা, ইসলাম কেবল লোক বৃদ্ধির প-ক্ষ নয়; বরং প্রকৃত মুসলিম জনসংখ্যা বাড়া-নার প-ক্ষ। আর তাঁ-দর-ক নি-য়ই নবী করীম (সা.) কিয়াম-তর দিন গর্ব প্রকাশ কর-বন।[১১৪]

## এইডস রোগীর বিধি-বিধান

AIDS-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হলো-Acquired Immunodeficiency Syndrome.যাকে মরণব্যাধিও বলা হয়। আর HIV-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হলো- Human Immunodeficiency Virus. সুতরাং যে ভাইরাস দ্বারা এইডস রোগ সৃষ্টি হয়

১১০. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৭
১১১. *ইসলামী ঐতি-হ্য পরিবার পরিকল্পনা,* পৃ. ২৩৭-২৩৮
১১২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: বালকদের কখন থেকে সালাত পড়ার নির্দেশ দিতে হবে, খ. ১, পৃ. ৮২, হাদীস নং- ৪৯৫
১১৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: কুমারী নারীকে বিবাহ করা, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং- ২০৫০
১১৪. মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান, *আহ্‌কামুল হাদীস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, আগষ্ট-২০১৯ (৭ম মুদ্রণ)পৃ, ৪৯৯-৫১০

তাকে সংক্ষেপে HIV বলা হয়। এই HIV তিন ধরনের হয়: HIV-A, HIV-B ও HIV-C।[১১৫] HIV এমনই ভয়ংকর জাতের ভাইরাস যে এ ভাইরাস মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করার পর তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। ফলে HIV আক্রান্ত রোগী যে কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ধাবিত হয়, যা **১৯৮১** সালে সর্বপ্রথম এ ভাইরাসটি ধরা পড়ে।[১১৬]

এইডস একটি মরণব্যাধি রোগ হওয়ায় এ সম্পর্কে মানুষের ব্যাপক ভীতিরয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে অজ্ঞতা ও অজানা তথ্যের কারণে এইচ.আই.ভি. বহণকারী ব্যক্তি বা এইডস আক্রান্ত রোগীকে একইসঙ্গে সামাজিকভাবেও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ হয়। এইডস সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে এবং অযৌক্তিক ঘৃণার কারণে দু:খজনক আর অমানবিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবন দিতে হয়েছে অনেক এইডস রোগীকে।কিন্তু বাস্তব হলো, এইচ.আই.ভি. ছোঁয়াচে নয় এবং শুধুমাত্র স্পর্শের মাধ্যমেই এইচ.আই.ভি. এক শরীর থেকে অন্য শরীরে স্থানান্তরিত হতে পারে না। এ বিচারে, এইচ.আই.ভি. বহনকারী ব্যক্তি অন্য সাধারণ ব্যক্তিদের মতোই স্বাভাবিক আচরণ প্রত্যাশা করতে পারে।

**এইডস-এর উপসর্গ বা লক্ষণসমূহ-**

অধিকাংশ সময় প্রাথমিক পর্যায়ে এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ রোগীর মধ্যে থাকে না। এ ভাইরাসটি দেহের কোষে দ্রুত বিস্তার লাভ করার ফলে কিছুদিন পর যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তার মধ্য থেকে কিছু হলো-

১. অস্বাভাবিকভাবে দেহের ওযন কমতে থাকা, দু'মাসের মধ্যে দশ পাউন্ডের ওযন হ্রাস পাওয়া;
২. এক মাসের বেশি সময় ধরে সর্বক্ষণ কিংবা থেমে থেমে জ্বর থাকা;
৩. এক মাসের বেশি সময় ধরে ডায়রিয়া থাকা;
৪. এক মাসের বেশি সময় ধরে ক্রমাগত কাশি হওয়া;
৫. ফুসফুসে ঘা বা সংক্রমণ হওয়া;
৬. সারা শরীরে চুলকানি হওয়া;
৭. ত্বকে সংক্রমণসহ Kapasis Sarcoma নামক কঠিন চর্মরোগ হওয়া;
৮. বার বার মুখে, জিহ্বায় কিংবা গলায় চক্রাকার সংক্রমণ (Candidiasis) হওয়া;
৯. বগলের নিচে ও রানের মাঝখানসহ সারা দেহের লসিকা গ্রন্থি (Iymph Nodes) ফুলে যাওয়া;
১০. শরীর ক্রমশ শুকিয়ে গিয়ে কাঁপতে থাকা; ইত্যাদি।[১১৭]

**এইচ.আই.ভি. যেভাবে ছড়ায়**

এইচ.আই.ভি.বহনকারী কোনো ব্যক্তির শরীর থেকে অন্য কোনো ব্যক্তির শরীরে HIV প্রবেশ করালেই কেবল HIVছড়াতে পারে। HIV বহনকারী ব্যক্তির শরীর থেকে অন্য স্বাভাবিক কোনো ব্যক্তির শরীরে HIV প্রবেশের কয়েকটি মাধ্যম রয়েছে:

১. এইচ.আই.ভি.বহণকারী ব্যক্তির সঙ্গে অরক্ষিত অবস্থায় স্ত্রী যোনী বা মলদ্বার বা মুখে যৌন সম্ভোগ করলে।
২. এইচ.আই.ভি.বহনকারী ব্যক্তির শরীরের রক্ত অন্য কোনো শরীরে প্রবেশ করালে।
৩. এইচ.আই.ভি. বহনকারী ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিঞ্জ অন্য কেউ ব্যবহার করলে।
৪. এইচ.আই.ভি.বহনকারী মা যখন সন্তান সম্ভবা হন অথবা সন্তান জন্মদানের সময়ে অথবা সন্তানকে দুধ পান করানোর মাধ্যমে শিশুর শরীরে HIV অনুপ্রবেশ করলে।
৫. এইচ.আই.ভি.বহনকারী কোনো ব্যক্তির ব্যবহৃত কোনো জিনিসপত্রে যদি সংক্রামক রক্ত লেগে থাকে এবং তা ব্যবহারের ফলে যদি শরীরের উন্মুক্ত বা কাটা-ছেড়া ত্বকের সংস্পর্শে আসে।[১১৮]

---

১১৫. গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইফা. ডিসেম্বর ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৬১০
১১৬. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
১১৮. ডা. মালিহা শিফা, *https://www.banglanews24.com/health/news/bd.* "এইডস সম্পর্কে জানা-অজানা", আপডেট: ০১.১৪.২০১২ (থেকে উদ্ধৃত)

**নিম্নোক্তভাবেও এইচ.আই.ভি. জীবাণু ছড়ায়-**

১. পুরুষে পুরুষে যৌন মিলনে;

২. নারীর সাথে নারীর যৌন মিলনে;

৩. স্বামী পর নারীর সাথে দৈহিক মিলন করলে;

৪. স্ত্রী পর পুরুষের সাথে দৈহিক মিলন করলে;

৫. জন্মসূত্রে অর্থাৎ পিতা-মাতার মধ্যে এইডস থাকলে তা সন্তানের মাঝে সংক্রমিত হয়;

৬.অধিক মাত্রায় মদ সেবন করলে।[১১৯]

**যেভাবে এইডস ছড়ায় না**

এইচআইভি বহনকারী ব্যক্তির সঙ্গে যে সকল সম্পর্ক করলে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে না তা হলো:

১। এইচ.আই.ভি আক্রান্ত ব্যক্তি কারো শরীরের ওপর হাঁচি, কাশি দিলে, চোখের জল, থুথু বা ঘাম ফেললে, নাক ঝাড়লে;

২। হ্যান্ডশেক, কোলাকুলি, স্পর্শ, চুমু কিংবা কথা বললে;

৩। একই পুকুর, গোসলখানা, পায়খানা, তোয়ালে, লুঙ্গি, গামছা ব্যবহার করলে;

৪। একই থালা-বাসন, কাপ-পিরিচ, তৈজসপত্র ব্যবহার করলে;

৫। একই আসবাবপত্র ব্যবহার করলে;

৬। এইচ.আই.ভি বহনকারী ব্যক্তির রান্না করা খাবার খেলে;

৭। মশা,মাছি বা পোকামাকড় কিংবা পশুর কামড়ে;

৮। একই বিছানা ব্যবহার করলে বা একই বাড়িতে অবস্থান করলে

৯। একই টেলিফোন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করলে;

১০। এইচআইভি মুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করে রক্তদান করলে।

উল্লেখ্য, এইচ.আই.ভি.-তে স্নেহ পদার্থের আবরণ (envelop) থাকায় এইচ.আই.ভি. অত্যন্ত ভঙ্গুর। ফলে এরা শরীরের বাইরে বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে না। শরীরের অধিকাংশ ক্ষরিত তরলেই এইচ.আই.ভি. জীবাণু থাকে। কিন্তু এর আয়ুষ্কাল কম হওয়ায় রক্ত বা যৌন মিলনের মাধ্যমে সরাসরি শরীরে প্রবেশ করতে না পারলে সংক্রমণের তেমন আশংকা নেই। তাই এইচ.আই.ভি. বহনকারী রোগীকে চুমুও দেয়া যায়।তবে চুমু দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বিশেষ করে এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে যদি কোনো কাটা-ছেড়া, ঘা বা ক্ষত থাকে তবে তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং Deep Kissing পরিহার করা উচিত।[১২০]

**এইচ.আই.ভি. জীবাণু কোথায় থাকে-**

১. মানুষের বীর্যে, ২. বীর্যপাতের আগে নির্গত পিচ্ছিল রসে (মযী), ৩. যোনি নিঃসৃত রসে, ৪. মানুষের রক্তে, ৫. মায়ের বুকের দুধে, ৬. প্রস্রাবে, ৭. অশ্রুতে এবং ৮. মুখের লালায়।

**এইডস প্রতিরোধে করণীয়-**

* ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এইডস প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলা। শুধু বিশ্বস্ত একজন স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখতে হবে এবং একাধিক যৌনসঙ্গী পরিহার করতে হবে।

* যৌনসঙ্গীর এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা অথবা নিয়মিত ও সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করা।

* শরীরে রক্ত বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের প্রয়োজন হলে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যে রক্ত বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এইচ.আই.ভি. নেই।

* একবার ব্যবহার করা যায় এমন জীবাণুমুক্ত সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।

---

১১৯ . মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১২০ . *https://www.banglanews24.com/health/news/bd.* প্রাগুক্ত

* পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সুচ, সিরিঞ্জ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে নিশ্চিত জীবাণুমুক্ত করে নেয়া।

* দেখা গেছে, যৌনরোগ বা প্রজণনতন্ত্রের সংক্রমণ থাকলে এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই কারো যৌনরোগ বা প্রজণনতন্ত্রের সংক্রমণ থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করানো।

* জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রতিরোধমূলক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া।[১২১]

**কারও নিজের শরীরে এ ভাইরাস পাওয়া গেলে তার করণীয়-**

* মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে সহজভাবে এর মোকাবেলা করা,

* দুশ্চিন্তা এড়িয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা,

* এসময় ভালো থাকার জন্য ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা,

* পুষ্টিকর ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া,

* নিজের টুথব্রাশ, রেজার, ব্লেড, ক্ষুর অন্যকে ব্যবহার করতে না দেয়া,

* স্বাভাবিক কাজকর্ম, বিশ্রাম ও প্রতিদিন ব্যায়াম করা,

* যৌন মিলনের সময় অবশ্যই কনডম ব্যবহার করা,

* মহিলাদের ক্ষেত্রে বাচ্চা নিতে চাইলে বা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে চাইলে সন্তান আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।[১২২]

এইডসের কোনো প্রতিষেধক বা টিকা আবিষ্কার হয়নি। এর যে চিকিৎসা বের হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া এ চিকিৎসা শুধু এইডস আক্রান্তের সময়কে বিলম্বিত করে। এইডস পুরোপুরি নিরাময় করে না।

তাই, এখন পর্যন্ত এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো- এইডস সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা এবং সে অনুযায়ী সচেতন হয়ে নিরাপদ জীবনযাপন করা। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সুতরাং এইডস বা এ জাতীয় কোনো রোগ (যেমন-করোনা) কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তার জন্য নিজ পরিবার ও সমাজে হেয় এবং তুচ্ছ হওয়ার ভয়ে রোগ গোপন রাখা জায়েয হবে না। কারণ এইডস বা করোনা আক্রান্ত রোগীর রোগ গোপন রাখা তার পরিবার ও সম্পৃক্তশীল ব্যক্তিবর্গের ক্ষতির কারণ হতে পারে। আর এক্ষেত্রে তার নিজের ক্ষতি ব্যক্তিগতকিন্তু পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সমষ্টিগত হওয়ায়তার সাথে সম্পৃক্ত ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দেয়াতার ওপর ওয়াজিব যাদের ব্যাপারে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে।[১২৩]

**ডাক্তারের জন্য এইডস বা এ জাতীয় রোগ জনসমাজে প্রকাশের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান**

রোগী নিজের রোগ বিষয়ে যতটুকু না জানে, ডাক্তাররা নিজ রোগীর গোপনীয় বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক বেশি অবগত থাকেন। এমতাবস্থায় একজন ডাক্তারের শরঈ, নৈতিক ও আইনত দায়িত্ব হলো, নিজ চিকিৎসাধীণ রোগীর গোপন কথা প্রকাশ না করা, যদ্বারা রোগীর ক্ষতি বা সমাজে দুর্নাম হওয়ার আশংকা আছে। আবার কোনো কোনো অবস্থায় গোপন রোগ প্রকাশ না করলে তার সঙ্গে সম্পর্কশীল ব্যক্তিবর্গের ভীষণ ক্ষতির আশংকা এবং কোনো সময় অসুস্থ ব্যক্তির দোষ ঢেকে রাখা অসংখ্য লোকের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এহেন অবস্থায় একজন মুসলমান ডাক্তার বড়ই দ্বিধা-দ্বন্ধে থাকেন। গোপন রোগের কথা ফাঁস না করেলে অন্যান্যদের যেমন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনিভাবে রোগের কথা বললেঅন্যদের সামনে রোগীর লজ্জিত হতে হয়।

উল্লেখ্য ইসলামে গীবত, মুসলমানের দোষ ও দুর্বলতা প্রকাশ করা যদিও কবীরা গোনাহ তথাপি কোনো বৈধ উপকারের লক্ষে গীবত ও তথ্য ফাঁস করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা প্রকাশ করা জায়েয এবং কখনো ওয়াজিব হয়ে যায়। এজন্যই মুহাদ্দিসগণ যেখানে গীবতের নিন্দনীয়তা শিরোনামে পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন, এর পাশাপাশি কোনো অবস্থায় অন্যের

---

১২১ . মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২,৮৩

১২২ . *https://www.banglanews24.com/health/news/bd.*প্রাগুক্ত

১২৩ . মুফতি আন্‌ওয়ার শাহ, *ইসলাম ও আধুনিক মেডিকেল মাসাইল*, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: জামিয়া ফারুকিয়া ওয়ায়েজুল উলূম ইসলামাবাদ, সরাইল, মার্চ-২০১১খ্রি. পৃ. ২৭

দোষ বর্ণনা করা যাবে, তাও বর্ণনা করেছেন। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ বর্ণনা করেছেন-باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد و الريب

অর্থ: ফেতনা-ফ্যাসাদকারীর গীবত বৈধ হওয়ার বর্ণনা।

সুতরাং ডাক্তারের জন্যও করণীয় হলো যদি কোনো রোগ থেকে ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে তা জানিয়ে দেয়া। এতে তার গীবত হবে না। কারণ গীবতকে যে সকল কারণে বৈধ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলোتحذير المسلم من الشر বা মুসলমানকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।[১২৪]

এছাড়া ইমাম নববী (রহ.) গীবত বৈধ হওয়ার যে ৬টি কারণ এবং আল্লামা শামী (রহ.) যে ১১টি কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন এগুলোর সারাংশ হলো- দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি দূর করা, নিজ বৈধ অধিকার আদায় করা এবং সঠিক পরামর্শ দেয়া কিংবা বাস্তব অবস্থা উদঘাটনের উদ্দেশ্যে অন্যের দোষ প্রকাশ করা জায়েয।
হাফেয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

قال العلماء تاب الغيبة فى كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا الى الوصول اليه بها كالتظلم و الاستعانة على تغيير المنكر و الاستفتاء و المحاكمة التحذير من العشر و يدخل فيه تجريح الرواة و الشهود و اعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده و جواب الاستشارة فى نكاح او عقد من العقود و كذا من راى متفقها يتردد الى مبتدع او قاسق و يخاف عليه الاقتداء به و ممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق او الظلم او البدعة–

অর্থ: উলামায়ে কিরাম বলেন, এমন উদ্দেশ্য গীবত জায়েয যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ এবং এটা ব্যতীত এই উদ্দেশ্য অর্জনের বিকল্প পথ নেই। যেমন, যুলুম প্রতিহত করা, অসৎ কাজের সংশোধনে সাহায্য নেয়া, ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করা কাজীর দরবারে মুকাদ্দামা নিয়ে যাওয়া এবং অন্যদেরকে অনিষ্টতা থেকে বাঁচানো। হাদীস বর্ণনাকারী ও সাক্ষীদের ওপর দোষত্রুটি বলাও এর মধ্যে শামিল। দায়িত্বশীলদেরকে তাদের অধীনস্থদের অবস্থা অবগত করা, বিবাহ বা অন্যকোনো মুআমালা সম্পর্কে পরামর্শ কামনাকারীকে পরামর্শ দেয়া, যদি কোনো তালেবে এলেমকে কোনো ফাসেক ও বেদআতীর নিকট আসা-যাওয়া করতে দেখা যায় এবং এর দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তাকে এ সম্পর্কে অবগত করা, এছাড়া যেসকল লোক প্রকাশে অত্যাচার, গোনাহ ও বিদআতে লিপ্ত তাদের গীবত বা দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাও জায়েয।[১২৫]

**এইডস বা এ জাতীয় রোগীর প্রতি সমাজের দায়িত্ব**

এইডস, করোনা, প্লেগ বা এ জাতীয় ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত লোকদের ব্যাপারে পরিবার-পরিজন ও সমাজের দায়িত্ব হলো, চিকিৎসায় তার সাহায্য করা এবং সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। মহামারী-আক্রান্ত এলাকা থেকে সুস্থ লোকদের পলায়ন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে নিষেধ করেছেন এর একটি উপকার হলো, মানুষ যদি পলায়ন করে চলে যায় তাহলে অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে দেখাশোনা করার মানুষ পাওয়া যাবে না। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন-

و لو رخص للاصحاء فى الخروج لما بقى فى البلد الا المرضى الذى اقعدهم الطاعون فانكسرت قلوبهم و فقدوا المتعهدين و لم يبق فى البلد من يسقيهم الماء و يطعمهم الطعام و هم يعجزون عن مباشرتهما بانفسهم فيكون ذلك سعيا فى اهلاكهم تحقيقاً–

১২৪. আল্লামা শামসুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান, *ফাতহুল মুগীস*, সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, ১৪২৬ হি. খ. ৩, পৃ. ২৬৭

১২৫. আল্লামা আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, সৌদি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০১ (প্রথম প্রকাশ), খ. ১০, পৃ. ৪৮৬

অর্থ: যদি সুস্থ ব্যক্তিদেরকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তবে শহরে শুধু ঐ সকল অসুস্থ ব্যক্তিই থাকবে যাদেরকে মহামারী মাজুর তথা অক্ষম বানিয়ে রেখেছে। তখন তাদের মন ভেঙ্গে যাবে এবং দেখাশোনা থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি ঔষধ সেবন করানোর মতো লোকও পাওয়া যাবে না এবং তারা নিজেরাও এ সকল প্রয়োজনীয়কাজ আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে অক্ষম হয়ে যাবে। এটা তাদেরকে নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের চেষ্টা করার নামান্তর হবে।[১২৬]

অতএব এ সকল লোকদের সেবা-শুশ্রূষা ও দেখা-শোনাতে কোনো ধরনের ত্রুটি না করা উচিত। জুমআ, জামাআত ও সম্মেলন স্থানেও তাদের নিয়মিত উপস্থিত না হওয়া উচিত। যদিও কোষ্ঠ রোগীর আধিক্যের কারণে তাদের জন্য আলাদা মসজিদ নির্মাণ করা ও তাদেরকে সাধারণ মসজিদে আসা যাওয়া থেকে বাধা দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, তারা মসজিদে আসা-যাওয়া করবে।[১২৭]

### রোগীর শিক্ষা-দীক্ষার হুকুম

যদি কোনো সমাজে ছোঁয়াচে রোগী বাচ্চাদের সংখ্যা অধিক হয়ে যায়, তাহলে প্রশাসন ও সেবামূল সংগঠনের জন্য উচিত হবে এরকম অপারগদের জন্য আলাদা কোনো পাঠশালা তৈরি করা। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে ফোকাহায়ে কিরামের মতামত হলো-

و اذا كثر عدد الجذامى فقال الاكثرون يؤمرون ان ينفردوا عن مواضع الناس و لا يمنعون عن التصرف فى حوائجهم–

অর্থ: যদি কুষ্ঠ রোগীদের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে অধিকাংশ ফকীহ বলেন, তাদেরকে মানুষ থেকে দূরে থাকার আদেশ করা হবে। তবে তাদেরকে নিজের প্রয়োজনীয় লেনদেন থেকে নিষেধ করা হবে না।[১২৮]

সুতরাং তাদেরকে সাধারণ শিক্ষালয় থেকে তখনই পৃথক রাখা যাবে যখন তাদের জন্য পৃথক কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এইডস, করোনা বা এ ধরনের ১/২ জন রোগীর ক্ষেত্রে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষালয়ে ভর্তি করা হলেও অন্য শিক্ষার্থীদেরকে তার রোগ ও অন্যান্য সতর্কতামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হবে। তবে শুধু ধারণাপ্রসূত তাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

### ইচ্ছাকৃতভাবে রোগ স্থানান্তর করার হুকুম

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের মধ্যে এই রোগ স্থানান্তর করে এবং এটা তার মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে মালিকিয়্যাহ ও শাওয়ায়েফের মতে, এমন ব্যক্তিকে 'কিসাস' হিসেবে হত্যা করা হবে। কেননা এটা বিষপান করানোর মতো। আর এমন মৃত্যু, মৃত্যুদণ্ডের কারণ। ইবন কুদামা (রহ.) বলেন-

ان يسقيه او يطعمه شيئاً قاتلا فيموت به فهو عمد موجب للقود اذا كان مثله يقتل غالبا–

অর্থ: বিষপান করানো অথবা কোনো ধ্বসাত্মক জিনিস খাওয়ানো এবং এর কারণে মৃত্যু হওয়া এবং এই ধরনের জিনিস সাধারণত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, তাহলে এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে মনে করা হবে এবং এ কারণে রক্তপণও ওয়াজিব হবে।[১২৯] আর এটাই মালিকী মাযহাবের অভিমত।

ইমাম শাফী (রহ.)-এরও এ ধরনের একটি অভিমত রয়েছে। ইমাম শাফী (রহ.)-এর দ্বিতীয় অভিমত হলো, যদি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়, আর মেহমান নিজের অজান্তে বিষ পান করে মারা যায় তাহলে তার ওপর 'রক্তপণ' ওয়াজিব হবে 'কিসাস' নয়। আর হানাফীদের মূলনীতি হলো, কারণ হিসেবে হত্যাকারীর ওপর 'রক্তপণ' ওয়াজিব হয়।–اما القاتل بسبب اذا تلف فيه ادمى الدية على العاقلة

অর্থ: এবং যদি হত্যার চেয়ে কম ক্ষতি হয় তাহলেও তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব। যদি এর মধ্যে সীমালঙ্ঘন অন্তর্ভূক্ত হয়।[১৩০]

---

১২৬. আবু হামিদ মোহাম্মাদ ইবন মোহাম্মদ আল-গাযযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, তা.বি. খ. ৪, পৃ. ২৭৯

১২৭. মুফতি আন্ওয়ার শাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১২৮. ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত: ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ), খ. ১৫, পৃ. ১৩০

১২৯. মুহাম্মদ ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, সৌদি আরব, রিয়াদ, দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৯৭ (তৃতীয় প্রকাশ), খ. ১১, পৃ. ২১১

অতএব যদি অসুস্থ ব্যক্তির এই কাজের কারণে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহলে তার ওপর ‘রক্তপণ’ ওয়াজিব হবে। আর যদি মৃত্যু না হয়, তবে সুস্থতার মারাত্মক ক্ষতি হয় তাহলে উপযুক্ত জরিমানা ওয়াজিব হবে। এছাড়া প্রশাসন যথাযোগ্য শাস্তিও দেবে। ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়্যাতে আছে –اذا سقى انسانا شرابا مسموما فمات فعليه التعزير

অর্থ: কোনো মানুষকে বিষাক্ত পানীয় পান করানোর ফলে যদি সে মারা যায় তাহলে তার ওপর তাজীর (শাস্তি) ওয়াজিব হবে।[১৩১]

আর যদি এমন হয় যে রোগ স্থানান্তর করার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত ছিল, তখনও সে দায়ী হবে। কেননা কেউ যদি কোনো মানুষের ক্ষতির কারণ হয় তাহলে তার আসবাব ও নড়াচড়া যাই হোক ক্ষতিপূরণ দেয়া তার দায়িত্ব। তাই বলা হয়-

لو سقط من ايديهم اجر او حجارة او خشب فاصاب انسانا فقتله فانه يجب الدية على عاقلة من سقط ذلك من يده و عليه الكفارة–

অর্থ: যদি হাত থেকে ইট, পাথর অথবা কাঠ পড়ে যায় এবং কারো শরীরে গিয়ে লাগে এবং তার মৃত্যু হয় তাহলে যার হাত থেকে পড়েছে, তার আকেলার ওপর রক্তপণ ‘দিয়ত’ এবং তার নিজের ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।[১৩২]

**রোগের কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের হুকুম**

মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাব মতে, বিবাহও ঐ সকল লেনদেনের অন্তর্ভূক্ত যা দোষের কারণে ভঙ্গ করা যেতে পারে। যদি বিবাহের পরে স্বামীর মধ্যে এমন কোনো দোষ দেখা দেয়, যা বিবাহের সময় ছিল কিন্তু মহিলাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত তিন ইমামের নিকট মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে। যে সকল দোষের কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দেয়া হয়েছে, যদিও তার বিস্তারিত বর্ণনায় মতভেদ রয়েছে, তবু মৌলিকভাবে এটা দু’ধরনের। যথা:

**এক.** যা যৌন মিলনের ক্ষেত্রে একে অন্যের থেকে উপকৃত হওয়ার অযোগ্য বানিয়ে দেয়।

**দুই:** যা ঘৃণাযোগ্য হয় এবং তা সংক্রমিত হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন: শ্বেত ও পাগলামী।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট স্বামীর পুরুষত্বহীনতা বা পুরুষাঙ্গ কর্তিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় মহিলা বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি করতে পারবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)–এর নিকট পাগলামী ও শ্বেতরোগের কারণেও মহিলা বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি করতে পারে। মুতাআখখিরীনে হানাফিয়্যাও এরই ওপর ফাতওয়া দিয়েছেন।

সাধারণভাবে উলামায়ে কিরাম মহিলা পৃথক হওয়ার অধিকারকে পাগলামী, শ্বেত ও কুষ্ঠরোগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বর্ণনা করেন। কিন্তু কিছু বর্ণনা দ্বারা অনুমান হয়, এই সীমাবদ্ধতা ঠিক না। আল্লামা কাসানী (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে-

خلوه من كل عيب يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون و الجذام و البرص شرط للزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح–

অর্থ: বিবাহ আবশ্যক হওয়ার জন্য স্বামী এমন সকল দোষ থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক, যেগুলো থাকাবস্থায় তার সাথে ক্ষতিবহন করা ব্যতীত মহিলা থাকতে পারে না। যেমন: শ্বেত, কুষ্ঠ, পাগলামী। সুতরাং এই সকল রোগের কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যেতে পারে।[১৩৩] জাইলায়ী (রহ.) বলেন-

و قال محمد ترد المرأة اذا كان بالرجل عيب فاحش بحيث لا تطيق المقام معه لانها تعذر عليها الوصول الى حقها لمعنى فيه فكان كالجب والعنة–

---

১৩০. ইমাম জালাল উদ্দিন ইবন শামসুদ্দিন আল-কারলানী, *আল-কিফায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুক আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি. খ. ৮, পৃ, ১৪৩

১৩১. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, *আল-ফিকহু ‘আলাল মাযাহিবিল ‘আরবা‘আ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল আরকাম, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, খ. ১, পৃ. ২৭৮

১৩২. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৯

১৩৩. ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৬৯

অর্থ: ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, যদি স্বামীর মধ্যে এমন কোনো দোষ থাকে যার কারণে মহিলা তার সাথে থাকতে পারে না, তাহলে মহিলা বিবাহ-বিচ্ছে করতে পারে। কেননা ঐ সময় মহিলার জন্য নিজ হক আদায় করা কষ্টকর হয়ে যাবে। অতএব এটা পুরুষাঙ্গ কর্তিত ও পুরুষত্বহীনতার মতো দোষ বলে গণ্য হবে।[১৩৪]

মোটকথা, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট মহিলা প্রত্যেক সংক্রামক এবং ঘৃণার যোগ্য অসুস্থতার ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করতে পারে। এটাই শরী'আত মুতাবেক এবং মূলনীতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কাওয়ায়েদ অনুযায়ী। সুতরাং আইম্মায়ে ছালাছা ব্যতীত হানাফিয়াদের নিকটও এইডস ঐ সকল রোগের অন্তর্ভূক্ত যার কারণে মহিলার বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আছে। কেননা, শ্বেত ও কুষ্ট রোগ থেকেও বেশি ঘৃণ্য ও ছোঁয়াচে। আর যৌন মিলনও যেহেতু এই রোগ সংক্রমিত হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এজন্য এইডস আক্রান্ত স্বামী তার স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীন ব্যক্তিরই হুকুমে। কেননা সে ঐ রোগ সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে এই পুরুষ থেকে মনের চাহিদা পূর্ণ করতে পারবে না। অতএব এমন পুরুষের ক্ষেত্রে মহিলা বিবাহ-বিচ্ছে করার অধিকার রাখে।[১৩৫]

**রোগের কারণে গর্ভপাত করার হুকুম**

এইডসসহ এমন কিছু রোগ রয়েছে, যেগুলো খুবই মারাত্মক এবং ছোঁয়াচে। গর্ভকালীন, ভুমিষ্ট বা দুধপানের সময় বাচ্চার সংক্রমণ হওয়ার পূর্ণ আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় মহিলার গর্ভপাত করার বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের হুকুম হলো- গর্ভের দু'টি স্তর রয়েছে। যথা:

(ক) ১২০ দিনের পর যখন আত্মা সৃষ্টি হয়ে যায়।

(খ) ১২০ দিনের পূর্বে যখন আত্মা সৃষ্টি হয় না।

আত্মা সৃষ্টি হওয়ার পর বাচ্চা রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকা সত্ত্বেও গর্ভপাত ঘটানো জায়েয হবে না। কেননা আত্মা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা ও ঐক্যমত রয়েছে। হাফেয ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন –اسقاط الحمل حرام باجماع المسلمين

অর্থ: গর্ভপাত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।[১৩৬] শায়খ আহমদ আলীশ মালেকী বলেন-

التسبب فى اسقاطه بعد نفخ الروح فيه حرام اجماعا و هو من قتل النفس–

অর্থ: আত্মা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাতের মাধ্যমগুলো অবলম্বন করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এবং এটা মানব হত্যার অন্তর্ভুক্ত।[১৩৭]

আত্মা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ওযরবশত গর্ভপাতের সুযোগ আছে। ফোকাহায়ে কিরাম ওযরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, এখনো দুধপানকারী সন্তান মায়ের কোলে আছে এবং পিতার এতটুকু সামর্থ্য নেই যে অন্যকোনো ধাত্রী দ্বারা দুধপান করাতে পারবে। তখন এই নবজাতকের খাবারের প্রয়োজনের লক্ষে গর্ভপাত করাতে পারবে, যাতে দুধ বন্ধ না হয়। সুতরাং বাচ্চা উত্তরাধিকারীসূত্রে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে জন্ম নেয়া স্পষ্টতই এর চেয়ে বড় ওযর। এজন্য ১২০ দিনের নিম্নের গর্ভ নষ্ট করতে পারে এবং মহিলা নিজে, স্বামী ও প্রশাসন সবাই এর অনুমতি প্রাপ্ত।

**মৃত্যুরোগের হুকুম**

এইডস, প্লেগ, ক্যান্সার, কোভিড-১৯ তথা করোনা এবং এ জাতীয় রোগ যখন ডাক্তারী দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসার অযোগ্য স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য মৃত্যুরোগ বা 'মারজুল মউত' হুকুম হবে কি না এবং এ রকম ব্যক্তির জন্য মৃত্যুরোগের ও মৃত্যুর বিধান চালু হবে কি না এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

তবে মৃত্যুরোগের সংজ্ঞার ব্যাপারে বিভিন্ন মত বর্ণিত আছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন: আল্লামা হাছকাফী (রহ.) লিখেন, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া এবং সে ঘর থেকে বের হয়ে নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করতে অক্ষম হওয়াই মৃত্যুরোগ।[১৩৮]

---

১৩৪. ইমাম ফখরুদ্দীন উসমান ইবন আলী, *তাবঈনুল হাকাইক*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ২৪৬

১৩৫. মুফতি আন্ওয়ার শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৩৬. মুস্তফা আল-'আদবী, *জামিউ আহ্কামিন নিসা*, মিশর: কায়রো, দারু ইবন আফ্ফান, ১৯৯৯, খ. ৪, পৃ. ৬০৭

১৩৭. আল্লামা আবু ঈসা সাইয়িদী মুহাম্মদ আল-হুদা, *আন-নাওয়াযিলুস সুগরা*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.খ. ২, পৃ. ১৯২

ফকীহ আবুল লাইছ থেকে বর্ণিত, মৃত্যুরোগ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শয্যাশায়ী হওয়া আবশ্যক না। তিনি একে যথেষ্ট মনে করেন, সাধারণভাবে এই রোগ মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। শামী (রহ.) একে সমর্থন করে লিখেন- এটা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কথার সঙ্গে মিলে যায়। অত:পর তিনি এ রায়ের ব্যাপারে আরো কতিপয় সমর্থনও বর্ণনা করেছেন।[১৩৯]
তবে এরকম অসুখ যা সাধারণত দীর্ঘ সময় থাকে, এটা ঐ সময়ই মৃত্যুরোগ বলে বিবেচিত হবে যখন ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। যদি তা বিশেষ এক সীমা পর্যন্ত এসে থেমে যায় এবং সারাবছর কিছু বৃদ্ধি না পায় তাহলে এটা মৃত্যুরোগ বলে গণ্য হবে না। দুররে মুখতারের মধ্যে আছে-

المقعد و المفلوج و المسلول اذا تطاول و لم يقعد فى الفراش كالصحيح ثم رمز الشارح حد التطاول سنة و فى القنية المفلوج و المسلول و المقعد مادام يزداد كالمريض–

অর্থ: পঙ্গু, পক্ষাঘাত ও ক্ষয়জ্বর যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সে শয্যাশায়ী না হয় তাহলে সে সুস্থ মানুষের মতো। তারপর হুলওয়ানী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, অসুখ দীর্ঘ হওয়ার সময় এক বছর পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন, পক্ষাঘাত ও ক্ষয় জ্বর যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রোগী 'মারজুল মউত' তথা মৃত্যুরোগেরই হুকুমে থাকবে।[১৪০]

এসকল বর্ণনার আলোকে এইডস, মহামারী, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের হুকুম হলো, যদি অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসার অযোগ্য হয়ে যায় এবং ডাক্তারী মূলনীতির তথ্য অনুযায়ী অসুখ ক্রমশ বেড়েই চলে তাহলে এটা মৃত্যুরোগ বলেই গণ্য হবে। আর যদি এক পর্যায়ে এসে অসুখ থেমে যায় এবং সারাবছর এ অবস্থায়ই থাকে তাহলে বর্তমান অবস্থায় এটা মৃত্যুরোগ বলে গণ্য হবে না। পরিত্যক্ত সম্পত্তি, স্বীকারোক্তি, অসিয়ত, তালাক ইত্যাদি আহকামের মধ্যে এই মূলনীতি অনুযায়ী বিধান কার্যকর হবে না।[১৪১]

---

১৩৮. *দুররে মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২০
১৩৯. মুহাম্মদ আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২০-৫২১
১৪০. মুহাম্মদ আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫,৬
১৪১. মুফতি আন্‌ওয়ার শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

## তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ অন্যান্য রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান ও মাসআলা

**শরীয়তের দৃষ্টিতে রক্ত দান বা গ্রহণ**

রক্ত দান বা গ্রহণ করার বিষয়টি এক সময় মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করলেও বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় রক্ত দান বা গ্রহণ করা একটি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় অপারেশনের ক্ষেত্রেই রক্ত দান বা গ্রহণের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অপারেশন ছাড়াও কারো শরীরে রক্ত কম থাকলে বা অন্যান্য কারণেও ডাক্তারের পরামর্শে রোগীর শরীরে রক্ত প্রবেশ করানো হয়। চিকিৎসার জন্য রক্ত দান বা গ্রহণে শরী'আতের হুকুম নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

**রক্ত দান:** মানুষ সাধারণত একে অপরকে দু' কারণে রক্ত দিয়ে থাকে।

(১) কোনো বিনিময় ছাড়াই মানবিক কারণে রোগীকে রক্ত দান করে।

(২) বিনিময় নিয়ে তথা বিক্রির মাধ্যমে রক্ত প্রদান করে। উল্লেখ্য, মানব রক্ত বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

রক্ত দান আবার দু'ভাবে হতে পারে-

(ক) রোগীর প্রয়োজনে রক্ত দান।

(খ) প্রয়োজন ছাড়াই রক্ত দান।

উল্লেখ্য, অনেকে চার মাস অন্তর অন্তর বিনা প্রয়োজনে নিয়মিত রক্ত দান করে থাকে, যা জায়েয নয়।

প্রয়োজনে রক্ত দানের ক্ষেত্রেও কেউ কেউ দু'টি কারণে রক্ত দানকে না জায়েয বলে থাকেন। যথা-

(১) রক্ত মানব দেহের অংশ। আর মানব দেহের কোনো অংশ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর ব্যবহার করা জায়েয নেই।

(২) রক্ত নাপাক। আর হাদীসে বর্ণিত আছে, নাপাক বস্তুর মধ্যে কোনো চিকিৎসা নেই।

তবে অধিকাংশ আলেমের প্রথম ক্ষেত্রে অভিমত হলো- রক্ত যদিও মানব দেহের অংশ কিন্তু এটা একজনের শরীর হতে অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করাতে কারোর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে একজনের দেহ থেকে অপরজনের দেহে প্রবেশ করানো হয়। এ হিসেবে একে মানুষের দুধের সাথে তুলনা করা যায়, যা অস্ত্রোপচার ব্যতীত একজনের দেহ থেকে বের হয়ে অপরজনের দেহে সঞ্চালিত হয়। ইসলামী শরী'আত নবজাতক শিশুর প্রয়োজনকে বিবেচনা করে মানুষের দুধকে শিশুর খাবার সাব্যস্ত করেছে। ফলে মায়ের জন্য নবজাতক শিশুকে দুধ পান করানো শুধু জায়েযই নয়; বরং সাধারণ অবস্থায় ওয়াজিব ও আবশ্যকও বটে। শিশু ব্যতীত প্রয়োজনে বড় মানুষের জন্যও চিকিৎসা হিসেবে মহিলাদের দুধ ব্যবহার করা জায়েয বলা হয়েছে।[১৪২]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে– و لا باس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة و يشربه للدواء

অর্থ: কোনো ব্যক্তি ঔষধ হিসেবে মহিলাদের দুধ ব্যবহার করলে এতে কোনো ক্ষতি নেই।[১৪৩]

অতএব, দুধের সাথে তুলনা করে একথা বলা যায় যে রক্ত মানব দেহের অংশ হওয়া সত্ত্বেও রোগীর জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয আছে।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অভিমত হলো- রক্ত যদিও নাপাক কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয। সুতরাং চিকিৎসার খাতিরে রক্ত দান না জাযেয নয়।[১৪৪] তবে তা জায়েয হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। যথা-

(১) রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়া অর্থাৎ রোগীর শরীরে রক্ত প্রবেশ না করলে রোগী মারা যাওয়ার আংশকা থাকা।

(১) রক্ত দেয়া ব্যতীত চিকিৎসার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকা।

(২) রক্তের প্রয়োজনীয়তা কোনো বিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া।

(৩) জরুরত পর্যায় না হলেও কমপক্ষে হাজতের পর্যায় হওয়া।

(৪) মানফা'আত ও যীনাত উদ্দেশ্য না হওয়া।[১৪৫]

---

১৪২. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

১৪৩. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩৫

১৪৪. মুফতী শফী, মুফতী আবু সাঈদ, মুফতী এরশাদ খান, *ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আশরাফিয়া বুক হাউজ, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৬১৮

**রক্ত ক্রয়-বিক্রয় করা**

সংকট মুহূর্তে ক্রয় করা ব্যতীত রক্ত পাওয়া না গেলে রক্ত ক্রয় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু রক্তদাতার জন্য এর বিনিময় গ্রহণ করা না জায়েয ও হারাম। কেননা মানুষ তার সকল অঙ্গসহকারে সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ অর্থ: নিশ্চয় আমি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছি।[১৪৬]

সুতরাং আর তাকে ও তার কোনো অঙ্গকে বিক্রি করা অসম্মান হওয়ায় তা না জায়েয।

**মুসলমানের জন্য অমুসলমানের রক্ত গ্রহণ**

প্রয়োজন দেখা দিলে অমুসলমানের রক্ত গ্রহণ করাও জায়েয আছে। তবে কাফির, মুশরিক ও ফাসেকের রক্তে তার কদর্যতা ও অশুভ চরিত্রের যে কুপ্রতিক্রিয়া রয়েছে তা গ্রহীতার মধ্যে প্রভাব বিস্তার হওয়ার প্রবল আশংকা থাকার কারণে তাদের রক্ত গ্রহণ করা থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত থাকাই শ্রেয়।আর এজন্যই আল্লাহ ওয়ালাগণ কোনো মুসলমানের সন্তান কোনো ফাসিক মহিলার দুধ পান করাকে পছন্দ করেন না।[১৪৭]

**স্বামী-স্ত্রী একে অপরের রক্ত গ্রহণ**

স্বামীর দেহে স্ত্রীর রক্ত এবং স্ত্রীর দেহে স্বামীর রক্ত প্রবেশ করালে তাদের বিবাহে কোনো প্রকারের সমস্যা হবে না, তাদের বিবাহ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক ভঙ্গের জন্য যে সকল শর্ত ফিকহী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, এ ক্ষেত্রে তা পাওয়া না যাওয়ায় বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না এবং রক্ত গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা হবে না।[১৪৮]

**একজনের অঙ্গ অপরের দেহে স্থাপন করা বা অঙ্গদান করার বিধান**

মানবদেহে এমন কিছু রোগ হয় যা সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয় না, বরং সরাসরি অন্যের অঙ্গ স্থাপন করতে হয়।আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং অন্য কোনো মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর জীবন রক্ষার্থে সহায়ক। কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনে একজনের অঙ্গ অপরের দেহে স্থাপন করা বা অঙ্গদান করা মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে একটি সংবেদনশীল বিষয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের আসল মালিক ও রক্ষাকর্তা হলেন আল্লাহ তা'আলা। তাই অন্যকে অঙ্গ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

একদল ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করেন, একজনের অঙ্গ অপরজনের দেহে স্থাপন করা বা অঙ্গদান করা জায়েয নয়। কারণ মানুষ শুধু সেটাই দান করতে পারে যার মালিকত্ব তার আছে। মানুষ যেহেতু নিজের শরীরের মালিক নয় বরং এর মালিক হলো তার সৃষ্টিকর্তা, তাই তা জায়েয নয়। এতে মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসম্মান এবং এক পর্যায়ে তা বাজারে বেচা-কেনা হওয়ারও প্রবল আশংকা রয়েছে। এছাড়া যারা একজনের অঙ্গ অপরের দেহে প্রতিস্থাপন করা না জায়েয মনে করেন, তারা মৃত দেহে অস্ত্রোপচার করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার দলীলসমূহ উপস্থাপন করে থাকেন।

---

১৪৫. হাজত শব্দটি একটি ফিকহী তথা ইসলামী আইনের পরিভাষা। এক্ষেত্রে ৫টি স্তর রয়েছে। যথা- (১) জরুরত (২) হাজত (৩) মানফাআত (৪) যীনাত ও (৫) ফুযূল।

**১. জরুরত:** জরুরত এমন অবস্থায় উপনীত হওয়াকে বোঝায়, যে অবস্থায় হারাম গ্রহণ না করলে সে মারা যাবে অথবা মারা যাওয়ার উপক্রম হবে। যেমন: ক্ষুধার তাড়নায় মারা যাওয়ার উপক্রম ব্যক্তির মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করা।

**হুকম:** এ অবস্থায় পৌঁছলে এমন ব্যক্তির জন্য তখন হারাম আর হারাম থাকে না। **২. হাজাত:** হাজত এমন অবস্থায় উপনীত হওয়াকে বোঝায়, যে অবস্থায় হারাম গ্রহণ না করলে সে মারা যাবে না ঠিক কিন্তু তাকে অনেক দুর্ভোগ ও কষ্ট সহ্য করতে হবে। যেমন: এমন রোগী যার চিকিৎসা হারাম দ্রব্য ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই। **হুকুম:** এমতাবস্থায় তার জন্য হারাম গ্রহণ করা বৈধ নয় অর্থাৎ অকাট্য দলীলের বিপরীত কোনো কাজ করা যাবে না, তবে অনুমানভিত্তিক দলীলের বিপরীত করা যাবে। মাঝেমধ্যে অকাট্য দলীলের ব্যতিক্রমও করা যাবে। যেমন, এ অবস্থায় রোযা ভাঙ্গার অনুমতি দেয়া হয় অথচ রোযা ভাঙ্গা অকাট্য দলীলের পরিপন্থী। **৩. মানফাআত:** এমন অবস্থাকে বোঝায়, যা গ্রহণ না করলে মারা যাবে না বা কোনো প্রকার কষ্টও হবে না; বরং কিছুটা উপকৃত হওয়া যায়। যেমন: সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট মানের খাবার খাওয়া। **হুকুম:** এমবাবস্থায় শরী'আ খেলাফ কোনোকিছু করা যাবে না। **৪. মানফা'আত ও যীনাত:** এটা হলো যা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যই হলো সাজ-সজ্জা, আরাম ও বিলাসিতা। যেমন: সুন্দর, পাতলা ও মোলায়েম কাপড় পরিধান করা। হুকুম: এটা অপচয় পর্যায়ে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত জায়েয, **৫. ফুযুল:** যা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজন। যেমন: অনর্থক, বেহুদা ও সন্দেহযুক্ত কাজ করা। হুকুম: স্বাভাবিক পর্যায়ে এমনটা করা না জায়েয।

১৪৬. আল-কুরআন, ১৭: ৭০

১৪৭. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪, ১৫৫

১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

অপরদিকে অনেক বিজ্ঞ আলেম মনে করেন- একজনের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গঅন্যের দেহে প্রতিস্থাপন করা বা অঙ্গদানের বিষয়ে ধর্মের কোথাও নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ নেই। আর কুরআন-হাদীসে যদি কোনো বিষয়ে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে তা অনুমোদনযোগ্য। যদিও এর কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে কিন্তু উপকারিতাও রয়েছে। বরং এটি ক্ষতির চেয়ে মানুষের প্রতি উপকারিতা ওসহানুভূতিরদিকটিই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই উপকারের দিক লক্ষ্য রেখে বর্তমানে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামস্বাস্থ্যের ক্ষতি না হলে একজনের অঙ্গ অপরজনের দেহে স্থাপন করা বা মৃত্যুপূর্ব উইল করে অঙ্গদান করাও জায়েয মনে করেন। নেদারল্যান্ডস লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামবিদ মোহাম্মদ ঘালি বলেন, আমার ধারণা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলি অঙ্গদানকে কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে, যেমনটি লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তান ও ভারতে। এসব দেশে কিছু কিছু ফাতওয়ায় অঙ্গদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের আলোচনার ভিতটাও খুব শক্ত নয়। তবে সৌদি আরবে অঙ্গদান বেশ প্রচলিত।[১৪৯]

'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন-১৯৯৯' নামে বাংলাদেশের আইনে বলা হয়েছে- "অসুস্থ ব্যক্তিকে তাঁর নিকট আত্মীয়রা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করতে পারবেন।" তবে বাংলাদেশে মৃত ব্যক্তিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, মৃত্যুর পূর্বে কেউ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের অঙ্গীকার করলেও মারা যাওয়ার পর তাঁর স্বজনরা এ ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আগ্রহী হয় না। এছাড়া এ ব্যাপারটি নিয়ে তেমন মাথাও ঘামানো হয় না। তাই সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের সুস্থ লিভার বা কিডনি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। যদিও বাংলাদেশে ১৯৮২ সাল থেকে কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তিদের দান করা কিডনিই ব্যবহৃত হচ্ছে।

একজনের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন করা বা অঙ্গদানের বিষয়টি যারা জায়েয মনে করেন, তারা দলীল হিসেবে নিম্নের ফিকহী মূলনীতি এবং কিছু যৌক্তিকতা পেশ করেন। যেমন–الضرورات تبيح المحظورات

অর্থ: শরী'আত স্বীকৃত প্রয়োজনসমূহ শরীআত নিষিদ্ধ কাজকে সিদ্ধ করে দেয়।[১৫০]

এছাড়া কোনো প্রাণীর হাড়, নখ ও দাঁত ইত্যাদি যে সমস্ত অঙ্গে প্রাণ সঞ্চার হয় না কিংবা নিতান্ত কম প্রাণ সঞ্চার হয়, তা দ্বারা মানব দেহের অচল অঙ্গের কাজ নেয়ার প্রথা আদিকাল থেকে চলে আসছে। এ পদ্ধতি শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়।–جواز المداواة بعظم بال، و هذا لاالعظم لا يتنجس بالموات على اصلنا، لانه لا حياة فيه

অর্থ: পুরাতন হাড় দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয আছে। কেননা মারা যাওয়ার কারণে হাড় নাপাক হয় না। কারণ হাড়ে জীবন থাকে না।[১৫১]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি যদিও সর্বাধিক সম্মানিত এবং তার মানহানি ও অসম্মান করা শরী'আতে অনুমতি নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কোথাও মানব জাতির ইজ্জত ও সম্মানের এমন কোনো কাঠামো ও সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি যে এমন করলে সম্মান করা হবে আর এমন করলে অসম্মান করা হবে। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে এক্ষেত্রে মান-অপমানের ভিত্তি নির্ধারণেসাধারণত তিনটি বিষয়কে মাপকাঠি হিসেবে ধরা যায়। যথা-

১. শরী'আত, ২. বিবেক-বুদ্ধি এবং ৩. সমাজ।

তাই এ তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যায় বলা যায়, শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত মান-অপমানের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন যায় না এবং বিবেক ও আকল সবসময় ও সর্বক্ষেত্রে মান-অপমান নির্ধারণ করতে পারে না।

সুতরাং মান-অপমান নির্ধারণ করার তৃতীয় ভিত্তি হলো সমাজ, যা পরিবর্তনশীল। কখনো কোনো কাজ সমাজের দৃষ্টিতে ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়, আবার পরবর্তীতে ঐ কাজটি মন্দ ও খারাপ কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হয়। আবার কোনো কাজ কোনো সমাজে খারাপ মনে করা হলেও অন্য সমাজে ঐ কাজটি খুবই ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্যই যেখানে শরী'আতের পক্ষ থেকে কোনোকিছু উল্লেখ থাকে, সেখানে আকল ও সমাজকে মান-অপমানের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা যাবে না। শরী'আত যেখানে চুপ থাকে সেক্ষেত্রে বিবেক ও সমাজের ভালো-মন্দ নির্ণয়কারী বিবেচনা করা যায়। তাই এক্ষেত্রেও সম্মান ও অসম্মানের মাপকাঠি হিসেবে সমাজকেই সামনে রাখা হয়।

---

১৪৯. *https://www.dw.com/bn/*(থেকে উদ্ধৃত)

১৫০. আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আবু বকর আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১৫১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, *শরহু সিয়ারুল কাবীর*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৯২

একথা সত্য যে কিছু কিছু সামাজিক প্রথা ও প্রচলন স্থান ও যুগের ভিন্নতার কারণেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন – كل ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا فى اللغة يرجع فيه الى العرف، كالحرز فى السرقة

অর্থ: যেসব বিষয় সম্পর্কে শরী'আতের বিধান নিরংকুশ এবং শরী'আত কিংবা ভাষা বা অভিধানেও কোনো নিয়ম-নীতি উল্লেখ নেই, সেখানে সামাজিক প্রচলনের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন, চুরির ব্যাপারে সম্পদের সংরক্ষণ ইত্যাদি।[১৫২]ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী (রহ.) বলেন ... اَلْمُتَبَدَّلَةُ مِنْهَا مَا يَكُوْنُ مُتَبَدِّلاً فِى الْعَادَةِ مِنْ حُسْنٍ اِلٰى قُبْحٍ وَ بِالْعَكْسِ

অর্থ: যে সমস্ত বিষয় পরিবর্তনশীল তার মধ্যে সামাজিক প্রথা ও প্রচলনও একটি পরিবর্তনশীল বিষয়। অর্থাৎ, কখনো সামাজিক প্রচলন ভালো মনে করা হয়, পরবর্তীতে তা মন্দ হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার কখনো কোনো প্রচলন মন্দ মনে করা হয়, পরবর্তীতে তা ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়।[১৫৩] ...

উল্লিখিত ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে বলা যায়, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এক দেহের অঙ্গ অন্য দেহের অঙ্গের সাথে সংযোজন করা হয় তা বাস্তবে অপমানজনক কি না?

ইসলামী শরী'আত যখন মানব সম্মান ও অসম্মানের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেনি, তাই সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে ঐ যুগ ও এলাকার প্রচলনের আলোকেই কোনো বিষয়ের সম্মান ও অসম্মানের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
ফুকাহায়ে কিরাম মানব অঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়াকে নিষেধ করেছেন ঠিকইকিন্তু এ নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ ছিলঐ সময় মানব অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়াকে অসম্মান মনে করা হতো এবং তখন এমন পদ্ধতির প্রচলনও ছিল না যে সম্মানজনক পন্থায় মানব অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে, বর্তমান যুগে এটাকে অসম্মান মনে করা হয় না। অধিকন্তু একে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় বলে মনে করা হয়। তাই অনেকে যখন মৃত্যুকালে নিজের অঙ্গ দানের অসিয়ত করে যায়, তখন তাদের এ অসিয়ত সামাজিকভাবে সুনামের কারণ হয় এবং এটাকে মানব সেবার অন্যতম মাধ্যম মনে করা হয়।এ হিসেবে একজনের অঙ্গ অন্যের শরীরে প্রতিস্থাপন করা বৈধ মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত: একজনের রক্ত অপরজনের দেহে প্রবেশ করানো প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বৈধতার ফাতওয়া দেয়া হয়েছে। অথচ রক্ত মানব দেহেরই একটি অংশ। রক্তকে যদিও দুধের সাথে তুলনা করে এ ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এ তুলনাটি পুরোপুরিভাবে সঠিক হয়েছে ও রক্তের সাথে মিল খেয়েছে বলা যায় না। কারণ, দুধ এক দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য দেহের উপকারে আসে। পক্ষান্তরে, রক্ত দেহের ভেতরে থেকেই দেহের কাজে লাগে। এরপরও তা অন্যের দেহে প্রবেশ করানো বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই রক্তের সাথে তুলনা করে অন্যান্য অঙ্গের ব্যাপারেও এই হুকুম দেয়া যায়।

এছাড়া জীবন রক্ষার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে সম্মানিত বস্তুর অসম্মানকে মেনে নেয়া হয়। যেমন- সিজার ও মানব দেহের অস্ত্রোপচার পরিচ্ছেদে মায়ের পেট কেটে বাচ্চ বের করার মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সম্মান মানব অঙ্গ থেকে অনেক বেশি এমনকি অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই। আর গোসল ফরয অবস্থায় তা ধরা ও পড়া কোনটিই জায়েয নেই। তথাপি মানুষের চিকিৎসার স্বার্থে রক্ত এবং প্রস্রাবের মতো নাপাক ও অপবিত্র বস্তু দিয়ে তা লেখাকে জায়েয বলা হয়েছে।
ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে-

اذا سال الدم من انف انسان و لا ينقطع حتى يخشى عليه الموت، و قد علم انه لو كتب فاتحة الكتاب او الاخلاص بذٰلك الدم علٰى جبهته ينقطع فلا يرخص له ما فيه– و قيل يرخص كما رخص فى شرب الخمر للعطشان و اكل الميتة فى المخمصة– و هو الفتوى–

অর্থ: যদি কারো নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় আর তা বন্ধ না হওয়ার ফলে মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয় এবং প্রবল ধারণা হয়, তার কপালে ঐ রক্ত দিয়ে সূরা ফাতিহা অথবা সূরা ইখলাস লিখলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য এর অনুমতি

১৫২. ড. ওয়াহবাতুয যাহইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, সিরিয়া: দামেস্ক, দারুল ফিকর, ১৯৮৬ (প্রথম প্রকাশ), খ. ১, পৃ. ৮৩১
১৫৩. ড. মুহাম্মদ আদীব আস-সালেহ, *মাসাদিরুত তাশরী'ইল ইসলামী*, সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল আবীকান, ২০০২ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৩৪০

রয়েছে। যেভাবে পিপাসার্ত ব্যক্তির জন্য পিপাসা নিবারণের জন্য(কোনোহালাল বস্তু না পাওয়া গেলে) মদ পান করা এবং ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির জন্য (কোনো হালাল খাবার না পাওয়া গেলে) মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।[১৫৪]

তবে এ ধরনের চিকিৎসাকে জায়েয বলা হলেও কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মাহাত্ম্যের দিক লক্ষ্য করে এমন চিকিৎসা গ্রহণ না করাই উত্তম বলা হয়েছে। অর্থাৎ, হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এ চিকিৎসাকে অনুত্তম বলেছেন। কিন্তু জায়েয হওয়ার মতটিও তিনি মেনে নিয়েছেন।
আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) বলেন-

ان عند بعض الحنفية يباح للمضطر اكل لحم الانسان الميت و هو اولىٰ لأن حرمة الحى أعظم–

অর্থ: কোনো কোনো হানাফী আলেমগণের মতে, নিরুপায় ব্যক্তির জন্য মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়া জায়েয আছে। অত:পর তিনি বলেন, এমন করাই উত্তম। কেননা, জীবিত ব্যক্তির সম্মান মৃতের তুলনায় অনেক বেশি।[১৫৫] ইবন নুজাইম 'আল-আশবাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

الصيد اولىٰ من لحم الانسان أنه لم يجد شيئاً غير لحم الانسان الميت يباح له أكله–

অর্থ: কোনো ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণের জন্য মক্কার হেরেমের ভেতর শিকার ও মানুষের গোস্ত ব্যতীত অন্য কিছু না পেলে উভয়টি হারাম হওয়া সত্ত্বেও মানুষের গোস্তের তুলনায় শিকারের গোস্ত খাওয়া উত্তম।[১৫৬]

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, যদি মানুষের গোস্ত ব্যতীত অন্য কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে এমন অবস্থায় জীবন রক্ষার্থে মানুষের গোস্ত খাওয়াও জায়েয আছে।
সুতরাং মানুষের গোস্ত খাওয়ার কারণে তার মানহানি হওয়া সত্ত্বেও জীবন বাঁচানোর জন্য বৈধ হলে খাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় তার কোনো অঙ্গ কাজে লাগানো বৈধ হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত। যদিও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বিনা প্রয়োজনে মৃতের হাড় ভাঙ্গাকে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতই অপরাধ বলা হয়। কিন্তু প্রয়োজনে এমন করলে তা এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। আর এজন্যই পেট কেটে বাচ্চা বের করা এবং কেউ অন্য কারোর দ্রব্য খেয়ে মারা গেলে পেট কেটে তা বের করার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং সম্মানহানি হলেও জীবন রক্ষার খাতিরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা জায়েয আছে।

উল্লেখ্য, প্রয়োজনে মুসলমানের দেহে অমুসলমানের অঙ্গও সংযোজন করা যাবে। তবে যে কারণ দেখিয়ে মুসলিমদের জন্য অমুসলিমের রক্ত গ্রহণ করা থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকাকে শ্রেয় বলা হয়েছে, সে কারণটি এখানেও বিদ্যমান বিধায় তাদের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা থেকেও মুসলমানদের যথাসাধ্য বিরত থাকা শ্রেয়।[১৫৭]

**বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে কতিপয় মাসআলা**

* শরীয়তের দৃষ্টিতে পূর্ব থেকে সংরক্ষণ নীতিতে বসন্ত, হাম, পোলিও, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি টিকা নেয়া জায়েয আছে।

* যদি কোনো ব্যক্তির উভয় কিডনী নষ্ট হয়ে যায় এবং নষ্ট কিডনী বের করে নতুন কিডনী স্থাপন করা না হলে বাহ্যিকভাবে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয় এবং কিডনী স্থাপনের বিকল্প না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় তার কোনো আত্মীয় কিডনী দিতে রাজী হলে এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের ধারণানুযায়ী একটি কিডনী বের করলে তার সুস্থতার মধ্যে কোনোপ্রভাব না পড়লে বিনামূল্যে একটি কিডনী দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানো জায়েয হবে।[১৫৮]

* প্রয়োজনে কোনো আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কাউকেশরীয়তের দৃষ্টিতে রক্ত দেয়া জায়েয আছে। কিন্তু মানুষ যেহেতু নিজ শরীর বা কোনো অঙ্গের মালিক নয়, তাই অপ্রয়োজনে তার এ অধিকার নেই যেনিজ শরীর থেকে রক্ত বের করে কোনো 'ব্লাডব্যাংক'-এ জমা রাখবে।

---

১৫৪. মুহাম্মদ আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, সৌদি আরব: রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ১, পৃ, ৩৬৬
১৫৫. মুহাম্মদ ওলী ইবনুল মুনযির আল-আনসারী, *ইরশাদুল মুসতারশিদ*, মাকতাবাতুল আবীকান, ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ), খ. ২, পৃ. ৯৮
১৫৬. মুহাম্ম ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি. খ. ৪, পৃ. ২৫৪
১৫৭. মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৬৪
১৫৮. মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

* যদি অসুস্থ ব্যক্তিকে বিনামূল্যে রক্ত দেয়ার মতো কেউ না থাকে, তাহলে অপারগতাবশত মূল্য দিয়ে রক্ত ক্রয় করা জায়েয। তবে রক্ত দানকারীর জন্য মূল্য নেয়া জায়েয হবে না।
* কোনো ছেলে বা মেয়ে কেউ কাউকে রক্ত দিলে এতে তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ রক্ত দেয়ার দ্বারা বিবাহ হারাম হয় না। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে রক্ত দেয়ার কারণেও তাদের বিবাহের মধ্যে কোনো প্রভাব পড়বে না, বিবাহ যথারীতি বহাল থাকবে।[১৫৯]

* রোযাবস্থায় চোখে ঔষধ দিলে, শরীরে ইনজেকশন বা স্যালাইন নিলে রোযা ভাঙ্গবে না। চাই ইনজেকশন বা স্যালাইন ঔষধই হোক বা খাদ্য চাহিদা পূরণকারী হোক।[১৬০]

* রোযা অবস্থায় দাঁত ফেলার পর রক্ত বের হয়ে পেটে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে, অন্যথায় নয়।[১৬১]
* রোযা অবস্থায় এনডোস্কপি করালে গলা থেকে পেটের ভেতর পর্যন্ত পাইপ ও মেশিনের যে অংশ প্রবেশ করানো হয়, তাতে যদি অন্য কোনো জিনিস যেমন- তেল ইত্যাদি লাগানো না হয়, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। আর যদি তেল বা অন্য কোনো বস্তু লাগানো থাকে, তাহলে তা ভেতরে প্রবেশের সাথে সাথে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[১৬২]

* রোযা রেখে হাঁপানী রোগ নিরাময়ের জন্য ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এর জন্য শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।[১৬৩]

* রোযা রেখে মেডিকেল টেস্টের জন্য বা অন্য কোনো মুমূর্ষ ব্যক্তিকে রক্ত দিলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে এর কারণে যদি এমন দুর্বল হওয়ার আশংকা হয়, যদ্দারা রোযা রাখার মতো শক্তি থাকবে না তাহলে মাকরূহ হবে।[১৬৪]

* কোনো কোনো ঔষধ এমন আছে যা খালি পেটে খেতে হয়, তাই রোযাদার অসুস্থ ব্যক্তি ঔষধ দ্বারা ইফতার করতে পারবে।[১৬৫]

* হায়েয মহিলাদের কোনো রোগ নয়, বরং প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রতিমাসে তা আসা স্বাভাবিক। তাই ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ না করাই ভালো। কেননা, এর দ্বারা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। হায়েয অবস্থায় 'তাওয়াফে যিয়ারত' ছাড়া হজ্বের অবশিষ্ট সব রোকন আদায় করা যায়। এক্ষেত্রে 'তাওয়াফে যিয়ারত' পরে আদায় করে নিতে হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করে হজ্ব কিংবা রোযা আদায় করে তাহলে এর সুযোগ আছে।[১৬৬]
* যদি রোগীর মৃত্যু বা সাধ্যের অধিক কষ্টের আশংকা থাকে এবং লজ্জাস্থান দেখা ব্যতীত চিকিৎসা করা সম্ভব না হয়, তাহলে লজ্জাস্থান দেখানো এবং ডাক্তারের দেখা অনুমতি আছে।[১৬৭]
*যদি কোনো দ্বীনদার অভিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলে যে দাঁড়ি কামানো ব্যতীত সুস্থতা লাভ হবে না, তাহলে অপারগতাবশত সুস্থতা লাভের জন্য তার দাঁড়ি কামানোর অনুমতি আছে। [১৬৮]
* যদি গর্ভস্থ সন্তান এমন হয় যে এখনো তাতে প্রাণ আসেনি, তাহলে ডাক্তারের জন্য অবৈধভাবে গর্ভস্থ সন্তান গর্ভপাত করা জায়েয আছে। আর যদি প্রাণ এসে যায় তাহলে জায়েয না।[১৬৯]

*ফরয ও ওয়াজিব সালাত দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। যদি পূর্ণ রাকাআত দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে তাহলে কোনোভাবে যদি দাঁড়িয়ে তাকরীরে তাহরীমা ও একটি আয়াত পড়তে পারে তাহলে এই পরিমাণ সময় অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যদি এই পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য না থাকে বা থাকলেও অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে অসুস্থ

---

১৫৯. মুফতী সায়্যেদ আবদুর রহীম, *ফাতওয়ায়ে রহিমিয়া*, পাকিস্তান, করাচি, দারুল ইশা'আত, ২০০৩, খ. ১০, পৃ. ১৭৬
১৬০. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩২
১৬১. মুফতী সায়্যেদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৫৯
১৬২. সায়্যিদ আমীর আলী (কর্তৃক অনূদিত), *ফাতওয়ায়ে আলমগীরি*, পাকিস্তান, লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়্যাহ, তা. বি. খ. ২, পৃ. ২২
১৬৩. মুহাম্মদ আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৬
১৬৪. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫
১৬৫. মুফতি আযীযুর রহমান উসমানী, *ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ*, পাকিস্তান, করাচি, দারুল ইশা'আত, সেপ্টেম্বর ২০০২, খ. ৬, পৃ. ৩০৭
১৬৬. মুফতী সায়্যেদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩৬
১৬৭. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২২৫
১৬৮. মুফতি মাহমুদ হাসান গাংগুহী, *ফাতওয়ায়ে মাহমূদিয়া*, পাকিস্তান, করাচি, ইদারাহ আল-ফারুক, ২০০৮(দ্বিতীয় প্রকাশ), খ. ১৯, পৃ. ৪১৬
১৬৯. মুফতি আন্‌ওয়ার শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

ব্যক্তির মসজিদে হেঁটে এসে বসে সালাত আদায়ের অনুমতি আছে। অনুরূপভাবে যদি কোনোভাবে বসে থাকারও সামর্থ্য না থাকে তাহলে শুয়ে ইশারা করে সালাত আদায় করবে। তবে নফল সালাত কোনো ওযর ব্যতীতই বসে পড়া যায়।[১৭০]

* যমীনে বসে সালাত আদায় করা উত্তম। বাস্তবেই যারা অপারগ এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারে না তারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করতে পারবে। আর কেউ যদি এক চেয়ারে বসে আরেক চেয়ারে সিজদা করে তাহলে সালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, সিজদার সময় উভয় পা চেয়ারে থাকতে হবে। যদি চেয়ারে পা না রাখে তাহলে এ সালাত পুনরায় আদায় করা জরুরী। আর যদি যমীনে বসে সিজদা আদায় করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে চেয়ারে বসে ইশারা দ্বারা সিজদা করলে সালাত আদায় হবে না।[১৭১]

* যদি অপারেশন বা অন্য কোনো কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞান করা হয় এবং একদিন একরাত বা তার চেয়ে কম সময় অজ্ঞান থাকে অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত বা তার চেয়ে কম ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়, তাহলে জ্ঞান ফেরার পরে এই সময়ের মধ্যে ছুটে যাওয়া সালাতসমূহ কাযা আদায় করতে হবে। আর যদি ছয় ওয়াক্ত বা তার চেয়ে বেশি সালাত কাযা হয়, তাহলে জ্ঞান ফেরার পরে এই সময়ের মধ্যে ছুটে যাওয়া সালাতগুলো কাযা আদায় করতে হবে কিনা এ নিয়ে মতভেদরয়েছে। তবে কাযা আদায় করে নেয়াই উত্তম। আর যদি কোনো অসুখ বা অন্য কোনো কারণে এমনিতেই অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বেশি ছুটে যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা কাযা করতে হবে না।[১৭২]

* যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি মাথা এতটুকু ঝুকাতে পারে যে যমীন পর্যন্ত অর্ধ হাত বা এর চেয়ে কম ব্যবধান থাকে তাহলে তেপায়া বা অন্য কোনো শক্ত জিনিসের ওপর সিজদা করা আবশ্যক। ইশারা দ্বারা সালাত হবে না। যদি এমন কোনো শক্ত জিনিস না পাওয়া যায় বা এতটুকু ঝুকাতে না পারে তাহলে ইশারা দ্বারা সালাত আদায় হবে। এমতাবস্থায় ইশারা দ্বারা যতটুকু মাথা ঝোকানো সম্ভব মাথা ঝোকাতে হবে। যদি এই পরিমাণ উপরে কোনো বালিশ বা তেপায়া রাখা হয় তাহলে সালাত আদায় হবে। আর যদি বালিশ বা তেপায়া এর চেয়ে উঁচু হয় তাহলে সালাত আদায় হবে না।[১৭৩]

* মহিলাদের সিজারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মুসলমান মহিলা ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। কোনো কারণে মহিলা ডাক্তার না পাওয়া গেলে অত্যধিক প্রয়োজনের সময় পুরুষ ডাক্তার দ্বারাও সিজার করানো জায়েয হবে।[১৭৪]

* ফরয গোসলের সময় যেহেতু মুখের অভ্যন্তরেওপানি পৌঁছাতে হয়, তাই ফিলিং (কোনো ধাতব দ্রব্যের মাধ্যমে দাঁতের মধ্যস্থিত গর্ত ভরাট করা) এবং ফিক্সড (সোনা-রোপা বা অন্য কোনো ধাতব দ্বারা শক্তভাবে দাঁত বসানো)-এর ফরয গোসলের সময় দাঁত খোলার প্রয়োজন নেই। এমনকি ভেতরে এবং গোড়ায় পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করাও প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্লেট সিস্টেমের ক্ষেত্রে (যা সহজেই খোলা এবং লাগানোযায়) কুলির সময় দাঁতের মাড়িতে সাধারণত অনায়াসে পানি পৌঁছে যায় বিধায় খোলা জরুরি নয়। তবে এ অবস্থায় যদি পানি পৌঁছে না বলে কারো প্রবল ধারণা হয়, তাহলে সে কুলি করার সময় দাঁত খুলে নেবে।[১৭৫]

* যদি কারো হাত বা পায়ে প্লাস্টার করা হয় আর অযু বা গোসলের সময় প্লাস্টার খুলে ধৌত করলে ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে প্লাস্টার খুলে ঐ অঙ্গ ধৌত করা জরুরি নয়, বরং প্লাস্টারের উপর মাসাহ করাই যথেষ্ট হবে। আর যদি খোলা ক্ষতিকর না হয় তাহলে তুলনামূলক বেশি মূল্যের প্লাস্টার কিনতে হবে। আরআর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বেশি মূল্যে কিনতে না পারলে তাতেও মাসাহ করা জায়েয আছে।[১৭৬]

এমনিভাবে ব্যান্ডেজ খুলে ধৌত করা বা মাসাহ করা ক্ষতিকর না, তবে বেঁধে দেয়ার মতো উপস্থিত কেউ নেই এবং সে নিজেও বাঁধতে অক্ষম, এমতাবস্থায় ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ করা জায়েয আছে। উল্লেখ্য, ব্যান্ডেজের অধিকাংশের উপর একবার মাসাহ করাই যথেষ্ট। অর্ধেকাংশ বা এর কম মাসাহ করলে জায়েয হবে না।[১৭৭]

---

১৭০. মুফতী সায়্যেদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, খ. ৫,পৃ. ১৫৮
১৭১. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫১
১৭২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২
১৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪
১৭৪. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৩
১৭৫.*আদ-দুররুল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৬
১৭৬. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৩
১৭৭. আল্লামা হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫

* কোনো ব্যক্তির ক্ষতস্থান থেকে অনবরত রক্ত ঝরতে থাকলে, এমতাবস্থায় কাপড় পরিবর্তনের পরে সালাত শেষ করার পূর্বেই যদি পরিহিত কাপড় ভিজে যায় তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য কাপড় পরিবর্তন করা ওয়াজিব নয়। অন্যথায় ওয়াজিব হবে।[১৭৮]

* যদি অসুস্থ ব্যক্তির কাপড় পাল্টানো সমস্যা হয় তাহলে এমতাবস্থায়ই সালাত আদায় করে নেবে, কাযা করবে না।[১৭৯]

* ওযরবশত অন্য কেউ তায়াম্মুম বা মাসাহ করিয়ে দিলে তা জায়েয হবে। তবে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে নিয়ত অসুস্থ ব্যক্তিকেই করতে হবে, অন্য ব্যক্তির নিয়ত ধর্তব্য হবে না।[১৮০]

* পানি আছে কিন্তু নিজে ব্যবহার করতে অক্ষম, এমতাবস্থায় অযু করিয়ে দেয়ার মতো তার পাশে অন্য লোক থাকলে অযুই করতে হবে, তায়াম্মুম করা যাবে না।[১৮১]

* যদি কোনো মহিলার গর্ভপাত হয়, তাহলে গর্ভের সন্তানের যদি কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হাত-পা ইত্যাদি হয়ে থাকে তাহলে গর্ভপাতের পরের রক্ত নেফাস বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সালাত ছেড়ে দেবে এবং রোযা কাযা করে নেবে। আর যদি কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না হয়ে থাকে তাহলে দেখতে হবে এর পূর্বের হায়েয কতদিন পূর্বে হয়েছিলো। যদি ১৫ দিন পূর্বে বা ততোধিক দিন পূর্বে হয়ে থাকে এবং বর্তমান রক্ত ৩ দিন বা তার চেয়ে বেশি দিন হয় তাহলে তা হায়েয। আর যদি ১৫ দিনের কম হয় এবং বর্তমান রক্ত ৩ দিনের কম বা ১০ দিনের বেশি হয় তাহলে ইস্তেহাযা। এই সময়ে সালাত রোযা সব পালন করতে হবে।[১৮২]

* রোযা অবস্থায় রক্ত দিলে বা নিলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। পরীক্ষার জন্য রোগীর শরীর থেকে রক্তও নেয়া যাবে।[১৮৩]

* রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, কারণ এতে ঔষধ গ্যাসীয় অবস্থায় মুখ দিয়ে টেনে ভেতরে নেয়া হয়। যা মুখের ভেতরের অংশ অতিক্রম করে পেটে বা খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে। যার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়। হাঁপানী বা এজমার কারণে কেউ ইনহেলার ব্যবহারে একান্ত বাধ্য হলে তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ইনহেলার ব্যবহার জায়েয আছে এবং উক্ত রোযার কাযা আদায় করতে হবে। তবে কোনো ব্যক্তির যদি হাঁপানী বা এজমা এমন স্থায়ী রোগে পরিণত হয় যা কখনও ভঅলো হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমনকি তার জীবদ্দশায় ছুটে যাওয়া রোযার আদায় করাও সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একটি করে ফিদিয়া তথা পৌনে দুই সের গম-আটা বা তার মূল্য পরিমাণ টাকা সদকা করে দিতে হবে।[১৮৪]

রোযা অবস্থায় চোখ, কান ও নাকে ড্রপ ব্যবহার করা যাবে। যদি ওষুধের স্বাদ মুখে অনুভূত হয়, সেক্ষেত্রে তা ফেলে দিয়ে কুলি করে ফেলা উচিত। চর্মের মলম, ক্রিম, অয়েন্টমেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।[১৮৫]

হৃদ রোগীর বুকে ব্যথা হলে নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রে বা ট্যাবলেট জিহ্বার নিচে নিতে পারবেন। এনজিওগ্রাম ও কার্ডিয়াক ক্যাথেটার করা যাবে। জরুরি কোনো অপারেশন প্রয়োজন হলে রোযা রাখা অবস্থায় করা যাবে। কিডনি অকেজো হলে রোগীর ডায়ালাইসিস করলেও রোযা ভাঙবে না। লিভার বায়োপসি অথবা অন্য কোনো অঙ্গের বায়োপসি করলেও রোযা নষ্ট হবে না।

দাঁত তোলা, ড্রিলিং করা, মেসওয়াক বা ব্রাশ টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা যাবে, তাতে রোযা ভাঙবে না। রোযা রোখে মুখ পরিষ্কারের জন্য মাউথওয়াশ বা গড়গড়া বা মুখে স্প্রে-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যাবে, এতে রোযা ভাঙবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে, পাকস্থলীতে যেনো কোনো কিছু না যায়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে।[১৮৬]

---

১৭৮. মুফতী রশীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫
১৭৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫
১৮০. মুফতী সায়্যেদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৪
১৮১. সায়্যিদ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৫
১৮২. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী, *এমদাদুল ফাতওয়া*, পাকিস্তান, করাচি, মাকতাবাতু দারুল উলুম, জুলাই ২০১০ খ. ১, পৃ. ৮৩
১৮৩. আল্লামা আবদুর রাউফ আল-মানাবী, *ফায়জুল কাদীর*, লেবানন, বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৭২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ৪, পৃ ৩২৭
১৮৪. মুফতী শফী, মুফতী আবু সাঈদ, মুফতী এরশাদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮
১৮৫. সায়্যিদ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২
১৮৬. মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২-১২৮

# ত্রয়োদশ অধ্যায়
## কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোগীর প্রতি দায়িত্ব এবং রোগীর ইবাদত-বন্দেগির বিধি-বিধান


| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | রোগীর সেবা-শুশ্রূষা |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | রোগী দেখার আদব |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | অসুস্থ অবস্থায় রোগীর ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | : | অন্তিম মুহূর্তে রোগীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য |

## প্রথম পরিচ্ছেদ : রোগীর সেবা-শুশ্রূষা

### রোগীর সেবা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত

প্রত্যেক ধর্মেই রোগীর সেবা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং বিনিময় হিসেবে রয়েছে বড় ধরনের পুণ্য ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি। ইসলাম ধর্মে নফল ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় পুণ্য হলো মানুষের উপকার করা। আর জঘন্য পাপ হলো অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে কষ্ট দেয়া। সুতরাং রোগীর সেবা করা যে একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত তা সহজেই অনুমেয়। হাদীসে দেখা যায়, একজন মুসলমানের আরেক মুসলমানের কাছে যে ছয়টি হক রয়েছে তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান হক হলো, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং সাধ্যমতো সেবা-শুশ্রূষা করা। এটি রোগীর প্রতি দয়া নয়, বরং রোগীর হক আদায় করা। আল্লাহ হয়তো নিজের হক বান্দাকে ক্ষমা করেও দিতে পারেন, কিন্তু বান্দার হকের ব্যাপারে সে নিজে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না।

রোগীর সেবা কখনো কখনো নফলের চেয়েও বড় নফল, সুন্নাতের চেয়েও বড় সুন্নাত, এমনকি ফরযের চেয়েও বড় ফরয হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইসলামী বিধান মতে, কোনো ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ানোর পর যদি পাশে কোনো রোগীর হঠাৎ রোগ বেড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুমুখে উপনীত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন সালাত আদায়কারীর ফরয সালাতও ভেঙ্গে ওই রোগীর জীবন বাঁচানো সালাতের চেয়েও বড় ফরয হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইবাদতের নিয়তে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো রোগীকে প্রয়োজনে একটু সেবা দিয়ে বা একটু সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েও আমরা অনেক বড় ধরনের পুণ্য অর্জন করতে পারি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন গোটা পৃথিবীর সকল সৃষ্টি জীবের জন্য রহমতস্বরূপ।[১] তাঁর পূত-পবিত্র অস্তিত্ব, প্রকৃতি-স্বভাব, আচার-আচরণ সবকিছুই ছিল সেই অফুরান রহমতের অনন্য ধারায় সিঞ্চিত। তিনি মানুষের জন্য যে পূর্ণাঙ্গ দীন নিয়ে এসেছিলেন তার প্রতিটি পরতে পরতে সর্বক্ষেত্রে সুপ্রবাহিত হয়েছে অনন্ত রহমতের ফল্গুধারা। পৃথিবীর সকল মানুষের ব্যক্তি জীবনের সীমিত গণ্ডি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের পরিব্যপ্তিতেও উপচে পড়েছে তাঁর আনীত দীনের রহমত ও বরকতের ধারা। সামাজিক জীবনের অন্যসব বিষয়ের পাশাপাশি রোগী সেবার ক্ষেত্রেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সত্যিই অনুপম। সুমহান মানুষ হয়েও তিনি যেভাবে সর্বশ্রেণির রোগীর সেবায় এগিয়ে এসেছেন তার দ্বিতীয় নযীর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি নিজেও রোগীর সেবায় নি:স্বার্থভাবে, অনাবিল দরদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং কিয়ামত অবধি তাঁর অনুসারীদেরকেও রোগীর সেবার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। আর্ত ও পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে সকল মুসলমানকে আর্ত সেবার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

সামাজিক জীবনে রোগ ও রোগীর প্রতি মর্যাদাকর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত ও তার সেবা-শুশ্রূষার ক্ষেত্রেও অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। নি:স্বার্থভাবে দরদ নিয়ে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির রোগীর সেবায় এগিয়ে আসতেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি পীড়িত ও অসুস্থ মানুষের সেবা-শুশ্রূষা করাকে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ও মানবাধিকার বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

রোগীর মনকে আশ্বস্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে বিশেষ আচরণ অনুসরণ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রোগীর নিকট বসা, রোগীর কপাল ও হাতে হাত রাখা, তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা, তাকে সান্ত্বনা ও ধৈর্যধারণে উৎসাহ দেয়া, তার জন্য দুআ করা, তার উচ্চ মর্তবার কথা বলে তার নিকট দুআ চাওয়া এবং দীর্ঘ সময় তার নিকট বসে তাকে বিরক্ত না করা ইত্যাদি।

মাতা-পিতা, পরিবার ও সমাজেরও দায়িত্ব হলো, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শরীয়ত যে দয়াসুলভ আচার-আচরণ ও চাল-চলনের হুকুম দিয়েছে, তার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা এবং অসুস্থ ব্যক্তির সাথে এমন ব্যবহার করা যেনো সে বেঁচে থাকার উৎসাহ পায়।

---

১. وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ– তথা আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। আল-কুরআন, ২১: ১০৭

**রোগী দেখতে যাওয়ার হুকুম**

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনে একে অপরের মুখাপেক্ষী। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন সুখ-সুন্দর হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সামাজিক জীবনের অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। কোনো মানুষ অসুস্থ হলে স্বভাবতই তাকে সেবা-শুশ্রূষা করার প্রয়োজন হয়। কোনো সমাজের অসুস্থদের যদি অন্যরা তাকে সেবা-শুশ্রূষা না করে তাহলে তার জীবন বিষিয়ে ওঠবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা বিরল। তিনি অসুস্থের সেবাকে একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব স্থির করে তাকে দেখতে যাওয়ার হুকুম করেছেন এবং নিজেও রোগীকে দেখতে গিয়েছেন। হাদীসে এসেছে-হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَ عُوْدُوا الْمَرِيْضَ

অর্থ: তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার করাও এবং রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করো।[২]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَ اتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ–

অর্থ: আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাও এবং জানাযার অনুসরণ করো।[৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি-

خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَ اِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَ شُهُوْدُ الْجَنَازَةِ وَ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَ اللهَ–

অর্থ: এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, দাওয়াতে (ডাকে) সাড়া দেয়া, জানাযায় উপস্থিত হওয়া, রোগীকে পরিচর্যা করা এবং হাঁচি দাতাকারী যখন যখন আলহামদু লিল্লাহ বলবে, তখন এর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।[৪]

**রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রোগী দেখতে যাওয়া**

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানব দরদী মানুষ। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যখন কারো অসুস্থতার কথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বলতেন বা তিনি কোনোভাবে কারো অসুস্থ হওয়ার কথা জানতে পারতেন সাথে সাথেই বা কখনো সময় করে তাকে দেখতে যেতেন এবং সাধ্যমতো তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحْسَنَ شَىْءٍ عِيَادَةَ لِلْمَرِيْضِ–

অর্থ: আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) রোগীদের দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষায় সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।[৫] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَرِضْتُ مَرْضًا فَاَتَانِى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ هُمَا مَشِيَانِ، فَوَجَدَانِىْ اُغْمِىَ عَلَىَّ، فَتَوَضَّاَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْئَهُ عَلَىَّ فَاَفَقْتُ فَاِذَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ...

অর্থ: জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন নবী কারীম (সা.) ও আবু বকর (রা.) পায়ে হেঁটে আমার খোঁজ নেয়ার জন্য আমার নিকট আসলেন। তাঁরা আমাকে

---

২.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮, অধ্যায়: খাদ্য সংক্রান্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৩৮, হাদীস নং- ৫৩৭৩

৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী, (অনুবাদ: আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪ (পঞ্চম মুদ্রণ), অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, পৃ. ২৪১,হাদীস নং- ৫২০

৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী, *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মাআরিফাহ, ১৯৯৬, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগীর পরিচর্যা, খ. ২, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং- ১৪৩৫

৫. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: জানাযার তাকবীরের সংখ্যা, পৃ. ৪৮২, হাদীস নং- ১৯৮৩

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তখন নবী কারীম (সা.) অযু করলেন। তারপর অযুর অবশিষ্ট পানি তিনি আমার গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। ফলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখলাম, নবী কারীম (সা.) উপস্থিত রয়েছেন।[৬]
আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُصِيْبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الاَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ-

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন সাদ ইবন মুআয (রা.) খন্দকের যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, যা তাঁর হাতের শিরায় বিদ্ধ হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জন্য মসজিদে (নববীতে) একটা তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি নিকটে থেকে বারবার তাঁর দেখাশুনা করে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন।[৭] আরেকটি হাদীসে এসেছে– عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ وَّجْعٍ كَانَ بِعَيْنَىَّ-

অর্থ: যায়িদ ইবন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমার দু'চোখ ওঠে ব্যথা হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখার জন্য এসেছিলেন।[৮]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। তাই তাঁর রোগী সেবা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি অমুসলিমদেরও সেবা-শুশ্রূষা করতেন। শুধু ধর্মের পরিচয়ে নয়, মানুষের পরিচয়ে অন্যের সেবায় নিবেদিত হওয়া এবং মানুষের দু:খ-দুর্দশা ও অসুস্থতায় মানবতাবোধ জাগ্রত হওয়া এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা। যার বাস্তব উদাহরণ আমরা নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহে দেখতে পাই।

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنِ اُبَىٍّ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ- فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيْهِ الْمَوْتَ قَالَ قَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ الْيَهُوْدِ-

অর্থ: উসামা ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ ইবন উবাই (মুনাফিক)-কে মৃত্যু শয্যায় তাকে দেখার জন্য গমন করেন। তিনি (সা.) যখন তার নিকট প্রবেশ করেন, তখন তিনি তার মাঝে মৃত্যুর আলামত দেখে বলেন: আমি তোমাকে ইয়াহূদীদের সাথে মহব্বত রাখতে নিষেধ করতাম।[৯] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ غُلاَمًا مِّنَ الْيَهُوْدِ كَانَ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلَى اَبِيْهِ وَ هُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَه اَبُوْهُ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ-

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার এক ইয়াহূদীর ছেলে রোগাক্রান্ত হলে নবী কারীম (সা.)তাকে দেখতে যান। তিনি (সা.) তার শিয়রে বসে বলেন: তুমি ইসলাম কবুল করো। তখন ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকায়, যে তার শিয়রে বসা ছিল। এমতাবস্থায় পিতা তাকে বললো: তুমি আবুল কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করে নাও। অত:পর ছেলেটি ইসলাম কবুল করলে নবী কারীম (সা.) এরূপ বলতে বলতে দাঁড়ান: সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমার কারণে তাকে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দিয়েছেন।[১০]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.)জনৈক বেদুঈনের রুগ্নাবস্থায় তাকে দেখতে যান। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়ম ছিল যখন কোনো রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, কোনো অসুবিধা

---

৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সেবা করা, খ. ২, পৃ. ১৬০৬, হাদীস নং- ৫৬৫১
৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ, ২০০4, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: বারবার রোগী দেখা, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৩০৯৯
৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: চোখের রোগীর পরিচর্যা, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৩১০০
৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৩০৯৩
১০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: যিম্মী কাফিরের পরিচর্যা, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৩০৯৪

নেই, ইনশাআল্লাহ গুনাহসমূহ থেকে পবিত্রতা লাভ হবে। তখন বেদুঈন বলল, আপনি বলছেন যে এটা গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে! কখনো নয় বরং এটা এমন এক জ্বর যা এক অতি বৃদ্ধকে উত্তপ্ত করছে, যা তাকে কবরস্থান দেখিয়ে ছাড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ তাহলে তাই।[১১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো রোগীকে দেখতে গেলে বা তাঁর কাছে কোনো রোগীকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার মাথায় বা আক্রান্ত স্থানে হাত বুলাতেন এবং দু'আ করতেন। কোনো সময় চিকিৎসাস্বরূপ অযু করে অযুর পানি বা অবশিষ্ট পানি শরীরে ছিটিয়ে দিতেন। উম্মতকেও তিনি অসুস্থের সেবা করতে গেলে বিশেষ দুআ করতে শিখিয়েছেন।[১২]

**রোগী দেখতে যাওয়ার প্রতিদান**

নানা ধরনের খিদমতে খালকের মধ্যে রোগী দেখতে যাওয়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ। অসুস্থ ব্যক্তি দেখতে যাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে দেখতে যাওয়ার সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অথচ তাঁর মহান সত্তা এসব মানবীয় বিষয়াদি হতে মুক্ত ও পূত-পবিত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্যই তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন। তাই রোগী দেখার ব্যাপারে আপন কি পরএমন কোনো শর্ত নেই, বরং রোগী যেই হোক ধনী-গরীব, আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং পরিচিত-অপরিচিত রোগ শয্যায় তার পাশে যাওয়া অনেক সওয়াবের কাজ। হাদীসে এসেছে- হযরত ছাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ–

অর্থ: যখন কোনো মুসলমান তার অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে।[১৩] অন্য এক হাদীসে এসেছে- হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ رَّجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا مُمْسِيًا اِلاَّ خَرَجَ مَعَه سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَه حَتّٰى يُصْبِحَ وَ كَانَ لَه خَرِيْفُ فِى الْجَنَّةِ– وَ مَنْ اَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَه سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَه حَتّٰى يُمْسِىَ وَ كَانَ لَه خَرِيْفُ فِى الْجَنَّةِ–

অর্থ: যদি কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা কোনো রোগীকে দেখতে যায়, তবে তার সাথে সত্তর হাজার ফিরিশতা বের হয়, যারা তার জন্য সকাল পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তার সাথেও সত্তর হাজার ফিরিশতা বের হয়, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়।[১৪]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَ عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– قُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ وَ مَا الْخَرِيْفُ؟ قَالَ اَلْعَامُ–

অর্থ: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে সাওয়াবের নিয়তে তার রোগগ্রস্ত মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ খারীফ দূরে রাখা হবে। রাবী বলেন: আমি আবূ হামযাকে জিজ্ঞাসা করলাম: খারীফ কী? তিনি বলেন: এর অর্থ হলো এক বছর।[১৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন-

يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ– قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْه– اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَّه لَوَجَدْتَّنِىْ عِنْدَه–

---

১১. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে কী বলবে? পৃ. ২৪৬, হাদীস নং- ৫২৮

১২. মুফতী মুতীউর রহমান, "রোগীর সেবায় মহানবী সা.", *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার (সম্পাদিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ২৭

১৩. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তান: করাচি, বুশরা পাবলিশার্স, ২০০৯, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: রোগীর দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত, খ. ৭, পৃ. ২০৭, হাদীস নং- ৬৫৪৮

১৪. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: অযুর সাথে রোগী দেখার ফযীলত, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৩০৯৭

১৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৯৬

অর্থ: হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর রাখোনি। বান্দা আরয করবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো বিশ্ব জাহানের প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে দেখতে যাবো? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি জানতে যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল। কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি যদি সেই বান্দাকে দেখতে যেতে তাহলে তুমি সেখানে আমাকে দেখতে পেতে।[১৬]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো রোগীর পরিচর্যা করে, আসমান থেকে একজন আহবানকারী ডেকে বলে- তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্ধারণ করে নিলে।[১৭]

### পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, দ্রুততম সময়ে তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাকে সময় মতো ডাক্তার দেখানো, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ খাওয়ানো, রোগ ও রোগীর চাহিদা মোতাবেক ফল-মূল ও ঘরে পাকানো ভালো খাবার খাওয়ানো, যথাযথ পরিচর্যা করা, রোগীকে আশ্বাসের বাণী শোনানো, তাকে সময় দেয়া এ সবই দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। একজন রোগীর জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নিজ পরিবারের রোগীকে নামি-দামি হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ডাক্তার ও নার্সদের ওপর চিকিৎসা করার দায়িত্ব দিয়ে দেয়,নিজে কোনো খোঁজ-খবর নেয় না এবং সময় দেয় না,এটা খুবই অমানবিক। অথচ এ সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরারোগীকে মানসিক সার্পোট প্রদানের জন্য তার কাছাকাছি থাকা জরুরী, দ্রুত সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রেওইহা বিরাট ভূমিকা রাখে। এছাড়া এমন অনেক রোগ ও বিষয় আছে যা রোগীর সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তার বা নার্সের তা জানা খুবই জরুরী অথচ রোগী সরাসরি ডাক্তার বা নার্সের নিকট বলতে লজ্জবোধ করে বা বলাটা সমীচীন মনে করে না, কিন্তু পরিবারের কোনো সদস্যের নিকট তা অবলীলায় বলতে কোনো ধরনের সংকোচবোধ করে না। এজন্যই রোগীর সেবা-যত্নে পরিবারেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তাছাড়া পরিবারের সদ্যসরা যথাযথ দায়িত্ব পালন না করলে এর নেতিবাচক প্রভাব শুধু রোগীর ওপরই পড়বে না, বরং দীর্ঘদিন একটি পরিবারে কোনো রোগী থাকলে গোটা পরিবারেই ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং এক সময় সবার মানসিক শক্তিও ভেঙ্গে যেতে পারে, যা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেওযদি পরিবারের প্রধান তার চিকিৎসার করানোর ব্যাপারে উদাসীন থাকে বা নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন না করে, তাহলে পরকালে তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ ... وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ–

অর্থ: ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারীস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।... গৃহকর্তা তার গৃহবাসীদের রাখালস্বরূপ, তাকে তার গৃহবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৮]

### সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মানুষ সামাজিক জীব। ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা ব্যতীত মানব জীবনের ধারণাই কল্পনাতীত বিষয়। আমাদের সমাজে এমন অনেক রোগী রয়েছে, যারা অর্থের অভাবে সুচিকিৎসা নিতে না পারায় দীঘদিন যাবৎ অসুখের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যত্ন সহকারে অল্প চিকিৎসা করলেই তারা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারে। এমতাবস্থায় সমাজের বিত্তবান লোকদেরও রোগীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যাকাতের একটি অংশ দিয়ে এমন অসহায় রোগীদের এককভাবে বা কয়েকজন মিলে দান সদকা করে চিকিৎসা করানো যেতে পারে। দুরারোগ্য অসুখের ক্ষেত্রে

---

১৬. *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: রোগীর দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত, খ. ৭, পৃ. ২০৮, হাদীস নং- ৬৫৫১

১৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগীর পরিচার্য করার সাওয়াব, খ. ২, পৃ. ১৯২, হাদীস নং- ১৪৪৩

১৮. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছে: বান্দা রাখালস্বরূপ, পৃ. ১২০, হাদীস নং- ২০৬

অনেক টাকার প্রয়োজন হলে সমাজের সকলে মিলে প্রয়োজনে চাঁদার মাধ্যমে টাকা উত্থোলন করে হলেও রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। সমাজের একজন লোক অসুস্থ হয়ে কাতরাবে আর অন্যরা দেখে অথবা না দেখে পাশ কেটে থাকবে এবং নিজে মহাআনন্দে দিন কাটাবে এটা কখনো ইসলামী সমাজের রূপরেখা হতে পারে না। তাই দেখা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়ত প্রাপ্তির অনেক পূর্বেই সমাজের দু:খ-দুর্দশা, হতাশাগ্রস্ত, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের খেদমত প্রদানের নিমিত্ত হিলফুল ফুযুল নামে একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى

অর্থ: তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করো।[১৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ... وَاللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- ... আল্লাহ সে সময় পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।[২০]

**রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক যে পাঁচটি চাহিদা রয়েছে যথা: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এসবই পূরণ করা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাগরিকদের এসব মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবাকে সব নাগরিকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া। পর্যাপ্ত হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং ঔষধসামগ্রী প্রস্তুত ও আমদানী করে চিকিৎসা সেবাকে সহজলভ করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ, যোগ্য, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সৎ ও নিষ্ঠাবান ডাক্তার, সেবক-সেবিকা, কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া। দায়িত্ব অবহেলা করার সাথে সাথে তড়িৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।[২১]সুতরাং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে, সেজন্যও রাষ্ট্রের কর্নধারদেরকে আখেরাতে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ،وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ–

অর্থ: ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারীস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং শাসক তার নাগরিকদের রাখালস্বরূপ, তাকে তার শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[২২]

**হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

যখন কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসালয়ে আসে তখন সে এটিকে নিজের ঘর-বাড়ির চেয়েও নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে এবং এখান থেকে সুস্থ হয়ে পুনরায় সে বাড়ি ফিরবে এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। রোগীদের এমন অসহায় ও অপারগ পরিস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো রোগীকে যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করে দ্রুততম সময়ে সুস্থ করে তোলা। আর এটি তখনই সম্ভব যখন সরকারী বা বেসরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রাইভেট কোম্পানী, ছোট ক্লিনিক বা বড় চিকিৎসা কেন্দ্র সবগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হয় মানবসেবা। সুতরাং রোগীদের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের খুবই সহনশীল ও দরদী হওয়া উচিত। চিকিৎসার মান যেমন উন্নত হতে হবে, তেমনি ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদিও সহজলভ্য হতে হবে। প্রয়োজনে নি:স্ব, অসহায় ও গরীব রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। চিকিৎসার নামে রোগীদের নিকট থেকে শুধু অর্থ উপার্জনের ব্যবসায়িক মন-মানসিকতা

---

১৯. আল-কুরআন, ৫: ২

২০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ: আলিমগণের ফযীলত এবং ইলম অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান, খ. ১, পৃ. ১৪৮, হাদীস নং-২২৫

২১. অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দীন আহমেদ, "ইসলামের দৃষ্টিতে রোগীর সেবা ও তার প্রতি কর্তব্য: একটি পর্যালোচনা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল-জুন ২০১৮, ৫৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১৩

২২. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০, হাদীস নং- ২০৬

পরিহার করতে হবে। রোগীদেরকে টাকা কামানোর পণ্য মনে না করে যত ধরনের ফাঁকিবাজি ও অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে তা পরিহার করত একমাত্র খেদমতে খালকের উদ্দেশ্যে হামদর্দি ও সহমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে এ মহান দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আঞ্জাম দেয়া উচিত। এজন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় মন-মানসিকতাসম্পন্ন ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীও নিয়োগ দেবে। এছাড়া চিকিৎসার পরিবেশ সুন্দর রাখার পাশাপাশি এর আশেপাশের পরিবেশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নির্মল রাখতে হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللهُ–

অর্থ: জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।[২৩]

**ডাক্তারের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অসহায় হলো একজন রোগী। তার পাশে পরিবারের যতো আত্মীয়-স্বজনই থাকুক না কেন এসময় ডাক্তারই তার সবচেয়ে আপনজন। তাই রোগীকে সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হামদর্দি ও সহমর্মিতার কথা যাই বলি না কেন, এসময় ডাক্তার যদি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট না হোন তাহলে এসবই বিফলে যাবে। রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্য ডাক্তারের ভূমিকাই মূখ্য, আর অন্যান্য সকল আয়োজন গৌণ। ডাক্তার রোগীকে যথাসময়ে এবং যথানিয়মে চিকিৎসা না দিয়ে দায়িত্বে অবহেলা করলে এটি হবে চরম অন্যায়। তাই ডাক্তারকে তার সেবায় হতে হবে একনিষ্ঠ ও আন্তরিক। রোগীর অবস্থা নিয়ে তার তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগীর সাথে নম্র-ভদ্র আচরণের পাশপাশি ধৈর্যসহকারে এবং সময় নিয়ে আমানতের সাথে চিকিৎসা দিতে হবে। ডাক্তারগণ যে কসাই না; বরং রোগীর বন্ধু তার প্রমাণ দিতে হবে। রোগীর এমন অসহায়ের সময় দয়াসুলভ ও সুন্দরভাবে চিকিৎসা প্রদান করলে আল্লাহ তাআলাও তার ব্যক্তি জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে দয়া বর্ষণকরবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থ: তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।[২৪]

**সেবক-সেবিকার দায়িত্ব**

রোগীদের চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে সেবক-সেবিকারা অন্যতম গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে অথবা বাড়িতে স্বেচ্ছায় কোনো রোগীর খেদমতে নিয়োজিত থাকুন না কেন, ইচ্ছা করলে তারা আন্তরিক সেবা দিয়ে একজন রোগীকে খুব সহজেই সুস্থ করে তুলতে পারেন। অসুস্থতা নিরাময়ে ঔষধপত্রের পাশাপাশি রোগীর পরিচর্যাও কোনো অংশে কম নয়। ডাক্তারের পরামর্শ ও ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবনেই যদি রোগী ভালো হয়ে যেতো, তাহলে সারাবিশ্বে প্রতিটি হাসপাতালে অসংখ্য সেবক-সেবিকা নিয়োগ দিয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতো না। বরং প্রতিটি হাসপাতালে ডাক্তারের চেয়ে সেবক-সেবিকার সংখ্যাই বেশি। এতেই প্রমাণ মিলে রোগীর প্রতি সেবক-সেবিকাদের দায়িত্ব কতো বেশি। ডাক্তারগণ সারাদিনে একেকজন রোগীকে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যবস্থাপত্র ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেবক বা সেবিকাগণ চব্বিশ ঘণ্টা রোগীর পাশে থেকে সময়মতো ঔষধ ও খাবার খায়ানো, প্রেসার মাপা, কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ বিভিন্ন ধরণের পরিচর্যা করে রোগীর খুব কাছকাছি থাকেন। রোগীর এমন অসহায়েত্বের সময় রোগীর সাথে উত্তম আচরণ করা, সান্ত্বনার বাণী শোনানো এবং কর্কশ ভাষা পরিহার করে সুন্দরভাবে কথা বলা সেবক-সেবিকাগণের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ–

অর্থ: আপনি যদি কর্কশভাষী এবং কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে লোকেরা আপনার আশপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।[২৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- সৃষ্টিকুল আল্লাহ তাআলার পরিবারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি প্রিয় যে তাঁর পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে।[২৬]

২৩. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না, পৃ. ৭৭, হাদীস নং- ৯৭
২৪. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, অনুচ্ছেদ: মানুষের প্রতি দয়া,খ. ২, পৃ. ৪১, হাদীস নং- ১৯২৪
২৫. আল-কুরআন, ৩: ১৫৯

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রোগী দেখার আদব

### রোগীর শরীরে হাত রাখা

ইহলৌকিক বা পারলৌকিক যেকোনো কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত বা আদব রয়েছে। এসকল সুন্নাত ও আদব মানব জীবনের সফলতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। রোগী দেখার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বেশকিছু নির্দেশনা ও আদব রয়েছে। যা অনুসরণ করলে একজন রোগী শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই স্বস্তি লাভ করে শান্তিময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও যুক্তিযুক্ত। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَّضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَه عَلَى جَبْهَتِه اَوْ عَلَى يَدِه وَ يَسْأَلَه كَيْفَ هُوَ؟

অর্থ: হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রোগী দেখার উত্তম নিয়ম হলো- তুমি রোগীর কপালে বা তার হাতে তোমার হাত রাখবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে, “আপনি কেমন আছেন”?[২৭]

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রোগী দেখার দ্বারা শুধু তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং আসল বিষয় হলো রোগীকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেয়া। আমরা কারো দু:খ-কষ্ট বা রোগ-শোক লাঘব করতে পারবো না, তবে সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণের দ্বারা তার হৃদয় মন অবশ্যই প্রফুল্ল করতে পারি। এভাবে কিছুটা হলেও তার দু:খ কষ্ট হালকা করতে পারি।

রোগীর মাথায় বা তার হাতে হাত রাখার দ্বারা একদিকে যেমন তার জ্বরের প্রচন্ডতা অনুভব করা যায়, তেমনি তার প্রতি নিজের আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সহমর্মিতা প্রকাশ ঘটে। আর এটা এমন একটি বিষয় যা একজন রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيْدًا- فَجَائَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِىْ وَ بَطْنِىْ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَ اَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ، فَمَازِلْتُ اَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِىْ فِيْمَا يُخَالُ اِلَیَّ حَتّٰى السَّاعَةِ-

অর্থ: আয়িশা বিনত সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেন, আমি যখন মক্কায় কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন নবী কারীম (সা.) আমাকে দেখার জন্য আসেন। ... তারপর তিনি আমার কপালের উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলিয়ে বললেন: হে আল্লাহ! তুমি সাদকে নিরাময় করো এবং তাঁর হিজরত পূর্ণ করো। আমি তাঁর হাতের হিমেল পরশ এখনও পাচ্ছি এবং মনে করি আমি তা কিয়ামত পর্যন্ত পাবো।[২৮]

### রোগীকে সান্ত্বনা দেয়া

অসুস্থ অবস্থায় মানুষ নিজেকে নি:স্ব মনে করে এবং রোগীর মন সবসময় পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো এমনকি ইবাদতও ভালো লাগে না। কোনো কিছুতেই মন বসে না। অজানা আশঙ্কায় সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকে। তাই এমন অস্থির অবস্থায় একজন রোগীকে সান্ত্বনা দেয়ার চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি নেই। দেখতে যাওয়া ব্যক্তি রোগীকে সান্ত্বনা দিলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার মন ভালো লাগবে এবং খুশি হবে। কিন্তু সান্ত্বনা না দিয়ে যদি তার সামনেই নিরাশার বাণী শোনানো হয়, তাহলে রোগী মানসিকভাবে ভেঙ্গে যাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে সাথে সাথেই যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সমাজে এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে। তাই মানব হিতৈষী রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখতে যাওয়া রোগীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তিনি নিজেও রোগীকে দেখে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন-

اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِى الْاَجَلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَ هُوَ يَطِيْبُ نَفْسَ الْمَرِيْضِ-

---

২৬. অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৭. শায়খ আলী ইবন সুলতান মুহাম্মদ, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০১ (প্রথম প্রকাশ), অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: মুসাহাফা ও মুআনাকা, খ. ৮, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং- ৪৬৮১

২৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগীর দেহে হাত রাখা, খ. ২, পৃ. ১৬০৯, হাদীস নং- ৫৬৫৯

অর্থ: তোমরা রোগীর পরিচর্যার জন্য উপস্থিত হবে, তখন তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে।  যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে, তখন তার দীর্ঘ হায়াত সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করবে। তবে তা তাকদীরকে ফিরাতে পারবে না, অথচ তা রোগীর অন্তরে খুশি সৃষ্টি করে।[২৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) রোগ শয্যায় শায়িত একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। নবী কারীম (সা.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখন কোনো রোগী দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন-لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ

অর্থ: চিন্তার কোনো কারণ নেই, ইনশাল্লাহ তুমি তোমার গুনাহসমূহ থেকে পবিত্রতা লাভ করবে তথা সুস্থ হয়ে যাবে ।[৩০] রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে আরো ইরশাদ করেন-

اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ–

অর্থ: তোমরা যখন কোনো অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির হাজির হবে, তখন তোমরা ভালো কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বলো ফিরিশতাগণ তোমাদের কথার ওপর আমীন বলেন।[৩১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত তিনটি হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- প্রথমত রোগীর নিকট তার দীর্ঘ জীবন লাভের আলোচনা করা। তোমাদের কথায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবশ্যই পাল্টাবে না, কিন্তু এতে রোগীর চিত্ত অবশ্যই আন্দোলিত ও প্রফুল্ল হবে। দ্বিতীয়ত রোগীকে সাহস দাও যে আল্লাহ চাহেন তো ভয়ের কোনো কারণ নেই। তৃতীয়ত যখনই কোনো রোগীর নিকট যাবে, তার সাথে অতি উত্তম কথা বলবে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) তাঁর অনবদ্য হাদীস ভাষ্যগ্রন্থ লুমআ'তে লিখেছেন- "তোমরা তাকে তার জীবনের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত করো" বাক্যের মর্মকথা হলো- তোমরা তার দীর্ঘায়ুর জন্য দুআ করো। তাকে অভয় দাও, আনন্দিত করো, তাকে বলো চিন্তা করবেন না, আপনার রোগ কোনো জটিল নয়, ইনশাআল্লাহ আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠবেন। এতে তিনি আনন্দিত হবেন, চিন্তা দূর হবে, মানসিকভাবে সুস্থ থাকবেন এবংঅসুস্থতাও তার কাছে হালকা মনে হবে।

**স্বল্প সময়ে রোগী দেখা**

ইয়াদত বা রোগী দেখা মানব সেবার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ ও আমলের দিক থেকে ছোট্ট হলেও সাওয়াবের দিক থেকে অনেক বড়। তবে এর প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিক নির্দেশনা রয়েছে। তিনি রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও তার নিকট বেশি সময় অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ রোগীর নিকট দর্শনার্থীদের দীর্ঘ সময় অবস্থান করা অপছন্দনীয় কাজ। বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই, দর্শনার্থীরা রোগীর নিকট অধিক সময় অবস্থান করলে রোগী, রোগীর পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের খুবই পেরেশানীতে পড়তে হয়। তাছাড়া রোগীর নিকট বেশিক্ষণ অবস্থান করলে স্বাভাবিকভাবেই আগত ব্যক্তির আদর আপ্যায়ন এবং মেহমানদারীর একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। এতে পরিবারের লোকজন রোগীর খিদমত ত্যাগ করে আগত দর্শনার্থীর জন্য রান্না ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী আঞ্জাম দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আগত মেহমানদের আপ্যায়ন করাতে গিয়ে কখনো এমনও হয় যে রোগীর খুব প্রয়োজনীয় ঔষধ খাওয়ানো ও সেবার কথা ভুলে যায়। এতে দর্শনার্থী রোগীর বাড়িতে গিয়ে অধিক সময় অবস্থানের কারণে উপকারের পরিবর্তে অপকারই করলো। হাদীসে এসেছে, হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন – اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ اَجْرًا سُرْعَةُ الْقِيَامِ مِنْ عِنْدِ الْمَرِيْضِ–

অর্থ: সাওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে সর্বোত্তম রোগী দেখা হলো রোগীর নিকট স্বল্প সময় অবস্থান করা।[৩২]

---

২৯. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগীর পরিচর্যা, খ. ২, পৃ. ১৯০, হাদীস নং- ১৪৩৮

৩০. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: অসুস্থ বেদুঈনদের সেবা করা, খ. ২, পৃ. ১৬০৮, হাদীস নং- ৫৬৫৬

৩১. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯, অধ্যায়: কাফন-দাফন, অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালিমা শোনানো এবং তার জন্য দুআ করা, খ. ১, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং- ৯৭৭

৩২. আল্লামা আবদুর রাউফ আল-মানাবী, *ফায়জুল কাদীর*, লেবানন, বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৭২ (দ্বিতীয় সংস্করণ),

অনুরূপ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন-

لَا يُطِيْلُ الْجُلُوْسَ لِاَنَّ لِاطَالَةَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ مَكْرُوْهَةٌ–

অর্থ: কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে না। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা অপছন্দনীয়।[৩৩]

বাস্তবে রোগী যদি কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়, তবে তার নিকট যত কম সময় অবস্থান করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর নিকট বেশিক্ষণ অবস্থান করলে, ঐ রোগ দর্শনার্থীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে সাথে যদি কোনো ছোট্ট বাচ্চা থাকে তাহলে তো কথাই নেই। নিজের স্বার্থেই যত দ্রুত সম্ভব রোগী দেখে তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। তাই বর্তমানে উন্নত দেশ ও হাসপাতালসমূহে দেখা যায়, রোগীর যত আপনজনই হোক না কেনো রোগী দেখার ক্ষেত্রে তাকে রোগীর নিকট অবস্থান করার জন্য নির্ধারিত স্বল্প সময় বেঁধে দেয়া হয়, নির্ধারিত সময়ের পর এক সেকেন্ডও অবস্থান করতে দেয়া হয় না। শুধু তাই নয় রোগীকে দেখার জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে এবং মাস্ক লাগিয়ে রোগীর নিকট যেতে হয়। অথচ রোগী দেখার আদবের ক্ষেত্রে আমরা মুসলমান হয়েও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণিত বাণীসমূহের প্রতি কোনো খেয়ালই করছি না, যা খুবই দু:খজনক।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোগীর নিকট কম সময় বসা এবং শোরগোল কম করাও সুন্নত। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: (উত্তম) রোগী সেবা হলো দু'বার উটনী দোহনের মধ্যবর্তী বিরতি পরিমাণ সময় (তার কাছে বসা)।

উটনীকে একবার দোহনের পর কিছু সময় বিরতি দেয়ার কারণ হলো উটনীর বাচ্চা যেন তার দুধ পান করে এবং স্তনে দুধ জমা হলে আবারো দোহানো যায়। এই দু'বার দোহানোর মধ্যবর্তী বিরতি অতিসামান্য সময়। সুতরাং হাদীসের মর্মকথা হচ্ছে- উত্তম রোগী সেবা হলো রোগীর নিকট অল্প সময় বসা।[৩৪]

### রোগীর চাহিদানুযায়ী খাদ্য ও হাদিয়া প্রদান করা

অসুস্থ অবস্থায় রোগীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পরিপাকতন্ত্র দুর্বল থাকায় শরীর ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না এবং সকল প্রকার খাদ্য হজম করার সামর্থ্যও রাখে না। তাই রোগীকে হালকা ও দ্রুত হজমযোগ্য খাবার খাওয়ানো প্রয়োজন। রোগীকে যদি অধিক পরিমাণ খাবার বা শক্তিশালী খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে রোগীর রোগ বেড়ে যাবে, এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা পর্যন্ত রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, রোগী দেখতে গিয়ে যেসকল ফলমূল বা খাবার জাতীয় হাদিয়া অতিথি নিয়ে আসে, তার মনোতুষ্টির জন্য সেখান থেকে কিছু রোগীকেও খাওয়ানো হয় অথবা খাওয়ানোর জন্য রোগীর সাথে পীড়াপীড়ি করা হয়, যা মোটেই ঠিক নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস বলেন-

The more you nourish a diseased body, the more the worse you make it.

অর্থ: অসুস্থ দেহে যতই খাবার দেবে ততই রোগ বাড়তে থাকবে।

তাই সবচেয়ে ভালো হয়, সম্ভব হলে রোগীর রোগ অনুযায়ী পথ্য নিয়ে যাওয়া, যা তার জন্য অপকারি না হয়ে উপকারি হয়। অনেক সময় রোগী কী খায় বা রোগীর কী চাহিদা তা জানা না থাকায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। আবার অনেকসময় রোগী দেখতে আমরা নিজেদের স্ট্যাটাস অনুযায়ী ইচ্ছা মতো খাবার ও হাদিয়া নিয়ে থাকি, যা হয়তো রোগীর কোনোই কাজে লাগে না। রোগী যদি গরীব হয় বা এমন ব্যয়বহুল রোগ হয় যে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পরিবারের জন্য কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় সম্ভব হলে কোনো খাবার বা হাদিয়া না নিয়ে পরিবারের হাতে টাকা দিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এতে রোগীর চাহিদানুযায়ী খাবার ও চিকিৎসা ব্যয় উভয়টি নির্বাহ করা যাবে।

---

খ. ২, পৃ. ৪৫, হাদীস নং- ১২৮৫

৩৩. প্রিন্সিপাল হাফেজ নযর আহমদ, (অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান), *তিব্বে নববী*, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, হকলাইব্রেরী, মার্চ ২০০২ (চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ২১৬

৩৪. মুফতী মুতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি হলো, রোগীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাকে কোনোকিছু খাওয়ানোর ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি না করে তার পরিপাকতন্ত্রকে এমন শক্তিশালী করার চেষ্টা করা, যেন নিজ থেকেই খাদ্যের চাহিদা তৈরি হয়। আর অসুস্থ অবস্থায় রোগীকে কম খাওয়ানোও এক ধরনের চিকিৎসা। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ– فَاِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَ يَسْقِيْهِمْ–

অর্থ: উকবাহ ইবন আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে পানাহারের ব্যাপারে জোর-দস্তি করবে না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করান।[৩৫]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَاْمُرُ بِالتَّلْبِيْنِ لِلْمَرِيْضِ وَ الْمَحْزُوْنِ عَلَى الْهَالِكِ وَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ التَّلْبِيْنَ تَجُمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ وَ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগীকে এবং কারো মৃত্যুর কারণে শোকাতুর ব্যক্তিকে তরল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের আদেশ দিতেন। তিনি বলতেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি- 'তালবীনা' রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কলিজা দৃঢ় করে এবং অনেক দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়।[৩৬]

عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ مَعَهُ عَلِىٌّ وَ عَلِىٌّ نَاقِهٌ وَ لَنَا دَوَالٍ مُّعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ يَاْكُلُ مِنْهَا وَ قَامَ عَلِىٌّ لِّيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لِعَلِىٍّ مَهُ اِنَّكَ نَاقِهٌ حَتّٰى كَفَّ عَلِىٌّ قَالَتْ وَ صَنَعْتُ شَعِيْرًا وَّ سَلْقًا فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا عَلِىُّ اَصِبْ مِنْ هٰذَا فَهُوَ اَنْفَعُ لَكَ–

অর্থ: উম্মু মুনযার বিনত কায়স আনসারিয়া (রা.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট আসেন এবং সে সময় তাঁর সংগে আলী (রা.)ও ছিলেন, যিনি অসুস্থতার কারণে দুর্বল ছিলেন। আমাদের নিকট খেজুরের কাঁদি লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে অবস্থান করে তা থেকে খেজুর খেতে থাকেন। তখন আলী (রা.) খেজুর খাওয়ার জন্য দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: হে আলী! তুমি এখনো দুর্বল, কাজেই তুমি খেজুর খাওয়া হতে বিরত থাকো। একথা শুনে আলী (রা.) তা খাওয়া হতে বিরত থাকেন।

উম্মু মুনযার (রা.) বলেন, এরপর আমি যব ও বীটচিনি দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁর সামনে পেশ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী (রা.)-কে বলেন: হে আলী! তুমি এটা খেতে পারো, এটা তোমার জন্য উপকারী।[৩৭]

হযরত সুহাইব (রা.) হতে বর্ণিত-

قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزُ وَ تَمرُ فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ– فَأَخَذْتُ تَمْرًا فَأَكَلْتُ فَقَالَ أَ تَاْكُلُ تَمْرًا وَ بِكَ رَمَدُ–

অর্থ: আমি নবী কারীম (সা.)-এর খিদমতে হাজির হই। তাঁর সম্মুখে তখন রুটি ও খেজুর রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কাছে এসো, খেতে বসো। আমি বসে খেজুর খেতে শুরু করি। অত:পর তিনি আমাকে বললেন: তোমার চোখে অসুখ আর তুমি এমতাবস্থায় খেজুর খাবে?[৩৮]

---

৩৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: অসুস্থকে জোর করে খাওয়ানো, খ. ৪, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ৩৪৪৪

৩৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রোগীদের জন্য তালবীনা বা তরল জাতীয় লঘুপাক খাদ্য, খ. ২, পৃ. ১৬১৭,হাদীস নং- ৫৬৮৯

৩৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রোগীর খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা, খ. ২, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৩৮৬০

৩৮. হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, লেবানন: বৈরুত, মাকতাবাতু আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ১০৪

বাস্তবে খেজুর অত্যন্ত শক্তিশালী, রক্ত বর্ধক এবং এতে অনেক উপকারিতা থাকলেও বিভিন্ন অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজের ইচ্ছামতো খেজুর না খাওয়াই উত্তম। কারণ ইউনানী ভাষায় খেজুরর তাছীর ও প্রতিক্রিয়া গরম। সুতরাং অসুস্থ অবস্থায় বিশেষত চোখে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া থাকলে খেজুর খাওয়া থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী।

তবে অসুস্থ ব্যক্তি বিশেষ কোনো কিছু খেতে চাইলে এবং উক্ত খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে যদি ডাক্তারের নিষেধ না থাকে, তাহলে শুশ্রূষাকারীদের জন্য উচিত হবে সেই খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাকে তা আহার করানো। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে রোগী কিছু খাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলে তার জন্য তিনি সেই খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন।[৩৯] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَن ابْنِ عَبَّاس اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ م تَشْتَهِيْ؟ فَقَالَ اَشْتَهِى خَبْزَ بُرٍّ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ اِلٰى اَخِيْهِ- ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اشْتَهَى مَرِيْضُ اَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ-

অর্থ: ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) একজন (অসুস্থ) লোককে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কী (খেতে) ইচ্ছা করছে? তখন তিনি বললেন, আমার গমের রুটি খেতে ইচ্ছা করছে। তখন নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন: যার কাছে গমের রুটি আছে, সে যেন তার ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়। অত:পনবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন: তোমাদের কোনো রোগী যখন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন তাকে তা খেতে দেয়।[৪০] অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ، فَقَالَ اَ تَشْتَهِى شَيْئًا؟ اَشْتَهِى كَعْكًا- قَالَ نَعَم، فَطَلَبُوْا لَهُ-

অর্থ: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) একজন অসুস্থ ব্যক্তির সেবার জন্য তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন: তুমি কি কিছু (খেতে) চাও? তিনি বললেন, আমি কেক খেতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ঠিক আছে। তখন তারা তার জন্য তা চেয়ে নেয়।[৪১]

**রোগীর জন্য দুআ করা এবং রোগীর নিকট দুআ চাওয়া**

রোগী দেখতে যাওয়ার সময় আমরা সাধ্যমতো অনেক দামি ফল-মূল ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে থাকি। বাস্তবতা হলো অনেকাংশে রোগী তা মুখেও তুলে না। অত:পর আমরা কিছুক্ষণ রোগী ও তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে কিছু আলাপ-আলোচনা করে যার যার মতো বাড়ি ফিরে আসি। সর্বোপরি রোগী যদি হাসপাতালে ভর্তি থাকাবস্থায় কোনো ডাক্তারের সাথে আমাদের পরিচয় থাকে, তাহলে রোগী যাতে একটু ভালো চিকিৎসা পায় সেজন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করে থাকি এবং এতেই নিজেদেরকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করি। কিন্তু যিনি রোগ দিয়েছেন এবং সুস্থ করার মালিকও যিনি তাঁর কাছে আমরা রোগীর সুস্থতার জন্য দুআ করি না, যা একজন রোগীর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। অথচ রোগী দেখে দুআ করা সুন্নাত এবং কী ধরনের দুআ করতে হবে তা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রোগীকে দেখতে গিয়ে তার সামনে দুআ করলে অনেক খুশি হয় এবং মানসিকভাবে সে এক ধরনের শক্তি অনুভব করে, যা রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, রোগী যখন নিজের সুস্থতা, গোনাহ মাফ, তাওবা এবং অন্যান্য কল্যাণকর বিষয়ে দুআ করবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার জন্য যে দুআ করেছিল তাকেও নিজের দুআয় শামিল করবে। আর রোগীর দুআ যে ফিরিশতার দুআর সমতুল্য তা হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَكَانَ اِذَا اَتٰى مَرِيْضًا اَوْ اُتِيَ بِهِ قَالَ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ وَ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا-

৩৯. মুফতী মুতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯
৪০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: রোগীর কিছু খেতে ইচ্ছা হলে, খ. ৪, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৩৪৪০
৪১. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৩৪৪১

অর্থ: নবী কারীম (সা.) যখন কোনো রোগী দেখতে যেতেন বা কোনো রোগীকে তাঁর খিদমতে নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি বলতেন- হে মানুষের রব! তার কষ্ট দূর করে দিন, তাকে আরোগ্য দান করুন। একমাত্র আপনিই আরোগ্য দানকারী, আপনি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্য দিতে পারে না। আপনি তাকে এমন আরোগ্য দান করুন, যার পর আর কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকবে না।[৪২] রোগী দেখার আরেকটি দু'আ হলো-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَّمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارًا اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيْكَ اِلاَّ عَافَاهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرِيْضِ-

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি এমন কোনো রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি, সে যেন তার নিকট বসে এ দুআটি ৭ বার পাঠ করে-

اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيْكَ-

"আমি সুউচ্চ আরশের সুমহান অধিপতি (রব)-এর নিকট আপনার রোগমুক্তি কামনা করছি। তিনি যেন আপনাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন।" এ দুআর ফলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করবেন।[৪৩]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাঁর ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-

عَادَنِى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَا مَرِيْضُ فَقَالَ لِىْ يَا سَلْمَانُ شَفَى اللهُ سَقَمَكَ وَ غَفَرَ ذَنْبَكَ وَ عَافَاكَ فِىْ دِيْنِكَ وَ جِسْمِكَ اِلٰى مُدَّةِ اَجَلِكَ-

অর্থ: আমি রুগ্ন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং এই দুআ করেন: আল্লাহ তোমার রোগ ভালো করে দিন, তোমার গোনাহ মাফ করে দিন এবং তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার দীন ও দেহকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।[৪৪] অন্য আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنِ السَّائِبِ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِىْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَاْسِىْ وَ دَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ-

অর্থ: সায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ। তখন নবী কারীম (সা.) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দুআ করলেন।[৪৫]

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ- فَجَائَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِىْ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِىْ وَ بَطْنِىْ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَ اتِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ-

অর্থ: আয়িশা বিনত সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন: মক্কাতে অবস্থানকালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী কারীম (সা.) আমাকে দেখতে আসেন এবং তাঁর পবিত্র হাত আমার কপালের উপর রাখেন। এরপর তিনি দুআ করেন: ইয়া আল্লাহ! আপনি সাদকে রোগমুক্ত করুন এবং তাঁর হিজরত পূর্ণ করুন।[৪৬]

---

৪২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: রোগীর জন্য পরিচর্যাকারীর দু'আ করা, খ. ২, পৃ. ১৬১৩, হাদীস নং- ৫৬৭৫

৪৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগী দেখার সময় তার জন্য দু'আ করা, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৩১০৪

৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যামান, *তিব্বে নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

৪৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: দু'আর উদ্দেশ্যে অসুস্থ শিশুকে নিয়ে যাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৬১২, হাদীস নং- ৫৬৭০

৪৬. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগী দেখার সময় তার রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করা, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৩১০২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اَذَا اَتَى مَرِيْضًا اَوْ اُتِىَ بِهِ قَالَ اَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

অর্থ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট কোনো রোগীকে আনা হতো তখন তিনি বলতেন: কষ্ট দূর করে দিন। হে মানুষের রব! শিফা দান করুন, আপনিই একমাত্র শিফা দানকারী। আপনার শিফা ব্যতীত অন্য কোনো শিফা নেই। এমন শিফা দান করুন যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে।[৪৭]

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- যখন তুমি কোনো রোগীর কাছে কিংবা কোনো মরণোম্মুখ ব্যক্তির নিকট যাও, তখন তার সামনে মঙ্গলজনক কথাবার্তা বলো। কেননা, তুমি যা বলো, ফিরিশতারা তার ওপর 'আমীন' বলে।[৪৮]

**রোগীর দুআ ফেরেশতার দুআর সমতূল্য**

যে কোন ব্যক্তির দুআই আল্লাহ তাআলার নিকট মূল্যবান। কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তিনিজেকে অসহায় মনে করে আল্লাহর প্রতি আরও বেশি নিবিষ্ট হয়ে যখন দুআ করে, তখন তার দুআ আল্লাহর নিকট আরো বেশি দামি হয়ে যায়। সুস্থতাবস্থায়মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পার্থিব কাজকর্মে লিপ্ত থাকার কারণে দুআর করার খুব বেশি সময় পায় না। কিন্তু একজন রোগী রোগ থেকে মুক্তির জন্য ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এবং মনে মনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় যখন কায়মনো বাক্যে দুআ করে থাকে, তখন স্বভাবতই সে দুআ কবুলের দরজা হাসিল করে নেয় এবং ফিরিশতাদের দুআ যেমন বৃথা যায় না, তেমনি রোগীর দুআও আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে না দিয়ে কবুল করে নেন। হাদীসে এসেছে-উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী কারীম (সা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

اِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ اَنْ يَّدْعُوَ لَكَ فَاِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلٰئِكَةِ–

অর্থ: তুমি যখন রোগীর কাছে গমন করবে, তখন তুমি তাকে তোমার জন্য দুআ করতে বলবে। নিশ্চয়ই তার দুআ ফিরিশতাদের দুআর অনুরূপ।[৪৯]

হযরত আনাস (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

عُوْدُوْا الْمَرْضٰى وَ مُرُوْهُمْ فَلْيَدْعُوْا اللهَ لَكُمْ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيْضِ مُسْتَجَابَةٌ وَ ذَنْبُهُ مَغْفُوْرٌ–

অর্থ: তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাবে এবং তাদের নিকট দুআর আবেদন করবে। তারা যেন তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করে। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির দুআ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে এবং তাদের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৫০]

অনেকে মনে করে রোগ-ব্যাধি হওয়া একটি আযাব ও গুনাহের শাস্তি। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা হলো, রুগ্ন ব্যক্তির ওপর আল্লাহর খাছ রহমত বর্ষিত হয়। তার দুআ বিশেষভাবে কবুল হয়ে থাকে। এটা কত বড় সুসংবাদ যে রুগ্ন ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় এবং তার দুআ কবুল হয়। শুধু তাই নয় বরং তাদের দুআ ফিরিশতাদের দুআর সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে তখন তার নিকট নিজের জন্য দুআর দরখাস্ত করবে। এতে বোঝা যায়, অসুখে পতিত হওয়ার কারণে বান্দা যেনো ফিরিশতাদের ন্যায় দুআ কবুল হওয়ার মাকাম ও মর্যাদা হাসিল করে এবং স্বীয় মাওলা পাকের অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

---

৪৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তিব্ব, অনুচ্ছেদ: গলায় তাবিজ ব্যবহার, খ. ২, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং- ৩৮৮৭

৪৮. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে যে দুআ পড়া হবে, খ. ২, পৃ. ১৯৩, হাদীস নং- ১৪৪৭

৪৯. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগীর পরিচর্যা, খ. ২, পৃ. ১৯১, হাদীস নং- ১৪৪১

৫০. হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আবদুল আযীম বিন আবদুল কাওয়ী আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, মিশর: কায়রো, দারুল ফাজর লিত-তুরাস, ১৪২১ হিজরী (প্রথম প্রকাশ), খ. ৪, পৃ. ২৪৯,

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ: অসুস্থ অবস্থায় রোগীর ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

কোনো মানুষ অসুস্থ হলে শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই সে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এতে পার্থিব কাজকর্মে যেমন বাধাগ্রস্ত হয়, তেমনি ইবাদত বন্দেগী করতেও অনেকাংশে অক্ষম হয়ে পড়ে। কিন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহর করুণার শেষ নেই। তাই কোনো মুমিন যখন অসুস্থতার কারণে ইবাদত বন্দেগী করতে না পারে, তখনও আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকেনিরবিচ্ছিন্নভাবে পুরস্কার বা প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

ইরশাদ হচ্ছে–ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ– اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرُ غَيْرُ مَمْنُوْنِ–

অর্থ: অত:পর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচ থেকে নিচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[৫১]

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখায় মুফাসিসরগণ বলেন- পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা করা হলেও এখানে তার বিপরীত বলা হয়েছে। কারণ মানুষ যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও  শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃতষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য এ উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিত অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কারণ যৌবন অস্তমিত হলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বাধ্যক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টি গোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের ওপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোনো উপকারে আসে না। অন্যান্য জীব জন্তু এর বিপরীত। সেগুলি শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ এসব জন্তু থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য আরো বহু রকম কাজ নেয়। জবাই করা হলে এর গোশত খাওয়া হয় অথবা মারা গেলেও সেগুলির চামড়া, পশম এবং অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও কোনো অংশ দ্বারা কোনো উপকারে আসে হয় না। সারকথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে অন্যতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা।[৫২]

কিন্তু পরের আয়াতে মুমিন সৎকর্মশীলগণ এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মুমিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, চরম ক্ষতি কেবল তাদেরই হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নি:শেষ হয়ে গেছে এবং পরকালেও তাদের কোনো অংশ নেই। কিন্তু মুমিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সাওয়াব কোনো সময়ই নি:শেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারগতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখ বিদ্যমান থাকে। বাধ্যক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করতো। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা আমল লেখক ফিরিশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎকর্ম করতো, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাকো।[৫৩]

সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে অশেষ নিয়ামত মনে করে যতো বেশি সম্ভব অসুস্থ হওয়ার পূর্বেই ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কারণ অসুস্থ হয়ে গেলে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইবাদত করা সম্ভব হয় না। অসুস্থতার কারণে যেখানে সাধারণ খাওয়া-দাওয়াই ভালো লাগে না এবং ফরয ইবাদত সম্পাদন করাও অনেকাংশে কষ্টকর হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করা, রোযা রাখা, যিকির-আযকার করা এবং ওযীফা আদায় করা তো আরো কঠিন বিষয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ হওয়ারর পূর্বেই সুস্থতাকে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন।[৫৪]

---

৫১.আল–কুরআন, ৯৫: ৫-৬

৫২.আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী* (তাফসীর গ্রন্থটির পুরো নাম: اَلْجَامِعُ لِاَحْكَامِ الْقُرْاٰنِ وَ الْمُبَيِّنُ لمَاَ تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ), লেবাননঃ বৈরুত, আর-রিসালাহ পাবলিশার্স, ২০০৬, খ. ২২, পৃ. ৩৭০- ৩৭১

৫৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী', (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)*, বাদশাহ ফাহাদইবন আবদুল আজিজ-এর নির্দেশ পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত: ১৪১৩ হিজরি, পৃ. ১৪৬৫

৫৪. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: আমলের বিষয়ে প্রতিযোগী হয়ে এগিয়ে যাওয়া, খ. ২,

তারপরও যদি কেউ কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে যায়, তবে এ অসুস্থতাও ঐ ব্যক্তির গোনাহের কাফফারা হয়ে যায় এবং সুস্থ থাকাকালীন যেসব নেক আমল ও ইবাদত-বন্দেগী করতো রোগাক্রান্ত হওয়ার পরও আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে সুস্থকালীন সময়ের ইবাদত-বন্দেগীর সাওয়াব দান করে থাকেন। সবসময় ইবাদত-বন্দেগীকরার কারণে আল্লাহ তাআলা অসুস্থতা বা অক্ষমতার দিনগুলোতেই শুধু পূর্বের ন্যায় অবিরাম সাওয়াব দিয়ে থাকেন এম নয়; বরং অসুস্থতার কারণে কেউ মারা গেলে মৃত্যু পর্যন্ত সে সাওয়াব পেতে থাকে, এটাও আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবাণী। অন্য রেওয়ায়েত আছে- ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় সাওয়াব লেখতে থাকেন।[৫৫]

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ اَحَدٍ يَمْرُضُ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَ هُوَ صَحِيْحُ–

অর্থ: যে কোনো ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় সে তার রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থাবস্থায় যেরূপ সাওয়াব লাভ করতো, সেরূপ সাওয়াবই লাভ করে।[৫৬] অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لاَ مَرَّتَيْنِ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضُ اَوْ سَفَرُ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَ هُوَ صَحِيْحٌ مُقِيْمٌ–

অর্থ: আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি নবী কারীম (সা.)-কে বহুবার বলতে শুনেছি: যখন কোনো ব্যক্তি নেক কাজ করে, কিন্তু অসুখ বা সফরের কারণে তা আদায়ে অক্ষম হয়, তখন তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকি লেখা হয়, যে পরিমাণ নেকি তার অসুস্থতার সময় বা বাড়িতে থাকার সময় নেক কাজ করার পরিবর্তে লেখা হতো।[৫৭]

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে কোনো আমলই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুমিন মুসলমানের প্রতি মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ যে আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাকে সুস্থ অবস্থায় আমল করার তাওফিক দান করেন। আবার বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন সুস্থ অবস্থায় যেভাবে আমল-ইবাদত করতো সেভাবে আমল-ইবাদতের সাওয়াব দানে ধন্য করেন। যাতে মুমিন মুসলমান উভয় অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। সুতরাং মুমিন বান্দার উচিত, সবসময় সুস্থতাকে মর্যাদা দেয়া। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়োল রাখা এবং ইবাদত-বন্দেগিতে মনোযোগী হওয়া। আর অসুস্থ হয়ে গেলেও আল্লাহ তাআলার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকা। সুতরাং সুস্থ অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়ে দেয়াই একজন মুমিনের বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তবেই সুস্থ-অসুস্থ সর্বাবস্থায় আল্লাহর অবিরত রহমত ও বরকতের ভাগীদার হওয়াসম্ভব হবে।

**অসুস্থ ব্যক্তির ফরয ইবাদত সালাত আদায় করা**

ঈমান আনার পর মুমিন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী হলো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো আদায় করা। কেননা মুকীম ও মুসাফির অবস্থায়, নিরাপদ ও ভীতিকর অবস্থায়, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায়-এক কথায় যে কোনো অবস্থায়ই সালাত আদায় করার দায়িত্ব রহিত হয় না।যদিও অসুস্থ হলে অনেক সময়মুমিন বান্দাকেও শয়তান এই বলে ধোকা দেয় যে এতো আমল করার পরেও আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যেহেতু রোগের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন তাই অসুস্থাবস্থায় সালাত আদায় বা অন্যান্য আমল করে কী লাভ হবে? আবার অনেক সময় দেখা যায়, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে রোগী ধৈর্য হারা হয়ে বা অধিক কষ্টের কারণে সালাত আদায় ছেড়ে দেয়। কিন্তু সাধারণ অসুস্থতার দোহাই দিয়ে কোনো অবস্থাতেই সালাত আদায় পরিত্যাগ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, সালাতের মধ্যেই শিফা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–فَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شِفَاءً অর্থ: নিশ্চয় সালাতে শিফা বা আরোগ্য রয়েছে।[৫৮]

পৃ. ১৫৬, হাদীস নং- ২৩০৬

৫৫. *তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৩৭২

৫৬. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বেও অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে, পৃ. ২৩২,হাদীস নং- ৫০২

৫৭. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: যখন কোনো লোক কোনো নেক কাজে অভ্যস্ত হয়, পরে অসুখ বা সফরের কারণেতা আদায় করতে ব্যর্থ হয়, খ. ২, পৃ. ৮৮-৮৯, হাদীস নং- ৩০৯০

৫৮. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: সালাত একটি শিফা, খ. ৪, পৃ. ৯৮, হাদীস নং- ৩৪৫৮

সুতরাং যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় সালাতের মতো কঠিন আমলে মনোযোগী হবে তার দ্বারা অন্যান্য ফরয আমল ছাড়া প্রশ্নই আসে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাহাবাগণের জীবনালেখ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই যেকোনো বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত বা রোগ-শোকে আক্রান্ত হলে সালাতের মাধ্যমে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তাআলাও পবিত্র কুরআনে সালাতের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য প্রার্থনার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

অর্থ: তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।[৫৯]

অনেক সময় অসুস্থতাকে ওযর হিসেবে ধরে মনে করা হয় সঠিক সময়ে সালাত আদায় না করলে কোনো গোনাহ হবে না বা সুস্থ হওয়ার পর সকল সালাত একসাথে আদায় করে নিলেই হবে অথবা মনে করা হয় অসুস্থতা যেহেতু সালাতের যাবতীয় ফরয ও ওয়াজিবসমূহ পূর্ণ করার পথে বাধা তাই যে কোনো প্রকারে সালাত আদায় করে নিলেই চলবে। এমন ভাবনা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং শয়তানের একটি বড় ধরনের ধোকা। সালাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে মওত পর্যন্ত যাতে এক ওয়াক্ত সালাতও কাযা না হয়। কারণজান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য প্রতিটি মুসলমানের সুস্থ-অসুস্থ সর্বাবস্থায় সালাত আদায়ে পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ–

অর্থ: আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হয়ে সেখানে স্থায়ী হবে।[৬০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) চরম অসুস্থতার সময়েও সালাত পরিত্যাগ করেননি, এমনকি তিনি কষ্ট করে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে হলেও সালাত জামাআতে আদায় করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَاءِشَةَ فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ التَّعْظِيْمِ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاُذِّنَ ... فَخَرَجَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ الْاَرْضَ مِنَ الْوَجْعِ–

অর্থ: আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আয়িশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম এবং সালাতের পাবন্দী ও এর তাযীম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সালাতের সময় হলে আযান দেয়া হলো।... আয়িশা (রা.) বলেন, আমার চোখে এখনো স্পষ্ট ভাসছে অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল।[৬১]

বস্তুত বিশ্বাসী ও সজাগ হৃদয়ের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। কঠিন অসুস্থতাও তাদেরকে সালাত আদায় ও তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। এমনকি আল্লাহ তা'আলা সালাতকে যুদ্ধ চলাকালে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করা অবস্থায়ও আবশ্যক করেছেন।

যদিও সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীর, কাপড় ও স্থান যাবতীয় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা শর্ত। কিন্তু অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সে পানি দ্বারা অযুর অঙ্গগুলো ধুইতে অপারগ হয়ে যায়। অবশ্য কেউ যদি অসুস্থাবস্থায় পানি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম হয় কিংবা কেউ তাকে অযুর ব্যাপারে সহযোগিতা করে তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত। কিন্তু পানি না থাকা কিংবা পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হওয়া অথবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে কেউ যদি পানি দ্বারা অযু করতে সক্ষম না হয়, সেক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অযুর বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

---

৫৯. আল-কুরআন, ২: ৪৫

৬০. আল-কুরআন, ২৩: ৯-১১

৬১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আযান, অনুচ্ছেদ: কী পরিমাণ রোগ থাকা সত্ত্বেও জামাআতে শামিল হওয়া উচিত, খ. ১, পৃ. ১৮৪-১৮৫, হাদীস নং-৬৬৪

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ–

অর্থ: আর তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বরা তায়াম্মুম করো। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো।[৬২]

তবে কারো অবস্থা যদি এমন হয় যে, পানি ব্যবহার করে অযু করতে পারছে না, আবার তার কাছে এমন কিছুও নেই যদ্বারা সে তায়াম্মুম করবে, এমতাবস্থায় সে যেভাবে আছে সেভাবেই সালাত আদায় করবে। কারণ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থ: আর তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।[৬৩]

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানকে সালাত আদায় করতে হবে। যেভাবে সালাত আদায় করতে সামর্থ্য হয় সেভাবেই সালাত আদায় করতে হবে। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকা অবস্থায় কোনো মুসলমান সালাত আদায় থেকে অব্যাহতি পায় না। কেননা সালাত আদায় ইসলামের রুকনসমূহের একটি অন্যতম রুকন। এটি কোনো ব্যক্তির মুমিন ও মুসলমান হওয়ার স্পষ্ট দলীলও বটে। শুধু তাই নয়, কোনো ব্যক্তির সালাত আদায় করার দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, সে ইসলামকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

উল্লেখ্য, ফরয সালাত দাঁড়িয়েই পড়তে হবে। দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা একটি অন্যতম রুকন।[৬৪]সামান্য কারণেই বসে বসে সালাত আদায় হবে না। অবশ্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে একেবারেই অপারগ হলে কিংবা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে খুব বেশি কষ্টকর হলে বসে সালাত আদায় করা যাবে। বসতে অপারগ হলে শুয়ে একদিকে কাত হয়ে সালাত আদায় করা যাবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে আদায় করা যাবে। তাও সম্ভব না হলে হুঁশ-জ্ঞান থাকাবস্থায় ইশারায় হলেও সালাত আদায় করতে হবে। কোনো কারণে দাঁড়িয়ে রুকু করা কষ্টকর হলে বসে ইশারা করে রুকু আদায় করা যাবে, তবে এ সময় রুকু বা সিজদার নিয়ত করতে হবে। আর সিজদার সময় রুকুর চাইতে একটু বেশি মাথা ঝুঁকাতে হবে। যাতে রুকুটি সিজদা থেকে আলাদা হয়।রুকু-সিজদার সময় মাথা দিয়ে ইশারা করতেও অক্ষম হলে চোখ দিয়ে ইশারা করতে হবে। অবশ্য এ অবস্থায়ও রুকুর সময় অল্প এবং সিজদার সময় বেশি ইশারা করতে হবে। কোনো কোনো রোগীকে দেখা যায়, তারা রোগাক্রান্ত অবস্থায় আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে সালাত আদায় করে। এরূপ করা সঠিক নয়। কুরআন ও হাদীসে কোথাও এমন বর্ণনা নেই এবং কোনো আলেমও একথা বলেননি।[৬৫]

সালাত সহীহ হওয়ার জন্য কেবলামুখী হওয়াও শর্ত। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে অসুস্থ ব্যক্তি যদি কেবলামুখী হতে সক্ষম না হয় কিংবা তার খাট ও বিছানা যদি কিবলামুখী অবস্থায় না থাকে এবং তা পরিবর্তন করাও সম্ভব না হয় তাহলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় সালাত আদায় করবে।

কোনো সময় রোগী এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়, প্রয়োজনের সময় সে কোনো লোক কাছে পায় না যে তাকে অযু করতে সাহায্য করবে। অথবা কখনো এমন হয় যে, তার কাপড়-চোপড় ও বিছানা নাপাক হয়ে গেছে অথচ সে নিজে তা পরিষ্কার করতে পারছে না। এদিকে সালাতের সময়ও চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সে এভাবেই সালাত আদায় করে নিবে। অত:পর সুস্থ হলে এসব ওয়াক্তের সালাত পুনরায় আদায় করে নিবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে নিয়মিত সালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন। সালাতের সকল আহকাম ও আদাব রক্ষা করে সালাত কায়েম করার তাওফীক দান করুন। সুস্থতা-অসুস্থতা সকল অবস্থায় সালাতের পাবন্দ থাকার তাওফীক দান করুন।

৬২. আল-কুরআন, ৪: ৪৩; ৫: ৬

৬৩. আল-কুরআন, ২২: ৭৮

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৯ (অষ্টম সংস্করণ), পৃ. ২৩৩

৬৫. মুফতী শফী, মুফতী আবু সাঈদ, মুফতী এরশাদ খান, *ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আশরাফিয়া বুক হাউজ, মার্চ ২০১৬, পৃ. ২১৮,২১৯

**অসুস্থ ব্যক্তির মসজিদে যাওয়ার হুকুম**

কোনো রোগীর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, তাকে আলাদা থাকতে হবে বা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ যাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনের নির্দেশনা দিয়েছে, তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে- এ সিদ্ধান্ত মেনে চলা, জামাআত বর্জন করা এবং নিজস্ব ঠিকানায় যথাসময়ে সালাত আদায় করা। কোনো কারণে আবেগ তাড়িত হয়ে বেশি সাওয়াবের প্রত্যাশায় অসুস্থ ব্যক্তির মসজিদে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ তার দ্বারা অন্যরাও রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শারীদ গোত্রের আমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

كَانَ فِيْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلُ مَجْذُوْمُ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ–

অর্থ: সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে জনৈক কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী কারীম (সা.) লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন: তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বায়আত করে নিয়েছি।[৬৬]

উল্লেখ্য, অসুস্থতাকে পুঁজি করে শয়তান রোগীদেরকে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে খুব গাফলতির মধ্যে রাখে, আবার অনেককে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, সুস্থ হলে সব সালাত একত্রে আদায় করে নেয়া যাবে। তাই যারা বাড়িতে বা হাসপাতালে রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকে তাদের উচিত সালাতের সময় রোগীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সালাত আদায়ে তাকে সাহায্য করা। বিশেষ করে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন অসুস্থ হলে সালাতের মতো গুররুত্বপূর্ণ নেকআমল সম্পাদনেপ্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। বিশেষ করে মুসলিম ডাক্তারগণ চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি রোগীদেরকে সালাত আদায়ে দাওয়াত দিলে এবং সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলে তা খুবই ফলপ্রসূ হবে।

**অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা**

শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম, স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন, সাবালক সব মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য রমযানে পূর্ণ মাস রোযা পালন করা ফরয ইবাদত। কিন্তু যারা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রোযা পালনে সক্ষম নয়, এমন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা বা বিশেষ ছাড়। রমযানে রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো: (১) মুসলমান হওয়া, (২) স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, (৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (৪) সুস্থ ও সক্ষম হওয়া, (৪) নারীদের পবিত্র অবস্থায় থাকা, (৫) সফর বা ভ্রমণে না থাকা।[৬৭]

ইসলাম এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যার মাঝে কোনো কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি নেই। ইসলাম মানুষের ফিতরাতের দিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা তার বান্দার ওপর এমন কোনো বিধি-নিষেধ অর্পন করেননি যা পালন করা তার জন্য সাধ্যাতীত। ইরশাদ হচ্ছে –لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থ: আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন।[৬৮] সুতরাং রমযান মাসে যদি কেউ সত্যিকারেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তার ব্যাপারেও পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

রমযান মাস! যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে মানবের দিশারিরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে। সুতরাং তোমাদের যারা এ মাস পাবে, তারা যেন তাতে রোযা পালন করে। আর তোমাদের যারা পীড়িত থাকবে বা ভ্রমণে, তারা অন্য সময়ে তা এর সমপরিমাণ সংখ্যায় পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের প্রতি কঠিন করতে চান না; যাতে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো যে তিনি তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[৬৯]

ইসলামের বিধান পালন করা হয় মানুষের নিজেদের স্বার্থে বা নিজেদের উপকারার্থে; এতে আল্লাহ তাআলার লাভ, স্বার্থ বা উপকার নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণের জন্য বিধান দিয়েছেন মানুষেরই সামর্থ্য অনুযায়ী। কোনো কারণে রমযান মাসে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে এবং এর পরেও তা কাযা রাখতে সক্ষম না হলে, তার জন্য ফিদইয়ার

৬৬. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনুচ্ছেদ: কুষ্ঠরোগ, খ. ৪, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং- ৩৫৪৪
৬৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২
৬৮. আল-কুরআন, ২: ২৮৬
৬৯. আল-কুরআন, ২: ১৮৪

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফিদ্‌ইয়া (فدية) আরবি শব্দ, এর অর্থ হলো- উৎসর্গ, বিনিময়, মুক্তিপণ।[৭০] যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান বার্ধক্য, অসুস্থতা বা যেকোনো কারণে রোযা পালনে অক্ষম বা অপারগ হন এবং পুনরায় সুস্থ হয়ে বা সক্ষমতা ফিরে পেয়ে রোযার কাযা আদায় করার মতো সম্ভাবনা না থাকে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির প্রতিটি রোযার জন্য একটি সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ সদকা আদায় করতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলা রোযা রাখলে যদি তার নিজের বা গর্ভস্থ সন্তানের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে; তবে পরে কাযা আদায় করতে পারবে। তবে এবিষয়ে ধর্মীয় বিধানের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। বিনা কারণে বা সামান্য অজুহাতে ফরয রোযা ছাড়া যাবে না।[৭১]

**অসুস্থ অবস্থায় হজ পালন**

হজ হলো আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ বিধান। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি অন্যতম ফরয ইবাদত হলো হজ। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও সাম্যের প্রতীকবহন করে হজ। হজে আর্থিক ও কায়িক শ্রমের সমন্বয় রয়েছে। অন্য কোনো ইবাদতে যা একসঙ্গে পাওয়া না যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবছর ৩০ থেকে ৪০ লাখ মানুষ পবিত্র হজ পালন করে থাকে। কিন্তু হজ ফরয হওয়ার যে পাঁচটি শর্ত রয়েছে, এর অন্যতম একটি হলো দৈহিকভাবে সুস্থ হওয়া। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তির ওপর হজ ফরয নয়, বরং আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্য পুরুষ ও নারীর ওপরই হজ ফরয। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

অর্থ: আল্লাহর তরফ থেকে সেই সব মানুষের জন্য হজ ফরয করে দেয়া হয়েছে, যারা তা আদায়ের সামর্থ্য রাখে।[৭২]

**অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহর ওপর সুধারণা রাখা**

শয়তানেক আমরা স্বচক্ষে দেখতে না পেলেও পবিত্র কুরআনে শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৩] শয়তান ইবাদতের মধ্যেও যেখানে একজন মুসলমানকে ধোঁকা দিয়ে থাকে, সুতরাং অসুস্থ বা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আরো বেশি ধোঁকা দিয়ে তাকে ঈমান হারা করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করে থাকে। তাই সুস্থাবস্থার চেয়ে অসুস্থ অবস্থায় নিজের ঈমান ও আমল হিফাযত রাখার ব্যাপারে আরো বেশি সচেষ্ট থাকতে হবে। অতএব অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো সবসময় আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং সাধ্য মোতাবেক ধৈর্য ধারণ করে নিজ প্রভুর প্রতি ভালো ধারণা রাখা। এটাই তার জন্য উত্তম। হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتُنَّ اَحَدُ مِنْكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّبِاللهِ –

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি- তোমাদের কেউ যেনো আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা ব্যতিরেকে মারা না যায়।[৭৪]

এছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির উচিত অন্তরে ভয়ও আকাংক্ষা রাখা এবং নিজ গুনাহের জন্য আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা এবং আপন প্রভুর রহমত কামনা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ–

অর্থ: এহেন অবস্থায় যে বান্দারই অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা ও আযাবের ভয় পাশাপাশি থাকে, সে বান্দাকেই আল্লাহ তার আকাংক্ষিত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আর যা সে ভয় করে তা হতে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকেন।[৭৫]

---

৭০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৬০৬

৭১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: ৬ষ্ঠ, সাওম-রোযা, অনুচ্ছেদ: যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয, পৃ. ৩১২

৭২.আল-কুরআন, ৩: ৯৭

৭৩.–اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ অর্থ: নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। -আল-কুরআন, ৩৬: ৬০

৭৪ . *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: তাওয়াক্কুল ও ইয়াকীন, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং- ৪১৬৭

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অন্তিম মুহূর্তে রোগীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন মানুষ সাধারণত ষাট থেকে সত্তর বছর হায়াত পেয়ে থাকে। অত:পর চিরচারিত নিয়ম অনুযায়ী তাকে এ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে অনন্ত অসীম জগতের দিকে রওয়ানা করতে হয়। সাধারণত অধিকাংশ মানুষই মৃত্যুর আগে হাসপাতালে বা নিজের বাসায়অসুস্থ অবস্থায় বেশকিছু দিন কষ্টে অতিবাহিত করে থাকে। এমন অসুস্থ ও অন্তিম মুহূর্তে রোগীর সাথে কেমন আচরণ হওয়া উচিত এবং এ পৃথিবী থেকে তার শেষ বিদায়ের সময় মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তাও ইসলাম ধর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

**রোগী দেখে কান্না ও মর্মবেদনা প্রকাশ করা**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত সাআদ ইবন উবাদা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.), সাআদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদও (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে-

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِيْ غَشِيَّةٍ فَقَالَ اَقَدْ قَضٰى؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ– فَبَكٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ–

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাআদ ইবন উবাদা (রা.)-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন তাঁকে নির্জীব অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? লোকেরা বলল- হে আল্লার রাসূল! এখনো মারা যায়নি। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কাঁদলেন।হাদীসের বর্ণনাকারী আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কাঁদতে দেখে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা কি জানো না আল্লাহ তাআলা চোখের পানি এবং অন্তরের কষ্টের ওপর কোনো শাস্তি দেন না? (অত:পর তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করে বললেন) তবে এটার কারণে আযাব বা রহম করেন।[৭৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র জীবনের এই ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, নিরব কান্নায় চোখে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া এবং হৃদয় ব্যথাতুর ও চিন্তাকিষ্ট হওয়াকে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকৃতিগত একটি বৈধ বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও ব্যথাতুর হয়েছেন এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করেছেন। স্বীয় উম্মতকেও এই দু:খ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু জিহ্বার দিকে ইশারা করে বলেছেন, ঐ ছোট্ট অঙ্গটি থেকে বের হওয়া শব্দাবলী যেমন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যম, তেমনি আযাব ও শাস্তির কারণ হয়। ভালো কথা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ডেকে আনে। আর অবৈধ শোক-গাঁথা, অভিযোগ ও শেকায়েতের কথা তাঁর আযাবকে বাড়িয়ে দেয়।

কোনো কোনো সমাজে প্রথা আছে, তারা মৃত্যুর পর মৃতের শিয়রে এবং শবযাত্রার সময় লাশের সাথে নিয়মিত মাতমকারী দল প্রেরণ করে থাকে। তারা এক বিশেষ ভঙ্গিতে শোক গাঁথা গায়, বুক চাপড়ায়, মাথা ও মুখে ধুলিবালি মাখে। কোনো কোনো এলাকায় এই কাজ ভাড়া করালোক দিয়েও করানো হয়। এখনো কোনো কোনো জায়গায় মহিলাগণ গলা মিলিয়ে সমস্বরে শোক গাঁথা গায়। চোখে পানি আসুক বা না আসুক, অন্তর কাঁদুক আর নাই কাঁদুক উচ্চ স্বরে তারা অবশ্যই মাতম করবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহ্বাকে আযাব ও দয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭৭]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.)-এর পুত্র ইবরাহীমের সর্বশেষ অসুখের সময় আমরা ধাত্রী খাওলা বিনতে মুনযিরের বাড়িতে গেলাম। তখন ইবরাহীম মরণোম্মুখ ছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) অজ্ঞতার কারণে মনে করতেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) এহেন বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন না। তাই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই অবস্থা! রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন- ইবন আওফ! এটা কোনো মন্দ বিষয় অথবা মন্দ অবস্থা নয়; বরং এটা মায়া-মমতা ও সহানুভূতি। এরপর পুনরায় তাঁর চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলে তিনি বললেন: চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করে, অন্তর

---

৭৫. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কাফন- দাফন, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই),খ. ১, পৃ. ৪৪১, হাদীস নং- ৯৮৩

৭৬.*আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন, খ. ৩, পৃ. ২৬৫, হাদীস নং- ২১৩৫

৭৭. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুযযামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯; *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়, খ. ৩, পৃ. ২৬৯, হাদীস নং- ২১৪০-২১৪৩

বেদনাবিধুর হয়, কিন্তু মুখে আমরা তাই বলবো, যা আল্লাহ পছন্দ করেন (অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। হে ইবরাহীম! তোমার বিরহে আমরা কাতর।[৭৮]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَ هُوَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ سَعْدُ وَ اُبَيُّ نَحْسِبُ- اَنَّ ابْنَتِيْ قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا ...فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِيْ حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ نَفْسَهُ تَقَعْقَعَ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَ لاَ يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ الرُّحَمَاءَ-

অর্থ: উসামা ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.)-এর এক কন্যা (যায়নাব) তাঁর নিকট সংবাদ পাঠিয়েছেন, এসময় উসামা, সাদ ও সম্ভবত উবায় (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন। সংবাদ ছিল এ মর্মে- আমার (যায়নাবের) এক শিশুকন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কাজেই আপনি আমাদের এখানে আসুন। ... অত:পর শিশুটিকে নবী কারীম (সা.)-এর কোলে দেয়া হলো। এসময় তার নি:শ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছিলো। নবী কারীম (সা.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। সাদ (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কী?তিনি উত্তর দিলেন: এটা রহমত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার অন্তরে এটি স্থাপন করেন। আর আল্লাহ তাঁর মেহেরবান বান্দাদের প্রতিই মেহেরবানী করে থাকেন।[৭৯]

**অন্তিম মুহূর্তে রোগীকে তালকীন দেয়া**

প্রতিটি জীবেরই মুত্যু আছে এবং মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। দুনিয়াতে আসার পর একদিন তাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। মৃত্যুর স্বাদ তাকে আস্বাদন করতেই হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ– অর্থ: প্রত্যেক প্রাণিকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।[৮০] হযরত আয়িশা (রা.) বলেন-

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ بِالْمَوْتِ وَ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَ هُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدْحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ–

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মৃত্যুকাতর অবস্থায় দেখেছি। তাঁর কাছে একটি পানি ভর্তি পেয়ালা ছিলো। তিনি পানির পাত্রে বার বার হাত ভিজিয়ে এনে স্বীয় চেহারা মুবারক মুছছিলেন এবং বলছিলেন- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণায় সাহায্য করুন।[৮১]

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, অন্তিম মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কোলে মাথা রেখে বলেছিলেন – اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ وَالْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الاَعْلٰى

অর্থ: হে আল্লাহ! আপরি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে আমার মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে নিয়ে যান।[৮২]

সুতরাং জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি যে কতো কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে, তা আল্লাহর হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের অবস্থা থেকেই বোঝা যায়। জীবন-মৃত্যুর সেই চরম সন্ধিক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন প্রচন্ড গরম অনুভব করেন যে তিনি বার বার ঠান্ডা পানিতে হাতডুবিয়েছেন এবং ভেজা হাতে চেহারা মুবারক মাসেহ করেছেন। একঠিন

---

৭৮. ডা. মো: আব্দুল হাই, (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম সা.* ঢাকা: বাংলাবাজার, মদীনা পাবলিকেশান্স, সেপ্টেম্বর ২০০৮ (ষোলতম সংস্করণ), পৃ. ৪০৭, ৪০৮

৭৯. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: অসুস্থ শিশুদের সেবা করা, খ. ২, পৃ. ১৬০৮, হাদীস নং- ৫৬৫৫

৮০. আল-কুরআন, ৩: ১৮৫

৮১. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কাফন-দাফন, অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর সময় কষ্ট হওয়া,খ. ১, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং- ৯৭৮

৮২. প্রাগুক্ত, অধ্যায়: দুআ, অনুচ্ছেদ: (শিরোনাম উল্লেখ নেই), খ. ২, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং- ৩৪৯৬

অবস্থাতেও তিনি তাঁর পবিত্র মুখে আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত কামনা করেছেন। মহান বন্ধুর সাথে মিলনের ঐকান্তিক আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

অতএব উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে আমাদের উচিত, সর্বাবস্থায় বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং যতো বেশি সম্ভব যিকির ও কালিমা তায়্যিবা পাঠ করতে থাকা। হয়তো এর ওসীলায় মৃত্যুর সময় মুমিনের কালিমা নসীব হয়ে যেতে পারে। আর মৃত্যুর পথযাত্রীর যাতে কালিমা নসীব হয়, পাশে থাকা লোকদেরও এদিকে নযর রাখা উচিত। এজন্য ইসলামে মৃত ব্যক্তিকে তালকীনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ একজন মুমিনের সুস্থ-অসুস্থ তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করার আসল লক্ষ্যই হলো তার মুখে যেনো সর্বশেষ কালিমা উচ্চারণ হয় এবং মৃত্যু সময়কালিমা পাঠ করে জান্নাতী হতে পারে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ–

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালিমার তালকীন দেবে তথা তার কানের কাছে আস্তে আস্তে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করতে থাকবে।[৮৩] মুআয ইবন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِه لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ–

অর্থ: যে ব্যক্তির সর্বশেষ কালিমা (কথা) হবে- “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮৪]

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ غُلاَمًا لِيَهُوْدَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اَسْلِمْ فَاَسْلَمَ–

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদীর ছেলে নবী করীম (সা.)-এর খিদমত করতো। ছেলেটির অসুখ হলে নবী কারীম (সা.) তাকে দেখতে এলেন। এরপর তিনি বললেন: তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে ইসলাম গ্রহণ করলো।[৮৫]

**তালকীনের সঠিক নিয়ম**

আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, শুশ্রূষাকারী যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তির শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারে, তখন তাকে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এটা তালকীনের সঠিক নিয়ম নয় বরং সুন্নাত হলো- পাশে থাকা লোক নিজেরাই জোরে জোরে কালিমা তায়্যিবা পাঠ করতে থাকবে। বস্তুত এর মধ্যে অনেক বড় হিকমত নিহিত রয়েছে। যদি মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে বার বার কালিমা পড়তে বলা হয় তার এই কঠিন অবস্থায় জিহ্বা নড়াচড়া করার শক্তি না থাকায় কালিমা পড়ার সক্ষমতা নাওথাকতে পারে এবং এই মুমূর্ষু অবস্থায় তার হুঁশ ও অনুভূতি ঠিক আছে কিনা তা জানারও কোন উপায় নেই। সর্বোপরি আল্লাহ না করুন মৃত্যু যাতনায় তার মস্তিষ্কও বিকৃত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় বেশি চাপাচাপি করলে সে হয়তো কালিমা পড়তে অস্বীকার করেও বসতে পারে। তাই পাশে উপবিষ্ট শুশ্রূষাকারীগণ কালিমা তায়্যিবা পাঠ করতে থাকলে রোগীর নিজেরই কালিমা পাঠের উপলব্ধি জাগ্রত হবে, ইনশাআল্লাহ। একবার কালিমা পাঠ করে নিলে তার নিকট উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গের উচিত আর কিছু না বলে চুপ থাকা এবং তার সাথে অন্য কথা না বলা, যাতে তার সর্বশেষ কথা ঐ কালেমাই হয়।তবে মুমূর্ষু ব্যক্তিরজন্য মনে মনে দু'আ করা যেতে পারে- হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, তার মরণকষ্টকে আসান করে দিন, ইত্যাদি। কোনো অবস্থাতেই এসময় তার সামনেকোনো প্রকারের মন্দ কথা না বলা বা অন্যায়মন্তব্য না করা। হযরত উম্মে সালামা(রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

৮৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: তালকীন, খ. ২, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ৩১১৬
৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ৩১১৫
৮৫. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মারজা, অনুচ্ছেদ: মুশরিক রোগীর দেখাশুনা করা, খ. ২, পৃ. ১৬০৮, হাদীস নং- ৫৬৫৭

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَبَا سَلَمَةَ مَاتَ قَالَ فَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً– قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

অর্থ: তোমরা যখন কোনো রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকবে তখন তার বিষয়ে ভালো কথা বলো। কেননা তোমরা যা বলবে, তার ওপর ফিরিশতারা আমীন-আমীন বলবে। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, অত:পরআমার স্বামী আবু-সালামাহ মৃত্যু বরণ করলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে উপদেশ দিয়েবললেন, বলো- হে আল্লাহ আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে উত্তম জিনিসের স্থলাভিষিক্ত করুন। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, এই দু'আর বরকতে আল্লাহ আমাকে আবু-সালামাহ এর চেয়ে উত্তম স্বামী রাসূলুল্লাহ(সা.)-কে দান করেছিলেন।[৮৬]

অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ (হানাফী,শাফেঈ, হানবালী)-এর মতে মরণাপন্ন ব্যক্তির পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে– عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاقْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ يَعْنِى يٰس–

অর্থ: হযরত মাকাল ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের মৃতদের কাছে সূরাহ ইয়াসিন পাঠ করো।[৮৭]

**মৃত্যু হয়ে গেলে করণীয়**

* মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার দিকে ঘুরানো।
* মৃত ব্যক্তির চোখ খোলা থাকলেতার চোখ বন্ধ করে দেয়া।
* মুখ খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দেয়া,প্রয়োজনে কিছু দিয়ে বেধে দেয়া এবং হাত পা ঢিলা করে দেয়া।
* কাপড়দ্বারা তার পুরো শরীর ঢেকে দেয়া,তবে ইহরাম বাধা অবস্থায়মারা গেলে মাথা ও মুখ খোলা রাখতে হবে।
* মারা যাওয়ার পর দ্রুততম সময়ে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা, দেরি না করা।[৮৮] হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِفَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِوَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ–

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা জানাযার কার্য অতিশীঘ্রই সমাধা করো তথা দাফনের ব্যবস্থা করো। কেননা, যদি সে নেককার হয়েথাকে তাহলে তো ভালো, কারণ তাকে তোমরা কল্যাণের দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছো। আর যদি সে বদকার হয়তাহলে আপদকে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে নিচ্ছ।[৮৯]

* মৃত্যুর খবর প্রচার করা, তবে জাহেলী যুগের মতো দরজায়দরজায়আঘাত করে, চিৎকার করে, উঁচু জায়গায়দাঁড়িয়েহায়-হুতাশ করে মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা যাবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) এমটি করা নিষেধ করেছেন।
* যে স্থানে বা এলাকায়মৃত্যু হয়েছে সেখানেই লাশ দাফন করা, অন্য স্থানে নিয়েযাওয়া দ্রুত দাফন কাফনের আদেশের বিপরীত।

* মৃত ব্যক্তির বকেয়া ঋণ অতিস্বত্বর শোধ করা। যদি উক্ত ব্যক্তির নিজের মাল না থাকে তাহলে ওয়ারিসীনরা সাধ্যনুযায়ী শোধ করবে। যদি তাদের সামর্থ্য না থাকে তবে রাষ্ট্রীয়ত্রাণ তহবিল থেকে শোধ করা হবে। যদি সেটাও সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিমদের বিশেষ ফান্ড থেকে শোধ হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে পাওনাদারকে বুঝিয়ে তার কাছ থেকে মাফ করে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

---

৮৬. *জামি আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কাফন-দাফন, অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালিমা শোনানো এবং তার জন্য দুআ করা, খ. ১, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং- ৯৭৭

৮৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে যে দুআ পড়া হবে, খ. ২, পৃ. ১৯৫, হাদীস নং- ১৪৪৮

৮৮. মো: মুজীবুর রহমান আযাদ, *মাইয়েতের মাসায়িল*, ঢাকা: ফকিরাপুল, দারুল ইবতিকার, মে ২০০২, পৃ. ২৩, ২৭

৮৯. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: জানাযা নিয়ে তাড়াতাড়ি করা, পৃ. ৪৫৫,হাদীস নং- ১৯১১

**আত্নীয়-স্বজনদের জন্য যা বৈধ**

* আত্নীয়-স্বজন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য মাইয়্যিতের চেহারা খুলে দেখা এবং কপালে চুম্বন করা বৈধ(অবশ্যই মাহরাম গাইরে মাহরাম মেনে)। হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর তার কপালে চুম্বন করেছিলেন। তবে চেহারা দেখানোর যে রুসুম প্রচলিত রয়েছে, সে হিসেবে মাইয়্যিতের মুখ দেখানোতে শরীয়তের অনেক বিধান লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং শরীয়ত বিরোধী কোনো রুসুম বা প্রথা চালু থাকলে, সে রুসুম অনুযায়ী মাইয়্যিতের মুখ না দেখানোই উত্তম।প্রয়োজনে না দেখানোর ওসিয়্যত করা মাইয়্যিতের ওপর জরুরী হবে।

* মাইয়্যিতের জন্য চাপা কান্না করা এবং তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করা বৈধ, এর বেশি শোক পালন জায়েয নেই। তবে স্ত্রী তার মৃত স্বামীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।

* মৃত্যুকে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর ও বিধান মেনে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করা এবং মৃত্যুও সংবাদ শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ– বলা ওয়াজিব। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা, উচ্চস্বরে কান্না করা,গাল নোচা, কাপড় ছেড়া, চুল ছেড়া, বুকে থাপড়ানো, ইনিয়ে বিনিয়ে রোদন করা, মাইয়্যিতের অতিরিক্ত প্রশংসা করা ও আমার সাত রাজার ধন ইত্যাদি বলে হা হুতাশ করা, তাকদীরকে গালি দিয়ে আল্লাহর প্রতি অবিচারের অভিযোগ করে কান্না করা, শরীরে ও মাথায় মাটি মাখা, কপাল ঠোকা ইত্যাদি হারাম। এগুলো জাহেলী কু-প্রথা। শোকে ভেঙ্গে মাথা নেড়া করা, শোক পালন হিসেবে মহিলাদের মাথার চুল না বাধা। শোকে বিমর্ষ হয়ে কয়েক দিনের জন্য দাড়ি লম্বা করা যদিও এর পূর্বে দাড়ি ছেটে রাখতো। শোক পালনের জন্য কালো পোশাক পড়া বা বিশেষ কোন রঙের পোষাক পড়া। মাইয়্যিতের রূহ বের হওয়ার সাথে সাথে জরুরী মনে করে কিছু সাদাকাহ করা, যে স্থানে মারা গেছে সেখানে কয়েকদিন আত্না ঘোরাফেরা করে এমন ধারণা পোষণ করা, সেই স্থানে ধুপ জ্বালানো বা কয়েকদিন পর মিলাদ দিয়ে সেই আত্না তাড়ানো, জান কবযের পর বাড়ির পানি ও রান্না করা খাবার ফেলে দেয়া, আয়না ঢেকে রাখা, ঋতুবতী মাহরাম মহিলাদের মাইয়্যিতরে পাশে ঘেঁষতে না দেয়া, দেখতে না দেয়া, স্পর্শ করতে না দেয়া, গোসল দিতে না দেয়া, ইত্যাদি বিষয় শরীয়ত কর্তৃক কোনো অনুমোদন নেই। এ সবই মানুষের নিজস্ব মনগড়া ও বানানো। হাঁ, মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াবের আশায় কুরআন পড়া ও খত দেয়া বৈধ। সেটা আত্নীয়-স্বজন, সন্তান-সন্তুতি সবাই করতে পারে এবং এমন কেউ না থাকলে হাফিয এনেও পড়ানো ও কুরআন খতম জায়েয হবে। কিন্তু টাকা বা অন্যকিছুর বিনিময়ে চুক্তিভিত্তিক হাফিয এনে কুরআন খতম বৈধ নয়, নিজেরা খুশি হয়েহাদিয়া দিলে ভিন্ন কথা। ইসালে সওয়াবের আশায় মৃত ব্যক্তির জন্য কালিমা পড়াও বৈধ তবে নির্দিষ্ট সংখ্যা ঠিক করে তার ফযিলত নির্ধারণ করা বিদআত এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ৭ দিন বা ৪০ দিন বা বার্ষিকী দিন নির্ধারণ করে কুলখানি করাও বৈধ নয়।[৯০]

তবে পবিত্র কুরআনও হাদীসে মৃত মা-বাবা, আত্নীয়-স্বজন এবং মু'মিনদের মাগফিরাত ও রহমতের জন্যবেশি বেশি দু'আ করার অনেক নির্দেশনা রয়েছে। মা-বাবার জন্য কিভাবে দু'আ করতে হবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে–رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا

অর্থ: হে আমার রব! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশব কালে লালন-পালনকরেছেন।[৯১]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَ لِوٰلِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ: হে আমাদের পালকর্তা! রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন।[৯২]

তাই মুমিনের উচিত, দু:খ-কষ্ট, রোগ-শোকও কারো ইন্তিকালের সময় অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় খুশি থাকা এবং ধৈর্যশীলদের জন্য তিনি যে পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন তা প্রাপ্তির আশা রাখা।

---

৯০. *সুনান ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: বিলাপ করা নিষিদ্ধ, মুখমণ্ডল আঘাত করা এবং বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা নিষিদ্ধ, খ. ২, পৃ. ২১০-২১৩, হাদীস নং- ১৫৮০ থেকে ১৫৮৭; *ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-২৭২

৯১. আল-কুরআন, ১৭: ২৪

৯২. আল-কুরআন, ১৪: ৪১

# চতুর্দশ অধ্যায়

## গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা

## গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

চিকিৎসার আধুনিকায়ন বিংশ শতাব্দীতে হলেও এ পর্যায়ে আসার পেছনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে নিয়ে মধ্যযুগ তথা পনেরো শতক পর্যন্ত মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ যে অত্যন্ত স্বার্থকভাবে এর বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যদিও পশ্চিমা আধুনিক চিকিৎসাবিদগণের সাথে বর্তমান মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ কম-বেশি অবদান রেখে চলছেন, তথাপি ইসলামী চিকিৎসা প্রথা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো মুসলিম উম্মাহ কুরআন-হাদীসের মূল্যবোধ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নে অনিহা ও অবহেলা।

পৃথিবীর সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানী মানব জাতিকে রোগমুক্ত একটি পৃথিবী উপহার দেয়ার যতোই নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, বাস্তবতা হলো রোগীর পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি হাসপাতাল ও ফার্মেসীতে ওষুধের জন্য সারাক্ষণ রোগীর ভীড় লেগেই থাকে। পাশাপাশি বর্তমানে এমন সব দূরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিচ্ছে যার নাম ডাক্তারগণও ইতিপূর্বে কোনো দিন শুনেনি। চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর সারাবিশ্বের প্রতিটি দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে এবং চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, উন্নত চিকিৎসার নামে আধুনিক যুগে যেসব ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তা মানুষকে সকল রোগ থেকে মুক্তি দিতে পুরোপুরি সক্ষম নয়। সুতরাং রোগমুক্ত পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত চিকিৎসা ব্যবস্থার যে কোনো বিকল্প নেই তা আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি। যার বাস্তব প্রতিফলন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম শুধু ইবাদত কেন্দ্রিক কোনো ধর্ম নয় বরং মানব সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে যতো প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে সেক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্দেশনা দিয়েছে। এমনিভাবে মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম মৌলিক চাহিদাচিকিৎসার ক্ষেত্রেও নানা ধরনের রূপরেখা প্রদান করেছে। হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কীয় এ গবেষণকর্মের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বোঝা যায়- রোগ বলতে শুধু শারীরিক অসুস্থতা নয়, বরং আমাদের মনও অসুস্থ হয়ে থাকে। আর এ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যমত স্বর্গীয় মাধ্যম হিসেবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেসকল পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা এক অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। এরই আলোকে আমার গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

* বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে এককভাবে শুধু অমুসলিমদের অবদান নয় বরং মধ্যযুগের মুসলমানদেরও অনেক অবদান রয়েছে, যা তাঁরা পবিত্র-কুরআন-হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা এবং তথ্যাদি প্রদান করেছেন।

* পবিত্র কুরআনকে শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ মনে করা হলেও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এটিকে একটি অনন্য শিফা গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যা অসংখ্য রোগমুক্তির সনদ।

* রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু ধর্ম প্রচারক ছিলেন না, তিনি ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি তাঁর সাহাবীগণকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন, নিজে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অন্যদেরকে চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করেছেন, চিকিৎসক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক দিয়েছেন এবং হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন।

* রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, যা প্রাকৃতিক, নিরাপদ, স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্য।

* হাদীসে বর্ণিত দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যে সুস্থ থাকার অনন্য ব্যবস্থাপত্র, তা বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রমাণিত।

* সুস্থতা লাভের জন্য শুধু ঔষধ নির্ভর চিকিৎসা নয়, পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ঘুম এবং নবী কারীম (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত মানবিক আচার-আচরণের চর্চাও নিরোগ জীবন লাভের অন্যতম উপায়।

* হাদীসে নির্দেশিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের নিয়মাবলী যথাযথ অনুসরণ সুস্থ এবং নিরাময় জীবন লাভের উত্তম ব্যবস্থাপত্র, যা বর্তমানে পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞানীগণও বলে থাকেন।

* ঔষধ সেবনের পাশাপশি পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আ এবং আমলও অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ লাভের অনন্য মাধ্যম।

*রোগ নিরাময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পদার্থ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা আধুনিক যুগেও সমভাবে গ্রহণযোগ্য।

* বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় শারীরিক অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যবিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা এবং ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও মানসিক অসুখ তথা অবসাদ, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো স্থায়ী চিকিৎসা নেই বললেই চলে। কিন্তু তিব্বে নববী পদ্ধতিতে এসকল মানসিক রোগেরও চিকিৎসা রয়েছে।

* রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগের দর্শন হলো মু'মিনের জীবনে রোগ একটি কষ্টি পাথর, যা গোনাহের কাফ্ফারা, রহমত এবং জান্নাত লাভের ওছিলা।

* মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে অযু, সালাত, সিয়াম, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, যিকর ইত্যাদি কেবল ইবাদত নয় বরং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভেরও অন্যতম মাধ্যম।

* সর্বোপরি হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য হলো- রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই শ্রেয়।

# সুপারিশমালা

**"হাদীস-শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা"** অভিসন্দর্ভে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পর্কীয় নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহ উল্লেখ করে সাধ্যমত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও গবেষণার কার্যপরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে বিধায় সবকিছু এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সে বিষয়গুলোও আলোচনা ও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমি নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা পেশ করছি, যা বাস্তাবায়ন করলে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

**০১.** ও.আই.সি.-এর মাধ্যমে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও দক্ষ চিকিৎসকের সমন্বয়ে এটি উচ্চতর গবেষণা টীম গঠন করা।

**০২.** বর্তমান ও আধুনিক চিকিৎসার সাথে হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক পর্যালোচনা করে আন্তর্জাতিক মানের একটি চিকিৎসা ব্যবস্থার অবকাঠামো দাঁড় করানো।

**০৩.** কুরআন-হাদীসের আলোকে চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করা এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার হলে তা পর্যায়ক্রমে এতে সংযোজন হবে।

**০৪.** হাদীসে বর্ণিত রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল বিষয় অধ্যায় ও অনুচ্ছেদভিত্তিক বিস্তারিত উল্লেখ করে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।

**০৫.** মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রাথমিকভাবে কোনো একটি এলাকায় পরীক্ষামূলক একটি পৃথক হাসপাতাল তৈরি করে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত পরামর্শ ও নির্দেশাবলীর আলোকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

**০৬.** তিব্বে নববী তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতিকে মডেল ধরে বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করে বিশ্বের দরবারে একটি স্বীকৃত ও প্রমাণিত চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

**০৭.** হাদীসে বর্ণিত যেসকল পদার্থ সরাসরি চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করত চূড়ান্ত ফলাফল ও সেবন বিধি নির্ধারণ করা। যেমন: মধু- কোন রোগের জন্য বয়সভিত্তিক কতটুকু, কিভাবে, কখন এবং কতদিন সেবন বা ব্যবহার করতে হবে তা আমাদের জানা নেই। এমনিভাবে কালিজিরা, খেজুর, ত্বীন, যাইতুন, লবণ, সোনামুখী,শিবরম, ঘৃতকুমারী, বিহিদানা, কুসত বা উদে হিন্দ, মাশরূম, যব,মেহেদী পাতার ইত্যাদি।

**০৮.** চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলমানের মধ্যে ইসলাম বহির্ভূত যেসব ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার রয়েছে কুরআন ও হাদীসের আলোকে অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে এর সঠিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করে তা নিরসণ করা।

**০৯.** সকল মানুষের মধ্যে তিব্বে নববীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীসেবর্ণিত চিকিৎসা বিষয়কপরামর্শ, নির্দেশনা, উপকারিতা এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরা।

**১০.** মুসলমানদের মধ্যে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আ ও আমলী চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরে তা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করা। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া বা ওষুধ গ্রহণ করা যদিও সুন্নাত তবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া শুধু ডাক্তার বা ওষুধের মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

**১১.** কুরআন-হাদীসে যেসব মানবিক আচার-আচরণের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত সুস্থতার রক্ষাকবচ। তাই মুসলিম উম্মাহর মাঝে সেসকল অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কাজ করা।

**১২.** ইসলামে বর্ণিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি মানব জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও সুস্থ রাখার মূল চাবিকাঠি হওয়ায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর সুফল তুলে ধরে তৃণমূল থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যাপক আকারে সেমিনার, আলোচনা সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করা।

**১৩.** বর্তমান পৃথিবীর সবকিছু মিডিয়াভিত্তিক হওয়ায় হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণামূলক তাত্ত্বিক দিকগুলো মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য স্বীকৃত মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া।

**১৪.** তিব্বে নববীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৃজনশীল পরিচালকের মাধ্যমে গঠনমূলক ও শিক্ষণীয় চলচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, বিলবোর্ড, ব্যানার তৈরি ও বিজ্ঞাপন প্রদান করা এবং ওয়েবসাইট, টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতার কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেয়া।

**১৫.** প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ঔষধপত্র ও এর আনুষঙ্গিক খরচ অনেক ব্যয়বহুল, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত চিকিৎসা ব্যবস্থা স্বল্পমূল্য এবং সহজলভ্য হওয়ায় বাংলাদেশের সকল শ্রেণির মানুষের উপকারার্থে তা চালু করার ব্যবস্থা নেয়া।

**১৬.** প্রতিটি রাষ্ট্র চিকিৎসা খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে থাকে। সুতরাং আমার উক্ত গবেষণা কর্মে হাদীস শাস্ত্রের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে যা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা মানব জীবনে প্রতিফলনের নিমিত্ত সরকারি উদ্যোগে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা নেয়া।

**১৭.** আমার গবেষণা কর্মটির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারিভাবে আরবী ও ইংরেজি ভাষাসহ বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ তা অধ্যয়নপূর্বক পবিত্র কুরআন ও হাদীস কেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় আগ্রহী হবে এবং রোগমুক্ত ও হাসি-খুশি পৃথিবী বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

# উপসংহার

প্রতিটি মানবসন্তান পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর আক্রমণ, খাদ্যাভ্যাস ও আচরণগত অনিয়মের কারণে নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আর মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারে ইসলামের ধারণা হলো মানুষ নিজেই একটি আমানত। সুতরাং নিজের হিফাযতের লক্ষে শারীরিক সুস্থতা বহাল রাখার জন্য সাধ্যমতো প্রচেষ্টা করা যেমন তার ওপর শরঈ দায়িত্ব, তেমনি ইচ্ছেমতো শরীরের কোনো ক্ষতি বা পরিবর্তন সাধন করার অনুমতিও তাকে দেয়া হয়নি। তাই ইসলামী অনুশাসনে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও গবেষণা মানব জীবনের অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যকলাপের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, যা ক্ষেত্রবিশেষে কখনো ওয়াজিব (অবশ্যকরণীয়), সুন্নাহ, মুবাহ (অনুমোদিত/আইনানুগ), মাকরূহ (অপছন্দনীয়) অথবা হারাম (নিষিদ্ধ) হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। মানব দেহের স্রষ্টাও হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আর সাধারণ নিয়ম হলো, যে কোনো সৃষ্টির উপকরণ সর্ম্পকে তার স্রষ্টাই সর্বাধিক জ্ঞাত। সে দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ রাসূল এবং তাঁর ওপর ওহী তথা নির্ভুল জ্ঞান অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং মানব দেহ সুস্থ রাখা এবং কোনো কারণে অসুস্থ হলে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর দেয়া নীতিমালাই যে চূড়ান্ত এবং একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল তা নি:সন্দেহে বলা যায়। কেননা মানব সৃষ্টির সূচনা হতে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত সকল জ্ঞানই তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আর তাই সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ যাবৎ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ যেসব স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন করেছেন এর কোনোটাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেয়া স্বাস্থ্য বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কিত তাঁর প্রতিটি বাক্য ও পরামর্শই একটি অতুলনীয় রত্নভান্ডার।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ সাধনে প্রেরিত হওয়ায় রূহানী চিকিৎসার পাশাপাশি রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে উম্মাতের দৈহিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অসংখ্য তথ্যভিত্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর এসব প্রজ্ঞাময় তথ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির অধুনা এ যুগেও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নির্ভুল ও কার্যকরী ব্যবস্থাপত্র হিসেবে স্বীকৃত, যা পর্যায়ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহর দেয়া অক্সিজেন ও আলো-বাতাস যেমন সব মানুষের কল্যাণ ও জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য, তেমনি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নবী কারীম (সা.)-এর দিকনির্দেশনাও পুরোবিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণকর ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি শুধু রোগ নিরাময়ের উপায় নিশ্চিত করে না বরং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যাচাইয়ে অনুপ্রাণিত করে এবং Prevention is better than cure তথা রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা শ্রেয়, এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। আর এজন্যই স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের প্রতি ইসলাম এতো গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি ইসলামী চিকিৎসা পদ্ধতি কখনই স্বীকার করে না যে শুধু ঔষধই রোগ সারাতে সক্ষম, বরং কোনো রোগই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং নির্দেশ ব্যতীত নিরাময় হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মতকে সুস্বাস্থ্য লাভ ও রোগমুক্ত থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সর্বদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার বিভিন্ন দু'আ ও আমলের শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং

ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, একজন অসুস্থ ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা তথা আল্লাহর অনুগ্রহ, মানসিক প্রশান্তি এবং বিভিন্ন উপাদান বা ঔষধ, এ সকল সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করে থাকে। এজন্য রাসূলুল্লাহ(সা.)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে ধারণা, অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলাফল। অপরদিকে নবী কারীম (সা.)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থা নির্ভর করে ওহীভিত্তিক এলেমের নিশ্চয়তা, বুদ্ধির পূর্ণতা ও জ্ঞানের উৎকর্ষতার ওপর। তাই তদানীন্তন আরব সমাজে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলতে তেমন কিছু না থাকলেও রোগ-ব্যাধি ঠিকই ছিল এবং নবী কারীম (সা.)-এর আগমন যদিও ডাক্তার বা ফার্মাসিস্ট হিসেবে ছিলো না তথাপি তিনি রোগ নিরাময়ে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন কিছু ঐশী ব্যবস্থাপত্র সংবলিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছেন যাতে অসুস্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতো।

অধিকাংশ মানুষ মনে করে একবিংশ শতাব্দীতে এসে চিকিৎসা পদ্ধতির অবস্থান সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, এটি একটি ভুল ধারণা। বাস্তব সত্য হলো, বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ সংযোজন হলেও সারাবিশ্বে অসংখ্য ল্যাবরেটরি ও লক্ষ লক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানী মিলে এখনো অনেক রোগের ঔষধ আবিষ্কার করতে এবং রোগমুক্ত পৃথিবী উপহার দিতে সক্ষম হয়নি। অথচ তিব্বুন নববীর ভাষ্য হলো- প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে। সুতরাং আমার বিশ্বাস  রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই স্বর্গীয় বাণী ও হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সামনে রেখে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ওস্কলারগণ নিগূঢ় গবেষণা করলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অজানা অনেক রোগের অনাবিষ্কৃত ওষুধ স্বল্প খরচে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। হতে পারে তা নির্ধারিত কোনো আমল ও দু'আ, মানবিক আচার-আচরণের চর্চা বা হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রিত ঔষধ।

অতএব জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও রোগমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি তিব্বুন নববী তথা নবী কারীম (সা.)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তি করা বর্তমান সময়ের দাবি, যা চিকিৎসা সেবার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এ মহান কাজটি যে দেশ বা জাতিই আঞ্জাম দেবে তা সকলের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হাদীস শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল নির্দেশনার ওপর আমল করে সুস্থ ও সুন্দর জীবন লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

# গ্রন্থপঞ্জি

## (ক) আল-কুরআন ও তাফসীর বিষয়ক


**আল-কুরআন**

আল-আলুসী, আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবন আবদুল্লাহ : *রূহুল মা'আনী*, লেবাননঃ বৈরুত, ইহয়াউ আত-তুরাস-আল-আরাবি, তা.বি.

আল কুরতুবী, আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর :*তাফসীরে কুরতুবী* লেবাননঃ বৈরুত, আল-রেসালাহ পাবলিশার্স, ২০০৬

আল জাসসাস, আবু বকর : *আহ্কামুল কুরআন*, লেবাননঃ বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইসলামিয়া, ১৯৯৪

আল-রাগীব ইস্পাহানী, আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মদ : *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পাকিস্তানঃ করাচী, নূর মোহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি.

ইবন কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, অনুবাদঃ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক, ঢাকাঃ ইফা. মার্চ ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

তাকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, অনুবাদঃ মুফতী সাইফুল ইসলাম ঢাকাঃ বাংলাবাজার, মাকতাবাতুল আশরাফ, এপ্রিল ২০১০

শাফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ দশম সংস্করণ, মার্চ ২০১২

” : *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*-সংক্ষিপ্ত, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান,বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ-এর নির্দেশ পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিতঃ ১৪১৩ হিজরি


## (খ) আল-হাদীস


আ'জমী, নূর মোহাম্মদ : *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিমিটেড, মার্চ ২০০৮, (পুনর্মুদ্রণ)

আত-তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা : *জামি আত-তিরমিযী*, পাকিস্তানঃ করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৯

আত-তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা : *শামায়েলে তিরমিযী*, অনুবাদঃ শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী, ঢাকাঃ উত্তরা, ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪

আদ-দারিমী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান :*সুনান আদ-দারিমী*, লেবাননঃ বৈরুত, মুআসসাসাত আর-রিসালাহ, ২০০৯

আন-নববী, আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারাফ : *শরহুল মুসলিম*, মিশর: কায়রো, আল-মাতবা'আতুল মিশরিয়্যাতু আল-আযহার, ১৯৩০ (প্রথম প্রকাশ

" : *আন-নাওয়াবীর চল্লিশ হাদীস*, অনুবাদ: নিযামুদ্দিন মোল্লা, IslamHouse, com তা. বি.

" : *শরহুল মুসলিম*, মিশর: কায়রো, আল-মাতবা'আতুল মিশরিয়্যাতু আল-আযহার, ১৯৩০ (প্রথম প্রকাশ

" : *রিয়াদুস সালেহীন*, ঢাকা: বাংলাবাজার, খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮

আন-নাসায়ী, আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব : *সুনানু নাসায়ী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৯

আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ : *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০১২ (১৫তম প্রকাশ)

আবদুল কাদির আওদাহ : *আত-আশরীউল জানায়িল ইসলামী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কাতিব আল-গাযালী, তা.বি.

আবু আওয়ানা ই'য়াকুব ইবন ইসহাক. আল্লামা : *মুসনাদ আবী আওয়ানা*, লেবানন: বৈরুত, দার আল-মা'রিফাহ, ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ)

আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী : *আল-মুসতাদরাকু আলাস-সহীহাইন*, মিশর, কায়রো, দারুল হারামাইন, ১৯৯৭ (প্রথম প্রকাশ)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযওয়াইনী : *সুনান ইবন মাজাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৯৬

আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী : *সুনান আবু দাউদ*, পাকিস্তান: লাহোর, মাকতাবায়ে রাহমানিয়াহ: ২০০৪

আমীন আস-সাহীর ইবন আবেদীন, মুহাম্মদ : *রাদ্দুল মুহতার*,সৌদি আরব: রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩

আমীমুল ইহসান, মুফতী সাইয়িদ : *মীযানুল আখ্বার*, অনুবাদ: আফলাতুন কায়ছার, ঢাকা: নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭

আমীর আলী, সায়্যিদ আত্-তাহ্হান, ড. মুহাম্মদ

আল-খাত্তাবী, আবু সুলায়মান হাম্মাদ ইবন মুহাম্মদ : *মা'আলিমুস সুনান*, লেবানন: বৈরুত, মাতবা'আতু আনসারিস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া, ১৯৪৮

আল-বায়হাকী, আবু বকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন ইবন আলী : *আস-সুনানুল কুবরা*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ (তৃতীয় প্রকাশ)

" : *আল-মুহাযযিব ফী ইখতাছারিস সুনানিল কাবীর*, সৌদি আরব: রিয়াদ, দারুল ওয়াতন লিন-নাসর, ২০০১ (প্রথম প্রকাশ)

আল বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম : *আল-জামি আস-সহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী*, (সংক্ষিপ্ত-*সহীহ আল-বুখারী)*, পাকিস্তান: করাচি, আলতাফ এণ্ড সন্স, ২০০৮

আল বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম : *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুবাদ: আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪ (পঞ্চম মুদ্রণ)

আল-মানাবী, আল্লামা আবদুর রাউফ : *ফায়জুল কাদীর*,লেবানন, বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৭২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

আল-মুনযিরী, হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আবদুল আযীম বিন আবদুল কাওয়ী : *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, মিশর: কায়রো, দারুল ফাজর লিত-তুরাস, ১৪২১ হিজরী (প্রথম প্রকাশ)

আলী ইবন সুলতান মুহাম্মদ আল-কারী, আল্লামা : *মিরকাতুল মাফাতীহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০১ (প্রথমপ্রকাশ)

আস-সুয়ূতী, আবদুর রহমান ইবন আবী বকর : *তাদরীবুর-রাবী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৮

ইবন আস-সালাহ : *উসমান ইবন আবদুর রহমান মুকাদ্দামা*, পাকিস্তান: ফারুকী কুতুবখানা, ১৩৫৭হি. (৪র্থ প্রকাশ)

ইবন কাসীর, আল্লামা ইসমাঈল ইবন উমর : *জামিউল মুসনাদ ওয়াস্ সুনান*, লেবানন, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪

ইবন কায়্যিম, হাফিয : *যাদুল মাআদ*, লেবাবনন: বৈরুত: মাকতাবাতু আল-মানারুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪

ইবন কুদামা, মুহাম্মদ : *আল-মুগনী*, সৌদি আরব, রিয়াদ, দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৯৭ (তৃতীয় প্রকাশ)

ইবন হাজার আসকালানী, আল্লামা আহমাদ ইবন আলী : *ফাতহুল বারী*, সৌদি আরব: রিয়াদ, সৌদি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২০০১ (প্রথম প্রকাশ), খ. ১০, পৃ. ৪৮৬

” : *নুযহাতুন নাযর শারহু নুখবাতিল ফিকর*, সিরিয়া, দামেশক, মুআস্সাসাহ ওয়া মাকতাবাতুল খাফিকাইন, ১৯৮০

” : *ফাতহুল বারী*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ, তা.বি.

” :*ফাতহুল বারী*, মিশর: কায়রো, দারুল আদইয়ান লিল তুরাস, ১৯৮৮ (তৃতীয় সংস্করণ)

” : *নুখবাতুল ফিকর*,মিশর: কায়রো, মাকতাবুল আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৪

ইবন হাম্বল, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ : *মুসনাদে আহমাদ* ,মিশর: কায়রো, দারুল হাদীস, ১৯৯৫ (প্রথম প্রকাশ)

ইয়াহ্ইয়া, আবুল ফাতাহ মুহা. : *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*, ঢাকা: মধ্যবাড্ডা, মাকতাবাতুল আযহার, আগস্ট ২০১২ (তৃতীয় প্রকাশ)

উমার ইবন হাসান ফালাতা, ড. : *আল ওয়াযউ ফিল হাদীস*,সিরিয়া: দামেশক, মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১

উসমানী, আল্লামা জাফর আহমাদ : *ই'লাউস সুনান*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

কামরুল হাসান, মাওলানা মোহাম্মদ : *আহ্কামুল হাদীস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, আগষ্ট-২০১৯ (৭ম মুদ্রণ)

খলীল আহমাদ, আল্লামা সাহারানপুরী : *বযলুল মাজহুদ*, লেবাবন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যহ, তা. বি.

থানভী, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী : *এমদাদুল ফাতওয়া*, পাকিস্তান, করাচি, মাকতাবাতু দারুল উলুম,জুলাই ২০১০

দেহলভী, আল্লামা আবদুল হক : *আল মুকাদ্দামাতু লি-মিশকাতিল মাসাবীহ*, ইন্ডিয়াঃ দিল্লী, রাশীদিয়া কুতুবখানা, তা.বি.

বাসয়ূনী যাগলুল, আবু হাজর মুহাম্মদ সাঈদ ইবন মুহাম্মদ ইবন : *মাওসূ'আত আতরাফিল হাদীসিন নাববীশ শরীফ*, লেবাবনঃ বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

মাদানী, আল্লামা মুহাম্মদ : *হাদীসে কুদসী*, অনুবাদঃ মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৫ (একাদশ মুদ্রণ)

মালিক ইবন আনাস : *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, পাকিস্তানঃ করাচি, মাকতাবাতুল বুশরাঃ ২০১১

মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, আবুল হুসায়ন : *আস-সহীহ লিল মুসলিম*, পাকিস্তানঃ করাচি, বুশরা পাবলিশার্সঃ ২০০৯

মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, আবুল হুসায়ন : *মুসলিম শরীফ*, সম্পাদনা ও অনূবাদ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০১০, (চতুর্থ সংস্করণ)

মুহাম্মদ ইবন আসীর : *জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, লেবাননঃ বৈরুত, মাকতাবাতু দারুল বায়ান, ১৯৭০

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান. আল্লামা : *শরহু সিয়ারুল কাবীর*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি. খ.

মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা : *হাদীসে-রাসূল (সা.)*, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৪৩২ হি.

মোরশেদ আলম সালেহী, ড. মাওলানা মোঃ : *হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৮ (প্রথম প্রকাশ)

যাগলুল ইবয়ানী, মুহাম্মদ ইবন আলী : *আল-মাওসূ'আতুল কুবরা*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০২১

সম্পাদনা পরিষদ : *তাজরীদুস সিহাহ*,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০04 (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পাদনা পরিষদ : *হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*, ঢাকাঃ মালিবাগ, প্রকাশনা বিভাগ জামিয়া শারইয়্যাহ, ডিসেম্বর ১৯৯৫

## (গ) আল-ফিক্‌হ বিষয়ক


আদ-দাররিয়্যি, ড. কাহতান আবদুর রহমান : *হুকমুল ইজহাদে ফিল ফিকহিল ইসলামিয়্যি*, লেবাবনঃ বৈরুত, বুকস পাবলিশার্স, ২০১৮

আদবী, আল-মুস্তফা : *জামিউ আহ্‌কামিন নিসা*, মিশরঃ কায়রো, দারু ইবন আফ্‌ফান, ১৯৯৯

আযাদ, মোঃ মুজীবুর রহমান : *মাইয়েতের মাসায়িল*, ঢাকাঃ ফকিরাপুল, দারুল ইবতিকার, মে ২০০২

আবদুর রহীম, মুফতী সায়্যেদ : *ফাতওয়ায়ে রহিমিয়া*, পাকিস্তান, করাচি, দারুল ইশা'আত, ২০০৩

আবদুল হাই, ডা. মোঃ : *আহকামে মাইয়্যেত*, অনুবাদ:মুফতী মুহাম্মদ অলি উল্লাহ, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, মুদ্দাসিরা প্রকাশনীঃ জুলাই ২০১৭

আবী ত্বহান, আল্লামা ফখরুদ্দীন : *ফাতওয়ায়ে কাযীখান*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মাহমুদ : *আল-বাহরুর রায়েক*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

আয-যুবাইদী, আল্লামা মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-হুসাইনী : *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন*, লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭১

আল-আনসারী, মুহাম্মদ ওলী ইবনুল মুনযির : *ইরশাদুল মুসতারশিদ*, মাকতাবাতুল আবীকান, ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ)

আল-কারলানী, ইমাম জালাল উদ্দিন ইবন শামসুদ্দিন : *আল-কিফায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

আল-কুরায়শী, আহমাদ ইবন দিয়া : *আদ-দিয়াউল মা'নাবী*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

আল-জুহেলি, ড. ওয়াহবাহ মোস্তফা : *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, সিরিয়াঃ দামেশক, দারুল ফিকর, ১৯৮৫ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

আল-জুযাইরী, আল্লামা আবদুর রহমান : *আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল 'ধারবা'আ*, লেবাননঃ বৈরুত, দারুল আরকাম, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

আল-বানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন : *আল-মাসায়িলুল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ফাতওয়াল শারঈয়্যাহ*, সৌদি আরব, মদীনা, দারুদ দিয়া, ২০০৬ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

আল-বালীছানী, ড. আহমাদ মুহাম্মদ : *আল-কাওয়াইদুল ইলমিয়্যাহ*, লেবাননঃ বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

আল-মাহদী, আবু ঈসা সাইদী মুহাম্মদ : *আন-নাওয়াযিলুস সুগরা*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবন মাসঊদ, আল্লামা : *বাদায়িউস সানা'য়ী*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

আলী ইবন সুলতান মুহাম্মদ, আল্লামা : *মিরকাতুল মাসাবীহ*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০১ (প্রথম প্রকাশ)

আস-সানাআ'নী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল : *সুবুলুস সালাম*, লেবাবনঃ বৈরুত, দারুল আরকাম, তা. বি.

আস-সারাখসী, আল্লামা শামসুদ্দীন : *কিতাবুল মাবসূত*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তা. বি.

আস-সালেহ, ড. মুহাম্মদ আদীব : *মাসাদিরুত তাশরী'ইল ইসলামী*, সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল আবীকান, ২০০২ (প্রথম প্রকাশ)

আস-সুয়ূতী, আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আবু বকর : *আল-আশবাহু ওয়ান নাযাইরু*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

ইবন আবদুর রহমান, আল্লামা শামসুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মদ : *ফাতহুল মুগীস*, সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, ১৪২৬ হি.

ইবন রুশদ, আহমাদ : *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, লেবানন: বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৯৮৭ (প্রথম প্রকাশ)

উসমান ইবন আলী, ইমাম ফখরুদ্দীন : *তাবঈনুল হাকাইক*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

উসমানী, মুফতি আযীযুর রহমান : *ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ*, পাকিস্তান, করাচি, দারুল ইশা'আত, সেপ্টেম্বও ২০০২

ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় : *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত: ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ)

গাণী ইবন ইসমাঈল, আব্দুল : *আত-ত্বারীকাতুন নাদিয়্যাহ*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

গাংগুহী, মুফতি মাহমুদ হাসান : *ফাতওয়ায়ে মাহমূদিয়া*, পাকিস্তান, করাচি, ইদারাহ আল-ফারুক, ২০০৮ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল : *আত-তাওযীহ*, মিশর: কায়রো, মাকতাবাতুল ইশা'আত, ১৩৬৬হি. (প্রথম প্রকাশ)

মুহাম্মদ ইবন মুফলিহ, আবু আবদুল্লাহ : *আল-আদাবুল শারঈয়্যাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬

মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান, আবু আব্দুল্লাহ : *মাওয়াহিবুল জালীল*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

যাহইলী, ড. ওয়াহবাতুয : *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, সিরিয়া: দামেস্ক, দারুল ফিকর, ১৯৮৬ (প্রথম প্রকাশ)

যায়নুল আবেদীন, মাওলানা : *গামাযু উয়ুনিল বাসায়ির*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ (প্রথম প্রকাশ)

রশীদ আহমাদ, মুফতী : *আহসানুল ফাতওয়া*, পাকিস্তান: করাচি, এইচ.এম. সাঈদ কোম্পানী, ১৪২৫ হি. (চতুর্থ প্রকাশ)

রাহমানী, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ : *জাদীদ ফিকহী মাসায়েল*, পাকিস্তান, করাচী, যমযম পাবলিশার্স, জুন ২০১০

শফী, আবু সাঈদ, এরশাদ খান, মুফতী : *ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আশরাফিয়া বুক হাউজ, মার্চ ২০১৬

সিদক্বী ইবন আহমাদ, ড. মুহাম্মদ : *মাওসুআতু আল-কাওয়া'ইদুল ফিকহিয়্যাহ*, লেবানন: বৈরুত, রেসালাহ পাবলিশার্স, ২০০৩ (প্রথম প্রকাশ)

হাসান ইবন আলী, আল্লামা : *হাসিয়াতুল ইসবাহ ‘ধালা নূরিল ইযাহ*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

হুমাম আশ-শায়েখ নিযাম, আল্লামা : *আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া*, লেবাননঃ বৈরুত, দারআল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০

## (ঘ) চিকিৎসা বিষয়ক

আন্ওয়ার শাহ্, মুফতি : *ইসলাম ও আধুনিক মেডিকেল মাসাইল*, ব্রাহ্মণবাড়িয়াঃ জামিয়া ফারুকিয়া ওয়ায়েজুল উলূম ইসলামাবাদ, সরাইল, মার্চ-২০১১খ্রি.

আবদুর রব খান, হাকীম : *ইউনানী মেটিরিয়া মেডিকা*, ঢাকা, কাঁঠালবাগান, গ্রীণরোড, বিসিরাম প্রকাশনীঃ ১৯৯৭

ইবনুল কায়্যিম, হাফিয : *আত-তিব্বুন নববী*, লেবাননঃ বৈরুত, দারুল কলম, তা.বি.

ইসহাক, মুফতী মুহাম্মদ : *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক*, ঢাকা:বাংলাবাজার, আল-আবরার প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৫

এ.কে.এম. আবদুর রহমান, ডা. দেওয়ান : *চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯২ (তৃতীয় সংস্করণ)

কামাল পাটোয়ারী, হাকীম এম.এ. : *রোগ ও উদ্ভিদতত্ত্ব*, গাজীপুরঃ স্টেশনরোড, ক্যামরুজ পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ১৯৯২ (প্রথম প্রকাশ)

খলীল বিন ইবরাহীম আমীন, ড. আবুল মুনযীর : *জ্বীন কেন্দ্রিক অসুস্থতার প্রতিকার*, অনুবাদঃ মুস্তফা আল মাহমুদ, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, দারুস সালাম বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০১৭

তাকী উসমানী, আল্লামা : *ইসলাম ও যুক্তির নিরিখে জন্ম নিয়ন্ত্রণ*, অনুবাদঃ মুফতী মোস্তাফিজুর রহমান কালাম, ঢাকাঃ তেজগাঁও, ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স, ২০০৯

দিলাওয়ার হোসাইন, মাওলানা মুফতী : *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা*, ঢাকাঃ সা'দ প্রকাশনী, মিরপুর, জুলাই ২০০৯

দেহলভী, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম : *তিব্বে রূহানী*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্ যামান, ঢাকাঃ বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, নভেম্বর ২০০০ (প্রথম প্রকাশ)

নযর আহমদ, প্রিন্সিপাল হাফেজ : *তিব্বে নববী*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্ যামান, ঢাকাঃ বায়তুল মুকাররম, হক লাইব্রেরী, মার্চ ২০০২ (চতুর্থ প্রকাশ)

মবিন খান, অধ্যাপক : *জন্ডিস ও লিভারের নানা রোগ*, ঢাকাঃ ধানমন্ডি, নভেম্বর ২০১৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

মুশাররফ হুসাইন, ডক্টর মুহাম্মদ : *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান*, ঢাকাঃ মতিঝিল,বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, অক্টোবর ২০১৩ (প্রথম প্রকাশ)

মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম, ডাঃ : *স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাবাজার, আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৭ (১ম সংস্করণ)

মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, ডা. : *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, আল- কাউসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯

” : *সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান*, অনুবাদ ও সম্পাদনা: খাদিজা আখতাররেজায়ী, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন: এপ্রিল ২০০৬

লুৎফর রহমান সরকার, মোহাম্মদ : *স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম*, (সম্পাদিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৩

শাহ এমরান, ড. মোঃ : *ওষুধ বিজ্ঞান*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০০৮৪-০০৮১-১

Laleh Bakhtiar : *Canon of Medicine*, New York, NY: AMS Press, Inc. ISBN 0-404-11231-5. (2nd ed.).

Lutz, Peter L. : *The Rise of Experimental Biology: An Illustrated History*. Humana Press.ISBN 0-89603-835-1

Margotta, Reberto : *The Story of Medicine*, New York: Golden Press, 1968

Nasser Mona, Tibi, Aida, Savage-Smith, Emilie : *Ibn Sina's Canon of Medicine: 11th century rulws for assessing the effects of drugs'* Journal of the Royal Society of Medicine, PMC, (2009).

U. Weisser : *Avicenna The influence of Avicenna on medical studies in the West*. Encyclopaedia Iranica. 2011

## (৬) জীবনী বিষয়ক

আজিজুল হক আনসারী, মাওলানা : *মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)*, ঢাকা: বাংলাবাজার, মীনা বুক হাউস, জানুয়ারী ২০১৯ (তৃতীয় মুদ্রণ)

আবদুল কাদের, ড. এম. : *মুসলিম কীর্তি*,ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১০ (তৃতীয় সংস্করণ)

আবদুল হাই, ডা. মোঃ : *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম সা.* অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: বাংলাবাজার, মদীনা পাবলিকেশান্স, সেপ্টেম্বর ২০০৮ (ষোলতম সংস্করণ)

আবদুস সুলতান, সৈয়দ : *ইবনে সীনা: সংক্ষিপ্ত জীবনী*, রাজশাহী: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৮১

আল-বাগদাদী, আবুল হুসাইন আবদুল বাকী ইবন মারযুক : *মু'জামুস সাহাবাহ*, লেবানন: বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৫

কান্ধলবী, মুহাম্মদ ইদরীস : *সীরাতে মুস্তফা সা.*, অনুবাদঃ আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, ঢাকা: বাংলাবাজার, ইসলামিয়া কুতুবখানাঃ তা.বি. ২০১৩

ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আল্লামা : *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী, ঢাকা: বারিধারা, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ শাখা, জুন২০০৩ (৯ম সংস্করণ)

নদভী, সোলায়মান, মাওলানা সৈয়দ : *সাহাবা চরিত*, অনুবাদঃ আখতার ফারূক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ (চতুর্থ মুদ্রণ)

নূরুল আমীন, মুহাম্মদ : *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী*, ঢাকা: নিউ এলিফ্যান্ট রোড, র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৩

মাইকেল এইচ. হার্ট : *দ্যা হানড্রেড*, অনুবাদ ও সম্পাদনা: অধ্যক্ষ এম, সোলাইমান কাসেমী, চট্টগ্রাম: আন্দরকিল্লা, মেমোরি পাবলিকেশন্স, জুন ২০১৩

Adams, Francis :*The Genuine Works of Hippocrates,* New York: William Wood and Company. 1891

Willim E. Gohlman :*THE LIFE OF IBN SINA,* Albany: New York PRESS: 1974

## (চ) অন্যান্য গ্রন্থ

আকবর আলী, এম. : *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, দি অনিক লাইব্রেরী, তা.বি.

আখতার-উজ-জামান : *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: বাংলাবাজার, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, জানুয়ারি ২০১০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

আজিজুল হক, শাইখুল হাদীস মাওলানা : *কোরআন হতে বিজ্ঞান*,ঢাকা: বাংলাবাজার, হাছানিয়া লাইব্রেরী, আগস্ট ১৯৯৯

আবদুল মওদুদ, বিচারপতি : *মুসলিম মনীষা*,ঢাকা: বাংলাবাজার, মাওলা ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৪ (তৃতীয় মুদ্রণ)

আবদুল হক ইবন আবদুর রহমান, আবু মুহাম্মদ : *কিতাবুত তাহজ্জুদ*, লেবাননঃ বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ)

আবু জাফর : *রাষ্ট্র দর্শনে মুসলিম মনীষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ১৯৭৯ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

আবু বকর আল কারাশী : *কিতাবুত তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল*, সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রাশীদ, ১৯৯৮ (প্রথম সংস্করণ)

আবুল কাসেম ভূঁইয়া, মু. : *যুগ-জিজ্ঞাসা ও পরিবার*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮

” : *ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাবাজার, বাংলাপ্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

আবুল হাসনাত মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ : *যিক্র ও দুআ*, ঢাকা: উত্তরা মডেল টাউন, কুরআন শিক্ষা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০১১ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী, হাফিজ : *আখলাকুন্ নবী (সা.)*, অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৬ (চতুর্থ সংস্করণ)

আয-যাহাবী, মুহাম্মদ ইবন আহমাদ শামসুদ্দীন : *তাযকিরাতুল হুফফায*, পাকিস্তান: লাহোর, ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮১ (প্রথম সংস্করণ)

আল-গাযযালী, আবু হামিদ মোহাম্মাদ ইবন মোহাম্মদ : *এহইয়াউ উলুমুদ্দীন*, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: বাংলাবাজার,মদীনা পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৩ (পঞ্চম সংস্করণ)

” : *সৌভাগ্যের পরশমনি*, অনুবাদ: আবদুল খালেক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১৫ (অষ্টম সংস্করণ)

” : *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, লেবানন: বৈরুত, দারুল মারিফাহ তা.বি.

” : *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, লেবানন, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

ইউসুফ, ড. মোহাম্মদ : *কুরআন হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায*, ঢাকা: ২০০৭ইং

এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম, এ.এম. হারুন অর রশীদ, আমিনুল ইসলাম, অজয় রায়, সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির,আবু জাফর মাহমুদ : *ফার্মাকোলজি*, *বিজ্ঞান বিশ্বকোষ*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, খ. ৩, পৃ. ৪৪৫। আইএসবিএন ৯৮৪-০৭- ৪১৯৬

এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদক) :“ঔ” *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩ খ্রি. আইএসবিএন ৯৮৪-০৭-৪২২২-১

এস.এম. আব্দুছ ছালাম, ড. : *সিয়াম ও রমযান*, (সংকলিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৭

কামরুল হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ : *ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম*,ঢাকা: মিরপুর, মিডিয়া দাওয়াতী সেন্টার, জানুয়ারী ২০১৭

গবেষণা বোর্ড :*Muslim Contribution to Science and Technology*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুলাই ২০১২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি : *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*,ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০১৫(তৃতীয় সংস্করণ)

তপন চক্রবর্তী : *চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাবাজার, অনুপম প্রকাশনী, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৭

তাকী উসমানী, মুফতী : *খাওয়ার আদব*, অনুবাদ: মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন বক্সী, ঢাকা: বাংলাবাজার,এদারায়ে কুরআন, তা.বি.

তৈয়্যব, মাওলানা কারী মোহাম্মদ ও হোসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা : *শরীয়ার আলোকে ও যুক্তির নিরিখে দাড়ি*,অনুবাদ: মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী, ঢাকা: বায়তুল মুকাররম, আজিজিয়া কুতুবখানা, মার্চ ১৯৯৬

থানভী, আশরাফ আলী : *মোনাজাতে মকবুল*, অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, তাবলীগী কুতুবখানা, মার্চ ২০০৪

দেহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ : *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-জিল, ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ)

নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী : *সিয়ামঃ গুরুত্ব ও তাৎপর্য*, অনুবাদঃ মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০১০

মরিস বুকাইলি, ডাঃ : *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, অনুবাদঃ ওসমানি গণি, ঢাকাঃ মগবাজার, প্রীতি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ)

মোঃ রফিকুল ইসলাম : *ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, পিস পাবলিকেশন, জুন ২০০৯

যাকারিয়া কান্ধলভী, মুহাম্মদ : *ফাযায়েলে সাদাকাত*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ্, ঢাকাঃ বাংলাবাজার ,দারুল কিতাবঃ সেপ্টেম্বর ২০০৩

সম্পাদনা পরিষদ : *সীরাত বিশ্বকোষ স.*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৮

” : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৬(দ্বিতীয় সংস্করণ)

” : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৯(অষ্টম সংস্করণ)

Axel Lange and Gerd B. Muller : *Polydactyly in Development, Inheritance and Evolution. The Quarterly Review of Biolog:*Mar 2017

D. M. Mahdi Gutas :*Avicenna, Encyclopedia Iranica.* London: Routledge and Kegan Paul, 1987. V-3.

K.L. Moore and A.M.A. Azzindani, :*The Developing Human with Islamic Additions*, Jeddah:Dur al-Qiblah for Islam Literatures.1982 3rd end.

Ronald Siegel : *Intoxication: The universal drive for mind-altering. Substances.* Vermont: Park Street Press. 2005. ISBN: 1-59477-069-7


## (ছ) অভিধান


ফজলুর রহমান. ড. মুহাম্মদ : *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনীঃ ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ)

সম্পাদনা পরিষদ : *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০২ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদনা পরিষদ : *বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশেনারী*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ২০০৫(২১তম পুনর্মুদ্রণ)

# (জ) পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল

| পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল | প্রকাশকাল |
|---|---|
| *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা-* ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩ |
| *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা-* ৫৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ |
| *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা-* ৫৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ |
| *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা-*৫৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১৮ |
| *ইসলামি-ফিকাহ-একাডেমি* | --- |
| *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সংখ্যা ৮-৯ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ ও জানুয়ারি-জুন ২০১৪ | জুন ২০১৪ |
| *দাওয়াতুল হক*, মাক্কাতুল মুকাররামাহঃ রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী- ৪র্থ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা | মার্চ ১৯৮৫ |
| *দৈনিক ইনকিলাব* | ১৬.০৪.২০২১ |
| *দৈনকি কালের কণ্ঠ* | ০৩.১১.২০১৭ |
| *দৈনিক কালের কণ্ঠ* | ১৮.০৬.২০২১ |
| *দৈনিক কালের কণ্ঠ* | ২৪.০৭.২০১১ |
| *দৈনিক কালের কণ্ঠ* | ২০.০৮.২০১৭ |
| *দৈনিক কালের কণ্ঠ* | ০৯.০১.২০১৭ |
| *দৈনিক প্রথম আলো* | ২১.০৬.২০২১ |
| *দৈনিক প্রথম আলো* | ২৭.০৮.২০১৯ |
| *দৈনিক প্রথম আলো* | ২৯.০৯.২০১৫ |
| *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন* | ০৪.০৫.২০১৮ |
| *দৈনিক যুগান্তর* | ১৪.০১.২০২১ |
| *মক্কা মুকাররমাহ্ ফিকাহ একাডেমি এর সিদ্ধান্তবলি, সংখ্যা-৩* | --- |
| *মেডিভয়েসঃ (সংখ্যা ৫ , বর্ষ ২)* | জুন-জুলাই ২০১৫ খ্রিঃ |
| *সীরাতুন্নবী সংখ্যা*, *ছাত্র সংবাদ* | মার্চ ২০০৮ |
| *Encyclopaedia Britannica* | 31 October 2007 |
| *Lippincott Williams &Wilkins* | 2007 |
| *Mosby's Pocket Dictionary of Medicine* | 2009 |
| *Oxford University Press* | 2010 |
| *Oxford University  Press* | 2005 |
| *US Federal Food* | 17 August 2008 |

# (ঝ) ওয়েবসাইট

| ওয়েবসাইট | প্রকাশকাল |
|---|---|
| *https://blog.bdnews24.com/alamgiralam/210632* | ২৩.০৩.২০১৭ |
| *https://m.bdnews24.com/amp/bn/detail/lifestyle.* | ১৪.০১.২০২১ |
| *https://barta24.com/details.* | ০১.০৪.২০১৯ |
| *https://www.bd24live.com/bangla/article.* | ০৮.০৩.২০২১ |
| *https://bn.mtnews24.com/islam* | ০১.১২.২০১৫ |
| *https://bangla.bdnews24.com* | ০২.০৮.২০২০ |
| *https://www.banglanews24.com/health/news/bd.* | ০১.১৪.২০১২ |
| *https://www.banglaquiz.in* | ০৬.০৭.২০২১ |
| *www.national-awareness-days.com/world-hospiceand palliative.* | ২৮.১০.২০১৪ |
| *http://www.risingbd.com/sciencead-technology/neciencIws.* | ২৫.০৭.২০১৮ |
| *https://www.myupchar.com/bn/diseas/  drug-abuse* | ০১.১২.২০১৮ |
| *https://bigganblog.org.* | ১৬.০৪.২০১৪ |
| *http://sangbad.net.bd/opinion/* | ২৩.০৪.২০২১ |
| *https://dainikazadi.net.* | ৩১.০১.২০১৯ |
| *http://www.bd-journal.com/health.* | ০৯.০২.২০১৯ |
| *https://roar.media/bangla/main/biography/abu-bakr-al-razi-the-most-important-figure-in-islamic-medicine,* | ৩০.১১.২০১৭ |
| *https://roar.media/bangla/main/science/cloning.* | ২০.০৩.২০২০ |
| *https://www.proz.com/kudoz/english-to-bengali/medical-general/* | ১৪.০৪.২০২০ |
| *https://www.bebeautiful.in/bn/all-things-skin/everyday/* | ০৭.০৭.২০২১ |
| *https://www.globalnews.com.bd.* | ০৫.১২.২০২১ |
| *https:/muktopran.com/autophagy-and-fasting/* | ২৯.০৪.২০২১ |
| *https://www.rtvonline.com/lifestyle.* | ১৭.০২.২০২০ |
| *https://daktarbhai.com.* | ১২.০৮.২০১৮ |
| *https://www.risingbd.com.* | ৩১.০৮.২০২০ |
| *https://www.prothomalo.com/life.* | ২৫.০১.২০২১ |
| *https://www.prothom alo.com/life.* | ০৪.০২.২০২১ |
| *https://www.prothomalo.com/life.* | ১৭.০৫.২০১৮ |
| *https://www.prothomalo.com/life.* | ১৩.০৭.২০১৫ |
| *https://www.prothomalo.com/life.* | ১০.০৫.২০১৮ |
| *https://www.prothomalo.com/life.* | ১৯.০৯.২০১৮ |
| *https://www.prothomalo.com/life/durporobash.* | ০৮.১০.২০১৬ |
| *https://www.prothomalo.com/life.* | ২৯.০১.২০১৬ |
| *https://www.kalerkantho.com.* | ০৫.১১.২০১৯ |
| *https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life* | ০৭.০৪.২০১৭ |
| *https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/* | ০৫.১২.২০১৯ |

| ওয়েবসাইট | প্রকাশকাল |
|---|---|
| *https://www. Kalerkantho.com* | ২৯.০১.২০১৬ |
| *https://www.kalerkantho.com/islamic-life.* | ২৪.০৬.২০১৯ |
| *https://www.kalerkantho.com/islamiclife.* | ০২.০৩.২০২০ |
| *www. Kalerkantho.com* | ১০.১২.২০২০ |
| *https://m.dailyinqilab.com.* | ১৩.১১.২০২০ |
| *https://m.dailyinqilab.com.* | ২৩.০৩.২০১৬ |
| *https://m.dailyinqilab.com.* | ১৭.০২.২০১৬ |
| *https://www.jugantor.com/lifestyle* | ১২.১০.২০২০ |
| *https://www.jugantor.com/lifestyle* | ১৬.০১.২০১৯ |
| *https://www.jugantor.com/lifestyle.* | ১৩.১২.২০২০ |
| *https://m.daily-bangladesh.com/ health-and-medical.* | ১২.১২.২০১৮ |
| *https://www.bd-pratidin.com/health.* | ২৮.০৫.২০১৯ |
| *https://www.bd-pratidin.com.* | ২১.১২.২০১৬ |
| *https://www.bd-pratidin.com/health.* | ২৮.০৫.২০১৯ |
| *https://www.ntvbd.com/health.* | ০৪.০৪.২০১৫ |
| *https://www.ntvbd.com/health.* | ০৫.১১.২০১৫ |
| *https://www.ntvbd.com/health.* | ২১.০২.২০১৭ |
| *https://www.ntvbd.com/health.* | ২৯.০৯.২০১৬ |
| *https://www.ekushey-tv.com.* | ১৬.০৯.২০১৮ |
| *https://m.daily-bangladesh.com/ lifestyle.com.* | ০৬.০৫.২০২১ |
| *https://bn.quora.com* | ২০১৮ইং |
| *https://roar.media/bngla/main/history/pharaoh diary how was* | ২৪.০৭.২০১৮ |
| *https://bn. m.wikipedia.org/wiki* | --- |
| *https://fourlimbed.blogpost.com.* | --- |
| *http://m.facebook.com/permalink. php story* | --- |
| *https://m.rtvonline.com* | --- |
| *www. Amaderislam.com.* | --- |
| *http://dictionary.Reference.com/browse* | --- |
| *https://www.banglatribune.com* | --- |
| *https://m.bdnews24.com.* | --- |
| *https://www.dw.com/bn/* | --- |
| *https://m.daily-bangladesh.com* | --- |
| *https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla* | --- |
| *https://www.stylecraze.com/bengali/makhoner-upokarita-in-bengali/* | --- |

| ওয়েবসাইট | প্রকাশকাল |
|---|---|
| *https://bn.quora.com.* | --- |
| *https://parstoday.com* | --- |
| *https://www.muslimmedia.info* | --- |
| *http://www.prevention.com;/health/healthy living/* | --- |
| *http://blogs.discovery.com* | --- |
| *https://www.platform-med.org.* | --- |
| *https://www.platform-med.org.* | --- |
| *https://www.kalerkantho.com.islamiclife* | --- |
| *https://www.holyworld.org/pharmacology/* | --- |